থ্রিলার-সপ্তক

থ্রিলার-সপ্তক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

THRILLAR-SAPTAK
A Collection of Bengali Thrillars By Syed Mustafa Siraj
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 150.00

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : ১৫০ টাকা

ISBN : 81-7612-559-8

প্রকাশক • সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ। পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শক্তিমান তরুণ কথাশিল্পী
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু—

লেখকের অন্যান্য বই

স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কর্নেল সমগ্র (১ম-৯ম)
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠীলিপিতে রক্ত
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজবনের ভয়ঙ্কব
হাট্টিম রহস্য
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
কালোমানুষ নীল চোখ
ভয়-ভুতুড়ে
টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
নিঝুমরাতের আতঙ্ক
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালোবাক্সের রহস্য
শ্রেষ্ঠগল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

এতে আছে

তদন্ত

—আপনি অরুণদার ভাই? কেমন ভাই?

ঘুরে দেখি, মেয়েটি আবার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার চোখের দৃষ্টি একটু বাঁকা। একটু সন্দিগ্ধভাব যেন ভুরুর ওপরকার কয়েকটা ভাঁজে আঁকা। কোন জবাব দেবার আগেই দ্রুত মনে হল, মেয়েটির চেহারায় মিষ্টি সৌন্দর্য আছে—যেটা কিছুক্ষণ আগে আমি লক্ষ্য করিনি।

—কেমন ভাই মানে? আমি হেসে ফেলি। ফের বলি—অরুণদা আমার কথা তো আপনাদের কাছে বলেছেন বললেন।

সে বলে—হুঁ, বলেছিলেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে কী সম্পর্ক, তা বলেননি।

একটু দ্বিধার পর বলি—মাসতুতো বলতে পারেন। মানে, ওঁর মাকে আমি মাসিমা বলতাম। অবশ্য সম্পর্ক একটা ছিল। সেটা বেশ খানিকটা দূরের।

সে কী যেন ভাবতে থাকে। কিন্তু কিছু বলে না। আমি তার দিকে লক্ষ্য রাখার দরকার মনে করি না। অরুণদার ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। একটা মরচেধরা লোহার খাট আছে, তার ওপর ময়লা তোষক দাঁত বের করে পড়ে রয়েছে। চাদরটা এক পাশে গোটানো। বালিশটাও নোংরা। পানের পিচের ছোপে ভর্তি। অথচ জানি, অরুণদা একসময় খুব ফিটফাট থাকতেন। শিলং-এ থাকার সময় তো দস্তুরমত সায়েব ছিলেন। নিজে থেকেই বলেছিলেন—এই পাহাড়ী শহরটার সায়েবী জৌলুসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি, বুঝলি তো?

কলকাতায় এসেও সেটা নাকি অনেকদিন বজায় ছিল। তারপর একটা কিছু ঘটেছিল, নিশ্চয় টাকাপয়সার অভাব, কিংবা কিছু, অরুণদা তাহলে বদলে গিয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে। এমন বাজে পাড়ায় এমন একটা ঘরে তিনি জীবন কাটাচ্ছিলেন, ভাবতে বড্ড কষ্ট হয়' এই একটা বছর কোন যোগাযোগ ছিল না বলে আমার কিছু জানা নেই। জানতে ইচ্ছে করে।

আপাতত ইচ্ছেটা চেপে রেখে খাটের তলায় উঁকি মারি। একটা কলো কিটব্যাগ দেখতে পাই। সেটা টেনে বের করি। চেনটা খারাপ হয়ে গেছে। টানাটানি করতেই কিটব্যাগটা হাঁ করে। একগাদা খবরের কাগজ, দোমড়ানো প্যান্টশার্ট, আর তলায় কী সব আছে। যেমন ছিল তেমনি রেখে দিই এবং খাটের ওপর তুলি ব্যাগটাকে।

দেয়ালে ক্যালেন্ডার আছে। কয়েকটা তারিখে লাল ডট পেনের দাগ। কিছু না ভেবেই ক্যালেন্ডারটা খুলে জড়িয়ে ফেলি এবং কিটব্যাগে ভরি। তারপর হাসি শুনতে পাই।

খাটটা কীভাবে নেবেন?

রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আমি অরুণদার সম্পত্তি নিতে এসেছি, তা ঠিক। কিন্তু তার আপত্তি কিংবা ঈর্ষার কী থাকতে পারে?

তার চেয়ে বড় কথা, সম্পত্তি বলতে তো দেখছি মোটে এই কিটব্যাগ, তোষক, চাদর, বালিশ—আর ... আর কী? হ্যাঁ—টুথব্রাশ, রেজার, টুকরো সাবান!

আমি কি খুব লোভীর মত এইসব তুচ্ছ জিনিসের দিকে তাকিয়েছি? তাও নয়। অতএব বলি—আমি কিছুই নিতে আসিনি। তবে এই ব্যাগ আর ক্যালেন্ডারটা নিতে চাইছি, শুধু স্রেফ কৌতূহলের জন্যে! অরুণদার সম্পর্কে বরাবর কৌতূহল ছিল আমার।

—সে আমাদের .... আমারও ছিল। বলে মেয়েটি ফের হাসে।

তার হাসি আমাব রাগ ধুয়ে দেয়। বলি—তাহলে তো বুঝতেই পারছেন আমার পয়েন্টটা।

—পারছি। বলে সে সরে যায় দরজা থেকে।

মেয়েটি কেমন যেন। ওর কাছে অরুণদাব সম্পর্কে অনেক কিছু জানার আছে। কিন্তু তার হাবভাব দেখে ভাল লাগছে না। কিটব্যাগে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘ দু মিনিট। মাথায় আবোল-তাবোল সব ভাবনা। মাঝে মাঝে মগজ খালি হয়ে যাচ্ছে যেন। কোথায় এসে দাঁড়িয়ে আছি, কেন দাঁড়িয়ে আছি, এবং অরুণদাই বা কে বুঝতে পারছি না।

যখন পারছি, তখন বুকের ভেতর টান লাগছে। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যাচ্ছে।

কষ্ট—কষ্ট একটা পাচ্ছি তো বটেই। সেটা অরুণদাব এমন শোচনীয় পরিণামের জন্যে, নাকি মানুষের জীবনের কথা ভেবেই, তা বলা কঠিন।

হঠাৎ খেয়াল হয়, আমাকে লেখা অরুণদার পুরনো চিঠিটা—যেটা এদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে দিয়েছি, আমাকে এখনও ফেরত দেয়নি। ওটা ফেরত নিতে হবে। অরুণদার স্মৃতি আমার কাছে পবিত্র। আর তাঁর মত মানুষের এত সব পরিচিত—এমন কি আত্মীয়স্বজন থাকতেও আমাকেই তিনি তাঁর 'জিনিসপত্র' দিয়ে গেছেন, একথা ভাবতে অমার মনে সুখদুঃখে মেশানো বিচিত্র ভাব ভেসে আসে। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল গভীর। কিন্তু এত গভীর, তা তো জানতাম না।

—একটু চা খান।

ঘুরে দেখি, হাতে চায়ের কাপ এবং প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট, দুটো সন্দেশ নিয়ে মেয়েটি আবার এসেছে। বলি—এ কী! আবার চা-ফা কেন! খামোকা ঝামেলা!

—না। ঝামেলা কেন? সে তেমনি মিষ্টি হাসে। অরুণদা আমাদের নিজের লোকের মতই ছিলেন। দেখতেই তো পাচ্ছেন, কীভাবে আমরা থাকতাম।

বুঝতে পারি, সন্দিগ্ধতার শেষটুকুও ঘুচে গেছে। খাটে বসে অগত্যা চা ও প্লেটটা নিই। তারপর বলি—অরুণদার জন্যে আর কেউ খোঁজ করেনি?

সে মাথা নাড়ে। তারপর আস্তে বলে—হুঁ করেছিল।

—কোন আত্মীয় কি?

—নাঃ। কয়েকটি ছেলে। চিনি না।

—কী বলছিল?

—অরুণদার জিনিসপত্র কী আছে, দেখবে। নিয়ে যাবে।

চমকে উঠে বলি—সে কী!

—গায়ের জোর দেখাল। মানে, জোর করে ঢুকল।

—তারপর?

—তোষক, বালিশ টিপে দেখল। কী দেখল কে জানে। তারপর ওই ব্যাগটা হাতড়াল।

—বলেন কি?

—তারপর 'কিছু মনে করবেন না' বলে চলে গেল।

—সর্বনাশ! কী খুঁজতে এসেছিল ওরা?

—কে জানে! .... বলে সে মুখ নামিয়ে নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখতে থাকে।

—কবে এসেছিল ওরা?

—অরুণদা যেদিন মার্ডার হয়, সেদিনই বিকেলে। পুলিশ আসার আগে।

—ব্যাপারটা পুলিশকে বলেননি?

—নাঃ। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কী?

—পুলিশ সেই একবার এসেছিল?

—হুঁ, আর আসেনি।

—কোন ঝামেলা করেছিল নাকি?

সে মুখ তুলল। মাথা নেড়ে বলল—নাঃ। অরুণদার সম্পর্কে দুচারটে প্রশ্ন করে চলে গেল।

—আমার কথা বলেছিলেন কি ?

সে হাসে। —না। কী দরকার?

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকি। আড়চোখে দেখি, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মনে প্রশ্ন ছিল অরুণদা সম্পর্কে। এখন আর কিছু মনে পড়ে না। খালি মনে হয়, যে মরে গেছে, তার কথা জেনে কী লাভ ? তার পাপ কিংবা পুণ্যের ভার এই বিরাট পৃথিবী বেশিক্ষণ বইবে না। মৃত্যুই সব মুছে দেয়।

—আচ্ছা, চলি। বলে উঠে দাঁড়াই।

সে বেরিয়ে বারান্দায় যায়। কিটব্যাগটা নিয়ে পা বাড়াই। বারান্দার ওপাশের ঘরটায় এরা থাকে। বলেছে, মা নেই—বাবা আছেন। বুড়ো মানুষ এবং রুগ্ণ। একবার সাড়া পেয়েছিলাম। আর কোন সাড়া নেই। উঠোনটা ছোট্ট। একতলা পুরনো এই বাড়িটার মালিক এরা নিজেই। বস্তি এলাকার অপরিচ্ছন্নতা আর রহস্যময়তা এ বাড়িকেও স্বভাবত গ্রাস করেছে। বেশিক্ষণ এখানে কাটানো তো কঠিনই—পরে আর কখনও আসার কথা ভাবতেও পারি না।

দরজার পাশে ক্লান্ত খর্বুটে শিউলি গাছটাই যা শীতের রোদ পেয়েছে খানিকটা, আর কোথাও রোদ নেই। উঠোনে নেমে ফের বলি—আচ্ছা, আসছি তাহলে।

তারপর মনে পড়ে যায় অরুণদার চিঠিটার কথা। ফের বলি—হ্যাঁ, সেই চিঠিটা...

—তাই তো! একেবারে ভুলে গেছি।

সে ঘর থেকে চিঠিটা এনে দেয়। আমি বেরিয়ে পড়ি দরজা খুলে। সঙ্কীর্ণ রাস্তায় আবর্জনা আর ভিড়। সে সঙ্গে আসছে দেখে বলি—থাক। আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

—চলুন, মোড় অব্দি পৌঁছে দিই।

কিছুটা চলার পর বলি—অরুণদাব ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জিগ্যেস করব ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল, থাক —কী হবে জেনে।

—সেটাই আমার এতক্ষণ অবাক লেগেছে কিন্তু!

তাকিয়ে দেখি সে আবার তেমনি করে হাসছে। ভুরুর ওপর তেমনি কুঞ্চন। বাঁদিকে একটা পোড়ো জায়গা, ডাইনে কারখানা। সামনে একটু দূরে বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ভাবলাম, ওই রাস্তার ধারে কোন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলা যেতে পারে। ওদের ঘরে কেমন যেন দম আটকানো ভাব ছিল। তাই যত দ্রুত পারি, চলে আসতে ইচ্ছে করছিল।

ওর কথার জবাব দিই—হ্যাঁ, অবাক লাগতে পারে। যাই হোক, আপনার অসুবিধে না হলে ওখানে কোথায় আমরা কথা বলতে পারি। চলুন।

—আমার কোন অসুবিধে নেই। .....

এই রাস্তাটা খুব চওড়া। মধ্যিখানে আইল্যান্ড। দুধারে গাছ। আর হাউসিং এস্টেটের অজস্র বাড়ি। মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সে আঙুল তুলে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে—অরুণদা আমাকে একদিন ওই বাড়িটায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে। ওঁদের খবর দেওয়া উচিত ছিল হয়তো। দশদিন হয়ে গেল যাই-যাই করে। কী দরকার?

বুঝতে পারছি, আমারই মতো এক ধরনের নিরাসক্তিতে ভুগছে মেয়েটি। তাছাড়া, বয়সের তুলনায় বেশ সিরিয়াস ভাব। বয়স—কত আর হবে? বড় জোর কুড়ি থেকে বাইশ? .... বোঝা যায় না। এতক্ষণে এই পরিপূর্ণ রোদে খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে ভাল করে দেখতে থাকি। মোটামুটি ফর্সা রঙ, টানা নাক এবং চোখ, সুন্দরী বলা যায়। একটু রোগা। ঈষৎ পুরু নীচের ঠোঁটে একটা তিল আছে। তিনকোনা থুতনিতে আত্মবিশ্বাসের পরিচয় আছে। অগোছাল চুল, অতিব্যবহারে বিশৃঙ্খল পশমী নীলচে চাদর, খয়েরি তাঁতের শাড়ি—এসব মিলিয়ে একটা নির্লিপ্ত ব্যক্তিত্বের আভাস আছে। চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপও তীব্র।

আইল্যান্ডে ধুলোমলিন ঘাসে রোদে দাঁড়ানোই পছন্দ করে সে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাই। বলি—একটা বেঞ্চ পেলে মন্দ হত না।

সে হাল্কা গলায় বলে—ওখানে পার্ক আছে। যাবেন?

—থাক, এই ভাল।

—আপনি তো এখান থেকেই বাস ধরবেন?

—হ্যাঁ। আপনার তাড়া নেই তো?

—না। আপনারও তো ছুটি আজ। নিউইয়ার্স ডে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলি—অরুণদা খুন হলেন কেন, বলতে পারেন? বলেই একটু চমকে উঠি। নিউইয়ার্স ডের সঙ্গে খুন জড়িয়ে গিয়ে আমার সামনে প্রলম্বিত ভবিষ্যৎ হঠাৎ কেমন অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। অরুণদা—আমার স্বপ্নের মানুষ, এবং কিছুটা আদর্শেরও, তার রক্ত দিয়ে নতুন বছর শুরু হল। এতে যেন ভাগ্যের কী একটা গোপন সঙ্কেত আছে। আমি শিউরে উঠি।

আমার অন্যমনস্কতা ওর চোখে পড়ে হয়তো। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পব বলে—ভেবেছিলাম, আপনি এলে আপনাকে ঠিক এই কথাটাই জিগ্যেস করব।

—কিন্তু আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এক বছর যোগাযোগ ছিল না ওঁর সঙ্গে।

—আগের কথাই বলুন না, শুনি!

ওকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে দেখে বলি—খুব একটা শান্ত লোক ছিলেন, তা বলব না। দেখতে রোগা হলেও জোর ছিল প্রচণ্ড। হয়তো মনেরই জোর। রাজনীতি—মানে ট্রেড ইউনিয়ন করতেন। পরে সব ছেড়ে চাকরি নিয়ে শিলং চলে যান। তখন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হীরু, এবার আমার জন্যে কনে দ্যাখ ভাই। তা ....

—দেখেছিলেন?

—পাগল হয়েছেন? অরুণদা বিয়ে করবেন না, আমি জানতাম।

—কেন?

একটু হেসে জবাব দিই—প্রথম প্রেমে সাংঘাতিক চোট খেয়েছিলেন। সে ত আমার সামনেই। ভদ্রমহিলা ওঁর সঙ্গে প্রেম করতে করতে হঠাৎ ওঁর এক বন্ধুকে বিয়ে করে বসলেন। বন্ধুটিকে চিনতে পারেন। এখন গণ্যমান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। মন্ত্রী হবার চান্সও আছে সামনের ইলেকশনে।

—কে বলুন তো?

—নগেন সেন। রোজ খবরের কাগজে নাম বেরোয় আজকাল।

—শিলং থেকে কলকাতা চলে এলেন কেন?

—চাকরি পোষাল না। এসে কিছুদিন মির্জাপুরে একটা মেসে ছিলেন। সেই সময় আমি বম্বে চলে গেলাম। তারপর আর যোগাযোগ ছিল না। এবার আপনি বলুন, আপনাদের বাড়িতে কবে উঠেছিলেন?

—মাস সাত-আট হবে। বাবার সঙ্গে পরিচয় ছিল।

—ইদানীং কী ভাবে চলত অরুণদার? চাকরি নিশ্চয় ছিল না?

—ছিল বলতেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি।

—কেন?

—সেটা বোঝা যায় বই কি। টাকা পয়সা নিয়মিত এলে মানুষের ভাবভঙ্গিতে তার ছাপ পড়ে। পড়ে না?

—আপনি বুদ্ধিমতী।

সে সামান্য হেসে আমার প্রশস্তিটুকু নেয়। তারপর বলে—ভদ্রলোকের মধ্যে কি একটা ছিল। খুব সহজে আপন করে নিতে জানতেন। আমি ত ওঁর মায়ের পেটের বোন হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু অনেক কথা গোপন রাখতেন, সেটাও বুঝতাম। যেমন ধরুন, প্রায়ই কারা সব এসে ওঁকে ডাকত। কি সব কথাবার্তা চলত চাপা গলায়। কোনদিন অনেকটা রাত করে ফিরতেন—আবার....

—কোন স্মাগলিং কারবারে জড়িয়ে পড়েননি তো?

—মনে হয় না। কারণ, তাহলে তো টাকাপয়সার অভাব থাকত না।

একটু ভেবে বলি—তাহলে ধরুন অন্য কোন অ্যান্টিসোশ্যাল কাজকর্ম.....

সে জোরে মাথা দোলায়। —বিশ্বাস করি না। যারা আসত, তারা মাস্তান নয়। তবে ভীষণ ভদ্রলোকও নয়।

—কিন্তু খুন হবার পর যারা এসেছিল, তারা তো মাস্তান টাইপের ছেলে!

—হ্যাঁ। ওদের কখনও আসতে দেখিনি। সেটাই অবাক লেগেছে।

তাকে অন্যমনস্ক দেখায় এবার। চুপ করে দূরের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবতে থাকে। আমিও চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ পরে বলি—আপনার পা ব্যথা করছে না তো?

—আপনার করছে? সে খোলা মনে হেসে উঠে বলল—ওই পার্কে গিয়ে বসি।

ঘড়ি দেখে বলি—না। আজ আর থাক। বরঞ্চ অন্য কোনদিন ....

—আর কি আপনার সঙ্গে দেখা হবে? বলেই সে লজ্জা পায় যেন।

কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় সেটুকু কাটিয়ে উঠতে। তারপর বলে—আপনি তো আর বম্বেতে ফিরে যাচ্ছেন না বলছিলেন!

—না। বদলি হয়ে এসেছি। অতএব দেখা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। ... এবং এই কথাটা বলার সময় একটা চাপা কাকুতি অনুভব করি নিজের মধ্যে। কেন যেন ওর সঙ্গ ক্রমশ লোভনীয় হয়ে উঠছে। অর্থাৎ ওকে ভাল লেগে যাচ্ছে। বিশেষ করে ওর হঠাৎ নির্মল এক ঝিলিক হাসিতে এবং ভুরুর ওপর কয়েকটা তাৎক্ষণিক ভাঁজে আশ্বাসভরা কয়েকমুঠো সৌন্দর্য আছে—যা এ যাবৎ কোন যুবতীর মধ্যে দেখিনি। আমি সেই গোপন আবেগ নিয়ে ফের বলি—আমার ফোন নম্বরটা রাখুন বরং। এক মিনিট—কার্ড আছে, দিচ্ছি। অফিসের কার্ড কিন্তু।

একটা কার্ড বের করে দিই। পড়ে দেখার পর আমার মুখের দিকে তাকায়। ওর চোখে এবার বিস্ময় আছে। কেরানির শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের মত বিস্ময় যেন। এটা ওর মধ্যে মানায় না। ও বলে—আমি বুঝতেই পারিনি আপনি এমন সাহেবসুবো মানুষ।

—পাগল। কী যে বলেন! পেটের দায়ে নেহাত একটা চাকরি করি, এই পর্যন্ত। কিন্তু আপনি কী করেন বা করতেন টরতেন বলেননি।

—এখন কিছু করি না, আপনাকে বলেছি। ভুলে গেছেন!

—তাই বুঝি?

—এক সময় একটা গার্লস কলেজে লেকচারার হয়েছিলাম। কয়েক মাসের জন্যে। অবশ্য মফস্বলের কলেজ। এদিকে বাবার এই অবস্থা। ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল। বাবা কী বলেন জানেন? সুনন্দা আমার মেয়ে নয়, ছেলে।

তার হাসিতে হাসি মিশিয়ে দিই। আরও ভাল লাগার টান আসে মনে। কিন্তু আবার মনে পড়ে যায় অরুণদার কথা। অরুণদা এই পরিচয়ের যোগসূত্র। অরুণদাকে কে বা কারা নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে। এসব ভেবে মন আবার তেতো হয়ে যায়। ইংরেজি বছরের নতুন দিনটা আবার রক্তাক্ত দেখি—এবং সে রক্ত বাসি, তাই কালচে হয়ে গেছে।

সুনন্দা বলে—বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতাম। কিন্তু এখন ওঁর অসুখটা বেড়ে গেছে, কথা বলতে কষ্ট হয়।

—তাহলে তো আপনাকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি। ঘড়ি দেখি এবং ট্যাক্সি খুঁজতে এদিক-ওদিক তাকাই।

সুনন্দা আস্তে বলে—আটকে রাখা কেন? কথা বলতে তো ভালই লাগল। মন খুলে কথা বলার লোক পাইনি। কেমন এলাকায় আছি, তা তো দেখলেন।

—বরং আরেকদিন আসব। আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করব। তাছাড়া, অরুণদার ব্যাপারে মনে হয়, আপনার বাবা অনেক খবর দিতে পারবেন।

—হয়তো পারবেন।

—কাইন্ডলি যদি সুবিধেমত রিং করেন, খুশি হবো।

—করব।

—আজ চলি তাহলে। কেমন?

সুনন্দা অন্যমনস্কভাবে বলে—আচ্ছা।

রাস্তার ওপাশে একটা ট্যাক্সি খালি হচ্ছিল। আমি দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে যাই। ট্যাক্সিতে ঢোকার পর পিছু ফিরে দেখি, সুনন্দা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হয়, মেয়েটি বড় অসহায়—বড় একা।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে কিছুদূর চলার পর আবার ঘুরে সুনন্দাকে দেখতে পাই। তখনও সে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মধ্যে একজন হিসেবী ও কর্মক্ষম লোক আছে। কিংবা তাকে চাকর বলাই ভাল। অফিসের কাজ আমি নিষ্ঠার সঙ্গেই করি। ছাপোষা গেরস্থর মত দেশের রাজনীতি-অর্থনীতির তেজী-মন্দা নিয়ে মাথা ঘামাই। খুঁটিয়ে কাগজ পড়ি সকালবেলা। দাড়ি কামাই। যত্ন করে পোশাক পরি। টিফিন খাই নির্দিষ্ট সময়ে। এবং এ ধরনের কত ব্যাপারে আমার সঙ্গে আরও পাঁচটা সাধারণ মানুষের তফাত নেই নিশ্চয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ কী সব ঘটে যায়। হঠকারী কাজও করে ফেলি—যার কোন ভবিষ্যৎ ভালমন্দ বিচার করি না।

যেমন দুমদাম ভাল চাকরি ছাড়ার ব্যাপারটা। এই এক্সপোর্ট এজেন্সির মার্কেটিং একজিকিউটিভ পোস্টে আসার আগে বছর দুই কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশ অফিসে খুব দামী একটা চাকরি করেছি। সেটা অরুণদার প্রভাবেই জুটেছিল। অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর জায়গায় অরুণদার মত মানুষের প্রভাব ছিল।

তা হঠাৎ একদিন মনে হল জীবনে অন্য কিছু করার জন্যে আমার জন্ম হয়েছিল। সুতরাং এভাবে দিল্লিতে পচে মরার মানে হয় না। যথারীতি নোটিশ দিয়ে বসলাম চাকরি ছাড়ার। স্বয়ং সেক্রেটারি অনুযোগ করেছিলেন—মিঃ চৌধুরী, ভাববার জন্যে আরও সময় নিন বরং।

সময় নিই নি। নোটিসের মেয়াদ শেষ হলে নিজের তদ্বিরে পদত্যাগপত্র অ্যাকসেপ্ট করিয়ে সোজা চলে গেলাম নৈনিতাল। রাজ্যেশ্বরবাবু নামে এক ভদ্রলোক ওখানে এক সময় হোটেল খুলেছিলেন। পরে সন্ন্যাসী হয়ে যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বরাবর যোগাযোগ ছিল। তো রাজ্যেশ্বরানন্দ মহারাজের আশ্রমে গিয়ে বাকি জীবন কাটাবার নেশা জেগে উঠেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়। তিন মাস যোগ-সাধনা করে এক রাতে কথায় কথায় ওঁর সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক হয়ে গেল। জালজোচ্চুরি, বুজরুকি, ভণ্ডামি বলে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম।

যাই হোক, মাথায় জটা গজায়নি, এই রক্ষা। কলকাতায় ফিরে দেখলাম মেজদা অ্যাকসিডেন্ট করে পা ভেঙেছেন। বড়দার ছেলে পাড়ার মেয়ে ভাগিয়ে বেপাত্তা হয়েছে। মেজদা রাগ করে আলাদা বাসায় উঠে গেছেন শ্যামপুকুরে। বাড়িতে নিরানন্দ থমথমে ভাব। একটা মাস তার মধ্যে কাটানো নরক-যন্ত্রণার শামিল। অতএব আবার চাকরি খুঁজলাম। আগের চাকরির সূত্রেই এটা দ্রুত পেয়ে গেলাম। চমৎকার কোয়ার্টার এবং একটা গাড়িও। গাড়িটা গতকাল সন্ধ্যায় কোম্পানির গ্যারেজে গেছে। আজ সকালে সুনন্দাদের ওখানে যাওয়ার সময় গাড়িটা নিই নি। অরুণদার খবরের চিঠিটা রাতে দেখামাত্র হুলস্থূল ঘটে গিয়েছিল।

সুনন্দার কাছ থেকে ট্যাক্সি করে কোয়ার্টারে ফেরার পর দেখি, গাড়িটা এসে গেছে। ড্রাইভার ধরমবীর উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে আশ্বস্ত করে ঘরে ঢুকেছি। অফিস যাইনি। কিটব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করেছি এবং গোয়েন্দার মত ক্লু হাতড়েছি। অজস্র সিগারেট খেয়েছি। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে অরুণদার কথা ভেবেছি।

কেন অরুণদা খুন হলেন? তিক্ত ঘৃণা ছাড়া মানুষ কি মানুষকে খুন করে? প্রতিহিংসা, স্বার্থ, কিংবা রাগ—যেদিক থেকেই দেখা হোক ব্যাপারটা, খুনের পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকে প্রচণ্ড ঘৃণা। তাঁর মত

মানুষের প্রতি কার বা কাদের এমন ঘৃণা হতে পারে?

'কাদের' বলাও ভুল। মূলত ব্যক্তিই ব্যক্তিকে খুন করে। কে সেই মূল ব্যক্তি—যে অরুণদাকে খুন করতে চেয়েছিল? হ্যাঁ—'চেয়েছিল' শব্দটাই গুরুত্বপূর্ণ। ওটাই কেন্দ্র বা মস্তিষ্ক। কিন্তু কার মস্তিষ্ক? অরুণদার বয়স এখন সম্ভবত পঁয়তাল্লিশের বেশি হয়নি। কিন্তু তাঁকে আরও বয়স্ক দেখাত। তাঁর চুল অনেকটা পেকে গিয়েছিল—শিলঙে এক বছর আগে যখন দেখি, তখনই চুলের অর্ধেক পাকা। বলেছিলেন, এখানকার পাহাড়ী শীতের এই মজা! সমতলের লোক পেলেই মাথাটিতে সাদা রঙ মাখিয়ে দেয়। তুই সাবধানে ঘুরিস, অজু।

এই অরুণদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বর্ধমান জেলার একটা বড় গাঁয়ে। সেবার কলকাতার স্কুল থেকে একদল ছাত্র পাড়াগাঁয়ে 'সোস্যাল ওয়ার্ক' করতে গিয়েছিল। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। অমরপুরে গিয়ে দেখি, রাস্তা মেরামত, পুকুর পরিষ্কার, এই ধরনের কাজ হচ্ছে। স্থানীয় লোকেরাও খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে প্রথমে অরুণদার নাম শুনি।

অরুণদা গাঁয়ের জমিদারবাড়ির ছেলে। থাকেন কলকাতায়। রাজনীতি করেন। তাঁর গাঁয়ে ছাত্ররা সমাজসেবায় গেছে বলে তিনিও এসে জুটে ছিলেন।

জমিদারি প্রথা কবে গেছে। ওঁদের পরিবারের সবাই কলকাতায় গিয়ে বাস করছেন তখন। বড় বাড়িটা ভেঙেচুরে গেছে। একটা অংশ মেরামত করে নিয়েছেন সরকার। সেটলমেন্ট আপিস আর ডাকঘর হয়েছে সেখানে। অতএব অরুণদা উঠেছেন তাঁর এক বাল্যবন্ধুর বাড়ি। বাল্যবন্ধুটি গ্রাজুয়েট এবং গাঁয়ের স্কুলে সদ্য শিক্ষক হয়েছেন। নাম প্রিয়ব্রত ব্যানার্জি। আমাদের সঙ্গে জমে গিয়েছিল খুব। সেই প্রিয়ব্রত—আমাদের প্রিয়দাই বলেছিলেন, অরুণ পাশের গাঁয়ে কাজ করছে একটা দল নিয়ে। আগামীকাল এ গাঁয়ে আসবে। দেখবে, ভারি অদ্ভুত মানুষ!

অরুণদা পর দিন এলেন এবং প্রিয়দাকে আড়ালে ঠেলে আমাদের অরুণদা হয়ে উঠলেন। দল বেঁধে মাঠের রাস্তায় মাটি ফেলছি আর উনি গান গাইছেন হেঁড়ে গলায়, আমরা কেউ কেউ গলা মেলাচ্ছি—কী ভালই না লেগেছিল।

পরকে সহজে আপন করার ক্ষমতা ছিল অরুণদার। শুধু কথা বলার ক্ষমতা নয়, গান, মজার মজার ধাঁধা, ভূতের গল্প আর হঠাৎ কবিতা আবৃত্তি! মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী পরিবারের ছেলেদের কাছে ভাল লাগার পেটেন্ট জিনিস বলতে তখনও এগুলোই ছিল।

এক মাস পরে আমরা অরুণদার সঙ্গে কলকাতা ফিরে এসেছিলাম। হাওড়া স্টেশনে ছাড়াছাড়ির পর সেই বিচ্ছিন্নতার দুঃখ এখনও মনে পড়ে।

ঠিকানা জানতাম। শিগগির গিয়ে দেখা করেছিলাম। থাকতেন হেদোর কাছে এক আত্মীয়ের বাসায়। কত সকাল-সন্ধ্যা দুজনে আড্ডা দিয়েছি হেদোর ধারে এবং কতবার পাশাপাশি হেঁটেছি—কত কথা শুনেছি, বলেছিও! পরস্পরের কোন সুখ-দুঃখ যেন পরস্পরকে গোপন করিনি।

আমার মনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। একটা অংশ অরুণদা হয়ে উঠতে চাইত—অন্য অংশটা একেবারে উল্টো পথে হাঁটত। সে অরুণদাকে অস্বীকার করত। অরুণদা সম্পর্কে ভয় দেখাত। বলত—সর্বনাশ হবে, খবর্দার! এর ফলে নিশ্চয় একটা ব্যালেন্স সৃষ্টি হয়েছিল। না হতে চেয়েছিলাম অরুণদার প্রোটোটাইপ, না পেরেছিলাম নিজের মত হতে। তাই শেষ পর্যন্ত যা হয়েছি, তা একেবারে ভিন্ন রকম। অরুণদা বা নিজের মত হয়ে উঠিনি। হয়ে উঠেছি অন্য এক রকম—যাকে আমি চিনতে পারিনে, বুঝি না, জানি না এবং যার ওপর প্রতি মুহূর্তে রাগ করে বেচে আছি। আমার মধ্যে অন্য কেউ বসে আছে এবং আমাকে চালাচ্ছে—এর চেয়ে দাসত্ব আর কী হতে পারে?

অরুণদার অনেক ব্যাপারে আমার রাগ হত, অনেক ব্যাপার দারুণ ভাল লাগত—যেগুলো নকল করতে চাইতাম। পারতাম না। ওগুলো যেন আর কাকেও মানায় না।

রাগ হওয়ার ব্যাপার বলতে কোন চমৎকার জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার কথা দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর যেতেন না। একবার হরনাথ মল্লিক স্ট্রিটে খুব বড়লোকের বাড়িতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অরুণদার সেখানে কী খাতির! আমার সমবয়সী দুটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। তারা ভারি গায়ে পড়া।

বারান্দায় দুই বোনে আমাকে গল্প করতে নিয়ে এল, যেখানে অজস্র টবে সুন্দর সুন্দর ক্যাকটাস আর ফুল। শ্রুতি আর ধৃতির সঙ্গে দারুণ জমে গেল। ওরা আমার চেনা অন্য মেয়েদের তুলনায় কত স্মার্ট আর ফ্র্যাংক। কত বিষয়ে খবরাখবর রাখে! আমি মুগ্ধ হলাম।

একটু পরে বয়স্কদের আসরে ঠিক হল সামনের রোববার পিকনিকে যাওয়া হবে ওঁদের বাগানবাড়িতে। ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে শত একর জায়গায় সায়েব আমলের একটা বাড়ি কিনেছেন ওঁরা। অরুণদা আমাকে শাসিয়ে বললেন—এই অজু! যেন ডোবাসনে বাবা। ঠিক সাতটায় এসে আমাকে ডাকবি। ভুলবি নে!

বাড়ির কর্তা অর্থাৎ শ্রুতি-ধৃতির বাবা বললেন—ভেবো না অরুণ। বরং গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

অরুণদা বললেন—না দাদা। ওইটি কোর না। অনেকের ঈর্ষার কেন্দ্র হয়ে যাব। সোজা চলে আসব আমরা। তোমরা রেডি থেকো। ....

সেই রোববার যেন আসতেই চাইছিল না। যখন এল, তখন কলকাতা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। অত ভোরে কোন দিন ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ছিল না। তবু উঠতে হল। তারপর অরুণদাদের বাসায় এসে শুনি, উনি গতকাল বাইরে কোথায় গেছেন। ফিরতে দেরি হবে কয়েকদিন।

রাগে দুঃখে ছটফট করতে করতে চলে এসেছিলাম। একবার ভাবি, অরুণদা না গেলেই বা কী? আমি তো যেতে পারি! আবার ভাবি, ওঁদের খাতির তো অরুণদার সঙ্গেই। আমি কে ?....

অনেক পরে শ্রুতির সঙ্গে দৈবাৎ একদিন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের কাছে দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওদের বাড়িতে পুজো। জিনিসপত্র কিনতে এসেছে। নীল অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। শ্রুতির সামনে দাঁড়াতেই চিনল। —

আরে! কেমন আছেন? সেদিন আপনারা এলেন না যে? জানেন, কী দারুণ জমেছিল পিকনিক! রিয়েল অ্যাডভেঞ্চারও হয়ে গেল! ধৃতি গঙ্গায় নেমে ভেসে যাচ্ছিল .....

শ্রুতি খিল খিল করে হেসে উঠল। বলতে ইচ্ছে করছিল—আর হবে না পিকনিক ? কিন্তু তক্ষুনি মনে হল এই হ্যাংলামির কোন মানে হয় না।

এরপর শ্রুতি অরুণদার কথা তুলেছিল। আমাকেও যেতে বলেছিল। একদিন ওদের বাড়ির গেট অব্দি ঘুরেও এসেছিলাম। ভেতরে ঢুকতে পারিনি। নেহাত বলেছে বলেই এভাবে যাওয়ার মত সম্পর্ক তো আমার সঙ্গে ওদের হয়নি। হয়েছে অরুণদার সঙ্গে।

অরুণদাকেও পরে ও বাড়ি যাওয়ার কথা বলতে পারিনি। উনি বা কী ভাববেন! ওঁর চেনা জানা পরিবারে আমার মেলামেশার ইচ্ছেটা কী হ্যাংলামি নয়? আর অরুণদার ব্যাপারটা স্রেফ খেয়াল। খেয়াল হলে ওখানে যাবেন, নয়তো যাবেন না।

এই একটা ঘটনা উল্লেখ করার কারণ, অরুণদার সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত সম্পর্ক বোঝানো। পৃথিবীর প্রচুর ভাল জিনিসের মধ্যে ঢুকে পড়ার ছাড়পত্র দিলেন যেন অরুণদাই। উনি ছাড়া আমি সেখানে মূল্যহীন। আমার এমন কোন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মর্যাদা ছিল না, যাতে আমি ‘শ্রেষ্ঠ মানুষ’দের সমাজে ঢুকে পড়তে পারি। শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের সঙ্গে যেন অরুণদার ইচ্ছাতেই আমার পরিচয় এবং হয়তো ভালবাসাও হয়ে যেতে পারে, এমন মনে হত। আর এই শহরে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সংখ্যা তো কম নয়।.....

এবার ওঁকে ভাল লাগার একটা ঘটনা বলি।

ট্রেড ইউনিয়ন করার সময় একটা কারখানার গেটে গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়েছিলেন অরুণদা। হাসপাতালে দৌড়ে গেলাম। সামান্য আঘাত বলে মনে হল। কিন্তু কী খাতির করছেন ডাক্তার এবং নার্সরা! দলে দলে লোকেরা আসছে খবর নিতে। কুলি কামিনগোছের মানুষও আসছে। যাবার সময় স্লোগান দিতে দিতে রাস্তা হাঁটছে। তারপর এলেন এক ভদ্রমহিলা। অসাধারণ সুন্দরী মনে হয়েছিল প্রথম দৃষ্টে। অরুণদার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। অরুণদা মিষ্টি হেসে বললে—বল নীলি!

উনি খাটেই বসলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন—কীভাবে হল?

—মনে হচ্ছে তোমার নগেনদারই হাতের ঢিল। দৈবাৎ ভুল করে ছুঁড়ে ফেলেছেন!

অরুণদা হাসতে থাকলেন। ভদ্রমহিলার চোখ জ্বলে উঠেছিল যেন।

তারপর ধরা গলায় বললেন—তুমি আমাকে অপমান করবে, ভাবিনি!

—তোমাকে অপমান? জাস্ট ফ্যাক্ট বললাম। ব্লান্ট ফ্যাক্ট।

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে। একবার আমার দিকে তাকালেন। তাবপর ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। আস্তে বললেন—আসি।

—তুমি রাগ করলে কেন নীলি?

—রাগ করিনি।

—তোমার নগেনদাকে বোলো, অরুণ সেনের ভাইটালিটি অসাধারণ।

ভদ্রমহিলার চোখে আবার আগুন জ্বলে উঠল। কয়েক মুহূর্ত ওঁর দিকে তেমনি নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পব দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। অরুণদা হাসছিলেন।

—অজু, বল্‌তো ও কে?

—নীলিমা রায়।

—তোর স্মৃতিশক্তি তো দারুণ।

এই নীলিমা রায়ের সঙ্গে অরুণদার এক সময় 'গভীর প্রেম' ছিল। অরুণদা নিঃসঙ্কোচে নিজের গোপন কথা আমাকে বলতেন। পরে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নগেন সেনের সঙ্গে নীলিমা রায়ের পাল্টা একটা 'গভীর প্রেম' হয়ে যায় এবং সে কথাও অরুণদা আমাকে বলেছিলেন। অরুণদা আমাকে গ্রাস করেছিলেন বলেই এই ব্যাপারটা মনে হত আমারই জীবনে ঘটেছে এবং ভাবতাম, আমি যদি অরুণদা হতাম, আর নীলিমা রায় কোনদিন আমার সামনে আসত, তাকে কী যে অপমান করতাম!

এই ঘটনায় আমার সেই ইচ্ছেটা আশ্চর্যভাবে মিটে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আমারই এক বিশ্বাসঘাতিনী সুন্দরী প্রেমিকাকে আমিই যেন অপমান করলাম মুখের ওপর।

তাই অরুণদাকে এত ভাল লাগল। যদি অরুণদা ওঁকে অপমান না করতেন আমার ভীষণ খারাপ লাগত। ... ..

নীলিমা রায়ের কথা মনে পড়ার পর ঘুমের মধ্যে কিংবা স্বপ্নে যাওয়ার মত আমি বেরিয়ে পড়ি। ধরমবীর একবার প্রশ্ন করে গন্তব্য জেনে নেয়।

হাওড়া।

শুধু জানতাম নগেনবাবু হাওড়ায় থাকেন।

হাওড়ায় আমার এক 'কমন ফ্রেন্ড' শিশির মজুমদার থাকে। ওর বাড়িটা আমি চিনি। শিশিরও কিছু কিঞ্চিৎ রাজনীতি করে। অনেকদিন অবশ্য যোগাযোগ নেই আমার সঙ্গে।

শিবপুরের ওদিকে শিশিরের বাড়িটা চিনতে ভুল হয় না। তবে বাড়িটাকে অনেক সচ্ছল এবং উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গেট, লন, বাগিচা আছে। শিশির ব্যালকনিতে রোদ পোহাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে নেমে আসে। বুকে জড়িয়ে ধরে। কী প্রকাণ্ড হয়ে গেছে শিশির!

—ওরে, ওরে শালা তৃতীয় পাণ্ডব! অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলিস রে? দেবলোকে নাকি রে? উর্বশীরা তোকে অভিশাপ-টাপ দ্যায়নি তো? একে তো শালা দুনিয়াটা খোজায় ভরে গেছে, আবার অরুণ সেনের স্যাঙাত যদি .... বলেই সে জিভ কাটে। লনের ওপাশে তার অ্যাডভোকেট পিতৃদেব বাগান পরিচর্যা করছেন।

শিশির খুব প্রাণচঞ্চল থাকে বলে হই-হুল্লোড় করতে ভালবাসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে একেবারে ওপরে নিয়ে যায়। সেই রোদেভরা দক্ষিণের ব্যালকনিতে একটা গদিআঁটা বেতের সোফায় প্রায় ঠেলে বসিয়ে দেয়। তারপর চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ভেতরে ছোটে। তিরিশ—ত্রিশেই শিশির যেন খানিকটা ছাপোষা হয়ে গেছে। সেই তারুণ্যের চেহারা বদলেছে—উচ্ছলতা যতই থাক। কারণ ওর সংসারী জীবনের গাঢ় ঘোলাটে ভাব চোখে পড়ছিল। মেঝেয় ছড়ানো হিসিভেজা ক্ষুদে পেন্টুলে,

উল্টে পড়ে থাকা কাঠের ঘোড়ায়, রোদে শুকোতে দেওয়া লেপ-তোষক-চাদরে-নানান জিনিসে। বেঁটে গান্দাগোব্দা এক মহিলাকে টেনে এনে দাঁড় করায় সে। —একে তুই দেখতে আসিস নি। আমার প্রাণেশ্বরী! আর মিনু, এই হচ্ছে সেই সুবোধ বালক—থুড়ি ! তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন চৌধুরী। সাবধান হবার দরকার নেই, বুঝলে মিনু! শালার হাতের গাণ্ডীব খসে গেছে গুরুর অভিশাপে।

ওর বউ নমস্কার করে হাসিমুখে। তারপর 'বসুন, আসছি' বলে চলে যায়। শিশির আমার পাশে বসে উরু খামচে ধরে বলে—তোর গল্প মাঝে মাঝে শোনাই বউকে। মানে অরুণদার প্রসঙ্গে।

একটু চমকে উঠি। অরুণদার সঙ্গে তাহলে সত্যি আমি ভীষণভাবে জড়িয়ে আছি। বলি—অরুণদার সঙ্গে তোর যোগাযোগ ছিল নাকি ?

শিশির মাথা তুলে নীচে লনের ওখানে যেন ওর বাবাকে দেখে নেয় এবং সিগারেটের প্যাকেট বের করে পকেট থেকে। সিগারেট দিয়ে বলে—এ ব্র্যান্ড চলে তো? আমি ভাই কড়া রোস্টেড টোব্যাকো ছাড়া সুখ পাই নে! নে—তুই জ্বেলে দে। আগের মত।

হ্যাঁ, সিগারেট ধরিয়ে দেওয়ায় আমার দক্ষতা ছিল। টুকরো দেশলাই কাঠিতে ঝড়ের মধ্যেও এ কাজ আমি পারতাম। এখনও কি পারি? পরীক্ষা করে দেখি না আজকাল।

—তারপর অজু, বম্বে থেকে কবে এলি? ট্রান্সফার? নাকি অন-ডিউটি ট্যুর?

—ট্রান্সফার।

—বিয়ে নিশ্চয় করিসনি। তোর চেহারা দেখেই বুঝেছি।

—তাই বুঝি ?

—হুঁ। ... বলে সে প্রায় লুকিয়ে সিগারেট টানে। ধোঁয়া ঊর্ধ্বগামী। মুখ তুলে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। বাবাকে ওর এত সমীহ!

—একটা বিশেষ ব্যাপারে এলাম তোর কাছে। নগেন সেনকে তো তুই চিনিস?

—কোন নগেন সেন?

—তোদের হাওড়ায় থাকেন, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা!

—ডাব্বুদা! তাই বল। কী ব্যাপার? লেবার ট্রাবলে ভুগছিস নাকি ?

—না। অন্য ব্যাপার। ওঁর ঠিকানাটা আমার চাই।

—ওই তো, ওখানে থাকেন। কাছেই। এখনই যাবি?

—হ্যাঁ।

—দু'মিনিট অপেক্ষা কর। চা-ফা খাওয়া যাক্। তারপর বেরুব। .... বলে শিশির ফের ধোঁয়া তাড়াতে থাকে।

ফের আগের প্রশ্নটা টেনে আনি এবার। —অরুণদার সঙ্গে তোর ইদানীং যোগাযোগ ছিল?

শিশির আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বলে—না রে! মাস ছয়েক আগে এসপ্লানেডে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল। ঘুরে দেখি অরুণদা। মাইরি—আপন গড ! অ্যাট এ গ্ল্যান্স চিনতেই পারি নি। রোগা, নোংরা চেহারা। আমি তো হতভম্ব। আগের বার দেখেছি একেবারে সাহেব সেজে আছেন। গালে মাংস লেগেছে। আর সেদিন একেবারে জাস্ট এসে ডেড ম্যান—রট্‌ন্ মাল।

—তারপর?

—অল্প দুচার কথা হল। কী হয়েছে, কিচ্ছু বললেন না। শুধু বললেন—চাকরি পোষাল না। আবার রাজনীতি করব ভাবছি। তারপর—বুঝলি অজু, আমাকে আরও অবাক করে বললেন—তিনটে টাকা হবে নাকি ? মনে [illegible]ছি।

—দিলি?

শিশিরকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। চাপা গলায় বলে—দিলাম না। জানিস? আমার.... আমার কেমন যেন ভীষণ রাগ হল। যদি বলতেন শিশির—একশো টাকা দে তো শিগগির, হয়তো তক্ষুনি দিতাম! কিন্তু আমাদের গ্রেট অরুণদা অমনি করে ভিখিরিদের গলায় বললেন—তিনটে টাকা হবে নাকি ! হবে

মানেটা কি, তুই বল তো আজ অজু? শিশির মজুমদারের কাছে তিনটে টাকা হবে না? শালা—তিনটে টাকা! মাটি ফেটে গেলে লুকিয়ে বাঁচি, এই অবস্থা।

ওকে থামতে দেখে বললাম—তারপর?

—সামনে একটা বাসের দিকে দৌড়ে গেলাম। বলে গেলাম—সরি অরুণদা। নেই।

—কিন্তু ওর হয়তো তেমন কিছু ঘটেছিল, শিশির।

—ঘটবে কী রে? কেন ঘটবে? গ্রেট অরুণ সেনের লাইফ হিস্‌ট্রি তো লেখার মত। সেই লোক তিনটে টাকা চাইবে ভিখিরির মত? টাকা দেওয়াটাই অপমান করা নয়? .... শিশির তারপর উত্তেজনা সামলে নিয়ে ফিক করে হাসে। বলে—বাসটা তো চলেছে। জিজ্ঞেস করলাম। ও মা। বলে বেহালা যাচ্ছে।

সে ক্রমাগত হাসতে থাকে। তার হাসির মধ্যেই একটি মেয়ে ট্রে আনে। চা-ফা। শিশির বলে—চা খা। উরে শালা! বউ কীসব বানিয়েছে! অজু, খা। স্ত্রীলোকের বড় ভালবাসা রে। এ জিনিস না থাকলে পৃথিবীটার কোন মানেই হত না। বিশেষ করে শীতের সময় যার ঘরে বাঙ্গাল বউ নেই, তার কী আছে? ভাবিস নে, খা। চন্দ্রপুলি-টুলি হবে এগুলো। আমি শালা ঘটি। নাম জানিনে।

—অরুণদা মারা গেছেন, জানিস শিশির?

শিশির নরম পিঠেয় কামড় দিয়ে একবার তাকায় আমার দিকে—তাই বুঝি? আহা রে! বেচারা! ভেরি ব্যাড নিউজ। কিন্তু খবরের কাগজে তো ছাপেনি খবর। ছাপা উচিত ছিল।

—শিশির, অরুণদাকে মার্ডার করা হয়েছে দিন দশেক আগে।

শিশির সামান্য চমকায়। —মা-মার্ডার? মানে খুন?

—হ্যাঁ।

—আপন গড?

—হ্যাঁ। রেললাইনের ব্রিজের পাশে পড়েছিলেন। লোকে ভেবেছিল ট্রেনে কাটা পড়েছে কেউ। পরে দেখা গেল স্ট্যাবড। সারা গায়ে নিষ্ঠুরভাবে ড্যাগার চালিয়েছে কারা—কিংবা কেউ।

শিশির পিঠে দ্রুত গিলে নেয়। ঢকঢক করে জল খায়। তারপর মাথা তুলে নীচের লন দেখে নিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। আমাকে অফার করে না। নিজেরটা নিজে ধরায়। কয়েকবার টেনে এবং ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া সাফ করার পর বলে—আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ! আজ আর হয়তো খাওয়া দাওয়া রুচবে না। ইশ্‌শ্‌শ্‌।

তার এই শ্বাসক্লিষ্ট আওয়াজ রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত শোনায়। সে পাদুটো দোলাতে থাকে। আমি বলি—বাই এনি চান্স অরুণদা এভাবে খুন হলেন কেন, বলতে পারিস?

—আমি? শিশির জোরে মাথা দোলায়। আমি কীভাবে বলব? আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু পুলিশ তো নিশ্চয় এনকোয়ারি করছে। কী বলছে ওরা?

—জানি না। পুলিশের কাছে আমি যাইনি।

—যা গিয়ে খোঁজ নে। অরুণদা তোকে অত ভালবাসতেন!

মনে মনে একটা রাগ হয় শিশিরের ওপর। সেটা চেপে রেখে বলি—যাক্‌ গে। আমাকে নগেনবাবুর ঠিকানাটা দে।

শিশির ওঠে। —চল, তোকে নিয়ে যাই নগেনদার কাছে' বলে সে পা বাড়ায়। এক মিনিট। আগে ফোনে কথা বলে নিই। বাড়ি থাকার তো কথা।

সে ভেতরে চলে যায়। আমি পিঠেপুলি ছুঁই নি। চা-টা শেষ করতে ব্যস্ত হই। সেই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হয়, নগেন সেনের কাছে কেন যাচ্ছি? কী জানবার আশা করছি?

শিশির ফিরে এসে বলে—ভেরি সারি, অজু। নগেনদা হঠাৎ মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লি চলে গেছেন। ফিরতে দুদিন দেরি হবে। তা নগেনদার কাছে কী ব্যাপার, বলতে অসুবিধে না থাকলে আমায় বলে যা। আমি কথা বলে রাখব 'খন। নগেনদার সঙ্গে আমার আজকাল খাতির আছে।

একটু ভেবে নিয়ে বলি—ওঁর স্ত্রীর নাম নীলিমা সেন। জানিস নিশ্চয়?

—হ্যাঁ। তুই ... বলেই শিশির ফিক করে হাসে। ও, হ্যাঁ। তুই তো চিনিস নীলি বউদিকে। এক সময় অরুণদার সঙ্গে ইমোশানাল্ অ্যাফেয়ার ছিল নাকি।

—আমি ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাই, শিশির।

শিশির শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট গোল করে রাখে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ নাচিয়ে বলে—ব্যাপার কী বলতো? অরুণদা-ঘটিত কিছু কি?

—হয়তো।

—তাহলে আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, শি ইজ এ ভেরি হার্ড নাট টু ক্র্যাক।

—তুই আমাকে বরং বাড়িটা দেখিয়ে দে শুধু।

—না না। আমার যেতে আপত্তি নেই। তবে ভাই সাবধান, খুব তেজী মেয়ে। বেফাঁস কিছু বললে আমিও বিচ্ছিরি অবস্থায় পড়ে যাব।

উঠে দাঁড়াই। বলি— সে গ্যারান্টি দিতে পারছি না, শিশির। তুই আমায় বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েই চলে আসবি।

শিশিরের মুখে দ্বিধা ফুটে উঠেছে, স্পষ্ট দেখতে পাই। সে আমারই টানে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেমে আসে। গেটে এসে চাপা গলায় বলে—অজু, ভুল বুঝিস নে! আমার অনেকখানি ভালমন্দ নির্ভব করছে নগেনদার হাতে। তাই বন্ধু হিসেবেই একটা কথা বলছি, তুই যে আমার কাছে এসেছিলি এবং আমিই তোকে ওঁদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছি, যেন বলিস নে। প্লিজ!

—না, না। তোর প্রসঙ্গ কেন তুলব? আয়। ...

কয়েকটা বাড়ির পর একটা কারখানা। তার ওপাশে খানিকটা পোড়ো জায়গা। তারপর একটা পেট্রোল পাম্প। তার পিছনে বিশাল একটা বাড়ি। উঁচু পাঁচিলের মাথায় ঘন আইভিলতার বুনোট। গেটটাও প্রকাণ্ড। বোগানভিলিয়ার ঝাড়ে ঢাকা। অজস্র লাল ফুল, সাদা ফুল, নীল ফুল। সবুজ ঘাস। টেনিস কোর্ট। প্রাচীন ফোয়ারা। বেশ বনেদী পরিবার মনে হল।

শিশির দ্রুত কেটে পড়ল। গেটে দারোয়ান ছিল। পাশের গুমটি ঘরে টুলে বসে থাকা একটা লোককে সে কিছু বলতেই আমার কার্ডটা এগিয়ে দিলাম। লোকটা বলল—সাব তো নেই। আপনি কোত্থেকে আসছেন স্যার?

—কার্ডে লেখা আছে দেখুন। আমি মিসেস সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কাইণ্ডলি এক মিনিট ওয়েট করুন। ... বলে সে ফোন তুলে কিছু বলে কাকে। তারপর কার্ড দেখতে দেখতে সম্ভবত দর্শনার্থীব পরিচয় জানিয়ে দেয়। তারপর ফোন রেখে হাঁক দেয়—বুধু সিং! স্যারকে নিয়ে যাও। মেমসাবের সঙ্গে দেখা করবেন। স্যার, গেট খুলে দিচ্ছে—আপনার ড্রাইভারকে বলুন গাড়ি ভেতরে এনে রাখুক।

ধরমবীরকে নির্দেশ দিয়ে আমি বুধু সিংয়ের সঙ্গে নুড়িবিছানো লন পেরিয়ে যাই। গাড়িবারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ির সামনে উঁচু প্রকাণ্ড দরজা। দরজায় একজন উর্দিপরা লোক অপেক্ষা করছিল। খুব আদবকায়দা দেখিয়ে প্রশস্ত ড্রইংরুমে নিয়ে যায় আমাকে। এক কোণে সুদৃশ্য এবং বহুমূল্য সোফার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—বৈঠিয়ে হুজুর। মেমসাব আভি আসবেন।

অপেক্ষা করার সময় সবাই যা করে আমি তাই করি। ঘরের আসবাব দেখতে থাকি। দেখি, আর খালি অরুণদার কথা ভাবি। নীলিমা সেন কেন অরুণদার বউ হতে যাবে—এমন ঐশ্বর্য ফেলে! প্রেম! প্রেম বলে সত্যি সত্যি কি কিছু আছে? নেহাত মনের খেয়াল—হয়তো শরীরে শরীরের টান লাগা। শিশির হলে বলে উঠতাম—শালা প্রেম!....

বিশাল ঘরের এক পাশে সেকেলে স্থাপত্যরীতির ঘোরান চওড়া সিঁড়ি। পুরু কার্পেট পাতা আছে। আমি একটা প্রকাণ্ড পোর্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। নগেন সেনের বাবা সম্ভবত। উকিলের গাউন পরা প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক।

অস্পষ্ট শব্দে ঘুরে দেখি, নীলিমা সেন সবে মেঝেয় অবতরণ করেছেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত আগের

দেখা চেহারার সঙ্গে কোন পরিবর্তন ধরা পড়ে না আমার চোখে। তারপর যত কাছে আসেন, দেখতে পাই চোখের নীচে এবং গালে সময়ের নখের দাগ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করি। উনি মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে এবং করজোড়ে পাল্টা নমস্কার করলে স্বস্তি পাই।

—বসুন, বসুন। ... বলে উনি সামনাসামনি বসে পড়েন। ফের বলেন—কী যেন নাম আপনার?

—অর্জুন চৌধুরী।

—আমার সঙ্গেই দরকার, নাকি মিঃ সেনের সঙ্গে? মানে—বলল যে আপনি কী বিজনেসের ব্যাপারে জরুরী কথা বলতে চান। কিন্তু এসব তো আমার কোন ....

বাধা দিয়ে বলি—ওরা ভুল বলেছেন আপনাকে। তাছাড়া মিঃ সেন বিজনেসও করেন কি না আমি জানি না।

ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করেন নীলিমা। —দেন, দেয়ার ওয়াজ এ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি ভাবলাম, খুব জরুরী কী ব্যাপার এবং উনি তো দিল্লিতে।

—ব্যাপার সত্যি জরুরী মিসেস সেন। এবং আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চেয়েছি।

বিরক্তি দ্রুত কেটে বিস্ময় ফুটে ওঠে ওঁর মুখে। —আমার সঙ্গে জরুরী ব্যাপার?

—হ্যাঁ মিসেস সেন। একটু স্মরণ করলে বাধিত হব, আমাকে আপনি এক সময় কয়েকবার দেখেছেনও। এবং নামটাও মনে পড়া উচিত।

মাথা দুলিয়ে নীলিমা বলেন—দুঃখিত ভাই। মনে রাখা সম্ভব নয়।

ভাই শুনে আরও স্বস্তি আসে। বলি—অরুণদার কাছে আমাকে দেখেছেন।

কাষ্ঠপত্তল হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকান নীলিমা। তারপর বলেন—অরুণদা?

—অরুণ সেন।

আবার কয়েকটা হতচকিত মুহূর্ত কেটে যায়। আমার চোখতে ফাঁকি দিতে পারেন না নীলিমা। ওঁর ঠোঁটের প্রচ্ছন্ন কাঁপন টের পাই। তার পর হঠাৎ উনি বদলে যান। খুব সহজ ও স্বাভাবিক দেখায় তাঁকে। মিষ্টি হেসে ওঠেন।

—মাই গুডনেস! অরুণদা? ও এখন কোথায় আছে বলুন ত ভাই? অনেকদিন কোন পাত্তা নেই। এক সময় ভীষণ ট্রেড ইউনিয়ন করত এবং আমার কর্তার সঙ্গে ঝামেলা হত। আমার কি মুশকিল ছিল জানেন? অরুণদা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বিবাদ মেটাতে আমাকেই নামতে হত!

মনে মনে বলি —নীলিমা সেন! আপনার অভিনয়চাতুর্যে আমি সত্যি অভিভূত। কেন যে ফিলমে না নেমে এই বড়লোক রাজনীতিওয়ালা ঘুঘুর ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন! নাকি আপনি ফাঁদে আটকে পড়েছিলেন, বেরুতে পারেননি?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে উনি বলেন—কিন্তু আপনাকে কেমন সিরিয়াস দেখাচ্ছে কেন বলুন তো ভাই? কী ব্যাপার?

—মিসেস সেন, অরুণদার সঙ্গে আপনার লাস্ট কবে দেখা হয়েছে?

—কেন?

—প্লিজ, বলুন!

—কিসের ভিত্তিতে আপনি প্রশ্ন করছেন, না জেনে কোন জবাব আমি দেব না।

ওঁর ঠোঁটের কোনায় একটা ভাঁজ প্রকট হল এবং সূক্ষ্ম দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। অতিশয় বিচক্ষণ মহিলা। সম্ভবত স্বামীর রাজনৈতিক চাতুর্যকলা রপ্ত করে নিয়েছেন। একটু ভেবে নিয়ে বলি—অরুণদাকে আমি খুঁজছি। তাঁর কোন পাত্তা পাচ্ছি না।

একটু তীব্র স্বরে বলেন—পুলিশের মিসিং স্কোয়াডে যান। আমার কাছে কেন?

—ক্ষমা করবেন মিসেস সেন, যদি না জেনে অপরাধ করে থাকি।

—প্রশ্নটা তা নয় ভাই। আপনি কেন ভাবলেন যে আপনার অরুণদার খবর আমি রাখি?

—এক সময় আপনার সঙ্গে ওঁর জানাশোনা ছিল তো, তাই...

জানাশোনা প্রচুর লোকের সঙ্গে আছে বা ছিল। তাতে কী হয়েছে?

—প্লিজ, রাগ করবেন না। ব্যাপারটা জরুরী।

—আপনার পক্ষে জরুরী হতে পারে। আপনি নিজেরটা দিয়ে অন্যের বিচার করবেন না।

এই সময় একটা উর্দিপরা ছোকরা (খুব কেতাদুরস্ত বাড়ি!) ট্রে এনে রাখে নীচু টেবিলে। হয়তো নীলিমা আমাকে তক্ষুনি বিদায় দিতেন, কিন্তু আর সম্ভব হল না। কিংবা হয়তো ভেতরে উত্তেজনার ঝড় বইছে, এবং আমাকে তক্ষুনি বিদায় না করে অরুণদার ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েছেন। ছোকরাকে ইশারায় চলে যেতে বলে উনি আস্তে বলেন—কফি খান। এবং কফি করতে থাকেন। ওঁর সাদা চিরোল আঙুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উঠি। ওঁর গলায় মুক্তাহার ঝিকমিক করে। চোখ সরাতে পারিনে। ওঁর কানের লালনীল পাথর বসানো দুলে নারীত্বকে দুলতে দেখি নিজের সুখের আবেশেই যেন বা। দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারি নে। তখন নীলিমা সেই শব্দে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে নেন।

কফির কাপ এগিয়ে বলেন—নিন ভাই।

—আমি আপনাকে এক সময় দিদির মত দেখতাম। এখনও দেখি। দিদি বলব।

অনিচ্ছায় হেসে নীলিমা বলেন—বেশ তো! কিন্তু মনে হচ্ছে, আপনি আপনার বয়সের চেয়ে ছেলেমানুষ।

হাল্কা মনে হেসে কফির কাপে চুমুক দিই। তারপর বলি—আপনার মনে পড়া উচিত নীলিদি।

নীলিমার চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। কিন্তু কিছু বলেন না।

—হাসপাতালে সেবার অরুণদাকে দেখতে গেলেন, আমি পাশে টুলে বসেছিলাম। আপনি আমাকে কী যেন বলতে চাইছিলেন। বারবার তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যেতে বলতেন। কারণ আপনার—আপনাদের কথা ছিল। আমি নির্বোধ, বয়স এত কম— তাই বসে রইলাম।

এতগুলো কথা বলার পর দম নিতে নিতে দেখি উনি নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এবার একটু কাঁপাগলায় বলেন—কিন্তু এসব কথা বলার দরকারটা কী? কেন বলতে এসেছেন? কী চান আপনি?

—আমাকে তুমি বলুন নীলিদি!

—গায়ে পড়া আত্মীয়তা আমি পছন্দ করিনে। আসল কথাটা জানতে চাই।

আবার ফুঁসে উঠেছেন নীলিমা। বেগতিক দেখে বলি—নীলিদি, অরুণদার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা কি আপনি টের পাননি সেদিন? অরুণদার সত্তার সঙ্গে আমি মিশে আছি, বোঝেননি?

একথায় নীলিমা অবার যেন বিস্মিত হন। ভুরু কুঁচকে বলেন—জীবনে অনেক কিছু ঘটে। সব কথা তো কেউ মনে রাখে না। আপনি বলুন, কেন এসেছেন?

—অরুণদার সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কবে?

—মনে নেই। কেন?

—এই কয়েক মাসে অরুণদা কোথায় আছেন, কী করছেন, আপনি জানতেন?

—না।

—প্লিজ নীলিদি। অরুণদার একটা চিঠি আমি উদ্ধার করেছি। ওঁর কিটব্যাগে খবরের কাগজের মধ্যে ছিল। চিঠিটা আর ডাকে দেন নি। এবং সে-চিঠিতে যা আছে, স্পষ্ট বোঝা যায় আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে অনেকবার।

নীলিমা এবার যেন কেঁপে উঠলেন। তারপর অস্ফুটস্বরে বলেন—তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ?

—এ কথা কেন নীলিদি?... আমি আর আবেগ দমন করতে পারি না। চোখে জল চলে আসে অতর্কিতে। ফের বলি—বার বার বলতে খারাপ লাগে। তবু বলছি! অরুণদা আর আমি একই মানুষ ছিলাম নীলিদি। ঠিক বোঝাতে পারব না, এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। অথচ এত সত্য, এত বাস্তব!

নীলিমা ক্রূর কণ্ঠস্বরে বাঁকা হেসে বলেন—অ্যান্ড টু ড্রামাটিক!

—এই ড্রামায় আপনার একটা প্রধান ভূমিকা আছে বা ছিল। অস্বীকার করবেন না নীলিদি।

—কিন্তু কী বলতে চাইছ তুমি?

—একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আপনিই কি অরুণদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন—পার্কসার্কাস বেলপুলের ওখানে?

নীলিমার মুখের ভাবে ধরা পড়ল—হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু ঠোঁটে উচ্চারিত হল না।

—আপনার কোন বিপদ হবে না। কাকুতি মিনতি করে বলতে থাকি। আমায় বিশ্বাস করুন। আর কেউ জানবে না আমি ছাড়া। বলুন, একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ....

নীলিমা সোজা হয়ে বসলেন। মুখের ভাব বদলে অতি স্বাভাবিক হয়ে গেল এবং হাসলেন। কিন্তু টের পাই, এই হাসি ও স্বাভাবিকতা এবার বর্মের মত পরে নিলেন উনি। তারপর বললেন—আবার বলছি ভাই, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ। অতবড় একটা কোম্পানি তোমাকে এমন ইম্পরটেন্ট কাজে রেখেছে, ভাবতেই অবাক লাগছে! যাই হোক, সে ওরা বুঝবে। আমি বলছি কী, এসব জেনে তোমার লাভটা কী? পুলিশের গোয়েন্দা নও তো তুমি?

নীলিমা দুলে দুলে হাসেন! কিন্তু সে হাসি শুকনো। গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ার মত। চোখ বুজলে মনে হবে দমকা হাওয়ায় একটা গাছ পত্রশূন্য হয়ে যাচ্ছে। এবং চোখ খুললেই দেখব তার রুক্ষ নিরাবরণ কঙ্কাল। তবু ওঁকে হাসিটার জন্যে সময় দিই। তারপর বলি—অরুণদা খেয়ালি মানুষ ছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে খুব সতর্ক আর হিসেবী মানুষ হয়ে উঠতেন। একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বেলপুলের ওখানে যাবার আগে ওই দিনের একটা খবরের কাগজের এডিটোরিয়াল পেজের মাথায় ইংরিজিতে লিখে রেখেছিলেন—'এন মে কাম। ইফ আই ডোন্ট কাম ব্যাক বাই দ্য নেক্সট মর্নিং, প্লিজ রিপোর্ট টু দা পুলিশ।'.... এন আসতে পারে। যদি আগামী সকালের মধ্যে না ফিরি, পুলিশে জানিও।

কাগজটা ফেলে রেখেছিলেন বিছানায়। সুনন্দা সেটা খুলে দেখেনি। পরে একসময় ভাঁজ করে অরুণদার কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

—কে সুনন্দা?

—যাদের বাড়িতে অরুণদা থাকতেন।

ঘটনার সঙ্গে নিজে জড়িত নন, এভাবে বাইরে থেকে তৃতীয়পক্ষের নির্লিপ্ততা নিয়ে নীলিমা আলোচনা বা কল্পনার ভঙ্গিতে বললেন—ভেরি মিস্ট্রিয়াস' তো পুলিশের চোখে পড়েনি কিছু?

- না। চোখে পড়া উচিত ছিল যদিও।

—হুঁ। বুঝতে পারছি, অরুণবাবুর পরিচয় ওদের জানা নেই—মানে, আগের পরিচয়। ভেবেছে কে এক অরুণ সেন! আর, আজকাল তো এসব ওদের গা সওয়া। ঝামেলা বাড়াতে চায় না।

—তাহলে নীলিদি, আমাদের কি নৈতিক দায় নেই কিছু?

—মার্ডারারকে খুঁজে বার করাব তো?

—ধরুন, তাই!

নীলিমা আলোচনার নৈর্ব্যক্তিক গাম্ভীর্য রেখে বলেন—হ্যাঁ তোমার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু কাজটা তো পুলিশের। বরং আই অ্যাসিওর ইউ, মিঃ সেন ফিরে আসুন। উনি মুভ করবেন। দেখবে, ব্যাপারটা আর চাপা দিতে পারবে না।

আমি ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে বলি—কিন্তু কে হতে পারে এই 'এন'? কেন তার সঙ্গে দেখা করতে আশঙ্কাও ছিল অরুণদার?

নীলিমা আবার হাসেন।—ভীষণ ডিটেকটিভ গপ্পো পড়ো বোঝা যাচ্ছে!

—এন কি আপনি, না আপনার হাজব্যান্ড নীলিদি? আপনাদের দুজনেরই নামের আদ্যক্ষর এন। যদি আপনি না হন, সারাজীবন অরুণদার একমাত্র সাংঘাতিক শত্রু ছিলেন নগেন সেন।

পলকে নীলিমার মুখ লাল হয়ে ওঠে। ঠোঁট কাঁপে। চোখ নিষ্পলক হয়। কয়েক মুহূর্ত পরে চাপা অস্ফুট স্বরে বলে ওঠেন—গেট আউট!

আমি একটুও দমে যাই না। একই সুরে বলি—আপনি, না আপনার স্বামী? কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল অরুণদার?

নীলিমা একটু ভাঙা গলায় বলেন ফের—গেট আউট!

—কেন অরুণদা গিয়েছিলেন রেলপুলের কাছে?

নীলিমা চেরা গলায় চিল চিৎকার করে ওঠেন—আই সে, গেট আউট!

আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে কোথায় কুকুরের গর্জন শোনা যায়। পাশের ঘরের দরজার পর্দা তুলে একজন গুণ্ডা চেহারার লোক উঁকি মারে—তার গায়ে নীল পুলওভার, তার গোঁফ অর্ধবৃত্তাকার।

নীলিমা সেন উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের দরজার দিকে আঙুল তুলে শেষবারের মত চিৎকার করে বলেন—বেরিয়ে যাও।

আমি দ্রুত বেরিয়ে আসি। নুড়ি বিছান লনে হেঁটে গাড়ির কাছে পৌঁছতে আমার অসম্ভব সময় লেগে যায়।

গাড়ি গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় নামার পর আমি হেসে উঠি। ধরমবীর ঘুরে দেখে নিয়ে বলে—স্যার?

—কিছু না। চল ... হ্যাঁ, সিধে নিউ আলিপুর। ....

সন্ধ্যায় দরজা এঁটে অরুণদার জিনিসপত্র নিয়ে আবার বসি। বিছানার ওপর বাচ্চাদের খেলাঘরের খেলনার মত সুন্দর করে সাজাতে থাকি সব। টুথ ব্রাশটা খুব পুরনো। ব্রাশের গোড়ায় সাদা শুকনো মাজনের কণা জমে আছে। অমনোযোগিতার লক্ষণ? কিন্তু সেফটি রেজারটা দামী। বিদেশী জিনিস। বিলিতি ব্লেডে দাড়ি কামাতেন অরুণদা! দুটো প্যান্ট, দুটো ছেঁড়া শার্ট, নোংরা একটা গেঞ্জি—খুঁজে বাস ও ট্রামের কয়েকটা টিকিট ছাড়া কিছু পাইনি। ইদানিং অরুণদা পাঞ্জাবি ধুতি পরতেন না তাহলে। লাশের পরনেও প্যান্ট-শার্ট ছিল নাকি। কিন্তু তাঁর আগের কাপড়-চোপড় কী হল? আর আশ্চর্য, কোন নোট বই নেই। ডায়েরি লিখতেও দেখেছি এক সময়। সেগুলো কোথায়? একজন বিরাট মানুষের মৃত্যুর পর শুধু এই কটা জিনিস কি থাকা সম্ভব? আগের জীবনের সঙ্গে এগুলোর কোন যোগসূত্রই নেই। শুধু কাগজের সম্পাদকীয় পাতার ওই টুকরো সতর্কবাণী এবং একটা ডাকে না দেওয়া চিঠি ছাড়া আর কিছু নেই। কেন নেই?

তাই আমার জানা দরকার, সুনন্দাদের বাড়িতে যাওয়ার আগে কোথায় ছিলেন অরুণদা?

কিন্তু কীভাবে জানতে পারবো তা? ওঁর পরিচিতদের সবাইকে বিশেষ চিনি না। যাদের চিনতাম, তাঁদের কে কোথায় থাকতেন, জানতামও না। শুধু সেন দম্পতি বাদে।

হটাৎ সোজা হয়ে বসি। শ্রুতি-ধৃতিদের বাড়ি খোঁজ নেওয়া যায়।

তারপরই ভাবি, দু বোনের এতদিনে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার কথা। ওদের বাবা-মায়ের সঙ্গে খুব একটা পরিচয় হয়নি এবং সেও এক বেলার ব্যাপার।

তা হোক। গিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

এবং এখনই কেন নয়? ব্যস্তভাবে জিনিসগুলো সামলাতে থাকি। কিট ব্যাগটা গুছিয়ে রাখার পর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ি। ধরমবীরকে আর কষ্ট দিতে চাই না। নিজেই ড্রাইভ করে যেতে চাই।

উত্তর কলকাতার সেই বাড়ির সামনে পৌঁছতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। শীতের সন্ধ্যায় ট্রাফিকের জট বাঁধা অবস্থা সেন্ট্রাল এভিনিউতে। একটু অবাক হয়ে দেখি, স্মৃতি বড় চাতুরী করেছে! বাড়িটা স্মৃতির মধ্যে যতটা জমকালো, বাস্তবে ততটা নয়। ময়লা, স্থবির আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে এখন। আলো অতি সামান্যই। কেন যে এমন একটা বাড়ি আমার কাছে সেদিন খুব অভিজাত মনে হয়েছিল জানি না। হয় তো এখন আমি সমাজের উঁচুতলার একালীন শ্রেষ্ঠ বাড়ি এবং আসবাবপত্র এবং মানুষদের দেখে ফেলেছি বলেই এমন লাগছে।

নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘণ্টার বোতাম টিপি। একটু পরে এক প্রৌঢ়া—কিংবা বৃদ্ধা, কম আলোয় ঠিক বোঝা যায় না, মৃদু হেসে বলেন—কাকে চাই বাবা?

—এখানে কি শ্রুতি থাকে ? মানে, এটা শ্রুতিদের বাড়ি কি ?

ভদ্রমহিলা মাথা দুলিয়ে বলেন—হ্যাঁ। কিন্তু ও তো এখন বাইরে থাকে। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—দেখুন, আমি মোটে একবার এসেছিলাম এখানে। ঠিক মনে পড়ছে না—সাত-আট বছর আগে সম্ভবত। এসেছিলাম অরুণদার সঙ্গে—মানে অরুণ সেন.

ভেতর থেকে কেউ বলেন—কে কথা বলছে, বড়বউ? শম্ভু নাকি ? আসতে বল।

ভদ্রমহিলা—শ্রুতির মা মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেন—শম্ভু না। এক ভদ্রলোক শ্রুতির কথা জিজ্ঞেস করছেন।

দ্রুত বলি—ধৃতি হলেও চলত। বরং ওকে ডেকে দিন!

—ধৃতি তো ক্যানাডায়। জামাই এসে গত মাসে নিয়ে গেল। ... তা, অরুণ মানে কোন অরুণের কথা বলছেন বাবা? আসুন না, ভেতরে আসুন!

ওঁর পাশে একটি রুগ্ণ ফ্যাকাসে, বৃদ্ধ মুখ উঁকি দিল। —অরুণ? কোন অরুণ?

—অরুণ সেন। হেদোর ওখানে থাকতেন ....

—ও! অরুণ সেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ—বুঝেছি, বুঝেছি। আরে, তার সঙ্গে আজ বহু বছর দেখা নেই! কী ব্যাপার? হঠাৎ অরুণের কথা কেন?

ভদ্রমহিলা ঝাঁঝালো করে বলে—আঃ! তুমি চুপ কর তো। উনি শ্রুতিদের কথা জিজ্ঞেস করছেন! আপনার নাম কি বাবা? কোথায় থাকেন?

-অর্জুন চৌধুরী। ... বলে আমি একটা কার্ড বের করে ওঁর হাতে দিই।

কার্ডটা ভেতরের আলোর দিকে ধরে পড়ার পর হাসিমুখে শ্রুতির মা বলেন—ভেতরে আসুন বাবা। এভাবে দাঁড়িয়ে কি কথা বলতে আছে? আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—আমার গাড়িটা আপনাদের গেটের সামনে আছে। বরং ....

—হরিকে পাঠাচ্ছি। ও পাহারা দেবে। আপনি আসুন। বলে উনি ডাকলেন—হরি! ও হরি! দেখ্ তো ওঁর গাড়ি রয়েছে বাইরে। তুই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক!

সেই স্মৃতির ঘরে ঢুকতেই আমার মন কেমন করে ওঠে। কিন্তু মিলিয়ে নিতে গিয়ে দেখি, এ যেন ধূসর শ্মশান। একদা এর মধ্যে দুটি সদাযৌবনা মেয়ের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ছিল—এ ছিল বসন্তের এক সাজানো বাগান। এখন পোড়ো জমি। আগাছার জঙ্গল। আর শ্রুতির বাবা বলেন—অরুণের সঙ্গে বহু দিন দেখা নেই। পাগল, পাগল! ও ছিল এক আস্ত পা... !

ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে ফোন বাজছিল! দেখি, সকাল হয়েছে। শার্সির ফাঁকে পর্দা গলিয়ে প্রতিফলিত রোদ সটান শুয়ে পড়েছে পায়ের কাছে। কাত হয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিই—হ্যালো। অর্জুন চৌধুরী বলছি।

—আমি সুনন্দা।

একটু হাসি। —গুড মর্নিং সুনন্দা। আমি এখনও শুয়ে আছি।

—তাই বুঝি ? শুনুন ...

—আপনি বুঝি ভীষণ সকাল-সকাল ওঠেন?

—হ্যাঁ। শুনুন—একটা জরুরী....

—কোত্থেকে ফোন করছেন?

—ওষুধের দোকানে। বাড়ির কাছেই। শুনুন, খুব জরুরী কথা আছে। একবার আসতে পারবেন?

—কখন? ... বলে ঘড়ি দেখতে থাকি। হাত থেকে খোলা হয়নি রাতে।

— এখন এলেই ভাল হত। আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছি। ভীষণ ভয় করছে।

—সুনন্দা, আপনার এসব কথা পাশে কেউ শুনতে পাচ্ছে কি ?

—পাচ্ছে না। আপনি একবার আসবেন?

—সত্যি তো আপনার গলা কাঁপছে। কী হয়েছে বলুন তো?

—ফোনে বলা যাবে না। আপনি কি আসতে চান না?

—নিশ্চয় চাই। বাই দা বাই, সুনন্দা, গত দিনটা এবং রাতটা আমার দারুণ কেটেছে। জানেন? নগেন সেনের বউকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। শ্রুতির ঠিকানা যোগাড় করেছি। আর ...

—কে শ্রুতি ?

—চমকাবেন না। অরুণদার অন্য কোন প্রেমিকা নয়। তবে আমার .... আমার ....

—আপনার প্রেমিকা তো? বুঝেছি। আপনি তাহলে আসছেন, কেমন?

—ওয়েট, ওয়েট। কী যেন বললেন? শ্রুতি আমার প্রেমিকা না কী! উঁহু— সেসব কিছু না। জাস্ট স্মৃতিঘটিত ব্যাপার। গিয়ে বলব'খন। আর শুনুন.... হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—!

ছেড়ে দিয়েছে সুনন্দা। ফোনটা গালে ঠেকিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার স্বাদ নিই এবং অসহ্য লাগলে রেখে দিই। উঠে বসি। কেন এত ফুর্তি লাগছে, বুঝতে পারি না। ঘুমটা নিশ্চয় ভাল হয়েছে। শরীর হাল্কা। ঘরের মধ্যে প্রচুর ওম জমে আছে। বাথরুমে ঢুকি। আয়নায় নিজেকে দেখতে থাকি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অর্জুন চৌধুরীকে! ঠোঁটের নীচে চিবুকের ওপর একটা ভাঁজ দেখে চমকে উঠি। অরুণদার এমন ভাঁজ ছিল না—কিন্তু ইচ্ছে করেই এমন ভাঁজ ফেলে ভাবতেন। আর ও চোখের দৃষ্টি !

একটু অস্বস্তি আসে। তক্ষুনি মিলিয়ে যায়। দাড়ি কামাতে থাকি।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে পড়ি। ধরমবীরকে বলি—আজ অফিস যাচ্ছি না। তুমি বিশ্রাম করো। আমার ফিরতে দেরি হবে।...

আমার গাড়ি সুনন্দাদের এলাকায় সেই হাউসিং এস্টেট ঘুরে ধীর গতিতে চলে। মোড়ে দাঁড় করিয়ে এক মিনিট ভেবে নিই। কী ভাবি? আসলে কিছুই না। অস্পষ্ট কিছু কথা ভেসে আসে মাথায়। তারপর মিলিয়ে যায়।

ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এই রাস্তার আইল্যান্ডে শিংশপা, আকাশিয়া, কৃষ্ণচূড়া নিঃঝুম দাঁড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের মাথায় কুয়াসার নীলচে ছোপ। গতরাতে কি খুব বেশি শীত পড়েছিল? এখনও রোদের হলদে ভাবটা যায় নি। ভিখিরিরা আগুন জ্বেলে তাপ নিচ্ছে গায়ে গতরে। মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে একটা করে গাড়ি—ভারি ষড়যন্ত্রসঙ্কুল তাদের আনাগোনা। একটু দূরের বাসস্টপে যারা দাঁড়িয়ে আছে, আজ তাদের সবারই অফিসে লেট হবে। ওপাশের পার্কে এক মহিলা কুকুরের সঙ্গে খেলছেন। তিনি কি বন্ধ্যা স্ত্রীলোক ? বেঞ্চে বুড়ো ভবঘুরেটি হাই তুলে কিছু দেখে হাসল। স্পষ্ট দেখতে পাই এসব। এবং ভাবি। কী ভাবি? হয়তো কিছু ভাবি। হয়তো কিছু ভাবি না, ভাবতে চেষ্টা করছি। অরুণদার হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র, কিংবা শ্রুতির কথা। শ্রুতিকে কী যে ভাল লেগেছিল! ওদের বাড়িটাও তো ভাল লেগেছিল। কিন্তু গত সন্ধ্যায় গিয়ে দেখেছি, ভাল লাগার মত কিছু নেই। শ্রুতির বেলায় কি তাই হবে? আর শ্রুতির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াতে হবে অরুণদারই উপলক্ষে, এটাই অদ্ভুত লাগে। অরুণদা আমার গেটপাসের টিকিট ! হেল অফ অরুণদা!

—আরে! আপনি এখানে কী করছেন? সুনন্দা হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে গজায়।

বাড়ি চিনতে পারছেন না বুঝি ? ওই তো। এই বাঁদিকে গলিরাস্তায় ঢুকলে। কখন থেকে ওয়েট করছি আপনার। .... এবং সে হাসে। হুঁ, যা ভেবেছিলাম, তাই। এই মোড়ে এসে সবারই ভুল হয়ে যায়। তাই ভাবলাম, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

—কীভাবে চিনলে আমাকে দূর থেকে ?

—কেন চিনব না?

—মানে, গাড়িফাড়ি নিয়ে আসছি কি না বলিনি।

—না বললেও বোঝা যায়। আসুন!

—এখানেই বলা যায় না তোমার জরুরী কথাটা?

সুনন্দা একটু ক্ষুব্ধ হয় যেন। বলে—আপনার সময়ের দাম আছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু এদিন

আপনার আগ্রহ ছিল যতটা, আজ সম্ভবত ততটা নেই। ফোনে আপনার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছিল। যাক্ গে, সে আপনার খুশি।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, সুনন্দা। ... বলে গাড়ির বাঁদিকেব দরজা খুলে দিই। ওঠ।

—যাক। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। আপনি এগোন।

—সে কী! রাগ করছ কেন?

—রাগ নয়। লোকেরা অকারণ উদ্বিগ্ন হবে। বলে সে ফের সরলভাবে হেসে উঠল।

অগত্যা স্টার্ট দিয়ে বাঁদিকের সরু রাস্তা বা গলিটায় আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। রোদপোহানো মজুর গোছের লোকেরা বিরক্ত হয়। এ রাস্তায় কি এই প্রথম গাড়ি ঢুকল? অসম্ভব। অথচ মনে হল, একটা শান্ত জীবন-যাত্রায় উপদ্রব এসে পড়ার ব্যাপার হচ্ছে। ছাগল গরু হাঁস মুরগি আর মানুষের মধ্যে একটা হঠকারী ঝকঝকে ল্যান্ডমাস্টার হুলস্থূল বাধাতে এসেছে। চ্যাটালো পাতাওয়ালা ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় আবর্জনার উপর গাড়িটা দাঁড় করাই। ওপাশে ধুনুরীরা লেপের তুলো ধুনতে ধুনতে হঠাৎ থেমে তাকিয়ে থাকে। খাটিয়ায় বসে এক মুসলমান বৃদ্ধ উর্দু কাগজ পড়ছিলেন। অকারণে সেলাম করেন। আমিও মৃদু হেসে হাত কপালে ঠেকাই। ওদিন লক্ষ্য করিনি, বস্তীটা কসমোপলিটান। গলিরাস্তার ওপর খ্রিসমাস স্টার ঝুলছে, লাল-নীল কাগজ দিয়ে বানানো। অতএব খ্রীষ্টানও আছেন। যে গাছটার তলায় নেমেছি, ওদিন লক্ষ্যই করিনি যে কয়েকখানা শালগ্রাম শিলা দেবী আছে সেখানে, ওপরে লাল পতাকা টাঙানো এবং এক সাধুও আছেন।

সাধুর চেহারা কালোকুচ্ছিত, রোগা হাড়গিলে। ব্যস্তভাবে ধোয়ামোছায় ব্যস্ত। এত শীতে এই দায়িত্বপালন! মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখে অমায়িক হাসেন তিনি এবং আমিও একগাল হেসে নমস্কার করি। তারপর সুনন্দা পাশ দিয়ে যায়। —ভেতরে আসুন। বলে সে তাদের একতলা বাড়ির দরজার দুটো ধাপ ডিঙিয়ে ঢোকে। দরজা খোলাই ছিল। আমি তার পিছনে ঢুকে যাই এবং উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকি। সুনন্দা বারান্দায় উঠে অরুণদার ঘরেব তালা খুলতে থাকে। খোলার পর ফের ডাকে—আসুন!

সেই ঘরে ঢুকে দেখি, সবই আগের মত। ময়লা চাদরটা বিছানায় পাতা আছে ঠিক তেমনি। তার ওপর বসে পড়ি। সুনন্দা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা গম্ভীর। তার ঠোঁটের কোনায় সেই ভাঁজ।—হুঁ, বল সুনন্দা।

—কাল রাতে হঠাৎ কী খেয়াল হল, এঘরে ঢুকলাম। তারপর ...

ওকে হঠাৎ চুপ করতে দেখে বলি—তারপর?

—একটা অদ্ভুত ব্যাপার আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করার সুযোগ পাননি, মানে তেমন দুর্ভাগ্য আপনার হয়নি। .... সুনন্দা একটু হাসে। ... আমরা যারা নীচের তলায় থাকি, অজস্র পোকামাকড় নিয়ে ঘর করি। আরশোলা, টিকটিকি, ছারপোকা, আরও কত সব পোকা। আলো নিভিয়ে ঘর বন্ধ করে, ধরুন, বাইরে গেলাম। তারপর যখনই আবার ঘর খুলে আলো জ্বাললাম, দেখি সারা ঘর জুড়ে ওরা রাজত্ব করতে বেরিয়েছে। অবাক লাগে, এত পোকা কোথায় ছিল? ঘেন্নাও করে। তারপর মানুষের সাড়া পেয়ে ওরা আবার লুকিয়ে যায়।

—আমিও দেখেছি। আমাদের রান্নাঘরে এমন হত। রাত দুপুরে জলতেষ্টা পেয়েছে। ভুল করে জলের গ্লাস রাখিনি শোবার ঘরে। অতরাতে মাকে ডাকতে ইচ্ছে করত না। রান্নাঘরে চলে যেতাম। তারপর সুইচ টিপেছি, দেখি পোকা থকথক করছে! ঘেন্নায় আর জল খেতে ইচ্ছে করত না।

—হ্যাঁ। অরুণদা মারা যাবার পর এঘরে যতবার ঢুকেছি, ওই ব্যাপার মনে হয়, উনি খুব কষ্টেই থাকতেন সুনন্দা শান্ত স্বরে বলতে থাকে। গতরাতে তেমনি ব্যাপার। একটু পরে পোকাগুলো তো লুকিয়ে গেল। ওই দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা টিকটিকি লুকোতে পারছিল না। তার মুখে একটা আরশোলা। ওই ঘুলঘুলিটা দেখছেন উঁচুতে—ওই যে কড়িকাঠের তলায়!

— দেখতে পাচ্ছি। বল! ... বলেই চমকে উঠি। সুনন্দা! আপনাকে আজ তুমি বলছি! কী মুশকিল! প্লিজ...

—আর আপনি বলা চলবে না। সুনন্দা অমায়িক স্বরে বলে।

—যাঃ! তা কেমন করে হয়? আমরা সদ্য পরিচিত।

সুনন্দা আমার কথা গ্রাহ্য করে না।—ছাড়ুন! খুব হয়েছে। তা, ঘুলঘুলিতে ওঠা অব্দি টিকটিকিটা লক্ষ্য করছিলাম। ভীষণ খারাপ লাগছিল। কারণ আরশোলাটা জ্যান্ত। ধড়ফড় করছিল। শেষ অব্দি সহ্য হল না। বারান্দায় একটা উঁচু টুল আছে দেখেছেন? টুলটা আর একটা ঝুলঝাড়া এনে চেষ্টা করলাম আরশোলাটাকে বাঁচাতে।

হাসতে হাসতে বলি—খুবই যুদ্ধ করেছ বোঝা যাচ্ছে! কিন্তু তোমার জরুরী ব্যাপারটার কী হল?

—সেটাই তো বলছি। টুলে উঠে খোঁচাখুচি করে আরশোলাটা ছাড়ানো গেল। টিকটিকিটা ফোকর গলিয়ে বাইরে পালাল। আর সেই সময় ঘুলঘুলি থেকে খুঁচিয়ে আরশোলাটাকে সরিয়ে নীচে ফেলার চেষ্টা করতেই ....

—আশ্চর্য তো! মেয়েরা নাকি আরশোলাকে ভীষণ ভয় পায়।

—আমি পাই না। .... বলে সুনন্দা হঠাৎ গলা চাপা করে—সেই সময় শক্ত কিছুতে ঠোকা লাগছিল। ঠেলে ধারে আনার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম ইটপাটকেল কিংবা অন্য কিছু। তারপর সেটা ধারে এসে ঠেকলে চমকে গেলাম। বাল্বটা কম পাওয়ারের। চল্লিশ। কিন্তু পাশেই আছে, দেখছেন তো? জিনিসটা তক্ষুনি সাবধানে নামালাম। থর থর করে কাঁপছিলাম।

—কী সুনন্দা?

—রিভলবার।

—অরুণদার রিভলবার! যাঃ, কোন মানে হয় না!

—আপনাকে দেখাচ্ছি। ... বলে সুনন্দা যেন পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে বসে থাকি। অরুণদার রিভলবার কী কাজে লাগত? অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন করার সময় ওঁকে নাকি খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হত। কিন্তু তারপর তো সরকারি চাকরি নিয়ে শিলং চলে যান। সেখান থেকে ফিরে, যতদূর জানি, আর রাজনীতিতে নাক গলাননি।

অবশ্য এই এক বছরের জীবনেব সবটাই আমার কাছে কুয়াশার মত ঝাপসা। কিন্তু অরুণদা, যিনি একটা পিঁপড়ে মারতেও ভয় পেতেন, তিনি রিভলবার রেখেছিলেন! তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, ওই ঘুলঘুলিতে লুকিয়ে রাখতে গেলেনই বা কেন?

সুনন্দা এতক্ষণে বাইরের দরজা বন্ধ করল শুনতে পাই। পাশের ঘরে তার বাবার কাসির শব্দ শুনি। বাপ ও মেয়ের মধ্যে চাপা স্বরে কিছু কথা হচ্ছে টের পাই। তার একটু পরে সুনন্দা এ ঘরে ফিরে আসে। একটা ব্যাটারির ছোট বাক্স তার হাতে। বাক্সটা বিছানায় আমার সামনে রেখে সে মুখোমুখি বসে। সাবধানে খোলে। আমার চোখ জ্বলে ওঠে। কালো কুচকুচে এবং ঝকঝকে একটা রিভলবারই বটে। পিস্তল নয়, তা গঠন দেখে বুঝতে পারি। এবং অটোমেটিক।

রিভলবারটা তুলে পরখ করি। পয়েন্ট ৩৮ ক্যালিবারের চীনা রিভলবার। পর পর পাঁচটা গুলি ছোড়া যায়। উনসত্তর-সত্তরে আমার এক বন্ধু দীনেশ আচার্যের কাছে অবিকল এই জিনিস দেখেছিলাম। দীনেশ এখনও নাকি জেলে আছে। ওর নামে তিনটে খুনের অভিযোগ ঝুলছে।

দীনেশের কথা মনে আসতেই হুড়মুড় করে এক গুচ্ছের স্মৃতির ঘূর্নি হাওয়ার মত হুলস্থূল বাধায়। দীনেশ গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরির কর্মী ছিল। অরুণদার দলের ছেলে। পরে চাকরি যায় এবং বিপ্লব করতে গা ঢাকা দিয়েছিল। অরুণদার তখন যেন মোহভঙ্গের সময়। রাজনীতি ছেড়ে সরে যাচ্ছেন। আমার সঙ্গে দেখা হলে সাবধান করে দিচ্ছেন—বড্ড দুঃসময় অজু। ছেলেধরা বেরিয়েছে, সাবধান।...

—ও কী করছেন!

একটু হেসে বলি—গুলি পোরা আছে। বের করে রাখি। অটোমেটিক। ভাগ্যিস তুমি সাবধানে হ্যান্ডেল করেছিলে। একটু ঝাঁকুনি লাগলেই গুলি ছুটে যেত!

—সর্বনাশ! কিন্তু আপনি দেখছি ...

—হ্যাঁ। জিনিসটা আমার কাছে দুর্বোধ্য নয়।

—রীতিমত পরিচিত। ... সুনন্দা অবাক হয়ে বলে—আপনার আছে বুঝি?

—নাঃ।

—তাহলে কেমন করে জানলেন এটা অটোমেটিক? গুলি বের করতেও তো জানেন দেখছি। ক্রমশ সুনন্দা কালকের মত সন্দিগ্ধ হতে থাকে। ফের বলে—আপনি কীভাবে শিখলেন এসব?

—কী সব বল তো?

—হ্যান্ডল্ করা।

—বলব। তার চেয়ে তুমি প্রশ্ন কর তো কে আমি?

—আমার ভয় করছে কিন্তু। সত্যি ভীষণ ভয় করছে।

—আমাকে?

সুনন্দা অবুঝ বালিকার মত প্রায় ছটফট করে বলে—কে জানে! বরং এটা থানায় জমা দেওয়া উচিত, কী বলেন? পুলিশকে এখনই জানানো উচিত। এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকেছে, সেই ছেলেগুলো কী খুঁজতে এসেছিল।

ওকে আশ্বস্ত করে বলি—ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, সুনন্দা। যা করার আমায় করতে দাও।

গুলিগুলো এবং রিভলবারটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। সুনন্দা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে বলে—ওটা আপনি নিয়ে যাচ্ছেন? পুলিশকে কিছু জানাবেন না?

—আপাতত না। কিন্তু তুমি আজ ভদ্রতা রক্ষা করছ না যে সুনন্দা?

সুনন্দা তাকায়।

—চা খাব। গলা শুকনো লাগছে।

অন্তত আধ মিনিট তাকিয়ে থাকার পর সে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়। আমি সিগারেট বের করি।...

আবার অরুণদার কথা ভাবি। ভাবতে গিয়ে রাগ হয়। অকারণ এমন একটা মারাত্মক অস্ত্র কাছে রেখেছিলেন উনি, কী কাজে লাগল? নিজেকে বাঁচাতে তো পারলেন না শেষ পর্যন্ত। অরুণদাটা বরাবর এমনি নির্বোধ। 'এন' নামে আততায়ীর সঙ্গে একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় যখন রেলব্রিজের ওখানে দেখা করতে যান, তখন এটা সঙ্গে থাকলে অন্য ঘটনা ঘটত। ওঁর সারা জীবন এই বোকামী। নাকি, আত্মবিশ্বাস?

সুনন্দা এল চা নিয়ে। বলি—এত শিগ্গির!

—কেটলি চাপিয়ে এসেছিলাম কুকারে!

—তুমি খুব ভাল মেয়ে সুনন্দা!

—কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ। বলে সুনন্দা আবার সামনাসামনি বসে।

ওর সুন্দর মুখ পাতাচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে দেখায়। কোথায় একটা নীরব অসহায়তা আছে ওর। বুঝতে পারি। মায়া জাগে।

—আমার কালকের ইনভেস্টিগেশনের রিপোর্ট দেওয়া উচিত।

—আপনার ইচ্ছা।

—তাছাড়া একটা দারুণ ক্লু পেয়ে গেছি, সেটাও বলা দরকার। আচ্ছা সুনন্দা, 'এন' আদ্যক্ষর এমন কোন নাম—যার সঙ্গে অরুণদার চেনা ছিল, মনে করতে পার?

—অরুণদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসার পর আলাপ হয়েছে। সুনন্দা ভাবতে ভাবতে বলে। এই ছ-সাত মাসে 'এন' ... নাঃ, তেমন কাকেও তো মনে পড়ছে না!

—যাক গে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নগেন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ডিটেলস বলছি। দারুণ মজা পাবে!...

সুনন্দা সাগ্রহে শুনতে থাকে। আগাগোড়া সবটাই বলি। শোনার পর সে বিবর্ণ মুখে হাসে একটু—ভদ্রমহিলা ভারি অদ্ভুত তো!

অকারণ জোরে হেসে উঠি। কিন্তু তারপর সে-হাসি এবং এইসব আলাপ অর্থহীন মনে হয়। দেখি,

সুনন্দাও গম্ভীর হয়ে উঠছে আমার মত। দুজনেই চুপচাপ বসে থাকি। তারপর ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠি—সর্বনাশ! বারোটা দশ! খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ার কথা আমার!

—কোথায় যাবেন?

—দূরে। প্রতাপগড়।

—সে কোথায়?

—বিহারে। ট্রেনে ষোল ঘণ্টার জার্নি। রিজার্ভেশান করাইনি। কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়ব।

—রিজার্ভেশন না করে ষোল ঘণ্টা! কষ্ট হবে দেখবেন।

—কেন যাচ্ছি, তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে।

—তাহলে বলুন!

—তখন ফোনে শ্রুতির কথা বলছিলাম, শুনলে না।

—শুনেছি। আপনার প্রেমিকা।

—অমার প্রেমিকা নয়, সেটাই বলছিলাম। তুমি ফোন ছেড়ে দিলে।

—তাহলে?

—প্রেমিকা হতে পারত। অরুণদা বাদ সেধেছিলেন। যাক্, আর একদিন দেখা হলে বলব। এখন উঠি।

সুনন্দা মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে—কিন্তু রিভলবারটার ব্যাপার পুলিশকে জানানো উচিত ছিল না?

—প্লিজ সুনন্দা, লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপচাপ থাক। ভেবো না, তোমার বা তোমাদের এতটুকু ক্ষতি হতে দেব না। আই প্রমিজ।

—প্রতাপগড় থেকে কবে ফিরবেন?

—আগামী পরশু। তুমি পারো তো বরং পরশু রিং কোরো।

—আচ্ছা! ... বলে সুনন্দা উঠে দাঁড়ায়।

বারান্দা থেকে চোখ পড়ে, পাশের ঘরের দরজার কাছে পাছা ঘষড়ে এক বৃদ্ধ রুগ্ন ভদ্রলোক—পরনে লুঙ্গি, কিন্তু উরু অব্দি নগ্ন হয়ে গেছে, বাইরে আসার চেষ্টা করছেন। সুনন্দা অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে—বাবা!

ভদ্রলোক ঘড় ঘড় করে বলেন—ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলব।

সুনন্দা ব্যস্ত হয়ে ওঁকে ধরে—কী কথা বলবেন? চলুন তো, ঘরে চলুন। অদ্ভুত লোক আপনি। বিছানা ছেড়ে ওঠা বারণ—আর ....

সুনন্দাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে বৃদ্ধ আমার উদ্দেশে চাপা গলায় বলেন—ও মশাই! কাছে আসুন তো, একটা কথা বলব।

সুনন্দার দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ করি। সুনন্দা ওঁকে ঠেলে ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা করে—কী কথা বলবেন? কোন কথা নেই। ঘরে চলুন বলছি। আঃ, কী হচ্ছে!

—ও মশাই, আপনিই অরুণের ভাই নাকি! বৃদ্ধ স্খলিত স্বরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন। অরুণ মহা ধড়িবাজ। অরুণ জোচ্চোর। না বুঝে সাপ এনে ঘরে ঢুকিয়েছিলাম। শুয়োরের বাচ্চা অরুণ.....

সুনন্দা ওঁর মুখটা চেপে ধরে গর্জন করে—চুপ করুন! চুপ করুন বলছি! তারপর আমার দিকে মুখ তুলে কাকুতি করে বলে—প্লিজ, আপনি এখন যান। প্লিজ!

অবাক এবং হতভম্ব হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেরিয়ে আসি।

গাড়ি ঘুরিয়ে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করি, যদি সুনন্দা আসে! কিন্তু সে আসে না। আস্তে আস্তে বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছে অন্তত দু মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখি গাড়ি, যদি সুনন্দা আসে। সে আসে না।

তখন জোরে এগিয়ে যেতে থাকি। সুনন্দার বাবার কথাগুলো পিছনে তাড়া করতে থাকে। ব্যাকভিউ মিররে দৃষ্টি রাখি। যতদূর যাই, সুনন্দার ছুটে আসার প্রতীক্ষা করি।.....

কোয়ার্টারে ফিরে দ্রুত খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ব ভেবেছিলাম। হল না। আমার রাঁধুনি-কাম ভৃত্য ধরণীধর জানাল, দুবার এক মহিলা ফোন করেছিলেন। নিজের পরিচয় কিংবা নাম্বার দেননি। আবার রিং করবেন বলেছেন।

এবং সবে খেয়ে সিগারেট ধরিয়েছি, রিং এল। ধরেই চোখ বুজে বলি—নীলিদি?

সতর্ক কণ্ঠস্বর ভেসে এল—অর্জুন চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—আমিই সে। বলুন নীলিদি!

কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর—আমাকে ক্ষমা কর। তখন তোমার সঙ্গে....

বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে বলি—আমার স্মৃতিশক্তি ভীষণ দুর্বল নীলিদি। ভুলে গেছি।

—তখন তোমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করে পরে খুব কষ্ট হল। তুমি রাগ কর না, ভাই।

—রাগ করলে তো এই সুযোগে শোধ নিতাম। যা আশা করে গিয়েছিলাম, তা ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নেওয়াটাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক নীলিদি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই অকারণ ক্ষমা চাইতেই আমাকে রিং করেন নি? হ্যাঁ—আই জাস্ট স্মেল ইট।... হ্যালো! হ্যালো!

—আছি। শুনছি।

—কিছু বলার থাকলে আমি খুশি হব। তবে মেক ইট ব্রিফ। কারণ এখনই আমি বেরুচ্ছি। দুটো পাঁচে ট্রেন।

—আজ না গেলেই নয়?

প্রচুর অন্তরঙ্গতা ও গরজের সুর টের পেয়ে মিথ্যে জেদ দেখাই—না নীলিদি! ভীষণ জরুরী।

—আমারটা হয়তো তার চেয়েও জরুরী, অজু।

—তাও ভালো। আমার ডাক নামটা মনে পড়েছে।

—জাস্ট এইমাত্র হঠাৎ মনে পড়ল! .... শোন, আমি যাচ্ছি।

—কিন্তু আমার ট্রেন যে ...

—ঠিক আছে। আমিই তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেব। এখন মোটে একটা পনের।

—আপনি হাওড়া থেকে আসতে আসতেই সওয়া দুটো বেজে যাবে।

—না। আমি চৌরঙ্গী এলাকায় আছি।

—আচ্ছা, আসুন। কিন্তু ...

—আবার কিন্তু কী অজু?

—আধ ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বেশ গম্ভীর হয়ে কথাটা বলি। ভেতরে আমি উত্তেজনায় অস্থির। কী বলতে আসছেন নগেন সেনের স্ত্রী? দারুণ ভাইটাল জায়গায় আঘাত দিয়ে এসোছলাম কি? সত্যি বলতে কী, প্রতাপগড় যাওয়াটা তেমন কিছু না। মিসেস সেন কিছু বলতে আসছেন, এর জন্যে আমার সবকিছু বরবাদ করতেও রাজি। এখন শ্রুতির চেয়েও অনেক মূল্যবান এই ভদ্রমহিলা। কথাটা এভাবে বলে ভয় পাচ্ছিলাম। যদি ওঁর রাগ হয়, কিংবা অপমানবোধে পিছিয়ে যান। কিন্তু না। হতাশ, উদ্বিগ্ন, অথচ অস্থির গলায় সাড়া আসে—পনের মিনিট মাত্র। অজু, প্লিজ! এখনই বেরুচ্ছি। আর একটা কথা। তোমাদের রাস্তাটা আমার চেনা। শুধু তুমি যদি কষ্ট করে বাইরে ...

—আচ্ছা। আসুন। আমাকে দেখতে পাবেন।...

পনের মিনিট কাটানো অসহ্য হয়ে ওঠে ছটফট করে বেড়াই। একবার বাইরে লনে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকি। সিগারেট টানি পর পর দুটো। আবার ঘরে যাই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকি। আবার বাইরে একেবারে গেটের কাছে গিয়ে পথে তাকাই। ধরমবীর পেছন থেকে বলে—গাড়ি রেডি স্যার।

—দরকার হবে না। অন্য একজনের অপেক্ষা করছি, ধরমবীর। তাঁর গাড়িতেই স্টেশনে যাব।

—জী সাব!

—তুমি বিশ্রাম নাও।

ধরমবীর হাসিমুখে গ্যারেজের পাশে তার ঘুপটি ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। রোদে খাটিয়া পেতে

সে এতক্ষণ বুঝি ঝিমোচ্ছিল। এবার দেখি, গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তার পাশে ঘাসে বসে আছে ধরণীধর। তারা চাপা গলায় কথা বলতে থাকে। আমার সন্দেহ হয়, তিনদিন ব্যাপী আমার জীবনে একটা দারুণ ওলটপালট হওয়াটা ওরা আঁচ করে নিয়েছে।

কতক্ষণ ধরে রাস্তায় রঙবেরঙের গাড়ি চলে যায়। যে গাড়িটি বেশি উজ্জ্বল এবং সাম্প্রতিক মডেলের, কিংবা আকারে ছোট, তার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাই। চলে গেলে বিরক্ত হই। এবং তারপর অবশেষে আমার অলক্ষ্যে হঠাৎ একটা সবুজ ফিয়াট গতি কমিয়েছিল—কাছে এসে থেমে যায়। দেখি, নীলিদি নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন।

হাসিমুখে বলেন—তুমি নিশ্চয় রেডি ? চলে এস।

—আমার ঘরে একবার পায়ের ধুলো দেবেন না নীলিদি?

—তাহলে তোমাকে ট্রেন ধরিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দিতে পারব না। মিছিল আসছে এসপ্ল্যানেডে দেখে এলাম।

ঘুরে ডাকি— ধরণী! তারপর ঘরের দিকে এগিয়ে যাই। ...

একটা মাঝারি স্যুটকেস মাত্র সঙ্গে নিয়েছি। অনিশ্চিত ভ্রমণের পক্ষে যতটা দরকার হতে পারে তার বেশি কিছু জিনিসপত্র নয়। কিছুক্ষণ পরে নীলিদির গাড়ি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছাকাছি এলে মুখ খুলি—এবার বলুন নীলিদি। উনি হাসেন—কোথায় যাবে?

—হাওড়া।

—কতদূরে যাচ্ছ? কাছাকাছি, নাকি, অনেক দূরে?

—প্রতাপগড়।

—শিমুলতলার কাছাকাছি।

গাড়ির স্পিড কমেছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে চলেছে। নীলিমা বলেন—কিছু মনে না করো তো জিজ্ঞেস করছি, অফিসিয়াল ট্যুরে যাচ্ছ, নাকি পার্সোনাল?

—পার্সোনাল ব্যাপার।

নীলিমা হেসে ওঠেন—তোমার অরুণদার ব্যাপারে ইনভেস্টিগেশনে নিশ্চয় নয়?

—দ্যাটস রাইট নীলিদি।

নীলিমা দ্রুত হাসি থামিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক তাকান—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। একটা অদ্ভুত সূত্র পেয়ে গেছি। শুনতে চাইলে বলব।

—তোমার খুশি। অবশ্য আমার কৌতূহল হচ্ছে!

—ওখানে শ্রুতি নামে এক মহিলা থাকেন। কলকাতার এক বনেদী ফ্যামিলির মেয়ে। চাকরি করেন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনসার্নে। পি আর ও পোস্টে। ওকে চেনন?

—না। তারপর?

—শ্রুতি সম্প্রতি কিছুদিন আগে কলকাতায় ওঁর বাবাকে লিখেছেন, অরুণদা এসেছিলেন হঠাৎ। দিন তিনেক ছিলেন ওঁর কাছে। এবং শ্রুতির ধারণা, অরুণদা পলিটিক্যাল অ্যাবস্কন্ডার অথবা আন্ডারগ্রাউন্ডে বেড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা সত্যি কি না খোঁজ নিয়ে জানাতে লেখেন শ্রুতি। এখন কথা হচ্ছে, ওঁর বাবা স্থবির মানুষ। চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁর পক্ষে খোঁজ নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অরুণদার সঙ্গে তাঁর বহুকাল দেখাসাক্ষাত হয়নি।

ট্রামলাইন পেরিয়ে গিয়ে নীলিমা বলেন—হুঁ। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। অরুণ সেন তো এখন ডেড ম্যান। ওর সম্পর্কে এত সব খুঁজে বের করে তোমার লাভটা কী অজু?

—জানি না। নিজেও বুঝতে পারছি না। অথচ .... অথচ একটা তাগিদ ..... একটা দায়িত্বও বলতে পারেন..... কিংবা ...... যাক্, নীলিদি। বরং আপনার জরুরী কথাটা এবার বলুন।

—অজু, গতকাল তুমি চলে আসার পর বুঝতে পেরেছিলাম আমি সম্ভবত বিপন্ন। সারারাত সে নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করে কাটিয়েছি। একটুও ঘুমোতে পারি নি। তারপর, তোমায় বলতে দ্বিধা দেখছি না, চৌরঙ্গী এলাকায় একটা স্যুট বেশ কিছুকাল থেকে রিজার্ভড রয়েছে। প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকি।

তো আজ সকালে সোজা সেখানে গিয়ে উঠলাম। দুপুর নাগাদ মনস্থির করলাম, তোমার সঙ্গে কথা বলব। তোমার কার্ডটা ছিল। ফোন নাম্বার ছিল। ফোন করলাম দুবার—তুমি বেরিয়েছিলে।

তিলকের প্রতিমূর্তির কাছে এসে গাড়ি দাঁড়াল হঠাৎ। বললাম—বলে চলুন। প্রতাপগড়গামী ট্রেনের চেয়ে এটা মূল্যবান মনে হচ্ছে।

আস্তে কথা বলেন নীলিমা—আমি সত্যি বিপন্ন।

—কেন?

—লাস্ট ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে, তারিখ মনে নেই, অরুণ আমাদের বাড়িতে এল। ও বাইরে গিয়েছিল। আমি একা ছিলাম। অরুণ এসে বলল যে ওকে কে যেন শাসাচ্ছে। খুব প্রাণসংশয়। তাই ওকে আত্মরক্ষার জন্যে একটা রিভলবার দিতে হবে। মিঃ সেনের কাছে নাকি লাইসেন্সহীন অনেকগুলো রিভলবার আছে।

চুপ করতে দেখে বললাম—সে কী! তারপর?

—অনেকগুলো না থাক, অন্তত একটা আছে, তা আমি জানতাম। ওটা কোথায় নাকি মিঃ সেনের দলের ছেলেরা কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। ওর জিম্মায় রেখে যায়। মিঃ সেনের আমাকে কিছু গোপন করার থাকে না। সব আমার জানা। এটাও জানতে পেরেছিলাম।

—বলুন নীলিদি।

—অরুণ জেদ ধরল। এমন কি শাসাতে শুরু করল। ওটা না দিলে পুলিশকে জানাবে। আমি দেখলাম মিঃ সেন এখন বাড়ি নেই। অরুণ যা একরোখা লোক, এখনই একটা কিছু করে বসলে আমার পক্ষে ট্যাকল করা সম্ভব হবে না। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম।

—আপনি দিলেন তো?

—দিলাম। অরুণ চলে গেল। সেই শেষ দেখা আমার সঙ্গে।

—মিঃ সেন ফিরে এলে কথাটা বলেননি তাঁকে?

—না বলে থাকতে পারিনি। ও আমায় ভীষণ বকল। তারপর বলল, দেখছি।

—কিন্তু এ থেকে কিসের বিপদ আশা করছেন নীলিদি?

—তুমি মরিয়া হয়ে খুঁজতে নেমেছ, তোমার অরুণদা কেন খুন হলেন। তাই না?

—নিশ্চয়। দ্যাটস কারেক্ট নীলিদি।

—সত্যি বলতে কী, তোমাকে অরুণের সঙ্গে বারকতক দেখেছি এবং জাস্ট তোমার ডাকনামটা মনে পড়ল তখন, কিন্তু তোমার সম্পর্কে আর কিচ্ছু জানা নেই। তুমি একটা এক্সপোর্ট কোম্পানির মার্কেটিং একজিকিউটিভ বলে পরিচয় দিয়েছ—কার্ডে তা ছাপা আছে সত্যি, এবং ......

—আপনি আমার অফিসে ফোন করলেই জানবেন, এটাও সত্যি।

—করেছিলাম। কিন্তু তবু বিশ্বাস হচ্ছে না, কে তুমি!

—আপনি কী ভাবছেন, স্পষ্ট করে বলুন নীলিদি!

—মিঃ সেনের কাছেই শুনেছি, সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর লোকেরা নানান কনসার্নে চাকরি নিয়ে ছড়িয়ে আছে।

হো হো করে হেসে বলি—না নীলিদি, আমি সি-বি-আইয়ের চর নই।

—তাহলে কেন অরুণের ব্যাপারে তোমার এত মাথাব্যথা?

—বলেছি তো। অরুণদা আমার অন্য ক সত্তা।

—বিশ্বাস করি না। তুমি সুনন্দার কাছ থেকে সেই রিভলবারটা হাতিয়ে নিয়েছ! সুনন্দাটা বরাবর নির্বোধ। সব্বাইকে সরল মনে বিশ্বাস করে বসে।

আমি নড়ে উঠেছি সঙ্গে সঙ্গে। হয়তো আমার দু চোখ কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে উঠেছিল। ওঁর চোখে চোখ রেখে বলি—সুনন্দাকে আপনি চেনেন?

—হুঁ!

—ওর সঙ্গে আপনার যোগাযোগও আছে দেখছি।

—ছিল সামান্য। তবে তুমি ওর কাছ থেকে চলে আসার পরই আমি সুনন্দার কাছে গিয়েছিলাম। সব জেনে তোমাকে তৃতীয়বার ফোন করেছি। আগের দুবার ফোন করার সময় অবশ্য জানতাম না যে তুমি ওটা সুনন্দার কাছ থেকে হাতিয়েছ। কাজেই বুঝতে পারছ, আমি এবার আগের চেয়েও ভীষণ বিপন্ন বোধ করছি।

—সুনন্দার সঙ্গে আপনার আলাপ কীভাবে হল?

নীলিমা ঝাঁঝালো স্বরে বলে ওঠেন—সুনন্দা আমার ছোট বোন। সহোদর বোন।

বিস্ময় কাটাতে একটু দেরি হয়। তারপর বলি—আমার ট্রেন ফেল হয়ে যাবে!

বুঝতে পারি, আমাকে চটাতে চান না নীলিমা। গাড়ি আবার চলতে থাকে। তারপর উনি ডাকেন—অজু!

—আপনি কি ওটা ফেরত চাইছেন?

—অবশ্যই।

—না দিলে?

—না দিলে আমার কিছু করার নেই, ভাই। শুধু অনুরোধ করব, তুমি আমাকে দিদি বলেছ—দিদির সম্মান রাখবে। কথা দাও অজু!

—কথা দিলাম। ..... রাজভবন ডাইনে রেখে সোজা গাড়ি লালদীঘির কাছে না পৌঁছোনো পর্যন্ত আর কোন কথা নেই দুজনের। জি-পি-ও পেরিয়ে যাবার পর বলি—আপনার বাবা অসুস্থ। ওই অবস্থায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে কোন নার্সিং হোমে রাখার ব্যবস্থা করলে পারতেন!

—বাবা আমার কোন সাহায্য নেন না। আমার মুখও দেখতে চান না।

—সুনন্দার হাত দিয়ে ব্যবস্থা করতে পারতেন নিশ্চয়?

—না। সুনন্দাও আমাকে ঘৃণা করে।

—জানি না কেন আপনি ওদের কাছে ঘৃণার পাত্রী। অরুণদাও সম্ভবত . . .

—হ্যাঁ। সেও করত। সবাই আমাকে ..... ঘৃণা.....

আড়চোখে দেখি, নীলিমা আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। সংকীর্ণ রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বলে ওঠেন—তুমি ড্রাইভ করতে পার তো? প্লিজ, স্টিয়ারিংয়ে এসো অজু। আমার হাত ভীষণ কাঁপছে। ......

দৈবাৎ ফার্স্ট ক্লাসে একটা খালি বার্থ পেয়ে গিয়েছিলাম। শুয়ে আসা গেল। প্রতাপগড় পৌঁছতে সকাল সাতটা। ট্রেন লেট করেছিল। কী প্রচণ্ড শীত! বিহারের শীতটা এমন প্রচণ্ড হবে, আগেই জানতাম। স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কয়েক কাপ কফি ও চা খেয়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। রাতে একটুও ঘুম হয়নি শীতে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ধরণী একটা কম্বল স্যুটকেশে ভরে দিয়েছিল।

শ্রুতি কোথায় থাকে, জেনেই এসেছি ভালভাবে। একটা ট্যাক্সি করে নিই। স্টেশন থেকে প্রায় পাঁচ-ছ কিলোমিটার দূরে ওদের কোম্পানির কলোনি এরিয়া। ছোটনাগপুর রেঞ্জের ছোটবড় অজস্র পাহাড় গেছে এই এলাকা দিয়ে। খনি আছে নানারকম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন।

শ্রুতিদের সুন্দর ছবির মত কলোনিটা ছোটখাট একটা হিল টাউন বলা যায়। পাহাড়ের গায়ে একটি করে বাংলো ধাঁচের বাড়ি। সবুজ রঙের বাড়িগুলো কুয়াশায় তখনও ঝাপসা দেখাচ্ছিল। ঘোরালো চড়াই দিয়ে ট্যাক্সি উঠছে আর আমি প্রতিটি গেটের নম্বরের ফলক পড়ে যাচ্ছি। তারপর পাওয়া গেল এরিয়া বি., রোড তিন, কিউ আর পাঁচ। শ্রুতির সংক্ষিপ্ত নাম এবং ডেজিগনেশান লেখা আছে।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভারি স্যুটকেস হাতে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। নির্জন নিঃঝুম বাড়ি। শ্রুতি আছে তো? যদি না থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জমে ওঠা এত উত্তেজনার পরিণাম কী হবে ভেবে শিউরে উঠি।

গেট খুলে ঢুকে পড়ি। এদিকটা উত্তর। ছায়া আছে। এবং কনকনে হাওয়া দাপাচ্ছে। কাঁপুনি ধরে যায়। ছোট্ট বারনান্দায় উঠে বোতাম টিপি। অপেক্ষা করার সময় পাশের গ্যারেজ এবং ভেতরে নীল

রঙের একটা গাড়ি দেখতে পাই। শ্রুতি খুব সুখেই আছে—যদি গাড়ি থাকাটা সুখের হয়। অবশ্য পাবলিক রিলেশন অফিসার শুনতে যত বিরাট মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি তা নয়। কিন্তু ওদের কোম্পানি প্রতাপগড়ে কী পাবলিক রিলেশন করে, বুঝি না। এসব তো শহরের অফিসে বসে করার কথা।

ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে যায়। একটি দেহাতী কিশোরী, নিশ্চয় কাজটাজ করে, অর্ধেক বেরিয়ে আমাকে দেখতে থাকে। একটু হেসে বলি—মেমসাব হ্যায়?

সে মাথা নেড়ে ভেতরে চলে যায়। একটু পরে পর্দা সরিয়ে যে আসে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠার মত বলি—অধমের নাম অর্জুন চৌধুরী। খুব দুঃখিত যে আগে খবর দিয়ে আসতে পারিনি!

শ্রুতি অবিকল তেমনি আছে যেন। তেমনি রোগা, ঢ্যাঙা, ডিমালো মুখ। শুধু যেন উজ্জ্বলতাটা বেড়েছে বহুগুণ। স্মৃতির সঙ্গে এই যা তফাত। সে আমাকে চিনতে চেষ্টা করে। —কী নাম বললেন, অর্জুন...

—অর্জুন চৌধুরী। অজু। অরুণদার সঙ্গে সেবার আপনাদের কলকাতার মানে শ্যামপুকুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। পিকনিক করার কথা ছিল ব্যারাকপুরে আপনাদের বাগানবাড়িতে। অরুণদার জন্যে আমার যাওয়া হয়নি। পরে আপনার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের কাছে দেখা হল। আপনি বললেন, চমৎকার জমেছিল পিকনিক।...

শ্রুতির মুখে বিস্ময়, অপ্রস্তুতি আর হতচকিত ভাব নানা রঙ ছড়াচ্ছিল। শেষে তার পাবলিক রিলেশনের অভিজ্ঞতা বা অভ্যাস একটি অখণ্ড অমায়িক হাসির মুখোশ পরিয়ে দেয়। শ্রুতি বলে—মনে থাকা সম্ভবই নয়। তবে বাবার রেফারেন্স দিচ্ছেন যখন, তখন আর কিছু বলার নেই। ভেতরে আসুন।

সে পর্দা তুলে এক পাশে সরে আমাকে যেতে দেয়। ভেতরে গিয়ে অতি ছিমছাম কেতাদুরস্ত ড্রইং রুমের শোভায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিই এবং পাশে স্যুটকেস রেখে আরাম করে বসি। অ্যাসট্রে আছে দেখে তক্ষুনি সিগারেট ধরাই। শ্রুতি সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে থাকে।

—মাই গুডনেস! চিঠিটা... শ্রুতির বাবার চিঠিটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কোটের ভেতর পকেট হাতড়ে সেটা পেয়ে যাই এবং আশ্বস্ত বোধ করি। চিঠিটা বের করে শ্রুতির দিকে এগিয়ে দিই।

শ্রুতি দ্রুত ভাঁজ খুলে চিঠি পড়ে ফেলে এবং আমার দিকে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টে তাকায়—কিছু মনে করবেন না মিঃ চৌধুরী! সে মিষ্টি হেসে বলে ওঠে—এবার আপনাকে আপনজন ভাবতে আর দ্বিধা নেই। বুঝতেই পারছেন, অরুণদা যেভাবে এলেন আর চলে গেলেন, সব আমার কাছে ধোঁয়াটে লেগেছিল। এবং এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। লেবার ট্রাবল চলছে অনেকদিন থেকে। তাই অরুণদার রেফারেন্সে কেউ এলে অস্বস্তি লাগে। অরুণদা সম্পর্কে আমাদের ফ্যামিলির বরাবর শ্রদ্ধার ভাব যতটা ছিল, ঠিক ততটা অস্বস্তি।

—খুব স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক। ওকে সায় দিয়ে বলি। ...

এরপর শ্রুতি আমার সঙ্গে আত্মীয়সুলভ আচরণ করে। ব্যস্তভাবে বাথরুম দেখিয়ে দেয়। কফি এবং ব্রেকফাস্টের আয়োজন করে। তার ফাঁকে-ফাঁকে নিজের জীবনের কথা বলে। বোনের কথা বলে এবং ওর বাবা-মায়ের কথাও। তারপর এখানকার ভাল মন্দ নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে। দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণ দেয়। বলে—এসেছেন যখন, দেখে যান। ভাল লাগতে পারে। আমার তো ভারি ভাল লাগে। নয়তো এক ঘণ্টাও থাকতে পারতাম না। বাই দা বাই, আজ রোববার। সারাদিন আমি ফ্রি। ঘুরে আসা যাবে।

অরুণদার প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই তুলি না। তুলব, সময় হোক। কিন্তু কিসের সময়, তাও জানি না। শুধু মনে হয়, সে সময় আসতে দেরি আছে।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে বসে আমরা কথা বলছিলাম। হঠাৎ শ্রুতি বলে—আপনি আজ থাকছেন তো? নাকি, চলে যাবেন?

—থাকার ইচ্ছে। আপনি আমাকে একটা ভাল হোটেল অ্যারেঞ্জ করে দিন।

শ্রুতি হাসে। হোটেল? তেমন ভাল কিছু নেই প্রতাপগড়ে। তবে টুরিস্ট লজ একটা আছে। সেও সাত আট কিলেমিটার দূরে। সরকারি বাংলো কয়েকটা অবশ্য আছে। কিন্তু অনেক আগে থেকে বলতে হয়। অসুবিধে বোধ না করলে আপনি আমার আতিথ্য করতে পারেন।

শেষ কথাটা বলার সময় জোরে হাসে সে। আমি কুণ্ঠা দেখিয়ে বলি—আপনারই অসুবিধে হতে পারে!

—মোটেও না। দেখছেন তো, একা থাকি। বরং পাশের ঘরে কোন পুরুষ মানুষ থাকলে গভীরভাবে ঘুমোব। .... সে ফের হেসে ওঠে— জানেন? আফটার অল এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। প্রায় চুরি ডাকাতি মারামারি খুনোখুনি হয়। যদিও আমার কোম্পানি স্টাফ কলোনিতে পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে, কিন্তু সর্ষের মধ্যেও তো ভূত থাকে! সত্যি বলতে কী, আমার রীতিমত অনিদ্রা হয়। কোথায় একটু খুট করে শব্দ হয়েছে কী, মোতিয়াকে ডেকে ওঠাই। মোতিয়াকে তো দেখলেন। ভীষণ সাহসী মেয়ে। ওকে দেখে বোঝা কঠিন, কী ডানপিটে মেয়ে! স্বামী মদ খেয়ে এসে অত্যাচার করত। একদিন স্বামীর মাথায় কাটারি মেরে বসেছিল।

—বলেন কী!

—সত্যি। মামলা-টামলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত জরিমানা এবং ডিভোর্স। তারপর থেকে আমার কাছে আছে।

একটু পরে গরম জলে আমার স্নানের ব্যবস্থা হল। চমৎকার খাওয়া সেরে শ্রুতির পরামর্শে এবং নিজের তাগিদে বাইরের ঘরে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরিপাটি বিছানা এবং কম্বলের স্পর্শে একটা লম্বা গাঢ় ঘুম হয়ে গেল। সে ঘুম ভাঙতে বিকেল চারটে।

শ্রুতি বলল—ইচ্ছে করেই জাগাই নি। ট্রেন জার্নি করেছেন। তো ঝটপট চা-ফা খেযে বেরিয়ে পড়া যাক। না কী, ইচ্ছে করছে না?

—নিশ্চয় করছে।

—তাহলে রেডি হয়ে নিন। ...

কিছুক্ষণ পরে শ্রুতির নীল রঙের গাড়িতে পাহাড়ী পথে চলেছি। শ্রুতি ড্রাইভ করছে। শীতের বেলা পড়ে এসেছে। কুয়াসা ঘনাচ্ছে। অসমতল রুক্ষ এলাকার মধ্যে বয়ে গেছে একটা নদী। ব্রিজের ধারে কিছুটা ঘিরে পার্ক মত রয়েছে। শ্রুতি বলে—এখানেই রাখছি। বেশি দূরে গেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

সায় দিই। গাড়ি এক ধারে রেখে দুজনে নামি। অন্তত তিন চারশো ফুট নীচে নদীতে নীচু পাথরের দেয়াল তুলে কৃত্রিম প্রপাত বানানো হয়েছে। জলের শব্দ হচ্ছে জোরালো। কংক্রিটের রেলিংয়ের ধারে কাঠের বেঞ্চ। আরও কিছু পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চারা রয়েছে। একটা খালি বেঞ্চে আমরা বসি। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে তৈরি হই। অরুণদার কথা তুলব।

এই নদী ও প্রকৃতির কথা শুরু করে শ্রুতি। আমি পিকনিকের কথা জুড়ে দিই। তারপর শ্রুতি বলে—হ্যাঁ, পিকনিক করতে আসে অনেকে। নদীর নীচের দিকটায়, ওই দেখছেন, কিছুটা জঙ্গল আছে। ওটাই পিকনিক স্পট। আমরাও বার দুই করেছিলাম।

—তবে আপনাদের ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ির পিকনিক নিশ্চয় অসামান্য ব্যাপার ছিল। মানে, সেই যেটাতে আমার যাওয়া হয়নি!

শ্রুতি হাসে—একটু একটু মনে পড়ছে এবার। নাইনটিন সিক্সটি সিক্সে। তাই না?

—হ্যাঁ। ডিসেম্বর মাসের পনের তারিখ।

—আশ্চর্য। আপনার তারিখটাও মনে আছে দেখছি।

—আছে। জীবনের কোন কোন তারিখ খুব ইমপরট্যান্ট হয়ে থাকে স্মৃতিতে। থাকে না?

শ্রুতি আনমনে বলে—হুঁ। থাকে বই কি।

—আমার জীবনের এই রকম কতকগুলো ইম্পরট্যান্ট তারিখ আছে। সেই তারিখে যেন একেকটা বড় বড় সম্ভাবনা ছিল। অথচ তা কাজে লাগাতে পারিনি।

শ্রুতি অস্ফুট স্বরে বলে—কেন?

—অরুণদার জন্য।

শ্রুতি আমার দিকে ঘুরে কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর বলে—অরুণদা এলেন। ভীষণ বিপর্যস্ত চেহারা। দেখেই বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু ঘটেছে। পলিটিক্যাল অ্যাবস্কন্ডার। কিংবা আন্ডার গ্রাউন্ডে বেড়াচ্ছেন। ওঁর সম্পর্কে যতটুকু জানতাম, তাতে তাই মনে হল। যাই হোক, রাতে আর কোন প্রশ্ন করলাম না। সকালে কথায় কথায় জানতে চাইলাম, কী হয়েছে। অরুণদা প্রথমে তো কিচ্ছু খুলে বলবেন না। অনেক প্রশ্নের পর জানতে পারলাম, নাইনটিন-সিক্সটিনাইন-সেভেনটি-র কোন এক সময়, একজ্যাক্ট ডেট মনে নেই ওঁর—নিশীথ নামে একটি নকশাল ছেলেকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন পুলিশের হাতে। তারপর ....

—কেন ধরিয়ে দিয়েছিলেন বলেননি?

—বলেছিলেন। স্রেফ আদর্শের খাতিরে। অরুণদার মনে হয়েছিল ওরা দেশের লেফটিস্ট ফোর্সকে অকেজো করে দিচ্ছে।

—বেশ। তারপর?

—নিশীথ পুরুলিয়ার জেলে থাকার সময় জেল থেকে পালিয়ে যায়। তারপর আর তাকে পুলিশ ধরতে পারেনি। হঠাৎ নাকি তাকে কলকাতায় দেখতে পেয়েছেন অরুণদা। তবে তার ভয়েই যে আমার এখানে লুকোতে এসেছেন, স্বীকার করতে রাজি নন। আপনি তো ওঁকে আমার চেয়ে সম্ভবত বেশিই চেনেন।

উত্তেজনা চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি—নিশীথ সম্পর্কে আর কিছু বলেননি অরুণদা?

—কী যেন বলেছিলেন, ভুলে গেছি।

—প্লিজ, মনে করে দেখুন না।

শ্রুতি একটু হাসে। মধুর আলোয় হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিস্ময় টের পাওয়া যায়। সে বলে—এক মিনিট। ....হ্যাঁ, নিশীথ তাঁকে ফলো করে বেড়িয়েছে, নাকি বেড়াচ্ছে, এই রকম কী যেন বলছিলেন।

—আর কিছু?

—ঠিক মনে পড়ছে না। ....বলে শ্রুতি মুখোমুখি ঘুরে প্রশ্ন করে—নিশীথ নামে কাকেও আপনি চেনেন না?

আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত বইছিল। আস্তে বলি—ভীষণ চিনি।

—তাহলে আপনিই ওঁদের মধ্যে একটা মিটমাট করে দিন না!

—এখন আর মিটমাটের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ....

—কারণ?

—অরুণদাকে নিশীথ খুন করেছে।

শ্রুতি নড়ে ওঠে। ভয়ার্ত স্বরে বলে—সে কী অরুণদাকে... অরুণদা....

—পার্কসার্কাস এরিয়ার একটা রেলব্রিজের কাছে একুশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিশীথ অরুণদাকে স্ট্যাব করে। অরুণদা রক্তাক্ত শরীরে পড়ে থাকেন। যখন পুলিশ আসে, তখন বাসি মড়া।

শ্রুতি ধরা গলায় বলে—খুব খারাপ লাগছে। আহা।

চুপ করে থাকি। নিশীথের কথা ভাবি। আলো কমে গেছে। তার কালো ছায়ামূর্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। কিছু বলতে চাইছে আমাকে। কান পাতি। সন্ধ্যার দিকে নদীর তলা থেকে কনকনে একটা হাওয়া উঠে আসছে। সেই হাওয়ার শব্দ দিয়ে নিশীথ ফিস ফিস করে বলে—এবার তোমার পালা! তৈরি হও!

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে। আবছা অন্ধকারে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখি! পাথর, গাছ, ঝোপের আড়ালে একটা করে নিশীথ বসে আছে তার হাতে ছুরি আছে।

কিন্তু আমার কাছেও রিভলবার আছে। পাঁচটা গুলি নিয়ে তৈরি। নিশীথকে সামনে পেলে ঝাঁঝরা করে দেব। ছিদ্রময় হয়ে যাবে নিশীথের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। আর সেই ছিদ্র দিয়ে ঝরে

পড়বে তার সব শক্তি। হাওয়ায় উড়ে যাবে বারুদের ধোঁয়া এবং গন্ধের মত তার বিপ্লবের সাধ। তার নাম শেষবারের মত মুছে যাবে পলাতক বন্দীদের তালিকা থেকে।

শ্রুতি ভারাক্রান্ত স্বরে বলে—অরুণদার ব্যাপারটা শুনে কী যে খারাপ লাগছে। আপনি কেন এতক্ষণ চাপা রেখেছিলেন বলুন তো?

—হয়তো আপনার মুখ থেকে নিশীথের নাম শোনার জন্যে।

শ্রুতি তীব্র স্বরে বলে—তার মানে?

—রেলব্রিজের কাছে অরুণদা 'এন' নামে কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই 'এন' আসলে কে, খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আপনার কাছেই পেয়ে গেলাম। আমি, কৃতজ্ঞ শ্রুতি।

শ্রুতি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে—ওঠা যাক। ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে।

পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির কাছে এসে সে দরজা খুলতে হাত বাড়ায় এবং হঠাৎ থেমে কেমন হাসবার চেষ্টা করে বলে—কিন্তু .... প্লিজ কিছু মনে করবেন না, আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিলেন।

—কেন?

—আপনি কি ডিটেকটিভ অফিসার?

হো হো করে হাসতে থাকি। হাসতে হাসতে এতক্ষণে টের পাই, আমার গায়ে এতটুকু জোর নেই। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। যে পথে হাঁটতে শুরু করেছিলাম, এবার তা শেষ এবং সামনে দেয়াল। রহস্যময় 'এনে'র পুরো নাম উদ্ধার করতে পেরেছি। শ্রুতির কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু আর কারও কাছে অরুণদা কি নিশীথের কথা বলে গেছেন?

সুনন্দার কাছে বলেননি। তার দিদি নীলিমার কাছে না। নগেন সেনকে..... নাঃ, অসম্ভব। যতদূর জানি, ওঁর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ছিল না।

শ্রুতি স্টিয়ারিংয়ে বসে ডাকে—কই, উঠুন।

কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলি—হ্যাঁ। এই যে ...

আবার একটা রাত ট্রেনে কাটিয়ে দিই। এবার ভাগ্যে বার্থ জোটেনি। ট্রেনটাও সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সব স্টেশনে থামতে থামতে এসেছে। সেকেন্ড ক্লাসে একটা সিট পেয়ে যাই এবং অদ্ভুত ব্যাপার, কম্বল ঢাকা দিয়ে পা ছড়িয়ে এবং হেলান দিয়েই গাঢ় ঘুম হয়ে যায়। শীত আর শীত ছিল না। কী যে আরাম!

দুপুর নাগাদ কলকাতা পৌঁছে ট্যাক্সি করে সোজা চলে গেলাম তিলজলা বস্তিতে, সুনন্দাদের বাড়ি।

সুনন্দা দরজা খুলে আমাকে দেখে যেন চমকে ওঠে। তারপর বলে—আসুন।

ভেতরে অরুণদার সেই ঘরে যাই। সুনন্দার দিকে তাকিয়ে থাকি। কী বলব, ভেবে পাই না।

সুনন্দা বলে—কী ব্যাপার? এভাবে হঠাৎ?

—চলে এলাম।

—আপনি কোথায় যেন যাবেন বলেছিলেন.....কী যেন জায়গাটার নাম?

—সুনন্দা, তার চেয়ে জরুরী কথা আছে।

—বলুন!

—তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতে চাই!

—বাবা... সুনন্দা যেন সমস্যায় পড়ে যায়! ইতস্তত করে ফের বলে—বাবার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওঁর মাথার গোলমাল আছে। আর, হ্যাঁ শুনুন, কাল সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ পুলিশ অফিসাররা এসেছিলেন।

চমকে উঠি। —পুলিশ! কেন? কী বলল?

—আমাকে অনেক প্রশ্নটশ্ন করল। অরুণদা সম্পর্কে। জিনিসপত্রের খোঁজও করল।

—তুমি আমার কথা বললে!

—হ্যাঁ। বললাম, ওঁর ভাই এসে সব নিয়ে গেছেন।

—আমার নাম ঠিকানা দিয়েছ?

—দিলাম। কেন, না দেওয়া উচিত ছিল?

একটু ভেবে জবাব দিই—না। ঠিক করেছ। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ আবার এল কেন বুঝতে পারলে কিছু?

সুনন্দা মুখ নামিয়ে বলল—আপনি তো বড়দির কাছে সব শুনেছেন। বড়দি ট্রাংক করেছিল জামাইবাবুকে দিল্লিতে। জামাইবাবু কাল ফিরে এসেছেন এবং ....

—পুলিশে তদ্বির করেছেন।

—হ্যাঁ।

—তোমার জামাইবাবু, মানে নগেন সেনের, লাভ কী এতে?

সুনন্দা একটু ভেবে জবাব দেয়—আমার ধারণা, আপনার ব্যাপার দেখে বড়দি আর জামাইবাবু একটু ভয় পেয়েছেন। পাছে ওঁরা জড়িয়ে পড়েন খুনের দায়ে, তাই হয়তো চাইছেন মাথা বাঁচাতে। বিশেষ করে রিভলবারটার ব্যাপারেও ওঁদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

—হ্যঁ, স্বাভাবিক।

—বসুন, চা করি।

—থাক। তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত সুনন্দা। সুনন্দা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে—বরং অন্য এক সময়ে আসুন। ওঁর অসুখটা বেড়েছে খুব। কাল সকালে বরং রিং করব আপনাকে।

উঠে দাঁড়াই। বলি—আচ্ছা, চলি সুনন্দা। আশা করি, আবার হয়তো দেখা হবে।

হন হন করে বেরিয়ে আসি। সুনন্দা তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না কেন, জানি না। হয়তো অরুণদার ইদানীংকার কোন দুষ্কর্মের খবর বুড়ো রাখে। কী সেই দুষ্কর্ম?

আবার ট্যাক্সি করে নিউ আলিপুরে আমার কোয়ার্টারে পৌঁছতে একটা বেজে গেল। প্রথমে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা লক্ষ্য করি। কোন সন্দেহজনক ব্যাপার চোখে পড়ে না। তখন ভেতরে ঢুকে যাই। ধরমবীর যথারীতি সেলাম দেয় এবং ধরণীও দৌড়ে এসে স্যুটকেসটা নেয়।

অরুণদার কিটব্যাগটা আলমারিতে ভরা ছিল। সেটা ঠিকই আছে। ‘এন’ সম্পর্কে অরুণদা যে খবরের কাগজে কিছু কথা লিখে রেখেছিলেন, সেই কাগজটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলি এবং পুড়িয়ে ছাই করে দিই। আরও কিছু কাজ বাকি আছে। যাক, আগে সুনন্দার বাবার সঙ্গে দেখা হোক, তারপর সেগুলো করা যাবে। দাড়ি কামাতে কামাতে হঠাৎ আমার ভাবনা হয়, আমি কি খুবই নির্বোধ?

খাওয়ার পর শুয়ে পড়ি। তখনই ঘুম এসে যায়। প্রগাঢ় ঘুম। ....

সেই ঘুম ভাঙে দরজায় ধাক্কাধাক্কিতে। কারা দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে যেন। রেগে চেঁচিয়ে উঠি—কী হয়েছে? হু ইজ দা ব্লাডি বাস্টার্ড? তারপর টলতে টলতে দরজার কাছে যাই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে প্রগাঢ় অন্ধকার। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচ জন ঘরে ঢুকে পড়ে। একজন সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেয়। তারপর উপদ্রব শুরু হয়। ঝড় এসে ঢুকে পড়ার মত হুলস্থূল চলতে থাকে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি। একটা টেকো মাথা গুঁফো প্রকাণ্ড লোক আমার কাঁধে হাত রেখে বলে—আসুন ব্রাদার।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—অসংখ্য। বিবিধ।

—তার মানে?

—ইউ আর অ্যারেস্টেড।

—বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন? ... আমি এতক্ষণে একটু হাসতে পারি। হাসি পায়।

—আপনি নিজেই তো জানেন। আবার প্রশ্ন করে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

—কী অদ্ভুত! অরুণ সেনের খুনীকে খুঁজে বের করার জন্যে আমি এত ছুটোছুটি করে বেড়ালাম। শেষে আমি নিজেই... কথা শেষ করতে পারি না। প্রচণ্ড হাসির চাপে আমার গা ঘুলিয়ে ওঠে। হাসতে

হাসতে আমি কুঁজো হয়ে যাই। লোকটা আমার কলার আঁকড়ে ধরে সামলায়।

তারপর কেউ বলে—ডায়রিটা পাওয়া গেছে স্যার।

হাসি থামিয়ে আস্তে বলি—কার ডায়রি?

—অর্জুন চৌধুরীর। যাকে বোম্বে মেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নিজে অর্জুন চৌধুরী সেজেছেন। সত্যিকার অর্জুন চৌধুরী হয়ে ওঠার জন্যে আপনাকে ওই ডায়রিটা নিশ্চয় সাহায্য করেছে।

—বলেন কি? আমি? আমি অর্জুন চৌধুরী হয়ে তার মতই ভেবেছি, এবং ...

—হ্যাঁ নিশীথবাবু। অর্জুনবাবুর পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করেও ঝালিয়ে নিয়েছেন। আপনি এক্সপার্ট। নিজেকে পাকাপাকিভাবে অর্জুনবাবু হিসেবে এস্টাব্লিশ করতে পেরেছিলেন।

—কিন্তু আমি তো অরুণদার খুনীকে খুঁজেতই এত সব করেছি!

—না ব্রাদার। প্রমাণ লোপ করতে বেরিয়েছিলেন। তাই প্রতাপগড়ে কাল সন্ধ্যায় শ্রুতি দেবীকে খুন করে পাহাড়ি খাদে ফেলে দিয়ে এসেছেন! সুনন্দা দেবীর বাবার সঙ্গেও আজ দেখা করতে চেয়েছিলেন। নিশীথ নামটার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কি না জানার ইচ্ছে ছিল। সুনন্দা বুদ্ধিমতী বলেই দেখা করতে দেয় নি। যাই হোক, আসুন—যথাস্থানে যাই। ব্যানার্জি, তুমি ভাই থরো সার্চ চালিয়ে যাও।...

পুলিশভ্যানে বসে এতক্ষণে টের পাই, আমাব মধ্যে নিশীথ বোস ফিরে এসেছে।..

নৃশংস

এক

অনেক দূর থেকেই ওই ঝিকিমিকি ছটাটা চোখে পড়েছিল সাধুর। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। চিতাবাঘের মতো এগিয়ে যাচ্ছিল সে। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছিল। কেউ কোথাও নেই। এত সকালে শীতের ভয়ে কেউ মাঠের দিকে পা বাড়ায়নি। বছরের এ সময়টা উত্তরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস মানুষ আর সবরকম জানোয়ারকে একেবারে ঘরকুনো করে রাখে।

এ মাঠের শেষ নেই যেন। যতদূর চোখ যায় শীতের ঘন কুয়াশা দূরের সবকিছু ধূসর করে রেখেছে। তার মধ্যে ওই ঝিকিমিকিটা খুব বেখাপ্পা বলেই নজরে পড়েছিল সাধুর। ক্রমশ তার রক্ত খেকে ঠাণ্ডা ভাবটুকু চলে যাচ্ছিল। এই সাত সকালে কপাল খুলে যাবার মতো শিকার মিলে যাবে, সে ভাবতেও পারেনি।

পিছনের গ্রামের এক দাগী ইয়ারদোস্তের বাড়ি রাতটা ভালই কাটিয়েছে। সাধুর এই দোস্ত এক মুসলমান চাষী। মুরগি কেটে গরম-গরম ভাত খাইয়েছে তাকে। শীত-কাটানোর উপযোগী ভাল কাঁথা কম্বল দিয়েছে। ভোরে চা খাওয়ারও অভ্যেস আছে লোকটার। ঘুম থেকে জাগিয়ে কাঁসার গেলাসে ঘন টাটকা দুধের চা খাইয়েছে। তারপর সাধুর মনে কী হল, মাঠ সেরে আসছি বলে নদীর দিকে এল এবং উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দূর কাশবনের ওই ছটাটা চোখে পড়ল। অমনি সাধু আর নিজেকে বাগ মানাতে পারল না। তার মন চনমন করে উঠল। দোস্তের নাস্তার কথা ভুলে সে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে নদী পেরিয়ে এল।

নদীর পারে একটা বটগাছ আছে। তার গোড়ার মাটিটা উঁচু। সেখানে দাঁড়িয়ে আবার সে দেখে নিয়েছে তার শিকারকে। হ্যাঁ, ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে। শীতের সূর্য সমানে ঝিলিক দিচ্ছে ওই বিশেষ জায়গাটায়। তখন সাধু কৃতজ্ঞভাবে মা রামেশ্বরীর সিঁদুর মাখানো নুড়ির কাছে ঝটপট মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলেছে—সব যেন ভালয় ভালয় কেটে যায় মা। ছেলেকে একবার দেখিস, মা!

'কাজে' নামবার আগে বরাবর সাধু খুব ভক্ত ও বিনীত মানুষ হয়ে ওঠে। দেবদেবতা পীরের নামে মানত করে। সন্ন্যাসী বা ফকির সামনে পেলে দু-চার পয়সা দান করে ফেলে। বলে—দেখো বাবা, মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

এ-সব সময় তার গতি বিদ্যুতের মতোই। নাবাল আবাদী মাঠে সর্ষের হলুদ ফুলে-ভরা ক্ষেত আর সবুজ চিকন গমের চারা মাড়িয়ে, ডাইনে বিলটা রেখে খুব শীগ্‌গির সে পৌঁছে গেল অনাবাদী ব্যানাকাশের জঙ্গলে। ঝিকিমিকিটা এখনও বড় ছটা হয়ে ঝকমক করে উঠেছে। শিকারের দেহটা ডুবে আছে খড়ের বনে। কোথাও কোন জনমানুষ নেই। এমন চমৎকার সুযোগ আর হয় না। সাধু গলার মাফলারটা ঢিলে করে রাখল—যাতে দরকারমতো খুলে নেওয়া যায়।

শিকার কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকারভাবে এগোচ্ছে। একবারও কোনদিকে ঘুরছে না। মাঝে মাঝে ছটা প্রচণ্ড ঝকমক করছে। সাধু যা অনুমান করেছিল, তা ঠিক। লোকটা এক বাসনওয়ালা। চলেছে সোজা পশ্চিমে। তার মাথায় ঝাঁকার বাসনে রোদ পড়ে ঝকমকিয়ে উঠছে।

আর বড়জোর একশো গজ দূরত্ব। পথ বলতে এই খড়ের বনে দু ফালি গাড়ির চাকার দাগ মাত্র।

শক্ত মাটি এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে। আর কিছুদিন পরেই এ-পথে লোকজন ও গাড়ি চলাচল পুরোপুরি শুরু হবে। তখন ধুলোয় হাঁটু অবধি ডুবে যাবে। সামনে ছোট্ট জলের সোঁতা—যার নাম 'খাগড়ি' তার জল পুরো শুকিয়ে বালি বেরিয়ে পড়বে। ওই-সময় গাড়ির চাকায় কেমন অদ্ভুত শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে, সাধু দেখেছে ছেলেবেলায়। এ-পথেই তার বাবার সাথে শিষ্যবাড়ি যেত কাঁহা কাঁহা মুল্লুক। সে-সব এখন আবছা মনে পড়ে মাত্র।

লোকটা একবারও পিছু ফিরল না। এটাই আশ্চর্য। সাধু মনে মনে হাসছিল। বরাবর তার এই ভেবে হাসি পায় যে একটু পরেই যার দফা রফা হবে, সে কী নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে! এই লোকটার বেলাতেও সেই ব্যাপার। নিয়তির অদ্ভুত কৌতুক যেন!

সাধু ঝটপট আন্দাজ করে ফেলল, বাসনগুলো কমসে-কম পনের সের তো হবেই। যেগুলো ঝকমক করছে, তা সবই কাঁসার। ঝাঁকার ভেতর কিছু পেতলও থাকা সম্ভব। লোকটার এক হাত ঝাঁকায় অন্য হাতে একটা কাঁসার ঘণ্টা ঝুলছে। সাধু জানে ঘণ্টার সঙ্গে খুব কায়দা করে একটা কাঠের হাতুড়িও ধরা আছে। গ্রামে গিয়ে সেটা বাজাবে সে। সেই সঙ্গে চমৎকার সুরে একখানা হাঁকও দেবে।

তা নিদেন শ'খানেক টাকার মাল বটে! সেই সঙ্গে ওর ট্যাকে কি আর দু-দশ টাকা থাকবে না? নগদ কিছু থাকলে ভালই হয়। ব্রহ্মপুরের সড়ক নাকি পাকা হয়েছে। বাস চলছে। শহরে গিয়ে মাল ঝাড়তে হলে কন্ডাকটার ছোকরাকে কিছু গুঁজে দিতেই হবে। সাধু মাল বইতে অনভ্যস্ত। কাজেই রিকশা করতে হবে মহাজনের গদি পৌঁছতে!.....

কী কী করতে হবে, মোটামুটি ছকটা দ্রুত সেরে ফেলল সাধু। একটু অস্বস্তিও হল। শহরের মহাজনের কাছে অনেকে বাকিতেও মাল আনে। এখন, সাধু যার কাছে যাবে, মালটা যদি তারই হয় এবং বাকির মাল?

পরমুহূর্তে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলল সে। বরং আরও দূরের কোন শহরে যাবে। আপাতত কাজটা শেষ করা যাক, তারপর সে-সব ব্যাপার নিয়ে পরে মাথা ঘামাবে। মাফলারটা আরও ঢিলে করে নিল সে। ঝটপট ফের চারদিকটা দেখে নিল। দূরে কয়েকটা মোষ চরছে। কিন্তু লোক নেই। থাকলেও কিছু টের পাবে না। 'খাগড়ি'র সোঁতা আরও দূরে পড়ে যাবে।

কাছাকাছি গিয়ে সাধু স্যান্ডেলের আওয়াজ তুলল এবং কাসল। বাসনওয়ালা একটুখানি ঘুরে দেখার চেষ্টা করল মাত্র। অদ্ভুত নির্বিকার লোকটা তো!

সাধু একেবারে পিঠের কাছে গিয়ে বলল—কোথায় যাওয়া হবে দাদা?

লোকটা আসলে ওই একফালি এবড়ো-খেবড়ো পথে অতি কষ্টে যাচ্ছে—মাথায় বোঝা নিয়ে পুরো ঘোরা তার পক্ষে কঠিন। সে দার্শনিকের মতো নিরাসক্তভাবে জবাব দিল—যাচ্ছি, যেদিকে গাঁ-গেরাম পাই। কাপাসখালিও যেতে পারি—আবার বাবুইহাটিও গিয়ে উঠতে পারি। আপনার কোন্‌দিকে?

সাধু উত্তেজনা চেপে রেখে বলল—ব্রহ্মপুর।

—বরমপুর! হুঁ—মেলা বসেছে শুনেছি। মেলা দেখতে নাকি?

—কতকটা।

আর কথা নেই। আপনমনে এগোচ্ছে। সাধু কথা খুঁজছিল। জোর ভাব না জমালে শিকারে বসা যাবে না। কিন্তু লোকটা যে বড্ড নির্বিকার! এসব ক্ষেত্রে পথিকদের মধ্যে খুব সহজেই ভাব জমে ওঠে। কত সুখ-দুঃখের লেনদেন হয়।

সাধু বলল—দাদার বাড়ি কোথায় বটে?

—হুই মোহনপুর।

—ওরে বাবা। সে তো সেই গঙ্গার ওপারে। দশ ক্রোশ হবে—নাকি?

তা হলে বই কি।

—অ্যাদ্দুর বাসন বেচতে আসেন?

—আসি। এদিকে রাঢ় অঞ্চলে লোকের কেনার ক্ষমতাটা বেশি—বুঝলেন? এবার ধান-টান তো

ভালই হয়েছে। তাই ভাবলাম, এদিকবাগেই যাই।

—এত সক্কালে নিশ্চয় মোহনপুর থেকে আসছেন না?

—নাঃ! রাত্তিরে এক গাঁয়ে ছিলাম।

—চেনাজানা আছে নিশ্চয়?

—নাঃ! দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াই—কেনাবেচার কাজ, বুঝতেই পারছেন—ভাব করে নিতে হয়!

সাধু মুচকি হাসল। তা দাদা, যদি কেউ ধরুন মেরেধরে কেড়ে নেয়?

—কী? মাল? .... বলে একটু চুপ করে থাকে সে। তারপর ফের বলে—নাঃ! আমি মানুষকে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করে তো কোনদিন ঠকি নি, ভাই!

রি রি করে জ্বলে উঠল সাধুর গা। ভাই কথাটা শুনে। এ শালা এক খোকা—গাল টিপলে দুধ বেরোচ্ছে। সাধু বলল—তাহলেও তো দেশে কতরকম মানুষ আছে। কার পেটে কি আছে, মুখ দেখে ধরতে পারেন? পারেন না। এই যেমন আমি—আমার ....

হঠাৎ লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। সাধুর দিকে অশ্চর্য শান্ত চোখে তাকাল। মুখে কেমন হাসি নিয়ে বলে উঠল—এক সামান্য বাসনওলাকে মেরে যদি আপনার লাভ হয়—মারুন। তাতে বাধা দেব না ভাই। চাঁদতারণ জানে, জন্মালে মানুষকে মরতে হয়—সে মরবে। কিন্তু তার মরণ দিয়ে যদি কারো দু'পয়সা লাভ হয়, হোক্। তাও ভাববে, সে কাজে লেগেছিল।

সাধু হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু হাসিটা ভীষণ শুকনো। হেসেই টের পেল, গলা জ্বালা করছে এবং সারা শরীর পরক্ষণেই কেমন ক্লান্ত নিঃসাড় হয়ে পড়েছে। তার উরু দুটো খুব ভারী লাগল। জীবনে এমন অবস্থায় কখনও সে পড়েনি।

লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি আছে। কালো কুচকুচে রঙ—কিন্তু চেহারাটি বেশ সুন্দরই বলা যায়। বড় বড় টানা চোখ, বাঁশীর মতো নাক, ঠোঁট দুটো পাতলা। পরনে হাঁটু অবধি ময়লা ধুতি পরেছে সে, পায়ে ধুলোমাখা কালো পাম্পসু। গায়ে একটা তেল চিটচিটে খয়েরি হাফহাতা ফতুয়া—তার ওপর ধূসর রঙের তুলোর কম্বল জড়ানো।

বয়স অনুমান করল সাধু। চল্লিশের বেশি তো বটে। দাড়ি-গোঁফে দু'এক ছিটে পাক ধরেছে। রোগা ঢ্যাঙা এই লোকটাকে দেখে এত ভয় করছে কেন, সাধু বুঝতে পারল না।

তার হাসি থামলে লোকটা আবার ঘুরে হাঁটতে থাকল। তারপর বলল—আমি মানুষ চিনি ভাই। আজীবন তো মানুষের ভিড়েই কাটাচ্ছি। মানুষ আমি চিনি।

সাধু ভাবল, এই বোকারামকে খিস্তি করে বলে দেওয়া দরকার—কচু চিনিস। শালা, ঘোড়ার ডিম চিনিস! কিন্তু তার মাথার পোকাটা আবার নড়ে উঠেছে। সে বুক সমান উঁচু কাশবনের মধ্যে সেই সোঁতাটা ঠাহর করতে চাইল। দেখা যাচ্ছে না কিছু। তাছাড়া, অনেক বছর পরে এই মাঠে হাঁটছে—অনেক অদলবদলও ঘটেছে বইকি। সোতার ধারে গিয়ে লোকটাকে একবার বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে রাজি করাতে হবে। তা না হলে কাজের অসুবিধে হবে প্রচণ্ড। গায়ের জোরে তাকে সহজে এঁটে ওঠা নিশ্চয় সম্ভব—কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সাধু সবে আবার কাজে নামতে চলেছে—তাই কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক মনে করছিল না।

লোকটা বড় অদ্ভুত। সাধু আর কথা বলছে না তো—সেও চুপচাপ চলেছে। ওকে কথা বলাতেই হবে। সাধু মুখ খোলে আবার—তা দাদার বাড়িতে কে কে সব আছে?

—আমার?

কথা শুনে আবার গা জ্বলে যায়, তবু সাধু মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলল—হ্যাঁ। আবার কার?

—এক মেয়ে আছে। ওই একটি মাত্তর। আর কেউ না।

—বলেন কি! একা থাকে বাড়িতে। কত বড় মেয়ে?

—তা বিয়ের যুগ্যি হয়েছে! এবার ভাবছি, পাত্তরটাত্তর দেখাশোনা খোঁজখবর করব গিয়ে! কথায় বলে মেয়ে না মাটির ঢিবি। দেখতে দেখতে ডাগরডোগর হয়ে গেল। তবে কি, মেয়ে আমার বড় ডানপিটে। বুঝলেন?

—তার মানে? সাধু চারদিক দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল।

—মানে, খুব জংলী স্বভাবের। পাঠশালায় বৃত্তি পরীক্ষে দিয়েছিল। পাস করল। সবাই বলল—মাইনর কেলাসে দাও। ও মেয়ে পড়বে কি, যা ঝগড়াটে! ... খিক খিক করে হাসতে থাকল বাসনওয়ালা চাঁদতারণ। ফের বলল—যাই বলুন, আমাদের জাতের লেখাপড়া হয় না।

—আপনাদের জাতি?

—চাষী কুনাই। বাপ-পিতামোর খানিক চাষব্যাস ছিল। এখন সব খুইয়ে এই ব্যবসা ধরেছি।

জানতে চাইল না, তবু সাধু মাথা উঁচু করে বলল—আমরা বামুন।

—অ। পেন্নাম ঠাকুরমশাই! লোকটা না ঘুরেই কাঁসরওলা হাতটা একটু তুলে সাধুকে শ্রদ্ধা জানাল।

—তা তুমি ... এবার অনায়াসে সাধু তুমি বলতে পারল—আগেও পারত, কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে বলেনি—সে বলল—তা তুমি যদি বলো, আমার এক জ্যাঠা ঘটকালি করেন। তোমার মেয়ের .....

বাধা দিয়ে চাঁদতারণ বলল—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই আমরা ছোট লোক। আমাদের মেয়ের ঘটকালি কি খাঁটি বামুনে করবে! করবে না!

—নিশ্চয় করবে। কেন করবে না? আজকাল এমন সবই চলছে।

সাধু এমনভাবে বলল, যেন চাঁদতারণের মেয়ের বিয়ে না দিয়ে সে ছাড়বে না। লোকটা আবার খিকখিক করে হাসছিল। —শুনে বড় তুষ্ট হলাম ঠাকুরমশাই। অবশ্যি, আমাদেরও বামুন ঠাকুর আছেন। পুজোপাব্বনে তেনাকে ডাকি। তবে তেনাদের সঙ্গে আপনাদের জল চল তো নেই।....

কথা বলতে বলতে একটা বাঁধের মতো জায়গা এল—বোঝা যায়, এক সময় কোন আমলে বাঁধ দেবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু পরে ভেঙে যায় এবং আর মেরামতের চেষ্টা হয়নি। তার ফলে জায়গায় জায়গায় উঁচু মাটি জমে আছে, তার ওপর ঝোপঝাড় ও তালগাছ গজিয়েছে। বাঁধে গিয়ে সাধুর মনে পড়ে গেল, খাগড়ির সোঁতাটা সামনেই পড়বে। আবার একদফা উত্তেজনা এসে তাকে চঞ্চল করে তুলল।

লোকটার হঠাৎ যেন দার্শনিক ভাবটা কেটে গেছে। হয়তো মেয়ের কথায় তার এই আসক্তি আর কথার দুয়ার খুলে গেছে। সে মেয়ের কথা এককাহন করে বলতে বলতে চলেছে। সাধু আর কান করছিল না। তার মন এখন কাজের দিকে। তার রক্তে ঝড় বইতে শুরু করেছে এতক্ষণে।

সাধু অনেক কষ্টে উত্তেজনা চেপে রাখল। বাঁধের ওপর অজস্র কুলগাছ গজিয়েছে। তাতে থোকা থোকা কুল ধরেছে। আলতো হাতে টপ করে একটা কুল পেড়ে সে মুখে ফেলল। রসালো মিঠে কুলগুলো বাসনওয়ালা চাঁদতারণকে আকৃষ্ট করছে না কেন, সে বুঝতে পারল না। বলল—কত কুল পেকেছে দেখছো হে? ভারি মিঠে কিন্তু।

—অ। তাই নাকি? তা এটা তো কুলেরই সময়। বলে চাঁদতারণ আবার তার মেয়ের প্রসঙ্গে ফিরে গেল।

সাধু বিরক্ত হয়ে বলল—মেয়েরা কুলের ভক্ত। খানিকটা পেড়ে নিয়ে গেলেও পারতে। এমন কুল তোমাদের গঙ্গাপারে ফলে না।

কথাটা বলেই কিন্তু সাধু অবাক্ হয়ে গেল। মলোচ্ছাই! কি বলছে—কাকেই বা বলছে! ওর মেয়ের কাছে সেগুলো নিয়ে যাবে কে?

চাঁদতারণ বলল—ফেরার পথে নোব ঠাকুরমশাই। তখন অবসর হবে। এখন ক্যানে খামোকা বোঝা বাড়াই বলুন?

—হুঁ। বলে কুল চিবুতে চিবুতে তাকে অনুসরণ করল সাধু। সোঁতার সোনালী বালি কাশবনের ফাঁকে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে। বালিটা যতবার তার চোখে ভাসল, ততবার চমক লাগল। কাজটা পারবে তো? কোন গোলমাল হবে না তো? তাহলে আবার সেই লুকিয়ে বেড়ানো, রক্ত শুকিয়ে যাওয়া, তারপর নির্ঘাত ধরা পড়া এবং এবার মেয়াদটা বেশ লম্বাই হবে। এক বছরের বদলে দু'বছর হওয়াও বিচিত্র নয়। শালা জেলে থাকে মানুষ! সাধু শুনেছিল, জেল নাকি মোটের ওপর ভালই জায়গা। জেলে তাকে অভিজ্ঞ দাগীরা বলেছিল, আর তোমার বেরোতেই ইচ্ছে করবে না ইয়ার! কিন্তু

সাধু অন্য মানুষ। কি কষ্টে যে একটা বছর কাটিয়েছে বলার নয়!

ফোঁস করে একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল সাধু। তারপর দ্রুত চারদিকটা আবার দেখে নিল। দূরে বাঁদিকে একটা বিল দেখা যাচ্ছে। সেখানে কোন জেলে-বাগ্দী জাল নিয়ে চলেছে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে। সেটাই ভাবনার কথা। জালওয়ালা লোকটা দেখতে দেখতে কাশের জঙ্গলে আড়াল হল। সাধু তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

উঁচু কাশ ঝোপটার পরই খাগড়ির সোঁতা এসে গেল। নামবার মুখে নীলচে জল আছে খানিকটা। জলে স্রোত বইছে না। মনে হচ্ছে, ভাটির দিকে দক্ষিণে কোথাও চাষীরা বাঁধ দিয়ে জলটা আটকেছে। বোরো চাষ করবে। বাসনওয়ালা সেই কনকনে ঠাণ্ডা জল পেরিয়ে আগে আগে গেল। ওর জুতো দুটো সম্পর্কে সাধু ভাবছিল—কি করবে। লোকটা মাথার ভার ঠিক ঠাক রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে জুতো বাঁ হাতে নিয়েছে। সাধু জলের ধারে দাঁড়িয়ে বলল—খুব ঠাণ্ডা নাকি?

চাঁদতারণ হাত দশেক জলের বিস্তারটা পেরিয়ে বালিতে পৌঁছে তারপর ঘুরে হাসল। জুতো দুটো বালিতে ফেলে দিয়ে পা গলাল। তারপর বলল—ঠাকুরমশাই বড় জলকাতুরে! চলে আসুন! আপনি তো আমার চেয়ে লম্বা। আপনার হাঁটু ডুববে না!

সাধু কোন কথা না বলে এগিয়ে গেল। বাপ্স! মগজ অবধি যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল। বালির চড়াটা সামনে অন্তত পনের কুড়ি গজ অবধি গিয়ে ওপারে ব্যানার জঙ্গলে শেষ হয়েছে। গাড়ির চাকার দাগ পড়েছে সেই বালিতে। দাগগুলো খুব টাটকা নয়। সম্ভবত কদিন আগে কারা উলুকাশের খড় কেটে নিয়ে গেছে। এলাকার লোক ওই দিয়ে ঘরের চাল ছেয়ে নেয়। খড়ের কুটো পড়ে আছে বালির চড়ায়। এক জায়গায় তামাকের ছাই জড়ো হয়ে আছে—কিছু পায়ের দাগও। কারা এখানে বসে তামাক খেয়েছিল।

বাসনওয়ালা হাঁটতে শুরু করেছে। সাধু বেগতিক দেখল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে ডাকল—একটু জিরেন নেওয়া যাক্। এস হে, সিগ্রেট টানি!

চাঁদতারণ ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল।- খান। আমার চলে না।

—চলাতে দোষ কি? ... বলে সাধু বালির ওপর ধুপ করে বসে পড়ল। ডাকল —এস এস। এখনও বেশি বেলা হয়নি!

চাঁদতারণ শীতের সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে ইতস্তত করছিল। সাধু আবার বলল—নামাতে অসুবিধে হবে? দিচ্ছি নামিয়ে! আর কতক্ষণই বা একসঙ্গে যাব! এস, এস!

তার তর সইছিল না। উঠে গিয়ে চাঁদতারণের ঝাঁকায় হাত লাগাল এবং প্রায় জোর করেই নামিয়ে দিল সেটা। তার হাত ধরে টেনে বসাল। চাঁদতারণ অগত্যা বসে পড়ল। হাসতে হাসতে সে বলল—পথে নেমে আমার বসা অব্যেস নেই! যাক্গে, ঠাকুরমশাই যখন বলছেন! আপনার খাতিরে...

সাধু সিগারেট ধরাতে গিয়ে ধরাল না। কাজের অসুবিধে হবে। স্যান্ডেল খুলে রাখল পা থেকে। মাফলারটা টেনে কোলে রাখল। কতকগুলো চিন্তাভাবনা তার মাথায় বিদ্যুতের মতো মুহুর্মুহু ঝিলিক দিচ্ছিল। গলায় মাফলার লাগানোতে সে সিদ্ধহস্ত। লোকটা সামনাসামনি বসেছে। পেছন থেকে ফাঁস লাগাতে পারলে ভাল হত। নাকি চাকুটা বের করবে?

সাধুর বুক কাঁপল। চাকু চালানো খুব ঝক্কির ব্যাপার। চ্যাঁচামেচি করবে। তার চেয়ে ফাঁস লাগানোই ভাল। নিরাপদে কাজটা চুকে যাবে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে চাঁদতারণের দিকে তাকাল। চাঁদতারণ সামনে তাকিয়ে আছে। নির্লিপ্ত দৃষ্টি। মনে হচ্ছে, খুব বড় ধরনের কোন জ্ঞানের কথা বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সাধু এক হাতে মাফলারটা ধরে একটু ঝুঁকে গেল তার দিকে।—তোমার পেছন দিকের চুল তো বেজায় পেকেছে হে! মেয়েকে বললেই তো তুলে দেয়।

চাঁদতারণ খিকখিক করে হাসল।—আজ্ঞে সে মেয়ে নয় ঠাকুরমশাই। ওই যে বলছিলাম না—দিন রাত্তির কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ায়! মা মরা মেয়ে—একা একা কোন গতিকে মানুষ হয়েছে।

সাধু মাফলারে অন্য হাতটাও রাখল। আলগোছে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—কি নাম তোমার মেয়ের?

—আজ্ঞে শিউলী।

—শিউলী?

—হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, শিউলীবালা। উঠোনে শিউলী ফুলের গাছ লাগাল ওর মা—আর সেই গাছ ফুল দিতে দিতে ওর জন্ম হল। ওর মা বললে—তবে মেয়ের নাম শিউলীই থাক। সপ্তমী পুজোর দিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—বুঝলেন? চৌধুরীবাবুদের বড় পুজো হয়—সেবারে থেটার হয়েছিল কলকাতার। কত ধুমধাম হয়েছিল। আমি সেবারে .... এ কী!

কথাটা থেমে গিয়ে কঁক্ কঁক্ আওয়াজ বেরতে থাকল ওর গলায়। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল। জিভ বেরোলো ইঞ্চি ছয়েক। তখন সাধু ওর বুকে বসে পড়েছে।

শীতের এক ঠাণ্ডা সকালে খাগড়ির সোঁতার বালিতে চাঁদতারণ বাসনওয়ালার খুব সহজেই মৃত্যু হল। সাধুর এ কারিগরী দক্ষতার কোন তুলনা নেই।

তার ঠোঁটের কোনায় অজান্তেই তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। পটুয়া যেমন তার হাতের আঁকা ছবির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, তার চোখে ঠিক সেই দৃষ্টি। তারপর তার হুঁশ এল।

মিস্ত্রীর কাজ শেষ, এখন আবর্জনা নিয়ে ঝামেলা—এই রকম তিতিবিরক্ত মনোভাব নিয়ে সাধু উঠে দাঁড়াল। খয়েরি মাফলারটা তখনও বাসনওয়ালার গলায় পেঁচানো আছে। খুলে নিতে দেরি করা ভালো। বলা যায় না, অনেকের প্রাণ খুব শক্ত। সহজে যেতে চায় না। সাধুর মধ্যে দু'এক মিনিট ধরে যে শান্ত-সুস্থ ভাবটা এসেছিল, এবার চলে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে। না—কেউ কোথাও নেই।

আবর্জনা সামলাবার ব্যবস্থা ঝটপট করে ফেলতে হবে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে সোঁতার ডাইনে বাঁয়ে তাকাল। তারপর ঝাঁকার দিকে ঝুঁকে গেল। হ্যাঁ, জব্বর একটা জিনিস পাওয়া গেছে। সে খপ করে হাত বাড়িয়ে বাসনকোসনের তলা থেকে একটা বড় পেতলের খুন্তি টেনে বের করল। নরম বালি খোঁড়ার কাজ ভালই হবে।

সে মাফলারে হেঁচকা টান দিয়ে বাসনওয়ালাকে মাটি ছাড়া করে ফেলল। তারপর বালির চড়ায় তাকে টানতে টানতে এগোল। দৌড়বার চেষ্টাও করল। কিন্তু লোকটা মরার-পর বেজায় ওজনদার হয়ে উঠেছে যেন।

বালিতে টানার স্পষ্ট দাগ পড়ে যাচ্ছিল। কিছু দূরে বাঁকটা পেরিয়ে সাধু হাঁফাতে থাকল। রক্ত ততক্ষণে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে তার। রাগ, বিরক্তি ও খাটুনির চোটে সে ক্রমশ ক্ষেপে যাচ্ছিল। ঠোঁট কামড়ে এবং থেমে মনোমত জায়গা খুঁজছিল। উদ্বেগও বাড়ছিল। হঠাৎ কেউ আবার না ওখানে এসে পড়ে! বাসনগুলো পড়ে আছে। আর কিছু না করুক, অমন অরক্ষিত অবস্থায় দু'একটা চমৎকার কাঁসা হাতিয়ে কেটে পড়তেও তো পারে!

বালিয়াড়ির ধারে লেজ নাচিয়ে কয়েকটা পাখি এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। জলের ফালিটা একখানে বাঁকের খোঁদলে ঢুকে গভীর হয়েছে এবং দাম গজিয়েছে, সেখানে একটা বক এক ঠ্যাঙে চুপচাপ বসে আছে। সে যেন সাধুর দিকে লাল চোখ মেলে একবার তাকাল। তার ওপরেই ঘন নলখাগড়ার ঝোপ। ঝোপের ডগায় এক ঝাঁক বনচড়ুই চাপা স্বরে কথা বলছে। সাধু সেদিকে গেলে ফরফর করে আচমকা ঝাঁকটা উড়ে পালাতেই ভীষণ চমকে উঠেছিল।

হ্যাঁ, এ জায়গাটা মন্দ হবে না। লাশটা টেনে কিনারার ব্যানাঝোপে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর বালির চড়ায় খুন্তি দিয়ে পাগলের মতো খুঁড়তে শুরু করল। বালির ওপরটা শুকনো, কিন্তু তলার দিকটা ভিজে। জমাট বেঁধে আছে। সাধুর ঘাম বেরোতে থাকল। হাতচারেক লম্বা আর হাতখানেক চওড়া গর্ত করতে হবে। অন্তত হাত চারেক গভীর না করলেও চলবে না। কম সময়ের মধ্যেই গর্তটা হয়ে যাবে মনে হচ্ছিল।

গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে ক্রমশ জল জমছিল। সাধু এতে আরও ক্ষেপে যাচ্ছিল। তারপর তার মনে হল, দূর ছাই! যে লোক মরে গেছে—সে জলে শোবে না শুকনোতে শোবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন

মানে হয় না।

খুঁড়তে খুঁড়তে সে মাঝে মাঝে দূরে বাসনের ঝাঁকাটা দেখে নিতে ভুলছিল না। এতক্ষণে কয়েকটা লেজ-নাচানো পাখি ওখানেও এসে গেছে। তারা দিব্যি ঘুরে-ঘুরে নাচছে সেখানে। রাগ ও বিরক্তির মধ্যেও সাধুর হাসি পেল। পাখিগুলো যেন মেলার ঝুমুরদলের ছুঁড়িগুলো।

আর মেলার ঝুমুরদলের কথা মনে পড়তেই এক সুন্দর আনন্দে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বাসনগুলো ভালয় ভালয় ঝাড়তে পারলে অনেক টাকা পাবে। আঃ, জেল থেকে বেরিয়ে সে পয়সার মুখ দেখেনি! এবার সত্যি সত্যি ব্রহ্মপুরে মেলায় যাবার একটা সুযোগ এল বটে! জয় মা কালী! জয় বাবা গুরু! মুখ তুলে তাকিও বাবা বেচারা সাধুর দিকে।

কবর প্রায় হয়ে এসেছে, হঠাৎ তার কানে এল কোথায় কে যেন টানা সুরে গান করছে। উত্তুরে হাওয়ায় গানটা খুব ছাড়াছাড়াভাবে শোনা গেল। চমকে উঠে সাধু দাঁড়াল। তার বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। সর্বনাশ! একটা ছই-দেওয়া গাড়ি আসছে পুবের সেই ভাঙা বাঁধের কাছে। তারই গাড়োয়ান চাষাড়ে গলায় গান গাইছে। সাধু আছে উত্তর-পশ্চিম কোণে। সূর্যের ছটা বাঁচাতে একটা হাত কপালে রেখে সে দ্রুত দেখে নিল ব্যাপারটা। গাড়িটা ধীরে-সুস্থে খড়ের জঙ্গলে এগোচ্ছে। বাঁধের কুলঝোপের কাছে দুটি মেয়ে—বেশ বড়সড় মেয়েই মনে হল—কারণ শাড়ি পরে আছে, তারা পাকা কুল পেড়ে কোঁচড়ে ভরছে। গাড়োয়ানের পেছনে কে উঠে দাঁড়িয়েছে—পুরুষমানুষ—ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে, পিছন ফিরে সম্ভবত মেয়ে দুটোকে ডাকাডাকি করছে।

সাধু দেখল, যা করার এখনই করে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। উরু অবধি গর্ত হয়েছে। এতেই বাসনওয়ালাকে শোয়াতে। হবে। কিছু শেয়াকুল কাঁটার ডালপালা দিতে পারলে শেয়ালে তোলার ভয় থাকত না। কিন্তু সময় নেই আর। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলল। তার ওস্তাদ বাহাদুর বলেছিল, লাশের তলপেটে ফুটো করে দিলে পচতে বা গন্ধ ছড়াতে দেরি হয়।

তক্ষুনি বাসনওয়ালাকে এক টানে কবরে ফেলে দিল সাধু। তার তলপেটটা চাকু চালিয়ে ফুটো করে দিল। চাকুর কালচে রক্ত কবরের জলেই ধুয়ে নিল। তারপর দুহাতে বালি ভরতে ব্যস্ত হল।

ওপরটায় জল ছড়িয়ে স্বাভাবিক করে দিল সে। এখন ওই টানাহেঁচড়া দাগটা নিয়ে কী করা যাবে, ভাবনায় পড়ল। ততক্ষণে ছই-দেওয়া গাড়িটা খাগড়ির কাছাকাছি এসে গেছে।

যতটা পারে, দুই পা চালিয়ে দাগটা এলোমেলো করে দিতে দিতে সে দ্রুত বাসনের ঝাঁকাব দিকে এগোচ্ছিল। এসময় সাধুকে দেখলে সবাই ভাবত—এই ধেড়ে ছোকরাটার মাথায় যেন আজগুবি ভূত চেপেছে।

ওইভাবে যেতে যেতে হঠাৎ তার খেয়াল হল—ওই যাঃ। খুন্তি আর তার মাফলারটা চাঁদতারণের কাছে রয়ে গেল যে। আফসোসে ক্ষুব্ধ হল সে। মাফলারটা খাঁটি পশমের। বহরমপুর জেল থেকে বেরিয়ে এক চায়ের দোকানে বসার সময় ওটা মেরে দিয়েছিল। যার মাফলার, সে ছিল এক শৌখিন ব্যাপারী—গ্রামেরই লোক। দুপুরবেলা রোদে বেঞ্চের ওপর খুলে রেখে চা খাচ্ছিল আর পাটের দর নিয়ে বেজায় বকবক করছিল। সাধু ওটা হাতিয়ে কেটে পড়লেও সে টের পায়নি। এ জিনিস কিনতে আবার কয়েকটা টাকা খসবে। ফাঁসের এমন অস্ত্র আর হয় না। খুব আফসোস হতে থাকল সাধুর।

আর খুন্তিটাও কমপক্ষে পোয়াটাক ওজন—নাকি তারও বেশি। বাজারে পেতলের কত দর কে জানে। সাধু অগত্যা বাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্ষোভটা ভুলতে চাইল। সেইসময় আচমকা তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বাপ্‌স! কী প্রচণ্ড ছটা এসে চোখে পড়েছিল! প্রায় কানা হবার উপক্রম! চোখ দুটো মুছে আর ওদিকে তাকাতে সাহস পেল না সে। মনে হল, বিবাট আর ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল বাজের আগুন যেন মারাত্মক হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আরো কাছে গিয়ে তার অস্বস্তিটা কেটে গেল। হুঁ—সেই কাঁসার ঘণ্টাটা! বালির ওপর পড়ে আছে আর সূর্যের ছটা প্রতিফলিত হয়ে ওই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। পলকে সাধুর মন অগাধ আনন্দে ভরে গেল।

ছই-দেওয়া গাড়ির গাড়োয়ানের গান সমানে ভেসে আসছিল। সাধু বাসনের কাছে এসে ধুপ করে বসে পড়ল। এবার ঐ গান, শীতের মিঠে রোদ, চাপা পাখপাখালির ডাক, কাশবনের শব্দ আর বিশাল

খোলামেলা আকাশের তলায় এই পৃথিবীর সবকিছু মিলে সাধুকে আনন্দময় একটা শান্তি দিচ্ছিল।

এই শান্তির কাছে খুন্তি, মাফলারটা এবং বাসনওয়ালার তুলোর কম্বল, জামাকাপড়—এমন কি তার কোমরের থলেটা কবরে সাত তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলার আফসোস আর পাত্তা পাচ্ছিল না। থলেয় পয়সাকড়ি নিশ্চয় বেশি ছিল না। থাকার কথাও নয়। এই ভেবেই সে তার খুশির হাওয়াটা জিইয়ে রাখল। চাপা শিস দিতে থাকল সে।

তারপর সাধু বড় স্নেহে বাসনের ঝাঁকাটা আঁকড়ে ধরল। তখন দেখল, বাঃ! একটা ন্যাকড়ায় মুড়ি বাঁধা রয়েছে যে! সে মুড়ির পিণ্ডটা তুলে গিঁট খুলতে গিয়ে লক্ষ্য করল, চাঁদতারণ ন্যাটা ছিল। পেতলের দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারাও নজরে এল তার। লোকটা খুব হিসেবী ছিল বোঝা যাচ্ছে। গেলাসের মধ্যে পেতলের ছোট বাটখারাগুলো কেমন সাজিয়ে রেখেছে! নাঃ পরে সব দেখাশুনো করা যাবে। সাধু মুড়ি চিবুতে থাকল। হুঁ, মুড়ির মধ্যে পাটালিও রয়েছে দেখছি! পাটালিতে কামড় বসিয়ে তার চোখ পড়ল বাসনওয়ালার জুতো দুটোর দিকে। উপরি লাভ। নিজের ছেঁড়া স্যান্ডেল দুটো তক্ষুনি বাঁহাতে সে ছুঁড়ে ফেলল কাশবনের মধ্যে। তারপর পাম্পসু দুটোয় পা গলাল। একটু আঁটো হচ্ছে। তা হোক্। জুতো দুটো ধুলোয় নোংরা দেখালে কী হবে, বেশিদিনের কেনা জিনিস নয়। এটাই আশ্চর্য লাগে, মানুষের কোন্ ব্যাপারে যে প্রচণ্ড শৌখিনতা থাকে, বলা কঠিন! এই সাদাসিধে হিসেবী—হয়তো হাড়কিপটেও বটে, এমন লোকের শখ ছিল পায়ের জুতোয়! পালিশ করলে খুব কাপ্তেনগোছের দেখাবে।

মুড়ি চিবুতে চিবুতে সাধু নিজেকে বলল—তাহলে ব্যাটা সাধু! তুমি এখন হলে মোহনপুরের বাসনওয়ালা! কেমন?

সাধু হাসি ও মুড়ি মুখে রেখেই তাকাল এবং তাকিয়েই রইল। ওপারে কাশবনের ফাঁকে রাস্তায় আচমকা বেরিয়ে এসেছে দুটি মেয়ে। সেই কুলখাকি মেয়ে দুটোই বটে—এবং থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, সাধুকে দেখছে।

রঙীন ঝকমকে শাড়ি আর পায়ে জুতো পরা এই মেয়ে দুটো যে বাবুবাড়ির তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবত দুই বোন—সাধু আন্দাজ করল। আন্দাজ হাত তিরিশের বেশি দূরে নেই ওরা—এই দূরত্বের মধ্যে হাত দশেক জল আছে। ওরা জলের জন্যে দাঁড়ায়নি তা ঠিক। সাধুকে দেখছিল। সাধু অস্বস্তিতে পড়ে ভাবল—কিছু কি গোলমাল দেখাচ্ছে এখানে? অমন ভ্যাবলার মতো হাঁ করে থমকে থাকার আছেটা কি?

সাধু নিজের কাছাকাছি জায়গাটা দ্রুত দেখে নিয়ে মুড়ি চিবুতে ব্যস্ত হল। মেয়ে দুটির দিকে চোখ রাখতে ভুলল না অবশ্য। তারপর ওদের গাড়িটা এসে গেল পিছনে। গাড়োয়ান গান থামাল সঙ্গে সঙ্গে। তার পিছনের বাবুটির মাথায় কাঁচাপাকা চুল—গায়ে সাদা শাল।

মেয়ে দুটি এবার নেমে এল জলের ধারে। গাড়োয়ান সাধুর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল—এই দাদা? কতটা জল হবে?

সাধু মুখে জবাব দিল না—মুড়ি ধরা ডান হাতটা তুলে ইশারা করল—চলে এস। জল কম।

মেয়ে দুটি জলে নামতে সংকোচ বোধ করছিল। হাসতে হাসতে পরস্পরকে ঠেলে দিচ্ছিল। গাড়িটা উঁচু থেকে নেমে এলে বাবুটি বললেন—তোরা গাড়িতে উঠে আয়। জলে নামিস নে! রামু, গাড়ি দাঁড় করা, বাবা। অ্যাই সিমি! আয় তোরা।

ততক্ষমে একটি মেয়ে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে জলে পা বাড়িয়েছে এবং তা করতে গিয়ে তার কোঁচড়ের একরাশ পাকা কুল পড়ে গেছে। অন্য মেয়েটি তা কুড়োতে শুরু করলে সে তেড়েমেড়ে ডাঙায় ফিরল। তারপর কাড়াকাড়ি চলতে থাকল।

—অ্যাই সিমি? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! বাবা দেখেছ, তোমার মেয়ের কাণ্ড? মেরে ফেলব বলছি!

সাধু হো হো করে হেসে ফেলল।

গাড়িটা ওদের পাশ দিয়ে জলে নামল। তারপর জল পেরিয়ে বালির চড়ায় পৌঁছলে বাবুটি বলে

উঠলেন—অ্যাই রামু এখানেই বরং জলটল খেয়ে নেওয়া যাক্। কি বলিস? কোমর ব্যথা করছে রে! কিছুক্ষণ পায়চারি করব। রমা! নামবে নাকি?

ছইয়ের ভিতর থেকে অসম্ভব ফরসা এক মহিলা মুখ বের করলেন এতক্ষণে। জায়গাটা দেখে নিয়ে বললেন—ভাল জায়গা। বেশ নিরিবিলি!

—তোমার শুধু নিরিবিলিই পছন্দ। বলে বাবুটি হেসে ফেললেন।

গাড়ি থামিয়ে গাড়োয়ান নামল। গরু দুটোকে খুলে দিল জোয়াল থেকে। তারপর সাবধানে ধরে সামনের দিকটা চড়ায় নামাল। গরু দুটো চলে গেল জলের ধারে। চোঁ চোঁ করে জল খেতে থাকল। গাড়োয়ান সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল—এই শীতের দিনেও ব্যাটাদের তেষ্টায় পেরান যাচ্ছিল!

বাবু এবং তাঁর স্ত্রী নামলেন। নেমে বালির চড়ায় দাঁড়ালেন। মেয়ে দুটি এতক্ষণে দৌড়ে এসে গেল। একজন বলল—এখানে পিকনিক করো না বাবা! কি মজা হবে!

অন্য মেয়েটি তাতে সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ বাবা, জলটল আছে। কেমন সুন্দর জায়গা।

সাধুকে ওরা দেখেও দেখছিল না। এতে সাধুর মনে খানিকটা স্বস্তি হচ্ছিল। সে মুড়িটা আধখাওয়া গুটিয়ে আঁটো পাম্পস্ পরা পা কষ্টেসৃষ্টে ফেলে জলের দিকে এগোল। টের পাচ্ছিল, এই জুতো পরে হাঁটাচলা তার পক্ষে আপাতত অসম্ভব। স্যান্ডেল দুটো ঝোকের মাথায় ফেলে খুব ভুল করেছে।

ধীরে সুস্থে জল খেয়ে সে একবার উত্তরে বাসনওয়ালার কবরের জায়গাটা দেখে নিল। তারপর বাসনের কাছে ফিরল।

ফিরেই দেখল মহিলা ও বাবুটি তার বাসনের ঝাঁকার কাছে দাঁড়িয়ে খুব নিবিষ্টমনে বাসনকোসন দেখছেন। তারপর মহিলাটি ঝুঁকে একটা কাঁসার সুদৃশ্য রেকাবি তুলে নিলেন। সাধুর বুক ঢিপ ঢিপ করল।

বাবু বললেন—বাঃ! বেশ রেকাবি তো? ফুলকাঁসা নাকি হে? খাগড়ার মাল?

সাধু মাথা নাড়ল।

মহিলা বললেন—মতিঠাকুরপো কি রেকাবি আনল, একগাদা দাম—আমার পছন্দই হয় নি! তা কি করব তখন? সেজবাবুর নাতি বলে কথা! অন্নপ্রাশনে আর দেবটাই বা কি? শুনলুম, কথা হয়েছে। সেজ বৌ বলেছে—হুঁ, রমাদির কি সেদিন আছে? এখন দায়সারা করেই খালাস! টাকা হয়েছে কি না!

কর্তা বললেন—ওরা ওইরকমই লোক। ছেড়ে দাও!

গিন্নী বললেন—হ্যাঁ গা, এই রেকাবিটা নিই না!

কর্তা বললেন—নেবে? পছন্দ হচ্ছে? ওহে বাসনওলা? কোথায় বাড়ি তোমার?

সাধু ঘামতে ঘামতে বলল—আজ্ঞে, মোহনপুর।

—মোহনপুর! অদ্দূর থেকে বাসন ফিরি করতে এসেছ? অ্যাঁ। তোমার সাহস তো বড় কম নয়! বলে উনি হেসে উঠলেন।

সাধু নিরীহ মুখে বলল—কেন বাবু?

—আরে! এই জঙ্গলে মানুষ মারা খাঁ খাঁ রাস্তায় এসেছ—তাই বলছি। প্রায়ই শুনি রাহাজানি হয়!

সাধু হাসল।—বাবু, আপনারা এলেন যে? ওনাদের গায়ে অতসব গয়নাপত্তর রয়েছে! আপনার ভয় করল না বাবু?

—আমার কাছে বন্দুক আছে! বলে কর্তাবাবু গাড়ির ভিতর থেকে সত্যি সত্যি একটা বন্দুক নিয়ে এলেন!—দেখছ তো? দোনলা বন্দুক।

সাধু ভক্তিতে গলে গিয়ে বলল—তাই বলেন! বাবু, বন্দুকে পাখি মারেন না?

বাবু জবাব দেবার আগেই গিন্নী বললেন—বাসনওলা! এটা আমার পছন্দ হয়েছে। নেব। নাও, দরটর বলো বাপু!

সাধু এতক্ষণে চমকাল। সর্বনাশ! দর তো জানে না। কি বলতে কি বলে বসবে যে! কিন্তু পরক্ষণেই সহজাত ধূর্ততা এসে তার বুদ্ধির দরজা খুলে দিল। সে সোৎসাহে বলে উঠল—নেবেন গিন্নীমা? বেশ তো! নিন না। আপনাদের কাছে আবার দরদাম? যা দেবেন—দিন না!

গিন্নী হেসে খুন। ওরে বাবা! এ যে দেখছি চাঁদতারণের চেয়েও এককাঠি সরেস! হ্যাঁ গা, চাঁদতারণও তো মোহনপুরের লোক না?

সাধু আবার চমকে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। কর্তা বললেন—কে ? চাঁদতারণ? মানে—ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ওহে, চাঁদতারণকে চেনো না?

সাধু অস্ফুটস্বরে বলল—খুব চিনি আজ্ঞে। শিউলী নামে তার একটা মেয়ে আছে। বিয়ের জন্যে....

গিন্নী হাসতে হাসতে বললেন—তোমাকে পাত্র বলে ধরেছে বুঝি ? ভালই তো! তা বল বাপু, কি দরটর নেবেটেবে।

সাধু বলল—ওই তো বললুম গিন্নীমা। হাতে তুলে ছেলেকে যা দেবেন, নেব। পছন্দ হয়েছে, আর আমি তাই নিয়ে দরদাম করব?

কর্তা ওদিকে গাড়োয়ানের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করেছেন। বোঝা যাচ্ছিল এখানেই দুপুরের রান্নাটা সেরে নেওয়া হবে। মেয়ে দুটি উৎসাহে চঞ্চল হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছিল।

গিন্নী বললেন—তা কি একটা কথা হল বাবা? বলো, কি দর নেবে?

—আপনারা কত দামে কেনেন বলুন? এ তো ফুলকাঁসা—নিজের মুখে বলেছেন!

—আচ্ছা, ওজন তো করো।

সাধু আনাড়ী হাতে ওজন করতে অনেক মেহনতে পড়ে গেল। শেষ অবধি তিন পোয়া দাঁড় করিয়ে দিল। গিন্নী বললেন—সেদিন মুখে ভাতের জন্যে খাগড়ার থেকে কিনে আনিয়েছিলাম—পাক্কি আধসের ওজন, তিন টাকা আট আনা পড়ে ছিল। তোমাকে আমি মোটমাট পাঁচ টাকার বেশি দেব না বাবা!

সাধু মাথা নুইয়ে বলল—আপনার আশীর্বাদ, মা। যা দেবেন, নিয়ে ধন্য হবো।

গিন্নী ব্যস্ত হয়ে কর্তাকে ডাকাডাকি শুরু করলেন। সাধু বুঝল, দরটা বেজায় সস্তা হয়ে গেছে। যাক্, নগদ পাঁচটা টাকা পাওয়া এখন খুব ভাগ্যের কথা। সে খুশি হয়ে শিস দিতে থাকল—চাপা শিস। বরাবর এই তার আনন্দের প্রকাশ। ......

দুই

—দেখ, দেখ। ওগুলো কি পাখি, বাবা?

ছোট বোন বাবার বন্দুক-সুদ্ধ হাতটা ধরে প্রশ্ন করছিল। কর্তা উত্তর-পূর্বের আকাশ দেখতে দেখতে জবাব দিলেন—ওইগুলো? শকুন-টকুন হবে!

—গুলি কর না বাবা!

এই শুনে কর্তা হো হো করে হেসে উঠলেন। আর বড় বোন গাড়ির কাছ থেকে দৌড়ে গিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। —এ মা! সিমি শকুন খাবে! শকুন খাবে!

—শকুন! সাধুর চোখ গেল এতক্ষণে। হুঁ, অনেক উঁচুতে একটা ঝাঁক ঘুরে ঘুরে নেমে আসছে। তার চোখ নিষ্পলক হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে চাপা অস্থিরতা জাগল। চাঁদতারণের মাংসের গন্ধ, টের পেয়ে গেছে ব্যাটারা? কিভাবে টের পেল? উৎকণ্ঠায় সে তাকিয়ে রইল শকুনগুলোর দিকে। যদি ওরা সত্যি এই সোঁতার ওপর নেমে আসে, তাহলে কী হবে?

সে দ্রুত ঝাঁকাটা সাজাতে ব্যস্ত হল। এক্ষুনি কেটে পড়া দরকার। সেই সময় গিন্নীমা এসে গেলেন আবার।—ওগো বাসনওলা ছেলে! শোন—আর দু-একটা জিনিস নেব। সিমি, তোর বাবাকে ডেকে দে এখানে!

কর্তা জলের ধার থেকে শুনে বললেন—তোর মাকে বাজারের নেশায় ধরেছে সিমি! কি কাণ্ড !

গিন্নী ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—তুমি থামো! ঘর-গেরস্থালীর বোঝোটা কি, শুনি? চিরদিন তো বাইরে বাইরে কাটিয়েছ। কোর্টকাছারী করেছ। কিসে কি লাগে, জানো?

কর্তা ভড়কে গিয়ে এগিয়ে এলেন।—কি মুশকিল! এই রাস্তার মধ্যে! ....

মুশকিল কিসের? মেয়েদের বে দিতে হবে না? দানসামিগ্রী লাগবে না? এখন থেকে কিছু কিছু করে কিনে রাখাই ভালো। ওগো ছেলে, ওই থালাটা ওজন করো।

কর্তার লম্বা ছায়াটা সাধুকে ঢেকে রেখেছিল। গিন্নীমা ঝাঁকার পাশে হাঁটু দুমড়ে বসেছেন। সাধু দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা নিয়ে বাসনটা ওজন করতে ব্যস্ত হল। কিন্তু আড়চোখে উত্তর-পুবের শকুনের ঝাঁকটা দেখতে ভুলল না। শকুনগুলো কোথায় নামবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না। এই সময় দুবোন দৌড়ে এসে মায়ের দুপাশে বসে পড়ল।

হঠাৎ সাধুর চোখ আটকে গেল গিন্নীমার হাত দুটোতে। সে হাতের সৌন্দর্য দেখছিল না। দুটো মোটা বালা আর এক গোছা চুড়ি তাকে লোভী করছিল।

সাধু চোখ ঘুরিয়ে দুবোনের দিকে তাকাল। দুটো করে বালা তাদের হাতে আছে। কানে বড় বড় রিং আর গলায় হার আছে।

সাধু আনমনা হয়েছিল। কর্তা বলে উঠলেন—ও কি চাপিয়েছ হে! তুমি দেখছি বেজায় আনাড়ী। অতবড় বাসন কি পোয়ায় খায়? সের চাপাও।

বিজ্ঞ মানুষ নিঃসন্দেহে। সাধু অপ্রস্তুত হয়ে হাসবার চেষ্টা করল। দুদিকেই টাল খাচ্ছে পর্যায়ক্রমে। এ এক সমস্যায় পড়া গেল বটে।

কর্তার দিকে চোখ টিপে গিন্নী ধমক দিলেন—তুমি থামো তো!

কর্তা হাসতে হাসতে বললেন—কদ্দিন ব্যবসা ধরেছ হে? নতুন—তাই না? একটা কথা বলি শোন। যখন কাজ থাকবে না, ঘরে বসে বসে ওজন প্র্যাকটিস করবে।

মেয়ে দুটি খিল খিল করে হাসতে থাকল। সাধুর কান লাল হয়ে গেল। মনে মনে বলল—পেতাম একলা-দোকলা। হাসি বেরিয়ে যেত।

ছোট মেয়ে বলল—এই রে! বাসনওলার রাগ হয়েছে বাবা, তোমার কথা শুনে। কেমন তুম্বো হয়ে গেছে মুখখানা।

বড় মেয়ে তাকে চিমটি কাটল।—আঃ কি হচ্ছে! সিমি, বড্ড ফাজিল হয়েছিস তুই!

না, শকুনগুলো এদিকে নামল না। দূরে কোথাও নামল। এই সাতসকালে কোথাও মড়া পেয়ে গেছে নির্ঘাত। সাধু ভগবানের এই ব্যাপারটা বোঝে। ভগবান সবাইকে সব জুটিয়ে দেন। আজ বাসনওলাটাকে না পেলে তাকে তো সেই মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে কাটাতে হত। পরের ঘাড়ে বসে খেতে হত। ভগবান বড্ড দয়ালু। সাধুকেও ভোলেন না। কখনও ভোলেননি। সাধুন যখন ভীষণ বিপদে পড়েছিল—না খেয়ে মারা পড়ার দাখিল, দয়া করে তিনি জেলে পাঠিয়েছিলেন। নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খাওয়া আর মাথার ওপর ছাদ তো এই পৃথিবীতে সহজে মেলে না।

তবে, খাওয়া ও ছাদের তলা মিলে যাবার পরও মানুষের আরও অনেক ইচ্ছে থেকে যায়। সাধুরও থাকে। সেটাই হয়েছে মুশকিল।

গিন্নীমার সঙ্গে দরাদরি করল না সাধু। যা দিলেন, তাই নিল। দুটো থালা, দুটো গেলাস আর তিনটে নকশা-কাটা বাটির বদলে গিন্নি কুড়িটা টাকা দিলেন। সাধু মোট পঁচিশ টাকা পেয়ে সুখে গলে গেল। ভারও কমেছে ঝাঁকার। নিলে সবগুলোই দিতে রাজি ছিল সে। কিন্তু মুখ ফুটে নিজে বললে পাছে সন্দেহ হয়, তাই সে কথা বলার লোভ সামলে নিল সে।

মেয়ে দুটি ঝাঁকার কাছে বসেই বালিতে ঘর বানিয়ে খেলছে। ধিঙ্গি মেয়ে। বড়টার বিয়ে দিলে তো দু'তিনটে ছেলের মা হত—সাধু বুঝেছে। সে মুখ তুলে চাঁদতারণের কবরের দিকটা দেখে নিল আবার। এই সময় কর্তা হঠাৎ বললেন—কি কাণ্ড। তোমার গলায় পৈতে দেখছি!

শার্টের ফাঁকে পৈতেটা কীভাবে বেরিয়ে এসেছে, সাধু টের পায়নি। নিজের অজান্তে গা চুলকোতে গিয়েই হয়তো বেরিয়ে এসেছে। তবে গা চুলকোবে না? চামড়ার দোষটা কি? সাধু একে ভীষণ জলকাতুরে। ঠাণ্ডায় স্নান করতে ভয় পায়, আজ তিনদিন জেল থেকে বেরিয়েছে। স্নান করা হয়নি। জেলে বাধ্য হয়ে স্নান করতে হত নিয়মিত। শীত পড়লে সে মেটকে ধরে রফা করেছিল। হাতে-মুখে আর মাথায় জল লাগিয়ে স্নান চালিয়ে দিত। তার বদলে খুনী আসামী সেই মেটটার হাত-পা টিপে

দিতে হত। ব্যাটার নাম ছিল জগা। কি জাত কে জানে! অবশ্য জাত নিয়ে সাধু মাথা ঘামায় না।

সাধু অপ্রস্তুত হেসে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্তাবাবু। পৈতে!

—তোমরা যোগী তাই না?

সাধু জানে, যোগীরাও পৈতে নেয়। বাহাদুরপুরের নাড়ু ডাক্তাররা যোগী—পদবী নাম। তাঁরা পৈতে নেন। কিন্তু সাধুর মনে মাঝে মাঝে যেমন করে আচমকা জাতের গুমোর জেগে ওঠে, এখনও জাগল। সে মুখ উঁচু করে জবাব দিল—না কর্তামশাই। আমি বামুনের ছেলে।

—বল কি হে! কর্তা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল যেন। গিন্নী গাড়ির কাছ থেকে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। মেয়ে দুটি খেলা থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সাধুকে দেখতে থাকল। কর্তা বললেন—হুঁ। চেহারা দেখে গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল। তা বাবা, এই ছোটলোকের ব্যবসা ধরলে কেন? ও গিন্নী, শুনছ? এ যে কুলনাশা কালাপাহাড় দেখছি।

গিন্নীর মুখে একটু গভীর প্রশংসার ভাব ফুটে উঠতে দেখছিল সাধু। তার কতখানি আশাতীত জলের দরে বাসন কেনার জন্য, আর কতখানিই বা তার ব্রাহ্মণত্বের জন্য, সাধু বুঝতে পারল না। গিন্নী প্রশান্ত হেসে মিঠে গলায় বললেন—সে সন্দেহ আমারও হয়েছিল। হ্যাঁ গো ছেলে, নাম কি তোমার?

—আজ্ঞে, ভাল নাম শ্রীগোপীনাথ মুখোপাধ্যায়। ডাক নাম সাধু।

—সাধু! কর্তা গিন্নী দু'জনেই হেসে উঠলেন।

সাধু অমনি ভড়কে গেল। ডাক নামেই লোকে তাকে চেনে। সেটা মুখ ফসকে ফাঁস করে দেওয়া মোটেও উচিত হয়নি। তার তল্লাটেই আসল গোপীনাথ মুখুজ্যে নাম খুব কম লোকে জানে। সে সাধু। কুখ্যাত বাটপাড় বদমাশ সাধু গুণ্ডা! হিসেবে বড্ড ভুল করে বসল হয়তো! সে দ্রুত বলে উঠল—আজ্ঞে। ছেলেবেলা থেকে এক সাধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। তখন থেকে লোকে ওই নামেই ডাকে।

—সাধুসঙ্গ করতে! কর্তা আবার হাসলেন।—বেশ, ভালো। খুব বৈরাগ্য হয়েছিল বলো! কেন হে?

—ছেলেবেলায় মা-বাবা মারা যায়। আর কী করব, বলুন?

—লেখাপড়া শেখোনি?

—আজ্ঞে অল্পস্বল্প। পয়সা কোথায় যে শিখব?

—আজকাল লেখাপড়া শিখতে পয়সা লাগে না। বলো, চেষ্টা ছিল না।

—আজ্ঞে, তাও হতে পারে।

—হুঁ, বামুনের ছেলে হয়ে এই লাইনে এসে ভালো করোনি বাপু। বয়স তো বেশি হয়নি। কত হল?

সাধু মাথা চুলকে বলল—তা বিশ-বাইশ হবে। তেইশও হতে পারে।

গিন্নী বললেন—দেখদিকি কাণ্ড। আমার মৃগেন বাঁচলে ঠিক এত বড়টি হত। আহা হা! যার কেউ নেই, তার কত কষ্ট! ওগো ছেলে, কথা শোন বাবা। এসব ছেড়েটেড়ে দিয়ে অন্য কিছু ধরো বরং। হ্যাঁ গো, তুমি ওকে একটা কিছু জুটিয়ে দাও না!

সাধু মনে মনে বলল—হুঁ, ঝাঁকার জিনিসগুলো সব হাতাবার মতলব। বেশ তো! আরও কিছু টাকা দিয়ে নিয়ে নাও না বাবা! বেঁচে যাই তাহলে।

কর্তা বললেন—তোমার বাবার নামটা বলো তো? মোহনপুরে আমাদের মহাল ছিল একসময়। আমার বাবার আমলে। কি নাম তোমার বাবার?

একটু ইতস্তত করে সাধু বলল—ঈশ্বর কালীনাথ মুখুজ্যে। কালু মুখুজ্যে বলত লোকে।

—কালীনাথ মুখুজ্যে! মোহনপুরের? কালু মুখুজ্যে! .... কর্তা ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে বললেন—এক কালীনাথ মুখুজ্যের এক সময় খুব রবরবা ছিল। হরিণমারার কালী মুখুজ্যে। তাকে সবাই বলত কালু মুখুজ্যে। মস্তো পালোয়ান ছিল সে। ডাকাতদের সর্দার ছিল। পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তখন আমি ছিলাম বহরমপুর শহরে। ফৌজদারি আদালতে মোক্তারি করতুম।

সাধুর কপালে ঘাম দেখা দিল। লোকটা মোক্তার! ওরে বাবা, কেঁচো খুঁড়তে যে সাপ বের করে

ফেলছে ক্রমশ। সে তাকিয়ে রইল ওঁর বন্দুকটার দিকে।

—তুমি কোন্ কালীনাথের ছেলে?

সাধুর দম আটকে গিয়েছিল যেন। মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল—আজ্ঞে, হরিণমারারই বটে।

—অ্যাঁ! তুমি সেই কালু মুখুজ্যের ছেলে! কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ!

গিন্নী ঝেঁঝে উঠলেন—আ মর! সর্বনাশটা হল কিসের শুনি? বাপ ডাকাত ছিল বলে ছেলে ডাকাত হবে নাকি?

—ওহে সাধু! এ তো বড় মজার কাণ্ড হল তাহলে। ডাকাতের ছেলে সাধু! অ্যাঁ! ... আবার হো হো করে হেসে ফেললেন কর্তা।

সাধু কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল— আজ্ঞে, কর্তামশায়ের নামটা শুনলে ধন্য হই।

আমি ভবশংকর বাঁড়ুজ্যে! কাঁকনতলার বাঁড়ুজ্যেদের নাম শোননি?

—শুনেছি। খুব শুনেছি।

—আমার বাবা হরশংকর বাঁড়ুজ্যের জমিদারিতে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এখন অবশ্য আমাদের জমিদারি আর নেই। তা সাধু, কথা শোন। দেশে এখন স্বাধীনতার যুগ, বুঝতে পারলে? কতরকম কাজকর্ম চলছে। কত জায়গায় কতশত লোক চাকরি পাচ্ছে। কাকেও ধরে-টরে একটা পিওনের চাকরিও জোটাতে পারোনি? এই ছোট জাতের ব্যবসা ধরেছ! .... হাসতে হাসতে আবার বললেন কর্তা। .. অগত্যা বাপের মতো যদি মানুষের মাথা কাটতে, তাও বুঝতাম হে!

দুই বোন এতক্ষণ কথা শুনছিল। এবার আরেক দফা দুলে দুলে হাসতে থাকল। সাধু আড়চোখে তাদের দেখছিল। বড় বোনের সরু হারটা বুকের ওঠা পড়ায় দুলে উঠছে। গলার নিচে উজ্জ্বল মাংসটা হয়তো খুবই নরম। তার উপর হারটা ঝিলিক দিচ্ছে। কি এক রহস্য যেন ওখানে ছমছম করছে। সাধু বার বার দেখতে থাকল।

ছোট বোন ধূর্ত। এটা টের পেয়েই যেন একটু ঠেলে দিল দিদিকে।

কিন্তু আর না। শীতের সকাল দুপুরের উজ্জ্বলতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে অতি দ্রুত। এখনই কেটে পড়া দরকার। অথচ সাধুর কেমন আলসেমি লাগছে। গা তুলতে ইচ্ছে করছে না। এই মানুষগুলোর মধ্যে কি একটা আছে, যা লোভনীয়, যা এই শীতে সুন্দর তাপের মতো। এদের ঘরে তার জন্ম হলে সাধু কক্ষনো বাসনওয়ালাকে মেরে ফেলত না—অন্তত এমন তার আবছাভাবে এই ধারণাটা মাথায় ভেসে আসছিল।

কর্তা বললেন—সময় করে একবার যেও আমার ওখানে। তোমাদের হরিণমারা থেকে ট্রেনে চাপবে—সিধে গিয়ে নামবে মণিগ্রামে। তারপর মাঠের রাস্তায় আধক্রোশটাক। এখন পাকা রাস্তা। বাস যাচ্ছে বেলডাঙা অবধি। যাবে—কেমন? দেখি, যদি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারি তোমার!

সাধু মাথা নাড়ল।

গিন্নী বললেন—ওগো ছেলে! আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরেই রওনা দেব। বলছিলাম কি এতক্ষণ থাকলে যখন—আমাদের সঙ্গে দুটি খেয়েই যাও না বাবা! আহা স্বজাতির ছেলে। বাবা মা নেই—মায়া লাগে। থেকে যাও বাবা। মাল তো কিছু বেচলে—না হয় আবার কোথাও বেচবে'খন।

ছোট মেয়েটি কি ভেবে বলে উঠল—হ্যাঁ। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

বড় মেয়ে ধমক দিল—জ্যাঠামি হচ্ছে! মা, শুনছ তোমার মেয়ের ডেঁপোমি!

আবার হাসাহাসি পড়ে গেল। কর্তা গাড়োয়ানকে ডেকে বললেন—রামু! বালির চড়ায় উনুন করে ফেল্। কাদা নিয়ে আয়। সিমি, আয় আমরা একটু এগিয়ে দেখি—পাখিটাখি পাই নাকি। মেলার ব্যাপার—রাত না হলে জমে না। সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যাব। আয়।

ছোট মেয়ে বাবার সঙ্গে এগিয়ে গেল। যাবার সময় দিদিকে ভেংচি কেটে গেল। গিন্নী গাড়ির দিকে এগোলেন। রামু গাড়োয়ান একটু দূরে গরু দুটো চরাচ্ছিল। সে তাদের ছেড়ে উনুন পাততে এল।

বড় মেয়েটি সাধুর কাছেই বসে আছে তখনও। বাবার চলে যাওয়া দেখছে। মুখটা গম্ভীর। সাধু

মনে মনে হিসেব করছিল : এই অবশিষ্ট বাসনকোসনের চেয়ে এর গলার হারটা দামী কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন : গাড়োয়ানটার দৌড়বার এবং লড়বার ক্ষমতা কতটা হতে পারে? তৃতীয় প্রশ্ন : এসব কাজ না করে ভবিষ্যতে আরও বেশি লাভের আশা রাখা উচিত কি না?

মীমাংসায় পৌঁছতে না পেরে সাধু বলল—বোনের নাম তো সিমি। তো তোমার নাম কি, দিদি?

মেয়েটি ঘুরল তার দিকে। ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বলল—যাঃ! আমাকে দিদি বলছ কেন? তুমি তো আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমার বরং দাদা বলা সাজে!

সাধু নিষ্পলক তাকিয়ে বলল—বেশ, তাই হল। আমি দাদা। এবার নাম বলো!

মেয়েটি বালিতে নিজের নাম লিখতে লিখতে বলল—ওর নাম সীমা। আমার নাম ঝুমি—মানে ঝুমুর মুখার্জি।

সাধু হাসল। —ছ্যাঃ! ঝুমুর! এ নাম কেন?

—কেন? নামটা ভাল না?

—ঝুমুর খারাপ নাম।

—আর সাধুও ভাল নাম না। সাধু! সন্ন্যাসী সাধু গাঁজাগুলি খায়। ছাই মেখে ভূত হয়ে থাকে। ছ্যাঃ।

সাধু হাসি-তামাশায় জমে গেল।—আমাকে দেখে তাই লাগে বুঝি ? আমার তো জটা নেই। গাঁজা-গুলিও খাই নে। কিন্তু ঝুমুর—মানে, ওই যে আজেবাজে মেয়েরা নাচে গায়। শোননি? খুব খারাপ মেয়ে তারা।

—আমিও তো নাচতে পারি। গাইতে পারি। তাই বলে আমি খারাপ?

—না, না! সাধু প্রশংসার চোখে তাকাল ওর দিকে।...

— ফাংশান হয়—তখন পার্টও করি থিয়েটারে। তুমি করোনি কখনও?

সাধু জোরে মাথা দোলাল। গিন্নীমা জলের দিকে গেছেন—গাড়ির আড়ালে। রামু পাড়ের ঝোপের পাশে বালিতে উনুন বানাতে ব্যস্ত। হাওয়া বাঁচিয়ে উনুন করতে হবে। সীমা তার বাবার সঙ্গে বালির চড়ার বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। ওরা গেছে বাসনওলার কবরের উল্টোদিকে —অর্থাৎ দক্ষিণে ভাটির দিকে। সাধু আবার খুব ঘামতে থাকল। এমন সুযোগ আর হবে না। এক ঝটকায় হারটা ছিঁড়ে দৌড়ে খড়ের বনে হারিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ নয়।

সে বুকে কাঁপন নিয়ে বলল—তোমরা কোন্ মেলায় যাচ্ছ? ব্রহ্মপুর নাকি ?

—হুঁউ। ব্রহ্মপুরে আমাদের মামাবাড়ি। মা জেদ ধরল, তাই আসা হল। আর কদ্দূর জানো?

—আর ক্রোশ তিন-চার বটে।.... বলে সাধু চারদিক ত্রস্তচোখে দেখে নিল।... তা ইয়ে —তোমরা ভাল পথ ছেড়ে এ পথে এলে কেন? কান্দী হয়ে ঘুরে যেতে পারতে।

ওরে বাবা! ও পথে তো আঠারো ক্রোশ। বাবা বলছিল। তার চেয়ে এখন এই রাস্তাটাই তো সোজা নাকবরাবর। তাই না? বাবা বলছিল—এখন এদিকে জল শুকিয়ে রাস্তা হয়েছে। অন্য সময় অবশ্যি ঘুরে কান্দীর পথেই যেতে হত !

সাধু হাত তুলতে গিয়ে তুলল না। ঝুমুর বড়ো করে একটি নিঃশ্বাস ফেলতেই তার গলার নিচে বুকের খাঁজটা দুলে উঠল। সাধুর চোখ আটকে গেল। মায়ায় ভরা কি যেন রহস্য তাকে আচ্ছন্ন করছে বার বার। রক্ত চনমন করছে।

ঝুমুর মুখ নামিয়ে বালিতে আঁকজোক কাটছে। সে সাধুর চোখের এই সব দেখতে পাচ্ছিল না।

সাধু ডাকল—ঝু...ঝুমুর!

—উঁ?

—তুমি লেখাপড়া করো, না? কোন্ কেলাসে?

—স্কুল ফাইনাল দেব এবারে।

একটু হাসল সাধু—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখে কী করবে? চাকরি?

—অত ভাবিনি, বাবা! ওসব ছেলেরা ভাববে।

ঠিক তখনই দূরে বন্দুকের শব্দ হল। কাশবন থেকে এক ঝাঁক বুনোপায়রা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালিয়ে গেল। কি সব হুলস্থূল ঘটে গেল চারদিকে। একটা ধারাবাহিক শান্ত শব্দহীনতা ছত্রখান করে জেগে উঠল উপদ্রব। আর সাধু সঙ্গে সঙ্গে তার হিংস্র হাতটা নামিয়ে নিয়েছে। হাতের কাঁপুনি সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে সে। আর একটু এদিক ওদিক হলে....

হ্যাঁ, বন্দুকটা না ছোঁড়া হলে অন্য একটা হুলস্থূল পড়ে যেত। সাধুর শরীর অবশ হয়ে গেল। উরু দুটো ভারী বোধ হল। কয়েক মুহূর্ত তার চোখে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে পড়ল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—এই বাসনওয়ালা দাদা! তুমি আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মপুরে যাবে না?

সাধু ধরা গলায় বলল—কেন?

—বা রে! মেলা দেখবে। বাসন বেচবে।

সাধু বলল—না।

তারপর উঠে দাঁড়াল। নিজেকে এমনিভাবে হঠাৎ কেন যে তার তুচ্ছ মানুষ লাগে, কেন এত অসহায় আর ভিখিরি-ভিখিরি, সে বুঝতে পারে না। গিন্নীমার ওপর অনেক আগেই সে চটে ছিল মনে মনে, কারণ আহা বলে দয়া দেখিয়েছিল—এখন এই মেয়েটির ওপরও চটে খাপ্পা হয়ে গেল সে। তার বাবার বন্দুক আছে!

ঝুমুর বলল—ওকি! তুমি চলে যাচ্ছ যে! মা তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলল না? ও মা! বাসনওয়ালা চলে যাচ্ছে!

সাধ হিংস্র হাতে অস্ফুট গর্জন করে ঝাঁকাটা মাথায় তুলেছে ততক্ষণে। তারপর সটান ঘুরে হাঁটতে শুরু করেছে।

গিন্নী পেছনে কি বলছেন মনে হল—স্পষ্ট শোনা গেল না। খড়ের বনে উত্তরের হাওয়া ভীষণ শনশন করে দুলে বেড়াচ্ছে। সাধুর কানে এল, ঝুমুব চেঁচাচ্ছে—বাসনওলা! ও বাসনওলা দাদা! তোমার জুতো—জুতো নিয়ে গেলে না!

সাধু ফিরল না। গাড়ির চাকার দাগ কোথায়? রাস্তাটা খুঁজে না পেলেও তার কি এসে যায়! জায়গায় জায়গায় খড় কাটা হয়েছে। পায়ে বিঁধছে কাঁটার মতো। বিঁধুক। সোজা নাক-বরাবর এগোল সে। দূরে দিগন্তে উঁচুতে ঝাপসা গ্রামরেখার দিকে গতি তার।

—বাসনওলা হে—এ—এ—এ! জু...তো...ও—ও—ও।

ব্যাটা রামু গাড়োয়ান ডাকছে। বাবুর হাতে বন্দুক না থাকলে আজ খাগড়ির সোঁতার বালিতে অনেকগুলো মড়া পুঁততে হত। মেহনত হত তো বটেই। তার বদলে সাধু যে রাজা হয়ে যেত!

গুড়ুম করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। দূরে পিছনে বাঁ দিকে কোথাও—সব শান্তি ছত্রখান হল। আকাশ কাঁপিয়ে চলে গেল বুনো হাঁসের ঝাঁক। ঝাঁকটা সোজা পশ্চিমে যেতে যেতে ঘুরে দক্ষিণ মুখি হল। পশ্চিম থেকে একদল কাক আসতে আসতে আচমকা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে উত্তরে পালিয়ে গেল। খাগড়ির খড়ের জঙ্গল আর জলাভূমি জুড়ে উপদ্রবটা কিছুক্ষণ মাতামাতি করে ফুরিয়ে গেল। তারপর শুধু উত্তুরে হাওয়ার টানা শনশন শব্দ, ব্যানাকাশের দুলে-দুলে ছেনালিপনা, রোদের গরম পেয়ে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার ঘাসফড়িঙের চিরিক্ চিরিক্ ডাক, আর সাধুর পায়ে খড়খড় আওয়াজ উঠছে তালে তালে—আনাড়ি কাঁধ কষ্ট নিয়ে [illegible] বইছে, তাই মুখ বাঁকা করে ছোটা টাট্টুর মত দেখাচ্ছে সাধুকে।

মাঠ ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। খড়ের জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বাবলার গাছ আর ঝোপ ঝাড় দেখা যাচ্ছে। বাবলাগাছের ধার মাড়াল না সাধু। জানে, তলায় কাঁটার জঙ্গল হয়ে আছে। একটু পরেই আবাদী মাঠের সবুজ ও হলুদ রঙের ছবি তার চোখে পড়ল। সরষের ফুলে ভরে আছে মাঠটা কচি গমের ক্ষেত তরতর করে কাঁপছে। সাধু দাঁড়াল।

সাধু পিছনে ঘুরল এতক্ষণে। বাঁড়ুজ্যে পরিবার একেবারে অদৃশ্য। শুধু গাড়ির ছইটা দেখা যাচ্ছে। সাধু দাঁতে দাঁত ঘষে বলল—শালারা বন্দুক দেখাচ্ছে। তারপর পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে একটুখানি ভাবল।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সাধু সুযোগ থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে একটুও দেরি করে না। ঝাঁকা নামিয়ে রেখে সে একটা চিতাবাঘের মতো ঘাপটি পেতে এগোল কাশবনের দিকে—যেখান থেকে এইমাত্র সে বেরিয়ে এসেছে।

হাঁটু দুমড়ে বসল সে। দেশলাই জ্বেলে ফেলে দিল। শীতে কাশ ব্যানা কুশ শুকোতে শুরু করেছে। সে জানে, এবার কয়েক ক্রোশ এলাকায় কি মারাত্মক কাণ্ড হবে। তবু এ ছাড়া আর কিছু করার কথা এ-মুহূর্তে ভাবতে পারে না।

হু-হু করে জ্বলে উঠল কাশবন। সাধু বিকৃতমুখে বলল—মর্ শালাশালীরা! পুড়ে বেগুনপোড়া হ্ তোরা! সাধু এখন চলল!

হাওয়া গেল ক্ষেপে। ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেল দেখতে দেখতে। আগুন দুলতে দুলতে শনশন ফরফর শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলল। ব্যানার গাঁট ফাটার ফট্‌ফট্ চড়্‌চড়্ শব্দ হতে থাকল পিছনে।

সাধু যেতে যেতে পিছু ফিরে ব্যাপারটা দেখে নিল আবার। জোর জমে উঠেছে আগুন। ঘাসফড়িং উড়ে পালাতে গিয়ে পুড়ে মরছে। কোত্থেকে পাখিও এসে জুটেছে। ফড়িংগুলো খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে ঝাঁকা তুলে নিয়ে হন হন করে পালাতে থাকল সাধু। এলাকার খড়ের ইজারাদার শুধু নয়, বাথানের গয়লা, রাখাল, চাষা-ভুষো কারো চোখে পড়লেই সাধুর আর বাঁচোয়া নেই।

আবাদী মাঠের পর উঁচু কাঁচা সড়ক পেয়ে গেল সে। এই তাহলে সেই বাদশাহী সড়ক। ষোল শতকে বাদশাহ হুসেন শাহ গৌড় থেকে পুরী অবধি বানিয়েছিলেন এই সড়কটা। দু'ধারে অজস্র দীঘি আর মসজিদও বানিয়েছিলেন। সব এখন মজাহাজা ভাঙাচোরা। জায়গায় জায়গায় কিছুটা পাকা হয়েছে—সেখানে বাস-মোটর চলে। সাধুর হাতে অনেক টাকা। ভাবনা নেই, বাস পেলে চাপবে।

সড়কে একটা বটগাছের ধারে চমৎকার পুকুর। বাঁধানো ঘাটটা ভেঙে-চুরে গেছে। সাধু ঝাঁকা নামিয়ে রেখে শান্তভাবে হাত-পা মুখ রগড়ে ধুল। তারপর পাড়ে উঠে অনেকদূরের সেই খড়ের জঙ্গলটার দিকে তাকাল। তার মুখ তৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল।

পুবের দিগন্ত রেখা জুড়ে ঘন ধোঁয়া উঠছে। সারা জঙ্গল জ্বলছে। গভীর সুখে সিগারেট বের করে ধরাল সে। তারপর আপনমনে খিক-খিক করে হেসে উঠল। ক্রমাগত হাসতে থাকল। এর চেয়ে জমজমাট ব্যাপার জীবনে কখনও ঘটাতে পারেনি সে।.....

তিন

ফাঁস দিয়ে মানুষ মারার সহজ কৌশল সাধু শিখেছিল হরিণমারার বাহাদুর শেখের কাছে। তখন তার বয়স কতই বা! বড় জোর আঠারো-উনিশ।

সাধু তখনও নেহাত ছিঁচকে চোর। সাধু-সন্ন্যাসী পেলে তার সঙ্গে জুটে যেত। ফাইফরমাস খাটত। গাঁজাও টানত। তবে নেশাভাং তার বরাবরই ভাল লাগে না। সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার ওই ভাব দেখেই লোকে তাকে সাধু বলে ডাকতে শুরু করেছিল। সাধু কিন্তু বেশ কয়েকটা দিন সেবা-টেবা করে শেষে তাঁর লোটা বা কমণ্ডলুটি নিয়ে কেটে পড়ত।

কালু মুখুজ্যের ছেলে বলে গাঁয়ে তার গায়ে কেউ বড় একটা হাত তোলেনি। জ্ঞাতিদের মুখ চেয়ে অন্তত খাতির করত সবাই। হুঁশিয়ারি দিয়েই ছেড়ে দিত। মারধর যা কিছু খেয়েছে, তা অন্য জায়গায়। একবার বহরমপুরে সিনেমাহলের ভিড়ে হার ছিঁড়তে গিয়ে খুব মার খেয়েছিল। কিন্তু বরাবর এই এক বরাতজোর—ওই যে বাঁড়ুজ্যের মেয়ে সীমা যেমন বলেছে—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—তাই শেষ অবধি ভুল লোককে মারা হচ্ছে ভেবে জনতার একাংশ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে সাধু পারতপক্ষে ভিড়ে হাত চালাতে যায় না।

এক গ্রীষ্মের দুপুরে সাধুর হাত নিশপিশ করছিল। পয়সাকড়ি একেবারে নেই। জামাজুতো ছিঁড়ে গেছে। জ্ঞাতি আত্মীয়বাড়ি তাই বলে সে হাত পাতবার পাত্র নয়। ঘুরতে ঘুরতে সোজা চলে গিয়েছিল

মুসলমান পাড়ায়।

গাঁয়ের শেষে বাড়ি ছিল বাহাদুরের। বাহাদুরের চোরডাকাত হিসেবে যেমন বদনাম, তেমনি লাঠিয়ালি আর খুনোখুনিতেও ওস্তাদ লোক সে। জীবনে অনেক বার জেল খেটেছে। বাহাদুর তার বাবা কালু মুখুজ্যের বড় অনুচর ছিল। মাঝে মাঝে বাহাদুর দুঃখ করে বলত—বাঘ নেই, এখন শেয়ালের রাজ্যি রে বাবা সাধু—শুধু শেয়াল।

সাধু বুঝতে পারত না। তাকিয়ে থাকত।

প্রৌঢ় বাহাদুর তার বিশাল শরীর আড়ামোড়া দিয়ে হাই তুলে বলত—বুঝলি না বাবা? আমাদের রাজার বড় অভাব। তুই রাজা হবি বাপের মতো?

সাধু ঘাড় নাড়ত।

—ঘাড় তো নাড়ছিস বাবা। পারবি মানুষ মারতে?

সাধু ফের ঘাড় নাড়ত।

—তুই ব্যাটা তো ছিঁচকে। যা—ভাগ্। যদি কোনদিন বাপের মতো মানুষের পেটে ছোরা চালাতে পারিস, চলে আসিস। মাথায় তুলে নোব!

সাধু টের পেত, জীবনের এই একটা লাইন আছে বটে। এই লাইনটা বেশ ভালই—কিন্তু সাহস হয় না যে। দূরের সুন্দর ঝকমকে কিছুর মতো এক পৃথিবী তাকে হাতছানি দিত।

সাধু সেদিন বাহাদুরকে এরকম কিছুই বলতে গিয়েছিল। নিঝ্‌ঝুম খাঁ খাঁ দুপুরবেলা। পুকুরপাড়ে বাহাদুরের বাড়িটা। চাচা বলেই ডাকত লোকটাকে। ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকে পড়েছিল সাধু। দেখল বাহাদুর বসে আছে দাওয়ায়। একজন অচেনা লোকের সঙ্গে গল্প করছে। সাধুর মনে হয়েছিল, বাহাদুরের চোখে মুখে যেন চাপা কি চাঞ্চল্য চনমন করছে। সাধুকে দেখে সে ইশারায় বসতে বলেছিল।

অচেনা লোকটাও মুসলমান। কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে শুধু টের পেয়েছিল পয়সাওলা লোক। চোখে সুরমা টেনেছে, দাড়িতে বোধহয় আতরও দিয়েছে। মাঝবরাবর সিঁথি-করা বাবরি চুল—তেল চকচক করছে। গোঁফটা কামানো। ঠোঁট পানের রঙে টুকটুকে। একটা সাদা ঢোল হাতা পাঞ্জাবি আর চেক লুঙ্গিপরা লোকটাকে অবাক্ হয়ে দেখছিল সাধু। ওর কাঁধে একটা মস্তো ডোরাকাটা হলদে রুমাল রয়েছে। এদেশে মুসলমানরা পয়সাকড়ি থাকলে এমন পোশাকই পছন্দ করে—সাধু জানে। লোকটার পিঠের দিকে একটা গাঁটরিও এতক্ষণে নজরে পড়ল তার।

বাহাদুর বলেছিল—দেখছ কি ঠাকুরমশাই! খুব বড় মহাজন ইনি। বাড়িতে তিনখানা রেশম তাঁত আছে। চাষবাসও আছে। আতাইনগরের নাম শুনেছ? সেখানকার লোক। আজ কপালগুণে আমার মেহমান হয়েছেন।

মেহমান মানে অতিথি—সাধু তাও জানে। সাধু বলেছিল—আদাব মিয়াসাব।

লোকটা হাত দুলে আদাব দিয়েছিল। বাহাদুর বলেছিল—জঙ্গীপুরে আলাপ হয়েছিল এনার সঙ্গে। ভাব হয়েছিল খুব। আমার মামুর বাড়ি উনি মেহমান ছিলেন সেদিন। বুঝতেই পারছ ঠাকুরমশাই, রেশমের থান বেচতে যান নানা জায়গায়। তা সেবার বলেছিলাম—যাবেন হরিণমারার দিকে। ভাল ব্যবসা হবে। আমার ভরসায় উনি দেখছি চলে এসেছেন।

লোকটা বলেছিল—হ্যাঁ। বলভরসা এখন আপনার দোস্ত্। এ দিকে কখনও আসিনি। কথামতো এলাম।

সাধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেছিল—চাচী কই?

—ও শালী গেছে বাপের বাড়ি। .... বলেই বাহাদুর হেসে উঠেছিল।—দোস্ত্, মাফ করবেন। আমার মুখটা কিন্তু এরকম দু'-চারটে খিস্তি না করে থাকতে পারে না। অব্যেস্।

লোকটাও হেসেছিল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, সে পারতপক্ষে কুকথা বলার পাত্র নয়। বেশ ভদ্র ও সরল মানুষ।

বাহাদুর ফের বলেছিল—তা এখন কি করি দেখ্ তো বাবা! মেহমানের খাতির করতে তো হবে।

মাগী আর সময় পেল না বাপের বাড়ি যাবার।

লোকটা শশব্যস্তে হাত নেড়ে বলেছিল—না দোস্ত্, ভাববেন না। দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো অব্যেস। সবখানে মানিয়ে চলতে পারি কোন তকলিফ হবে না। আল্লার কসম।

—তা চাল-ডালও তো সেদ্ধ করতে হবে। না কি ? .. হুঁ, দোস্ত্, এবারে হাতে মুখে পানি দেন। মুড়ি-আছে দিচ্ছি, নাস্তা করুন। চলুন—ঘাট দেখিয়ে দিই।

একটু পরেই লোকটাকে খিড়কির ঘাট দেখিয়ে দিয়ে বাহাদুর একা ফিবে এল। তারপর তার মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সাধু। বাহাদুরের চোখে একটা বুনোভাব ফুটে উঠেছে। শিকারী বাঘের মতো চঞ্চল সে। ফিসফিস করে বলেছিল—তোকে দেখে সাহস হল। চুপচাপ বসে দেখে যা কি করি। দরকার হলে সাহায্য করবি। আর শোন বাপ্, সদর দরজায় হুড়কোটা চেপে দিয়ে আয়।

সাধু কিছু না ভেবেই যন্ত্রের মতো হুকুম তামিল করেছিল। বাড়িটা পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিল বেশ উঁচু। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই। ঘন নিমবন আছে।

সাধু দেখেছিল, বাহাদুর ঘর থেকে একটা মাফলার বেব করে গেঞ্জি তুলে কোমরে জড়াল। মাফলারটা কি হবে বুঝতে পারছিল না সে।

লোকটা বিড়বিড় করে সম্ভবত আরবী ভাষায় মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘাট থেকে ফিরেছিল। বলেছিল—জোহরের (দুপুরের) নমাজটা সেরে নিই দোস্ত্। ঘাটে অজু (প্রক্ষালন) করে এলাম। জায়নমাজ (নমাজের আসন) দেন একটা।

বাহাদুর ঘর থেকে একটা সুদৃশ্য মাদুর এনে দিয়েছিল। দাওয়ায় সেটা বিছিয়ে লোকটা নমাজ পড়তে ব্যস্ত হয়েছিল। সাধু তখন অবশ হয়ে বাহাদুরকে দেখছে। বাহাদুর লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে মাফলারটা কোমর থেকে খুলেছিল। তারপর যেমনি লোকটা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে উঠতে যাচ্ছে, আচমকা পিছন থেকে ফাঁস পরিয়ে দিল।

আঃ! সে কী ভয়ংকর মনে হয়েছিল সাধুর! এমন করে চোখের সামনে মানুষ মারতে কখনও সে দেখে নি। যদিও পুলিশের গুলিতে বাবা কালু মুখুজ্যের রক্তাক্ত লাশটা সে একবারের জন্যে দেখেছিল—দেখেও কিছু মনে হয়নি তার। কিন্তু এখনও সেই দৃশ্য চোখের সানে ভেসে উঠলে সাধু তেমনি অবশ হয়ে যায়।

বাহাদুর লোকটার বুকে বসে আছে, দুহাতে মাফলার কষে ধরেছে, আর লোকটার চোখ জিভ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, পা দুটো কাঁপছে, বাহাদুর চাপা গলায় ব্যস্তভাবে বলেছে—অ্যাই শালা! হাত দুটো ধর্ শিগ্গির! সাধু তাই হাত দুটো নিয়ে সামলাতে ব্যস্ত—পারছে না—ভীষণ নড়ছে—এখনও এই দৃশ্য তার চোখে ভেসে ওঠে। সে ভয়ে চোখ বুজে ফেলে।

লাশটা ঘরের মেঝেয় সাত হাত গর্ত করে পুঁতেছিল দুজনে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম, ঘরের কোন জানালা নেই—লাশটা কোনায় ঠেকে পড়ে আছে।

সেই মেঝেয় একদিন বাহাদুর জ্বরে ভুগে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল। তার বাঁজা বউটাও কি জানত, একটা গোরস্থানে তারা শুয়ে থাকে ? সাধু দেখেছে, ওখানেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে চাচী পান্তা খাচ্ছে। লঙ্কা আর পেঁয়াজের ঝালে চোখে জল বেরোচ্ছে। হাপুস হুপুস শব্দ করে খাচ্ছে সে।

—অ্যাই মাগী! আর কতক্ষণ খাবি? উঠে আয়, বলছি।

—শুনছ ঠাকুর, তোমার চাচার মুখের বুলি?

চাচীর চেহারা ছিল ভারি সুন্দর। বয়সও তুলনায় কম। পীরিত করে ডাকাত বিয়ে করে বেচারার ভোগান্তি। আবার নিকে করতে পারত। করেনি। শেষ বয়সে ভিক্ষে করে বেড়াত। তারপর পাগলী হয়ে যায়। সাধু ভাবে—তাহলে কি চাচীও অমন করে মানুষ মারতে দেখেছিল? তা না হলে ক্ষেপে গেল কেন?

বাহাদুরের ভিটেয় এখন ঘুঘু চরছে। নিমগাছের জঙ্গল গজিয়েছে। ওদিকে পা বাড়াতেই সাধুর ভয় করছে।

তবে ফাঁসের ব্যাপারে বাহাদুরই তার গুরু। কীভাবে ফাঁস লাগাতে হয়, বুকের কোথায় হাঁটুর চাপ দিতে হয়—তলপেট ফুটো করতে হয় কেন—সব শিখিয়েছিল সে। তারপর সাধুর প্রথম শিকার গাঙ্গুলীবাড়ির বুড়ী ক্ষেমাঠাকরুন। একলা থাকত। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বহরমপুরে। কিন্তু বাড়ি আর সামান্য জেতজমা ছেড়ে কিছুতেই সেখানে জামাইয়ের কাছে থাকতে চায়নি। আসলে সাধুর হাতে মৃত্যুটা ছিল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে বাহাদুর আর সাধু গেল। সাধুই ডাকল—ঠাকমা, ও ঠাকমা!

বুড়ী সারা রাত জেগে থাকত। সাড়া দিল—কে র‍্যা?

—আমি গোপীনাথ, ঠাকমা।

—এত রেতে কেন ব্যা?

—তোমার জামাই এয়েছে, ঠাকমা। অন্ধকারে আসতে পারছিল না—বললে, পৌঁছে দাও। নিয়ে এলাম।

বুড়ী তক্ষুনি দরজা খুলল। আর যা হবার হয়ে গেল। এই লাশটা ফেলেই চলে আসতে হয়েছিল। টাকা সামান্যই পাওয়া গিয়েছিল। অলংকার খুঁজে কিছু পায়নি।

সাধুর দ্বিতীয় শিকার কিন্তু একা-একা।

ফুটফুটে একটি ন'-দশ বছরের মেয়ে বেড়াতে এল মামাবাড়ি। হীরু মুখুজ্যের ভাগনী। ভারি সুন্দর চেহারা। সাধুর জ্ঞাতিভাই হীরু। তাই সাধুও হল মামা। সাধুকে চোখে চোখে রাখলে কী হবে, বাড়িতে খাটাখাটুনি পড়লে সাধু দশজনের কাজ একা করে দেয়। শুধু দুটো খেতে দিয়ে অত বেশি কাজ পাওয়া যায় বলে তার খাতির। হীরুবাবুর বড় মেয়েব সেবার বিয়ে লেগেছিল। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়স্বজন গমগম করছে। সাধু গলদঘর্ম খেটে বেড়াচ্ছে। গা-ভরা অলংকার পরে মেয়েরা ঘুরছে দেখে তার লোভ নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু হীরুবাবুর দজ্জাল স্ত্রী সাধুকে শুনিয়ে শুনিয়ে মেয়েদের হুঁশিয়ারি দিলেন কেন? ওতেই সাধুর দুঃখ হয়েছিল।

—মেয়েরা, গয়নাপত্তর পরে বেড়াচ্ছে। খ্যাল রেখে চলো। আমাদের গাঁয়ের বড্ড বদনাম।

ব্যস, সাধুর অভিমান হল। কিন্তু চেষ্টাচরিত্র করেও সুবিধে করতে পারল না কিছু। সব মেয়ে যেন কীভাবে টের পেয়ে গেছে, এই খাটিয়ে ছেলেটার মতলব ভাল না। কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালে মেয়েরা ত্রস্ত হয়ে ওঠে— কেমন চোখে তাকায়।

.হুঁ, গিন্নী নির্ঘাত তার নামেই আড়ালে সাবধান করে দিয়েছে। ভাঁড়ারে মসলা আনতে সাধু দৌড়ে গেল, হঠাৎ এক মহিলা তাকে দেখে বলে উঠলেন—বারবার ' এমন কাজ বাবা তোমার, এসে খালি গায়ের ওপর পড়ছ তখন থেকে? ছেলেদের কাজ বাইরে—এখানে কী এত?

সাধু হীরুবাবুর কাছে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। হীরুবাবু গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। —যে যা বলছে, বলুক না। ছেড়ে দে। বিয়েবাড়ির ব্যাপার—নানান লোকে নানান কথা বলবে। বলুক!

সাধুর মনে তখন বাস্তু সাপটা ফুঁসছে। যত ভাবছে, মিছেমিছি কাঁদতে গিয়েছিল হীরুদার কাছে—তত নিজের ওপর ক্ষেপে যাচ্ছে সে।

পরদিন সকালে ভাব জমে গেল সেই ন'-দশ বছরের ফ্রক-পরা মেয়েটির সঙ্গে। গলায় চেন, কানে রিং হাতে দু'গাছা বালা। সে মামা মামা করে অস্থির। মামা তাকে আখ খাওয়াতে নিয়ে গেল। কেউ 'লক্ষ্য করেনি ব্যাপারটা।

—ও মামা! এ যে জঙ্গল দেখছি!

—হ্যাঁ। জঙ্গল তো বটেই। শেয়ালের গর্ত দেখবে? অনেক ছানা আছে।

—তাই নাকি? মামা, শেয়াল পোষ মানে না?

—মানে বইকি। পুষবে? চলে এস—এক্ষুনি ধরে দিচ্ছি।

তারপর আখের বনে একটু ধস্তাধস্তি হল। এক ঝাঁক চড়ুই ভয় পেয়ে ফরফর করে উড়ে পালাল। সেবার হরিণমারার পুব মাঠে সত্তর বিঘে জমিতে আখ ফলানো হয়েছিল। ফাল্গুন মাস। সবে আখ

কাটা শুরু হয়েছিল। ধরা পড়ার চান্স ছিল। কিন্তু সাধুর কপাল।

লাশটা পুকুরে দামের নিচে ডুবিয়ে দিয়েছিল সাধু। তারপর নিরীহ চেহারায় ফিরে এসেছিল। দুপুরের পর খোঁজ শুরু হল। কে বলল—আগের দিন ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে মাঠের পুকুরে পদ্ম তুলতে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে ডুবে মরেনি তো?

ছেলেময়েরা সবাই বলল—আজ কেউ যায়নি পদ্ম তুলতে। তবু সেই পুকুরে খোঁজ-খবর করা হল। লাশটা বেরিয়ে পড়ল। হ্যাঁ, পদ্ম তুলতেই ডুবেছে মেয়েটি।

কিন্তু হাতে গলায় কানে সোনা ছিল যে! ওর মা ডুকরে কেঁদে বললেন—কেউ তাহলে ডুবিয়ে মেরেছে গো!

আশ্চর্য সাধুর বরাত। মাঠের পুকুরে যারা খোঁজ করতে গিয়েছিল—তারা বাড়ির মুনিশ মাহিন্দার। হরি কৈবর্ত, সতীশ বাউরি আর ফজল শেখ। ওদের ওপর সন্দেহটা পড়ল। পদ্ম তুলতেই ডুবেছে মেয়ে—তবে লাশ থেকে ওরা তিনজনে গয়নাগুলো হাতিয়েছে। নইলে হীরু মুখুজ্যের ভাগনীকে ডুবিয়ে মারবার সাধ্য হবে কার? তাছাড়া সে অচেনা লোকের সঙ্গে ওখানে যাবেই বা কেন?

সাধু তখন ব্যস্ত হয়ে আলু কাটছে। বলছে—ভাগ্যিস সারাদিন তরকারি কুটছি—কী বলো সত্যদা?

সত্য ঠাকুর গামছায় নাক মুছে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলল—সাধু, ছিলিম সাজ্। মগজ খালি লাগছে! এলাচ গুঁড়ো মেশাবি ব্যাটা।

হরি সতীশ ফজলকে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে গিয়ে নাকি বেদম পেটানো হয়েছিল। তবু কবুল করেনি। তারপর ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল।

দৃশ্যটা এখনও চোখে ভাসে সাধুর। আখের জমির মধ্যে ঘন ছায়ার আঁকিবুকি—কুকুরশুঁকো নামে একরকম চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা গুল্ম গাজিয়েছে—তার ফুলগুলো নীল। সেই নীল ফুলের পাশে ভিজে মাটিতে শুয়ে আছে ফ্রকপরা একটি মেয়ে। নাক আর কষায় কালো রক্তের ক্ষীণ ধারা।

সাধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাকে। মনে মনে বলে—বড় পাজি জায়গা এই পৃথিবীটা। তার চেয়ে দিব্যি ঘুমোও খুকী! ঘুমের মতো সুখ আর নেই।

সাধুর কি কষ্ট হয়? মোটেও না। সে বেগতিক বুঝলে আরও বলে—আরে বাবা! হতটা কী শুনি? আর ক'বছর পরে বিয়ে হত। কার বাড়ি গিয়ে ঘরকন্না করতে। নাকের জলে চোখের জলে হতে। ছেলেপুলে বিয়োতে। ব্যস! তারপর বুড়ী হতে হতে হাড় পাকিয়ে যমের বাড়ি যেতে। তার চেয়ে এ মন্দটা কী!

তবু কী আছে মনে। মাঝে মাঝে কতদিন কত নির্জন দুপুরে—কত অন্ধকার কিংবা জ্যোৎস্নার রাতে একলা যেতে যেতে চমকে উঠে পিছু ফিরেছে সাধু। কে ফিসফিস করে ডাকল না—মামা, মামা!

সাধু হেঁড়ে গলায় অমনি গান গেয়ে উঠেছে।

—হেই! কে যায় গো?

—আমি সাধু। গোপীনাথ গো। কালু মুখুজ্যের ছেলে।

—অ। যাও বাবা, যাও।

এমন ছেলেকে কেউ ডেকে বিপদ বাধাতে চায় না। যেখানে যাচ্ছে, চলে যাক্। ওর জন্যে কারও মাথাব্যথা নেই। ...

এর পর সাধু আবার মানুষ মেরেছিল। এবার কিন্তু ফাঁস লাগিয়ে নয়। চাকু মেরেছিল। পয়সাও পেয়েছিল অনেক। নগদ পঞ্চাশটা টাকা বখশিস পেয়েছিল। এতে তার গরজ ছিল শুধু ওই বখশিসের।

কিছুদিন এলাকায় বাহাদুরের চেলাদের সঙ্গে মিশে ছোটোখাটো ডাকাতিতে হাত পাকাচ্ছিল সে। তার ফলে পুলিসের খাতায় তার নামটা কিভাবে উঠে যায়। বারকতক থানায় নিয়ে গিয়ে মারধরও করা হয়েছিল। হীরুবাবু লোক-লজ্জার খাতিরে তাকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। কিন্তু দারোগাবাবুর হুকুম—তাকে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় থানায় হাজিরা দিয়ে আসতে হবে।

সাধু বিপদে পড়ে গেল। ডাকাতদলের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়ায় তার পুরো সায় ছিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢুকে পড়েছিল। দল বেঁধে কিছু করতে তার ভাল লাগে না। সে একা থাকতে, একা

নিজের হাতে 'কাজ' করতেই ভালবাসে। কেউ তার ওপর হুকুম করুক—অন্তত দু-দুটো খুনের পর সে এটা বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তার অহমিকায় বাধত। এখন ডাকাতদলের পাল্লায় পড়ে এই হাজিরা দেওয়া তাকে খুব কষ্টে ফেলেছিল।

দারোগাবাবুটির আবার নানান অভ্যেস। সাধুকে পা টেপাতেন মশারির ভেতর—ফচকেমিও করতেন কিছু কিছু। সাধুর অসহ্য লাগত। বলতেন—বাড়ি গিয়ে কি করবি ব্যাটা? এখানেই রাতটা কাটিয়ে যা। খাওয়া-দাওয়া করবি। ঘুমোবি।

সাধু জানত, তাকে কেন থাকতে বলছেন উনি। সে পুরুষমানুষ। ওই সব ফচকেমি তার বরদাস্ত হবে কেন?

রাতে থাকেনি সে কোনদিন। কিন্তু একবার তাকে থাকতেই হল। মুসলমানপাড়ার এক প্রৌঢ়কে সে বাহাদুরের মতো চাচা বলত। এই লোকটা ডাকাত ছিল না—নিতান্ত ভালমানুষ। টাকার কুমির বললেও চলে। ওই বয়সে সে আবার একটা নিকে করেছিল। এই বউটি কিন্তু অনেক স্বামীর ঘর করা ধড়িবাজ মেয়ে। আগের পক্ষের ছেলেপুলেরা পৃথকান্ন। সম্পত্তি তাদের নামে অবশ্য লিখেই দিয়েছিল সে। বাকি বিঘে উনিশ-কুড়ি নিজের নামে রেখেছিল।

হঠাৎ এই লোকটা—নাম ওসমান আলি, কিভাবে টের পেয়ে গেল তার নতুন বিবি নষ্ট মেয়েমানুষ। তখন দিনরাত্রি মারধর ঝগড়াঝাঁটি চলতে থাকল। শুধু তাই নয়—তালাক দিতেই চাইল একেবারে।

কারণ রটতে দেরি হয় নি। ওসমান আলির এক ভাগ্নের সঙ্গে তার নাকি পীরিত চলছিল। এদিকে এই ভাগ্নেটি ওসমানের মহা দুশমন। জমি নিয়ে মামলা চলছিল মামার সঙ্গে। সে-সব শরীয়তী সম্পত্তি বণ্টনের রীতি সাধুর জানার কথা নয়। সাধু শুধু জানত—মামা মরলে সম্পত্তিটা তার হাতেই ফিরে যাবে। কারণ জমি তার মায়ের সূত্রে জবরদখল করেছে মামা।

ভাগ্নের নাম ইসমাইল। পাশের গাঁয়ে বাড়ি। সাইকেলে চেপে বেড়ায়। দেখলে হিন্দু বলে মনে হয়। খুব শৌখিন ছোকরা। সাধুর সঙ্গে অল্প-অল্প খাতির ছিল।

সে সাধুকে একদিন ডেকে একটা প্রস্তাব দিল। ওসমানকে খতম করতে পারবে না সাধু—যার বাবা কালু মুখুজ্যে একশো একটা খুন করেছিল? ইসমাইল জানে বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। পঞ্চাশটা টাকা বখশিস পাবে—কম কথা নয়।

তখন সাধুর অবস্থা শোচনীয়। খাওয়া-দাওয়াই জোটে না। রোজ সন্ধ্যায় থানায় হাজিরা দিলে মনের অবস্থাটা কেমন হয়—সাধুই জানে। সব সাহস শুকিয়ে য় না মানুষের! সে সহজেই রাজি হয়ে গেল।

ফন্দিফিকির ইসমাইলই বাতলে দিল। তখন বর্ষার সময়। সন্ধ্যায় ভিজে একাকার হয়ে সাধু গেল হাজিরা দিতে। বড়বাবুকে জানাল—আজ থানায় থাকতে পেলে ধন্য হবে সে। ঘরের ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ছে। ধসে পড়বে নির্ঘাত। কোন্ সাহসে সে শুয়ে থাকবে?

দারোগাবাবুর লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে শুল সাধু। এক জায়গায় শোয়াটা ঠিক নয়—যদিও দারোগাবাবুর সেই ইচ্ছেই ছিল।

সাধু বলল—আমি থানার বারান্দায় শোব, স্যার।

—সর্বনাশ! মশায় তুলে নিয়ে পালাবে রে!

—তাহলে মশারি দিন।

সাধুর আব্দার রাখা হল। তখনও হরিণমারায় বিদ্যুৎ আসেনি। একটা হ্যারিকেন জ্বলত! সেটা খড়ের চালের বাতায় টাঙানো থাকত। বাংলোধাঁচের উঁচু বারান্দাওয়ালা ঘর। বারান্দায় শুল সে। কম্বলও পেল। কারণ শীত-শীত করছিল বেশ।

থানায় সেন্ট্রি থাকার নিয়ম আছে। কিন্তু গ্রামের থানায় ও সব নিয়মকানুন মানা হয় না। নিঝ্‌ঝুম রাত। ভাল করে দেখে নিয়ে সাধু উঠল। কম্বলটা এমন ভাবে রাখল, যেন মানুষ শুয়ে রয়েছে যথারীতি। তারপর বেরিয়ে পড়ল সে।

সে-রাতে ওসমান বিবির সঙ্গে ঝগড়া করে মাটির ঘরের দাওয়ায় মশারি খাটিয়ে একা শুয়েছিল। ঘরে শুলেও অসুবিধে হত না। বউ দরজা খুলে দিত সাধুকে।

শুয়ে থাকা মানুষকে ফাঁস লাগিয়ে মারা অসম্ভব। সাধু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর দেরি করাও যায় না। তখন সে কোমরের কাছ থেকে বড় চাকুটা বের করল। বেশি কিছু ভাবল না। (এখনকার মতো বুদ্ধি থাকলে নিশ্চয় চিন্তা-ভাবনা করত।) মাথার দিকের দড়ি কেটে ফেলল। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

তার পিঠের কাছে বউটি কখন পা টিপে চলে এসেছে এবং তার পিঠে স্তনের নরম চাপ অনুভব করছে সাধু। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এ মুহূর্তে এ কিসের স্বাদ?

তারপর মেয়েটি তাকে অবাক্ করে টর্চ জ্বালল। ঘুমন্ত মানুষের মুখে টর্চের আলো পড়তেই চোখ কেঁপে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তে সাধু টের পেয়েছে, মেয়েটি তাকে সাহায্য করছে। সে ধারাল চাকুটা প্রচণ্ড চাপে গলায় বসিয়ে এক টান দিল। আলো নিভল।

তীব্র গোঙানি শুরু হল। আর ভয় পেয়ে সাধু পালিয়ে গেল। যেতে যেতে শুনল মেয়েটি প্রচণ্ড চেঁচাচ্ছে—খুন! খুন! খুন করে গেল গো!...

হাত মুখ নালার জলে ধুয়ে সাধু দিব্যি শুয়ে পড়ল থানার বারান্দায়।

কিন্তু শেষ অবধি একটু গোলমালে পড়ে গিয়েছিল সে। দারোগাবাবুর গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে গিয়েছিল—তাতে রক্ত লেগেছিল।

ভাগ্যিস লেগেছিল। দারোগা গোপনে অনেক ধমকা-ধমকি করেছিলেন। খুন যে সাধুই করেছে—তা জানা। কিন্তু পোশাকটাই গোলমালে ফেলেছে। ফাঁস হলে বেচারার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। তাই চুপ করে গেলেন তখনকার মতো।

কিন্তু পরে সাধুকে বেমক্কা একটা চুরির কেসে ফাঁসিয়ে জেলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। সাধু সে ব্যাপারে এতটুকু দোষী ছিল না।

জেল থেকে বেরিয়ে সাধু হরিণমারা ঢুকতে সাহস পায়নি। পাছে সেই দারোগাবাবু আবার কিসে ফাঁসিয়ে দেন। খোঁজ নিয়েছিল সে—অশ্বিনী দারোগা এখনও বদলি হয়নি। তাছাড়া আরও বড় খবর—উনি এতদিনে বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছেন। খুব দাপট বেড়েছে। সাধু আর হরিণমারার ধারেকাছে যাবে না কোনদিন।....

এবং এইভাবেই সাধুর দিনকাল কেটেছে। সে আশা করে, এভাবেই বরাবর কাটিয়ে যাবে। সারাদিন যতগুলো মানুষ সে দেখে, প্রত্যেককে তার ফাঁস লাগিয়ে মারতে ইচ্ছে করে। তার মনে হয়, কাজটা একেবারে ডালভাতের মতো। হুকুম দিয়ে কেউ দেখুক, এক ঘণ্টার মধ্যে সাধু পৃথিবীকে শূন্য করে ফেলবে। আর, এ-কাজের জন্যই তো জন্ম।

এ-সব কথা ভাববার সময় অভ্যাসমতো চাপা শিস দেয় সে। মুখটা উঁচু করে হাঁটে।

কাঞ্চনতলার বাঁড়ুয্যে পরিবারকে সে ওই চোখেই দেখেছিল। ব্যর্থতার আফসোস তাকে এখন কুরে কুরে খাচ্ছে। মাথার ঝাঁকাটা বড্ড ভারী ভারী লাগছে। সে চলতে চলতে এক সময় দেখল, পথে কখন ভিড়টা বেড়ে গেছে। অজস্র মানুষ—কেউ সাইকেলে, কেউ গরু মোষের গাড়িতে, কেউ পায়ে হেঁটে চলেছে।

কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে সে তাকাল। ভোজবাজি নাকি? কোথায় এত আসা-যাওয়া হচ্ছে? পরক্ষণে টের পেল—কী সর্বনাশ! সে ব্রহ্মপুর মেলার পথেই চলেছে যে!

কাচ্চাবাচ্চাদের হাতে নাগিন বাঁশি বেলুন কাগজের ফুল। পোঁ পোঁ বাঁশির শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। খেলনার ফুল ফুটিয়ে বাড়ি ফিরছে সবাই। যারা যাচ্ছে, তাদের চোখে লোভ আর খুশির আশা শেষ বেলার রোদে ঝলমল করে উঠেছে। এই বহুতা খুশি ও উজ্জ্বলতার মধ্যে সাধু নিজেকে লক্ষ্য করে দুঃখিত হল।

সে এক তুচ্ছ বাসনওয়ালা সেজেছে কেন? এখানে তাকে কী বিচ্ছিরি না দেখাচ্ছে। যেমন বাজে

জামাকাপড়—তেমনি রুক্ষ চেহারা। ঠোঁট ফেটে জ্বালা করছে। খালি পা হাঁটু অবধি ধুলোয় ভর্তি। মাথার অমন সুন্দর চুলগুলো চেপটে একাকার হয়ে গেছে। ব্রহ্মতালু শিসিয়ে উঠছে চাপা একটা যন্ত্রণায়।

সামনে একটা মোড় দেখা যাচ্ছিল। দু'ধারে ধু-ধু শূন্য মাঠ— ঢেউ খেলানো রাঢ়ের মাটি। রুক্ষ কিছু গাছ একলা-দোকলা দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বাঁজা ডাঙার ওপর তালগাছের সারি। সাধু বিরক্ত মুখে সামনের মোড়ের দিকে তাকাচ্ছিল। একটা গ্রাম আছে ওখানে। মোড়ে দোকানও আছে দেখা যাচ্ছিল। কয়েকটা ট্রাক আর বাসও দেখতে পেল সে। তাহলে ওখান থেকেই পাকা সড়ক শুরু।

সামনের লোকটাকে সে জিজ্ঞেস করল, ওটা কোন্ গ্রাম, দাদা?

লোকটা কেমন চোখে তাকে দেখে নিয়ে জবাব দিল—গোঁসাইতলার হাট।

—ব্রহ্মপুর আর কদ্দূর?

—আর মাইলটাক। মেলায় যাবে নাকি?

—ইচ্ছে।

—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—মোহনপুর।

—মোহনপুর! সে তো মা গঙ্গার ধারে। অ্যাদ্দূরে ....

সাধু হকচকিয়ে বলল—হ্যাঁ। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম আর কী!

লোকটার আগে যে ছিল, সে সাধুর বয়সী। বেশ বলিষ্ঠ গড়ন। দুজনেই ভাল জামাকাপড় ও জুতোপরা মানুষ—সুতরাং ভদ্রলোক বলেই মনে হল সাধুর। আগের যুবকটি পিছিয়ে এসে বলল—কী আছে ঝাঁকায়? বাসনকোসন দেখছি!

সাধু বলল—হ্যাঁঃ।

—কাঁসা কী দর যাচ্ছে হে বাসনওলা?

সাধুর পিত্তি জ্বলে গেল এই সম্ভাষণ শুনে। কিন্তু হজম করল। বলল—দর চড়েছে বড্ড।

—তাও কত, শুনি?

—কেন? কিনবেন নাকি? খামোকা দরাদরি করে কী লাভ?

যুবকটি হেসে উঠল। —মেজদা! বাসনওলা একেবারে মেজাজী রাজাবাদশা দেখছি! এর মাথায় জল দেওয়া দরকার!

আগের লোকটি বলল—তা তো হবারই কথা। কোথায় মোহনপুর—সে কি এখানে? বোঝা বয়ে বেচারার মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

যুবকটি সাধুর কাছাকাছি হয়ে বলল—ব্যবসাবাণিজ্য করতে হলে মেজাজ ঠিক রাখতে হয়, ব্রাদার। বুঝেছ? নিজের মাথার সুন্দর টেরিকাটা চুলগুলোয় টোকা মেরে সে বলল—ঘিলু ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তারপর ব্যবসা করছ বাসন-পত্তরের। কিনবে মেয়েরা। মেজাজ করলে যে গালে ঠোনা মেরে দেবে। অ্যাঁ?

সে নিজের রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল। সাধু রেগে লাল হয়ে গেল। সে দাঁতের ফাঁকে বলল—যা তা বললে ভাল হবে না, বলে দিচ্ছি! আমি কারো ধারি নে।

—ওরে বাবা! বোলতারাগা হয়ে গেছে যে! যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল। তেমনি হেসেও খুন হল।—ও মেজদা! একেবারে খেপচুরিয়াস!

সাধুর মাথার ঠিক রাখতে পারল না। ঝাঁকা নামিয়ে রেখে রুখে দাঁড়াল।—কী বললে, আরেকবার বলো। বলেই দেখ।

যুবকটি গ্রাহ্য করল না। আরও হেসে উঠল।—ওরে বাবা! এ যে ষাঁড়ের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মারামারি করতে চায়। ও মেজদা! দেখ—দেখ!

—আঃ, কী হচ্ছে শ্যাম। ছেড়ে দে। বাসনওলার সঙ্গে ঝামেলা করছিস কেন? তোর যত বয়স বাড়ছে—তত ইয়ে। চলে আয়!

মেজদার কথায় কান করল না শ্যাম। বলল—কী হে? তাহলে সত্যি লড়বে একহাত? তারপরই আচমকা সাধুর মুখে জোরে ঘুষি মারল। সাধু পড়ে গেল। মেজদা মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাইকে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেল। পথের লোকে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে থাকল।

পড়ে গিয়ে সাধু টের পেল, তার ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে। আঙুলে রক্তটা নিয়ে দেখল সে। পরক্ষণে সে শান্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাসনের ঝাঁকাটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

মেজদা বলল—কিছু মনে কোরো না বাসনওলা! ছেলেটা বড্ড গোঁয়ার। কই, হাত লাগাও। মাল তুলে দিই।

সাধু ঘাড় নাড়ল। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল লোকটা। শ্যাম একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে সিগারেট ধরিয়েছে। সাধুর দিকে হাসিভরা মুখে একবার তাকিয়ে সে মেজদার সঙ্গে এগোল। ভিড় আবার চলতে থাকল যে যার দিকে। সাধু একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলল।

তার বুকে একটা প্রচণ্ড কাকুতি ঠেলে উঠছিল। সে চেঁচিয়ে বলতে চাইছিল—আমি বাসনওলা নই। আমি সাধু—কালু মুখুজ্যের ছেলে গোপীনাথ! কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। এই কষ্টটা তার চোখে জল এনে দিল। রুমাল বের করে চোখ মুছে সে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সাধু যখন গোঁসাইতলার একটা চায়ের দোকানে বসেছে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওখান থেকেই দূরে দক্ষিণে ব্রহ্মপুরের মেলার আলো চোখে পড়ছিল।

উত্তরের হাওয়াটা কমেছে। এখন। কিন্তু শীত বেড়েছে। চাঁদতারণের তুলোর কম্বল আর জুতো ফেলে আসা কী বোকামিই হয়েছে, এতক্ষণে টের পাচ্ছিল। পাতলা সুতীর চাদরে এই প্রচণ্ড শীত থেকে বাঁচা কঠিন হবে। মেলায় গিয়ে এক্ষুণি কম্বলের খোঁজ করা দরকার। থাকবে কি?

তার আগে গোঁসাইতলার কোন দোকানে মালগুলো ঝেড়ে দেওয়া যায় কি না খোঁজ নেওয়া দরকার। তারপর ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। ভাত না হোক, লুচি সন্দেশ খেয়ে নেবে একপেট। পকেটে নগদ পঁচিশটে টাকা আছে। ভাবনা কী।

চা খেয়ে সে পাশের লোকটাকে জিজ্ঞেস করল—বাজারে কাঁসা-পেতলের দোকান আছে দাদা?

লোকটা আস্ত কম্বলমুড়ি দিয়ে বসেছিল। নাকের ডগাটা দেখা যাচ্ছিল শুধু। জবাবে সে ঘাড় নাড়ল।

আছে? সাধু বলল—কোথায় বলুন তো?

মাথাটা নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে সামনের দিকটা দেখিয়ে দিল। চা-ওলার কানে গিয়েছিল কথাটা বলল—চলে যাও। ওই যে আলো জ্বলছে।

সাধু গেল। দোকানের মধ্যে হ্যাসাক জ্বলছে। লোহার বেড়া আছে একপাশে। সোনারুপোর ব্যবসাও আছে। দুটি লোক খাতা নিয়ে ঝুঁকে ছিল। সাধকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

কোণের দিকে আরও একজন উবু হয়ে বসে হুঁকো খাচ্ছিল। তার সামনে একটা আগুনের মালসা। হুতুমপ্যাঁচার মতো গলায় সে বলল—কোরবান নাকি রে?

সাধু বলল—আজ্ঞে না। আমি গোপী।

—গোপী? সে আবার কে?

সামনের একজন বলল—কী মাল আছে? কোথাকার লোক?

মানুষ নয়, যেন রেকর্ড বাজছে। সাধু ঝাঁকাটা নামিয়ে বসল। তারপর বলল—দেখুন, বড্ড বিপদে পড়েছি। পথে আমার টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েছে—এই দেখুন মারধোরও করেছে.....

বাধা দিয়ে দু'জনেই এক গলায় বলল—সর্বনাশ! থানায় চলে যাও। এখনও বোধহয় দারোগাবাবুকে পেয়ে যাবে। যাও—যাও। ঘুমোতে গেলে আর রাতের বেলা মাথা ভেঙেও বেরোবে না দারোগা।

—আজ্ঞে না। থানা-পুলিসের হাঙ্গামায় যাব না। আপনারা....

—আমরা কী করব?

—এই সামান্য মাল আছে। যদি দয়া করে কিনে নেন, ভাল হয়!

একটু চুপ করে দুজনে ওকে দেখতে থাকল। কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব। সাধুর শীত চলে যাচ্ছিল ক্রমশ। অবশেষে একজন বলল—মহাজন কে?

সাধু বুঝল না। বলল—আজ্ঞে?

—বলি, ব্যবসা তো করেছ। মাল কোত্থেকে আনো?

—আজ্ঞে খাগড়া।

—মহাজনের নাম কী?

সাধু আবার পলকে নিজের ধূর্ততা ফিরে পেয়ে বলল—আজ্ঞে সুনীলকুমার চন্দ্র।

এই নামটা ভাগ্যিস সে জানত। লোকটা তা শুনে বলল—সুনীল চন্দ্র আবার কাঁসা-পেতলও ধরল? কিছুই বাদ দেবে না দেখছি। তা দেখ, আমরা ওব মাল কিনব না।

সাধু দমে গিয়ে বলল—কিনবেন না কেন?

—সুনীল চন্দ্র পাজির হদ্দ। মাল তার কাছে বাকিতে না নগদে কিনেছ, কে জানে বাবা। ও পথে আমরা নেই! আগে রসিদ দেখাও, তখন কথা হবে।

সাধু বুঝল, ব্যবসার জগতে একটা চুক্তি আছে পরস্পর—যে মহাজন যতদূরেই থাক, সেই অলিখিত চুক্তি মেনে চলবে। দুনিয়ায় কতরকম লাইন নিয়ে মানুষ বাঁচছে। প্রতিটি লাইনের লোকগুলো পরস্পর যেন এককাট্টা—পরস্পরকে সাহায্য করবেই। বেলাইনের লোক তাদের চোখের সামনে ধড়ফড় করে মরলেও চেয়ে দেখবে না। তাছাড়া নিজের-নিজের লাইনে সবাই কেমন ঠাণ্ডা-নিষ্ঠুর-নির্লিপ্ত। যেমন সাধু নিজেও তাই। যেদিকে তাকাও, শুধু দল আর দল। নানান দলে পৃথিবীর মানুষ ভাগ হয়ে আছে। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার! সাধু মনের বিষ মনে রেখে বলল— চোখের দিব্যি, মাল নগদে কিনেছি। রসিদ ছিল টাকার সঙ্গে। শালা ডাকুরা কেড়ে নিয়ে গেছে যে! নইলে তো এক্ষুনি দেখাতাম।

পিছনের তামাকখেকো হুতুমপ্যাঁচার স্বরে বলল—রাত্তিরে আমরা বেচাকেনা করিনে।

সাধু মরিয়া হয়ে বলল—বাবুমশাই, বড্ড বিপদে পড়েই এসেছি। যা দেবেন দিন না মালগুলো নিয়ে। এ ব্যবসা আর করব না বলেই কিরে করেছি। বিশ্বাস করুন!

ওর ওই মালসার আগুনের একটা টুকরোর মতোই জবাব এল—হবে না।

সাধু ফুঁসে উঠল—কেন হবে না? এগুলো খেলনা না ধলোবালি শুনি? আপনারা তো ভারি অদ্ভুত লোক, মশাই। আপদে-বিপদে মানুষকে দেখবেন না?

এমন বলাটা নিশ্চয় ব্যবসাদার বা বাসনওয়ালার মতো হল না—এ বুলি বেলাইনের। সাধু বুঝেও রোখের মাথায় বলল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন পড়তে লাগল। ওদিকে সামনের লোক দুটোর চোখ জ্বলতে জ্বলতে এখন ফুলকি ঠিকরে পড়ছে যেন। সাধুর মনে হল তার আত্মার ভিতর-অবধি খুঁটিয়ে দেখছে দুই চতুর ঘুঘু মানুষ। দেখুক্। সাধু মরিয়া।

হঠাৎ ওদের একজন—যার কপালে তিলককাটা, মুখ নামিয়ে কেমন বিদকুটে হাসল। চাপা স্বরে বলল—চোরাই মাল নাকি হে? খুলে বলোই না। এদিক-ওদিক করার কী আছে এত?

সাধু জোরে মাথা নেড়ে প্রায় গর্জে বলল—না, না।

আবার চাপা রসিকতার স্বরে সে বলে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আমরা গন্ধে বুঝতে পারি। ভূষণদা, মালটা দেখ তো।

মুহূর্তে সাধু নরম হল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাল। তার টাকা নিয়ে কথা।

ভূষণ নামে লোকটা ঝাঁকা টেনে নিয়ে মাল দেখতে ব্যস্ত হল। তামুকখেকো গম্ভীর গলায় কী যেন বলল, বোঝা গেল না। সাধুর চাপা শিস দিতে ইচ্ছে করছিল অভ্যাস-মতো। ইচ্ছেটা চেপে রাখল। ভূষণ বলল—খাগড়াই বটে। সতু, দাম বলে দাও।

তার মানে বিনি ওজনে নেবে? সাধু তাকাল। সতু বলল—দেখ বাপু, এ-সব মাল রাখার অনেক ঝক্কি। আবার গালিয়ে পিটিয়ে ভোল বদলাতে হবে। নয় তো গোলমালে পড়ে যাব। সব খরচা ধরে-

টরে তিরিশ দিতে পারি। রাজি থাকলে দাও।

সাধু বলল—তাই দিন।

সাধু টাকা গুনে নিয়ে বেরিয়ে আসছে, সতু পিছু ডাকল। চাপা স্বরে বলল—শোন! কোত্থেকে হাতিয়েছ বলে গেলে না? এদিককার কারো নয় তো?

সাধু একগাল হেসে জবাব দিল—না। মোহনপুর এলাকার! সে আপনি ভাববেন না।

রাস্তায় বেরিয়ে সে সটান খাবারের দোকানেই ঢুকল। অনেকদিন পরে সাধু পেট পুরে লুচি আর রসগোল্লা খাবে। তার নোলায় জল জমতে থাকল। ময়রার দোকানের বেঞ্চে বসে সে চাপা শিস দিল এতক্ষণে।

চার

বাস ছেড়েছিল রাত নটায়—লাস্ট ট্রিপ। দশ মিনিট লেগেছিল ব্রহ্মপুরে পৌঁছতে। সাধু যখন বাস থেকে নেমেছে, তখন সে অন্য মানুষ। পরনে নতুন ধুতি, ডোরাকাটা শার্ট, পায়ে ছ'টাকা দামের হাল্কা স্যান্ডেল, কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগে একটা তুলোর নতুন কম্বলের সঙ্গে ময়লা ধুতি-শার্ট আর চাদর ঢুকে সেটা বেশ ডাগর দেখাচ্ছিল। আরও টুকিটাকি কিনেছিল সে গোঁসাইতলার বাজারে। দাঁতমাজা ব্রাশ, পেস্ট, সাবান, স্নো, একশিশি গন্ধতেল, একটা চিরুনিও। সাধু এখন ছোটখাট রাজা। চাপা শিস দিতে দিতে সে মেলায় ঢুকেছিল। একটুও শীত করছিল না আর। মেজাজে এক অপূর্ব উষ্ণতা।

ঢোকার মুখে এতক্ষণে ঝুমুরদের কথা মনে পড়েছিল তার। একটু আনমনা হয়েছিল। সত্যি কি ওরা কাঁকড়া-পোড়া হয়ে মরেছে? পরক্ষণে মনে হয়েছিল, ওরা সোঁতার মধ্যে ফাঁকা জায়গায় ছিল—পুড়ে মরার চান্স কম। তবে ধোঁয়ার কষ্ট পেয়েছে খুব। কে জানে, ধোঁয়ায় মানুষ মরে নাকি।

আর মরে গিয়ে থাকে তো কী করার আছে! শুধু আফসোস রয়ে যায়—গয়নাগুলো মেরে দেবার হয়তো একটা চমৎকার সুযোগ চলে গেল। সকালে সেখানে ফিরে গিয়ে খোঁজখবর নিলে ভাল হত। কিন্তু থাক। পৃথিবীতে কত জায়গায় কত কাঁড়িকাঁড়ি ধনসম্পদ জমে আছে—সাধুর আর অত হন্যে হতে ইচ্ছে করে না! তার অল্প-স্বল্প জুটে গেলেই চলে যাবে।

মেলার আলো আর হইচই, ড্রামের বাজনা, বাঁশির সুর তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল ক্রমশ। রক্ত গরম হয়ে উঠছিল। দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে সে হনহন করে এগিয়ে গিয়েছিল মেলার মধ্যে। দুধারে কপাট আর তক্তপোশ-ওয়ালারা তেঁতুলতলায় খোলামেলা রাত কাটাচ্ছে। তারপর লোহা-লক্কড়ের দোকান। তারপর চোখ-ধাঁধানো মনোহারির আসর। মধ্যে সামিয়ানার নিচে মস্ত প্রাঙ্গণে যাত্রা হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ঝুমুরদের আসর খুঁজতে খুঁজতে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। এ-সব আসর একটু আড়ালেই বসে। মেলার পিছন দিকটায়।

ব্রহ্মপুরে ঝুমুর আসাটা চিরকালের রেওয়াজ। আজকাল ঝুমুর প্রায় উঠেই গেছে। ছেলেবেলায় সাধু সব মেলাতেই দেখেছে ঝুমুর না হলে চলত না। মাজা দুলিয়ে একগাদা ছুঁড়ী নাচত আর পীরিতের গান গাইত। লোকেরা পেলা ধরত। নাম ধরে ডেকেই পেলা ধরত। আর এলোকেশী অথবা যমুনা নাচতে নাচতে ভিড় ঠেলে গিয়ে তার কোলে বসে পড়ত। দেখাদেখি সাধুও পেলা ধরেছে। কিন্তু ছুঁড়ীদের বেশি ফচকেমি সে বরদাস্ত করতে পারত না। ধাক্কা দিয়ে ঠেলে পালিয়ে যেত। অথচ সে এক মজার খেলা। একটা তামার পয়সার জোরে আস্ত একটা ছুঁড়ী নেচে নেচে কাছে আসবে, গলা জড়িয়ে ধরবে—এর মতো আশ্চর্য ব্যাপার আর কী আছে? সাধুর ওস্তাদ বাহাদুর লোকটা ছিল ভারি মজার। পেলা ধরে যখন এলোকেশীরা এসেছে—চোখ নাচিয়ে বলেছে, আমার এই খোকাবাবুকে এট্টুখানি দুধু খাইয়ে দাও তো মা! ব্যস! এলোকেশী প্রায় কোলে তুলে নিয়েছে কিশোর সাধুকে। ওর মুখটা বুকে চেপে ধরেছে। সাধু ছটফট করে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। লজ্জায় আর রাগে অস্থির সে। কিন্তু এলোকেশীর গায়ে কেমন মিষ্টি গন্ধ ছিল—ঘামের সঙ্গে মেশা স্নো-পাউডারের গন্ধ—ভ্যাপসা হলেও মিষ্টি, নাক থেকে কতক্ষণ যেত না। সকালে জামা শুঁকে গন্ধটা বারবার নিত সাধু। মন কেমন করে উঠত। ওটাই তার লোভের ব্যাপার ছিল বরাবর।

এখনও ওই ধরনের গন্ধ হঠাৎ পেলে এলোকেশীর কথা মনে পড়ে যায় সাধুর। মন কেমন করে ওঠে। স্মৃতির অন্ধকারে হারমোনিয়াম-তবলা বাজে। ঘুঙুর বাজতে থাকে ঝুম ঝুম ঝুম।

একবার জ্যাঠতুতো দাদা নিবারণের শালী এল। শহরের মেয়ে। সবসময় সেজেগুজে থাকে। সাধুর তখন বড় জোর চোদ্দ-পনের বছর বয়স। ছিঁচকেপনার জন্যে ঘরে ঢোকা তার বারণ। তবু নিবারণদার শালী তাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়েছিল। খাটে বসিয়ে নাম-ধাম জিজ্ঞেস করেছিল। সাধু পালাতে পারলে বেঁচে যায়। আর ওই ছটফটানির মধ্যে হঠাৎ নাকে এল এলোকেশীর গন্ধ। সাধু বশ মেনে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটির বুকে মুখ ঘষতে পারলে যেন দম আটকানো ভাবটা কেটে যায় তার।

—তুমি পড়াশুনো করো না! বলছ কী? এমন সুন্দর ছেলে—ভদ্রলোকের ছেলে! সে কী গো!

দরজা থেকে নিবারণদার মা বলল—কাকে কী বলছ মা? বাবার লাইন ধরতে বাকি রাখল নাকি এ বয়সেই! গুপী, এখন আয় বাবা।

সাধুকে উনি গুপী বলতেন। সাধুর মান-অপমান জ্ঞান বরাবর টনটনে। সে কিন্তু ওই গন্ধটার লোভে উঠে আসতে গড়িমসি করছিল। শেষ অবধি বুড়ী প্রায় জোর করে টেনে বাইরে বের করে দিল ওকে। সেবেলা সাধুর ওবাড়ি খাবার কথা ছিল। খায়নি। মাঠে গিয়ে গাছতলায় বসে কেঁদেছিল। আর তার ফল হল, পরদিন নিবারণদার তেজী খাসিটা জলে ডুবে মারা পড়ল।

কোথায় আছে সেই এলোকেশীর গন্ধওলা মেয়েটা? এতদিন নিশ্চয় অনেকগুলো ছেলেপুলের মা হয়েছে। একবার দেখতে ইচ্ছে করে সাধুর।....

[illegible]পাটের পিছনে গিয়ে সাধু অবাক্। এ যে আর এক মেলা। চারদিকে গ্যাসবাতি আর হ্যাসাক জ্বেলে অগুনতি জুয়াড়ী আসর বসিয়েছে। থোকা থোকা ভিড় জমে আছে এক একটা ছকের সামনে। বাদামী চামড়ার কৌটোর ভেতর গুটি নড়ার খড়খড় শব্দ হচ্ছে। রঙিন ছকে হরতন ইস্কাবন রুইতন চিড়িতন ড্রাগন আর রাজমুকুটের ছবি। জুয়াড়ীরা সবাই গোঁফ রাখে। হাতে বালা পরে। মাথায় মাফলার জড়ায়। সাধুর জুয়াড়ী হতে ইচ্ছে করে বরাবর। কিন্তু খেলায় বসতে ভয় পায়। ওতে নাকি জাদুবিদ্যার দরকার হয়। তা না হলে যে খেলতে বসে, শেষ অবধি সে হেরে ফতুর হয় কেন? সাধুকে কে সেই বিদ্যা শেখাবে?

একটা আসরে ভিড় বেশি। সাধু সেখানে উঁকি দিল। একটা নিচু টুলে হ্যাসাক জ্বলছে। হ্যাসাকটা নতুন। প্রথমে সে হ্যাসাকটাই দেখতে থাকল। কালীপুজোর রাতে এমনি একটা নতুন হ্যাসাক এনেছিল হরিণমারার জমিদারবাবুরা। শেষরাতে সবাই যখন মাতাল হয়ে লুটোচ্ছে, সাধু হ্যাসাকটা খুলে নিয়ে পালিয়েছিল। কেউ টের পায়নি। অতগুলো আলোর মধ্যে [illegible]টা আলো গেছে—সেটা টের পেতে আরও দুদিন লেগেছিল। ততক্ষণে সাধু পাঁচক্রোশ দূরের এক গাঁয়ে এক ধনী মুসলমানকে দশ টাকায় ঝেড়ে এসেছে সেটা। চোরাই মাল কেনার ব্যাপারে সবাই একরকম। দরকার না থাকলেও কিনবে—টাকা ধার করেও কিনবে।

হঠাৎ সাধু দেখল জুয়াড়ীর পাশে একটি বউ বসে আছে। বউ—কারণ সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর—রাঙা ঠোঁট। পান চিবুতে চিবুতে মিটিমিটি হাসছে। হাসতে হাসতে আসরের ভিড় ও খেলোয়াড় বা 'খেলাড়ি'দের দিকে তাকাচ্ছে। যেন হাসির সঙ্গে জাদুমন্ত্র ছড়াচ্ছে ঝিলিক দিয়ে। হাঁটু দুমড়ে বসে আছে সব পয়সাওলা খিলাড়ি—বেশভূষা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা এলাকার পয়সাওলা শৌখিন ছোকরা। দু-একজন বয়স্ক মানুষ আছে। জুয়াড়ীর দিকে তাকিয়ে আরও অবাক হল সাধু। এ যে রীতিমত সায়েব মানুষ। গোঁফ, হাতে বালা সবই আছে—কিন্তু প্যান্টকোট আর টাই-পরা এমন জুয়াড়ী সাধু কখনও দেখে নি। ঝকমকে মুখ লোকটার—গোলগাল। মাথায় টাক আছে। সচরাচর ম্যাজিকের তাঁবুতে রিংমাস্টাররা এমন এমন পোশাক পরে। আর সার্কাসের তো কথাই নেই। তারা সবাই উঁচু জাতের মানুষ। সাধুর ধারণা এরকম।

সাধু কৌতূহলী হয়ে বসে পড়ল আসরের ফাঁকে। অমনি তার দিকে চোখ গেল বউটির। —কী ভাই? বসবে নাকি একহাত? হ্যালো মিস্টার, আমাদের নতুন প্লেয়ারকে একটু জায়গা দিন না—প্লিজ।

সাধুর কান জুড়িয়ে গেল। সিনেমায় এমন কণ্ঠস্বরে কথা বলে মেয়েরা। সে ঝোঁকের বশে একটা

টাকা বের করে চিড়িতনে ধরল।

খড়খড় শব্দ করে সায়েবজুয়াড়ী কৌটো নাড়তে থাকল। আর সেই মুহূর্তে সাধুর মনে হল আশ্চর্য—এলোকেশীর গন্ধটা সে পাচ্ছে। অবিকল সেই গন্ধ। সাধু নাক উঁচু করে লুকিয়ে শুঁকল। অভিভূত হয়ে গেল। সাধুর মনে হল, তার মধ্যে একটা ওলটপালট শুরু হয়ে গেছে।

গুটি ছড়িয়ে পড়েছে ছকে। সাধু জিতেছে। মেয়েটি নিজের হাতে তার দিকে দুটো টাকা ঠেলে দিয়ে বলল—নিন ভাই। আপনার গুড লাক।

সাধু খুশি হয়ে বলল—আর আপনাদের ব্যাড লাক !

ভিড় হেসে উঠল। সাধুও হাসল। ব্যাড লাক কথাটা মওকা মতো বলার আনন্দে সে অস্থির হয়ে উঠল। হুঁঃ, কী কাণ্ড। কোথায় সে এক ছোটলোক বাসনওয়ালা সেজে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে একশোবার বাবুমশাই করেছে!

খেলার নেশা মাথায় চড়ে গেছে সাধুর। মাঝে মাঝে সে টের পাচ্ছিল, আজ রাতে মানুষ মারার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর এক বিপজ্জনক জায়গায় সে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু মেয়েটির মুখের হাসি, মিঠে কথাবার্তা ওকে তক্ষুণি সেই বোধ থেকে সরিয়ে আনছিল।

সাধুর হাতে মোটে পনেরটা টাকা ছিল। কয়েক দান পরে সে হিসেব করে দেখল আরও দশটা টাকা বেড়ে গেছে। একটা পাঁচ টাকার নোট ধরবে নাকি ? একটু ভাবনা-চিন্তা করার জন্যে সে মুখ ফেরাল—তারপরই দেখল, তার চিনতে এতটুকু ভুল হল না—সেই শ্যাম তার পাশেই বসে কতক্ষণ থেকে খেলছে!

মুহূর্তে শরীর শক্ত হয়ে গেল তার। শ্যাম তাকে নিশ্চয় দেখেছে এতক্ষণ, কিন্তু চিনতে পারেনি বোঝা যাচ্ছে। চেনার কথাও না। সাধুর পরনে নতুন জামা কাপড়-মুখে স্নো, মাথায় গন্ধ তেল এবং পরিপাটি চুল আঁচড়ানো। চেনার কোন উপায় তো নেই। তাছাড়া সাধুর চেহারাটাও তাকিয়ে দেখার মতো।

কিন্তু আপাতত কী আর করবে সাধু? সে শ্যামের দানের দিকে তাকাল। শ্যাম দশ টাকার নোট বার করে ড্রাগনে ধরেছে—মুখে শব্দহীন হাসি, চোখের দৃষ্টি জুয়াড়ীর বউয়ের দিকে। মেয়েটিও মুখ টিপে হাসল। সাধুর মনে হল, এতক্ষণ ধরে শ্যামের দিকেই বউটির মনোযোগ যেন বেশি। তার সঙ্গেই বেশি কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। প্রচণ্ড এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষেপে গেল সাধু। সে পাঁচ টাকার নোটটা রেখে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল রাজমুকুটে। জুয়াড়ী বলল—কত ?

—পুরো।

সাধু চোয়াল শক্ত করে তাকাল শ্যামের দিকে। শ্যাম তাকে একবার দেখে নিয়ে বাঁকা ঠোঁটে হাসল।

জুয়াড়ীর হাতের বালা ঝিলিক দিল। বাদামী কৌটোটা নড়তে থাকল মুখের ওপর—ঘুরে ঘুরে ছকের আকাশে বাজপাখির মতো কিছুক্ষণ বেড়িয়ে শোঁ করে ছকে বসে পড়ল। আরো কিছুক্ষণ থেমে থাকল জুয়াড়ীর হাত। আঙুলে একগাদা আংটি, লাল-নীল পাথর বসানো—সাধুর চোখ সেখানে আটকে আছে। ভিড়ে যেন চাপা উত্তেজনা—দম আটকানো কী হয় কী হয় ভাব। বউটি শান্ত হেসে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। জুয়াড়ী হেঁকে উঠল—আউর কৈ হ্যায়? এক—দো—তিন—চার.....

চিড়িতনে কে একটা সিকি ফেলল।

—পাঁচ ....ছে....সাত ....আট ....

হরতনে একটা টাকা পড়ল।

—নও.... দশ!

কৌটো উঠে গেল। শ্যাম জিতেছে। সাধু? সাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। সে গুটির কিছু বোঝে না। প্রতিমুহূর্তে ভাবল, এই বুঝি বউটি অন্যবারের মতো তার দিকে আরও দশ টাকা এগিয়ে দেবে। কিন্তু না। সমানে মিটিমিটি হাসছে সে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে।

সাধু দেখল জুয়াড়ীর আংটি-পরা বিরাট থাবা ছকের সব টাকা-পয়সা টেনে নিল। শ্যামের দিকে আগেই আর একটা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়েছিল সে এবং শ্যাম নিজে দানের টাকাটা টেনে নিয়েছিল

তক্ষুনি। শ্যাম গুটি চেনে।

সাধু প্রায় ককিয়ে উঠল—কী হল?

বউটি ঠোঁটের হাসিতে ভিজিয়ে জবাব ছুঁড়ে দিল—ব্যাড লাক।

সাধু অমনি উঠে পড়ল। জেতা টাকাগুলোর ওপর দিয়েই গেল—খুব বেঁচে গেছে সে।

—ও কি ভাই! এর মধ্যেই হয়ে গেল?

সাধু দেখে মেয়েটির চোখে কী যেন ঝিলিক দিচ্ছে। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে হাসি শুরু হল। রাঙা মুখে সাধু ভিড়ের বাইরে যেতেই একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুটি গুটি আবার অন্য ভিড়ের দিকে এগোল সে। অন্যরকম উষ্ণতা দরকার। কিন্তু পায়ে যেন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

একটা চায়ের দোকানে কিছুক্ষণ বসে চা খেল সে। তারপর ঝুমুরদলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। সারা মেলা ঘুরে কোথাও ঝুমুরদলের পাত্তা পেল না সাধু। তাহলে কি ওরা এবার আসেনি? মন আরও খারাপ হয়ে গেল তার। কথাটা কাকেও জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করে। ওকে লম্পট ভাববে যে!

অগত্যা সাধু যাত্রার আসরে ঢুকল। যুদ্ধের সিন চলছে। তার মানে শেষ অঙ্ক। সাধু দেখল অনেকে শতরঞ্জি ও তেরপলে গড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। যাত্রার দিকে তার উৎসাহ ছিল না। এক ফাঁকে ভিড়ে ঢুকে বসে পড়ল। তারপর হাই তুলতে তুলতে গড়িয়ে পড়ল। সহজেই ঘুম এসে গেল তার। আজ সারাটা দিন কম ধকলটা তো যায়নি।

ঘুমিয়ে সাধু স্বপ্ন দেখছিল। 'খাগড়ি'র খড়ের বন পেরিয়ে সে আসছে। বনে আগুন লেগেছে। দম আটকে যাচ্ছে তার। পালাতে যাচ্ছে, পা ওঠে না। বাসনওলা চাঁদতারণ চেঁচিয়ে বলছে—মার মার! ঝুমুর দৌড়ে এসে তার বুকে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল সাধুর।

ধুড়মুড় করে উঠে বসল সে। আসর ছত্রখান। লোকজন উঠে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি করছে। মাথায় ফেট্টি বাঁধা লোকেরা লাঠি তুলে চ্যাঁচাচ্ছে—বসে পড়ুন, বসে পড়ুন!

মার মার আওয়াজ একটা আসছে। সাধু ভিড় ঠেলে আওয়াজটার দিকে এগোল। পেছনে কোথাও হট্টগোল হচ্ছে। লোকেরা সেদিকেই ছুটে যাচ্ছিল। সাধু গিয়ে দেখল জুয়াড়ীদের আসরে মারামারি লেগেছে। আসর গুটিয়ে ফেলেছে ওরা। সাধু ভিড় ঠেলে সেই সায়েব জুয়াড়ীর খোঁজ করতে ব্যস্ত হল।

যা ভেবেছিল, তাই। মারামারিটা ওখানেই হয়েছে। সায়েবজুয়াড়ীর নাক ফেটে রক্ত পড়ছে। তার হাতে একটা বাঁকানো ডাণ্ডা—মোটরেব হ্যান্ডেলের মতো। তাকে ধরে আছে ওর বউ—বড় বড় চোখ, নাকের ফুটো কাঁপছে। ব্যাপারটা কী? সাধু একজনকে জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে দাদা?

লোকটা জবাব দিল—শালা জুয়াড়ী আর এক গুণ্ডার মারামারি! চিরকাল এমন হচ্ছেই। ছেড়ে দিন মশাই।

অন্য একজন বলল—দোষটা যাই বলো, জুয়াড়ীর নয়। তুই শালা কপালের দোষে হারছিস—ও কী করবে? এ তো হারজিতের খেলা। খেলতে বসলি কেন?

আর একজন বলল—শ্যামাটার খুব বাড় হয়েছে। গতবার ও নজর জুয়াড়ীকে ছুরি মারতে গিয়েছিল। মগের মুল্লুক পেয়েছে মাইরি!

সাধু চমকে উঠেছিল।—শ্যামা কে দাদা?

—বনকাপাসির শ্যামা মজুমদার। এখনও গুয়োর ডিম ভাঙেনি—মারামারি করে বেড়ান শালার পেশা হয়ে উঠেছে। মরবে—নির্ঘাত মরবে।

সাধু অনেকটা বুঝল। সেই শ্যাম! তার মাথায় আগুন ধরে গেল। হনহন করে এগিয়ে সায়েবজুয়াড়ীর কাছে গেল সে। জুয়াড়ীর বউ ওকে এমন করে এগোতে দেখে চমকে উঠেছিল।

সাধু বলল—কী হয়েছে বউদি?

পরক্ষণে নিজেই অবাক হল। বউদি বলে ফেলল একেবারে। বউটি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—কী ভেবেছে এরা? ভেবেছে বোস-সায়েবের কেউ নেই? জানে না যে খবর দিলে শহর থেকে একশো লোক এসে মেলা অ্যাটাক করবে?

সাধু বলল—শ্যামা মেরেছে নাকি?

জুয়াড়ী নাকের রক্ত রুমালে মুছে বলল—হ্যাঁঃ।

—কই সে? সাধু মুখ তুলে শ্যামাকে খুঁজল।

ভিড়ের একজন বলল—সে কি আর আছে মশাই? এতক্ষণে মেলা থেকে কেটে পড়েছে।

সাধু হঠাৎ এক টানে কাঁধ থেকে ব্যাগটা খুলে ফেলল। তারপর জুয়াড়ীর বউয়ের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল—এটা রাখুন বউদি। আমি শালাকে দেখে আসছি!

বউটি হাত বাড়িয়ে ঝোলাটা নিল—হয়তো ভীষণ অবাক্ হয়েছিল—তাই যন্ত্রের মতো নিল। ভিড়ও অবাক্ হল নিশ্চয়। সাধু পাগল হয়ে বেরোল।

এমন অদ্ভুত জেদ কোনদিন সাধু দেখায়নি। আজ কী একটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল তার। সারা মেলা প্রায় প্রতিটি মুখ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না সেই চেনা মুখটা। শেষরাতের মেলা প্রায় ঝিমোচ্ছে। যাত্রার আসর ফাঁকা। সবাই ঘুমোচ্ছে দোকানে ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে।

সাধু যখন ফিরল, তখন জুয়ার আসরগুলোও ফাঁকা। শেষরাতের কুয়াশা নীল হয়ে ঘিরে ধরেছে ওদিকটা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। ক্লান্ত সাধু সায়েব জুয়াড়ীকে খুঁজছিল। দেখল একটা আমগাছের পাশে ছোট্ট তাঁবু রয়েছে। তার পাশে—কী অবাক্, একটা হুডখোলা ছোট্ট মোটরগাড়িও আছে। হ্যাসাকটা তাঁবুর ভিতরে রয়েছে। জুয়াড়ী বাইরে বসে সিগ্রেট টানছে। তার বউ তাঁবুর ভেতরে কীসব গোছাচ্ছে। সাধু কাছে গিয়ে বলল—ব্যাড লাক। তারপর খিকখিক করে একটু হেসে ফেলল।

ভেতর থেকে বউটি তাকিয়ে সাধুকে দেখল। জুয়াড়ী বলল—ছেড়ে দিন, ভাই!

—ছাড়ব না। দেখবেন। আমার নামও সাধু।

—জুয়াড়ী তাকাল। —কোথায় থাকেন?

—হরিণমারা।

—সে কোথায়?

—গঙ্গাপারে। আমার বাবাকে ও তল্লাটে সবাই চেনে—কালু মুখুজ্যে। নাম শুনলে ভিরমি খায় লোকে। ... সাধু আবার হাসতে লাগল। .... তবে বাবা নেই। তার ছেলে তো আছে!

—বসুন ভাই, বসুন। একজন মাত্র সাপোর্টার পেলুম এ মেলায়—বুঝলেন? এই শুধু আপনি। শালা, একজনও আমার হয়ে কথা বলল না? কী দেশ মশাই!... জুয়াড়ী মুখ ঘুরিয়ে বউকে ডাকল।—লতা! স্টোভটা জ্বালো। কড়া করে চা করো। আর ঘুমটুম হবে না। ভাইটিকে চা খাইয়ে দাও। বিস্কুট থাকলে দিও।

একটা শতরঞ্জি দিল জুয়াড়ী। সাধু বসল। তারপর বলল—আপনার দেখছি মোটরগাড়িও আছে?

—আছে ব্রাদার। সঞ্জয় বোস আনি-দুয়ানির খেলা করে না। নামডাক শুনে এসেছিলুম এখানে। এরা নিলে তো একগাদা টাকা—অথচ নো সিকিউরিটি! মাথা বাঁচাতে এল না মশাই! কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন! আমি কালই পালাব এখান থেকে!

তাঁবুর মধ্যে স্টোভের শোঁ-শোঁ আওয়াজ শোনা গেল। সাধু বলল—দাদার থাকা হয় কোথায়?

—স্থায়ী ডেরা একটা আছে ভাই। কাটোয়ায় একটা পৈতৃক বাড়ি আছে। তবে শুকনো মরশুমে—মানে ড্রাই সিজিনে রাঢ় অঞ্চলে মেলায় মেলায় ঘুরি। এ একরকম নেশা বলতে পারেন!

—সঙ্গে দু-একজন লোক রাখা উচিত, দাদা। সাধু পরামর্শ দিল।

—উচিত তো বটে। ছিলও আগে। তবে বুঝলেন—সব শালা ঠক। এটা-ওটা হাতিয়ে কেটে পড়ে শেষ অবধি।

সাধুর ইচ্ছে হল—বলে, আমাকে নিন। কিচ্ছু ঠকবেন না। কিন্তু পারল না। কী ভাববে যেচেপড়ে এমন করে বললে! যদি নিজে থেকে বলে তো বলুক। সাধু তক্ষুণি রাজি হয়ে যাবে। সে বলল—মানে, বিশ্বাসী লোকের কথা বলছি। যে আপনার বিপদের সময় চাকু চালাতে পারবে!

ওর কথা শুনে বোসসায়েব হেসে খুন হল।—আরে! ও লতা? শুনছ কী বলছে এ? বলে—চাকু চালাতে পারবে!

ভেতরে চা করতে করতে লতা বলল—ঠিকই বলেছে।

—তুমিও সায় দিচ্ছ ওকে? ভাল। তাই নেব এবার। বোস নিজে চাকু চালিয়ে এত বড় হল—তাকে এবার চাকুচালানোর লোক নিতে হবে!...খুব হাসতে লাগল সে।

লতা চায়ের কাপ নিয়ে বেরল। আগে সাধুর হাতে একটা কাপ দিয়ে বলল—ভাগ্যিস, তুমি ছিলে ভাই! নয়তো এতক্ষণ কী যে মনখারাপ হয়ে যেত। বিদেশবিভুঁয়ে কেউ এসে সাপোর্ট করলে মনটা খুশি হয়।

বলেই সে তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে ঘুরল। হাসিমুখে একটু চুপ থেকে সাধুর দিকে তাকাল। ফের বলল—সেই লোকটাকে খুঁজে পেলে কী করতে ভাই তুমি?

সাধু গম্ভীব হয়ে বলল—চাকু চালাতাম।

বোসসায়েব হো হো করে হেসে উঠল।—বলেন কী! সর্বনাশ!

লতা খুশি হয়ে বলল—তেমন কিছু করলে দেখতে আমরা তোমাকে হাঙ্গামা থেকে বাঁচাতুম। নি-ু " বাঁচাতুম।

ধূর্ত বোস বলল—ভালো, ভালো। কিন্তু ব্রাদার, হঠাৎ আমার মতো একজন অচেনা লোকের হয়ে কেন শ্যামা না বামাকে আপনি স্ট্যাব করতেন? উঁ?

সাধু বলল—কেন?

—হ্যাঁ। কেন?

সাধু কথা খুঁজল। ঠিকই তো। কেন সে শ্যামাকে খুঁজতে গিয়েছিল? মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে আস্তে আস্তে বলল—আজ রাস্তায় আসতে আসতে শালা আমাকে ঘুষি মেরেছিল। সামান্য কথা নিয়ে। বুঝলেন? তখন থেকেই রাগটা ছিল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আবার একদফা হাসল। সাধুও হাসল। শেষরাতের নিঝ্ঝুম ঠাণ্ডা বাগানের তলায় চা খেতে খেতে সাধুর মনে হল, এদের সঙ্গে থাকতে পেলে স ভারি খুশি হত। এরা কি তাকে নেবে?

সাধু জেলে থাকতে খুব ভোরে ওঠার অভ্যাসটা বাধ্য হয়ে করেছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এই দু-তিনটে দিন যেখানে শোবার সুযোগ পেয়েছে, বেলা অবধি ঘুমিয়ে তা উসুল করেছে। ছেলেবেলা থেকেই দেরিতে ওঠা তার অভ্যাস। এজন্যে মায়ের পিটুন আর চিমটি কম খায়নি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর সব ব্যাপারেই প্রচুর স্বাধীনতা তার জুটে গিয়েছিল। বাবা তো অন্য জগতেব বাসিন্দা। তার নিয়ম-কানুন দিনকাটানো বা জীবনযাপনেব রীতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কারও সঙ্গে তা মেলাবার নয়। আর সাধু যে তারই ছেলে, বাবা যেন তাও জানতো না। কে না কে একটা ছেলে, বাড়িতে মানুষ হচ্ছে—এই রকম। তার ফলে মা-ই ছিল সাধুর একমাত্র গার্জেন। যদ্দিন মা বেঁচেছিল, লেখাপড়া হয়েছিল। তারপর মা মরল তো সেটুকুও গেল। সাধুর কিছুদিন তখন কী আনন্দ! বেলা পর্যন্ত পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। কেউ চিমটি কেটে চুল খামচে ব দিতে দিতে তাকে আর ওঠায় না।

সাধুর মা মারা গিয়েছিল গলায় দড়ি দিয়ে। অন্তত ছেলেবেলার স্মৃতি এবং লোকজনেরা তাই বলে। পরে জ্ঞানবুদ্ধি হয়ে তার যখন ফাঁসিবিদ্যায় হাতেখড়ি হল, সাধু প্রথমেই সন্দেহ করেছিল, মায়ের মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয়। কিছু আবছা স্মৃতি তার মনে ভেসে এসেছিল তখন।

বর্যরা রাত ছিল সেটা। বাবা-মার কী নিয়ে প্রচণ্ড মারামারি হয়েছিল সন্ধ্যাবেলায়। তার ফলে সে-রাতে আর খাওয়া-দাওয়া হল না। পেটে খিদে নিয়ে তো ঘুম আসে না কারও। হয়তো তন্দ্রামতো এসেছিল বড়জোর—হঠাৎ সাধু শোনে, কালু মুখুজ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কোথা থেকে কান্নাটা

আসছে, ঠাহর করতে একটু দেরি হল সাধুর। ঘর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টিটা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ছাদ আর গাছপালার পাতা চুঁইয়ে তখনও টুপটাপ করে জল ঝরছে। প্রচণ্ডভাবে পোকামাকড় আর ব্যাঙ ডাকছে। কানে তালা ধরে যাবার উপক্রম হচ্ছিল সাধুর। তার মধ্যে বাবার হেঁড়ে গলার কান্নার শব্দ নিয়ে গোলমালে পড়া স্বাভাবিক এতটুকু ছেলের পক্ষে।

বাবাই যে কাঁদছে, তা তক্ষুণি বুঝেছিল। কারণ, মদ খেয়ে বাবার মাঝে মাঝে অমনি করে কান্না পেত। সাধু পেন্টুলটা একহাতে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফাঁস দিলে প্রায়ই গেরো পড়ে পেন্টুলের দড়িটা বিপত্তি ঘটাত বলে সে কোন রকমে দড়ি পরানোর ফাঁক ফাঁক দুটো গুঁজে রাখত পেটে এবং শুলে তা সম্ভবত খুলে যেত।

সাধু উঠে অন্ধকারে প্রথমে মাকে ডেকেছিল। সাড়া না পেয়ে ব্যাপারটা দেখতে পা বাড়িয়েছিল। সেই সময় কার সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা!

ওটা তার মাই বটে। কিন্তু মা যেন শূন্যে ভেসে আছে। সে একহাতে আঁকড়ে ধরলে মা দুলছে মনে হল। সাধু ভয় পেয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠেছিল—মা!

তখন কালু মুখুজ্যে বাইরে থেকে কান্না থামিয়ে গর্জে উঠেছিল—কী রে শালা? ফাড়ছিস কেন মা মা করে?

কালু মুখুজ্যের ভাষাই আলাদা। সাধু বাবাকে গ্রাহ্য করত না অবশ্য—সম্পর্ক ছিল না, তাই। সে পালটা চেঁচিয়ে বলেছিল—মা এখানে ঝুলছে কেন?

—চো-ওপ্ শালা! শুয়ে পড়্। তোর মা স্বগ্যে গেছে।....

মায়ের কথা ভাবলেই বাবার ওই চাপা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পায় সাধু। এখনও পায়। কিন্তু আজ তার দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা মাকে ফাঁস লাগিয়ে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

সাধু খুব নিরাসক্ত হয়ে পড়ে এসব কথা ভাবলে। তার মনে হয়—কাজটা হয়তো শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল। মা বেঁচে তাকলে কি সে এমনি করে যেখানে খুশি বেড়াতে পারত—যা মন চায়, করতে পারত? বাবা-মা ব্যাপারটা কী কাজে লাগে সাধু বুঝতেই পারে না।

সাধুর যখন ঘুম ভাঙল, তখন বাইরে রোদ বেশ ঝকমক করছে। কয়েক মুহূর্ত সে বুঝতে পারল না কোথায় শুয়ে আছে। সাদা কাপড় টানটান হয়ে বেঁকে উঠে গেছে কোথায়, শেষ দেখার জন্যে সে পাশ ফিরল—তারপর সব মনে পড়ল। হুঁ, বোসসায়েবের তাঁবুতে মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে সে শুয়ে পড়েছিল। তখন প্রায় শেষরাত। বোসসায়েবের বউ শুল ক্যাম্পখাটে—সাধুর পাশাপাশি মেঝেয় শুল বোসসায়েব। তারপর যেন হঠাৎ উঠে গেল কোথায়। আর এল না। কোথায় গিয়েছিল সে?

সাধু দেখল জায়গাটা এখনও খালি। বোসসায়েবের কম্বলও নেই। পরক্ষণে চমকে উঠল সাধু। তাহলে এতক্ষণ সে আর বোসসায়েবের বউ এক তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিল? তার রক্ত চঞ্চল হল সঙ্গে সঙ্গে। কী সুযোগ না গেছে!

সুযোগ আবার আসতে পারে। কিন্তু আবার যদি এইরকম গাঢ় বিশ্রী ঘুম এসে যায়! বোসসায়েবের বউয়ের হাতে কানে ও গলায় কী আছে, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না যদিও। কাল রাতে ওসব কিছু লক্ষ্য করেনি সে। ছিল কি কিছু? থাকবে না কেন? এত টাকা-পয়সা নিয়ে কারবার—একটা আস্ত মোটরগাড়ির মালিক—তার বউয়ের গয়না থাকবে না—এটা কি কথা হল?

সাধু দেখল—আশ্চর্য, তুলোর কম্বলের ওপর একটা পশমী কালো কম্বল চাপানো রয়েছে। তাই প্রচুর ওম তাকে আরামে প্রচণ্ড রকমের একটা ঘুম দিয়েছিল! সে উঠে বসল। তারপর দেখল বোসসায়েবের বউ আমগাছের তলায় স্টোভ জ্বেলে পাঁউরুটি সেঁকছে। সটান সেখানে চলে গেল সাধু। প্রথমে তার হাতের দিকে তাকাল। নিরাশ হল। শুধু কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। না শাঁখা না নোয়া! স্রেফ সিঁথিতে একফালি ক্ষীণ সিঁদুর নিয়েই এয়োতি! বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত। কান লক্ষ্য করে সাধু আরও নিরাশ হল। দুটো সাদা পাথরের ফুল মাত্র। গলাতে যে হার-টার নেই—তা বোঝা যায়।

না—আছে। আছে! চোখ জ্বলে উঠতে গিয়ে আবার মিইয়ে পড়ল সাধু। পুঁতির হার! সাধু পেছনে

দাঁড়িয়ে মনে মনে গর্জাল—শালাদের শুধু ভড়ং! কে জানে গাড়িটাও খেলনার কী না।

লতা ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে মিষ্টি হাসল। —উঠে পড়েছ? মুখ ধুয়ে ফেল ভাই। চা করছি।

সাধু বলল—দাদা কোথায়, বউদি?

—গাড়িতে ঘুমোচ্ছে। লক্ষ্মীটি, জাগিয়ে দাও না ভাই!

সাধু এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। হুড তুলে পেছনের দিকে কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে জুয়াড়ী। এখনও নাক ডাকছে। কম্বলটা গড়িয়ে নিচে পড়েছে। একটা ফুল হাতা পুরু সোয়েটার আর ডোরাকাটা পাজামা পরে দিব্যি ঘুমোচ্ছে লোকটা।

সাধু চাপা গলায় ডাকল—দাদা, দাদা! উঠুন! উঠে পড়ুন।

অদ্ভুত ঘুম তো! তক্ষুনি নাক ডাকাটা থেমে বোস সায়েব লাল চোখে তাকাল। আবার চোখ বুজল।

সাধু হাসি চেপে বলল—দাদা! বউদি চা করেছে। উঠুন!

বোসসায়েব জড়ানো গলায় বলল—বেডটি কই?

কী বলে রে বাবা! সাধু স্টোভের কাছে গিয়ে বলল—দাদা উঠছেন না। কী যেন বললেন—বেট্টি দাও!

লতা হেসে উঠল। —এত বেলায় আর বেডটি খাবে কী? ও কি ভেবেছে বাড়িতে শুয়ে আছে? তুমি তো মুখ ধোও। আমি দেখছি।

সাধু আড়ামোড়া ছেড়ে খুশি খুশি ভাব প্রকাশ করল। সে এখন এদেরই একজন হয়ে গেছে। সেই রকম চালচলন তাকে মেনে চলতে হবে বৈকি। তাঁবুতে ঢুকে মাথার কাছ থেকে বালিশ-করা ঝোলাটা হাতড়াল সে। কিছু লন্ডভণ্ড হয়নি তো? হয় নি দেখে আশ্বস্ত হল। কাঁধে ব্যথার কারণ নিশ্চয় স্নো আর তেলের শিশিটা। সে পেস্ট বের করল। ইস্! চেপ্টে গেছে একেবারে। নতুন ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে খুব দাপটে ঘষতে ঘষতে সে দীঘির ঘাটের দিকে এগোল।

মেলার অনেকগুলো দোকান ইতিমধ্যে খুলে গেছে। কিন্তু একেবারে খাঁ খাঁ বললেই চলে। চা আর খাবারের দোকানে যে অল্পস্বল্প ভিড়—তা দোকানদারদেরই। গ্রামটা পিছনের দিকে। গ্রাম আর মেলার মধ্যে এই বিশাল দীঘিটা রয়েছে। ঘাটের এক পাশে সেকেলে শিবমন্দির। তার চত্বরে অনেক লোক রোদ পোহাচ্ছে। ঘাটে কিছু লোক এত ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে স্নান করছে। কেউ হাত-মুখ ধুচ্ছে। সাধু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জোর ব্রাশ চালাল। মুখভর্তি ফেনা নিয়ে সে ওপাশের লোকগুলোকে খুব তাচ্ছিল্য করে দেখছিল।

এদিকে-ওদিকে আরও কিছু ঘাট আছে। সেখানে গ্রামের মেয়েরা থালা-হাঁড়ি ধুচ্ছে। জল ভরছে। এক পাড়ে সার্কাস আর ম্যাজিকের তাঁবু। মাঝে মাঝে বাঘ ডেকে উঠছে। সাধুর মনটা খুশিতে ভরে গেল। আজ সার্কাস দেখবে। সিনেমাও এসেছে। চারদিকে অস্ফুট কত রকম শব্দ করে একটা বড়ো রকমের আনন্দের দরজা খোলা হচ্ছে। এ মুহূর্তে শ্যামকে সামনাসামনি পেলে সাধু সহজেই ক্ষমা করে দেবে।...

মুখ ধুয়ে মুখের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা আর জ্বালা করছিল। অভ্যাস নেই পেস্টে দাঁত মাজা, তাই। অভ্যাস হয়ে যাবে ক'দিনেই। শিস দিতে দিতে সে এগোল। তেঁতুলতলায় কপাট-চৌকাঠ তক্তপোশের পাহাড় জমে আছে। চকিত চোখে সে দেখে নিল জায়গাটা। দরকার হলে কি কোন শিকার মিলবে না এখানে? এদিকটাতে খোলামেলায় একটেরে লোকগুলো থাকে। কপাট আর তক্তপোশ দিয়ে ঘর বানিয়ে নিয়েছে। বড্ড ফাঁকির ঘর। দরজা বলতে একটা চটের পর্দা ঝুলছে। টাকা-পয়সা কোথায় লুকিয়ে রাখে ওরা? সাধু ঠিক করল, সন্ধ্যায় একবার আসবে।

মনোহারি দোকানের লাইনে এসেই সাধু থমকে দাঁড়াল। তার শরীর অবশ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঝুমুর আর সীমা দাঁড়িয়ে একটা দোকানের সামনে। কিছু কিনছে নিশ্চয়। একটা কমবয়সী হাফপ্যান্ট পরা ছেলেও তাদের সঙ্গে এসেছে। সাধু পারলে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বলে উঠত—পুড়ে মরোনি তোমরা? আসতে পেরেছ বেঁচে-বর্তে?

ঠাণ্ডা অবশ শরীরে প্রায় পা টিপে টিপে তাদের পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল সাধু। কিন্তু কে তার তীক্ষ্ণ ধূর্ত দৃষ্টিটা ওদিকেই আটকে রাখছিল।

ওদের পেরিয়ে গিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। তারপর মনে হল—আর কি তাকে ওরা চিনতে পারবে? সে পোশাক সে চেহারা তো এখন তার নেই। অবশ্য সেই বন্দুকবাজ ঘোড়েল মোক্তারবাবুটির মুখোমুখি পড়লে কী হয়, বলা যায় না।

ভাল মন নিয়ে মুখ ধুতে গিয়েছিল সাধু। ফিরল খারাপ মন নিয়ে। এত খারাপ কখনও হয়নি তার মন—এত তেতো, হতাশ, ক্ষিপ্ত আর সন্ত্রস্ত সে কখনও হয়নি।

বোসসায়েব গাড়িতে বসে চা খেতে খেতে তাকে ডাকল—কাম অন ব্রাদার। আ যাও হেঁয়াপর!...

পাঁচ

সঞ্জয় বোস রাগ করে মেলা ছেড়ে চলে যাব বলেছিল। শেষ অবধি গেল না। মেলা কমিটির কর্তারা এসে খুব সমবেদনা দেখিয়ে গেলেন, সেটা নিশ্চয় একটা বড় কারণ। তবে তার চেয়েও বড় কারণ যতীন দারোগার আকস্মিক আবির্ভাব। থানা হচ্ছে গোঁসাইতলায়। অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প মেলায় একটা বসানো হয়। যতীন দারোগা মাঝে মাঝে এসে দেখেশুনে যায়। এবার এসে সঞ্জয়কে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল—হ্যালো বোস! তুমি এখানে?

সঞ্জয় জুয়াড়ী যতীন দারোগাকে দেখে পারে তো ঘুষি মেরে পাথর ফাটায়। যতীন সরকারও কাটোয়ার লোক। ক্লাস ফ্রেন্ড ছিল স্কুলে। পরস্পরের খোঁজখবর বরাবর রেখেছে। আই. এ. পড়তে পড়তে দু'জনেই পড়া ছেড়ে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিল। তারপর যতীন যুদ্ধের পর পুলিশে ঢোকে। সঞ্জয় ঢুকেছিল সার্কাসের দলে। যতীন সাব-ইন্সপেক্টর থেকে থানার ও-সি হয়েছিল। সঞ্জয় সার্কাস ছেড়ে জুয়াড়ী হল। এই গতিপথ অবশ্য সাবলীল নয়। অনেক টানাপোড়েন উত্থানপতন ঘটেছে। তবে লতাকে যতীন দেখেনি। এই প্রথম দেখল। খুশি হয়ে বলল—বেঁচে গেছ হে বোস। এবার তোমার উন্নতি হবে।

আর কী! মেলায় সঞ্জয়ের দাপট বাড়ার পক্ষে এই যথেষ্ট। আর সব জুয়াড়ী সঞ্জয়ের ভাষায় নেহাত 'গাঁইয়া' এবং 'আনি-দুয়ানির' মাল। সম্বল মোটে জুয়ার টাট আর একটা গ্যাসবাতি। শোয় গাছতলায়, নয় তো বারোয়ারি আটচালায়। কেউ মন্দিরের ওদিকে গিয়েও মাথা গোঁজে। তারা এই গাড়ি-তাঁবু-প্যান্ট, কোট, টাইওয়ালা রীতিমতো সায়েবজুয়াড়ীর প্রতি ঈর্ষায় জ্বলে মরছিল। কতরকম চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছিল তলে তলে। শ্যামকে হয়তো তারাই খানিকটা লেলিয়ে দিয়েছিল। এখন দারোগার সঙ্গে সঞ্জয়ের দহরম-মহরম দেখে ট্যারা হয়ে গেছে।

শ্যামকে যতীন দারোগা বিলক্ষণ চেনে। সব শুনে বলেছে—বোস। এবার শালাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছি। বড় বাড় বেড়েছে কায়েতের পোর। এখানে ওখানে টুকিটাকি মারধোর করে হাত পাকাচ্ছে। কোন্ পথে এগোচ্ছে, তা তো বোঝাই যায়। পরে তখন শালা আমার চোখের ঘুম কাড়বে। অঙ্কুরে নিপাত করছি।

আর সঞ্জয় বিয়ে করেছে—এতে যতীনের আনন্দ হবে না তো হবে কার? দারোগাও তো মানুষ—সংসারী মানুষ বইকি। ছাপোষা গৃহস্থের মতো 'বউমা'কে আশীর্বাদ করেছে—যেহেতু সে বন্ধুর চেয়ে বয়সে দু'বছরের বড়। বলেছে—বুঝলে বউমা? একে আমি শালা-টালা বলব, দোষ নিও না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আমার অন্য সম্পর্ক।

ওদিকে সাধুর অবস্থা তখন শোচনীয়। গোড়ায় কিছুক্ষণে যতটা পারে আড়ালে-আড়ালে থাকবার চেষ্টা করছিল, শ্যামার পরিণতি আঁচ করে আনন্দে ফেটে পড়ছিল—পরে কিন্তু দারোগা যত এদিক-ওদিক তাকিয়ে কথা বলে, তত সে পিছু হটতে হটতে কেটে পড়েছে মেলার ভিড়ে। একটা চায়ের দোকানের ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে শেষ অবধি। একটা চোখ বাইরে, অন্য চোখ দরমা-বেড়ার দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারে। কতরকম সুন্দরী, কত গয়না পরা চেহারা সব। কিন্তু ছবির লোভনীয় সৌন্দর্য মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্বাদ করেছে পুলিশের সম্ভাবনা। দারোগার চোখ কী জিনিস, সাধুর চেয়ে বেশি করে

কেউ তো জানে না।

তার ভাবনা হচ্ছিল, কথায় কথায় বোসসায়েব তার কথা বলে বসবে না তো দারোগাকে? বললেই হয়েছে যে হরিণমারার কালু মুখুজ্যের ছেলে সাধু—বাস্! সাধুর ধারণা, অন্য সব ব্যাপারের মতো পুলিশদের মধ্যেও ব্যাপক যোগসূত্র আছে। সাধুর খবর তারে-তারে পাচার হয়ে সারা দেশের পুলিশে ছড়ায়নি, এটা অসম্ভব। জেলের অভিজ্ঞ দাগীরা তাকে সরকারের এই পুলিশী বন্দোবস্তের কতরকম হাল-হদিস বাতলেছিল। শুনতে শুনতে সাধুর গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। খুব অসহায় লেগেছিল নিজেকে। দুনিয়া জুড়ে যদি জাল পেতেছে, তাহলে তুমি বাঁচবে কেমন করে?

তবে জেল থেকে বেরিয়ে অনেক বড় মাঠ—বহু জায়গায় সাধু বিচরণ করে এল। আশ্বস্ত হয়ে দেখল যে সবখানে পুলিশ নেই। অতবড় খাগড়ির খড়ের বন, বিল, মাঠ, নদী-নালার জগতে কোথায় পুলিশ—কোথায় আসামী ধরার ফাঁদ? ওই সব ফাঁদ বুঝেসুঝে চলাফেরা করলেই তো তুমি দিব্যি গায়ে বাতাস দিয়ে ঘুরতে পারছ।

সাধু অনেক দেরি করে বেরিয়েছিল। চায়ের দোকান থেকে। তাঁবুর ওদিকটা দূর থেকে উঁকি মেরে দেখার পর তবে পা বাড়িয়েছিল। গিয়ে দেখল, লতা বউদির রান্না শেষ। সঞ্জয় জুয়াড়ী নেই। সাধুকে দেখে লতা বলল—কী ছেলে তুমি! তোমার জন্যে বসে আছি কখন থেকে। স্নান করা হচ্ছে না!

সাধুর মনের তলায় বিচিত্র একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠল। তার জন্যে বসে আছে বোসসায়েবের বউ? সে হাসল।—মেলায় ঘুরলাম বউদি। দাদা কই?

লতা গর্বের সঙ্গে বলল—বন্ধুর সঙ্গে বেরোল। এগিয়ে দিতে গেছে। তুমি ভাই পাহারা দাও তো এখানে। বড্ড কাকের উৎপাত। আমি স্নানটা সেরে আসি।

সাধু লতার টুলটায় বসে পড়ল। বলল—দীঘিতে নাইবেন বউদি? বড্ড ভিড় কিন্তু।

লতা চুল খুলতে খুলতে বলল—কী করব বলো? আগে তো বাথরুম ছাড়া স্নান করতেই পারতুম না। এখন তোমার দাদার পাল্লায় পড়ে সব লজ্জা খুইয়ে বসেছি।

লতা হাসছিল। সাধুর মনে হল, ওর হাসিতে দুঃখ আছে। সে বলল—আপনি কোথাকার মেয়ে বউদি?

চুলে চিরুনি চালিয়ে লতা জবাব দিল—বাবার বাড়ি ভাই কলকাতায়। এখন আর কেউ নেই-টেই। একটা ভাই—সে তিন বছর নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ মানে?

—কোথায় চলে গেছে কে জানে! অনেক খোঁজখবর করে পাত্তা পাইনি! হয়তো প্রাণেই মারা পড়েছে। তুমি দেখো ভাই, কেমন? .... বলে লতা তাঁবুতে ঢুকে কীসব হাতড়াতে ব্যস্ত হল।

সাধু বলে উঠল—ধরে নাও না, আমি তোমার সেই ভাই!

বলেই নিজে অবাক্ হয়ে গেল—এমন একটা কথা তার মুখে এসে গেল কীভাবে। ওখানে লতা কথাটা শুনে তার দিকে তাকাল—মুখে কেমন শান্ত হাসি। গুঁড়ি মেরে একটা হাত হাঁটুতে রেখে সে কী টানাটানি করছিল। তারপর মাথাটা দোলাল এবং বেরিয়ে এল সাবানের কৌটো আর তোয়ালে হাতে নিয়ে। বলল—তুমি তো আমার ভাই-ই।

তারপর চলে গেল। সাধু তাকিয়ে তাকিয়ে তার চলে যাওয়া দেখছিল। মেলার পিছন ঘুরে গাছের ছায়ায় যেন নাচের ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে বোসসায়েবের বউ। রাতে যতটা মোটা-সোটা স্বাস্থ্যবতী মনে হয়েছিল—আদতে তা নয়। বেশ খানিকটা রোগা হালকা গড়ন। মুখটাই যা ভরাট। পাঁশুটে রঙ। কপালটা একটু চওড়া। মাথায় যতটা চুল থাকা উচিত ছিল—তা নেই। জংলাছাপের শাড়ি আর হাতকাটা ব্লাউজপরা মেয়েটিকে কেন এত আপন লাগছিল, সাধু জানে না। বোনের ভাই হওয়ার কী সুখ, সে কেমন করে জানবে? শুধু মনটা কেমন করে ওঠে।

লতা চোখের আড়াল হলে কিছুক্ষণ সাধু চুপচাপ বসে থাকল। তারপর হঠাৎ মুখ ও ঘাড় সিধে করল। কী একটা চাপা গরগর শব্দ শোনা যাচ্ছিল নিজের মধ্যে। সে চকিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর সটান উঠে তাঁবুতে ঢুকল।

ক্যাম্পখাটটার তলায় একটা বাক্স দেখেছিল। উঁকি মেরে লক্ষ্য করল, বাক্সয় তালা আঁটা আছে। হাত বাড়িয়ে টানাটানি করল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল—এটা তুলে নিয়েই কেটে পড়া যায়। নিশ্চয় টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি ওর মধ্যে আছে। কিন্তু যেই বাক্সটা টানতে গেছে, পিছনে সঞ্জয় বোসের গান শোনা গেল। চাপা গলায় হিন্দীগান গাইতে গাইতে সে আসছে। তাকে দেখা যাচ্ছিল না। সাধু উঠে দাঁড়াল। তারপর কী করবে খুঁজে না পেয়ে ক্যাম্পখাটে গড়িয়ে পড়ল। চোখ বুজে ঘুমের ভান করল।

সঞ্জয় বোস এসে উঁকি মেরে বলল—অ্যাই রিংমাস্টার। মরেছে রে, নির্ঘাত মরেছে!

সাধু ধুড়মুড় করে উঠে বসল।

—বউদির বিছানায় শুয়েছ? ডান্ডি খাবে, ব্রাদার। উরে ব্বাস, আমাকে ছুঁতে দেয় না। শিগ্‌গির করে এস! মেক হেস্ট! ... বলে স্ফূর্তিবাজ জুয়াড়ী শিস দিতে দিতে কোট খুলতে থাকল।

সাধু অপ্রস্তুত হবার ভান করে বলল—রাত্তিরে ঘুম হয়নি ভাল। চোখ দুটো এঁটে আসছিল।

—ও কোথায়?

—নাইতে গেলেন।

—ওক্কে! ফিরে এলে আমরা দু'ভায়ে খাব। কেমন? এগ্রি?

সাধু মাথা দোলাল।

—বুঝলে ব্রাদার? শালা শ্যামা না রামার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে আজই। থানার বড়বাবু আমার বুজুম ফ্রেন্ড। কী লাক হে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সাধু আড়াল থেকে সব দেখেছিল। বলল—হ্যাঁ, দাদা। সে তো দেখলাম।

—এবার কী করবি রাসকেলরা? অ্যাঁ? বলে সঞ্জয় জোর হাসতে থাকল। সাধুও তার হাসিতে যোগ দিল।

সঞ্জয় পোশাক খুলে ফেলল। তার বিশাল শরীরে থলথলে ভুঁড়ি জমেছে—চর্বি আছে গায়েগতরে। যেখানে রোদ পড়েছে, সেখানে টুলটা পেতে সে বসল। সিগারেটের প্যাকেট খুলে বলল—খাবেনাকি ভায়া? হুঁউ—লজ্জার কী আছে? তুমি খাও—তা আমি টের পেয়েছি। এস—দুভায়ে মৌজ করে সিগ্রেট খেয়ে নিই। ও আসুক—তারপর....তারপর কী?

সকৌতুকে স্ফূর্তিবাজ জুয়াড়ী সাধুর দিকে তাকাল। সাধু বলল—চান!

—চান! বলে সঞ্জয় ওকে জড়িয়ে ধরল প্রায়।

সাধু মদের গন্ধ পাচ্ছিল। কোথাও তাহলে দারোগার সঙ্গে এতক্ষণ খাওয়া হচ্ছিল। কোথায় হতে পারে আর? নিশ্চয় মেলা কমিটির আড্ডায়।

গাছপালার ছায়া ভিজিয়ে দিতে দিতে লতা এসে গেল একটু পরে। সাধু আড়চোখে দেখছিল ওকে। ভিজে শাড়িতে মেয়েদের এসময় কেমন যেন দেখায়। কোথাও কোথাও ফরসা চামড়া স্বচ্ছ কাপড়ের ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সাধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। লতা মোটগাড়ির আড়ালে গিয়ে শাড়ি বদলাতে ব্যস্ত হল। সঞ্জয় বলল—আমরা সেরে আসি দুভায়ে। ভিড় কেমন দেখলে ঘাটে?

লতা কাঁপতে কাঁপতে বলল—গিয়েই দেখ না!

উৎসাহে যতটা নয়, সঞ্জয়ের টানে সাধু দীঘির দিকে এগোল বটে—কিন্তু আসলে সে বরাবর বড্ড জলকাতুরে। স্নান করে কদাচিৎ। তাতে পুরো শীতকালটা সে স্নান করে না। বড়জোর মাথায় একটু জল দিয়ে নেয়। তাতেই তার কাঁপুনির চূড়ান্ত। ছেলেবেলায় মা তাকে স্নান করাবার সময় সে এক প্রচণ্ড কাণ্ড হত। বাড়ি মাথায় করে চেঁচাত সাধু। মা বলত—ওরে গরম জল। দেখ—এই দেখ! তাতে কী? সাধুর সাদা চামড়ায় অজস্র বুজকুড়ি ফুটত ঘামাচির মতো। স্নানের আগেই দাঁতে দাঁত খটখট করে বাজত। মা হাসত—পরে ক্ষেপে যেত। চড়থাপ্পড় খেতে খেতে স্নান করতে হত সাধুকে। কালু মুখুজ্যে বারান্দায় বসে তেল মাখত—নিজে নয়—কোন না কোন পালোয়ান চেলা এ-কাজের জন্যে হাজির থাকত তার কাছে। কালু মুখুজ্যে সাধুর স্নান দেখে বলত—এ শালা আগের জন্মে বেড়াল ছিল।

তা শুনে মা বলত—আর তুমি ছিলে আস্ত একটি ভোঁদড়।

হা হা করে হাসত কালু মুখুজ্যে। পেল্লায় স্বাস্থ্য, মাথায় সঞ্জয়ের মতো টাক। এই টাক ফুটো

করেছিল পুলিশের গুলি। তখন মা বেঁচে থাকলে বড্ড খুশি হত—সাধুর মনে হয়। মা শাপশাপান্ত করত কি না! বলত—পাশার দান উলটে যাবে একদিন। তখন? তখন দেখবে, এই দাসীমাগীর পায়ের তলায় ককিয়ে-ককিয়ে মরবে। মরার সময় মুখে জল দেব ভাবছ? সে মেয়ে এ শৈল নয়।

বাবার মুখে মা জল দেবার সুযোগই পেল না অবশ্য। নয়তো সাধু দেখত মা কী করে! ওই যে—'তোমার পাতে ভাত খুলি তো অমি বেজন্মা মেয়ে' বলে কতবার অকাট দিব্যি দিত—আবার কিন্তু সুড়সুড় করে ভাত বেড়ে দিত। প্রকাণ্ড বাটিভরা পাঁঠার মাংস এগিয়ে দিত। মুখ টিপে হেসে বলত—একদিন তো মুখ ফুটে বললে না, কেমন রেঁধেছি। তা বলবে কেন? আমি তো ডাকাতবাপের মেয়ে নই। মানুষের মাথা ভাঙতেও পারিনে!

কার জন্যে কথাটা বলত—সাধু জানে। বাউরীপাড়ার গদাইয়ের মেয়ের সঙ্গে কালু মুখুজ্যের বদনাম ছিল। সে মেয়ে নাকি ডাকাতি করতে যেত মুখুজ্যের দলে। সাধুর আবছা মনে পড়ে তাকে। মা কালীর মতো গড়ন—দেখলেই সাধুর গা ঘিনঘিন করেছে। কতদিন উঁকি মেরে দেখে এসেছে সে, বাবা গ্রীষ্মের দুপুরে দিব্যি দরজা খুলে রেখেই গলা জড়িয়ে শুয়ে আছে। ওভাবে পুরুষ ও মেয়ে শোয় কেন, বুঝতে পারত না সাধু।

এখন বোঝে। কিন্তু কী এক নিস্পৃহতার শক্তি তাকে যেন ওইদিক থেকে সতত দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সাধু ভাবে—নিজে থেকে মুখ ফুটে কোন মেয়ে বললে তার কাছে শুতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু নিজে আগু বাড়িয়ে বলতে পারবে না। তার ভারি লজ্জা করে যে! এই ধেড়েবয়সেও সেই লজ্জা বা গোপন ভীরুতার ভাবটি কাটল কই? আসলে এ-সব ব্যাপারে খানিকটা সাহস দরকার—তা তার মূলেই নেই। বরং কোন মেয়ের গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারতে দাও, সাধু মুহূর্তে সাত-পাঁচ না ভেবেই পা বাড়াবে। কিন্তু পীরিত—সাধুর মুখটা লাল হয়ে যায়। বুকের ভিতরে হুড়মাতুন চলতে থাকে।

দীঘির জলে সঞ্জয় নেমে গেলে সাধু বিপদে পড়ে গেল। তেল মেখে নিলে পারত। হাতে নতুন মোড়ক-খোলা সাবান। লোভ হচ্ছে মাখতে—কিন্তু জলে পা বাড়িয়ে কাঁপুনি জেগেছে।

সঞ্জয়ের থলথলে গতর জলে চকচক করছে। অবশ্য সেও হাপুস করে ডুবে মাথা তুলে মুখ দিয়ে কতরকম শব্দ করছে। দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

সাধু সাবানটা একধারে রেখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সঞ্জয় ঘুরে তাকে দেখে বলল—কী হল? চলে এস! কাম কাম!

বারকতক ডাকার পর সে করল কী হুড়মুড় করে সোনালী মোষের মতো এসে সাধুকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল। ঘাটসুদ্ধ লোক সাধুর চেঁচামেচি শুনে হেসে খুন হল। সাধু পাত পা ছুঁড়তে থাকল।—ওরে বাবা! মরে যাব—ওরে বাবা!

তারপর অবশ্য কাঁপতে কাঁপতে সাধু সাবান মেখেছে। মাখতে মাখতে দ্রুত কয়েকটা জিনিস ভেবেও নিয়েছে। সায়েবজুয়াড়ীর গায়ে অসুরের শক্তি আছে। সার্কাসে নাকি বড় খেলোয়াড় ছিল। বারের কসরত করত। আবার বুকে হাতিও নিত। ডাম্বেল মুগুর ভাঁজত। এখন সব ছেড়ে বেজায় মুটিয়ে যাচ্ছে। গড়নের শ্রী বদলেছে। একটু-আধটু চর্চা না করলে নাকি এরপর খারাপ অসুখ হয়ে মারা পড়বে।

ফেরার পথে সাধু নিজের উজ্জ্বল হয়ে ওঠা শরীরে মোহে পড়ে যাচ্ছিল, আর নানা ভাবনার ফাঁকে সঞ্জয়ের শরীরের ইতিহাস শুনছিল। না—এই লোকটাকে ফাঁস দিয়ে মারার কথা তার না ভাবাই ভালো। চাকু চালিয়েও এই প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ প্রাণের মানুষকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না।

তাহলে শ্যাম ওকে ঘুষিতে কাবু করল কী ভাবে? সঞ্জয়কে হঠাৎ বেমক্কা শুধিয়ে ফেলেছে সে। সঞ্জয় বলেছে—আরে, সে তো আচমকা! তা ছাড়া তোমার বউদি এমন করে ধরল আমাকে!

—আপনি ঘুষি মারলে তো শালা বেলুন ফাটা হত!

—হত হয়তো। কিন্তু এই হাত দুটো দেখছ না? অ্যাকসিডেন্টে আঙুল আর কব্জি জোর জখম হয়েছিল। তাই তো সার্কাস ছেড়ে দিতে হল।

কব্জি দুটো দেখে শেষ অবধি আশ্বস্ত হয়েছে সাধু। তাহলেও যে মানুষ বুকে হাতি বয়েছে, সে কালু

মুখুজ্যের চেয়েও বীর। বীরের প্রতি বরাবর সাধুর মোহ্ আছে। কেমন যেন আপন মনে হয় তাকে।

—মাঠঘাটে পিকনিকের রান্না, ভাই। লতা বলল। ... কোন রকমে ক্ষিধে মেটাবার ব্যবস্থা। তোমার হয়তো ভাল লাগবে না।

সাধু হাপুসহুপুস খাচ্ছিল। ভাল লাগবে না মানে? এমন করে কোন মেয়ে তাকে খেতে দিয়েছে— মনেই পড়ে না। সেই ছেলেবেলায় মা এমন করে খাওয়াত। তারপর তো সাধু ভিখিরীর মতো তফাতে বসে একলা-একলা গিলেছে। কে বলেছে তাকে এমন করে—এটা আর একটু দিই, না—না লজ্জা কোরো না ভাই!

সাধুর চোখে জল এসে গেল।

—ও কি ? ঝাল তো দিই নি মোটে ! তোমার দাদা ঝাল খায় না। আমিও না। স্রেফ গুঁড়ো মসলার রান্না। মসলা না ঘোড়ার নাদি—কে জানে!

সঞ্জয় ডিমের ঝোলের দিকে তাকিয়ে বলল—এই! দিলে তো মনে পড়িয়ে!

—তোমার আবার কী হল?

—ঘোড়ার নাদি বললে!

সাধু চোখে জল নিয়ে হাসতে লাগল!....

মোটর গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে রোদে রেখে সঞ্জয় হুড নামিয়ে দিয়েছে। পা দুটো তুলে ঘুমোচ্ছে। লতা রোদে টুল পেতে বসে চুল শুকোচ্ছে। সাধু পাশে ঘাসের উপর বসে সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ বলল—গয়না পরেন না কেন বউদি?

লতা হাই তুলে বলল—গয়না?

—হ্যাঁ। গয়না পরলে আপনাকে কত মানাত !

লতা হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—গয়না কোথায় পাব, ভাই? যা দুচারখানা ছিল, তোমার দাদার পুঁজিতেই লেগে গেল। মহুলার মেলায় গত পুজোয় ও আমাকে সুদ্ধ হেরে যেতে বসেছিল!

সাধু খিকখিক করে হাসলেও লতা হাসল না।

লতা বলল—সত্যি বলছি। ওস্তাদেরও ওস্তাদ থাকে না? পড়েছিল এক পাকা জুয়াড়ীর হাতে। শেষ অবধি .....

হঠাৎ ওকে থামতে দেখে সাধু বলল—জুয়ো খেলা ভাল না বউদি। দাদাকে অন্য লাইন ধরতে বলেন না কেন?

—শোনার পাত্র তো! হুঁঃ!

—আমি বলব।

—তাহলেই হয়েছে।

সাধু একটু ভেবে নিয়ে বলল—ওই গাড়িটায় প্যাসেঞ্জার বইলেও তো পয়সা হয়। আমাদের হরিণমারার রুটে অমনি একটা ট্যাক্সি চালিয়ে ফেন্টুবাবু লাল হয়ে গেছে। আপনার দিব্যি!

লতা আবার একটু হাসল।—পাগল হয়েছ? ওটা তোমার দাদার সেকেন্ড ওয়াইফ! আমার সতীন—বুঝেছ? লটারিতে টাকা পেয়ে কিনেছে। এই তো গত মাসে।

—কী কাণ্ড ! তা আপনাকে গয়না গড়িয়ে না দিয়ে মোটর গাড়ি কিনলেন দাদা? সাধু অবাক হয়ে গেল।

লতা কিন্তু হঠাৎ রেগে গেল।—ড্যাট্ ! শুধু গয়না আর গয়না! ওকথা ছাড়ো তো ভাই! .... পরক্ষণে সাধুর মুখটা দেখে নিয়ে আবার হেসে বলল—নিজের বউ হবে যখন, তাকে প্রাণভরে গয়না পরিও। কেমন?

বলে সে তাঁবুর ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়ল। সাধু কিছুক্ষণ বসে রইল। হুঁ কেমন করে তার মাথায় মেয়েদের সঙ্গে গয়নাটা দুশ্ছেদ্য হয়ে গেছে কে জানে! মেয়েদের সে গয়নার বাইরে দেখতে চাইছে না

কেন? আসলে তার পাপী মনের লোভ। নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হল সাধু। সে কি অদ্ভুত মন নিয়ে জন্মেছে! মেয়েদের রক্তমাংস বলতে যে একটা ব্যাপার আছে—সেটাই তো দুনিয়ার সব পুরুষমানুষের আকাঙ্ক্ষার জিনিস। শুধু সাধু অন্যরকম। তার মনটা তেতো হয়ে গেল।

একটু বসে থেকে সে উঠল। ঘুমোবে না। খাওয়া থাকার জায়গা আপাতত পাওয়া গেছে। কিন্তু সাধু নিজেও তো বরাবর এখানে থাকতে পারবে না। হাতে মাত্র দশ টাকা কয়েক আনা সম্বল। এখনই টাকার ধান্দায় বেরোনো দরকার।

সে শিকারের খোঁজে মেলায় ঘুরতে গেল। সটান গেল তেঁতুলতলার কপাট-তক্তপোশওলাদের আড্ডায়। পাশেই দীঘির পাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। পাড়ে অজস্র তালগাছ! রোদে সেখানে দাঁড়িয়ে সে ওদের সঙ্গে ভাব জমাবার ফিকির খুঁজতে থাকল। সেই সময় তার কানে ভেসে এল বাঁশের বাঁশির সুর। কয়েক মুহূর্ত তন্ময় হয়ে সুরটা শুনতে থাকল সে। প্রথমে ভেবেছিল কোথাও রেকর্ড বাজছে। কিন্তু রেকর্ড নয়—তেঁতুলতলার দিক থেকে আওয়াজটা আসছিল। তার চোখ পড়ল নিচের জমিতে। ধান কেটে নেওয়া জমির উপর কপাট আর তক্তপোশের গাদা। সেখানে রোদে তক্তপোশ পেতে একজন বসে অছে। সেই বাঁশি বাজাচ্ছে।

সাধু হন হন করে নেমে গেল। তার পায়ের শব্দে লোকটা চমকে উঠে বাঁশি থামিয়েছিল। সাধু তক্তপোশে বসে বলল—বাজান, বাজান দাদা! অপূর্ব!

লোকটা সাধুর চেয়ে বেশি বয়সের। বাবু ভদ্রলোক নয়—তা চেহারা ও পোশাকেই বোঝা যাচ্ছে। গায়ে ফতুয়া, পরনে পেঁচিয়ে পরা ময়লা ধুতি। গলায় চাঁদির তক্তি আছে। হাতে কামার বালা আছে। টিকালো নাকের তলায় সুচলো গোঁফ। চমৎকার বাঁশি বাজাতে পারে সে।

শ্রোতা পেয়ে সে কিছুক্ষণ সমানে সুরটা বাজাল। তারপর বাঁশি নামিয়ে রেখে ফতুয়ার পকেট থেকে বিড়ি বের করল।

সাধু বলল—সিগ্রেট খান।

সাধু সিগারেট দিলে সে হাত বাড়িয়ে নিল। শিল্পী মানুষ। ভক্ত পেলে খুশি হবে না আবার? সাধু হাওয়া বাঁচিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিল তার এবং নিজেও ধরাল। তারপর বলল—অপূর্ব! কোথায় শিখলেন দাদা?

লোকটা একটু হেসে বলল—নিজে-নিজেই প্র্যাকটিস করেছি। আপনার ভাল লাগল?

—বললাম না? অপূর্ব! প্রথমে তো গ্রামোফোন ভেবেছিলাম।

—সত্যি বলছেন?

—মাইরি। আপনার দিব্যি।

—ওইটুকু নিয়েই আছি, ভাই। আপনাদের আশীর্বাদ!

সাধু খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলল—জানেন? আমারও ভীষণ শখ হয় বাঁশির। হয়ে ওঠে না। আপনার মতো গুণীর সঙ্গ পেলে নিশ্চয় চেষ্টা করতাম!

—এ আর তেমন কী! একটা বাঁশি কিনে ফেলুন। তারপর চালিয়ে যান। আমি তো মোট তিন বছর বাজাচ্ছি। এই মেলায় এসে বাঁশি কিনে ফেললাম— আবার সেইখানেই বসে বাজাচ্ছি।.... বলে লোকটা তার বাঁশিচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাল।

সাধু বাধ্য হয়ে শুনল। তারপর নাম-ধাম ইত্যাদি জানতে চাইল। কপাটওয়ালার নাম শম্ভু—শম্ভু নন্দী। লালগোলা এলাকার পদ্মার ধারে বাড়ি। সেখানে এক হরেরামবাবুর কাঠগোলা আছে—তারই মাল আসলে। সে কর্মচারী মাত্র। বাবু নিজে আসে না। দু'জন লোক পাঠায় দু'গাড়ি মালের সঙ্গে। গাড়োয়ানরা পৌঁছে দিয়ে চলে যায়। চিঠি লিখে তারিখ বলে দিলে আবার এসে বাকি যা অবিক্রি থাকে—নিয়ে যায়।

শম্ভুর সঙ্গীর নাম কান্ত। সে বুড়োমানুষ। রাতে ঘুম হয় না—তাই সারাদিন ঘুমোয়। ওই দেখুন না, কেমন হাঁ করে ঘুমোচ্ছে! সাধু বুড়োকে দেখল।

এবারে কেনাবেচা কেমন হল?

তা মন্দ হচ্ছে না। ধানটান ভালোই হয়েছে রাঢ়ে। তার উপর ক্যানেল এলাকা। শুখা-আকাড়া নেই। দিনে দিনে দেশের অবস্থা তো ভালোই হচ্ছে আগের তুলনায়।

সাধু বলল—আমাকে একটা ভালো বাঁশি কিনে দিন, দাদা। এক্ষুনি চলুন। আমার আর তর সইছে না। উঠুন উঠুন!

শম্ভু উঠে পড়ল। ছোকরাকে তার ভাল লেগেছে। তার উপর এমন মুগ্ধ ভক্ত—বিশেষ করে ভদ্রলোকের ছেলে, সে কখনও তো পায়নি। যাবার সময় কান্তবুড়োকে ঠেলে জাগিয়ে দিয়ে এল। আর ঘুমোয় না কান্ত খুড়ো! ওঠ। আমি একবার মেলা থেকে ঘুরে আসি।

বুড়ো শুয়ে থেকেই বলল—যাও। আমি আছি।

কপাট তক্তপোশ তুলে নিয়ে পালানো চোরের পক্ষে ঝক্কির ব্যাপার। যেতে যেতে চোরের এইসব অসুবিধের কথা আলোচনা করছিল শম্ভু। মনোহারি লাইনে ঢুকে সাধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টে চারদিক দেখে নিল। এবেলাও ঝুমুররা নিশ্চয় আসবে। এখনও অবশ্য আসেনি। সবে দু-চার-জন করে ভিড় বাড়াচ্ছে মেলার।

অনেক দেখে-শুনে আট আনায় একটা বাঁশি কেনা হল। সাধু ভিড়ের মধ্যেই ফুঁ দিতে দিতে শম্ভুর সঙ্গে তার ডেরায় ফিরল। নাঃ—যত সহজ ভেবেছিল, তা নয়।

—মাসখানেক লাগবে ফুঁ প্র্যাকটিস করতে। শম্ভু বলল।—তবে সর্বক্ষণ লেগে থাকবেন। হয়ে যাবে। আপনার ফুঁয়ের গতিক ভালো।

সাধু বলল—তাহলে হবে বলছেন?

—নিশ্চয় হবে। মানুষ কী পারে না বলুন?

ক'জন খদ্দের এসে দরাদরি করছিল কান্তবুড়োর সঙ্গে। শম্ভু তাদের নিয়ে পড়ল। সাধু তখন সেই তক্তপোশে বসে সমানে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছে বাঁশিতে।...

সাধু যখন উঠল, তখন মেলার আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। মেলায় জমজমাট ভিড় শুরু হয়েছে। সব ঘাঁতঘোঁত জেনে এবং কিছুটা অনুমান করে সাধু উঠল। বলে এল—সময় পেলে একবার যাবেন দাদা!

কোথায় যাবে, তা একশোমুখে বর্ণনা করা হয়ে গেছে। সঞ্জয় জুয়াড়ী তার দাদা। ওই যে সায়েবজুয়াড়ী—যার মোটরগাড়ি আছে! এমন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে শম্ভু ভারি খুশি।

সাধু যেতে যেতে প্ল্যান ছকে নিয়েছে। জুয়োর আসরে শম্ভুকে বসাবে তারপর সুযোগমত বেরিয়ে আসবে এবং তেঁতুলতলায় তক্তপোশ-কপাট দিয়ে তৈরি ঘরে চটের পর্দা তুলে ঢুকবে বুড়োর কাছে। বুড়োর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। তাকে শম্ভুর কথা জিজ্ঞেস করবে।

একটা টর্চ চাই। সঞ্জয়ের আছে। সেটা হাতাতে দেরি হবে না। আর চাই একটা মোক্ষম জিনিস—মাফলার। মাফলারও একটা পেয়ে যাবে—সঞ্জয়েরই আছে।

একটু ভাবল সে। একটু দোনামনা জাগল। তাহলে কি তাকে সঞ্জয়ের আখড়া ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে? কে জানে, অবস্থা কী দাঁড়ায়। কিন্তু এতদিন পরে এই প্রথম সাধু টের পেল, একটা জায়গায় তাকে খুব ভিতর দিকে যেন বেঁধে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। বার বার লতাবউদির মুখটা তার সামনে ভেসে উঠল। সে চঞ্চল হল। একটা প্রবল ছটফটানি নিয়ে সে এগোল।

এবং ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। সামনে একটা দেয়াল যেন।

সেই গুঁফো বন্দুকবাজ মোক্তার, তার গিন্নী, তার দুই মেয়ে।

চোখে চোখ পড়ামাত্র সাধু পাশ কাটাতে চাইল। কিন্তু ঘুঘু মোক্তার তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন এবং খপ করে সাধুর হাত ধরে ফেললেন।—আরে! তুমি সেই সাধুচরণ না? সেই যে খাগড়ির সোঁতায় কাল দেখা হল?

কী ধুরন্ধর চোখ লোকটার! সাধু অবশ হয়ে তাকাল।

ঝুমুর বলল—সেই বাসনওয়ালা দাদা!

গিন্নী বললেন—ও মা! ছেলেকে চেনাই যায় না! এবার বাবা যেমন ছেলে, তেমনি মানিয়েছে!

মোক্তার ভবশংকর বললেন—হুম্‌! সিগ্রেট-বিড়ি খাওয়া অব্যেস আছে—কেমন?

সাধু বুঝতে না পেরে বলল—আজ্ঞে?

হো হো করে হেসে উঠলেন ভবশংকর।—আর অস্বীকার কোরো না হে! ভবমোক্তার ঘাগী দাগীর ভেতর অবধি দেখতে পায়। কাল কী কাণ্ড করেছ, টের পাও নি—তাই না? ইস্ কী সর্বনেশে ছেলে তুমি হে! বোকার মতো দেশলাই কাঠিই হোক— কিংবা বিড়ি-সিগ্রেটের টুকরোই হোক্—নির্ঘাত ফেলে চলে গেছ। আর কী হয়েছিল জানো?

সাধু ঘাড় নাড়ল।

—পিছু ফিরে দেখনি?

সাধু ফের ঘাড় নাড়ল।

হো হো করে হাসতে থাকলেন ভবশংকব। গিন্নী বললেন—আমবা তো ভয়ে কাঠ, বাবা। চারদিকে আগুন—কী ধুঁয়ো! কী ধুঁয়ো! ভাগ্যিস! বাতাস ছিল উত্তর দিক থেকে। আগুনটা চলে গেল দক্ষিণে। জায়গায় জায়গায় খড় কাঁচা ছিল, ধরেনি। কী বোকা ছেলে তুমি, দেখ তো!

ঝুমুর বলল—এই সিমি আর বাবা পড়েছিলেন আগুনের পাল্লায়! সিমি তো কেশে মুখ লাল করে দৌড়ে এল! আমরা ধুঁয়ো পাই নি। খুব মজা লাগছিল কিন্তু।

মোক্তার বললেন—খবর্দার! ভবিষ্যতে খড়েব জঙ্গলে আগুন ফেলবে না। খুব ববাতজোর যে হাওয়া উল্টো দিকে ছিল।

এতক্ষণে হাতটা ছাড়তেই সাধু পা বাড়াল। কিন্তু ভবশংকব ফের আটকালেন। বললেন—উঠেছ কোথা?

সাধু বলল—ওইখানে। আমার এক দাদার কাছে।

—কেমন দাদা?

—আজ্ঞে, মামাতো। এখানে আমাব মামা বাড়ি ছিল কি না?

—ছিল মানে?

—এখন সব চলে গেছে জামশেদপুরে।

মোক্তারি জেরা আরও কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তায় লোকচলাচলে অসুবিধে হচ্ছে দেখে দলটা ফাঁকার দিকে এগোল। সাধুর পালাবার উপায় রইল না। ভবশংকব বললেন—যাও তোমার কথা নিয়ে মাথা না ঘামাতুম, ওই কেলেঙ্কারির পর ঘামাতে হয়েছিল। বুঝতে পারছ? তখনই ঠিক করেছিলাম—মেলায় যদি দৈবাৎ ছোকরাকে পাই, অ্যায়সা দণ্ড দিন দেব যে পাক্কা একবছর ঘানিটানার শামিল হবে। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল দলে। গিন্নী বললেন—মুখ দেখেই বুঝছ না—তখনই বুঝেছিলুম, বয়সের চেয়ে ছেলেমানুষ। একেবারে সাদাসিধে গোবেচারা যে। বেচারাকে ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও কচিকাঁচা বয়সে ঝাঁকা বইতে হচ্ছে।

মোক্তার বললেন—ঝাঁকা কী হল হে?

সাধু একটু হাসল।—আজ্ঞে, ফেলে দিয়েছি। ও কাজ আর করব না।

ওর পিঠে প্রশংসাসূচক থাপ্পড় মেরে ভবশংকর বললেন—এক্সেলেন্ট! এখন এস—দল বেঁধে মেলা দেখি আমরা। খুব বড় সার্কাস এসেছে নাকি!

ঝুমুর ও সীমা সার্কাস নিয়ে হইচই করার তালে ছিল, হঠাৎ ভবশংকর মোক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন—কী লুকোচ্ছ দেখি, দেখি?

সাধু এতক্ষণ বাঁহাতে বাঁশিটা পিঠের দিকে জামার তলায় গোঁজাব চেষ্টা করছিল। ঘুঘু মোক্তারবাবুর চোখ এবার সেখানে গেছে। সাধু পিঠ বাঁচাতে পারল না। মোক্তাব গুপ্তিছোরা আবিষ্কার করার মতো আসামীকে কায়দা করে জিনিসটি বাগালেন। তারপর ঝুমুর, সীমা ও তাদের মায়ের সঙ্গে তাঁর একগলায় একটি কোরাস বেজে উঠল—বাঁশি।

মোক্তারবাবু চোখের সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাঁশিটা দেখে একগাল হেসে বললেন—অ্যাঁ! তুমি বাঁশিও বাজাতে পারো! বল কী হে সাধুচরণ! অ্যাঁ! তুমি যে রীতিমতো গুণী ছেলে! ও রমা, বলেছিলুম

না! চেহারা দেখেই ধরেছি—ছেঁড়া বস্তায় খাসা চাল!

মোক্তারগিন্নী সস্নেহে সপ্রশংস চেয়ে আছেন সাধুর দিকে। দুই বোন একবার বাঁশি একবার সাধুকে চঞ্চল দৃষ্টিতে ঝকমকিয়ে দিচ্ছে।

সাধুর মুখটা প্রথমে সাদা হয়ে উঠেছিল—যেন সত্যি একটা গুপ্তিছোরা বের করা হচ্ছে তার কাছ থেকে। তারপর ভীষণ রাঙা হয়েছে। লজ্জায় চোখের দৃষ্টি মোক্তারবাবুর গলাবন্ধ কোটের বোতামে আটকেছে। এসময় আয়নায় যদি নিজেকে দেখত, কী ভীষণ চমকে উঠত সে! পৃথিবীর তাবৎ নিষ্পাপ সরলতা যেন এই সন্ধ্যার মেলার ভিড়ে তার চেহারায় এসে জড়ো হয়েছে। একটা অসহায় সুন্দর শিশুর খোলস পাঠিয়ে দিয়ে এ মুহূর্তে কে তাকে ঢেকেছে এবং এর চেয়ে মর্মান্তিক ঠাট্টা আর কী থাকতে পারে!

মাঝে মাঝে সাধুকে নিয়ে এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কেউ করে বসে, সাধু টের পায়—অথচ তার কিছু করার থাকে না। সামনে তাকে পেলে তো গলায় ফাঁস লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিত।

—তোমার বাঁশি শোনা যাবে সময় মতো।... বলে মোক্তার সাধুর কাঁধ ধরে পা বাড়ালেন। সাধু যেন বানের জলে ভেসে চলল। পাথরচাপা কান্না তার বুকে। পাবলে মেলার সব আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলে—আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!

ছয়

সার্কাসের টিকিট কাটার সময় সুযোগ বুঝে সাধু কাটল। লোভ হচ্ছিল বটে—কিন্তু আজ রাতে সে যাকে শিকার বলে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, সেই কান্তবুড়ো যেন যমের বাড়ি যাবার জন্যে তার পথ তাকিয়ে ছটফট করছে—এই ভেবে সাধুও যে অস্থির। কাকেও মারবার ইচ্ছে জাগলে তো তার রেহাই নেই। সারাক্ষণ বুকের ভেতর একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করে। নিজেকে ছোবল মেরে জর্জরিত করে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে সাধু অসহায়।

পালিয়ে এসেও কিছুক্ষণ পিছুটানের মতো মুখগুলো তার মনে পড়েছিল। বেশি মনে পড়ছিল ঝুমুরকে। ওকে তো খাগড়ির সোঁতায় সে মৃত্যদণ্ড দিয়ে বসেছিল প্রায়। শুধু সুযোগ পায়নি—এই যা! সাধু শিউরে উঠেছিল বার বার। সুযোগ পেলেও কাজটা ঠিক হত না। ঝুমুর শব্দটার সঙ্গে এলোকেশীর নরম বুকের অদ্ভুত স্মৃতি এবং মিষ্টি একটা গন্ধ জড়িয়ে আছে। সাধু ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে টের পেল ঝুমুরের জন্যে তার মন কেমন করছে।

সাধু জুয়ার আড্ডায় গিয়ে দেখলে সঞ্জয় বোস, লতাবউদি যথারীতি আসর পেতেছে। তাঁবুর দরজার সামনেই ওদের আসর। উঁকি মেরে সরে এল। শম্ভু তো আসেনি। যাবে নাকি শম্ভুর ওখানে?

তার কাঁধে হাত পড়তেই চমকাল সে। মোক্তারবাবু নাকি? না—শম্ভু। সাধু বলল—এক্ষুনি দাদার কথা ভাবছিলাম। অনেকদিন বাঁচবেন।

শম্ভু হাসল।—সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়াটা সেরেই এলাম।

সাধুর ওর হাত ধরে টেনে সঞ্জয়ের আসরের দিকে এগোল। চাপা স্বরে বলল—এক টাকার বেশি দান ধরবেন না শম্ভুদা। তবে বোসদাকে আমি বলে দিচ্ছি। আপনার ভয় নেই। আপনি আমার লোক।

আসরে ভিড় ঠেলে সে ঢুকল। ঢুকেই বলল—বসে পড়ুন এখানে। আসছি।

লতা তাকে দেখে মুখ টিপে হাসল। সে ভিড় ঘুরে সঞ্জয়ের কাছে গেল। তারপর ওর কানেকানে বলল—খিলাড়ি বাগিয়ে আনলাম। ওই যে, গোঁফওলা লোকটা!

সঞ্জয় খুশি হয়ে ফিসফিস করে বলল—বাঃ! ভালো, ভালো। এই তো চাই। কেমন মাল হে ব্রাদার? আছে তো?

সাধু জানাল—কপাটওলা। মালকড়ি আছে কিন্তু হঠাৎ ভড়কে দেবেন না যেন।

সঞ্জয় শিস দিয়ে কৌটো নাড়তে থাকল। লতা চাপা স্বরে সাধুকে বলল—দাদার এজেন্ট হয়ে গেছ দেখছি! ভালো ভাই। তোমার উন্নতি হবে।

সাধু হাসতে হাসতে উঠে পড়ছিল। সেই সময় লতা গলা তুলে আবার বলল—শোন, ক্ষিদে পেলে খেয়ে নিও। কেমন? আমাকে ডেকো।

—আপনারা?

—আমাদের খেতে সেই রাত তিনটে।

—তাহলে আমিও তখন খাবো। এখন একটু ঘুরে-টুরে আরও খিলাড়ি দেখি।

লতা একটু হাসল।—বেশ। আর শোন, ক্যাম্পে লক্ষ্য রাখবে কিন্তু। এতদিন আমাকেই আসর ছেড়ে উঠতে হত। এবার তোমার সব দায়িত্ব। বুঝলে তো?

সঞ্জয় বোস আওয়াজ দিচ্ছিল।—এ আনি-দুয়ানির খেল নয় ভাই! মালদার রাজা-উজীর আমির-ওমরাহ্‌র আসর। বসলে বাদশা, উঠলে ফকির—তো কভি কভি ফকিরভি বাদশা বন্ যাতা! আরে ভাই! টাকা নিয়ে কেউ জন্মায়নি, টাকা কারও সঙ্গে যাবে না। তবে যাবে কী? ইমান। বিশোয়াস। ফেথ! ফেথ টু লাক। এই লাক বড় আশ্চর্য জিনিস ভাই। বলবেন—কেমন জিনিস? গোল না চৌকো? আমি বলি—এভ্‌রি বডি হ্যাজ হিজ আইজ—চোখ আছে, দেখুন। কান আছে শুনুন। বোসসায়েবের হাতের মধ্যে শুনে নিন। ... সে গুটি বাজাতে বাজাতে মুখেও বোল তুলল—গুড় গুড় গুড় গুড় .... চাক্ চাক্ চাক্ চাক্ ....

খিলাড়িরা হেসে খুন। এমন স্ফূর্তিবাজ মজার জুয়াড়ী এ মেলায় কখনও আসেনি। কে কবে দেখেছে জুয়াড়ী ইংরেজী বলে, প্যান্ট কোট টাই পরে গাড়ির মালিক হয়? তার উপর সুন্দরী মেয়েমানুষ ছকের পাশে বসে থাকে। যেন শেষ অবধি তাকে দানে ধরে বসবে—পারো তো জিতে নাও। এমনি হাবভাব।

এলাকায় খবর সবে রটেছে। বড় বড় মালদার রংবাজের টনক নড়েছে। উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে আসরে। কিন্তু তার সঙ্গে এও রটেছে, গোঁসাইতলার দুঁদে দারোগা যতীনবাবুরও বন্ধু। মনে বদমাইশি থাকলেও উপায় নেই। গ্রাম্য মানুষ সব। পৃথিবীর অনেকটাই তাদের কাছে আজব রহস্যে ভরা। আট-দশ বছর আগে তো আরও রহস্য ছিল। এলাকার বড় রাস্তা পাকা হয়ে কিছুটা অদলবদল ঘটেছে জীবনে। শহরে যাতায়াত বাড়ছে দিনে দিনে। লোকে চালাকচতুর হচ্ছে। গোঁসাইতলায় ব্লক-অফিস খুলেছে। কত কী ঘটতে শুরু হয়েছে চারদিকে। তা না হলে এমন জুয়াড়ী দেখতে সারাদিন মেলায় ভিড় হত। কত আজব গল্প রটত। জুয়াড়ীর বউয়ের রূপ আর খিটকেল নিয়ে একশো গান বাঁধা হত। চৈত্রের গাজনের সঙ বাঁধা হত। এখন অত কিছু আর হবে না।

সাধু একটু অপেক্ষা করছিল পিছনে। শম্ভুকে দেখছিল [illegible]। শম্ভু লতাকে দেখছে আড়চোখে। কপাটওয়ালার বুকে কী হচ্ছে সাধু অনুমান করে ক্রমশ রেগে গেল। শালা, খেলতে এসেছিস, খেলবি। ছকের আর গুটির দিকে চোখ রাখবি। বেলেল্লাপনা হচ্ছে?

সঞ্জয়ের উপরও রাগ হল তার। পেয়েছে একটা বোকাসোকা মেয়ে—যা খুশি করাচ্ছে। আর বউদির বা কী আক্কেল? অমন সেজেগুজে বসে থাকার কী দরকার ছিল? ভাবল—পরে সুযোগমতো কথাটা তুলবে বউদির কাছে। এটা ভাল নয়—মোটেও ভাল নয়।

কিন্তু শম্ভুর হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল, সে আসর ছেড়ে ওঠাব নাম করবে না সহজে। টোপে গেঁথে গেছে যেন। এটা অবশ্য ভালই হল। সাধু সরে আসবার সময় দেখল, সঞ্জয় বোস বউয়ের হাতে কৌটো দিয়েছে এবার। লতা একমুখ হাসি নিয়ে চামড়ার কৌটোটা দুহাতে তুলে নাড়া দিচ্ছে। তার কাঁধের নেটের রঙিন চাদরটা খসে পড়েছে। কী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার গলা বুক আর বাহুর মাংস! চারদিকে ফেটে পড়ছে চাপা লোভ। সাধু প্রচণ্ড ক্ষোভে গিয়ে সরে এল। এ মুহূর্তে সঞ্জয় বোসের গলায় ফাঁস দিতে পারলে তার দম আটকানো ভাবটা চলে যেত।

বউদির মুখের ওই হাসিটা যেন বিপন্ন অপ্রস্তুত আর অসহায় মানুষের হাসি। ওই হাসির জন্যে যেন বউদিরও বুকে দম আটকাচ্ছে। সাধু থুথু ফেলল। মানুষের প্রতি পুরনো হিংসে নিয়ে সে পা বাড়ালো। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর মানুষকে সে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বসেছে। দরকার শুধু একটা শক্ত খয়েরি মাফলার। তারপর কঁক্ কঁক্ ঘড় ঘড় আওয়াজ। ব্যস্। শান্তি।

হুঁ— টর্চ চাই। মাফলাব চাই। সাধু ফিরে এল। বউদির কোলে একটা টর্চ দেখেছে। কিছু না বলে সেটা তুলে নিল সে। বউদি একবার তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে সম্মতি দিল। তার হাতে কৌটো এখন।

সঞ্জয়ের কানে ফিসফিস করে সাধু বলল—দাদা, আপনার মাফলারটা দেবেন? গলা ব্যথা করছে বড্ড।

সঞ্জয় বলল—তাঁবুর মধ্যে আছে। খুঁজে নাও গে।

তাঁবুর দরজায় একটা তেরপলের পর্দা দড়িতে আটকানো আছে। ফাঁস খুলে ঢুকল সে। টর্চ জ্বেলে খুঁজল মাফলারটা। চকিতে একবার মনে পড়ল খাটের তলায় বাক্সটার কথা। কিন্তু এখন মনে অন্য চিন্তা। মানুষ মারার নেশা মাথায় চড়লে সাধু আর কোনদিকে মন দিতে পারে না—লক্ষ টাকা পড়ে থাকতে দেখলেও না। এক অদ্ভুত শক্তি তাকে ভর করে এসময়।

ঘুপচি তাঁবুর মধ্যে খুঁজে খুঁজে অবশেষে মাফলারটা পেল সে। লাল-হলদে চকরাবকরা পশমী মাফলার। বেশ খাপি জিনিস। টর্চ রেখে অন্ধকারে দু'হাতে টেনে দেখল সে। আরও পাতলা হলে ভাল হত। থাক্ গে এতেই কাজ চালিয়ে নেবে।

তাঁবুর দরজা ঠিকঠাক রেখে মাথা ও গলায় মাফলার জড়িয়ে সাধু চলল। এসময় সে নিশির ডাকে বেরিয়ে যাওয়া মানুষের মতো হাঁটে। তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে সে দম নিল। মুখ উঁচু করে কয়েকবার শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে পা বাড়াল। ধূর্ত হিংস্র চিতাবাঘের মতো সে পা টিপে টিপে-তক্তপোশের স্তূপে ঢুকল। অন্য কপাটওলারা হারিকেনের সামনে বসে তাস খেলছে। সবাই কম্বলে আগাগোড়া ঢাকা। চোখ আর নাক জেগে আছে শুধু। শম্ভুদের ডেরায় একটা খাড়া করা চৌকাঠের ডগায় হারিকেন ঝুলছে। বুড়োকে দেখতে পেল না সে। দরজায় চটের পর্দা ঝুলছে। এত সকাল সকাল শুয়ে পড়ল নাকি বুড়ো?

সাধু চাপা কেশে ডাকল—শম্ভুদা!

সাড়া এল পেছন থেকে।—কে গো? শম্ভু মেলায় গেছে।

টর্চ জ্বালাল সাধু। পরক্ষণে নিবিয়ে দেল। কী কাণ্ড! বুড়োটা পেছনে বসে অপকম্ম করছে। হাতের কাছে একটা এনামেলের জলভরা ঘটি। জমিটার আল ঘেঁষে বসেছে সে। কপাটের স্তূপ থেকে বড়জোর হাত দশ বারো দূরে। কী নোংরা লোক! দুর্গন্ধে ভূত পালাবে না? শম্ভুটা সহ্য করে কীভাবে?

হঠাৎ সাধুর মাথায় ঝিলিক দিল—এই তো মস্তো সুযোগ! সে পা বাড়াতে গিয়ে টের পেল, কেটে নেওয়া ধান গাছের গোড়াগুলোতে তার স্যান্ডেল খড়খড় শব্দ করছে। কাজের সময় খুলে পড়বে না তো?

তক্ষুনি স্যান্ডেল দুটো খুলে ঠেলেঠুলে দুই পাশ পকেটে ঢোকাল। দিব্যি ঢুকে গেল। জামাটা গায়ের মাপের চেয়ে বড়োই। ধুতি গুটিয়ে ফেলল। পিঠের দিকে বাঁশিটা গোঁজা আছে। টর্চটা নিয়ে সমস্যা। সামনের জামার নিচেটা তুলে ধুতির তলায় পেটের কাছে গুঁজে দিলে বুকে একটা চমৎকার খোঁদল হল। টর্চটা ঢোকাল সেখানে।

আর একটুখানি অপেক্ষা করতে হবে—জলশৌচ করে একটু সরে আসা অবধি। নয়তো নোংরা মেখে যাবার ভয় আছে। শুধু দাঁড়-করানো কপাটগুলোর আড়ালে ওঁৎ পেতে রইল।

সময় যেন কাটতে চায় না। বুড়োর অপকম্ম শেষ হচ্ছে না—হচ্ছেই না। সে একবার ভাবল—থাক্। বরং এই সুযোগে ঘরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করা যায়। টাকা-পয়সা নিশ্চয় কোথাও রেখেছে। শম্ভু বলেছে—বেচাকেনা ভালই হচ্ছে। বাবুর লোক এসে টাকাকড়ি নিয়ে যাবার রেওয়াজ আছে। লোক এখনও আসেনি। কাজেই টাকা আছেই।

কিন্তু বুড়োকে সে মারবে বলে ঠিক করেছে যে! ওকে না মারলে সাধু নিজেই যে দম আটকে মরে যাবে।

না—বুড়োকে মরতেই হবে। হাত নিশপিশ করছে। এমন চমৎকার মাফলারটা একটা ভাল কাজে ব্যবহার করবে না—এটা কী কথা হল?

সাধু ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিল। হারিকেনের আলো কপাটের আড়ালে—পিছনের দিকটা অন্ধকার। ওপাশে লোকগুলো অন্তত বিশহাত তফাতে তক্তপোশে খেলামেলায় বসে তাস খেলছে

একমনে। ওরা নিশ্চিন্ত। জানে—তক্তপোশ বা কপাট যেভাবে একসঙ্গে থাকবন্দী বাঁধা আছে, খুলতে গেলে শব্দ হবে। গড়িয়েও পড়তে পারে। তাছাড়া এসব জিনিস চুরি করে পালাবারও হাঙ্গামা আছে। কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সাধু অকারণ একবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে নক্ষত্রগুলো যেন পিটপিট করে তাকিয়ে তার দুষ্টুমি দেখছে। মা কালী! আশীর্বাদ করিস্ মা। জয় বাবা মহাদেব! দেখো! সাধু মনে মনে প্রণামটা সেরে নিল। বাহাদুর তাকে এটা পইপই করে বলে দিয়েছিল—সাধু তা মেনে চলেছে। বাহাদুর বলেছিল—দেখ বেটা, মোছলমান কুলে জন্মো—তবু মা কালীর দয়া ছাড়া আমার কাজ হয় না। কাজে—নামবার আগে এ জিনিসটা যেন ভুলিস না। ভুললেই মরবি, বেটা। একবার ভুলে মাকে পেন্নাম করি নি—তো কী হয়েছিল শোন্......

সাধুর মনে হল, বুকে জোর আসছে। বাহাদুরের বিশাল মূর্তিটা অন্ধকারে তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গরম শ্বাসপ্রশ্বাস ঝাপটা মারছে যেন। সাধু শিউরে উঠল। কান খাড়া করে থাকল। মাফলারটা দু'হাতে ধরে যেন বাহাদুরের সংকেত বাক্যের জন্য কান পাতল।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক রাতচরা পাখি শনশন করে উড়ে গেল সেই সময়। সাধু বুঝল, এইটাই ইশারা। পাখিগুলো দীঘির তালগাছের মাথার উপর দিয়ে যেতে যেতে ডেকে উঠল—আঁক্ আঁক্! সাধু চাপা শিস দিল।

বুড়ো জল সেরে উঠেছে। কাপড় ঠিকঠাক করেছে। তারপর ঘুরে পা বাড়িয়ে এতক্ষণে বলেছে—কে ডাকছিলে গো শম্ভুকে?

—আমি বলে সাধু এগিয়ে গেল।.....

কিছুক্ষণ পরে সাধু দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে জামাকাপড় ঠিকঠাক করছিল। শরীর অবশ ক্লান্ত। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। বুড়োর প্রাণ খুব শক্ত ছিল—সেটা তার এই ভেঙে পড়ার কারণ নয়। একটা পয়সাও খুঁজে পায়নি। বুড়োর পকেট বা কোমর হাতড়েছে, ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস তোলপাড় করেছে—কোথাও টাকা-পয়সার পাত্তা নেই! সাধু ক্ষেপেছে। ক্ষেপতে ক্ষেপতে শেষ অবধি ক্লান্ত হয়েছে। মনে হয়েছে, প্রচণ্ড চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলবে এক্ষুনি। তার মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করছে। তারপর চলে এসেছে এখানে। উরু দুটো যেন ভেঙে পড়ছে। কিছুতেই এই ক্লান্তিটা কাটছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তার চোখে জল চিকচিক করছিল। সার্কাসের তাঁবুর আলো তার মুখে এসে পড়েছিল। কেউ এসময় তাকে দেখলে ভাবত সাধু একলা দাঁড়িয়ে কী দুঃখে যেন কান্নাকাটি করছিল এতক্ষণ।

তাহলে কি শম্ভুর ট্যাঁকেই সব টাকাপয়সা থাকে? সাধু ভুরু কুঁচকে মেলার দিকে তাকাল। বুড়োর লাশটা বিছানায় শুইয়ে ঢেকে দিয়ে এসেছে কম্বলে। সহজে কেউ টের পাবে না যে ও মরেছে। শম্ভুরও টের পেতে হয়তো সকাল হয়ে যাবে।

সাধু আর দাঁড়ানো নিরাপদ মনে করল না। দৌড়ে গিয়ে ঘাটে নামল। হাত পা মুখ ধুতে হবে। এখন আর ঠাণ্ডা জলের ভয় করছে না তার। গা ঘিন ঘিন করছে। সে দ্রুত জলের কাজ সেরে এবং আঁচলা ভরে ঠাণ্ডা রাতের কালো ঠাণ্ডা জল গিলে চলে এল। সোজা মন্দিরের চাতালে গিয়ে কথকতার আসরে কিছুক্ষণ বসে রইল। কথকঠাকুর লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা গাইছেন। নাকে ও কপালে তিলক কণ্ঠি, দুহাতে সাদা উড়নি পেঁচিয়ে ধরে নাচের ভঙ্গিতে পালা বলছেন। খোলওয়ালা হাঁটু গেড়ে খোল বাজাতে বাজাতে ওঁর মুখের দিকে মা দুর্গার পায়ের তলার অসুরের মতো চোখ ফাটিয়ে তাকাচ্ছে, মুখে হিংসার ভাব—আসলে দ্রুততাল বাজনা বাজাতে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

একটু বসে থেকে সাধু উঠল। মন অশান্ত। মনে হাহাকার, এ কী হল? কেন হল? কোথায় ত্রুটিটা ঘটল তার?

একখানে মুসলমানদের 'একদিল পীরের' গানের আসর বসেছে। চামর হাতে মুসলমান কথক আলখেল্লা আর পাথরের মালা গলায় দিয়ে এবং পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে নেচে গান গাইছে। তলায় দোহারকিরা ধুয়ো ধরছে। খোল বাজছে উদ্দাম। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে দুটি নাচিয়ে।

ছেলে মেয়ে সেজেছে। ঘাঘরা ঘুরিয়ে নাচ জুড়লে কথক বসল। বিড়ি ধরাল।

'বঁধু, লাও বা না লাও মুখ দেখে যাও
বিনি কাচের আয়না।'

সাধু একটু মজল। এতক্ষণে হাসি ফুটল তার ঠোঁটের কোনায়। এলোকেশীদের মনে পড়ছে। কোমর দুলিয়ে অমনি করে তারা নাচত গাইত। লোকে পেলা ধরত। এ আসরেও ধরেছে পেলা। সাধু খিকখিক করে হেসে ফেলল। তাও যদি মেয়ে হত! একটা নাচিয়ে পেলা নিতে গিয়ে লোকটার গলা জড়িয়ে ধরেছে। কে চেঁচিয়ে উঠল—ভেসে গেল! ভেসে গেল! দোহারকিরা ধুয়ো ধরল গলা চড়িয়ে। খোল করতাল তুমুল বাজতে থাকল। সাধু চলে এল।

পাশেই বাউলদের আসর। মধ্যে গ্যাসবাতি জ্বলছে। একসময় সাধুর বাউল হতে ইচ্ছে করত। পলাশগাঁয়ের আখড়ায় একবার দিনকতক এক বাউলের সঙ্গে গিয়ে জুটেছিল। ভাল লাগে নি। লোকগুলো যেন মেয়েছেলে এক-একটা। পুরুষমানুষ ভিক্ষে করবে কী? তবে সেটাও বড় কথা নয়—যে লোকটার সঙ্গে গিয়েছিল, সে ভারি অসভ্য। অশ্বিনী দারোগার মতো এই অদ্ভুত রোগ সে-ব্যাটারও ছিল। সাধুকে রাতের বেলায় জড়িয়ে ধরে চুমু খেত ব্যাটা। সাধুর তখন কত আর বয়স? চোদ পনের হবে। গতিক দেখে রাতারাতি কেটে পড়েছিল।

হুঁ। তখন এ লাইন জানা থাকলে ব্যাটাকে আর বাঁচতে হত না। বলে কি না—এস, আমরা আজ লীলা করি। তুমি রাধে, আমি কৃষ্ণ—তুমি কৃষ্ণ আমি রাধে—এই রকম।

সাধু হাসতে হাসতে এগোল।....'পড়ে গউর লীলার বাজারে, অবাক যাই হেরে।' বলেছে ভাল। ওদিকে বড় আসরে আজ কবিয়ালী। মেচওয়ালা কবিয়াল আর ঢুলি পাঁয়তারা জুড়েছে। ঢুলি ঢোল ছেড়ে মাঝে মাঝে মুখে বোল বলছে : ঢিপেডাঙ্গা গুপীনাথপুর। ঢিপেডাঙ্গা গুপীনাথপুর! ইর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌ তসর করে খসর্ মসর্ ... খোপের ভিতর লাল কবুতর! দেখবি কি দেখবি না... দেখবি কি দেখবি না... দেখবি না.... দেখবি না..... দেখবি না...... দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্..... তারপর সোমরে মাথায় চড্ডুম। হাজার হাজার মুখের হাসিতে আসর ফেটে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

—এই! শোন—আমি হারিয়ে গেছি।

আচমকা যেন বাজ পড়ল। ঝিলিক দিয়ে চড় চড় চড়াৎ আওয়াজ। সাধু নীল হয়ে দাঁড়াল।

—বাবারা কোথায় গেলেন, খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি একটু খুঁজে দেবে?

সাধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। ঝুমুরই বটে। ঠোঁটের কোনায় অপ্রস্তুত হাসি, চোখে করুণতা—আঙুল খুঁটছে সামনে দাঁড়িয়ে, একটু একটু হাঁফাচ্ছে। নাকের ফুটো ঘনঘন কাঁপছে। সাধু বলল—উঁ?

—তুমি তো অদ্ভুত মানুষ! টিকিট কেটে আমরা তখন কত খুঁজলুম—পালালে কেন? শোন—সার্কাস থেকে বেরিয়ে ভিড়ে বাবাদের হারিয়ে ফেললুম। এখন দেখ তো, কী বিপদে পড়লুম। আমি যে কিচ্ছু চিনি নে!

সাধু বলল—বাড়ি চলে যাও। পেয়ে যাবে।

—ভ্যাট্! চিনতে পারলে তো যেতুম। আমি কখনও এসেছি নাকি? তাতে কী অন্ধকার ওদিকটায়! গিয়ে দেখ না তুমি!

সাধু একটু হেসে বলল—তোমাকে ফেলে হয়তো ওনারা বাড়ি যাননি। ওনারাও খুঁজছেন বইকি। তুমি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আলোতে দাঁড়াও।

বলে সে পা বাড়াল। ঝুমুর তার সঙ্গ নিয়ে বলল—তুমি এমন কেন বলো তো?

—কেমন?

—তুমি...বড্ড ইয়ে। যাও!

সাধুর মনে কী একটা শিশিয়ে উঠল—সে নিষ্পলক তাকাল ঝুমুরের দিকে। কী আশ্চর্য, এই তো তার হাতের সামনে চমৎকার একটা শিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাগড়ির সোঁতায় যা ঘটতে গিয়ে ঘটে নি, এখন আবার সেই ব্যাপারটা অভাবিতভাবে এসে গেছে। সাধুর মন চঞ্চল—শরীর শক্ত। আজ

রাতে ওই ভয়ংকর ব্যর্থতা উসুল করতেই হবে। সে ডাকল—এস।

মেলা ছাড়িয়ে দীঘির পাড়ের নীচে গ্রামে ঢোকা রাস্তায় পৌঁছে ঝুমুর হেসে উঠল হঠাৎ।—এই! নিয়ে তো যাচ্ছ! আমার মামাবাড়ি তুমি চেন?

সাধু বলল—না।

—ওই তো লোক আসছে। মামার নাম অঘোর মুখুজ্যে। জিজ্ঞেস করে নাও।

পথটা অন্ধকার। বাঁদকে দীঘির উঁচু পাড়ে জঙ্গল। ডাইনে একটা ছোট্ট মাঠের ওপারে আলো জুগজুগ করছে। সাধুর মনে পড়ল—সামনে একটু এগোলে একটা বটতলা পড়বে। অবশ্য এতদিনে গাছটা বেঁচে আছে কি না কে জানে! ছেলেবেলায় বার দুয়েক আসার কথা মনে আছে। আরও এসেছে নিশ্চয় কিছু মনে নেই।

সাধু বলল—চিনি। আমারও মামাবাড়ি ছিল না এ গাঁয়ে?

ঝুমুর আর কথা বলল না। কয়েকজন লোক হারিকেন হাতে মেলার দিকে গেল। সাধু পিছন ফিরে তাদের চলে যাওয়া দেখল। তারপর সামনে তাকাল। কেউ নেই। কিন্তু এখানে নয়। উপযুক্ত জায়গা চাই। সে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—কী হল? দাঁড়ালে কেন?

ঝুমুর কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত একটা শেয়ালই হবে—বাঁদিকে উঁচু দীঘির পাড় থেকে নেমে দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে ডানদিকের মাঠে নামল। আর অমনি সে ভয় পেয়ে দুহাতে সাধুকে জাপটে ধরল।

সাধু চমকে উঠেছিল। টর্চের আলো ফেলে জন্তুটাকে খুঁজল। কিন্তু দেখতে পেল না। শুকনো হেসে সে বলল—ছাড়ো!

ঝুমুর ছাড়ল কিন্তু তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। চাপা স্বরে ভয়ে ভয়ে বলল কী ওটা?

—শেয়ালটেয়াল হবে!

—বাঘ নয় তো?

—যাঃ! তোমার দেখছি বড্ড ভয়।

—তোমার ভয় করল না?

—উঁহু। ভয় কিসের? ভূতটুতই গ্রাহ্য করি না, তো....

ঝুমুর অস্ফুট চেঁচিয়ে আবার ওকে জড়িয়ে ধরল।—এই· ওসব বলো না!

সাধু মজা পেয়ে গেল। বলল—নাম শুনেই এত ভয়! ·· বার মতো সামনা-সামনি পড়লে কী করতে ? জানো একবার অমাবস্যার রাতে আসছি...

ঝুমুর প্রায় কেঁদে ফেলল—না, না! শুনব না!

সাধু হাসতে হাসতে বলল—অদ্ভুত মেয়ে তুমি! নাও, ছাড়ো পথের মধ্যে জাপটাজাপটি দেখলে লোকে দুষবে।

ঝুমুরের মেয়ে মন অমনি ব্যাপারটা আঁচ করল। ছেড়ে দিল ওকে—কিন্তু গা ঘেঁষে রইল। ভয়ের সঙ্গে হয়তো সহজাত বোধের এক বিচিত্র অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করছিল। অস্ফুটস্বরে সে বলল—কই, চলো।

সাধু হাঁটতে থাকল। কয়েক পা হাঁটার পর আকাশে নক্ষত্র দেখতে দেখতে সে বলল—ধরো, আমিও যদি তোমার মতো ভীতু হতাম, তাহলে কী হত?

—তুমি ভীতু নও, তা তো জানাই।

—কেমন করে?

—বারে! যখন তুমি বাসন বেচে বেড়াতে—কত জায়গায় রাতবিরেতে ঘুরতে হত না একা?

—হত বইকি।

—তাহলে?

—হুঁ। ঠিক বলেছ। ... সাধুর বুকটা গর্বে ফুলে উঠল। একটি ভয়-পাওয়া মেয়ে তাকে আঁকড়ে

ধরে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে, এতেই তার গর্ব। সে একটু পরে ফের বলল—আমাকে আর বাসনওলা বলছ না তো তুমি?

—যাঃ! আসলে তো তুমি বাসনওলা ছিলে না—। এখনও নও!

সাধু চমকে উঠে বলল—তবে কী আমি, ঝুমুর?

—তুমি তো আমাদেরই স্বজাতি!

শুধু এই? সাধু খুশি হল না। আড়ষ্টস্বরে বলল সে—তা তো বটেই!

—আর মা বলছিল...

ওকে থামতে দেখে সাধু বলল—কী বলছিল তোমার মা?

—তোমার অমন চেহারা। লেখাপড়া শিখলে তো কথাই ছিল না!

সাধু লজ্জায় লাল হল অন্ধকারে। বলল—যাঃ!

—সত্যি। দেখ, কপালে না থাকলে কিছু হয় না। কিচ্ছু না। মা সরস্বতী সবাইকে তো আর দয়া করেন না! ... বলে ঝুমুর হাসল। হাসতে হাসতে বলল—এই! জানো? আমি দু'দুবার স্কুল ফাইন্যালে ফেল করেছি? এই থার্ডবার টেস্ট দিয়েছি। কী হবে কে জানে! মা বাবাকে বকে। বলে—হেডমাস্টারকে বলে দিলেই অ্যালাউ করে দেবে। বাবা বলে—তা না হয় দিল। কিন্তু ফাইন্যালে? তখন তো অন্যলোকে খাতা দেখবে। তখন? আবার সেই গোল্লা! তাই না? বাবা ঠিক বলে না?

সাধু এসব ব্যাপার মোটেও বোঝে না। সে অন্য কথা ভাবছিল। অন্যমনস্কভাবে শুধু বলল—উঁ? কী বললে?

—এই, তুমি কীসব ভাবছ!

—নাঃ! কী ভাবব?

—আমাকে খুব বোকা ভাবছ। ভাবছ—একটা গবেট ফেল-করা মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছি। না?

—যাঃ!

—আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার খারাপ লাগছে।

—না ঝুমুর। তুমি যা বলবে, বলো না। শুনছি তো!

—তুমি শুনছ না।

—সাধু দাঁড়াল। শুকনো হেসে বলল—তুমি কি দেখতে পাচ্ছ অন্ধকারে?

—পাচ্ছি তো!

—কী দেখতে পাচ্ছ?

—তোমাকে।

—হুঁ?

—তুমি অন্য কারো কথা ভাবছ!

সাধুর মনে হল, এইবার ওকে বলে ফেলে—তুমি জানো না ঝুমুর, কার সঙ্গে তুনি নির্জন রাস্তায় অন্ধকার রাতে এমন করে হেঁটে যাচ্ছ। আঃ! এ কী কষ্ট সাধুর। বুকের এই ওঠানামা, চোখের এই ঝিলিক দিয়ে ওঠা আগুন, আর নিভে যাওয়া, কিছু টের পাচ্ছে না বোকা সরল মেয়েটা। তার ইচ্ছে করছে, বলে ওঠে রুদ্ধশ্বাসে—তুমি পালাও, পালিয়ে যাও ঝুমুর! এক্ষুনি পালাও!

—সাধুদা!

—উঁ?

—তোমায় আমি সাধুদা বলে ডাকব।

সাধু ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল—তাই ডেকো।

কখন গাঁয়ে ঢুকে পড়েছে ওরা। দুধারে মাটির ঘরবাড়ি। টর্চের আলো আবার এতক্ষণে জ্বলে উঠল। একটা দাওয়ায় কজন লোক অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। রাস্তায় দুটো গরুর গাড়ি। সাধু বুঝল, বিদেশী গাড়োয়ান ওরা। ধান কিনতে এসেছে। সঙ্গে টাকা আছে নিশ্চয়। কিন্তু এখানে তার ক্ষমতায় কুলোবে না। একলা হলে চেষ্টা করে দেখত।

—এই! আর কদ্দুর?

—দাঁড়াও। গাঁয়ের লোক পেলে জিজ্ঞেস করব। আমিও চিনতে পারছি না। রাত্তিরবেলা কিনা।

হ্যারিকেন হাতে এক বুড়ী বেরোল। পেছনে একটা বাচ্চা মেয়ে। শীতে গুটি গুটি থপথপ করে এগোচ্ছে। এদের দেখে হ্যারিকেন তুলে বুড়ী বলল—মধু নাকি রে?

সাধু বলল—না বুড়ীমা। /

—অ। যাও বাবা যাও। আয়, ইমলি!

সাদু বলল—বুড়ীমা, অঘোর মুখুজ্যের বাড়িটা কোথায় জানো?

—আর একটুখানি এগিয়ে ডানহাতি ঘুরবে। তারপরে বরজেতলার মন্দির...

ঝুমুর বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনতে পারব।

ওরা চলে গেল। এরা এগোল। ডানদিকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়েছে। একটু পরে সাধু বলল—একটা কথা ভাবছিলাম, ঝুমুর।

—কী কথা? আমার কথা তো?

সাধু হাসল। —যাঃ। অন্য কথা।

—কাকেও মনে পড়ছিল বুঝি? সে কে গো সাধুদা?

—কী ফচকে মেয়ে রে বাবা! সাধু আরও জোরে হেসে উঠল। তলায় তলায় পেকে লাল। বুঝেছি, এ জন্যেই পরীক্ষায় গোল্লা পাও!

ঝুমুর দমে গেল না। যেন এইসব নির্জনতা আর রাত্রির অন্ধকারে কী থাকে, যা মানুষকে বড়োরকমের একটা স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দেয়। সেই স্বাধীনতা তাকে ভয়হীন করে—সংকোচ থেকে মুক্ত করে ফেলে—নিয়ে যেতে থাকে নিজের মুঠোর মধ্যে। আর, সাধুও তো দেখেছে রাতের নির্জনে মানুষ কেমন অন্যমূর্তি হয়ে ওঠে। ইচ্ছে-বাসনার সব বন্ধ দুয়ার খুলে যায় দুমদাম শব্দে। একটা তোলপাড় জেগে ওঠে আবহমণ্ডলে।

কিন্তু সাধুর বরাবর কী হয়েছে—যাকে বলা যায় দুর্দান্ত জিঘাংসা। তার হাত নিশপিশ করে। মানুষের গলা ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায় না। একটা হ্যাঁচকা টান, কঁক্ কঁক্ ঘড় ঘড় আওয়াজ, চোখ জিভ ঠেলে বেরিয়ে আসা, তারপর হাঁটুর চাপ—কয়েক ফোঁটা রক্ত নাকে আর কষায়—ব্যস্। শান্তি।

সাধু শিউরে উঠে ভয়-পাওয়া চোখে তাকাল অন্ধকারে। টর্চ জ্বালতে সাহস পেল না। সেই মারাত্মক ইচ্ছেটা আবার হুহু করে উঠেছে মগজে। সে ঠোঁট কামড় ধরল।

—সাধুদা!

সাধু চুপ।

—কী হল? আর কথা বলছ না যে? এই সাধুদা!

ঝুমুর ওকে ধাক্কা দিল একটু। সাধু বলল—বলো!

—একটা কথা বললে রাগ করবে না তো?

—উঁহু।

—না। থাক্ বাবা, বলব না। তুমি যা নীতিবাগীশ ছেলে?

—তার মানে?

ঝুমুর চালিয়াতি করে বলল—বলছি তোমার মর‍্যাল সেন্সটা খুব বেশি কি না। একেবারে গার্জেনদের মতো! কড়া গার্জেন!

আহা, কেন সাধুর লেখাপড়া হল না? সাধু হাসল।

—বলব?

—হুঁ, বলো।

—তুমি নিশ্চয় কোন....

—থামলে কেন, ঝুমুর?

—তুমি নিশ্চয় কোন মেয়েকে....থাক্ বাবা। গার্জেন রেগে কাঁই হবে।

—ঝুমুর! বলো।

—তুমি যাকে ভালবাস, তার কথা ভাবছিলে তখন। তাই তো?

দুম করে কথাটা বলেই ঝুমুর খিলখিল করে হেসে, যেন সাধু তাকে চাঁটি মারতে যাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে একটু সরে গেল। সরতে গিয়ে তার স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ল। সে অস্ফুট চেঁচাল—হল তো? এবার জুতো বইতে হবে। স্ট্র্যাপটা গেল। আলো দেখাও তো!

সে হেঁট হয়ে স্যাণ্ডেল দেখতে ব্যস্ত হল। সাধু তার পায়ের ওপর টর্চ জ্বেলে রইল। তারপর নিভিয়ে দিয়ে পা বাড়াল। গুম হয়ে রইল। কী সুন্দর পা দুটো!

ঝুমুর খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। জুতো বইবার পাত্রী নয় সে। বলল—যাক্ গে বাবা। সাধুদার সঙ্গে অনেক ফাজলেমি করা হল এতক্ষণ। কিন্তু বরজেতলাটা ... ওই যে—হ্যাঁ, ওই তো! দাঁড়াও—এখান থেকেই ডাকি। মামা! ও মামা!

সাধু আলো ফেলল। একটা মন্দির দেখা যাচ্ছিল সামনে। আর সেই সময় সাধুর মনে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে একটা আঁখের ক্ষেত। সবুচ কুকুরশুঁকোর থোকাথোকা পাতা আর নীল চুল মাথার তলায় রেখে একটি ফ্রক পরা মেয়ে ফিসফিস করে ডাকছে—মামা! মামা! তার নাকে আর কষায় কয়েক ফোঁটা রক্ত।

—মামা! মামা!

ঝুমুর আবার ডাকল। আর সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য কষ্টে ছটফট করে সাধু প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এল। একবারও পিছু ফিরে তাকাতে সাহস পেল না।

পিছনে ঝুমুর হয়তো হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সাত

সে রাতটা কীভাবে কেটেছে, সাধু টের পায়নি। শুধু মনে পড়ে, ঝুমুরকে এগিয়ে দিয়ে এসে সঞ্জয় বোসের মোটরগাড়িতে বসেছিল। তারপর তার প্রচণ্ড কাঁপুনি এসে যায়। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তাঁবুতে ঢুকেছিল। লতার ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়েছিল। একটা কম্বলও টেনে নিয়েছিল। তবু কাঁপুনি থামেনি। কুঁকড়ে মায়ের পেটে থাকা ভ্রূণের মতো একটা পিণ্ড হয়ে উঠেছিল সে। তেষ্টায় বুক গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর কেউ—হয়তো লতা বউদি তাকে কখন জল খাইয়েছে। মনে আছে এইটুকুই।

তারপর কত কী যে ঘটেছে। ভাষা দিয়ে সাধু তা প্রকাশ করতে পারবে না কোনদিনও। হয়তো স্বপ্ন দেখেছে। কাশকুশের বন, বাসনওয়ালা চাঁদতারণ.... তার বাবা কালু মুখুজ্যে .... বাহাদুরের কাঁকনপরা শরীর... একশো বন্দুকবাজ পুলিশের দৌড়ে চলা .... ঝুমুর .... এলোকেশী .... এলোকেশী না ঝুমুরের নাচ ..... মা ডাকছে, জল খাবি বললি যে, আয়! সাধু বলছে, দরজা খোলো.... জেলখানার ভেতর মা ঢুকল কেন—হাতে জলের গ্লাস? ..... বাজনা বাজছে বিয়ের। হাতির পিঠে বর। হাতি চলেছে কাঁকনতলা ছাড়িয়ে মোহনপুর পেরিয়ে কাটোয়ার দিকে। সেই বলল—মুর্শিদাবাদ এস্টেটের নবাববাহাদুরের হাতি। সেই হাতি সাধুকে তাড়া করেছে। আর সাধুর হতে কমণ্ডলু। কমণ্ডলু ভরা গঙ্গার জল—হরিণমারার গঙ্গার কালো স্ফটিক জল, তল অবধি দেখা যায়। রোদ ঝিলমিল করে বালিতে। মৌরলা মাছের ঝাঁক। তবু কেন তেষ্টা? লাল কাপড়-পরা সন্ন্যাসী চোখ পাকিয়ে বলল—জল খাবি, না রক্ত খাবি রে বেটা? সাধু ফুঁপিয়ে কাঁদে। রক্ত না, জল খাবে! জল!

একবার মনে হয়েছিল কে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা ছোট্ট হাত। ঝুমুর নাকি? ঝুমুর জানে না তো, সাধুর বিয়ে হয়েছে কোন ছেলেবেলায় এলোকেশীর সঙ্গে! এলোকেশী সর্বনাশী মেয়ে রে! সাধুকে পর করে দিলি মানুষজন থেকে। সে আর কার দিকে তাকাবে? চোখে ঠুলি পরিয়ে দিলি, এলোকেশী!....

সাধু পিটপিট করে তাকাল। মাথা প্রচণ্ড ভারি। সারা শরীরে বেদনা। কোথায় শুয়ে আছে সে? কী হয়েছিল তার? সামনে একটা রোদরাঙা ঘাসের মাঠ দেখা যাচ্ছে। কাগজের টুকরো পড়ে আছে অজস্র। সাধু আবার চোখ বুজল। সেই সময় তার মাথায় আবার কার ছোট্ট হাত পড়ল। সাধু আরামে অস্ফুট ডাকল—ঝুমুর!

খিলখিল হাসি শুনে তাকাল সে। অতি কষ্টে ঘুরল। লতা বউদি! সে লতা বউদির বিছানায় শুয়ে আছে এখনও! ওঠার চেষ্টা করল তক্ষুনি। কিন্তু লতা বউদি তার কাঁধ ধরে আবার শুইয়ে দিল।—উঠো না, উঠো না! এখনও জ্বর আছে। মাথা ব্যথা করছে তো? তখন থেকে ট্যাবলেট নিয়ে বসে আছি। খাবে?

বাইরে থেকে সঞ্জয় বোসের গলা শোনা গেল।—হুঁশ হয়েছে ওর?

লতা বলল—হ্যাঁ। যা জ্বর! আমার তো ভয় হয়েছিল! ডিলিরিলয়ামে বকছিল শোন নি? একবার ভাবলুম, মাথাটা ধুয়ে দিলে হত। তখন শেষ রাত্রির যা ঠাণ্ডা! পারলুম না।

সঞ্জয় এসে ভেতরে ঢুকল। ভর্ৎসনার সুরে বলল—কী ছেলে হে তুমি! কাল বলবে তো যে স্নান করব না—ঠাণ্ডা লাগছে! আমিও বোকার মতো দীঘির জলে ডোবালুম তোমায়—আর তুমিও বাপ্পোৎ গবেটের মতো অতক্ষণ ধরে সাবান মাখলে! শালা ঢের জল দেখেছি—এমন বরফ জল দেখিনি কোথাও! যেন সুমেরু না কুমেরু! ওরে বাবা! তোমার দেখেই শিক্ষা হয়েছে। আমি আর ডুবতে যাচ্ছিনে—নেভার! লতা, ওখানে স্নান ছেড়ে দাও।

লতা বলল—আমার কিছু হবে না। সাধু, ওঠ তো! ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও, লক্ষ্মীটি!

সাধু মরে গেলেও ওষুধ খেতে পারবে না। জীবনে কেউ ওকে ওষুধ খাওয়াতে পারেনি। মা হাত-পা-বেঁধে মুখে গুঁজে দিত, সাধু গিললে তো? সে কষ্ট করে হাসল। খোনা খোনা স্বরে বলল—খাই না।

—খাই না মানে? পাগল ছেলে কোথাকার! এই, জোর করে ট্যাবলেটটা খাইয়ে দাও তো! বুড়ো বয়সেও দুষ্টুমি যায়নি। বলে—খাই না।

লতার কথা শুনে সাধু একলাফে উঠে বসল। ব্যথাবেদনা চলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। হাউমাউ করে বলল—দোহাই বউদি! আপনার দিব্যি। ওসব খেলে মরে যাব। মাইরি মরে যাব। পায়ে ধরে বলছি।

এত বড় জোয়ানকে ওষুধের নামে হাউমাউ করতে দেখে স্বামী-স্ত্রী হেসে খুন। তবে এটা স্বাভাবিক বৈকি। সঞ্জয় বলল—আরে, গাঁয়ের ছেলেরাই ওরকম। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলত—কোথায় গাঁয়ে কলেরা লেগেছে। ওরা গেছে ইনজেকশান দিতে। গিয়ে দেখে, গাঁ ফাঁকা খাঁ খাঁ। সব ধোঁয়া—মানে স্মোক! কী ব্যাপার? না সব আন্ডা-বাচ্চা গাঁ ছেড়ে মাঠে বনবাদাড়ে লুকিয়ে পড়েছে।

বিশালদেহী প্রাক্তন সার্কাসওয়ালা হা হা করে হাসতে থাকল। বিরাট বুকটার ওঠাপড়ার দিকে তাকিয়েছিল সাধু। ওখানে হাতি বয়েছে একসময়। তা, অমন শরীর পেলে সাধু অ্যাদ্দিনে পাঁচশো মানুষ মারত। তুমি করলেটা কী জুয়াড়ীদা?

হাসতে হাসতে সঞ্জয় বলল—ব্রাদার, চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি একটু ঘুরে আসি। যতীন শালা দলবল নিয়ে হামলা করেছে।... বলে সে গলাটা চাপা করল।—কী ডেঞ্জারাস কাণ্ড মাইরি। অনেক মেলা ঘুরলুম। হাঙ্গামা খুনোখুনি মেলা খেলায় হয়েই থাকে। কিন্তু বরমপুরের মেলায় যা দেখলুম—বাপ্‌স! আমার তো বুক কাঁপছে।

সাধুর চোখ জ্বলে উঠেছিল। বলল—কী হয়েছে দাদা?

—শুনলে ভয় পাবে। জ্বর ছাড়ুক। লতা, যতীনটা হয়তো আসবে। তুমি কটা ডিমটিম আনিয়ে রাখো। সেই ছোঁড়াটাকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি। আর শোন, খবরদার, একা দোকা যেও না! শালা খুনেদের জায়গা। বি ভেরি কেয়ারফুল!

সঞ্জয় চলে গেলে লতা বলল—তোমার দাদা এবার দেখবে মেলা ছেড়ে পালাবে! যা ভীতু মানুষ! খুনখারাপি একদম দেখতে পারে না। সকালে দেখে এসেই সায়েবের ধুকপুকুনি বেড়ে গেছে। দেখতে শরীরটা অমন জাইগ্যান্টিক ফিগার হলে কী হবে—বড্ড ভীতু! দেখলে না? সে রাতে এক পুঁচকে

ছোকরার হাতে মার খেল কেমন! হুঁ, সার্কাসে বুকে নাকি হাতি চাপাত। কুস্তি কসরত করত। ডাম্বেল মুগুর ভাঁজত! তাতে কী হয়েছে? মনটা ওর বড্ড নরম—বড্ড ভীতু। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো, ভাই! পারলে তোমার বউদির আঁচলে ঢুকে পড়ে! ওই তো হয়েছে আমার জ্বালা, ভাই!...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লতা চুপ করল। সাধু অধীর হয়ে বলল—কে খুন হয়েছে বউদি? কোথায়?

—কে জানে! শুনছি—কপাটওলাদের ওখানে। লোকে বলছে, ওর সঙ্গের লোকটা নাকি জুয়ো খেলে। টাকার লোভে মেরেছে। সব টাকা নাকি খুন-হওয়া লোকটার কাছেই থাকত।

সাধু একটু চুপ করে থেকে বল্‌ল—আমি তোমার খাটে কেন বউদি? তুমি শুয়েছিলে কোথায়?

—তোমার পাশেই। বলে নিচের দিকটা দেখিয়ে লতা হাসল। রসিকতা করে আবার বলল—টের পাওনি বুঝি?

সাধু মাথা দোলাল।

লতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—খেলে না তাহলে ট্যাবলেটটা? পরে বরং খেও। কেমন? দেখ এ বেলা কেমন থাকো। নয়তো ... ইয়ে, এখন বরং পাঁউরুটি সেঁকে দিই। দুধ দিয়ে গেছে গয়লা। গরম করে দিচ্ছি। খেয়ে নেবে কেমন?

সাধু আবার মাথা দোলাল।

লতা দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে বলল—তোমার মতো ছেলে পেয়ে আমাদের মনে কত জোর বেড়েছে, জানো না তো ভাই! তোমার দাদা বড্ড খুশি হয়েছে। হুঁ, চাকু-চালানো লোক পেয়েছে কি না। বডিগার্ড! কী? সত্যি সত্যি চাকু চালাতে পারো তো? যাও, যাও! ঢের দেখেছি! সবাই বোসসায়েব!

হাসতে হাসতে চলে গেল সে। সাধু কাত হয়ে পড়ে রইল কতক্ষণ। যতীন দারোগা আসবে বলে গেল। এসে সাধুকে তো দেখতে পাবে। তারপর চোখে চোখে তাকালেই তো আত্মার তলা অবধি বিলকুল খবর পেয়ে যাবে। তখন কী হবে? ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সাধু। এখন যদি ঝুমুর আসত তার খোঁজে, সোজা তার সঙ্গে চলে যেত ওদের মামাবাড়ি। স্বজাতির ছেলে। বিপদে পড়েছে বলেই তো গেছে। ফেলে নিশ্চয় দিত না! সে মনে মনে প্রার্থনা করল—মা কালী? কাল রাতে বাগে পেয়েও ঝুমুরকে ছেড়ে দিয়েছি! এতে কি পুণ্যি করি নি মা কালী! তা যদি করে থাকি ঝুমুরকে তুমি পাঠিয়ে দাও! তোমার পায়ে পড়ি, মা! আমাকে বাঁচাও! ... সাধুর ঠোঁট কাঁপতে থাকল।

—ওকি! তুমি কাঁদছ? কেন ভাই? ...লতা এসে ঢুকেছে কখন। এসেই চোখ গেছে? সাধুর মধ্যে কী পাচ্ছে এরা?

সাধু ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল—না তো!

—ছিঃ! কাঁদবে কেন? মা বাবা নেই—কেউ নেই, তো আমরা আছি, ভাই। পর মনে করছ কেন? দেখ—তোমাকে তো পর বলে দূরে দূরে রাখিনি!...লতা পাশেই বসে পড়ল। মাথায় হাত রাখল। —বলো, পর ভেবে অবিশ্বাস করেছি? আমি—আমি যে কত খুশি হয়েছি, তোমাকে কী বোঝাব? আমার হারানো ভাইয়ের কথা বলিনি তখন? তুমি তো আমার সেই হারানো ভাই। না—না, কাঁদে না! এই! কী হচ্ছে! ছি, ছি!

সাধুর কী হয়ে যাচ্ছিল, প্রচণ্ড চেষ্টাতেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। এবার লতার দুই উরুর মধ্যে মাথা গুঁজে সে ভীষণভাবে কেঁদে ফেলল। তার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। যার ছন্নছাড়া জীবনের পরতে পরতে, কঠিন ঠাণ্ডা বড় বড় পাথরের তলায় শিশির বা বৃষ্টির জল জমে যেমন স্যাঁতস্যেঁতে হয়ে থাকে— তেমনি অজস্র স্যাঁতস্যেঁতে ভাবগুলো এতদিন পরে হু হু করে বেরিয়ে এসেছে। এই ভয়ঙ্কর কান্নায় তার কথা ছিল অনেক— সে কথা সে অন্য ভাষায় নিজেও যেমন বলতে পারলে না, কেউ বুঝতেও তো পারবে না কিছু।

লতারও দু চোখ বেয়ে শব্দহীন জলের ধারা গড়াতে থাকল। কান্নায় কান্না টানে। সাধুর পিঠে হাত রেখে একসময় খুব আস্তে বলল—তুমি যেমন পথের মানুষ, আমরাও তেমনি পথের মানুষ ভাই। পথেই আপনজন পাই—হাসি, খেলি। সুখদুঃখের কথা বলি। আবার কে কোথায় হারিয়ে যাই দূরে।

আবার নতুন জনের সঙ্গে চেনা হয়। তবে দেখ, আমাদের পৃথিবীটা অনেক বড়ো। অনেক—অনেক বড়ো।

লতা নিজেকে সামলে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল—দুধ চাপিয়ে এসেছি স্টোভে। উথলে যাবে।

সাধু মুখ তুলে নিয়ে কম্বল চাপা দিল। লতা বেরিয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য শান্তি সাধুর মনে! এ শান্তি ফাঁস পরিয়ে মানুষ মারার সেই পরিচিত শান্তিটা নয়। এর মধ্যে গভীরতর আরাম আছে! শরীর এত হালকা লাগছে তার!

প্রাণভরে কাঁদতে পারায় যে কত সুখ, সাধু তা জানত না। সে মনভরা গভীর তৃপ্তি নিয়ে আপাতত একটা সিগারেট খাবার কথাই ভাবল। এই রে! জামা পরেই শুয়েছিল—পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেটটা তাহলে গেছে! শশব্যস্তে হাতড়াতে থাকল সে। নেই তো! আর পিঠে বাঁশিটাও গোঁজা ছিল না? বালিশের দিকে চোখ গেল তার। লতা বউদির বালিশে শুয়েছিল আজ? তাই সারারাত নাকে এলোকেশীর গন্ধ নিয়ে এলোকেশীকে স্বপ্ন দেখেছে বার বার? ও হরি, তাই বলো! কিন্তু এখন নাক বন্ধ হয়ে আছে সর্দিতে—তাই গন্ধটা পাচ্ছে না। দু চারবার ফোঁত্ ফোঁত্ করে নাক সাফ করার চেষ্টা করল সে। বালিশটা তুলে নাকে ঠেকাল। আর তখনই দেখতে পেল, সিগ্রেটের প্যাকেট, খুচরো পয়সা, বাঁশিটা কে বের করে রেখে দিয়েছে মাথার কাছে। লতা বউদি ছাড়া আবার কে ? মনে মনে বলল—বউদি, আমার সোনার বউদি, আমার প্রাণের বউদি! তুমি এত ভাল মেয়ে! এই সাধু সারা পৃথিবীর মানুষ মেরে শেষ করে দেবে—শুধু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। .... একটু ভেবে কথাটা বদলাল।... হুঁ—তোমাকে আর ঝুমুরকে। ঝুমুরও খুব ভাল মেয়ে। খুব ভাল।

কিন্তু দেশলাইটা গেল কোথায়? পড়ে গেছে হয়তো। মাথা তুলে নিচেটা দেখার সময় লতা এল।—দুধ গরম হয়েছে। শোন, গরম জল করতে দিলুম। মুখটা কষ্ট করে উঠে ধুয়ে নেবে। কী খুঁজছ? তোমার দেশলাইটা নিয়ে স্টোভ জ্বেলেছি। না—এখন সিগ্রেট খায় না। আগে মুখ ধোও।

সাধু উঠে বসল। শরীর টলছে। মাথা ঘুরছে। লতা তার কাঁধটা ধরল।

সাধু বলল—না। পারব। সামান্য জ্বর। অনেকদিন অসুখ-টসুখ হয়নি কিনা! মনেই পড়ে না—কবে জ্বর হয়েছিল। জে...

বলেই সামলে নিল সে। এই রে! জেলে কদিন জ্বরে ভুগেছিল। তবে ওষুধ খায়নি। জেল হাসপাতালে তার মতো অনেক কয়েদী ছিল। তাদের কাছেই শিখেছিল, ওষুধ না খেয়ে কীভাবে ফেলে দিতে হয়। শুধু ইনজেকশানটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। জেলে ঢোকার পর একবার প্রথমেই ইনজেকশান! উঃ! সে যেন মুসলমানদের জবাই করার কাণ্ড! সাধুর চিৎকারে, পাগলাঘণ্টি বাজার উপক্রম হয়েছিল। অত বড় একটা সুচ পটপট করে ঢোকানো হবে—ভাবতেও সাধুর হৃৎপিণ্ডে খিল ধরে যায়। তার চেয়ে ওসমানের গলায় যেমন চাকু চালিয়েছিল—কেউ চালাক না তার গলায়। সাধু ভয় করবে না। যে মরছেই, তার আবার ভয় করার কী আছে শুনি?

যতীন দারোগা আর আসেনি। তার আসার ফুরসত নেই। শম্ভুকে ধরে চালান দিয়েছে। যত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, সঞ্জয় বোস বলেছে লোকটা রাতে তার আসরে জুয়ো খেলছিল—হেরে ভূত হয়েছে। কাজেই মোটিফ পেতে দারোগার অসুবিধে হয়নি। গোঁফে তা দিয়ে বলেছে—অ্যাই গিরধারী! পাকড়ো শালাকো!

দুপুরে জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গিয়েছি- সাধুর। গায়ে ঘাম দিচ্ছিল। সঞ্জয় আজ কাকে দিয়ে বালতি ভরে টিউবওয়েলের জল আনিয়ে স্নান করেছে। শুধু তাই নয়—গরম জল মিশিয়েছে। লতা কথা শোনেনি। সে দীঘিতে স্নান করার মজা পেয়ে গেছে যেন। সাধুকে শুনিয়ে বলেছে—বলো তো ভাই এবার, তোমার দাদা মেয়েছেলে—না আমি?

তাই শুনে সঞ্জয় তোয়ালেটা মাথায় ঘোমটার মতো চাপিয়ে একটু কোমর দুলিয়ে দিয়েছে। সাধু হেসে অস্থির। বড্ড আমুদে লোক বোসসায়েব।

কিন্তু সাধু ভাতই খাবে। লতার আপত্তিতে সে রোগা ছেলের মতো খুঁখুঁ করেছে খুব। সঞ্জয় বলেছে—থাক্ না বাবা! আজকাল জ্বরে আর উপোস করে না কেউ!

—বেশ তো। পাঁউরুটি খাক্।

সাধু বলেছে—তেতো লাগে বউদি! তোমার পায়ে পড়ি—দুটি ভাতই দাও আমাকে।

লতা বলেছে—বেশ। খাও—খেয়ে আবার জ্বর আসুক। তখন দেখবে মজা। আমি আর দেখব না বলে দিচ্ছি। সোজা ওই গাছতলায় বিছানা করে দেব, দেখবে।

সাধু বলেছে—আমি তো গাছতলারই মানুষ, বউদি!

সেই দুপুরে খাওয়ার পর লতা শিবমন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল। সঞ্জয় ওসব মানে না। ঠাট্টা করে বলেছিল—হঠাৎ পুজোর ঘটা কেন, লতা? কী মানত করেছিলে, বলবে না? আমার যেন যমের বাড়ি যাওয়ার পথটা ....

তাই শুনে লতা থমকে দাঁড়িয়েছিল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে। চোখে কেমন দৃষ্টি। সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলেছিল—যাও, যাও। শুভ কাজে বাধা দেব না।

সে চলে গেলে সাধু বলেছিল—দিলেন তো বউদির মনটা খারাপ করে? খারাপ মন নিয়ে পুজো দিতে নেই।

—আর পুজো! তুমি তো জানো না হে—এর আগে তো যেখানে গেছে, মন্দির পীরের দরগা সাধুসন্ন্যাসী ধরাধরি করতে বাকি রাখেনি কিছু। অ্যাদ্দিনে খানিকটা ছেড়েছিল। আবার হঠাৎ কী হল কে জানে!

সাধু বলেছিল—কেন দাদা?

—ওর এক হাড়হারামজাদা মহাখচ্চর ভাই ছিল—বুঝলে? মহাধড়িবাজ শয়তান ছিল ছোঁড়াটা। কতবার যে শালার জন্যে আমাকে থানায় যেতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন শালা হাওয়া হয়ে গেল। মুখে বলতে পারি না, ওর কষ্ট হবে শুনে। শালা নির্ঘাত চাক্কু খেয়ে পটল তুলেছে কোথাও। ওরা তো অমনি করেই মারা পড়ে! ছেড়ে দাও।

সাধু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাহলে সেও কি একদিন কারও হাতে চাক্কু খেয়ে মারা পড়বে? সে খুব বিশ্রী ব্যাপার হবে। সে আনমনে মাথা দুলিয়েছিল। না—না—অমনভাবে তার মৃত্যু যেন না হয়।

সঞ্জয় একটু পরে বলেছিল—তুমি তো বামুনের বাচ্চা। কোষ্ঠী দেখতে জানো? জ্যোতিষ শেখোনি?

সাধু ঘাড় নেড়েছিল।

—তাহলে শিখেছ কী ব্রাদার? তোমার কী রাশি, কী লগ্ন?

সাধু বলেছিল—জানি না।

—আমার বৃষ রাশি, তুলা লগ্ন। রাহুর দশা কেটে সবে বৃহস্পতি পড়েছে। সব লক্ষণ ভালো। বুঝলে?.... একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল—তবু কী জানো, এই লাইনটা আমার খুব একটা বরদাস্ত হচ্ছে না। তোমার দিব্যি, বিলিভ মি। থ্রিল আছে, ওঠাপড়ার জার্ক আছে। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কী জানো, জেনেশুনে লোককে ঠকাতে ইচ্ছে করে না।

—জেনেশুনে?

—তা বই কি। খোপে গুটি ঘোরে—কোন্ পাশে চিত হয়ে শোবে—তুমি ভাবো, সবই অ্যাকসিডেন্ট? ও তো ব্রাদার, জুয়াড়ীর হাতে। স্রেফ এই হাতের প্র্যাকটিস। গুটিকে যে পাশে চিত হতে বলব, হবে। নয়তো ওস্তাদী কিসের?

সঞ্জয় তার জুয়াখেলার অনেক গল্প শুনিয়েছিল। সাধু বুঝেছিল, কত বোকা গেঁয়ো রংবাজ যে সর্বস্বান্ত হয়েছে ওর হাতে, তার সংখ্যা নেই। কিন্তু ওস্তাদেরও ওস্তাদ থাকে। এক আসরের সব জিত অন্য আসরে দুঁদে খিলাড়ির পাল্লায় পড়ে খোওয়া যায়। কতবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। তখন একটা টাকা নেই যে খেয়ে বাঁচবে। সেসব খিলাড়ি গুটির আওয়াজ বোঝে। আওয়াজেই টের পায় গুটি কোন্ দিকে

চিত হয়ে ছকে শোবে।

সঞ্জয় বলেছিল—তাছাড়া অনেক মা-বউ-ঝির অভিশাপ এসে লাগে, ভাই। আলবৎ লাগে। ভুবনপুরের মেলায় এক বাঞ্চোৎ বউয়ের গয়না ধরে খেলতে বসেছিল। বউটা এসে পরে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল। মেয়েমানুষের শালা গয়নার বড্ড লোভ। ....

—বউদির কিন্তু লোভ নেই। সাধু না বলে থাকতে পারে নি।

সঞ্জয় হেসেছিল।—পাচ্ছে না, তাই। বোসসায়েবের হাতে পয়সা জমলে তখন দেখো, কী করে।

—বউদি সে মেয়ে নয়।

—দুদিনেই বউদির প্রেমে পড়ে গেছ, ব্রাদার! বউদিকে তো চেনো না! যাক্‌গে—শোন সেই মাগীর কাণ্ড। মাগী শাপ দিল হে! বলল—আমার বউও ওর মতো গয়না হারিয়ে ধড়ফড় করে মরবে। আর—মাইরি শালা, মাস ঘুরতে না ঘুরতে তাই হল? হ্যাঁ—ঠিক তাই হল।

—শুনেছি।

—ও বলেছিল বুঝি? হুঁ-দুঃখ তো হবেই। তবে এই মেলায় যা গতিক, মনে হচ্ছে গয়নার টাকা উঠে আসবে।

—আপনি তো চলেই যাচ্ছিলেন মেলা ছেড়ে!

—আর যাব না। যতীন আছে—তুমি আছো! ... বলে সে সাধুর ডান হাতটা নিয়ে বলেছিল—এই! তুমি যে মাস্তানী করেছ বললে, তা মাইরি আমার বিশ্বাস হয় না! ইস্! মাগীর মতো নরম হাত তোমার! এমন কার্তিক চেহারা! শালা, আমি ছুঁড়ি হলে সত্যি তোমার প্রেমে পড়ে যেতুম!

সাধুর চোখ জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল—নিজের সব কীর্তি ফাঁস করে দেয়। মাফলারের খেলের নমুনা একটুখানি দেখিয়ে দেয় বোসসায়েবকে। কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়েছিল ইচ্ছেটা। লোকটা দারুণ ভড়কে যাবে।

—এর পর কোথায় যাবে দাদা? সাধু জিজ্ঞেস করেছিল এক সময়।

—ভেবে দেখিনি। কাছাকাছি তেমন বড় মেলা কই? এর পর তো শিবচতুর্দশীর কয়েকটা মেলা বসার কথা। হ্যাঁ হে, সাধুচরণ, তোমাদের হরিণমারা থেকে মোহনপুর কদ্দূর বলো তো?

সাধু চমকে উঠেছিল। বলেছিল—মোহনপুর?

—হ্যাঁ। ওখানে গঙ্গার ধারে খুব বড় মেলা বসে শিবচতুর্দশীতে। রেল লাইনের ধারে জায়গাটা নাকি। গেছ কখনও মোহনপুর?

সাধু ঘাড় নেড়েছিল। চাঁদতারণের কথা ভাবছিল সে।

—আমার কাছে ম্যাপ আছে। দেখেছি। কাঁদি হয়ে যেতে হবে মনে হচ্ছে। রাস্তা তারপর কিছুদূর পাকা—কিছুটা কাঁচা। মোহনপুরের রাস্তায় পিচ পড়েছে কি না কে জানে! ম্যাপটা পুরনো—ব্রিটিশ আমলের। ওক্কে! যতীনকে শুধোব। হি ইজ দা রাইট ম্যান!...

কথা বলতে বলতে পুজো দিয়ে লতা ফিরে এসেছিল। এসে বলেছিল—এখন নয়—কাল সকালবেলা শরীর ভাল থাকলে তোমাকে নিয়ে যাবো। তোমার দাদা তো নাস্তিক ম্লেচ্ছ মানুষ। তোমাকে নিয়ে যাবো। প্রণাম করে আসবে। এই নাও প্রসাদী ফুল।

সাধু বেলপাতা আর জবাফুল নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল।

—তুমি তো নেবে না! তোমার ছকে ছুঁইয়ে রাখছি। দেখো, ফেলে-টেলে দিও না। কই? কোথায় রেখেছ?

সঞ্জয় হেসেছিল।—তোমার খাটের তলায় বাক্সের ওপর আছে। দেখ, যদি আজ রাজা হতে পারি!...

সে রাতে আর জ্বর আসেনি সাধুর। কিন্তু তাঁবু ছেড়ে তাকে বেরোতে দেয়নি লতা। খাইয়ে-দাইয়ে দরজায় তেরপলের পর্দা বাইরে থেকে গিঁট বেঁধে আসরে গিয়েছিল। সাধু অবশ হয়ে ঘুমোল সারা রাত।

সকালে সঞ্জয় বলল—চলো হে মাস্তান! একবার ঘুরে আসি। গাড়ি নিয়ে বেরোব। শরীর ভালো তো?

সাধু ঘাড় নাড়ল। সঞ্জয় সায়েব সেজেছে একেবারে—মাথায় টুপি পরেছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল—লতা গেলেও পারতে!

লতা বলল—হ্যাঁ, আমি যাই। আর সব উচ্ছন্নে যাক্।

—আরে কেউ কিছু নেবে না। যতীন দারোগার ফ্রেন্ডের আখড়া।

—সাধু, গা ঢেকে বসো, ভাই। বাতাস লাগবে। ওগো, হুডটা তুলে দাও না!

সাধু সামনে ডানদিকে বসেছে। জীবনে এ এক আশ্চর্য ঘটনা তার। এমন মোটরগাড়ি চেপে যাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? গর্বে তার মুখটা উঁচু হয়ে গেল। মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ভাবটা প্রচণ্ড রকম পেয়ে বসল তাকে। কদিন আগে সে পা-ভরা ধুলো নিয়ে বাসনওলা সেজেছিল!

না। মানুষ মারার জন্যে তার পাপ হয় না। হয় নি। মা কালী তাকে এ কাজের জন্যেই তো পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে। যদি পাপ হত, তাহলে এত সুখ জুটত কি তার? সাধু অভ্যাসমতো চাপা শিস দিতে থাকল।

গাড়ি দীঘির ধার দিয়ে কাঁচা রাস্তায় এগিয়ে একটু পরেই পুবে পাকা সড়কে উঠল। রাজ্যের ন্যাংটা আধ ন্যাংটা মেলাচরা ছেলেপুলে পেছনে লেগেছিল। তারা সব ধুলোয় ভূত হয়ে গেছে দেখে সাধু খুব হাসতে লাগল। একসময় এমন ছোটাছুটি নিজেও তো সে করেছে। এর মজাটা কী, সে ভালোই জানে। হরিণমারার জমিদারবাবুর গাড়ি ছিল না। কিন্তু তাঁর বেয়াইমশায়ের ছিল। তিনি বাঘমারা গাঁয়ের রাজা। পশ্চিমা বামুন—পদবী ত্রিবেদী। গাড়ি নিয়ে বেহাইবাড়ি আসতেন। পেন্টুল খুলে যেত সাধুর দৌড়তে গিয়ে—তাও গ্রাহ্য নেই। যতক্ষণ না পায়ে আটকে ধুলোয় আছাড় খেয়েছে, সমানে দৌড়েছে। আসলে গাড়ির গন্ধটাই নেশা ধরানো। বড় হয়ে পেট্রলের নাম শুনেছিল সাধু। পেট্রলের গন্ধ নাক উঁচু করে সে শুঁকত। কী চমৎকার গন্ধটা! সেই গন্ধ আজ সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। কী কপাল সাধুর! জেল থেকে বেরিয়ে পর পর সব ভালো হয়ে যাচ্ছে—শুধু কান্ত বুড়োটাই যা নিষ্ফলা গেল। যাক্। তার বদলে কত কী পেল সে। ঝুমুরের জড়িয়েধরা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ঝাপটানি, সেই চটুল হাসি, 'নিশ্চয় কোন মেয়েকে ভালোবাসো'...হুঁ কত কী ঘটল।

ভালো একজনকেই বাসে সাধু। তার নাম এলোকেশী। কিশোর বয়সের তাজা এক স্মৃতির মধ্যে সে নেচে চলেছে কোমর দুলিয়ে। চিরোল চিরোল আঙুলে সাধুর কাছ থেকে পেলা তুলে নিচ্ছে। এলোকেশীর গায়ের সুবাসে এ সাধুর পিছনে-সামনে পুরো জীবনটাই যে ভরে রইল, কে তার খবর রাখে বলো?

গাড়ি গোঁসাইতলার দিকে যাচ্ছে! সাধু নড়ে বসল। —বাজারে যাবেন নাকি দাদা?

সঞ্জয় জবাব দিল—হ্যাঁ। যতীনের কাছে যাই। বার বার বলে যাচ্ছে। একবার যাওয়া উচিত বইকি। তাছাড়া বাজারে এটা ওটা কেনার দরকার।

সাধু কাঠ হয়ে গেল। পৌঁছানো যাক্ তো। তারপর কায়দা করে কেটে পড়বে। সে তৈরি হয়েই রইল।

সেদিন রাতে জায়গাটা বোঝা যায়নি, এখন দেখে অবাক হল। ছোটোখটো শহর বললেই চলে। কত ট্রাক বাস রিকশা, কত মানুষজন। কত রকমারি দোকানপাট। এমন জায়গা ছেড়ে তবু বোকার মতো লোকে মেলায় যায় কেন, সে বুঝতে পারল না।

আজ হাটবার। সেইজন্যে এত ভিড়। হর্ন দিতে দিতে এগোচ্ছিল গাড়িটা। সাধু ধমক দিতে থাকল লোকজনকে। ধাক্কা লেগে মরবে যে সব! এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে সঞ্জয় নামল। —এস। আগে বাজারটা সেরে নিই। তারপর যাব দারোগার কাছে।

সাধুর কাঁধে হাত সঞ্জয়ের—কেটে পড়ার ফুরসত পেল না সে। এও ভব মোক্তারের চেয়ে এককাঠি সরেস। সাধু বিরক্ত হল মনে মনে। কী আছে রে বাবা সাধুর মধ্যে যে এত আদিখ্যেতা না দেখালে চলে না? সে কি রাতারাতি সুন্দর হয়ে উঠেছে আরও? যা বলেছিল সিমি—'সুন্দর মুখের জয়

সর্বত্র!' মেয়েটা পাক্কা মাল। দিদির চেয়ে হাজার গুণে বুদ্ধিমতী আর চালাক চতুর। ঝুমুরটা তো ভ্যাবলা মেয়ে। শুধু ছেনালিটা ভাল জানে। ও পরীক্ষায় ফেল করবে না, গোল্লা খাবে না, তো কে খাবে বলো?

কাপড়ের দোকানে ঢুকল সঞ্জয়। অমনি যেন সাড়া পড়ে গেল দোকানে। ভেবেছে কোন বড় অফিসার—এস-ডি-ও না ম্যাজিস্ট্রেট—হন্তদন্ত হয়ে উঠেছে সব। চেয়ার আন্, চেয়ার দে। বসুন স্যার! বসুন!

জুয়াড়ীর এত খাতির! সাধু মনে মনে হাসছিল। সঞ্জয় বলল—রেডিমেড ফুলপ্যান্ট আছে নাকি?

—আজ্ঞে না স্যার। এখানে ওসব এখনও চালু হয়নি। তাই রাখি না। তবে হাফপ্যান্ট আছে। প্যান্টের কাপড়ও আছে।

—ফুলপ্যান্ট বানাবার দরজী নেই এখানে?

—দরজী আছে স্যার। তবে সে কি ভাল হবে?

—হুঁ। ভাল ধুতি দেখান।

একগাদা ধুতি পড়ল সামনে। সঞ্জয় দেখতে দেখতে সাধুকে বলল—ব্রাদার! পছন্দ করো।

সাধু ঢোক গিলে বলল—আমি?

—তুমি না তো কে? বাঃ! তুমি পরবে ধুতি, আমি করব পছন্দ?

সাধু লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—আ-আমার জন্যে? কেন?

—শাট আপ্। পছন্দ করো। কাম অন। ও মশাই, রেডিমেড পাঞ্জাবি নেই?

—আজ্ঞে না। শার্ট আছে।

—দেখান! অ্যাই মাস্তান! বেছে নাও।...

ধুতি শার্ট গেঞ্জি কিনে সঞ্জয় বেরল। সাধু ব্যাগের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। অত টাকা আছে বোসসায়েবের! লোভ কিলবিল করে উঠল তার মাথায়। ফেরার পথে ওকে ফাঁস লাগিয়ে কেটে পড়লে কী হয়? সাধু অন্যমনস্ক হয়ে গেল কিছুক্ষণ।....

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সঞ্জয় বলল—তোর পয় আছে, ভাই। মাইরি! এ দুটো রাতে ভাল কামিয়েছি। কিছু মনে করিস না। ছোট ভাইকে প্রেজেন্ট করলুম। তোর বউদি খুশি হবে কত, জানিস?

মুহূর্তে সাধু বদলে গেল। লতা বউদির মুখটা মনে পড়ল। জীবনে ওকে কোন কষ্ট দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে না? বিধবা হলে বউদি যে প্রচণ্ড কষ্টে পড়ে যাবে। কাটোয়ায় নিজের বাড়ি আছে বলেছিল বোসসায়েব। লতা বলেছে—হাতি আছে! ভাড়ার বাড়ি। নিজের বাড়ি করার মুরোদ থাকলে এ লাইন ধরে কেউ? হুঁঃ! গাড়ি! কদিন পরে অভাব পড়লে তখন বেচব বলে! দু হাতে খরচ করলে পয়সা থাকে, ভাই? ও যেমন আসরে বুলি ঝাড়ে—এই রাজা এই ফকির! ও নিজেও তো তাই।

তন্ময়তার মধ্যে গাড়ি কখন থানায় চলে এসেছে। সাধু গোঁ ধরে বসে রইল। কিন্তু সঞ্জয়ও নাছোড়বান্দা। অবশেষে বেরোতে হল সাধুকে।

থানার পিছনে নতুন কোয়ার্টার। সুন্দর ফুলবাগিচা। বেড়ায় শাড়ি শুকোতে দেওয়া আছে। ছোট ছোট জামা পেন্টুল ঝুলছে বারান্দার তারে। যতীন দারোগা টুলে বসে তেল মাখছে। সঞ্জয়কে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাল্লো বোস! এস, চলে এস। ওটা কে?

—আমার শালা।

—চলে এস। ওগো, সঞ্জু এসেছে। বেরো।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে বেরোল ঘর থেকে। সঞ্জয় মিষ্টির হাঁড়িটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।—বউদি! বউদি!

যতীন দারোগা বলল—দাঁড়িয়ে কেন হে! বসো—ওই চেয়ারটায় বসো। সঞ্জুর শালা তুমি, আমাদের নিজের লোক। অ্যাই ভগা, মিছরিজিকে কুয়ো থেকে জল তুলতে বল্ গে।

এ স্বপ্ন না তো? সাধু দারোগাবাবুর সামনে চেয়ারে বসে আছে! সাধু আড়ষ্টভাবে ফুলগাছের দিকে তাকিয়ে রইল। যতীনবাবু উঠে গেল। বলে গেল—তোমরা বসো। চানটা সেরে আসি। কেমন?

দারোগাও যে গৃহস্থের স্বরে কথা বলে ঘরসংসার করে—সাধুর বিশ্বাসই হত না। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চলে গেলে সে কিছুক্ষণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

একটু পরে সঞ্জয় বেরোল। দারোগার টুলে বসে বলল—জায়গাটা কিন্তু অপূর্ব বউদি!

—ওটি বুঝি শ্যালক? বাঃ! বেশ সুন্দর ছেলেটি তো? পড়াশুনো করছে তো? কলেজ-টলেজে—তাই না।

সাধু তাকাল। দারোগাবাবুর বউ চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। মোটাসোটা রাশভারী মানুষ। চওড়াপাড় সাদা শাড়ি পরনে, মাথায় কিছুটা ঘোমটা আছে—গয়নায় গা-গতর ভরতি। একেবারে জ্যাঠাইমার মতো দেখাচ্ছে।

চতুর সঞ্জয় ওঁর প্রশ্নের জবাব দিল। হ্যাঁ! পড়াশুনো তেমন হল কই? বাবা-মা নেই—একমাত্র বোন। সে তো স্ত্রীলোক। আমার কাঁধে ঝুলে পড়ল শেষ অবধি! ... সে হাসতে লাগল। সাধুর দিকে চোখটাও টিপল।

এইসব নানা কথাবার্তার পর চা ও সন্দেশ খেতে খেতে যতীন দারোগা স্নান সেরে এল। এসেই বলল—নাও! হল তো! শালা মহাপাপে এই পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলুম। তোমরা এলে, কোথায় গল্পসল্প করব—তা নয়, ছোটো এখন বিল বাদাড়ে! শালারা আর বাঁচতে দেবে না হে সঞ্জু!

সঞ্জয় বলল—কী ব্যাপার?

—আরে ভাই, ওদিকে খাগড়ি বলে একটা সোঁতা আছে দফরপুরের বিলে। সেখানে নাকি বালিতে পোঁতা লাশ বেরিয়েছে। চৌকিদার এসে হাজির! নাও ঠ্যালা!

সাধুর গলায় সন্দেশ আটকে গেল। সে প্রচণ্ড কাশতে শুরু করল। দারোগার বউ মিষ্টি হেসে বলল—দিদি নাম করছে, আবার কী!

আট

সাধুকে শিবমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল লতা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়েছে। পূজারির আশীর্বাদও পাওয়া গেছে। আঁচলে প্রসাদী ফুল বেলপাতা বেঁধেছে। তারপর চত্বর থেকে নেমে আসতেই সাধু বলেছে—তুমি এখন যাও দিদি। আমি একটুখানি ঘুরব।

লতা চলে গেছে। বলে গেছে—বেশি ঘোরাঘুরি কোরো না। ঠাণ্ডা লাগিও না।

সাধু মাথা নেড়েছে। সকাল থেকে সঞ্জয়ের দেওয়া নতুন জামাকাপড় পরার পর লতাকে দিদি বলতে শুরু করেছে। আর সঞ্জয় হয়েছে জামাইবাবু। সাধুর যেন আর এক জীবন শুরু হল। প্রণামের সময় মনে মনে বলেছে—আমাকে খুব ভালো মানুষ করে দাও, বাবা। আমি আর মানুষ মারব না। টাকাপয়সার লোভ করব না। আর দেখো বাবা, চাঁদতারণ ব্যাটার লাশটা যেন আমাকে বেকায়দায় না ফেলে!

এই উৎকণ্ঠাটা কিছুতেই যাচ্ছে না মন থেকে। সব সময় সে অন্যমনস্ক হয়ে থাকছে। সেদিন তাকে ঘুঘু ভব মোক্তার খাগড়ির সোঁতায় দেখেছিল। সে তখন বাসনওলা সেজেছিল। চাঁদতারণও বাসনওলা ছিল, তা কি বেরিয়ে পড়বে না? সেই ধুরন্ধর মোক্তার এখন ব্রহ্মপুরেই রয়েছে। ওদিকে গোঁসাইতলার মহাজনটা যদি ফাঁস করে দেয় চোরাই বাসনকোসনের ব্যাপারটা!

আবার মনে পড়েছে স্যান্ডেল দুটোর কথা। খড়ের বনে পুলিশ কি সে দুটো কুড়িয়ে পেয়েছে? আর চাঁদতারণের পাম্পশু দুটোই বা কোথায় যাবে?

সাধুর ধুকুপুকু যাচ্ছে না। একবার ভাবছে, কিছু হবে না—আবার ভাবছে, যেন একটা গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে তলে তলে—তাকে টিট করার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

এই মন নিয়ে কিছু ভাল লাগে না। সঞ্জয় বলেছে তাকে জুয়োর আসরে বসাবে এবং তাই কৌটোর চাল শেখাবে। সাধু তা শুনে তো ভারি খুশি হয়েছিল। কিন্তু এখন দোনামনায় পড়ে গেছে। মেলা ছেড়ে

পালিয়ে যাবার জন্যে মন ছটফট করছে সব সময়। অথচ এখানে কী চমৎকার একটা আশ্রয় মিলে গেছে! কে তাকে এমন করে ভালবাসবে—বিশ্বাস করবে—অসুখবিসুখে সেবাশুশ্রূষা করবে? চেনাজানা সব জায়গায় তো শুধু দুচ্ছাই আর দুচ্ছাই।

আর সবচেয়ে বড় কথা—সঞ্জয়ের এই জীবনটাই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি। কেমন সুন্দর এই দেশে দেশে ঘোরা জীবন—মেলা থেকে মেলায়। সবসময় হল্লাজেল্লা রঙিন বেলুন নাগিনবাঁশী মানুষনজন কতরকম। মেলা মেলা! মন চনমন করে ওঠে। দীঘির পাড়ে গভীর রাতে চাপা গুরগুর ড্রাম বাজে, বাঘ সিংহ গর্জায়, ট্রাপিজের খেল দেখায় শূন্যে ভেসে থাকা দুধের মতো সাদা পরীমূর্তি—দেবদূতের মতো শক্তিমান মানুষপাখি—ডানা বাড়িয়ে উড়ে বেড়ায় যেন। রহস্যময় বাদামী কৌটোয় হাড়ের গুটি নিজের ভাষায় কথা বলে—কে রাজা কে ফকির বুঝতে পারলে তো তুমিই তখন বিধাতাপুরুষ—ছকের ওপর রঙ-বেরঙের ছবি থরথর করে কেউ কাঁপছে, কেউ জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে, তুমি সব দেখতে পাবে।

থাকে থাকে সাজানো সম্ভাব নিয়ে দোকানপাট—কেনো বা না কেনো, কী এসে যায় তাতে? দেখ—শুধু দেখে দেখেই চোখ সার্থক করো।

অথচ সাধুর মনে অস্বস্তি। বরং চলুক না ওরা সেই মোহনপুর—চাঁদতাবণের গ্রাম, কে চিনবে সাধুকে? সঞ্জয়ের আর যাবার নাম নেই। শিবচতুর্দশীর আর কদিন বাকি কে জানে! সাধুর মনে সুখ জমছিল, হঠাৎ তলায় ফুটো হয়েছে। সব ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে।

এই কদিনে কিছু দোকানদারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার। লতার সাবান কিংবা সঞ্জয়ের বোন্ এটা ওটা কেনাকাটাতেও বটে—অনেকে জেনেছে যুবকটি বোসসায়েবের শালা। পৈতেটা কোমরে জড়িয়ে গাপ করে রেখেছে সাধু। স্রেফ্ কায়েত বনে যাওয়ার একটা ছেলেমানুষী কৌতুকও তাকে পেয়ে বসেছে।

আলি হোসেন নামে মনোহারিওলার সঙ্গে সাধুর বেশি খাতির হয়েছে। মন্দির থেকে এসে সে সেখানেই ঢুকেছিল। সকাল থেকে দুপুর হচ্ছে। মেলায় নিষুতি ভাব—লোকজন বিশেষ নেই। পেছনের দিকে সবাই উনুন জ্বেলে রান্নাবান্না করছে। কারো-কারো ঝাঁপ বন্ধ দোকানে। আলি হোসেনের দোকানটা সব সময় খোলা থাকে। বড় দোকান। আলি হোসেনের চেহারাটা চাপা দেওয়া ঘাসের মতো ফ্যাকাসে। বড় কপাল, চিমসে গাল, খাড়া নাক। গোঁফ দাড়ির বালাই নেই মুখে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ফুলবাবু সেজে থাকে। সাধুকে দেখে বলল—আসুন সাধুবাবু! বোসসায়েবের খবর কী বলুন? কেমন চলছে খেলা?

সাধু বসে বলল—মন্দ না। আপনার?

—চলছে। চা খান।.... বলে সে সামনে রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে হেঁকে বলল—বেজোদা, দুটো চা পাঠিয়ে দিন।

সাধু বলল—এ মেলার পরে কোথায় যাবেন দাদা?

—মোহনপুর!

সাধু তাকাল।

—খুব বড়ো মেলা। এর চেয়ে অনেক বড়ো। আমি ভাই ছোটখাটো জায়গায় যাই নে। পড়তা হয় না।

—জামাইবাবুও যাবে বলছিল।

—বোসসায়েব যাবে? সে তো ভাল।

দুটো গেলাসে চা দিয়ে গেল একটা বাচ্চা। চা খেতে খেতে সাধু হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল—আচ্ছা দাদা, আপনার মতো একটা মনোহারি দোকান করতে কত টাকা লাগে?

আলি হোসেন হাসল। —করবেন নাকি?

—ইচ্ছে তো করে।

—দেখুন ভাই, কথায় বলে—যার আছে মনোহারি, কী করবে জমিদারি! ব্যবসা হিসেবে খুব

ভালোই। তবে সবই তো বরাত। আমার কথা বলবেন—আমি তো মোটে আড়াই টাকার চুড়ি আর আলতা নিয়ে বসেছিলাম। কত সাল বলছি। তেরশো বাহান্নতে। এটা হল তেরশো আটান্ন। মোটে ছ'বছর। এখন আমার দোকানে মাল লাগিয়েছি কমপক্ষে হাজার নয়েক টাকার। ...আলি হোসেন গর্বে ঝলমলে হয়ে তাকাল সাধুর দিকে।

সাধু আগ্রহ দেখিয়ে বলল—এ কী করে হল দাদা?

—না। আড়াই টাকা থেকেই এত পুঁজি হয়নি। মাঝে মাঝে বউয়ের গয়না বেচে, জমি বেচে ব্যবসাতে লাগিয়েছি বৈকি। তবে আল্লার দোয়ায় আবার সব ফিরে পেয়েছি। ভাইকে একটা সেলাই কল কিনে দিয়েছিলাম। তারও এখন বড় কারবার। তিনখানা মেশিন চলছে।

সাধু একটু ভেবে নিয়ে বলল—মেলায় দৈনিক বেচাকেনা কত টাকার হয়?

আলি হোসেন হাসল আবার। চায়ের গেলাস খালি করে বলল—সে সবদিন সমান নয়। কোনদিন একশো, কোনদিন—বেশি লোকজন হলে পাঁচশোও হয়। গতদিন হয়েছে। আজও হতে পারে। লোকের আজকাল চোখ খুলেছে কি না। স্টেশনারি গুডস না হলেই চলছে না। যত সভ্যভব্য হচ্ছে, তত। বুঝলেন না? এই হল যুগের হুজুগ।

আলি হোসেন বক্তৃতা শুরু করল। সাধুর মনে অন্য কথা। লোকটার অনেক নগদ টাকা আছে। একে শিকার করলে কেমন হয়? শোয় কোথায় ও? ওই পিছন দিকের খুপরি ঘরে—নাকি এখানেই? সাধু গলার মাফলারটা আনমনে শক্ত করে ধরে রইল। লোকটার গলার বেড় বেশ নয়। নড়বড় গলা—খানিকটা লম্বা। এসব গলা একটা টান সইতে পারে না।

হঠাৎ পিছনে কে বলে উঠল—এক ডজন সেফটিপিন দিন তো!

সাধু ঘুরে দেখে ঝুমুর। তাব সঙ্গে একটি অচেনা মেয়ে। বয়সে তার চেয়ে ছোট। সাধু হেসে বলল—আরে। ঝুমুর যে!

—সাধুদা! তুমি এখানে কী করছ?

—আড্ডা দিচ্ছি। ও কে ?

—আমার মামাতো বোন। সাধুদা, তোমার সঙ্গে কথা আছে। উঠে এস।

—কথা? ... সাধু চঞ্চল হয়ে উঠল।

ওরা সেফটিপিন কিনে নিয়ে এগোল। সাধু সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে বলল—এত সেপটিপিন কী হবে ঝুমুর?

—মেলায় আমরা থিয়েটার করব। দেখবে—কী দারুণ জমিয়ে তুলি।

কী কথা বলবে ঝুমুর? সাধু অস্বস্তি নিয়ে হাঁটছিল। একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝুমুর বলল—অমন করে পালিয়ে এলে যে? এ কিন্তু বড্ড বদ অভ্যাস তোমার। সবসময় আমাদের দেখলেই পালাতে চাও। কেন শুনি?

সাধু বলল—যাঃ। পালাব কেন? পালাইনি।

—চালাকি? শোন—বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার জুতো দুটো আমরা নিয়ে এসেছি। রামু মেরে দেবে ভেবেছিল—আমি তক্কে তক্কে ছিলুম তো। পারেনি। কাগজে মুড়ে রাখা আছে। কে তোমার জুতো বইবে, বাবা? এখন চলো—নিয়ে আসবে।

সাধু শিউরে উঠে বলল—জুতো!

—হ্যাঁ, জুতো।

সাধু গোঁ ধরে বলল—ও জুতো রামুকে দিয়ে দাওগে। আমার পায়ে ছোট হয়।

—ছোট হয়? তাহলে কিনেছিলে কেন?

সাধু ঝুমুরের দিকে তাকাল। কেন এই মেয়েটি তাকে উত্যক্ত করতে চায়—যেন সবসময় আঠার মতো এঁটে যাওয়ার ইচ্ছে? কী চায় ও সাধুর কাছে? পীরিত? লেখাপড়া জানা বড়লোকের মেয়ে—আর সাধু এক জেলখাটা দাগী ক-অক্ষর গোমাংস!

—এই সাধুদা! অমন করে তাকিও না। চাউনি দেখলে ভয় করে।

ঝুমুর ভুরু কুঁচকে হাসছিল। ওর মামতো বোনটি ওর তুলনায় ভ্যাবলা—নেহাত গেঁয়োমার্কা—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে একবার ঝুমুরকে একবার সাধুকে দেখছে। মুখে কথা নেই।

সাধু বলল—আমার এখন কাজ আছে, চলি।

—তাহলে জুতো নেবে না?

—না।

—আমি যদি নতুন জুতো কিনে দিই—নেবে?

—তুমি কিনে দেবে? সাধু অবাক হল।—কেন ঝুমুর?

—ওই জুতো দুটোর বদলে।

ঝুমুর, তুমি পাগল। পাগলী!....সাধু হাসতে লাগল।

ঝুমুর ওর মুখ দেখতে দেখতে কেমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—নেবে না তুমি?

সাধু মাথা দোলাল।

—আমি দিচ্ছি, তুমি নেবে না?

সাধু আবার মাথা দোলাল।

ঝুমুর চোখের পলকে ঘুরে হনহন করে অন্যদিকে হাঁটতে থাকল। ওর মামাতো বোন তাকে অনুসরণ করল। সাধু দাঁড়িয়ে রইল। হতভম্ব। নিশ্চুপ একেবারে। কেন তাকে জুতো কিনে দেবে ঝুমুর? কেন?

সাধু তাকিয়েছিল। দীঘির পাড়ের নিচে ছায়াঢাকা পথে ঝুমুর হনহন করে চলেছে। ওর মামাতো বোন প্রায় দৌড়োচ্ছে পিছনে। সাধুর কী হল, হঠাৎ দৌড়তে লাগল। এক দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলল ওদের। —ঝুমুর শোন! এই ঝুমুর!

ঝুমুর দাঁড়াল না। তখন সে ওর সামনে গিয়ে পথ আটকাল। দেখল, ঝুমুরের মুখ থমথম করছে। মাটির দিকে দৃষ্টি। নাকের ফুটো কাঁপছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে।

সাধু হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—তুমি কিনে দিলে নেব, ঝুমুর। হ্যাঁ—নেব। কিন্তু তার বদলে আমি তোমাকে কিছু কিনে দেব। তোমাকে নিতে হবে। বলো—রাজি?

ঝুমুর ওর দিকে মুখ তুলল। তারপর মামাতো বোনের দিকে ঘুরে বলল—সোমা, তুমি একটু দাঁড়াবে? এই গাছতলায় দাঁড়াও না লক্ষ্মীটি। চলে যেও না কিন্তু। কেমন?

সোমা বুড়ো আঙুলের নখ কামড়াতে কামড়াতে মাথা নাড়ল। ঝুমুর সাধুর দিকে তাকিয়ে বলল—চলো।

যেতে যেতে ঝুমুর হঠাৎ ঘুরে সোমার কাছে ফিরল। তারপর চাপা গলায় কী বলে সাধুর সঙ্গ নিল। এসে মিষ্টি হেসে বলল—ওকে বারণ করে দিলুম।

কী বারণ করল, সাধু বুঝেছে। কিন্তু তখন তার বুকে ঝড়। তার মাথায় আকাশপাতাল তোলপাড় করা শব্দ। সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

মেলার কাছে এসে ঝুমুর বলল—আমায় কী দেবে, সাধুদা?

—ভাবছি।

—দেখ, আর যাই দাও, জুতো দিও না। ...ঝুমুর হেসে উঠল। ফের বলল—কিন্তু কী দেবে? তেমন কিছু দিলে তো হাজারটা কৈফিয়ত দিতে প্রাণ যাবে মায়ের কাছে। কী দেবে ভাবছ?

—ঠিক করতে পারছি না।

আর মোটে দশটা টাকা আছে সাধুর কাছে। সবটা লেগে গেলে তো পকেট খালি হয়ে যাবে! অন্তত দুটো টাকা রাখতেই হবে। কিন্তু দেবেটা কী—যা ঝুমুর গোপনে রাখতে পারবে—কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না। সে ভাবনায় পড়ে গেল। কতরকম জিনিসের কথা তার মাথায় আসছিল—স্নো, সাবান, গন্ধতেল, চুলের ফিতে। বড়লোকের মেয়ে—ওর কি পছন্দ হবে? কী দেবে শুধু?

—দেখ তোমার পায়ের স্যান্ডেলটা একেবারে মানাচ্ছে না। ... বলে ঝুমুর একটু ভেবে নিল। ফের

বলল—ভালো স্যান্ডেল এখানে পাব কিনা কে জানে?

সাধু আস্তে বলল—স্যান্ডেল নয়। আমাকে যদি দেবে—অন্য কিছু দাও ঝুমুর। আর....

—আর?

—ছিঃ! পায়ের জুতো কি দিতে আছে? ববং এমন কিছু দাও—যা চিরকাল থাকবে। চিরকাল!

সাধুর গলার স্বর হাঁপানি রুগীর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ঝুমুর বলল—অত ভেবে কিছু বলি নি। তুমি কিছু মনে করো না। সত্যি তো! জুতো দেয নাকি ? .... সে একটু হাসল। ফের বলল—কিন্তু কী দেব?

পরস্পর পরস্পরের দিকে অসহায় হয়ে তাকাল। তারপর সাধু বলল—চলো না, ওই বটলতায় গিয়ে একটু ভেবে নিই!

ঝুমুর খুশি হয়ে পা বাড়াল। বটতলাটা নির্জন। ওখান থেকে তাঁবুটা চোখে পড়ে। সাধু দেখল, সঞ্জয় রোদে শতরঞ্জি .পতে তাস খেলছে কাদের সঙ্গে। লতাকে দেখতে পেল না। দুজনে বটতলায় মোটা শেকলের ওপর পাশাপাশি বসল।

কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ঝুমুর হেসে উঠল। —কিছু মাথায় আসছে না।

—আমারও।

—তাহলে কী হবে!

মাঝে মাঝে দমকে দমকে উত্তরে বাতাস এসে ঝাপটা দিচ্ছিল। ঝুমুরের কপালে চুলের গুছি উড়ে পড়ছিল। সে আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। আর সাধুর একরাশ কোঁকড়ানো চুলেও ঝাপটানি—সে বার বার কপাল থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল চুলগুলো। মাথার ওপর পাখপাখালি ডাকছিল। কী এক আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতিতে—গভীর অব্যক্ত বিহ্বলতা জাগছিল চেতনায় আর বাইরের জগতে—ঝলমল করছিল অদূরে মিষ্টি রোদ, একটা প্রতীক্ষায় চঞ্চল যেন সেই স্বর্গীয় আলো। কী হবে কী হবে এমন একটা তোলপাড় নিয়ে উত্তরের বাতাস গাছপালাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল বার বার।

সাধু বলল—মেয়েটা থাকবে তো?

—কে ? সোমা? থাকবে।

—যদি বলে দেয় বাড়িতে ?

—বলবে না।

—ঝুমুর!

—উঁ?

সাধু চুপ করে থাকল। কথা আসছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী বদলে যাচ্ছে পলকে পলকে। এ কোথায় চলে এল সাধু? অচেনা দেশ। অচেনা মানুষ। অজানা ভাষা। কী বলতে কী বলে ফেলবে, সেই ভয়।

হঠাৎ ঝুমুর বলল—শোন, আমায় তুমি একটা পাথরের মালা কিনে দাও।

অমনি সাধু বলল—তুমি আমাকে একটা ছোরা কিনে দাও।

ঝুমুর চমকে উঠে বলল—ছোরা! ছোরা কী করবে তুমি?

সাধুও কথাটা বলে চমকে উঠেছিল। এ কী বলে ফেলল সে? হ্যাঁ—আলি হোসেনের দোকানে লাল মখমলের ওপর জরির নকশা-কাটা খাপে-ভরা সুন্দর বাঁকানো একটা ছোরা সে দেখেছে। দেখে দেখে তার লোভ হয়েছে। কতবার ভেবেছে, ওটা চুরি করে নেয়। সুযোগ পায়নি। রুপোলী রিঙে ঝোলানো অত সুন্দর খাপে ঢাকা ছোরা সে এর আগে কোথাও দেখেনি। দাম শুধিয়েছিল, বারো টাকা। বারো টাকা শুনেই পিছিয়ে এসেছিল। রাগ হয়েছিল। এত বেশি দাম। আলি হোসেন বলেছিল কানপুরের তৈরি মাল। ওর বাঁটটা হাতির দাঁতের কিনা। তাই অত দাম।

সাধু বলল—হ্যাঁ। ছোরাটা দেখলে তোমারও লোভ হবে। চলো না—দেখাচ্ছি!

ঝুমুর দোনামনা করে উঠল।.বলল—আর কিছু নয়—ছোরা? মানুষ মারবে নাকি ? সে হাসল।

সাধু পা বাড়িয়ে বলল—হুঁ। পেলেই মারব।

—এইম্মা? খুনীর মতো কথা বলো না।

—আমি তো খুনীই, ঝুমুর।

—যাঃ!

সাধু হাসল। ঝুমুর, তুমি জানো না সাধু কে, কী মাল! জানলে তো এক্ষুনি ভয়ে পালিয়ে যেতে কোথায়। বাবাকে বন্দুক ছুঁড়তে বলতে।

ঝুমুর যেতে যেতে বলল—মানুষ খুন করতে ইচ্ছে কেন—এ বয়সেই?

—এ বয়স মানে?

—খুনোখুনি তো করে বেশি বয়সে। সম্পত্তি নিয়ে হাঙ্গামা বাধলে। মোক্তারের মেয়েকে তুমি ওসব শিখিও না।

—হুঁ, মনে ছিল না।

একটু পরে ঝুমুর বলল—মানুষের ওপর তোমার বুঝি ভীষণ রাগ?

সাধু খুশি হয়ে বলল—হ্যাঁ, তোমার নেই?

—কে জানে! অত ভেবে দেখি নি!...তা, শোন। কত দাম লাগবে জানো? আমার কাছে নটা টাকা আছে। হবে না?

সাধু গুম হয়ে বলল—না। বারো।

—বারো টাকা? .... ঝুমুর থমকে দাঁড়াল। তারপর মুখোমুখি ঘুরে বলল—এই, তুমি রাগ কোরো না। লক্ষ্মীটি। যদি ওবেলা কিনে দিই তোমাকে? বলো—রাগ করবে নাকি? মায়ের কাছে টাকা বাগাতে হবে তো। বরং এক কাজ করা যাক্ সন্ধ্যার পর আমরা মেলায় আসব। তখন এক ফাঁকে আমি কেটে পড়ব। তুমি কোথায় থাকবে, বলে দাও।

সাধু বলল—ওই বটতলায়। চলো, তোমাকে মালাটা কিনে দিই।

ঝুমুর বেঁকে দাঁড়াল।—না তুমি একটা চমৎকার মালা কিনে ওখানে অপেক্ষা করবে। আর আমি তোমরা ছোরাটা কিনে নিয়ে চলে আসব। চলো, কোন দোকানে আছে—দেখিয়ে দেবে। এই, ওরা কাকেও বেচে দেবে না তো? বরং আমি অ্যাডভান্স করে দেব কিছু। হবে না?

সাধু মাথা দোলাল।

কেউ অত লক্ষ্য করেনি, সকাল থেকে টুকরো টুকরো মেঘ এদিকে ওদিকে আনাগোনা করছিল। দুপুরের পর আকাশ খানিকটা মেঘলা হয়ে গিয়েছিল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে হতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হল। এই বৃষ্টি মেলাওয়ালাদের মুখ গম্ভীর করে। চাপা উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট করে তোলে—বিশেষ করে তাঁবুওয়ালাদের। ছোটখাটো জুয়াড়ীদের তত ঝামেলা নেই। গাঁয়ের ভেতর কোন ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে গিয়ে মাথার ওপর চাল পেলেই হল। সেখানেও খিলাড়ি মেলে। কিন্তু বোসসায়েবের সে লাইন নয়। তাকে তো ডেকেছিল প্রাক্তন নায়েব মাখন ঘোষাল—মদ ও জুয়া দুইয়েই তার খ্যাতি এবং এখন বুড়ো হয়েছে বলে বাইরে কম বেরোয়। বলেছিল—আসবেন বোসসায়েব, আমার বাড়ি। নেমন্তন্ন রইল খেলার। আজ এই আবহাওয়ার গতিক দেখে সঞ্জয় একবার ভেবেছিল যাবে নাকি। কিন্তু গেল না। কারও বাড়ি বয়ে খেলতে যাওয়ার বিপদও আছে। তার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে খুব ভাল নয়। ওদিকে ঘোষালও তাই বলে প্রকাশ্যে যদু মধুর সঙ্গে মেলার আসরে বসে খেলবে না। তার ইজ্জত আছে।

আজ রাতটা ব্যর্থ যাবে? সঞ্জয়ের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। গাড়ির হুড তুলে একটা বাড়তি তেরপলে মুড়েছিল। সেকেলে ফোর্ড গাড়ি—কত হাত ঘুরেছে ঠিক নেই। তবু তার ওপর তার মমতার শেষ নেই।

মেলায় বৃষ্টির টিপটিপানি সত্ত্বেও প্রথমে কিছু লোকজন হল। তারপর একটা বাতাস এল। বাতাস ঘুর ঘুর করতে লাগল। সেই অত্যাচারে শেষ অবধি সবাই পালাল। মেলা খাঁ খাঁ ভূতের বাজার তখন।

বাতাসের ঝাপটাতে ঝাঁপ পড়তে থাকল দোকানে দোকানে। সঞ্জয়ের তাঁবুর দরজাটা পুবে। কিন্তু তলা দিয়ে হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। লতার স্টোভের তাল কাটছে। নিভেও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। খাটের ওপর বসে আছে সঞ্জয়। স্যুট পরে যথারীতি সাজতে ভোলেনি। কিন্তু তার ওপর কম্বল চড়িয়েছে। সিগারেট টানছে। মেজাজ ভাল নেই।

সাধু কেটে পড়েছিল এক ফাঁকে। পাথরের মালাটা কিনে সে বটতলায় গিয়েছিল। তারপর অপেক্ষা করতে করতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ঝুমুর নির্ঘাত আসতে পারবে না। শালা কোথায় থাকে এসব বৃষ্টিবাদলা ওত পেতে? ঠাণ্ডায় কাঁপুনি এলে সে আর থাকতে পারেনি। নিজের ওপর রাগ হয়েছে। তুইও শেষে একটা ঢ্যামনা হলি সাধু! মাগীর জন্যে বনবাদাড়ে এসে বসে থাকতে পারলি? তোরও পীরিতের নেশা ধরল! ধিক্ তোকে, বাঞ্চোৎ!

ক্ষ্যাপার মত সাধু চলে এসেছে বটতলা থেকে। আলি হোসেনের দোকানে গেছে—যদি বা ঝুমুর এসে থাকে! কিন্তু তার পোড়াকপাল, দোকানে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে ততক্ষণে। সাধুর মেজাজ গেছে আরও খিঁচড়ে। আসলে হয়তো তার লোভটা ছিল সেই মখমলের নকশা-কাটা খাপে-ভরা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা ছুরিটা পাওয়ার। হুঁঃ! ঝুমুর নামে একটা রংবাজ মেয়ের জন্যে তার বয়েই গেছে! দু দুবার পরীক্ষায় ফেল-করা একটা ভ্যাবলা মেয়ে—তার জন্যে সাধুর প্রাণটা গেল! রামোঃ! ওয়াক থুঃ।

অনেককালের যে ক্রূর বন্যতা সম্প্রতি চাপা পড়েছিল, সে মুহূর্তে আবার নিজের অন্ধকার পাতালগুহা থেকে গরগর করে উঠেছিল তার মধ্যে। এ সাধু সেই সাধু—যে রামেশ্বরীতলা থেকে দূর কাশবনে ছটা ঝিলিক দিতে দেখেছিল। এ সেই ভয়ংকর নিষ্ঠুর আত্মা—যার পায়ের কাছে একদিন এক সবুজ আখের জঙ্গলে কাটাকুটি ছায়ায় কুকুরশুঁকো পাতার সবুজ মখমলের ঝাঁপিতে নীল নীল ফুল দলে শুয়েছিল ফ্রকপরা একটা কিশোরী—যার নাকে ও কষায় কয়েক ফোঁটা রক্ত।

লাল পাথরের মালাটা তার পকেটে শব্দ করে বাজছিল। এর বদলে পাওয়া গেল না, যেন আর পাওয়াই যাবে না সেই কানপুরী নকশাদার ছোরাটা—মিছেমিছি লগ্নী করা হল দেড়টা টাকা! সাধু একবার ভাবল ছিঁড়ে ফেলে দেবে—আবার ভাবল, থাক। এর বদলে নিজের দরকারী কিছু নেবে আলি হোসেনের কাছে। তার দোকানেরই মালা তো। অসুবিধা হবে না। খুব হিসেবীর মতো সিদ্ধান্তটা নিল সে।

কিন্তু মনে এই জ্বালা, বৃষ্টি বাতাস আর ঝুমুরের ওপর প্রচণ্ড হিংসার ভাব—সে কী করবে? কী করবি তুই সাধু? হাত যে তোর নিশপিশ করছে। গলায় জড়ানো রঙিন মাফলার সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছে। কার গলায় টান দিবি—বুকে হাঁটুর চাপ দিয়ে এবং তলপেট ফুটো করে কাকে পুঁতবি মাটির তলায়?

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ দোকানপাটের করগেট বা তেরপলের ছাদে, বাতাসে শনশন শাঁইশাঁই করে বেড়াচ্ছে। জড়োসড়ো সাধু অন্ধকার মেলার জনহীন পথে পথে ঘুরছে। একটা কিছু করতে হবে—করতেই হবে।

ঝাঁপের আড়ালে আলো জ্বলছে ভেতরে। চায়ের ও খাবারের দোকানগুলোও গতিক দেখে ঝাঁপ ফেলেছে। শুধু বৃষ্টি হলে কথা ছিল। বাতাসটাই মারাত্মক দাপট দেখাচ্ছে। দোকানের ভেতর চাপা গলায় লোকেরা কথা বলছে। সাধু শুনল, কে বলছে—যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ। ভগবান যা করেন, তা ভালোর জন্যে হে নিবারণ!

ভালো না কচু। সাধুর জবাব দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সামলে নিল। ঝুমুর এল না—আসতে পারল না, কথাটা তার যত মাথায় এল—সে আরও অস্থির হল। আলি হোসেনকে ডেকে শুধোতে ইচ্ছে করছে—সেই মেয়েটি আজ সেই মখমলের খাপে-ঢাকা ছোরাটা কিনেছে নাকি। কিন্তু সে কি পারা যায়? আলি হোসেন আর কাকেও বেচবে না বলে কথা দিয়েছে। সে কথা সে রাখবে। ঝুমুর কেন তুই সাধুকে ক্ষেপিয়ে দিলি আবার? সে তো ভালোমানুষ হতে চেয়েছিল!

এসবের জন্য ঝুমুরকেই সে বার বার দায়ী করল। আর সেই সময় দীঘির পাড়ের দিকে সার্কাসের

তাঁবুতে জানোয়ারগুলো ডেকে উঠল। অন্ধকার বৃষ্টিঝরা মাঘের রাতটা গভীরতর একটা বিভীষিকায় পৌঁছে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ডাকগুলো থেমে থেমে শোনা যাচ্ছিল। সাধুর বুক থরথর করে কেঁপে উঠল। ওস্তাদ বাহাদুর কি তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়েছে? বৃষ্টি বাতাস জানোয়ার ডাক দিয়ে অন্ধকার তোলপাড় করে সে কি তাকে সাহস দিচ্ছে—শাবাশ্ বেটা! কী চাও গুরু? কী দাবি করছ সাধু বেটার কাছে? একটা হ্যাঁচকা টান—বুকে হাঁটুর চাপ, দমফাটা গোঙানি, কয়েকবার হাত-পা ছোঁড়া, ঘড়ঘড়..... তারপর কালঘুম।

সাধু ঘুরল। মনোহারি এলাকায় চলে এল। এদিকটা পুরো অন্ধকার। আলি হোসেনের দোকানটা চিনতে তার ভুল হল না। কোমরের কাছ থেকে ওসমানকাটা চাকুটা বের করে একধারে বসে পড়ল। সে তেরপলের ঝাঁপের একটা পাশে আটকানো দড়ি কেটে দিল। তারপর সাবধানে নাকের ডগা ঢুকিয়ে তাকাল।

আলি হোসেন সামনেই ঘুমোচ্ছে। সাধুর দিকে পা। কম্বল মুড়ি দিয়েছে। সাধু জানে মানুষের প্রথম ঘুমটা খুব গাঢ় হয়। অন্তত ঘণ্টা দুই থাকে এই প্রবল ঘুমের চাপ। তারপর বাকি রাত টুক করতেই তার জাগার সম্ভাবনা থাকে। আবার সেই শেষ রাতে একটা গাঢ় ঘুম আসে। কিন্তু প্রথম ঘুমের মতো নয় সেটা।

মেঝেয় সাজানো জিনিসপত্রের এদিকে যেমন একটা ফাঁকা জায়গা, অন্যদিকেও তেমনি। সেখানে আর একজন একইভাবে ঘুমোচ্ছে। তার নাক ডাকছে জোরে জোরে। কিন্তু শুয়ে থাকা মানুষকে ফাঁসে আটকাবে কেমন করে? সাধু যেখানে ছোরাটা টাঙানো ছিল, সেখানে তাকাল। তারপর চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ছোরাটা নেই!

কোথাও নেই। মোমের আলো ক্ষীণ হলেও সব দেখা যাচ্ছে। বেচে দিল কাকে? কখন বেচল? সন্ধ্যার অগে হার কেনার সময় তো দিব্যি থাকতে দেখেছে। বাচ্চাদের খেলনার সঙ্গে ঝুলছিল ওটা। তবে কি ঝুমুর বৃষ্টিবাদলা না মেনে কখন এসেছিল এবং কিনে নিয়ে গেছে?

তা যদি হয়, তাহলে অত ভীতু মেয়ে বটতলায় গিয়ে তাকে না পেয়ে এতক্ষণ নিশ্চয় প্রাণ হাতে করে পালিয়েছে। সাধুর মনটা তক্ষুনি ছটফট করে উঠল। সাধু উঠল।

বটতলায় গিয়ে সে চাপা গলায় ডাকল—ঝুমুর! ঝুমুর!

বটের পাতা থেকে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ল। পাখি ডানা ঝাড়ল। সাধু আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এল। ব্যর্থতার দুঃখে সে ক্ষেপে গেল আরও। একটা সুন্দর গোপন নির্জন সন্ধ্যার খেলা মাটি হয়েছে। সাধু কী করবে? কী করবি তুই সাধু?

এবার সেই হিংসার ঢেউটা তার মধ্যে ফেটে পড়েছে। চোয়াল আঁটো হয়েছে। মনে মনে বলল—আমার দোষ নিও না মা কালী! দেখ এখনও অমি নিজেকে সামলে রাখছিলাম! আর কিন্তু পারছি না।

সে এগোল। বৃষ্টির শীতের অনুভূতিশূন্য সাধুর শরীর এখন ভূতগ্রস্ত। হাত নিশপিশ করছে আবার। আবার দীঘির পাড়ে জানোয়ারের ডাক শোনা যাচ্ছে। আর বাহাদুর ফিরে এসে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে ইশারা দিচ্ছে। দুর্যোগভরা রাতের ভাষায় বলছে—শাবাশ্ বেটা!

তাঁবুর দরজার পর্দাটা কাঁপতে দেখে লতা চমকে উঠে বলল—কে?

কোন সাড়া এল না। তখন সঞ্জয় টর্চ হাতে নিয়ে ভারি গলায় বলল—আবার কে? গুণবান মাস্তানটা। সাধু নাকি রে?

—হুঁ।

—তা বাঞ্চোৎ মুখে কি ঠুলি এঁটেছ। বুনো মোষের মতো দরজা ঠেলছ!... উঠে গিয়ে সঞ্জয় ফাঁস খুলে পর্দা তুলে দিল। ঢোক্ শিগ্‌গির! তোর মরণ নেই রে। তখন থেকে ভাবছি—শালা!

লতা বলল—এই মা! ভিজে কী হয়েছ তুমি! ছি ছি ছি! এত বলেও লজ্জা হল না একটু! এই সবে জ্বর থেকে উঠলে! তোমাকে নিয়ে পারা যায় না দেখছি।

সঞ্জয় সাধুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকিয়েছিল। বলল—কোথাও মাল খাচ্ছিলি! তাই না? চেহারা দেখেই বুঝেছি!

লতা বলল—শিগ্‌গির কাপড় বদলাও! তুমি তো ভারি অদ্ভুত ছেলে!

সঞ্জয় বলল—দেখি, তোর মুখ শুঁকে? বলে সে সাধুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল। তারপর হাসতে হাসতে বলল—দুধের গন্ধ বেবোচ্ছে। মাইরি লতা! ভাবা যায় না। হ্যাঁরে, কোথায় ভিজছিলি এতক্ষণ? দশটা বাজে। এই দেখ্ .... সে হাতঘড়িটা কোটের হাতা সরিয়ে দেখাল।

সাধু তার ব্যাগ থেকে ধুতি বের করতে থাকল। কোন কথা বলল না। লতা বলল—আজ একসঙ্গে খাব বলে বসে আছি—তো বাবুর পাত্তাই নেই। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সাধুর জবাব নেই। সে কাপড় নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল. সঞ্জয় বলল—ওই কোণে দাঁড়িয়ে পরে নে। বেরোলেই ঠ্যাং খোঁড়া করে ফেলব। নে নে—বাবা। লজ্জা করিসনে। গাল টিপে দুধের গন্ধ পেলুম—তার আবার লজ্জা! এই নে আমি মুখ ঘোরাচ্ছি। লতা, তুমি ওদিকে ঘোরো। বাবু কাপড় বদলে নিক।

অগত্যা নির্বাক্ সাধু তাই করতে বাধ্য হল। লতা রুটি সেঁকেছে, আলুর দম করেছে। প্লাস্টিকের প্লেটে বাড়তে বসল এক কোনায়। সঞ্জয় বলল—আর হাত ধুয়ে কাজ নেই, আয়, খেয়ে নিই।

সাধু এতক্ষণে মুখ খুলল। —আমি খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছ? কোথায়? লতা বলল।—চালাকির আর জায়গা পাওনি! কী হয়েছে তোমার শুনি? আমাদের ওপর রাগ করেছ—তাই না?

সাধু মাথা দোলাল।

গোঁ দেখে সঞ্জয় বলল—কিছু একটা হয়েছে। যাক্ গে, শোন্। আজ মাইরি আমি এখানে শোব। তুই ভাই গাড়িতে চলে যা। তেরপল ঢেকে দিয়েছি। একটুও শীত করবে না। কেমন?

লতার চোখে চাপা ভর্ৎসনা দেখে সঞ্জয় মুখ টিপে হাসল। সাধু তার কম্বল নিয়ে সটান বেরোল। সে বেরোলে দুজনে বিস্মিত চোখে পরস্পর একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর খেতে বসল।

সাধু গাড়ির তেরপল তুলে ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ওম জমেছে কিছুটা। ওপরে টুপটাপ জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। কুঁকড়ে শুল সে সিটের ওপর। জল পড়ার শব্দ শুনল কতক্ষণ। তারপর হঠাৎ মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কেঁদে উঠল। কান্নার দমকে ছটফট করতে থাকল সাধু। কেন এত কান্না পেল সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু না কাঁদলে দম ফেটে সে মরে যেত এতক্ষণে। বাইরে বৃষ্টি বাতাস আর অন্ধকার তোলপাড় হচ্ছিল। থেকে-থেকে দীঘির পাড়ে সার্কাসের তাঁবুতে জানোয়ারগুলো ডেকে উঠছিল। এখানে একটা ছোট্ট ফোর্ড গাড়ির খোঁদলে ঢুকে কোমরভাঙা সাপের মতো সাধু হয়তো কান্নার ভাষায় গর্জন করছিল।

সেই গোপন অন্ধকারে অস্ফুট শব্দ আর কাঁপন, সেই নির্জন হাহাকার আর বিক্ষোভ পৃথিবীর কেউ টের পাচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ কেঁদে সাধু একটু শান্ত হল। ফোঁসফোঁস করে নাক ঝেড়ে চোখ মুছে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা নিচে ঘষে নেভাল। তারপর সিগারেট টানতে থাকল।

নয়

সকালেও আকাশ মেঘলা। কিন্তু বৃষ্টি আর পড়ছে না। ওদিকে মেলা তোলপাড় করে লোক জড়ো হচ্ছে। ব্রহ্মপুর গ্রাম থেকেও মানুষ দৌড়ে আসছে। হিন্দুস্থানী চানাচুরওয়ালা রামভগতের ঝোপড়ির সামনে ভিড় বাড়ছে।

ঝোপড়িই বটে। একটা ছেঁড়াখোঁড়া তেরপল তিনটে খুঁটির ওপর কোনরকমে তাঁবুর মতো খাটানো। একমানুষও উঁচু নয়। ওই হাত তিন-চার মেঝের একপাশে উনুন—তাতে কালো বালিভরা

কড়াই চাপানো। পোড়া ভুট্টার ছাই চাঙড় বেঁধে আছে। বোঝা যায় ভাজতে ভাজতেই আততায়ী চড়াও হয়েছিল। উনুনের ধারে সটান চিত হয়ে পড়ে আছে সে! জিভ বেরনো, চোখের পর্দা সাদা হয়ে ফেটে পড়ার মতো—বীভৎস একটা লাশ। কে কাপড় চাপিয়ে দিয়েছে মুখে। তার ধড়ের তলায় চানাচুরের ঝাঁকা—কাঠের খোপবন্দী বাক্স। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে ভাজাগুলো।

সবাই বলছে—ঠিক এমনিভাবেই বুড়ো কপাটওয়ালার লাশটা পড়েছিল। অবিকল একই চেহারায়।

আর উনুনের পাশে পড়ে আছে একপাটি নতুন স্যান্ডেল। এমন স্যান্ডেল রামভগতের বাবাও চোখে দেখেনি। তার রবারের টায়ারের তৈরি বেখাপ্পা গড়নের স্যান্ডেল দুটো একপাশে রয়েছে। কাজেই ওটা খুনীর।

রামভগতের স্বাস্থ্য ভাল। প্রৌঢ় হলেও দশাসই চেহারা। তার এক হাতের মুঠোয় ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো—সেটা চাদরের অংশ। সুতীর চাদর। নীলচে রঙের খদ্দর। বোঝা যায় খুনীর গায়ে চাদর ছিল। রামভগত তা আঁকড়ে ধরেছিল।

কিন্তু কে এমন নিষ্ঠুর খুনী? একটা গরিব চানাচুরওয়ালার কী এমন টাকা-পয়সা ছিল যে তাকে খুন করতে হল? দুজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। দারোগা এসে পড়বেন এক্ষুনি। খবর চলে গেছে।

সঞ্জয় দেখে গেল। সাধু তাঁবুর সামনে মোড়ায় বসে চা খাচ্ছে, লতা তাঁবুর ভেতরে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে, এমন সময় সঞ্জয় এল লাশ দেখে।

সে এসেই সাধুর কাঁধ ধরে বলল—শুনে যা তো!

সাধু নিঃশব্দে তার সঙ্গে গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল। লতার চুপ আঁচড়ানো শেষ—সে ঘুরে বসে বলল—দেখে এলে?

সঞ্জয় তার কথার জবাব না দিয়ে সাধুর দিকে তাকিয়ে বলল—বস্। তারপর জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

লতা অবাক হয়েছিল। উদ্বিগ্ন মুখে বলল—কী ব্যাপার?

সঞ্জয় বলল—অ্যাই বাঞ্চোৎ! তোর জুতো কই?

সাধু মুখ নামিয়ে বসেছিল। বলল—কেন?

—চোপ্ শুওরের বাচ্ছা! বল্, কোথায় গেল জুতো? সক্কাল থেকে তুই খালি পায়ে বেড়াচ্ছিস। বল্, জুতো কী করলি?

লতা বলল—কী হল? ওকে নিয়ে পড়লে কেন?

সঞ্জয় ধমকাল।—তুমি থামো! অ্যাই সাধু, জবাব দে কথার।

—স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ছিল। ফেলে দিয়েছি।

—হুঁ। লতা! শিগ্‌গির, ব্যাটার চাদরটা নিয়ে এসো।

লতা বলল—চাদর তো বাইরে মেলে দিয়েছি। কী হবে, চাদর?

সঞ্জয় অধীর হয়ে বলল—আঃ! দেরি কোরো না। শিগ্‌গির! এ শালার জন্যে এবার ধনেপ্রাণে মারা পড়ব—বুঝতে পারছ না? যাও—জলদি!

লতা বেরিয়ে গেল। সাধু মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না—স্তব্ধ সে।

—সাধু?

—উঁ?

—তুই কে?

সাধু একবার তাকিয়ে মুখ আবার নামিয়ে রাখল।

—তুই যেই হোস, তোকে আমরা বিশ্বাস করেছিলুম। তুই মাস্তানী দেখাচ্ছিলি সে রাতে—ভেবেছিলুম, এ বয়সে আজকাল সব ছেলেছোকরাই একটু আধটু ডানপিটে হয়। তোকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু তুই যে অন্য মানুষ রে! তুই একটা পাক্কা খুনী! দু'দুটো ডেডবডি দেখলুম— দেখেই বুঝলুম—তুই মহাদাগী ওস্তাদ লোক। না—মোটেও না। এ একেবারে পাকা হাতের কাজ। ... সঞ্জয় একটু দম নিয়ে বলল—কেন তুই এ কাজ করিস? অ্যাদ্দিন হয়তো করেছিস—করেছিস। এখন তোর

কিসের অভাব হল রে শালা? টাকাপয়সার? চাইলে পেতিস না আমার কাছে—তোর দিদির কাছে? মায়ামমতার বদলে এই তোর প্রতিদান শুওরের বাচ্চা?

লতা চাদরটা নিয়ে এসে দাঁড়াল। অমনি সঞ্জয় তার হাত থেকে চাদরটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করল। তারপর একদিকে আঁচলের ছেঁড়া অংশটা সাধুর চোখের সামনে তুলে বলল—এই দ্যাখ্ শালা তোর মরণফাঁদ!

লতা বলল—খুলে বলবে আমাকে সব?

সঞ্জয় খেঁকিয়ে উঠল—ন্যাকা! বুঝতে পারছ না কী মাল আমরা ঘরে তুলেছি। এ শালার চেহারা দেখে বুঝতে পারছ না একজন ধুরন্ধব মার্ডারার? দু'দুটো খুন করল মেলায়।

লতা থরথর করে কেঁপে উঠল। সাধুর দিকে তাকিয়ে বলল—সাধু! সে কী ভাই!

সাধু চুপচাপ বসে রইল। একই ভঙ্গিতে। সঞ্জয় লাফিয়ে উঠল—না, নো এক্সকিউজ। এ শালা কালসাপ। একে আমি ধরিয়ে দেব। কবে আমকেই ছোবল দেবে। মাই গড ! একজন ঘাগী খুনী নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকি ! তোকে ছাড়ব না—কভি নেহি!

লতা বিরক্তমুখে বলল—আঃ! কী চেঁচামেচি করছ? মাথা ঠাণ্ডা করো তো? লোকে শুনে ফেলবে। তখন বিপদে পড়ে যাবে না?

—বিপদের আর বাকি আছে? কেউ যদি শালার চাদর আর জুতো লক্ষ্য করে থাকে তো—আমিও গেছি! ছি ছি ছি! যতীনের কাছে মুখ দেখাব কী করে? ও বাবা পুলিশ—নিজের ফাদার-মাদারকে ছেড়ে কথা কয় না তো বন্ধু ! ফ্রেন্ডশিপ! আইনের কাছে ফ্রেন্ডশিপ!

লতা হঠাৎ হাত বাড়াল।—শোন। আর চেঁচামেচি কোরো না। চাদরটা আমাকে দাও তো। আঃ দাও না!

সে চাদর প্রায় কেড়েই নিল। সঞ্জয় বলল—মরবে, মরবে লতা। কী করবে চাদর? আরে—ও কী করছ তুমি!

লতা ঝটপট একগাদা কাপড়চোপড়ের মধ্যে চাদরটা লুকিয়ে তোয়ালে আর সাবান নিল। তারপর বলল—সকাল সকাল চানটা সেরে অসি। দেখ—আর পাড়া মাথায় কোরো না। আসছি। চুপচাপ বসে থাকো তোমরা।

সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সঞ্জয় ওর কাঁধে হাত রেখে ডাকল—সাধু!

—উঁ?

—কেন এসব তুই করিস, ভাই?

সাধু আবার চুপ করে থাকল।

—একটা প্রাণ কত কষ্টে পৃথিবীতে আসে রে! কত দুঃখকষ্টে কত আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে সে বাঁচে। আর তুই....তুই তাকে....ক্ষোভে দুঃখে আর কথা বলতে পারল না। মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। তার চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

সাধু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সঞ্জয় বলল—কোথায় যাবি? চুপ করে বস্। এখন বেরোস নে। ধরা পড়বি। বস্ চুপচাপ। পুলিশ আসুক—দেখছি। আর শোন, আমার এই ফোমের স্লিপারটা পরে থাক্। পর এক্ষুনি।

সাধু পরল না। বসলও না। ঝোলাটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। কাঁধে তুলল।

—কোথায় যাবি তুই?

—আসছি। বলে সাধু বেরিয়ে গেল।

সঞ্জয় ক্ষেপে গিয়ে হতাশভাবে বলল—মর্ গে শালা পাপী! আমার কী?

সাধু হন হন করে এগিয়ে আলি হোসেনের মনোহারি দোকানে গেল। ছোরাটা সত্যি সত্যি ঝুমুরই কিনেছে কি না, তার জানতে তীব্র কৌতূহল হচ্ছিল। হায় ভগবান! যদি মেঘ বৃষ্টিটা কিছুক্ষণ পরে পাঠাতে!

সাধুকে দেখে আলি হোসেন বলল—শুনেছেন কাণ্ড ?

সাধু মাথা নাড়ল।

—ঢের মেলায় ঘুরেছি ভাই। চুল পেকে গেল। এমন কোথাও দেখিনি। মনে হচ্ছে কোন ভয়ানক দাগী এ মেলায় এসে জুটেছে। উঃ! কী সাংঘাতিক দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। এদিকে আর এক কাণ্ড শুনুন। আমাদের দোকানের ঝাঁপের ওপাশটা কে রাতে কেটে রেখে গেছে। কে জানে, শয়তানটা আমার ওপর প্রথমে হামলা করতে এসেছিল হয়তো। আমি তো আল্লা খোদা জপ করছি।

সাধু বলল—সেই ছোরাটা...

—কই? মেয়েটি তো আর এল না! হয়তো বাদলার জন্যে আসতে পারে নি। আসবে'খন। আপনার খাতিরে ওটা সরিয়ে রাখলুম। বুঝলেন না? খদ্দের চাইলে তো না করা কঠিন। বলবেন—রাখা আছে ওনার জন্যে। যত্ন করে রেখেছি। পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু।

সাধু কিছু না বলে সরে এল। চানাচুরওয়ালার লাশের ওদিকে ভিড়ে ঢুকল না সে। পাশ কাটিয়ে চলে গেল মন্দিরের কাছে। মন্দিরের ঘাটে লতা স্নান করছে। আজ ঘাটে কেউ নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে যে! ঘাটের সামনে কিছুটা ফাঁকা—তারপর দামের জঙ্গল শুরু হয়েছে। সাধু দেখল, লতা দামের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে এবং ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে শাড়ি বদলাতে ব্যস্ত হয়েছে। সাধুকে সে দেখতে পেল না।

কিন্তু সাধু দেখছিল লতাকে। তালবনের আড়ালে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সে। ভিজে শাড়িটা ছেড়ে শুকনো শাড়িটা পরল লতা। তারপর পায়ের কাছ থেকে ভিজে শাড়িটা পা দিয়ে ঠেলে ঘাটের ধাপে জলের কাছে ঠেলে দিল। একটু দাঁড়াল। কী যেন ভাবল। একটুও কি শীত করছে না মেয়েটার? সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিসের জোরে—ওর রোগা পলকা শরীরে কী অছে এমন? সাধু দেখতে থাকল। চোখে পলক ফেলতে ভুলে গেল। লতা চত্বরে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর মন্দিরের সিঁড়ির নিচে গিয়ে সে হাঁটু দুমড়ে মটিতে মাথা নোয়াল। পিঠে ও দু'পাশে পাতলা ভিজে চুলগুলো ঝুলে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। কতক্ষণ ধরে প্রণাম করল লতা। আর সাধুর যেন গায়ের ওপর দিয়ে কতগুলো দিন মাস বছর হুহু করে চলে গেল। কেন মাথা তুলছে না—প্রণাম কেন শেষ হচ্ছে না ওর? সাধু যে দূর থেকে আড়ালে একটি প্রণাম করার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে বুড়ো হয়ে গেল—স্থবির হয়ে পড়ল তার ঊরু দুটো। সাধু অনেক দূরের পথ হাঁটবে কেমন করে?

কতক্ষণ পরে মাথা তুলে লতা উঠল আস্তে আস্তে। ঘুরে ঘাটের দিকে এল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে যেন আকাশ দেখতে থাকল।

আর ঠিক সেই সময় পুবের আকাশে মেঘের ফাটল থেকে সূর্যের খানিকটা আলো গিয়ে লতার মুখে পড়ল। লতা আগুনের মতো জ্বলতে থাকল যেন। কী অলোর ছটা! অভিভূত সাধু মাটির দিকে ঝুঁকে মনে মনে বলল—ক্ষমা করে দিও দিদি, সাধুকে। তারপর একটু ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর ঘুরে হনহন করে এগিয়ে চলল পাকা সড়কের দিকে।

পিচে উঠে দক্ষিণে ঘুরল সে। এসেছিল উত্তর থেকে, চলল এবার দক্ষিণে। আর পকেট থেকে লাল পাথরের মালা বের করে ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে একটু দাঁড়াল। থাক্। পয়সা দিয়ে কিনেছে। পয়সা না সাধুর রক্ত। যাক্। থেকে যাক্। যতকাল সাধু বাঁচে, এ থাক তার বুকের তলায়।

সাধ মিটল না। সুখের সন্ধ্যা আসতে গিয়ে থমকে রইল, সেই দুঃখের সাক্ষী এই লাল পাথরের কিছু টুকরো। তাকে নষ্ট করবে না সাধু।

সে হন হন করে চলতে থাকল। পথে মোটর বাস পেলে চাপবে, নয়তো চিরকালের হাঁটার নেশা মন্দ কী! তবে সাধুর পকেটে এখন অনেক টাকা। গুনে দেখেনি—সেই দশটা ছাড়াও একগোছা নোট আছে। রামভগতের গেঁজের মধ্যেই আছে। গেঁজেটা তার কোমরে বাঁধা। পরে গুনে দেখবেখন। এত ব্যস্ত হবার কী আছে?

সাধুর ডান হাতের কনুইয়ের কাছটা এতক্ষণে চিনচিন করল। হাতা সরিয়ে নিশ্চিন্ত নির্জন রাস্তায় নিরাপদে দেখল। রামভগতের হাতে কী বিচ্ছিরি নখ! শালা মাংস চিরে ফালা ফালা করেছে। হাতের

সেই জায়গাটা চুষেছে রাতে—আবার এখন চুষতে চুষতে চলল।

....তোমরা সাধুকে টানলে কী হবে? সাধুর মন টান নেয় না। তোমরা জলের স্রোত, সাধু পাথর। ভিজে যায়, নড়ে না। সে নিজের জায়গা কামড়ে পড়ে আছে।

ওই যাঃ। বাঁশিটা তো আনা হল না! একটু দাঁড়াল। হাসল সে। তোকে বাঁশি সয় না সাধু। বাঁশি তোর জিনিস নয়। তোর আসল জিনিস এই মাফলার। . সে বোসসায়েবের মাফলারে ভাল করে মাথা গলা কান ঢেকে নিল।

পিছনে উত্তরে হাওয়ার চাপ। সাধু চলেছে দক্ষিণে। যেন শিকারী বাজপাখি উড়ে চলেছে দেশান্তরে—দু'চোখে তীক্ষ্ণ খোঁজখবর।

বিকেল নাগাদ মেঘ কেটে আকাশ আবার ঝলমল করছে। ব্রহ্মপুরের মেলার সাংঘাতিক খবর ততক্ষণে গাঁয়ে গাঁয়ে রটে গিয়েছিল। সেদিন মেলায় বাড়তি এক জনের পা ফেলার জায়গা নেই—এমন ভিড়। সারা মাসের মধ্যে এমন জমজমাট কোনদিনই দেখা যায়নি। হইহল্লা বেড়েছে। পুলিশও আজ অনেক বেশি। লালটুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। মহকুমা থেকে এক ট্রাক পুলিশ এসে গেছে মেলায়। যতীন দারোগা গোঁফ পাকিয়ে ঘুরছে। মেজাজ আগুন একেবারে।

ঘুরতে ঘুরতে সে সঞ্জয়ের তাঁবুতে এল এক সময়।—সঞ্জু! আজ খাবো হে! ডিনার খাবো। রাতটাও কাটাবো। বউমা কই? বউমা।

সঞ্জয় বলল—এস যতীন। ওর শরীরটা হঠাৎ ভাল নয়—ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগিয়েছে।

—জ্বর নাকি?

—হ্যাঁ। বারণ করলুম—শুনল না। সকালে ওই ঠাণ্ডার মধ্যে দীঘিতে ডুবে এল। বসো ভাই যতীন।

যতীন দারোগা মোড়ায় বসল।—আজ কার পৌষ মাস কার সর্বনাশ। চানাচুরওয়ালা মরে মেলাওলাদের কপাল ফিরে গেল। ভিড় দেখছ? তোমার তো মওকা হে সঞ্জু। খুব লুটবে।

সঞ্জয় হাসল। সিগারেট দিয়ে বলল—শেষ অবধি কী হল ব্যাপারটা?

যতীন সিগারেট জ্বেলে বলল—তুমি খাবে না?

—নাঃ। এক্ষুনি খেলুম। তুমি টানো।

সিগারেটের ধোঁয়ায় রিঙ পাকাতে পাকাতে যতীন বলল—কেসটা ভাই সিরিয়াস। তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। কতকগুলো ভাইটাল পয়েন্ট পাচ্ছি—ভেরি পিকিউলিয়ার। কপাটওয়ালার সঙ্গীটাকে তো চালান দিলুম। বুড়োর লাশটার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেল গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে—গলা টিপে নয় কিন্তু!

সঞ্জয় চমকে উঠে বলল—ফাঁস দিয়ে? তার মানে?

—গলায় রঙিন পশমের ফাইবার পাওয়া গেছে। লাল আর হলদে। এ বোঝাই যায়, মাফলারের কাজ। দ্যাটস দা মার্ডার উইপন।

—লাল হলদে! মাফলার! সঞ্জয় হাঁ করে তাকাল।

—এই দ্বিতীয় খুনটাব বেলায় একই আফটার ডেথ সিম্পটম। তাই দেখে আমি নিজেই আতস কাচ দিয়ে দেখলুম। কী অদ্ভুত ব্যাপার! এখানেও লাল হলদে পশমের ফাইবার! মার্ডারার আর যেই হোক, সেই শম্ভুচরণ নয়—এটা ক্লিয়ার। খুনী অন্য কেউ।...

সঞ্জয় চঞ্চল হচ্ছিল মনে মনে। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখে বলল—সর্বনাশ!

যতীন বলল—এবার আসছি সবচেয়ে স্ট্রেঞ্জ পয়েন্টে। সেদিন তোমায় বললুম বিলে একটা সোঁতায় লাশ পাওয়া গেছে। কিছুটা পচে উঠেছিল—খানিকটা শেয়ালে খেয়েও ফেলেছিল। কিন্তু মাথার দিকটা ঠিকই ছিল। লাশটার পোস্টমর্টেম সম্ভব হয়নি। হাঙ্গামা করতে চাইনি। কিন্তু সেটা ভুল হয়েছে। কারণ....

সঞ্জয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকাল।

—কারণ, সে লাশটারও জিভ একইভাবে বেরিয়ে ছিল। চোখের পাতাও বন্ধ ছিল না। হুবহু একই লক্ষণ—দম আটকে মেরে ফেলার ঘটনা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে, তার গলায় একটা মাফলার

পেঁচানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। অবশ্য এটা লাল-হলদে নয়। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল দেখছ?

সঞ্জয় মাথা দোলাল। তার মনে হল, লতা শুনতে পাচ্ছে তো কথাগুলো? শুনুক—ভাল করে শুনুক। তারই শোনা উচিত। সকাল থেকে তো খুব চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করছিল। এবার বুঝুক।

যতীন বলল—আরো পিকিউলিয়ার ব্যাপার—এখানে পাচ্ছি আমরা একটা স্যান্ডেল, সোঁতায় একজোড়া স্যান্ডেল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ একজনেরই। স্যান্ডেল জোড়াটা সচরাচর গ্রামের লোকেরা পরে—এমন নয়। সম্ভবত লোকটা বেশ শৌখিন। শহুরচরা লোক বলতে পারো।

সঞ্জয় বলল—কে রে বাবা?

যতীন ভুরু কুঁচকে গোঁফ পাকাতে পাকাতে বলল—খুনী ওই পথে ওই কম্মটি করে তারপর মেলায় এসেছে—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দেখা যাক্।

সঞ্জয় শুকনো গলায় বলল—সোঁতায় পোঁতা লাশটা সনাক্ত হয়েছে?

—হুঁউ। ওই এলাকার লোক বলছে, এ সেই মোহনপুরের চাঁদু বাসনওয়ালা।

—বাসনওয়ালা!

—হ্যাঁ। চেহারা খানিকটা বদলে যায় এসব ক্ষেত্রে। কিন্তু ওর লাশের সঙ্গে একটা বড় পেতলের খুন্তি পাওয়া গেছে।

—খুন্তি !

—ওই দিয়ে কবর খুঁড়েছিল খুনী। এবার দুয়ে দুয়ে চার করা সোজা। পেতলের খুন্তি—সুতরাং বাসনওয়ালারই মাল। মেরে মাল সাবড়েছে ব্যাটা। দেখা যাক্। কোথাও না কোথাও মাল বেচেছে! যাবে কোথায়? যতীনের শালা গোঁফ পেকে গেল এতে !

দারোগা পা দোলাতে থাকল। সঞ্জয় একটু চুপ করে থাকার পর বলল—বাসনওয়ালার বাড়িতে খবর গেছে নাকি ?

—চৌকিদার পাঠানো হয়েছিল। একটা মাত্র মেয়ে ছিল লোকটার। এসে অবশ্য লাশ দেখতে পায় নি। গন্ধে টেঁকা যাচ্ছিল না। কী করব বলো? পোড়াতে দিয়েছিলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য মেয়ে রে ভাই! একটু কান্নাকাটি পর্যন্ত করল না! সব শুনেটুনে চলে গেল। মরুক গে! কই, বউমা কেমন আছে—দেখি!

বলে দারোগা উঠল। তাঁবুর দরজায় গিয়ে ডাকল—বউমা! কী হয়েছে? এখানে এসে জ্বর বাধিয়ে ফেললে। কী মুশকিল! ভাবলুম—আজ তোমার হাতে খাবো টাবা।

লতা ক্যাম্পখাটে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। উঠে বসল। আসুন দাদা। বসুন।

—না, না। বসব না। শুনলুম শরীর খারাপ—তাই....

—এমনি একটু ..... তেমন কিছু না। ... বলে লতা একটু হাসল। —খেতে চেয়েছেন বড় মুখে। খাবেন।

—না, না। এমনি ঠাট্টা করছিলুম। তুমি শুয়ে থাকো।

লতা আর আগ্রহ দেখাল না। দারোগা চলে গেলে সে শুল। মাথায় কম্বল চাপিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুল। মুখটা আবার থমথমে হয়ে গেল।

যতীন দারোগা বেরিয়ে গিয়ে বলল—তোমার শ্যালকটিকে দেখছিনে যে?

সঞ্জয় বলল—কোথায় বেরিয়েছে। মেলায় ঘুরছে হয়তো। ইয়ে যতীন, আমরা, সম্ভবত কাল চলে যাচ্ছি। ভাই।

যতীন দারোগা ব্যস্ত হয়ে বলল—সে কী! কেন? মেলা তো সবে জমল! তারপর গলার স্বর চাপা করে ফের বলল—কেন? হচ্ছে-টচ্ছে না কিছু?

সঞ্জয় মাথা দোলাল। —কিপটে দেশ হে! সব আনি-দুয়ানির খেলাড়ি।

—আবে ভাই, সে তো প্রথম হবেই। রসে মজতে দাও। এ কী রকম জানো? চার ফেলে ছিপ নিয়ে বসে আছ। প্রথমে তো খুচরো চুনোপুঁটি ঘুর ঘুর করবে—জ্বালাবে। তারপর আসবে রুইকাতলা।

সঞ্জয় তেতো মুখে বলল—না ব্রাদার। কদ্দিন এসেছি। হাত ব্যথা হয়ে গেল। রুইকাতলার পাত্তা

নেই। ভাবছি, কালই চলে যাব। দেখি—মোহনপুরে যাওয়া যায় নাকি। আজই ভাবছিলুম—তুমি তো নানা জায়গায় ঘুরেছ। ওদিককার রুটটা বলতে পার নাকি। খুব বড়ো মেলা নাকি—এর চেয়ে অনেক বড়ো!

দারোগা কী বলতে যাচ্ছিল, একজন দফাদার এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।—বড় হুজুরকে কমিটির পিসিডেন সেলাম দিয়েছেন। কাছারিতে বসে আছেন স্যাব।

যতীন হন্তদন্ত হয়ে উঠল।—ওই দ্যাখ। ভুলে বসে আছি। পাঁচটায় কাছারিতে অঘোর মুখুজ্যের সঙ্গে মিট করার কথা। চলি সঞ্জু! রাতে আছি। আবার দেখা হতেও পারে। দরকার হলে দেখা কোরো।

সে চলে গেলে একটুখানি গুম হয়ে বসে থাকার পর সঞ্জয় উঠল। তাঁবুর ভেতর ঢুকে লতার পাশে বসল। বলল—শুনেছ দারোগা কী সব বলল?

লতা বলল—তুমি শুনেছ, ওতেই হবে।

—না লতা। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নাও। শালাব হালহদিশ তো খানিকটা পাওয়া গেল। আরও কত আছে কে জানে। এত করে তোমায় বলি—যাকে তাকে অমন করে প্রশ্রয় দিও না। সেবারে এক ছোকরা চুরিচামারি করে কেটে পড়ল। এত করেও...

লতা ফুঁসে উঠল। —আবার সেই একই কথা তুলে ঝগড়া করতে এলে?

সঞ্জয় আপসের সুরে বলল—না। কথাটা হচ্ছে দোষ আমারও নিশ্চয় আছে। আমারও শালা কী হয়ে গিয়েছিল ওকে দেখে। তক্ষুনি-তক্ষুনি আলাপ, আর তক্ষুনি-তক্ষুনি ওকে আমরা শুতে জায়গাও দিয়ে বসলুম! কোথায়? না—এক্কেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে! মাই গড!

লতা রেগে গেল।—ফের সেই একই কথা তুলছ কিন্তু!

সঞ্জয় শুকনো মুখে কাঁচুমাচু হাসল।—না, না। ভাবনার কথাটা বলছি। ভেবে দেখ তো, তোমার কত কাছে ওইখানটায় একটা জঘন্য সাপ শুয়ে থেকেছে—যদি...

লতা প্রায় চেঁচিয়ে বলল—চুপ করো, তুমি!

সঞ্জয় চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ খুলল। —আমি এ লাইনের মাল নই আসলে। এক্কেবারে আনাড়ী—শালা নোভিস। দেশবিদেশে ঘুরি। কেউ আপন হতে চাইলে বুকে টেনে নিই। একবারও ভাবিনে, মানুষ না সাপ—হাতি না বাঘ-ভালুক! কেন এমন করি? কোন মানে হয় না—কোন মানে হয় না!....

লতা কম্বলে পা ঢেকে রেখে উঠে বসল। কী বলবে বলে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু বলল না। সঞ্জয় পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিরুনি বের করে বারকতক টাকেব পেছনকার হালকা চুলগুলো আঁচড়াল।

একটু পরে লতার দিকে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে সে চাপা গলায় বলল—ভাগ্যিস এখানে এসে মাফলারটা একবারও পরিনি। কিন্তু কথা হচ্ছে—যতীন শালা ওর খোঁজ করছিল। তোমায় দেখার ছলে কে জানে ওকে খুঁজে গেল নাকি! ও বাবা পুলিশ! ফ্রেন্ডশিপ থাকলে কী হবে? আমি পুলিশ চিনি। তাই বললুম —কালই চলে যাচ্ছি।

লতা আস্তে বলল —তাই চলো। আমার আর একটুও ভাল লাগছে না এখানে! এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

সঞ্জয় গুম হয়ে ভাবতে থাকল।

লতা আবার বলল—রাত্রে যতীনবাবু আবার এসে যদি ওর কথা জিজ্ঞেস করেন?

—বলব, এসে আবার বেরিয়েছে। সার্কাস-টার্কাস দেখছে।

—কাল যাবার সময় যদি উনি থাকেন, সঙ্গে ওকে দেখতে পাবেন না। তখন কী বলবে?

—রাইট, রাইট! সঞ্জয় একটু ভেবে বলল—তার চেয়ে রাতেই যতীনকে বলে দেব—ওকে মোহনপুর পাঠিয়েছি নটার লাস্ট ট্রিপে। আগাম জায়গা দেখতে গেছে।

—রাত নটার ট্রিপে?

—হ্যাঁ। ধরো—কান্দীতে আত্মীয় বাড়ি থাকবে। সেখান থেকে সকাল সকাল যাবে।

লতার মনে ধরল প্ল্যানটা। বলল—সেই ভাল। তাই বোলো যতীনবাবুকে।

—সঞ্জয় উঠে দাঁড়াল। বলল—আজ খেলতে একদম ইচ্ছে করছে না। শুওরের বাচ্চা সব তেতো করে পালাল। ভ্যাট্! এই নাক কান মলা। দেখবে—কখনও যদি কোন শালাকে জায়গা দিই!

সে বেরিয়ে যাচ্ছিল, লতা ডাকল—শোন।

সঞ্জয় ঘুরে দাঁড়াল।

—সেদিন জ্বরের মধ্যে ও ঝুমুর-ঝুমুর করছিল। কথাটা জিজ্ঞেস করিনি। তোমায় কিছু বলেনি? মানে—ঝুমুর কে, কী ব্যাপার! বলেনি?

—ঝুমুর? না তো। শালা খচ্চরের কোন পীরিতের মেয়ে হবে! নাকি বউ?

লতা করুণ হাসল। মাথা নেড়ে বলল—না, না বিয়ে যে করে নি—তা আমি বুঝেছি। বিয়ে করা মানুষ অন্য রকম হয়। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তা ছাড়া....লতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে আবার বলল—আর যাই করুক, ছেলেটা লোচ্চা বা লম্পট প্রকৃতির নয়। মেয়েদের ব্যাপারে ভারি লাজুক! সেটা আমি বেশ বুঝেছি।

সঞ্জয় বিকৃত মুখে বলল—থাক্। আর সার্টিফিকেট দিও না। আর কী মতলবে ঢুকেছিল কে জানে! এখন তো ভাবতে ভীষণ খারাপ লাগছে যে তুমি শুয়েছ এখানে—আর ও শালা শুয়ে থেকেছে তোমার দু'ইঞ্চি নিচে—ব্যস! একটুখানি ডিফারেন্স!

লতা তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল—ছিঃ! কী যা তা বলছ আবার? ওকে আমি ছেলের মত দেখেছি! আবার তুমি সেই কেলেঙ্কারি করছ?

সঞ্জয় অপ্রস্তুত হয়ে বলল—না, না! যত ভাবছি—শিউরে উঠেছি। যদি টাকার লোভে তোমার গলায় ফাঁস লাগাত! ধরো—যদি তোমার গয়না থাকত গায়ে! মাই গড! বাপ্ রে বাপ্ রে বাপ্!

লতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ছাড়ো! আর ওসব নয়।

সঞ্জয় বাইরে চলে গেল। লতার মনে পড়ল—সাধু বলেছিল, গয়না পরেন না কেন বউদি? কথাটা বার বার তার মাথায় ভেসে এল। গয়না থাকলে কি সে লতাকে মেরে ফেলত?

অসম্ভব। লতার কিছুতেই তা মনে হয় না। সাধু তাকে সত্যি সত্যি ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। আর সেদিন ভোরে তার পেটে মুখ গুঁজে সেই হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কান্না? এখনও কানে ভাসছে। ওর মধ্যে একটা অসহায় শিশুর পরিচয় লতা পেয়েছে। নাই বা হল ছেলেপুলের মা, লতার মনটা যে বরাবর মায়ের মন!

চোখ ফেটে জল আসছিল লতার। ফিরে এসে দেখা যে হল না! দেখা হলে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করত সে—কেন তুমি অমন করে বেড়াও?

যদি কোনদিন আবার দৈবাৎ দেখা হয়ে যায়, লতা প্রথমে এই প্রশ্নটিই করবে।....

দীঘির পাড়ে মন্দিরের পাশেই একসময়কার জমিদারী কাছারি। একতলা সারবন্দী চার-পাঁচটা ঘর। আজকাল সেটায় প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। কিন্তু মেলা যদ্দিন চলে, স্কুলের বালাই থাকে না। তখন পুরোটা মেলা কমিটির অফিস। ওদিকে একটা ঘরে পুলিশ ক্যাম্প বসে যায়।

সেই অফিসে যতীন দারোগা অঘোর মুখুজ্যের ভগ্নীপতি সদর ফৌজদারী আদালতের জাঁদরেল মোক্তার ভবশংকর বাঁড়ুজ্যের স্টেটমেন্ট লিখছিল। টেবিলের উপর খবরের কাগজে মোড়া একজোড়া পাম্পশু জুতো।

ধুরন্ধর মোক্তারের মাথায় গোড়া থেকেই নাকি সন্দেহ চেপেছিল, একটা কিছু গলদ আছে ছোকরার মধ্যে। আজ সকালে চানাচুরওয়ালার মুঠোয় আঁকড়েধরা নীলচে [illegible]র চাদরের টুকরো আর এক পাটি স্যান্ডেল যেই দেখা, উনি শিউরে উঠেছিলেন। বললেন—চাদর না হয় চিনলেন। কিন্তু স্যান্ডেল? হুঁউ—এ ঝানু চোখ সবখানেই থাকে যে! না—থাকত না। কিন্তু সোঁতায় নতুন পাম্পশু ফেলে চলে যাওয়া, কম দামে বাসন বিক্রি, আনাড়ী হাতে ওজন, এসব নিয়ে সন্দেহের পোকা ঢুকেছিল মাথায়। তাই ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ও তো দারুণ ঘুঘু! কাটল সঙ্গে সঙ্গে।

মেলায় এসে চোখ পড়েছিল ওর পায়ে—এর কারণ, জুতো ফেলে এসেছে তো কী পরছে ছোকরা

এখন? দেখলেন নতুন হালফ্যাশানের স্যান্ডেল। মুখস্থ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ভবমোক্তার যা দেখেন মন দিয়ে, চট করে মনে গেঁথে যায়। তা, সন্দেহ জমাট হল মনে। এক গরিবগুরবো বাসনওলা ছোকরা অমন দামী পাম্পশু ফেলে এসে এই সস্তা হালফ্যাশানী স্যান্ডেল কিনে ফেলল! ব্যাপারটা কী? আর ও-সি যে বললেন, গলায় লাল-হলুদ পশমের ফাইবার—নিশ্চয় মাফলারটা নতুন কিনেছিল। তারও সাক্ষী আছে। মোক্তার বললেন—অঘোরের মেয়ে সোমা দেখেছে। গতকাল সকালে আমার মেয়ে ঝুমুরের সঙ্গে ব্যাটা ভাব জমাতে চেষ্টা করেছিল। ভাবতে তো মশাই শিউরে উঠছি—অল্পস্বল্প গয়নাগাঁটি ছিল গায়ে। দিন-দুপুরে বলে—তা ছাড়া মেলার জায়গা বলে সুবিধে করতে পারেনি। সোমা গিয়ে বলেছিল—ঝুমুরদি একটা লোকের সঙ্গে ....

সামলে নিয়ে মোক্তার বললেন—মানে, একটা লাল হলুদ মাফলার জড়ানো ছোকরা ঝুমুরের সঙ্গে কী কথা বলতে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। আমার মেয়ে বুঝলেন মশাই! একটু সরল বোকাসোকা মেয়ে। নানারকম বোকামি আছে ওব। সোমা বলল—ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে নাকি ছোকরাটা ওর ঝুমুরদিকে কোথায় নিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন ওর ফেরার নাম নেই, সোমা চলে আসে। বাড়িতে গিয়ে বললে তক্ষুনি লোক পাঠালুম। লোকটার সঙ্গে পথেই ঝুমুরের দেখা হয়ে যায়। বাড়ি এলে তো বুঝতেই পারছেন, ওর মা প্রচণ্ড বক্‌ল-টক্‌ল। আর একা বা অন্য কারো সঙ্গে বেরোতেই দিল না।

যতীন দারোগা বলল—কী বলতে ডেকেছিল আপনার মেয়েকে? ওর একটা স্টেটমেন্ট দরকার হবে কিন্তু।

মোক্তার ট্যারা হয়ে তাকালেন।—অ। দরকার হবে বুঝি? বেশ তো। নেবেন। তা আগে আমার মুখেই শুনুন। ঝুমুরকে ব্যাটা হার না মালা-ফালা কিনে দিতে লোভ দেখাচ্ছিল। ও নেবে কেন? অনেক কায়দা করে ওর হাত থেকে পালিয়ে আসে।

কমিটির এক ভদ্রলোক বললেন—জোর বাঁচা বেঁচেছে!

—বেঁচেছে বই কি। আমারই ভুল হয়েছিল—তক্ষুনি পুলিশে ইনফর্ম না করা।

আর এক ভদ্রলোক বললেন—আমার মনে হচ্ছে, ছোকরাকে আমি বোসসায়েবের জুয়াড়ীর সঙ্গে দেখেছি!

যতীন দারোগা খিকখিক করে হাসল।—সে আর আপনি বলবেন কেন? তক্ষুনি বুঝে গেছি। আমি শালাকে দেখেই চিনেছিলুম। বোস ব্যাটা নেহাত আমার চেনাজানা। তবে আইন মশাই আইন। ওতে মা বাপকে খাতির করিনে আমি। দেখুন না, কী করি!

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার জেগে ওঠেনি, সকাল সকাল একটা হ্যাসাক জ্বেলে আনা হল। টেবিলের কোনায় সেটা রাখা হল। দারোগা সিগারেট ধরাল। অঘোর মুখুজ্যে একটু কেশে বলল—মেলার দায়িত্ব যদ্দিন হাতে নিয়েছি, কোন হাঙ্গামা হতে দিই নি। এবার কুগ্রহ ছাড়া কী বলব? অতসব লোকের সেফ্‌টি আমাদের ওপর ডিপেন্ড্ করছে। এরকম মারাত্মক ফাঁসুড়ে শুধু মেলায় কেন, দেশে থাকাও তো বিপজ্জনক! আমি ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে লিখব। লোকাল এম. এল. এ., এম. পি.-কেও বলব।

যতীন দারোগা শুকনো হেসে বলল—মশা মারতে কামান দাগবেন কেন মশাই? আমরা আছি কী করতে তাহলে? দেখুন না, কী করি। ...

চা, রসগোল্লা ইত্যাদি খেয়ে একটু পরে সে বেরোল। পাশের একটা ঘরেই অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। একজন এ. এস আই. চার্জে আছে। সেখানে কিছুক্ষণ কথা বলে সে চলে গেল।

সোজা সঞ্জয় বোসের তাঁবুতে গেল যতীন। সঞ্জয় হ্যাসাক জ্বেলেছে সদ্য। খেলার আয়োজন করছে। লতা যথারীতি সেজেগুজে তৈরি হয়েছে। যতীনকে দেখে দুজনেই চমকে উঠেছিল। সঞ্জয় হাসবার চেষ্টা করে বলল—এস যতীন।

যতীন বলল—একটা গুরুতর কথা আছে হে সঞ্জু। শোন।

আড়ালে গিয়ে সে মোটামুটি ব্যাপারটা জানাল। তারপর বলল—তুমি শালা ওকে কীভাবে বুকে নিলে, মাইরি এ এক মিস্ট্রি। তুমি সেই হাবাকান্তই থেকে গেলে হে!

সঞ্জয় আর কিছু গোপন করল না। করে লাভ নেই। সে সব দোষ লতার ঘাড়েই চাপাল। বলল—ওর নিরুদ্দিষ্ট ভাই নিয়ে আমার প্রব্লেম লেগেই আছে—লেগেই আছে! সেবারে কাটোয়ায় এক অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরা....

যতীন ফিসফিস করে বলল—শোন। তুমি আজ খেলায় বোসো না। এক্ষুনি কেটে পড়ো—ফর ইওর সেফটি। নইলে নিজের পজিশন বাঁচাতে তোমায় অ্যারেস্ট করতে হবে আমাকে। বুঝতে পারছ না কদ্দুর গড়িয়েছে? দেরি করো না! গুছিয়ে নাও এক্ষুনি। পরে আমি হামলা করতে আসব—মাইন্ড দ্যাট। এসে যেন দেখি—তুমি ভ্যানিশ্‌ড্‌!

সঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে উঠল। যতীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার দু হাত চেপে ধরেই ছেড়ে দিল। ...

রাত নটা পনেরোতে সঞ্জয়ের গাড়ির হেডলাইট অন্ধকার চিরে কৃষ্ণপুরে চটির মোড়ে পুবে ঘুরেছে—চটির আটচালায় শুয়ে থাকা কয়েকজন মানুষের ওপর থেকে আলোটা ঝাঁটার মতো অন্ধকার সাফ করতে করতে চলে গেল। সাধু তুলোর কম্বল থেকে বিরক্ত হয়ে একবার নাক বের করেই আবার ঢাকল। বুকে জ্বালা নিয়ে ঘুম আসে না তার।

গাড়িটা চলে গেলে অনেকক্ষণ গুড়গুড় শব্দটা শোনা যেতে থাকল। সে চিত হয়ে সিগারেট ধরাল। টানতে থাকল। অন্ধকারে ওইটুকুই যা আলোব আভাস। আটটা বাজতে না বাজতে চটির ছোট্ট বাজার বন্ধ হয়ে গেছে। বটতলায় একদল গাড়োয়ান ধান-বোঝাই গাড়ির তলায় চটের পর্দা টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছে। ভেতরে হারিকেন জ্বলছে—তার আলো বাইরে আসে না। কাল রাতের বৃষ্টির পর আজ প্রচণ্ড শীত পড়েছে। তার ওপর তিনদিকে ধুধু ফাঁকা মাঠ—ঢেউখেলানো, দিগন্ত থেকে দিগন্তে শূন্যতা অন্ধকারে খালি হুহু করে বেড়াচ্ছে।

সাধুর পাশের তিনটি লোক গরু-কেনা পাইকার। চলেছে বিহার অঞ্চলে হিরণপুরের গোহাটায়। সাধু দেখেছে, ওদের কাছে হান্টারের মধ্যে গুপ্তিছোরা আছে। টর্চ আছে প্রত্যেকের। শীতের চেয়ে অস্বস্তিটাই বেশি।

তারপর কখন শেয়াল ডাকল। ডাক থামলে বটগাছে প্যাঁচা ডাকল কয়েকবার। কিসের ইশারা দিচ্ছে ওরা? সাধু চঞ্চল—কিন্তু অসহায়। ছটফটানি বেড়েই চলেছে। বাইরে গাড়ির গরুগুলো মাঝে মাঝে চট্‌পট্‌ করে কান ঝাপটাচ্ছে। মশা তো নেই। কেন অমন করে ওরা? অভ্যাস হয়তো।

কতক্ষণ পরে একজন পাইকার উঠল। ঘুম থেকে ওঠার ফেঁসফোঁসানি বেশ অদ্ভুত লাগে। লোকটা টর্চ জ্বালতে জ্বালতে বেরোল। হিসি পেয়েছে।

সাধুও উঠল। কেশে দিল একবার। লোকটা ঘুমভাঙা জড়ানো গলায় বলল—শীতের রাত কী লম্বা। তেমনি জাড়ও পড়েছে।

—হুঁউ! বলে সাধু ওর খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে কাজটা সেরে নিল ঝটপট। তারপর ওর কাছে গিয়ে বলল—দাদা, একটা উপকার করবেন?

—বলুন বাবু!

সাধুকে বাবু ঠাউরেছে। সাধু তো বাবুবাড়িরই ছেলে। সে বলল—একবার মাঠ সারতে হবে, মনে হচ্ছে। আমার আবার বড্ড ভয়...খিকখিক করে হাসল সে।...বড্ড ভয়, দাদা। কেউ কাছাকাছি না দাঁড়ালে হবেই না!

লোকটা কি একটু বিরক্ত হল? মনে হয় না সাধুর। বিড়ি জ্বেলে বলল—বেশ তো! চলুন না। ওই তো পুকুর আছে। নিন, টর্চটা নিন।

টর্চ নিল না সাধু। পুকুরটা পাশেই। পাড়ে উঠল। লোকটার পাশাপাশি যাচ্ছিল সে। লোকটা আলো ফেলে একটা ঘুটিংভরা শুকনো খটখটে জায়গা দেখিয়ে বলল—ওখানেই বসুন।

সাধু ততক্ষণে মারাত্মক লাল-হলুদ মাফলারটা খুলে নিয়েছে গলা থেকে।—বসি। বলে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল।

তারপরই শুরু হল একটা ধস্তাধস্তি। ঘুটিংভরা পাথুরে মাটিতে পড়ে লোকটা ধড়ফড় করতে

থাকল। পা দুটো ধুপ ধুপ করে মাটিতে আছাড় খাচ্ছিল তার। সাধু তার বুকে কলজের ওপর হাঁটুর চাপটা বাড়াতে বাড়াতে শেষবারের মতো হ্যাঁচকা টান দিল গলায়। অন্ধকারে তার শিকারের দুটো বিশাল চোখে নক্ষত্রের আলো পড়ে প্রচণ্ড জ্বলছে। সাধু চোখ বুজে অনেকক্ষণ একই ভঙ্গিতে বসে রইল তার বুকে। দেহটা ক্রমশ শান্ত হয়ে যাচ্ছে। ....

দশ

সাধু যখন কান্দী শহরে ঢুকল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। শরীর জমে পাথর, অবশ। ক্লান্ত অনুভূতিহীন সেই শরীর টেনে সে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছল। একপাশে রাস্তা, তিনপাশে দোকানপাট। একটা চায়ের দোকান সেই ভোরেই সবে খুলে আঁচ দিয়েছে। সাধু একটা খালি বাসে উঠে বেঞ্চে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আর আসবে না। তার খালি মনে হচ্ছে, এবার তার নিজের গলায় ফাঁস আটকেছে—সে আর বাঁচবে না। দম আটকানো ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। বুক পেট হুহু করে জ্বলছে। মাথার ভিতর আগুন—ওইটুকু যা তাপ। এত জ্বালা নিয়ে মানুষ বাঁচে না। সাধুর মনে হল, সেও বাঁচবে না।

আর সিগারেট নেই। পাইকারটার পকেটে একগাদা বিড়ি পেয়েছিল। তাই টেনেছে সারাপথ। এখনও কয়েকটা আছে। একটা বের করে জ্বালল। লাল চোখে দরজা দিয়ে চায়ের উনুনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে সে নামল। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে হাফ পেন্টুল পরা ছেলেটা গ্লাস কাপ প্লেট সাজাচ্ছে। জল ফুটছে না। বার বার এসে হাওয়া দিচ্ছে উনুনে। চা-ওলা তখনও শুয়ে আছে ভেতরে। মুখ বের করে তাকিয়ে আছে। সাধুকে দেখে বলল—এত ভোরে কোথায় যাবেন, বাবু?

—মোহনপুর।

মোহনপুর যাবে না—এমনি বলল। কোথায় যাবে, তা কি জানে সাধু? লোকটা উঠল। আড়ামোড়া দিতে গিয়ে—বাপরে শীত! বলে সে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় বসে রইল। বলল—কাল এদিকে জোর বৃষ্টি। আজ সকালেও খানিক হয়েছিল। তাই ঠাণ্ডাটা জোর পড়েছে।

সাধুর কথা বলতে ভাল লাগছে না। একবার ভাল বিছানা পেলে শুয়ে দেখত ঘুম আসে নাকি। এখন শুয়ে পড়তে আর ঘুমে তলিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। আর কোন ইচ্ছে নেই এ মুহূর্তে। একটা ভাল বিছানা—একটা গভীর ওম—এসবের জন্যে সাধু তার সব রোজগার কারো হাতে তুলে দিতে রাজি। ভগবান! মা কালী। অভাগা সাধুকে এবার একটু দয়া করো।

ছেলেটা চা এগিয়ে দিয়ে বলল—বিস্কুট?

সাধু গ্লাস নিয়ে মাথা দোলাল। ছেলেটা ওকে দেখতে থাকল। সাধুর বিরক্তি জাগল। কী দেখছিস শালা অমন করে? এত কী দেখার আছে সাধুর মধ্যে? দেখিস না—কানা হয়ে যাবি।

সাধু চা খেয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে পড়ল বাগানপাড়ার গলির কথা। একবার এক ইয়ারদোস্তের সঙ্গে এসেছিল। সে এক লম্পট চোরচোট্টা। সাধুকে সে বলেছিল—খাসা জিনিস। যা, চলে যা। টাকা আমি দেব। সাধু যায়নি। বসে থেকেছে বাড়ির বুড়ীটার কাছে—যাকে মাসী বলছিল ওর সঙ্গী। বুড়ীটা বেশ আলাপী। হরিণমারা বাড়ি শুনে আঁতিপাতি জিজ্ঞেস করছিল। হরিণমারার পাশেই নাকি ওর গ্রাম ছিল একসময়।

কী নাম যেন ছুঁড়ী তিনটের—হুঁ, আকালী, ইন্দি আর পদ্ম। পদ্মের বয়স কম। একেবারে বাচ্চা বললেই চলে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন—মন্দ না দেখতে। সঙ্গী পরে বলেছিল—কী চালাক রে ছুঁড়ী! আমার দুই জাং খুঁটিয়ে দেখল। বলে, রোগ আছে নাকি দেখলুম।

সাধুর রাগ হয়েছিল খুব। পয়সা নেবে—আবার দেখাদেখি কিসের? সাধু হলে মজা দেখিয়ে দিত!

ওর সঙ্গী বলেছিল—তা যাই বলিস মাইরি! ওসব কাঁকড়া-গুগলিখেকো ছোট জাতের মাল ভগবান যেন অনেক খেটেখুটে তৈরি করেছেন।....

সাধু একটু ইতস্তত করল। কিন্তু বিছানা আর ওমের আরাম ওখানে ছাড়া আপাতত পাচ্ছেটা কোথায়? এখন সেটাই বড় জরুরী। বিশ্রাম চাই, কিছুক্ষণ টানা ঘুম চাই।

গলিতে ঢুকে সাধু এদিক-ওদিক তাকাল। হুঁ, ওই তো কাঞ্চনফুলের গাছওয়ালা বাড়ি। সে দরজায় গিয়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকল—মাসী! মাসী!

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর দরজা খুলল। সাধু ভোলেনি। এই সেই ধাড়ী মেয়েটা—আকালী! সেই কালো কুচকুচে মোটাসোটা গতর! সাধুকে টানাটানি করেছিল—পকেটে হাত ভরে পয়সা নিতে চেষ্টা করেছিল। সাধুকে বাগানো সহজ কথা নয়।

—মরণ নেই মিনসেদের! ভোরবেলায় জ্বালাতে এসেছ? .... অবশ্য আকালী হাসছিল। যাও, এখন হবে না। এখনও কাকপাখিতেও আহার করেনি। উনি গতরের জ্বালা মেটাতে এসেছেন!

হ্যাঁ—জ্বালাই বটে। সাধুর বড় জ্বালা। সে তাকে ঠেলে ঢুকে পড়ল বাড়িতে। সেই ছোট্ট উঠোন, খিড়কির দরজা—ওপাশে পুকুর আছে। সেই পুবমুখো একতলা পাকা ঘর, আর দক্ষিণে পুবে একটা করে মাটির দেওয়াল টালির ছাদ দেওয়া ছোট্ট ঘর। মাসীর সেই পাঁঠাটা আরও ডাগর হয়েছে। তার পিঠে চটের থলে বাঁধা। বারান্দায় নাদির মধ্যে বসে বসে কান নাড়ছে। গলায় ঠুং-ঠুং ঘণ্টা বাজছে। সেবার পাঁঠাকে খুব জ্ঞানী মনে হয়েছিল। এখন মনে হল, বুড়িয়ে বোকা হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

মাসীর আওয়াজ এল বন্ধ একতলা পাশ ঘর থেকে—কে র‍্যা আকালী?

—লোক।

—এমন অসময়ে কোন্ পোড়ারমুখোর মাথায় আগুন চড়ল র‍্যা? কেমন লোক—ভাল করে দেখ্।

সাধু ব্যস্ত হয়ে বলল—হরিণমারার। সেই যে সেবার নোটনের সঙ্গে এসেছিলাম।

বুড়ী আর কথা বলল না। আকালী ডাকল—এস।

সাধু তাকাল তার দিকে।

—কী পছন্দ হচ্ছে না নাগরের? তোমার যে কপাল মন্দ ভাই। পদ্মর ঘরে রাতকাবারি লোক। ইন্দির অসুখ। আর যাবে কোন্ চুলোয়? ঢুকে পড়ো। আমি জল সেবে আসছি।

সাধু ঢুকল। ঘুপটি অন্ধকার ঘর। তক্তপোশের ওপর বিছানা আর লেপও আছে। কিন্তু কেমন ভ্যাপসা গন্ধ ঘরটার। কোণে দুটো ইট পাতা—তার নিচে ফোকর। ধোওয়ার জায়গা। গন্ধটা সেখান থেকেই উঠছে।

সাধু যে অবস্থায় ছিল, কাঁধে ব্যাগসুদ্ধ বিছানায় ঢুকে প[illegible]। ধুলোভরা অবশ পা দুটো ঝাড়ল না—ধোওয়া দূরের কথা। তারপর কোমরে হাত দিয়ে টাকাগুলো একবার অনুভব করল। একটু অস্বস্তি হল সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমোলে আকালী চুরি করে বসবে না তো?

কিন্তু আর পারা যায় না। যা হবার হোক, সে ঘুমোবে।....

একবার ঘুমের ঘোরে সে টের পেয়েছিল আকালী তার গলা জড়িয়ে শুয়েছে। তাকে নড়তে দেখে কী যেন বলেছিল সে।

দ্বিতীয়বার ঘুমটা ভেঙেছিল যখন, দেখেছিল আকালী নেই। সে কোমরের কাছে হাত রেখে টাকাগুলো খুঁজেছিল। আছে। আশ্বস্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তারপর আকালীর ডাকে ঘুম ভাঙল।—ওঠ নাগর! খালি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতেই এসেছিলে নাকি? চার ঘণ্টা থাকলে। ঘণ্টা তিন টাকা। কত হল? বারো টাকা। এখন পাওনা মিটিয়ে আবার নাক ডাকাও। আর খেতে হলে বলো কী খাবে? টাকা দিলেই পাবে। কই, পাওনাটা আগে দাও। মাসী বকছে।

সাধু বলল—দিচ্ছি। মুখ ধুয়ে নিই। টাটকা টিউবওয়েলের জল এনে দাও।

আসলে আকালীর সামনে টাকা বের করবে না। মেয়েটা বেরিয়ে গেলে সে ঝটপট টাকা বের করল। আকালী উঠোনের টিউবওয়েলে আওয়াজ দিয়ে জল ভরছে আর কার সঙ্গে হাসাহাসি করছে। সাধু টের পাচ্ছিল—বাইরে পৃথিবীতে তোলপাড় হচ্ছে মানুষের জীবন। কাকের ডাক, কথাবার্তা, গম্ভীর চাপা কী সব গর্জনের সঙ্গে একাকার হয়ে ভেসে আসছে। শহর জায়গা। তাই এত গোলমাল। এখন

ব্রহ্মপুর মেলায় লতা আর বোসসায়েব কী করছে? কী করছে ঝুমুর? মনে আবার কষ্টটা ফিরে এল। কী ভালো যে কেটে যাচ্ছিল ওই কয়েকটা দিন! জীবনের সব চেয়ে সুন্দর আনন্দভরা কিছু সময় ছিল ওটা। আর কি তেমন সময় জীবনে ফিরে আসবে তার?

মালাটা গলায় পরা আছে—শেষরাতে পরে বসেছিল পথে আসতে আসতে। ঝুমুরকে মনে পড়ছিল। ঝুমুর সেই সন্ধ্যায় বটতলায় গেলে কী ঘটত? আঃ! আবার জ্বালাটা এল মনে। কে পাঠিয়ে দিল অসময়ে হঠাৎ সেই হারামী বৃষ্টিবাদলটা? কেন পাঠাল? না না! সাধু ছটফট করে উঠল। ঠোঁট কামড়ে ধরল।

আকালী এসে বলল—এই নাও জল। কই, টাকা দাও।

টাকাটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিল সাধু। যতক্ষণ সে মুখ ধুল, আকালী কোন কথা বলল না। মুখ ধুয়ে ধুতির খুঁটে মুছল। তখন আকালী বলল—এমন নিরামিষ নাগর তো দেখিনি বাবা! পীরিতে মন নেই—তবে কেন আসা? কলুর বলদ নাকি হে?

খিলখিল করে হাসতে লাগল মেয়েটা। পারলে সাধু বলে বসত— তোর ওই থলথলে কুকুরখেকো গতর নিয়ে সাধু কী করবে রে মাগী? সাধুর পীরিতের মেয়েকে তো তুই দেখিসনি!

—কী হে? চুপ করে কেন?

রাঢ় অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মেয়েরা 'হে' বলে পুরুষকে—যার সঙ্গে পীরিত বা ঠাট্টার সম্পর্ক আছে, তাকে। সাধু তেতো মুখে বলল—হে হে করো না। আমাকে চা এনে দিতে পারবে! খালি চা।

আকালী অপ্রস্তুত হয়ে বলল—এত বেলায় খালি চা খাবে? এগারোটা বাজতে চলল। টিউবওয়েল আছে—চানটান করো। টাকা দাও। হোটেল থেকে ভাত এনে দিই।

সাধু চটে গিয়ে বলল—ঘরের মাগ যেন! আদরে চিঁড়ে ভেজাচ্ছে!

তারপরই কী হল তার, বেরিয়ে পড়ল। দরজার দিকে এগোল। অসহ্য লাগছে। বমিভাব পেয়ে গেছে। বেরিয়ে পড়তেই হবে এখান থেকে। পিছনে আকালী খিলখিল করে হাসছে।

মাসী কোলে পাঁঠাটা নিয়ে বসে আছে। বলল—কী হল র‍্যা আকালী? অত আশনাই কবছিস কেন?

—মিনসের দেমাক খারাপ। চলে যাচ্ছে।

—যাক্ না বাবা। তোরই বা অতো পীরিত কিসের। পয়সা দেবে, থাকবে। পয়সা মেটাবে, চলে যাবে। মিটিয়ে নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—সরে আয়। আমাকে এক পাত্তর ঢেলে দে। গলা শুকনো লাগছে।

বাইরে গলিটুকু সাধু ব্যস্ত হয়ে পেরোল। ছি ছি, লোকে দেখলে ভাববে, এ বেশ্যাবাড়ি ঢুকেছিল! লজ্জায় মুখ কান লাল করে সে প্রায় পালাতে থাকল।

বাজার এলাকায় গিয়ে সে প্রথমে জুতোর দোকানে ঢুকল। কাবুলী চপ্পল কেনার শখ অনেকদিনের। হাতে এখন অঢেল টাকা। একটা গরম চাদরও কিনতে হবে। একটা বাঁশিও কিনতে হবে। কতদিনের সাধ আজ প্রাণভরে মেটাবে সে। কোঁচা পকেটে গুঁজে নীলচে (এই রঙ তার পছন্দ) পশমী শাল গায়ে চড়িয়ে সাধু চপ্পল ফটফটিয়ে আজ হাঁটবে।

একসময় কেনাকাটা শেষ করে চাপা শিস দিতে দিতে সে ভাবল স্নান করা দরকার। একটু এগোলে সিনেমা ঘরের পাশে ঘাট বাঁধানো দীঘি আছে। সাধু দীঘির ঘাটে গিয়ে জামাকাপড় খুলে নতুন গামছা পরে সাবান মাখতে বসল। রগড়ে গা ধুতে হবে। আকালীর বিছানার গন্ধে বমি আসছে।

গা ধুয়ে ধীরে সুস্থে জামাকাপড় পরে সাধু হোটেলে গেল। তৃপ্তির সঙ্গে খেতে বসল। জ্বালা অনেকটা কমেছে। শরীরটা বেশ পবিত্র লাগছে। সাধু সিগারেট টানতে থাকল।...

দ্বারকা-ময়ূরাক্ষীর অববাহিকায় এ মাটি যেমন সমতল, তেমনি ঘন সবুজে ঢাকা। সেই মাটিতে পিচের পথ চলেছে সদর শহরের দিকে এঁকেবেঁকে' দুধারে উঁচু উঁচু শিরীষ দেবদারু বউল কতরকম গাছ। ছোট ছোট মাঠে সরষের হলুদ ফুল শীতের রোদে খইফোটা হয়ে ফুটছে যেন। কোথাও সবুজ

ঝোপঝাড় গাছপালা আচমকা গাপ করেছে পথটাকে, কোথাও তেমনি আচমকা উগরে দিয়েছে। সাধু আস্তে আস্তে মেজাজে হাঁটছে। বাঁশিটা বের করে নিয়েছে। একলা হলেই দম ফাটিয়ে ফুঁ দিচ্ছে—আনাড়ী আঙুল ফুটোয় পড়ে না। শুধু টাটায়। তবু সাধুর ক্ষান্তি নেই। মাঝে মাঝে বাস লরি সাইকেল রিকশা যাচ্ছে-আসছে। তখন সে রাস্তার ধার ঘেঁষে গাছের আড়ালে দাঁড়াচ্ছে। নীল উর্দিপরা এক চৌকিদারকে দেখেই তো পিলে চমকে উঠেছিল। হিসি করতে বসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। চৌকিদারটার কাঁধে ঝোলা, হাতে নতুন বালতি—একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেল। তাকালও না তার দিকে।

তাহলেও এ পথে স্বাধীনতার স্বাদ আছে। একলা চলার নির্ভয়তা আছে। সাধু বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে স্বাধীনতার অগাধ নির্ভয় মুখকে প্রকাশ করতে চাইছিল।

ধূর্ত সাধু বাসে চাপেনি। বাস স্ট্যান্ড মাড়ায়নি। কৃষ্ণপুর চটির লাশের খবর হয়তো কখন কান্দী থানায় পৌঁছে গেছে। সে শহরের অন্যদিকে ঘুরে মাঠের পথে বেরিয়েছে। তারপর এই পাকা রাস্তায় পৌঁছেছে। গলার মাফলার ব্যাগে লুকোনো। কোঁচা পকেটে গোঁজা, জামাইবাবুর মতো প্রশান্ত চেহারার যুবককে কে আর বলবে ফাঁসিদার—যার গায়ে দামী পশমী শাল, পায়ে কাবুলি চপ্পল?

একটা ছোট্ট সাঁকোয় দাঁড়িয়ে হাঁফ সামলে নিল সে। তারপর বাঁশিতে ফুঁ দিতে দিতে এগোল। কয়েক পা গেছে হঠাৎ পিছনে খিলখিল করে কে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি থামিয়ে ঘুরল সে।

বছর ন-দশ বয়স হবে মেয়েটার, রাঙা টুকটুকে ফ্রক, খালি পায়ে আলতা, চুল বেণীবাঁধা আর ভীষণ তেল চুকচুকে, কিন্তু মুখ আর গলা পাউডারে ধ্যাবড়া, হাসছে—হাসতে হাসতে একহাতে দড়ি - বাঁধা ঘটিটার ভার অন্য হাত লাগিয়ে সামলে নিচ্ছে। শ্যামলা রঙের মেয়েটি যে বাবুবাড়ির নয়, তা সাধু তাকিয়ে বুঝেছে। কিন্তু রাগতে গিয়ে সাধুও ফিক করে হেসে ফেলল। বলল—কী হল খুকি? হাসছ কেন?

কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি হাসি থামাল—কিন্তু ঠোঁটের কাছটায় সেই হাসির চাপটা দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট।

সাধু বলল—আমার বাঁশি শুনে হাসছ? আর বোলো না—শিখছি।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাধুর মনে হল, সে তার আগে যেতে রাজি নয়। কে জানে কেন, সংকোচ বোধ করছে হয়তো। তাই সে নিজেই পা চালাল। বাঁশি ছাড়ল না। এতটুকু মেয়েকে লজ্জা করার কী আছে সে ভেবেই পেল না।

কিন্তু আবার মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল এবং হাসতে গিয়ে হাতে ঝোলানো ঘটিটা সামলাতে পারল না সে। হাঁটু দুমড়ে একটু আছাড় খেল। সাধু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আবার। সে দেখল, মেয়েটির মুখ এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে।

সাধু তার দিকে এগিয়ে সাহায্য করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তক্ষুনি উঠে পড়ল। তারপর হাঁটু পরীক্ষা করতে লাগল। সাধু হাসতে হাসতে বলল—আছাড় খেলে তো? ছড়েছে নাকি? হুঁউ—আর বাঁশি শুনে হাসবে। কেমন মজা! অ্যাঁ?

মেয়েটি তার কথার জবাব এবারও দিল না। সে ঘটিটার কিনারা সাবধানে মুছতে থাকল। তারপর তুলে নিল। বেশ ঝকমকে করে মাজা পেতলের বড়ো ঘটি।

সাধু বলল—ওতে কী অছে, খুকি!

মেয়েটি এবার আস্তে জবাব দিল—আখের গুড়।

তাই বটে। ফেনা জমে আছে। নতুন গুড়। ভারি মিঠে গন্ধ টাটকা গুড়ের। সাধুর নোলায় জল আসছিল। এক একটা জিনিসে হঠাৎ জীবনটা কী সুন্দর আর লোভনীয় হয়ে ওঠে। তার মেজাজ এখন অন্যরকম হয়ে গেল। সে পা বাড়িয়ে বলল—ঘটিটা বইতে যদি কষ্ট হয়—আমাকে দাও না।

—উঁহু। মেয়েটি পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে আপত্তি জানাল।

—ভাবছ, খেয়ে নেব? আরে না না! .... সাধু হাসতে হাসতে পিছন ফিরে ওর মুখটা দেখে নিয়ে আবার বলল—কোথায় যাবে তুমি?

—চণ্ডীতলা।

—কোত্থেকে আসছ?

—মহিমাপুর থেকে।

—চণ্ডীতলা কেন যাচ্ছ, খুকি?

—বা রে! আমাদের বাড়ি যে ও-গাঁয়ে।

—তাই বলো। মহিমাপুরে কে আছে? সেখান থেকেই গুড় আনলে বুঝি?

—আমার জ্যাঠাইমা দিল। ওদের আখ উঠেছে যে। অনেক গুড় হয়।

—অ্যাঁ? তুমি এক গাঁয়ে, তোমার জ্যাঠাইমা অন্য গাঁয়ে! সে কী গো?

—আমার জ্যাঠা যে ওখানে ঘরজামাই।

সাধু হো হো করে হেসে উঠল। —ছ্যা, ছ্যা! ঘরজামাইয়ের গলায় দড়ি। পরক্ষণে মেয়েটি রেগে যাবে ভেবে সুর বদলে বলল —তা খুকি, তোমার নাম কী?

—করুণা।

—করুণা? বল কী! তুমি করুণা?

—হ্যাঁ। করুণাই তো।

নামটা কয়েক মুহূর্ত মনে মনে রেখে সাধু বলল—করুণা, তোমরা কাদের?

—আমরা সদেগাপদের।

—ও। তা ওই ঘটিটা নিশ্চয় তোমার জ্যাঠাইমার নয়?

—আবার কার? আমি কি গুড় আনতে গিয়েছিলাম নাকি? জ্যাঠাইমা ডেকে পাঠায় বারে বারে —তাই যাই। জ্যাঠাইমার যে ছেলেপুলে নেই। আমাকে...বলে মেয়েটি ঘটিটা হাতবদল করে দম নিয়ে আবার বলল—আমাকে কত ভালবাসে। জামাকাপড় দেয়। পয়সা দেয়। যতবার যাই, একটা করে টাকা দেয়। পুজোর সময় গেলাম, এই জামাটা দিল।

সাধু বুঝতে পারল, মেয়েটির দ্বিধাসংকোচ কেটে গেছে। কিন্তু ঘটি হাতবদল করার সময় যেভাবে কনুই বেঁকে যাচ্ছে, গুড়ের ওজনটা মনে হচ্ছে ওর পক্ষে একটু বেশিই। সাধু আন্দাজ করল—আড়াই সের তো বটেই। সে বলল—ঘটিটা বইতে তোমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিশ্বাস করে আমাকে দিলেই পারতে। তারপর আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে।

করুণা মাথা দুলিয়ে বলল—অ্যাদ্দুর আনলাম কী করে? এটুকুনও পারব।

একটু চুপচাপ চলার পর সাধু বলল—মুখে ঢাকনা দেয়নি তোমার জ্যাঠাইমা। রাস্তার ধুলো পড়ছে যে।

করুণা বলল—কই ধুলো?

—করুণা?

—উঁ।

—আমি কে জিজ্ঞেস করছ না?

—যাঃ!

আহা, লজ্জার কী আছে। আমি তোমার দাদার মতো। বলো তো আমি কে, কী নাম, কোথায় বাড়ি?

—আমি জানি না।

সাধু মুখ উঁচু করে বলল—আমি সাধু। হরিণমারার সাধু।

করুণা আবার হাসতে হাসতে টলে পড়ল।

—এতে হাসির কী আছে গো?

—তুমি সাধু তো জটা কই? কমণ্ডলু কই?

সাধুও হা হা করে ঝুঁকে পড়ল হাসির চোটে। জুতো টোক্কর খেল।

—তুমি জামাইবাবু। শ্বশুরবাড়ির থেকে আসছ! কেমন? ঠিক ধরেছি না?

সাধু ঘুরে দেখল, করুণা রাঙা মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। সে বলল—ঠিক ধরেছ, করুণা।

—তোমরা বউ আনলে না সঙ্গে?

—আনব, আনব। সময় হলেই আনব। ...ইয়ে, তোমরা ক'ভাইবোন গো?

সাধুর নরম মিঠে প্রশ্ন শুনে করুণা আরও বাচাল হয়ে উঠল। বলল—আমরা তিন ভাই—আর আমি বড়। বাবার তো পেটের অসুখ। বিছানায় শুয়ে থাকে। মা কান্দী থেকে রোজ হাসপাতালের ওষুধ আনে। ছোটটা তো কোলে ঝুলতে ঝুলতে যায়। কী কাঁদে যদি দেখতে!

—তাকে তুমি কোলে নাও না?

—নিই না আবার? কিন্তু মা হাসপাতাল যাচ্ছে দেখলেই আর তুমি ওকে থামাতেই পারবে না। কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে যাবে। তখন শুধু ফ্যাঁস ফ্যাঁস করবে।

—বার বার হাতবদল করছ। দাও না বাবা আমাকে। অত ভয় কিসের? তোমার ও গুড়টুকু নিয়ে আমি কী করব বলো তো? দাও—দাও।

সাধু প্রায় জোর করেই নিল। গুড়ের গন্ধে আনমনা হল। করুণাও আর আপত্তি করল না। কিন্তু ওর পাশে পাশে অর্থাৎ ঘটির কাছ ঘেঁষে চলতে থাকল। সামনে বাঁদিকে একটা পুকুর দেখা যাচ্ছিল। তার পাড়ে ঘন ঝোপজঙ্গল। পুকুরটাও দামে ভরা। সাধু হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার মন চঞ্চল হচ্ছে। মাথাটা কেমন করছে। মুখ উঁচু করে সে দম নিল। চোখ বুজে নিজেকে ঝাঁকুনি দিল একবার। করুণা বলল—অমন করছ কেন তুমি?

—কী করছি?

—চোখ বুজে গা নাড়ছ কেন?

অবাক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সাধু শুকনো হাসল।—ও কিছু না। অভ্যেস।

—তোমাদের বাড়িতে কে আছে, বললে না তো?

—কেউ নেই।

—নেই? যাঃ! বাবা-মা নেই?

—উঁহু!

একটু চুপ করে থেকে নাক খুঁটতে খুঁটতে করুণা বলল—ভাইবোন তো আছে?

—উঁহু।

—সত্যি বলছ?

—হুঁ।

—উঁ?

করুণা অবাক হল। কথা বলছে না কেন লোকটা? সাধু তার দিকে ঘুরে শুকনো হাসল আবার। কিন্তু কিছু বলল না। করুণাও কিছু বলল না। সামনে কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। সাধু ঘুরে দেখল—পিছনে বাঁক অবধি কোন লোক নেই। তারপরই নিজেকে মনে মনে বলল—লোক নেই, তাতে তোর কী বে শালা? যাচ্ছিস—যা না। আবার এদিক-ওদিক করছিস কেন?

—শুনছ? এখানে একবার দাঁড়াও না! আমি জল খাব।

সাধু তাকাল। পুকুরের ধারে এসে গেছে। টলটলে কাল জল। বিকেল হয়ে এসেছে। রোদ ঠিকরে পড়ছে পশ্চিমের কিনারায়। চোখ ধেঁধে যাচ্ছে তাকাতে। ভাঙা-চোরা একটা আমগাছের ধারে সাধু দাঁড়াল। করুণা জল খেতে গেল। একহাঁটু জলে নেমে দুহাতে জলটা দুদিকে সরিয়ে দিতে দিতে ডানহাত তুলে সেচের ভঙ্গিতে মুখে জল ঢোকাতে থাকল সে। সাধু ক্লান্ত বোধ করছিল। গাছের গোড়ায় একটু উঁচু হয়ে থাকা মোটা শেকড়ে বসে পড়ল।

জল খেয়ে করুণা কাছে এল। বলল—কই, ওঠ।

—একটু জিরিয়ে নাও। কেমন? আমিও সিগ্রেট খেয়ে নিই।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো করুণা একটু তফাতে অন্যপাশের সরু শেকড়ে বসল। পা দুটো সে সোজা রেখে দিল। ফ্রকের নিচেটা টেনে নামাল দুই হাঁটুর মধ্যিখানে। সাধু টের পাচ্ছিল, করুণার এই কাজটা

নিছক মেয়েলি সতর্কতা। অতটুকু মেয়ে, তবু আব্রু মেনে চলার জন্যে কী সতর্কতা। কে শেখায় ওদের? ভাবতে অবাক লাগে।

সাধু আবার তাকাতে গিয়ে ওর চোখে একটা তীব্র ছটা এসে ঝিলিক দিল। সে বসে আছে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মুখ করে, করুণা বসেছে উত্তর-পশ্চিমে ঘুরে—তাই ওর কপালে সূর্যের আলো পড়েছে—সেখান থেকে ছটাটা এল। তখন মুহূর্তে চমকে উঠে সাধু আবিষ্কার করল, ওর কপালে একটা সোনার আধখানা চাঁদ—যাকে বলে টিকুরি রয়েছে। সাধুর চোখ নিষ্পলক হল। করুণার হাতে ওই বালা দুটোও কি সোনার? সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—বাঃ। তোমার কপালে ও কী পরেছ করুণা?

করুণা লজ্জায় রেঙে মুখ ঘুরিয়ে বলল— সোনাটিকুরি।

—আর হাতে?

বালা। জ্যাঠাইমা দিয়েছে! একটা হারও গড়িয়ে দেবে বলেছে। স্যাকরা আসছে না যে। অনেক টাকা ধার নিয়েছে জ্যাঠাইমার কাছে তো—তাই আসতে পারছে না। জ্যাঠাইমা বলেছে—না আসুক। ধান বেচে আসুক তোর জ্যাঠা। তখন তোকে নিয়ে কান্দী যাব। গড়িয়ে দেব।

সাধু পুকুরপাড়ে ঝোপগুলোর দিকে তাকাল। কী দেখতে গিয়ে কী দেখল যেন সে। কোত্থেকে আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল ছায়াকুটিকুটি আখের ক্ষেত, চ্যাপটা সবুজ মখমলের মতো কুকুরশুঁকোর নীল ফুলদলে শুয়ে থাকা আর এক বালিকা—হিম শরীর, নাকে আর কষায় কয়েক ফোঁটা রক্ত! সাধুর ঠোঁট কাঁপতে থাকল। চোখ বুজল ভয়ে। দম আটকে গেল। ঝাঁকুনি দিল। মুঠো শক্ত হল। শিরা ফুলে উঠল গলায়। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল।

আর তাই দেখে ভয় পেয়ে করুণা বলে উঠল—তোমার পেট ব্যথা করছে? এই লোকটা! শুনছ? তোমরা কষ্ট হচ্ছে?

সাধু মাথা জোরে দুলিয়ে চাপাগলায় বলল—না।

—তবে অমন করছ কেন তুমি?

সাধু জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চোখ খুলল। মুখটা পাণ্ডুর—যেন একফোঁটা রক্ত নেই। সে কোমরে হাত ভরে আস্তে আস্তে লাল-হলুদ মাফলারটা বের করল। একটা ফাঁসও তৈরি করে নিল। সেটা হাতে নিয়ে সে তাকাল মেয়েটির দিকে। করুণা তীক্ষ্নদৃষ্টে লক্ষ্য করছে তাকে। তার মুখে দম-আটকানো ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে পারছে না।

শুধু ফাঁসটা গলায় পরিয়ে দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান, বুকে হাঁটুর চাপ, হাত পা ছোঁড়া, কঁক্কঁক্ ঘড়ঘড় আওয়াজ, খেঁচুনি ব্যস—চিরকালের ঘুম।

—করুণা?

—উঁ?

—এটা নেবে?

করুণা কী বুঝল কে জানে, ভয়-পাওয়া অস্ফুটে বলল—না, না!

এইসময় একটা বাস ঝড়ের বেগে চলে গেল। কিছু ধুলো উড়ল। কিছু শব্দ হল। তারপর আবার নির্জনতা ছমছম করে উঠল। সাধু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল।

—করুণা!

—উঁ?

সাধু মাফলারটা দুহাতে নাচাতে থাকল। রোদ ক্রমশ লালচে হতে হতে নিভিয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে পাখিরা ঘরে ফিরছে। করুণাও ঘরে ফিরে যাবে। সবার এখন ঘরে ফেরার সময়। শুধু সাধুর কোন ঘর নেই। সাধু ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিজের গলায় মাফলারের ফাঁসটা পরাল। তার মনে হল, কোথায় যেন অপেক্ষা করে আছে হাজার হাজার ঢাকী, ঢাকের পাশে শক্ত আঙুলে ধরা চিকন-চিকন কাঠি, বেজে উঠবে গুমগুম করে। আকাশ কাঁপবে। পৃথিবী কাঁপবে। পাতাল তোলপাড় হবে। লক্ষ লক্ষ রাক্ষস দৌড়ে আসবে জীয়ন কাঠিতে ছোঁয়া লেগে। সাধুর চোখ

ফেটে জল আসছে।—করুণা!

—উঁ?

চাপাগলায় ব্যাকুল সাধু বলে উঠল—এটা ধরো। টান দাও। জোরে টানো। ভীষণ জোরে। ছাড়বে না—কিছুতে ছাড়বে না। টানো, টানো।

করুণা হাসল এতক্ষণে। এই মজার লোকটা ভারি মজার খেলা খেলতে চায় তো! সে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—যাঃ!

—লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে! টানো—একবার টানো! অনেক টাকা পাবে—টানো, টানো।

করুণা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে অবাক চোখে বলে উঠল—কী হল তোমার ওগো লোকটা! কাঁদছ কেন? কষ্ট হচ্ছে।

সাধু ঠোঁট কামড়ে মাথা দোলাল। রোদের রঙ ফুরোতে না ফুরোতে হালকা নীলচে কুয়াশা জমেছে দূরে। চারদিক ঘিরে সেই কুয়াশা আসছে সাধুর দিকে। সাধুর কপালে নাকের ডগায় চিবুকে এই দিনশেষের ঠাণ্ডাতেও ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটেছে। সে চোখ বুজল। হাঁ করে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকল। ঠোঁট কাঁপল। বিড় বিড় করে বলে উঠল—না না না না।

করুণা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ততক্ষণে। তার দুটো হাত একটু একটু করে আখের গুড়েভরা ঘটির দিকে চলে গেছে।

তারপর সাধু বিকট চেঁচিয়ে উঠেছে হঠাৎ। —অ্যাই! পালা এখান থেকে! পালা শিগ্‌গির! যাঃ চলে যা সামনে থেকে। বাঁচবি তো পালা বলছি! গেলি?

দুঃশিত ভীত মেয়েটা অবাক চোখে তার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘটির দড়ি ধরে উঠে দাঁড়াল। একপা একপা করে সে পিচের দিকে এগোল, কিন্তু চোখ থাকল লোকটার দিকে। তারপর পিচের মাঝামাঝি গিয়ে সে যেন ভারি মজা পেল, সেই প্রথম বারের মতো আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপর বুঝি ভাবল, হেসেছে বলে ক্ষ্যাপা লোকটা তাকে এবার নির্ঘাত ঢিল ছুঁড়বে—তাই সে দুহাতে ঘটিটা মাথায় বসিয়ে ধুকুর ধুকুর দৌড় দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারবন্দী মোটা মোটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে মিলিয়ে গেল তার রাঙা টুকটুকে ফ্রক, ঝকমকে মাজা পেতলের ঘটি, আর শ্যামলা দুটি ছোট ছোট আলতা-পরা পা।

সাধুর কানে হাসিটা বাজতে থাকল। কতক্ষণ ধরে বাজতে থাকল। চোখে জেগে থাকল, দুটি রাঙা পায়েব ওঠাপড়া। কতক্ষণ পরে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল সে। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠিটা সামনে শুকনো ঘাসে ফেলে তাকিয়ে রইল। আগুন গোল হয়ে এগোতে এগোতে তারপর নিভে গেল। জেগে থাকল একটা কালো বৃত্ত—বিশাল ক্ষতচিহ্নের মতো।

বুকের তলায় কি সেই ছাপ আছে সাধুর—বিশাল কালো পোড়ার দাগ? তাই কি এত যখন তখন হুহু করা জ্বালা? কিসে ঘুচবে এই জ্বালা? সাধু জানে না। বুঝতে পারে না।...

—কে? কী চাই?

—আমি সাধু।

—সাধু!

—আমি সাধু। হরিণমারার কালু মুখুজ্যের ছেলে সাধু।

—মাই গুডনেস! সীতেশবাবু! রক্ষাকরবাবু! আনোয়ার! গিরিধারী।

উঁচু বারান্দায় বুটজুতোর দুদ্দাড় আওয়াজ হতে থাকে। এদিক-ওদিক এঘর-সেঘর থেকে দৌড়ে আসে খাকী-পোশাকপরা তাগড়া তাগড়া শক্তিমান মূর্তিগুলো। বড় টেবিলের ওপাশে রিভলভারের নল উত্তেজনায় কাঁপে। টালমাটাল হতে থাকে সন্ধ্যারাতের স্তব্ধতা। —কী হল স্যার? কে ও?

—দা রেড অ্যান্ড ইয়েলো মাফলার! দেখতে পাচ্ছেন না?

চোখগুলো চমকে গিয়ে নিষ্পলক হয়। সব শরীর কাঠপুতুল—অথচ তলপেটের কাছ থেকে তীব্র

একটা কাঁপন ঝিলিক দিয়ে ওঠা। দম আটকে যায়। কালো রাতের পর্দা সরিয়ে নিজেই দেখা দিয়েছে সেই বিভীষিকা। কিন্তু এত সুন্দর যে! শান্ত মুখটা ভিজে দেখাচ্ছে—ঠোঁটে আশ্চর্য সুন্দর হাসি। কপালে কয়েকটা রেখায় বিষণ্ণতা ফুটে উটেছে। এই বিষণ্ণ সৌন্দর্যের কোন্ পাতালে ওত পেতে থাকত একটা ক্রুব কেউটে সাপ?

—এই সেই সাধুচরণ?

সাধু হাসে। —আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই সাধুচরণ। ভাল নাম শ্রীগোপীনাথ মুখুজ্যে।

আবার বিকট হাঁকডাক শুরু হয়।—রক্ষাকরবাবু! মেসেজ পাঠান এক্ষুনি। এস-পি ডি-এম সবাই অ্যাংশাস! আনোয়ার! এস. ডি. ও.-কে ফোনে জানিয়ে দাও। সীতেশবাবু! ওকে সার্চ করুন। বি ভেরি কেয়ারফুল! গিরিধারী! হুঁশিয়ার! ভবেশবাবু কই? ভবেশবাবু! কোথায় যায় লোকটা?

—আছি স্যার!

—ওর ঝোলাটা নিয়ে নিন। সীতেশবাবুকে হেল্প করুন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সাধু। পায়ের তলার মাটিটা এতদিনে শক্ত লাগে। মুখে হাসি নিয়ে সকৌতুকে লোকগুলোকে সে দেখে। তাকে পেয়ে ওরা ক্ষেপে গেল কেন, বুঝতে পারে না।

—নন্দীবাবু! লিস্ট করুন। লিখুন : ওয়ান রেড অ্যান্ড ইয়েলো মাফলার। নাম্বার টু : ওয়ান অর্ডিনারি ড্যাগার। মাপের জায়গাগুলো খালি রাখুন। পরে মেপে নেব। নাম্বার থ্রি : এ ব্যাম্বু পাইপ—ব্র্যাকেটে ফ্লুট লিখে রাখুন। নাম্বার ফোর .... ওরে বাবা! মালা স্যার। লিখুন নাম্বার ফোর : এ রেড স্টোন .... হার কী লিখব স্যার?

—ইয়ে .... নেকলেস লিখুন।

—হুঁ। এ রেড স্টোন নেকলেস। নাম্বার ফাইভ ...

সাধু বলে —আমার ফাঁসি হবে তো?

কেউ জবাব দেয় না।

সাধু জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—আমার ফাঁসি হবে না? কেন হবে না ফাঁসি?

কোন জবাব আসে না। খস খস শব্দ ওঠে পেনসিলে। কারবন পেপারটা তলার পাতায় গিয়ে ঢোকে। তাছাড়া কোন শব্দ নেই। স্তব্ধতা ছমছম করে। শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ে না যেন।

সাধু আবার বলে—হবে। তার মুখে বিশ্বাসেব ছাপ ফুটে ওঠে। সে শান্তভাবে বার বার বলে—হবে। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে।

সে শেষ কথাটা চাপা স্বরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে বলে—গভীর তৃপ্তি আর আরামে উচ্চারণ করে। মনে হয়, ওই শব্দটা দূরে চারপাশের অন্ধকারে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। বাহাদুর এসে দাঁড়িয়ে আছে কি সেখানে? ওস্তাদ বাহাদুর বলছে—শাবাশ ব্যাটা!

সাধু মুখ তোলে। —যখন আমার ফাঁসি হবে, এই হারটা ..হারটা ... পাঠিয়ে দেবেন কাঞ্চনতলার ভব মোক্তারের মেয়ের কাছে। তার নাম ঝুমুর। ঝুমুরকে বললেন, সাধু কথা রেখেছিল। ব্যস! তাহলেই সে বুঝবে। বলবেন—সাধু বলে গেছে, ঝুমুর কিন্তু কথা রাখেনি। বলবেন—সাধু বলে গেছে, সাধুর যখন আবার জন্ম হবে—তখন সে এর শোধ নেবে। বলবেন—সাধুকে ফাঁকি দিয়ে কেউ পার পায় নি। বলবেন—এজন্যেই সাধু আবার জন্ম নেবে।...

—এক মিনিট। সীতেশবাবু, নোট করুন কী বলল। আবার বলো সাধুচরণ।

সাধু গলাটা ঝেড়ে নেয়। হাসিবিহীন শক্ত মুখে আবার কথাগুলো বলতে শুরু করে। পেনসিলে খসখস শব্দ ওঠে। তারপর একটা জিপ এসে থামে। একজন সেপাই দৌড়ে এসে বলে—এস. ডি. ও. চলে এসেছেন স্যার, আসামী দেখতে। .....

মা নিষাদ

এক

বাস-রাস্তার ধারে বিশাল শিরিষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখছিলেন বার বার। বেশ ছিমছাম সপ্রতিভ চেহারা, হালকা নিটোল গড়ন। কলকাতার নিউ মার্কেট এলাকায় এমন ধরনের ফরসা প্রচণ্ড রূপসী এবং চোখে গগলস প্রচুর দেখেছি, গাড়ি থেকে নেমে যাঁরা বিদ্যাসুন্দরীয় ত্রিপদী ছন্দে কেনাকাটায় এগিয়ে যান এবং হাওয়ায় রেখে যান দুর্মূল্য সুরভি ও চোখগুলিতে সেক্স।

দেখা অবধি আমার মনে কেবল কলকাতা শহরের ওই চৌহদ্দী আর রাস্তা দোকানপাট মানুষজন ইত্যাদি ভাসছিল। কোথায় দাঁড়িয়ে এবং কেন, একটুও মনে ছিল না। সুন্দরীর চারপাশে বাতাসে একটা কড়া সুগন্ধ ভাসছিল।

আমিও বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। একটু আগে রাণীহাট থেকে এবড়ো-খেবড়ো খোয়াভরা সরু রাস্তায় দুদিকে ফাঁকা কয়েক একর জমি পেরিয়ে আসতে আসতে বীরেশ্বরের ওপর চাপা ক্ষোভটুকু মনে ছিল। বড়-রাস্তায় পৌঁছে এই ভদ্রমহিলাকে দেখার পর সেটুকু ভুলে গিয়েছিলুম।

উৎকট গরম পড়েছে। ফ্যানের বাতাসেও সারাটা রাত ভাল ঘুম হয়নি। নতুন জায়গা, তার ওপর মনে উত্তেজনা—শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে থাকব। বীরেশ্বর খুব সকালে ওঠে। সে জাগিয়ে দিয়েছিল। ....'তোমার বাসের সময় হয়ে এল। চা রেডি। মুখ ধোবার জলও রেডি। এবার উঠে পড়ো!'

বীরেশ্বর যেন আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে পারলে বেঁচে যায়। দুপুরে কিংবা বিকেলের বাসে গেলেও আমার ক্ষতি নেই। এমন কি বীরেশ্বরের বাড়ি দু-চারটে দিন কাটিয়ে গেলে তো আরও ভাল হয়। কিন্তু সে আমার মুখের কথাটাই যেন আমল দিয়ে বসল। ছেলেবেলার বন্ধুর বাড়ি এতকাল পরে গেছি। তার জোর করা উচিত ছিল। করল না।

করল না বলেই বীরেশ্বর সন্দেহভাজন হয়ে গেল আমার কাছে। ওর সম্পর্কে যা জেনেছি, তা সত্য না হয়ে যায় না। শুধু একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে, সে তো আমার কোন কথাই জানে না। তার জানা একেবারেই অসম্ভব। অথচ আমাকে অত তাড়াহুড়ো করে বিদায় দিতে ব্যস্ত হল কেন? ওর মুখ দেখে সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, ওর মনটা অন্য কোথাও ব্যস্ত রয়েছে। খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে।

এই ভদ্রমহিলা বীরেশ্বরকে ভুলিয়ে দিলেন। একসময় দূর শৈশব ও কৈশোরের কিছু সময় গ্রামেই ছিলুম। তারপর টানা বিশ বছরেরও বেশি কলকাতায় আছি। অন্যের কী হয় জানিনে, এখন গ্রামে গিয়ে পড়লে হাঁপিয়ে উঠি। সে সময় একজন শহরবাসী ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তখন কী যে স্বস্তি হয়, ভাবা যায় না।

বীরেশ্বরটা চিরকালই গোঁয়ার। তার ওপর একটানা গ্রামবাসের দরুন ও এমন আদিম হয়ে গেছে। এই সব ভেবে প্রসন্ন চিত্তে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু অচেনা মেয়েদের কাছে আগ বাড়িয়ে কথা বলা নিশ্চয় ভদ্রতাসম্মত নয়।

তাহলে ইনিই রায়বাবুদের সেজছেলের স্ত্রী! বীরেশ্বর এঁর কথাই বলছিল। ....'প্রদীপকে মনে আছে তো তোমার, রায়বাহাদুরের নাতি—সেই যে ভাল ফুটবল খেলত! সে এখন দুর্গাপুরে থাকে। কী

একখানা বউ জুটিয়েছে, দেখলে তাক লেগে যায়। ব্যাটা নিজে আসে না—বউকে পাঠায় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করতে। আসল ব্যাপারটা হল, এখনও কিছু সম্পত্তি বাগান-পুকুর এসব আছে সেজবাবুর। ছেলে কেমন উড়নচণ্ডী, বাবা তো ভাল জানে। তাই ধুরন্ধর মায়াবিনী বউটাকে দিয়ে সামলানোর চেষ্টা করে।'

বলেছিলুম, 'ধুরন্ধর মায়াবিনী—বল কী!'

'দেখলে তো তাই মনে হয়। দারুণ মেয়ে!'—বীরেশ্বর বলেছিল। 'তবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেও পারে। শুনলুম, সকালের বাসে দুর্গাপুর চলে যাচ্ছে। শিরিষতলায় তেমন কাকেও দেখলে জানবে, ইনিই তিনি!' ....বীরেশ্বর খুব হেসেছিল।

তাহলে ইনিই তিনি। কিন্তু তেমন ধুরন্ধর বলে তো মনে হচ্ছে না। একালে সচ্ছল পরিবারের বউরা যেমন দেখতে হন, তেমনি। তবে মায়াবিনী বলতে আপত্তি নেই। সুন্দরী যুবতী মাত্রই আমার মত আনাড়ি ব্যাচেলারের চোখে মায়াবিনী হতে বাধ্য, বিশেষ করে আকাশনীল ফিনফিনে নাইলন জর্জেটের তলায় যদি দেহের কিছু অংশ আভাষিত হয়।

স্থানকালপরিবেশে ভুলে যাবার পক্ষে এ ছিল যথেষ্টই। আমার চোখে দেড়শো মাইল দূরের শহর কলকাতার এক সুরম্য এলাকা ভাসছিল। এই নির্জন খাঁ খাঁ রাস্তা, গাছপালার ছায়া, ধূ ধূ শস্যশূন্য মাঠ আর গ্রাম মন থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙল ভদ্রমহিলার কথায়।

'কিছু মনে করবেন না! প্লিজ, আপনার টাইমটা কত দেখুন তো?'

বিগলিত হয়ে ঘড়ি দেখে বললাম, 'জাস্ট সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'দেখছেন কী কাণ্ড! বাসটা এখনও এল না। সাতটা ত্রিশে পৌঁছনোর কথা এখানে।'

'সাতটা ত্রিশ! না, আটটা?'....আমি চমকে উঠলুম বীরেশ্বর কি ভুল সময় বলল তাহলে?

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। ...'আপনি কোন্‌দিকে যাবেন, বলুন তো?'

'বহরমপুর। আপনি....' বলেই মনে পড়ে গেল, ইনি তো যাবেন দুর্গাপুর, প্রদীপের স্ত্রী ইনি। প্রদীপ—অস্পষ্ট চেহারাটা মনে আছে। কত বছর দেখিনি ওকে।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আপনার উল্টোদিকে। দুর্গাপুর। আপনার বাস নিশ্চয় লেট করবে না। আমারটা প্রায়ই এমন করে।' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনি বুঝি প্রায় আসেন এখানে?'

'হ্যাঁ। আসতে হয়।' .... জবাবটা কেমন অন্যমনস্ক শোনাল।

'কিছু মনে করবেন না। এখানে রায়বাবুদের বাড়ির প্রদীপ নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় পরিচয় ছিল। শুনলুম, সে দুর্গাপুরে থাকে এখন। আপনি কি ...'

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। .... 'হ্যাঁ, আমি—মানে প্রদীপ আমার স্বামী। আপনি ওকে চেনেন?'

আমি খুশি হয়ে বললুম, 'খুব চিনি। বললুম না—ছেলেবেলায় আমার বন্ধুই ছিল বলতে পারেন। তবে প্রায় বিশ বছরেরও বেশি আর দুজনে দেখা হয়নি। কেমন আছে ও? ওকে আমার কথা বলবেন।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'এখন কলকাতায়। এক সময় আমাদের বাড়ি অঞ্চলেই ছিল। ওই যে দূরে যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে—শিমুলিয়া, ওখানেই। পড়তুম এই রাণীহাট হাইস্কুলে। তারপর বাবা কলকাতা চলে গেলেন। তারপর থেকে সেখানেই।'

প্রদীপের স্ত্রী খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনছিল যেন। এবার ঘুরে দাঁড়াল। কালো চশমার ভিতর ওর চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল না। ভুরুর সামান্য কুঞ্চন দেখলুম। ....'কী করতেন আপনার বাবা?'

'ডাক্তারি।'

'তাই বুঝি! আপনি কী করেন?'

'একটা কোম্পানিতে ছোটখাটো চাকরি করি।'

'কেন? .... আবার একটু হাসল প্রদীপের স্ত্রী। .... আপনি ডাক্তার হতে পারলেন না?'

'পারলুম কই?' বলে আমি জোরে হেসে সিগ্রেট ধরালুম।

'এখানে কোথায় এসেছিলেন?'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'মানে—হঠাৎ একবার জন্মভূমি দেখার ইচ্ছে হল, তাছাড়া আর কী বলব? রাণীহাটে আমার বন্ধুবান্ধব সহপাঠীও আছে দুচারজন। দেখা করে গেলুম। আবার কখনো আসব কি না, ঠিক তো নেই। আপনি কিন্তু আপনার মিস্টারকে বলবেন আমার কথা।'

প্রদীপের স্ত্রী দূরের দিকে বাসের খোঁজে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি কিন্তু আপনার নামটা এখনও বলেননি। আপনার বন্ধুকে কীভাবে বলব?'

'আমার নাম আনোয়ার চৌধুরী।'

'আচ্ছা!' বলে যেন একটু অবাক হয়ে দু মিনিট চুপচাপ আমাকে দেখতে লাগল প্রদীপের স্ত্রী।

ভাবলুম, সম্ভবত আমার মুসলমান নামটার জন্যে ও একটু চমক খেয়েছে। এমন হতে আমি বরাবর দেখেছি। আসলে হয়েছে কী, শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর মুসলমান এত কম দেখতে পান হিন্দুরা, বিশেষ করে হিন্দু মেয়েরা তো তাও পান না,—আমি দেখেছি, আমার পরিচয় দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু চমকের সৃষ্টি করে ফেলি।

'আপনি কি অবাক হলেন?' না বলে থাকতে পারলুম না।

প্রদীপের স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হল যেন। ...'না, না। তা কেন?'

হাসতে হাসতে বললুম, 'এক ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন—আপনাকে মুসলমান বলে চেনাই যায় না!'

'চেহারা দেখে কারও কিছু জানা যায় না।'...হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল ওর মুখভঙ্গি! ...'ওটা নিজেদের দুর্বলতা।'

হয়তো আমার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছে প্রদীপের সুশিক্ষিত মডার্ন বউ—এই ভেবে ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি আমার ছেলেবেলার বন্ধুর স্ত্রী। ও একটু রসিকতা করলুম মাত্র।'

দূরের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'এবার বাসটা আসছে। ইস্, এত লেট করে!'

'প্লিজ, প্রদীপের ঠিকানাটা দেবেন?'

'লিখে নিন।'

পকেট থেকে কাগজ বের করে আঁকাবাঁকা হরফে ঠিকানাটা লিখে নিলুম।

'আপনার কলকাতার ঠিকানাটাও লিখে দিন না। ও খুশি হবে।'

লিখে দিলুম। চিরকুটটা ভ্যানিটিব্যাগে ভরে নিয়ে প্রদীপের বউ রাস্তায় উঠে গেল। বাসটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। সাতটা পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেছে। এখনও পনেরো মিনিট কিংবা তারও বেশি আমাকে একা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মহিলাটির সঙ্গে বেশ সময় কেটে যাচ্ছিল। প্রদীপ চমৎকার বউ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কেমন যেন স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মত ভাবভঙ্গি কথাবার্তা—ব্যক্তিত্বটাও দারুণ। তাহলেও কী যেন আছে, কী যেন টানে—খুব ভিতর দিক থেকে টানে।

বাসটা এসে দাঁড়িয়ে গেল। ওঠবার আগে আমার দিকে একটু হাসল প্রদীপের বউ। ...'ক'দিন আছেন এখানে? শিমুলিয়া, না বহরমপুরে থাকছেন?

'কিছু ঠিক নেই।'

'আচ্ছা, চলি। নমস্কার।'

'নমস্কার। প্রদীপকে বলবেন।'

'নিশ্চয় বলব। ঠিকানা নিলুম কেন?'

'কলকাতা গেলে অবশ্যই....'

বাসের ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় মেরে বিকট চেঁচিয়ে উঠল—'ঠিক আছে, ঠিক আছে!'

বাসটা চলতে লাগল। জানালায় প্রদীপের বউয়ের মুখ দেখা গেল। ঠোঁটে হাসি। মায়াবিনী! বীরেশ্বর ঠিকই বলেছিল।....

বাসটা চলে গেলেও সেই সুগন্ধটা থেকে গেল। প্রদীপের বউয়ের কথাগুলোও আমার মাথা থেকে গেল না। শিরিষ গাছের ছায়ায় সকালবেলার হালকা বাতাস বইছে। সামনে বিশাল রুক্ষ মাঠে রেশমি রোদ্দুর সোনালী চিকণ আভা ছড়াচ্ছে। কাছাকাছি কোথাও কোন লোক নেই। এই নির্জনতা আর নৈঃশব্দ্য আমাকে বোবা ও কালা করে ফেলছিল। অন্য কাবো কী হয় জানিনে, পাড়াগাঁয়ে গেলেই আমার এটা হয়—যেন একটা সাউন্ডপ্রুফ বন্ধ ঘরে ঢুকে গেছি। হয়তো সারাক্ষণ নানারকম শব্দ আব কোলাহল শুনতে অভ্যস্ত কানের পক্ষে ওই রকম স্তব্ধতা খুব গভীর একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে সেখানটা মোটেও স্তব্ধ ছিল না বা থাকে না। বাতাসের শব্দ, পাখি আব পোকামাকড়ের, জীবজন্তুর ডাক, কখনও মানুষের কণ্ঠস্বব থাকে। এগুলো অবশ্য প্রকৃতিরই নিজস্ব ভাষার মত।

আসলে হয় কী, খোলামেলা বিশাল আকাশ ও বিস্তৃত জায়গার পক্ষে ওইসব শব্দ এত কম বলেই আমার মত বহিরাগতের কাছে তা দারুণ স্তব্ধতা ছাড়া কিছু নয়।

প্রদীপের বউ চলে গেলে এই স্তব্ধতাটা আমাকে কামড়ে ধরল চারদিক থেকে। খুব অকাবণে নিজের জীবনটা ব্যর্থ লাগল। প্রদীপ—রায়বাবুদেব সেই গোলগাল ভোম্বলমার্কা নাকমোটা ছেলেটি কুড়ি বছর যেতে না যেতে এমন একটা আশ্চর্য বউ জুটিয়ে ফেলেছে! আমি দেখেছি, কোন কোন মেয়ে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ভীষণ চেনা হয়ে ওঠে এবং মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। খুব আপন মনে হয় এদের। ওর প্রত্যেকটি কথা আমার কানে বাজতে লাগল। চেহাবাব হিন্দুত্ব-মুসলমানত্ব নিয়ে খোঁচা-মারা কথাটা বলা আমার উচিত ছিল না। তবে ও চমকে উঠেছিল নাম শুনে, এটা ঠিকই। 'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না'...সে তো ঠিকই। আমার চেহারায় যেমন মুসলমানত্ব বলে কিছু নেই, তেমনি অমার চাকরির পরিচয়ও তো ছাপা নেই। সেটা, অর্থাৎ যাকে বলে 'আইডেনটিটি কার্ড', আমার ভিতর পকেটে সাবধানে রাখা আছে। আমার এই ভদ্র ভব্য মুখের ওপরতলায় ঘিলু নামক ধূসর রংয়েব জিনিসে কী মারাত্মক ষড়যন্ত্র সীল করে রাখা হয়েছে, এবং এই মুখোশটা দেওয়া হয়েছে—বাইরে তার কোন চিহ্ন পাবারও উপায় নেই।

আমার এই মুখোশে বড় বড় হবফে লেখা আছে : দিস ইজ টু সারটিফাই দ্যাট শ্রী আনোয়ারুল চৌধুরী বিশ বছর পরে তার জন্মভূমি দেখতে যাচ্ছে। সে এই এলাকায় তার একসময়ের চেনা লোক এবং বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবে। তাদের কারো-কারো বাড়ি সুযোগ পেলে রাত্রিবাসও করবে। সে ক'দিন থাকবে কোন ঠিক নেই। একটা লম্বা ছুটি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেবেলার স্মৃতি তাকে কতদিন ধরে উত্ত্যক্ত করছিল। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত এই চৌত্রিশ বছর বয়সের অবিবাহিত যুবকটির কাছে তার জন্মভূমির মাটি আকাশনিসর্গ এখন পবিত্র তীর্থের সান্ত্বনা। নগর-জীবনের জটিলতা ও জ্বালা, এবং সাম্প্রতিক অবক্ষয়, অন্ধকার ও পচনশীলতা থেকে পালিয়ে সে কয়েকটি দিন এখানে সুখ-স্বস্তি চায়।....

বীরেশ্বর এগুলো সম্পর্কে বলছিল, 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস...তাই! তুমি এখনও সেইরকম আছ আনোয়ার, একটুও বদলাও নি।'

'কী রকম শুনি?'

'সেই উদাস-উদাস কবিটাইপ। ... হুঁ কথাটা হল—জ্বালা এখানে প্রচণ্ড। দেখ, এসেছ যখন, কিছু সুখ-শান্তি এখানে পাও নাকি। তবে আমার অবাক লাগছে।'

'কেন?'

'এটা বেড়ানোর সময় নয়। প্রচণ্ড খরা। আগুনের হল্কা বইছে সারাদিন। আর এ এলাকার খরার আবহাওয়া তো তোমার জানা!'

'বললুম তো। ছুটিটা হঠাৎ পেয়ে গেলুম—তাই।'

বীরেশ্বর খুক-খুক করে একটু হেসেছিল। সওয়া ছ ফুট উঁচু প্রকাণ্ড মানুষ বীরেশ্বর। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই লোহার রড দুমড়ে দিত এক দমকে। এখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। এখন আর ওসব নেশা নেই। বাইশ বছর বয়সে একজনকে প্রচণ্ড মাব দিয়েছিল কী কারণে। মামলা চলতে চলতে লোকটা

হঠাৎ মারা যায়। বীরেশ্বরের তিনবছর সশ্রম জেল হয়। হঠাৎ সে জেলের পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসে। দুমাস পরে ধরা পড়ে। তখন আরও সাত বছর তাকে জেলে কাটাতে হয়। ফিরে এসে সে কিছুদিন পল্লীসমিতি ইত্যাদি করছিল। গ্রামের উন্নতিমূলক কাজকর্মে মন দিয়েছিল। হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে সব ছেড়ে রাজনীতিতে ঢুকল। তারপর সে আবার দুর্দান্ত মানুষ হয়ে উঠল। তার এবারের পরিচয় সম্পূর্ণ অন্যরকম।

মাত্র একটা বিকেল আর একটা রাত বীরেশ্বরকে বুঝে ওঠার পক্ষে কিছুই নয়। ওর সম্পর্কে যে পাতার পর পাতা খুঁটিনাটি তথ্য—যাকে বলে ডেট বাই ডেট, আমাকে দেখানো হয়েছে—সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা আমি করিনি। এখনও সময় আর সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি। আবার আমাকে যেতে হবে বীরেশ্বরের কাছে।....

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। বীরেশ্বরের দিকে সরে গিয়েছিল মন—অনিবার্যভাবে। আবার খেই ধরে ফিরে এলুম। .... 'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না।' ...হঠাৎ আমার মাথায় খুব ভিতর দিকে একটা ঠাণ্ডা সাপ চলে গেল যেন। চমকে উঠলুম।

মাই গুডনেস! আজ বিশবছর পরে যার জন্যে এখানে ফিরে এসেছি, চেহারা দেখে কি তাকে চিনতে পারব? চেহারা দেখে তো কারো কিছু জানা যায় না! প্রদীপের বউ কথাটা ঠিকই বলে গেল। কিন্তু 'জানা যায় না' বলল কেন? 'চেনা যায় না' বললেই স্বাভাবিক হত না কি?

দুর্গম স্মৃতির ভিতর একটা আবছা মুখ ভেসে উঠল। বছর ন'দশ বয়সের একটি মুসলিম চাষীপরিবারের মেয়ে। একটু ফরসা রং হয়তো। নাকের সিকনি মুছতে জানে না। খালি গা, কোমরে একফালি ন্যাকড়া পেঁচানো। ওই বয়সেই স্তনের বোঁটাটা বেশ-প্রসারিত ও লালচে হয়ে উঠেছে। মাথা-ভর্তি ঝাঁকড়-মাকড় লালচে চুল। সকালে তাকে দেখেছি আমার মায়ের দেওয়া পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া ব্লাউজটা গায়ে জড়িয়ে মসজিদে মৌলবীর কাছে পড়তে যাচ্ছে। দুপুরে দেখেছি শিমুলতলার বাঁজাডাঙায় ছাগল চরাচ্ছে খালি গায়ে। ওর বাবা ছিল ভীষণ গরিব। আমাদেরই কিছু জমি একসময় ভাগচাষে করত-টরত। পরে ছেড়ে দিয়েছিল। বাবা বলতেন, ইরফানের যক্ষ্মা হয়েছে। বাবার চিকিৎসায় কোন ফল হয়নি। আমরা থাকতে থাকতেই মারা গিয়েছিল লোকটা। তখন বাড়ি বাড়ি ধান ভেনে বা টুকিটাকি কাজকর্ম করে ওর বউ পেট চালায়। মেয়ে মাঠে ছাগল চরায়। আমার একটা অদ্ভুত মমতা ছিল মেয়েটির সম্পর্কে।

আমাদের কলকাতা চলে আসার আগের বছর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমার মামাবাড়ি আত্রাইনগর শিমুলিয়া থেকে দশমাইল দূরে। সেখানে পৌষে দাদাপীরের মেলা বসে। মেলায় সেই প্রথম সিনেমা দেখলাম। ছবিটার নাম ছিল 'লায়লা-মজনু'। তেরো বছর বয়সের একটি ছেলের মনে আশ্চর্য একটা বোধের জন্ম হল।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, দশমাইল পথ কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়িটা আসছে। উদাসীন অন্যমনস্ক আমি পিছনে হেঁটে আসছি। আমার মন জুড়ে লায়লা, আমার চোখে পাড়াগাঁয়ের আকাশ আর মাঠ আরবের শহর হয়ে উঠেছে। সেই কচিকাঁচা বয়সে ওই দশমাইল রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে আমি ইরফান শেখের মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছিলুম।

কারণ, ওর নামও ছিল তাই। লায়লাটা অবশ্য একটু তাচ্ছিল্যমেলা আদরে লাইলি বা লাইলি হয়ে উঠেছিল—এই যা। যদ্দুর মনে পড়ে, ওর এ নামটা দিয়েছিলেন সেই মৌলবীসায়েব। খুঁড়িয়ে চলতেন বলে সবাই তাকে বলত খোঁড়া মৌলবী। রাণীহাট হাইস্কুলে উনি আরবী শিক্ষক ছিলেন। থাকতেন শিমুলিয়ার মসজিদে। সকাল-সন্ধ্যা চাষী ছেলে-মেয়েদের আরবী আর বাংলা বর্ণবোধ পড়াতেন। পালা করে সবাই ওঁর খাওয়া যোগাত। ঘোড়ায় চেপে খোঁড়া মৌলবী স্কুল যাওয়া-আসা করতেন। ওঁর ঘোড়াটা আমাদের হাতে পড়ে কী দুর্গতিই না সইত।

লাইলিকে অমি ভালবেসে ফেলেছিলুম 'লায়লা-মজনু' সিনেমাটা দেখার পর থেকে। ওই গরিব ছাগলচরানী মেয়েটি আমার চোখে ছিল আরবের ধনী সওদাগরকন্যা। তারপর কত ছলে ওর সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করেছি। পীরের মাজারে কত নির্জন দুপুর...কাঠমল্লিকার গন্ধে ভরা গ্রীষ্মকাল ...দু-চারটে

অকারণ উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা। ... অবশ্য পরে একদিন সবটাই হাস্যকর লাগত। কলকাতায় গিয়ে যখনই লাইলির কথা ভেবেছি, নিজের দীনতার প্রতি লজ্জা জেগেছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কী বোকা! কত সুন্দর আশ্চর্য সব মেয়ে এখানে—শিমুলিয়ার লাইলি যেন আমার ভালবাসা ও সৌন্দর্যবোধের পক্ষে দারুণ দীনতার প্রতীক। তাকে মনে পড়লে লজ্জা পেতুম বলেই তার স্মৃতিটা জোর করে মনের তলায় গভীর অন্ধকারে অনাদরে ছুড়ে ফেলেছিলুম।

আজ বিশবছর পরে সেই লাইলির জন্যেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে—এই একটা অদ্ভুত যোগাযোগ।

রাণীহাটে বীরেশ্বরের কাছে এসেছিলুম ওই একই উদ্দেশ্যে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে আপাতত। কিন্তু একটা গভীর ছটফটানি চলছে ভিতরে সারাক্ষণ। বিশবছর পরে লাইলির চেহারা এখন কেমন হয়েছে? তাকে দেখলে চিনতে পারব তো? প্রদীপের বউ বলে গেল, 'চেহারা দেখে কারো কিছু জানা যায় না।' উঁহু—হয়তো সেটা ঠিক নয়। বীরেশ্বরের চেহারায় তো ওর দুর্দান্ত স্বভাবের ছাপ স্পষ্ট দেখে এলুম। লাইলির চেহারায় কিছু ছাপ না থেকে পারে না।

ঘড়ি দেখলুম, কখন আটটা বেজে গেছে। এ বাসটাও লেট করছে। অন্যভাবেও যাওয়া যেত। রাণীহাটে একটা জিপ গেছে—গত রাতে যাবার কথা। ধুলোয় চাকার দাগও দেখে এলুম। জিপটা ইরিগেশানের। কী একটা এনকোয়ারিতে আসবে—এই মত কথা আছে। যদি সব ঠিক ঠিক ঘটে যেত, আমার ওই জিপে বহরমপুর যেতে বাধা ছিল না। কিন্তু সব ব্যর্থ। অতএব আমাকে বাসেই ফিরতে হবে।

অবশ্য এখনও কোথাও কোন লোক নেই। জিপটা এসে পড়লে টুপ করে উঠে পিছনে বসে পড়তুম। কেউ দেখত না। কিংবা দেখলেও ভাবত, ভদ্রলোক একটা লিফ্‌ট ম্যানেজ করলেন। জানিনে, তাতে কোন ধুরন্ধর লোকের সন্দেহ হত কি না।

কিন্তু এবার ক্রমশ অসহ্য লাগছে। রাতে ঘুম হয়নি উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায়। চোখ জ্বালা করছে। গগলসে ঘাম জমে যাচ্ছে।

একটা চাপা গুর গুর শব্দ শুনলুম পিছনে। ঘুরে দেখি, রাণীহাট থেকে জিপটা ধুলো উড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। ওই লব্‌ঝড় রাস্তায় অত জোরে আসছে কেন? একটু অবাক হলুম।

বড় রাস্তায় এসে আমার সামনেই ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল জিপটা। গাদাগাদি ছ'জন বসে আছে। সামনের সিটে দুজন। মুখার্জী প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই যে স্যার কতক্ষণ?'....সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল ব্যস্তভাবে।

একটু হেসে বললুম, 'আধঘণ্টা প্রায়। নো চান্স!'

'কেন বাস যায়নি?'

'একটা গেল—মিনিট পনেরো আগে। আপে।'

'কেউ চাপল দেখলেন?'

'হ্যাঁ—এক ভদ্রমহিলা।'

মুখার্জী একলাফে নেমে দাঁড়াল। 'নীল শাড়ি, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, চোখে গগলস?'

'হ্যাঁ। কেন? আমার সঙ্গে পরিচয় হল ভদ্রমহিলার। এখানে রায়বাবুরা আছেন, তাঁদের বাড়ির বউ। প্রদীপ নামে আমার এক বাল্যবন্ধু ছিল—এখন দুর্গাপারে থাকে। তারই স্ত্রী। ঠিকানা দিয়ে গেলেন।'

জিপ থেকে দত্ত বলল, 'মুখার্জী, চলে এস। ধরে ফেলব—ওনলি ফিফটিন মিনিটস। বাবুগঞ্জের আগেই ধরে ফেলব। আপনি আসবেন, স্যার?'

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম, 'কী ব্যাপার?'

মুখার্জী একলাফে গাড়িতে উঠে বলল, 'চলে আসুন, স্যার। আপনার প্রদীপবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আবার দেখা হবে।'... সে হো হো করে হেসে উঠল।

পা বাড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কী হয়েছে কী, বলবেন তো মিঃ মুখার্জী?'

মুখার্জী একটু ঝুঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ওই দেখুন—প্রদীপবাবুর রিয়েল স্ত্রী ওই পুকুরের

পাড়ে—জেলে দিয়ে মাছ ধরাচ্ছেন। বেচে টাকাকড়ি নিয়ে দুর্গাপুরে চলে যাবেন ইন টাইম।'

একটু সরে জায়গা দিল সে। আমি এক মোটাসোটা ভদ্রমহিলাকে অদূরে পুকুরপাড়ে জেলেদের তম্বি করতে দেখলুম। পলকে আমার মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। 'তাহলে যাকে দেখলুম সে কে?' ... বলে মুখার্জীর পাশে কলের পুতুলের মত উঠে বসলুম।

মুখার্জী একটু হেসে জবাব দিল, 'লাইলি খাতুন।'

লাইলি খাতুন! এখনও আমার নাকের ভিতর সেই খর সুগন্ধ মোছেনি।

বীরেশ্বর আমাকে ঠকাল। ওর চতুরতার সত্যি কোন সীমা নেই। গোপনীয় নথির পাতায় আমি যা পড়ে এসেছি, তা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। এখন দেখছি আমি ভুল করেছি।

আর লাইলি খাতুন সম্পর্কে যা রেকর্ড তা তো আমি একটুও বিশ্বাস করিনি। সম্ভবত এ রিপোর্ট পাওয়া গেছে এমন লোকের কাছে, যে কিংবা যারা মেয়েটির প্রতি কোন কারণে ক্ষুব্ধ এবং বিদ্বেষপরায়ণ। লালবাজার হেডকোয়ার্টার্সের সেই নির্জন ঘরে বসে নথিগুলো পড়তে পড়তে আমার চোখে ভেসেছিল একটি সুন্দরী পাড়াগেঁয়ে যুবতী। মাথার ওপর হয়তো কেউ নেই। হয়তো নানা কারণে একটু চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তার ফলেও নানা ব্যাপারে একটু-আধটু জড়িয়ে থাকবে। তাছাড়া যদ্দূর মনে আছে, মেয়েটি একটু জেদী টাইপের ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় জানি, এ ধরনের মেয়েরা স্বভাবত স্বৈরিণী হয় এবং অনেক পুরুষকে সঙ্গ দেয়, পাত্তা দেয় না। তাই তাদের ওপর অনেকের ভীষণ রাগ থাকে। লাইলি সংক্রান্ত রেকর্ড সেই রাগেরই প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনি।

ফাইল বুজিয়ে রেখে আমি হেসেছি আর সিগ্রেটের ধুঁয়োর মধ্যে লাইলিকে দেখবার চেষ্টা করেছি। বার বার সেই ছাগলচরানী বালিকাকেই দেখতে পেয়েছি। ফাইলের ওপর ক্যাপিটাল হরফে লেখা আছে : লাইলি খাতুন। বাবার নাম : মৃত ইরফান শেখ। পেশা : চাষবাস। গ্রাম : শিমুলিয়া, পো : রাণীহাট, থানা : বাবুগঞ্জ ইত্যাদি। তারপর খুঁটিনাটি তারিখ ও সময় দিয়ে লেখা বিচিত্র কিছু ঘটনা। এইসব গোপনীয় ফাইল জেলার সদর থেকে পাঠানো হয়েছিল। পিনে আটকানো একটুকরো কাগজে নোট ছিল : এ স্পেসাল কেস ফর ভেরি আর্জেন্ট অ্যান্ড ইমিডিয়েট অ্যাকশান অ্যান্ড স্ট্রংলি রেকমেনডেড বাই অনারেবল মিনিস্টার ... অতটুকু কাগজটায় আরো অজস্র ক্ষুদে নোট ছিল। শেষ তারিখটা দিয়ে সই করেছেন এ. সি. ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। সংক্ষিপ্ত নির্দেশ তাঁর : শ্রী এ চৌধুরী, স্পিক অ্যাট ওয়ান্স।

এ. সি. অরিন্দম ত্রিবেদী ওই জেলারই লোক। ফাইল দুটো পড়া শেষ করে তাঁর ঘরে যেতেই হেসে বলেছিলেন, 'পড়া হয়েছে? বসুন।'

আমার মাথার ভিতর থেকে ঘোরলাগা ভাবটা তখনও যায়নি। বসে বললুম, 'হ্যাঁ, পড়লুম। কিন্তু আমার ধারণা, কোথাও কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে।'

মিটিমিটি চেয়ে হাসছিলেন মিঃ ত্রিবেদী। ... 'যেমন?'

'যেমন এই লাইলি খাতুনের ফাইলটা। আমি তো ভীষণ চিনতুম ওকে। একই পাড়ায় বাড়ি ছিল' ... লাইলি সম্পর্কে আমার যা কিছু বাল্যস্মৃতি অকপটে বলেছিলুম।

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগ্রেট দিয়ে বলেছিলেন, 'সেই জন্যই দি কেস ইজ নাউ ভেরি প্রপারলি অ্যাট ইওর ডিসপোজাল চৌধুরী। আপনার বাড়ি শিমুলিয়া ছিল, তা জানতুম। তবে যা বললেন লাইলি খাতুন সম্পর্কে, আমি জানতুমও না—ভাবিও নি! নাউ, আই কনসিডার ইট এ গ্র্যান্ড লাক। এ একটা আশাতীত যোগাযোগই বলব। উইশ ইউ এ গ্র্যান্ড সাকসেস। ওখানে লোকাল থানা তো বটেই, জেলার সব থানা আর ইনটেলিজেন্সের লোকজন আপনাকে সবসময় সাহায্য করবে। তাছাড়া রাণীহাট এলাকায় আমাদের ইনফরমার আছে কিছু—' বলে একটু ভেবে নিয়েছিলেন।....'নো। সেটা আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ইনফরমারদের আপনার পরিচয় জানানো ঠিক নয়। আফটার অল, দে আর লোকাল পিপল অ্যান্ড মে বি ইন্টারেস্টেড আদারওয়াইজ। ঠিক আছে। আপনি যান।'

সব আয়োজন সম্পূর্ণ হলে মিঃ ত্রিবেদী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'কিন্তু দেখবেন মশাই, আপনাকে আবার নস্টালজিয়ায় পেয়ে না বসে। আপনার বাল্যপ্রিয়া লাইলি খাতুনও এদিকে নাকি দেখতে টেখতে এমন, মুণ্ডু ঘুরিয়ে না দ্যায়। বি ভেরি—ভেরি কেয়ারফুল ইয়ংম্যান।'

'স্যার, ওর কোন ফটো নেই?'

'না। অদৃশ্য মায়াবিনীর কোন ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

'বীরেশ্বর ব্যানার্জিকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না কেন?'

'কী দেখলেন ফাইলে? অপনি ভারি অন্যমনস্ক, চৌধুরী।'

এ. সি. ঠিকই বলেছিলেন। নথিগুলো আমি আদৌ মন দিয়ে পড়িনি। আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। হিজিবিজি কার্বন কপির ওপর নিরন্তব ভেসে থাকছিল আমার ছেলেবেলাটা—দুর্লভ হারানো সেই অতীতকাল, যখন একে একে জীবনের চোখ ফোটে, একটি করে কামনা-বাসনা সুগন্ধ ছড়ায় নিজের চারপাশে। ...'পড়েছি স্যার। কিন্তু তেমন কিছু ....'

'উঁহু। ইউ রিড ইট এগেন অ্যান্ড এগেন। মাই অর্ডার, চৌধুরী।'

'আবার পড়ছি স্যার।'

'বীরেশ্বর ব্যানার্জির বিরুদ্ধে কোন কংক্রিট চার্জ আনা যাচ্ছে না। অথচ আমরা জানি সে কী করছে না-করছে।'

'লাইলি খাতুনের বিরুদ্ধে কংক্রিট চার্জগুলো কী?'

হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন মিঃ ত্রিবেদী। ...'আপনি মশাই এ লাইনে এসে জুটেছিলেন কেন, আমি ভেবেই পাইনে। ছদ্মনামে পদ্য-টদ্য লেখেন না তো?'

সেই সময় গোয়েন্দা বিভাগের এক ইন্সপেক্টর বারীন রুদ্র—সবার প্রিয় বারীনদা, ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'কী হল স্যার? আনোয়ার কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে কেন?'...

মিঃ ত্রিবেদীর কাছে সব শুনে বারীনদা বলেছিলেন, 'সে যাই হোক, আনোয়ার ইজ দা রাইট ম্যান, স্যার। দেখতে মুখচোরা মিনমিনেটি হলে কী হবে। গত অগাস্টে মিসেস রমলা ওরফে সুলতানা বেগমের কেসটা কী দুর্দান্তভাবে ট্যাকল্ করল। উঃ, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, স্যার! একটা মারাত্মক স্পাই-রিং কীভাবে গুঁড়ো হয়ে গেল। যাই বলুন, আনোয়ার বাঘা-বাঘা সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম জমাতে ওস্তাদ, এ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে স্যার। ভাবা যায়? অমন দুঁদে মেয়ে ওর প্রেমে এমন হাবুডুবু খেতে লাগল যে ...গুড গড। আমাকে এক্ষুনি শ্যামবাজার যেতে হবে যে! সর্বনাশ!' ..... স্যালুট ঠুকে বারীনদা চলে গিয়েছিলেন।

মিঃ ত্রিবেদী বলেছিলেন, 'তাহলে চৌধুরী, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

'ইয়েস স্যার।'

'মনে রাখবেন শুধু, লাইলি খাতুন আর সেই স্পাই মহিলা সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের। লাইলি খাতুন আফটার অল গ্রামের মেয়ে—বিশেষ করে ব্যাকওয়ার্ড মুসলিম চাষী পরিবারের মেয়ে—তেমন কিছু লেখাপড়া মোটেও জানে না। কাজেই তাকে ভদ্রমহিলা ভেবে বসবেন না। পোশাক-টোশাকে তাকে ভদ্রমহিলা বলে ভুল হতে পারে অবশ্য। তবে আপনার চোখে ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ পল্লীর মেয়েরাও তো ভদ্রমহিলা সেজে ভিড়ে ঘোরে। তাদের সহজেই চেনা যায়। এই লাইলি খাতুনকেও চেনা যাবে। তাই না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আপনি যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছেন চৌধুরী?'

'না স্যার। হঠাৎ মাথাটা ধরেছে যেন।'

'ট্যাবলেট খেয়ে ফেলুন। আজ রাতের গাড়িতে যাচ্ছেন তো?'

'তাই যাব।'

'অলরাইট। উইশ ইউ গুড লাক্।'

করমর্দন করে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ এ. সি. বলেছিলেন, 'একটা কথা চৌধুরী। লাইলি খাতুনের

কাছে কখনো নিরস্ত্র হয়ে যাবেন না। নেভার। আর, দেখুন—নথিগুলো দেখতে দেখতে আমার কেমন যেন মনে হয়েছে, দ্যাট বীরেশ্বর ব্যানার্জির সঙ্গে মেয়েটির কোন ইমোশনাল সম্পর্ক আছে।'

চমকে উঠেছিলুম। একটা অশিক্ষিতা খুনে মেয়ের সঙ্গে বীরেশ্বরের প্রেম! তাছাড়া একজন মুসলমান, অন্যজন হিন্দু ...

বাইরে বেরিয়ে মনে হয়েছিল, কী ভাবছি! অপরাধীদের যেমন জাতবিচার ধর্মবিচার নেই, তেমনি প্রেমেরও তো তাই।

অনেক পরে যখন ট্রেনে চেপে বসেছি, তখন টের পেয়ে গেলুম—আমি ঈর্ষান্বিত। ভিতরে একটা ছটফটানি চলেছে। রাগে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রাগটা বীরেশ্বরের প্রতি—নাকি লাইলি খাতুনের প্রতি, ঠিক করতে পারছিলুম না।

সেই সময় মনে পড়েছিল, আগের দিন ডিপার্টমেন্টাল কনফারেন্সে একজন সকৌতুকে বলেছিলেন, 'চৌধুরী আবার জড়িয়ে না যায় উল্টোপাকে। ওর পক্ষে ইমোশনাল ইনভলভমেন্ট খুবই স্বাভাবিক। একে বাল্যসঙ্গিনী, তার ওপর অমন প্রেমানুষঙ্গিক নাম—লাইলি'..

জিপে যেতে যেতে বার বার গা শিউরে উঠেছে আমার। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। তাহলে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে আমার আকস্মিক আর অবিশ্বাস্যভাবে কেটে গেছে লাইলির সঙ্গে! সেই লাইলি! তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি, তাকে দেখেছি খুঁটিয়ে—অথচ একটুও চিনতে পারিনি! এতক্ষণে আমার পরিচয় শুনে তার চমকে ওঠার মানে স্পষ্ট হল। সে আমাকে প্রথমে চিনতে পারেনি—

উঁহু, বীরেশ্বর নিশ্চয় তাকে আমার কথা বলেছে। ওটা লাইলির চালাকি। কিন্তু বীরেশ্বর বা সে দুজনের কেউই তো আমার অন্য পরিচয় জানে না। তাহলে লাইলি নিজের পরিচয় দিল না কেন? আনোয়ার চৌধুরী কুড়ি বছর আগে এখানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। থাকে কলকাতায়। তাকে নিজের পরিচয় দিল না কেন লাইলি? সম্ভবত বীরেশ্বরের নিষেধ ছিল। ওরা আসলে ভীষণ সাবধানী আর চতুর। কাকেও বিশ্বাস করে না। আমাকেও বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমি কি বোকার মত বীরেশ্বরের কথায় 'প্রদীপের স্ত্রী' ঘটিত ধাপ্পায় পড়ে গেলুম!

এখন আর পস্তে লাভ নেই। সামনে একটা চান্স রয়েছে। সুনিশ্চিত চান্স। বাসটা ধরে ফেলতে আর দেরি নেই। জিপের গতি হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল। রাস্তা ফাঁকা মোটামুটি। জিপের সবাইকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'আমি বরং পিছনে যাই মিঃ মুখার্জী।' ... একটু ভেবে নিয়ে বললুম, 'যদি কোন এদিক-ওদিক ঘটে যায়, আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখে ফেলা ঠিক হবে না। বুঝতে পারছেন?'

মুখার্জী একটু হেসে জবাব দিল, 'সে ঠিক। তবে ওই বাসে উঠতে যদি দেখে থাকেন, আর এড়িয়ে যাবার কোন চান্স নেই। আপনি ঠিক দেখেছেন, তো স্যার?

'নিশ্চয় দেখেছি। কথা বলেছি।'

'তাহলে ঠিক আছে। অর্জুন, তুমি সামনে এসো—আমি কাত হচ্ছি। স্যার পিছনে যাবেন।'

অনেক কষ্টে পিছনে ঘুপটিতে লুকিয়ে বসলুম। আশ্বস্ত হওয়া গেল। বললুম, 'আপনারা খবর পেলেন কখন যে ও বাসরাস্তায় এসেছে?'

মুখার্জী বলল, 'সেইটেই তো দেরি হয়ে গেছে। সম্ভবত আপনি গিয়ে পড়ায় বীরেশ্বর ওকে কোথাও সরিয়ে ফেলেছিল। এদিকে আমরা তো আপনার সিগন্যালের জন্যে রাত জাগছি। আপনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন। তখন দত্ত আর আমি আপনার জানলার নিচেই আছি। বুঝলুম, আর হল না। হয় খবর ভুল ছিল, নয়তো যা বলছিলুম—সরিয়ে রেখেছে কোথাও। ফিরে গিয়ে শিবু মণ্ডলের বাড়ি শুয়ে পড়লুম। শিবু সত্যি সত্যি ইরিগেশনের লোক ভেবে সেই রাতে যা খাওয়া দিল, দারুণ স্যার! আমরা আপনার কথা ভাবছিলুম।'

'আমার বাল্যবন্ধুও মন্দ খাওয়ায়নি মুখার্জী।'

'ভাল স্যার, ভাল। তারপর শুনুন, সকাল থেকে শিবুর আবেদন শুনে যাচ্ছি, আর দত্ত নোট নিচ্ছে। আমরা ভিতর-ভিতর ভীষণ ব্যস্ত। ইনফরমার রাণীহাট চষে বেড়াচ্ছে, ফিরছে না। ফিরল যখন, তখন সাড়ে সাতটা আর নেই—জাস্ট সাতটা তেতাল্লিশ প্রায়। তক্ষুনি গাড়ি ছুটিয়ে চলে এলুম। তো...' হাসতে

লাগল মুখার্জী।

ড্রাইভার বলল, 'সামনে বাস মনে হচ্ছে। বাঁক পেরোলেই বোধ হয় দেখতে পাব স্যার।'

মুখার্জি বলল, 'এভরিওয়ান—বি রেডি। কুইক।'

ওদের দেখাদেখি আমিও রিভলবারটা কিটব্যাগ থেকে বের করে হাতে তৈরি রাখলুম। উত্তেজনায় আমার চোয়াল শক্ত হয়ে এল। লাইলি, সেই লাইলি—ছোট্ট পাড়াগাঁ শিমুলিয়াকে যে আরবের এক মায়াময় শহর করে তুলেছিল। হঠাৎ আমার বুক কেঁপে উঠল। লাইলি এমনি-এমনি ধরা দেবে তো? না দিলে এরা ওর অত সুন্দর দেহে—ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললুম।

জীবনে এই প্রথম আমি ধর্মবিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরকে একবার প্রার্থনা জানালুম, লাইলি যেন সহজে আত্মসমর্পণ করে।...

বাসটা আমার স্বপ্নেব মধ্যে দেখা দিল এতক্ষণে। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ওই বাসে লাইলি আছে। আমার রক্ত ঠাণ্ডা হযে যেতে থাকল মুহূর্তে-মুহূর্তে। এই চাকরি নেওয়া আমার উচিত হয়নি। উচিত হয়নি। ...

জিপটা যেন লাফ দিয়ে পাশ কাটাল। তাবপর সামনে কয়েক হাত তফাত রেখে খুব আস্তে চলতে থাকল। বাসটা হরন্ দিচ্ছিল। আমাদের জিপ আস্তে আস্তে চলে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। বাসটা সশব্দে ব্রেক কষেছে। যাত্রীরা জানালায় ঝুঁকেছে। মুখার্জী দত্ত —আর বাকি সবাই এক লাফে বাসের পিছনে দরজার সামনে ঘিবে দাঁড়াল। হাতে খোলা রিভলবার প্রত্যেকের। বাসের যাত্রীরা কাঠপুতুল হয়ে গেছে। জিপের পিছনের পর্দার একটা ফুটোয় চোখ রেখে সব দেখতে পাচ্ছি।

তারপর দেখলুম, মুখার্জী একলাফে উঠে গেল। দত্ত বাসের তলায় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। কোন গুলির শব্দ হল না। কোন চিৎকার না। শুধু স্তব্ধতা।

তারপর মুখার্জীর গলা শুনলুম। ক্ষেপে গিয়ে চেঁচাচ্ছে যেন। 'কোথায় নেমে গেল বললে?'

জবাবটা শুনতে পেলুম না। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

মুখার্জী ফিরে এসে বলল, 'ভেরি ব্যাড লাক স্যার। অসম্ভব ধূর্ত মেয়ে। আগে যে নদীর ব্রীজটা পেরিয়ে এলুম, ওখানে নেমে গেছে। ওদিকটা তো ভীষণ জঙ্গল। কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম আছে। এখন আর খুঁজে বের করা অসম্ভব। নাকি গিয়ে একটা চান্স নেব? কী বলেন স্যার।'

'আপনাদের খুশি। আমি কিন্তু বাসটা চলে গেলেই নেমে যাব।'

'শিমুলিয়ায় ফিরবেন—নাকি বহরমপুর?'

'জানি না মিঃ মুখার্জী। ভাববেন না। আমি সময় মত খবর দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

'আমার মনে হয়, আমি থাকা অবধি আপনাদেব কোন আলাদা চেষ্টা চালানো ঠিক হবে না মিঃ মুখার্জী। তাতে আমার অসুবিধে হতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার। আই এগ্রি।'

বাসটা চলে গেলে আমি নেমে এলুম জিপ থেকে। ফাঁকা মাঠ দুধারে। কিছু গাছপালা আর পুকুরও আছে ডানদিকে। মুখার্জীরা চলে গেল। সকালের স্মিত বোদ্দুরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম এতক্ষণে। হালকা হাওয়ায় গায়ের ঘাম জুড়িয়ে গেল। একটা অর্জুন গাছের ছায়ায় গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লুম। এত ক্লান্তি কোনদিন আসে নি।

একটু পরে আবার বাতাসে সেই সুগন্ধি ঝাঁঝটা যেন ভেসে এল। লাইলি যা রেখে গেছে আজ কিছুক্ষণ আগে। এই গন্ধটা যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। কিছু বলছে—বুঝতে পারছিনে।

এক সময় গ্রীষ্মে কাঠমল্লিকার ফুলের গন্ধ পেলে অনিবার্যভাবে লাইলির কথা মনে পড়ে যেত! ওই গন্ধটার অনুষঙ্গে লাইলির স্মৃতি জড়ানো।

আজ এই কড়া সেন্টের গন্ধ আর এক লাইলির অনুষঙ্গ তৈরি করল। এ লাইলি অন্য মেয়ে। প্রদীপের স্ত্রী বলে যাকে অতি সহজে মেনে নিয়েছিলুম—অথচ যে মারাত্মক খুনী এবং বিপ্লবী।

দুই

হ্যাঁ, 'বিপ্লবী'। এ ছাড়া অন্য কোন শব্দ সরকারী দপ্তরের গোপন নথিতে ব্যবহার করা হয়নি লাইলি বা তার দল সম্পর্কে। এবং এইটাই আমার কাছে ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। সেই সঙ্গে অবিশ্বাস্য।

একটা কথা এখানে অবশ্যই পরিষ্কার করা দরকার যে এই 'বিপ্লবী' দলটি—যার এক আঞ্চলিক অধিনেত্রী কৃষাণকন্যা এই লাইলি খাতুন, এরা কিন্তু প্রখ্যাত নকশালপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবী নয়। আমার সদর দপ্তরের নথিপত্রে এটা পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল। তাছাড়া আমাকে বিশদভাবে এদের কর্মপন্থা আর উদ্দেশ্যও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যতদূর জানা গেছে, এটি একটি নতুন দল। এরা পশ্চিমবঙ্গে এখনও সংখ্যায় অতি সীমিত। প্রধানত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এদের ঘাঁটি। নগরাঞ্চলে দেখা পাওয়ার চান্স খুব কম। এরা প্রধানত যে কাজকর্ম করছে—তা হল, দুর্ধর্ষ লোকদের দলে টেনে দলের শক্তি বাড়াচ্ছে এবং ডাকাতি,ওয়াগন ব্রেকিং, তার কাটা, রাহাজানি থেকে শুরু করে সবরকম উপায়ে এরা অর্থসংগ্রহ করছে। এই অর্থ দিয়ে বাইরে থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার প্ল্যান আছে এদের, এবং দরকার মত অস্ত্র যোগাড় হয়ে গেলেই এই দলটি বিপ্লবের কাজে নেমে পড়বে। সে কাজ কী ধরনের, তাও অনুমান করা গেছে। অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস, গেরিলা পদ্ধতিতে এবং দরকার হলে সামনা-সামনি লড়াই চালানো। এভাবেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করার স্বপ্ন এরা দেখছে।

রাণীহাট এলাকায় যে ঘাঁটিটি রয়েছে, তার নেত্রী লাইলি খাতুন। এই এলাকার একটা বিশেষ সুবিধা ওদের কাছে, তা হল : রাণীহাট-শিমুলিয়ার পশ্চিমে এক বিশাল বিকীর্ণ দুর্গম এলাকা রয়েছে। ছোট-বড় অজস্র নদী সেই অববাহিকার নিম্নভূমিতে প্রবাহিত হওয়ার দরুন কোন রাস্তাঘাট এখনও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কিছু এলাকা জলা আর জঙ্গলে ভর্তি— কোন মানুষের বাস নেই। ছোট-ছোট যে-সব গ্রাম আছে, তারা এখনও প্রায় আদিম যুগে বাস করছে। তাদের মধ্যে জেলে, বাগ্দী, সাঁওতাল আর বেদের সংখ্যাই বেশি। এরা ভীষণ গরিব। যারা চাষবাস করে, তাদের ভাগ্যও অনিশ্চিত—কারণ প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়। পঞ্চবার্ষিক যোজনার কোন সুবিধাই ওরা পায়নি। ভোটার-সংখ্যা বেশি হলে হয়তো অন্য কিছু ঘটত—অন্তত আমার তাই ধারণা।

লাইলি আর তার দলের লোকেরা সম্ভবত ওই দুর্গম এলাকাতেই লুকিয়ে থাকে, অর্থাৎ বিশ্রাম আর প্ল্যান করে এবং অ্যাকশনের সময় বেরিয়ে যায় নির্দিষ্ট জা ' গায়। হাতে-নাতে কোথাও ধরে ফেলা এদের কঠিন ছিল। কারণ এদের অ্যাকশনের কোন বিশেষ এলাকা নেই। আজ রামপুরহাটে ওয়াগন ভাঙল, তো পরের রাতে জঙ্গীপুরে গিয়ে তার কাটল। তারপর দিন হয়তো হঠাৎ সিউড়িতে ব্যাঙ্কডাকাতি করে বসল। আশ্চর্য নিপুণ এদের সংগঠন আর হিসেবী চলাফেরা। স্পষ্ট বোঝা যায়, একটা অতিবুদ্ধিশীল মস্তিষ্কযন্ত্র এদের পিছনে সক্রিয়—লাইলি শুধুমাত্র যার হাতের পুতুল।

সব কিছুর উৎস অবশ্য কলকাতা শহর। কলকাতার মূল ঘাঁটিটি ইতিমধ্যে বিধ্বস্ত করে ফেলা হয়েছিল। খবরের কাগজে সে সব অদ্ভুত রোমহর্ষক বিবরণ সবাই পড়েছেন। অন্যান্য অঞ্চলের ঘাঁটিগুলিও প্রায় খতম। শুধু রাণীহাট এলাকায় রয়ে গেছে এবং আমার ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে এই ঘাঁটিটি খতম করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর কর্তাদের মাথা খেলেছিল। আনোয়ার চৌধুরী মুসলমান, লাইলি খাতুন মুসলমান—এবং দুজনেই একই গ্রামের মানুষ। বিশেষত পরস্পর একসময় পরিচিত। অতএব আনোয়ার চৌধুরীকে পাঠানো মানে রাবণের মৃত্যুবাণ হানা।

কিন্তু তার আগে লাইলির পিছনের কথা আমার জানা দরকার। হঠাৎ একটি পাড়াগেঁয়ে সাধারণ মেয়ে তো আর রাতারাতি এই দুর্ধর্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে বসেনি! নিশ্চয় এর একটা পূর্বাপর সুসমঞ্জস কাহিনী আছে—একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। কে তাকে আনল এই ভূমিকায়? বীরেশ্বর?

শিমুলিয়ায় এসে লাইলি সম্পর্কে কোন কথাই তুলিনি - পাছে কেউ সন্দেহ করে বসে। [illegible] বছর পরে হুট্‌ করে সেখানে চলে আসার কোন সঙ্গত কারণ নিজেব কাছেই জোরদার হচ্ছিল না। জন্মভূমি দেখতে আসাটা কি খুব বিশ্বাস্য ব্যাপার? বিশেষ করে সেখানে যখন কোনদিক থেকেই কোন যোগসূত্র নেই আমার। এবং এসে লাইলির কথা তুললে সন্দেহ হবার কথা বই কি। লাইলি ছিল অতি নগণ্য একটি ছাগলচরানী মেয়ে। অমন মেয়ে গ্রামে তো অনেক ছিল। হঠাৎ লাইলির কথা কেন? আব লাইলি যে এলাকায় অত প্রখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে উঠেছে, তা নিশ্চয় আমার জানার কথা নয়।

তাই ভেবেছিলুম, সুযোগ বুঝে সুকৌশলে কথাটা তুলতে হবে কারো কাছে। কোন সরল বৃদ্ধের কাছেই। শিমুলিয়ায় তেমন লোক একজনই আছে, সে ফৈজুচাচা। ছেলেবেলায় সে আমাকে খুবই ভালবাসত। সন্ধ্যাবেলায় বাবার ডাক্তারখানায় এসে আড্ডা দিত। সেই আড্ডায় আমি চুপিচুপি দাঁড়িয়ে থাকতুম। কত আশ্চর্য রূপকথা বলতে পারত ফৈজুচাচা! এখন সে ভীষণ বুড়ো হয়ে গেছে। চলাফেরা করতে পারে না। খাটিয়ায় শুয়ে বা বসে থাকে সব সময়। আমাকে দেখে সে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছিল।...

মুখার্জীদের জিপ চলে গেলে আমি অর্জুন গাছটার তলায় বসে সিগ্রেট খেতে খেতে এইসব কথা ভেবে নিলুম। তারপর উঠে দাঁড়ালুম। কখন কোন ফাঁকে শিমুলিয়ার দিকে যাবার বাসটা চলে গেছে লক্ষ্যই করিনি। কোন খালি রিকশাও চলছে না এখন।

মাত্র কোয়ার্টার মাইল দূরে বাবুগঞ্জ বাজার। সেখানে গিয়ে একটা রিকশা পাওয়া যেতে পারে। পিছনে বাতাস পাবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

পরক্ষণে মনে হল, থাক। শিমুলিয়া যে-কোন সময় যাওয়া যেতে পারে। এদিকে খুব বেশি দিন এখানে কাটালে লাইলির অনুচরদের সন্দেহভাজন হয়ে পড়ব। কাজেই যত তাড়াতাড়ি পারি, আমাকে কাজ শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। এখন যদি আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর ছলে সেই নদীর ব্রিজের কাছে যাই, লাইলির কোন পাত্তা পাওয়া কি সম্ভব?

আবার আমার গা শিউরে উঠল। আমার বুকপকেটে পরিচিতিপত্রের সঙ্গে একটা সরকারী আদেশপত্রও রয়েছে। একমাত্র আমিই পারি লাইলিকে দরকার হলে 'মৃত অবস্থায় গ্রেফতার' করতে। হ্যাঁ, 'মৃত অবস্থাতেও গ্রেফতার' বলে একটা কানুন আছে। তার মানে যে-কোন সময় লাইলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তাকে গুলি করে মারতে পারি এবং এতেই আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। লাইলি মরলেই এ ঘাঁটি বিধ্বস্ত বলে ধরে নেওয়া হবে।

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল একথা ভাবতে। ওই আদেশপত্রটার তত গুরুত্ব দিইনি এতক্ষণ। এ মুহূর্তে যতই ব্যাপারটা বাস্তবঘটনার ছকে ফেলে ভাবলুম, আমার পা দুটো ভীষণ ভারি হতে লাগল। আমার বুকের ওপর কী সাংঘাতিক কালকেউটে নিয়ে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ঘুরছি!

লাইলি নাকি অসংখ্য খুনের অপরাধে অপরাধী। আর আমি 'দরকার হলে' লাইলিকে খুন করব। কিন্তু আইন এবং সমাজের চোখে আমি খুনী বিবেচিত হব না!

আর 'দরকার হলে' মানে কী? যদি আত্মসমর্পণ না করে, যদি সে আমাকে আক্রমণ করতে আসে!

ভাগ্যের এ এক অদ্ভুত পরিহাস ছাড়া আর অন্য কোন অর্থ খুঁজে পেলুম না। আমার সেই আশ্চর্যসুন্দর দিনগুলিতে যে ছিল আমার একটি গোপন আনন্দময় স্বপ্ন, কৈশোরকে যে ভরিয়ে দিয়েছিল ফুলে ফুলে নানা রংয়ের ছটায়, পৃথিবী আর জীবনকে যে মেয়ে করে তুলেছিল আমার চোখে স্বর্গের মতন সুখসম্ভব—আজ যৌবনে তাকে হত্যার পরোয়ানা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি!

মন খারাপ হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে এ চাকরি ছেড়ে দিই। সমাজ, রাষ্ট্র, আইন সব অনেক বড় ব্যাপার। আমি সামান্য মানুষ—আমার ছোট ব্যক্তি-বিবেক খুব ছোট দিক থেকে সব ভাল-মন্দ বিচার করে। কোনদিন আদর্শ সমাজবীর হবার স্বপ্নও আমার ছিল না। নেহাত এক আকস্মিক ঘটনাচক্রে এই চাকরির অফার পেয়েছিলুম। তারপর থেকে অপরাধীদের পিছনে ছায়ার মতন ঘুরে তাদের কব্জা করে ফেলা একটা বিচিত্র খেলার মতন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, তাই এ চাকরি করে আসছি। এই লুকোচুরি

খেলা, এই নানা রকম মুখোশ পরে বেড়ানো, বাস্তব জীবনের মধ্যে এইসব অভিনয়—নেহাত নেশা ছাড়া কিছু তো নয়।

আমার মনে এই উলটো স্রোতটা বরাবর আছে। এটাকে দ্বন্দ্ব বলাই ভাল। কিন্তু তবু কর্তব্যে কোনদিন ফাঁকি দিই নি। নিজের সেই ছোট্ট বিবেকটিকে চড়-থাপ্পড় মেরে চুপ করিয়ে কতদিন কত অপরাধীকে তার প্রিয়তমার বুক থেকে, তার শিশুর সান্নিধ্য থেকে কেড়ে নিয়ে আইনের দরবারে পৌঁছে দিয়েছি—তার সংখ্যা নেই। কলকাতার এক কুখ্যাত অপরাধী তার এক দুর্বল মুহূর্তে তার একমাত্র বাচ্চা মেয়ের অসুখের সময় বাড়ি ফিরে এসেছিল, আমি সে সুযোগ ছাড়ি নি। সেই মেয়েটির কান্না আমার মনে এখনও জমা রয়েছে। টের পেয়েছিলুম যে যত জঘন্য অপরাধীই হোক, মূলত সে মানুষ—সে কারো না কারো বাবা, ভাই, স্বামী, সন্তান।

বারীনদা বলেন, 'আনোয়ারটা যত দিন যাচ্ছে, দার্শনিক হয়ে উঠছে!' কে জানে! মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকটাই দেখতে দেখতে অন্ধকারে হেঁটে চলা আমার কাজ। কিন্তু অন্ধকারচারী মানুষের মধ্যে আলোর আকুতিও তো দেখতে পাই। মানুষ সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, দেবতা নয়। অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর আর দেবতা হবার সম্ভাবনাও তো তার ছিল। কিংবা প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে দেবতা নেই, তাই বা কে হলফ করে বলতে পারে? একবার দূর থেকে এক মারাত্মক খুনী গুণ্ডাকে অনুসরণ করে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি রাস্তার মোড়ে যেতে যেতে সে একটি ছোট্ট ছেলেকে রাস্তা পার করে দিল! একবার দেখেছি, আর এক খুনী রাস্তার ধারে একটি ফুটপাথজাত বাচ্চাকে গাল টিপে আদর করছে। আর একবার এক কুখ্যাত অপরাধীকে কতক্ষণ আকাশ-নদী-পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

অবশ্য লাইলি কী জানিনে। আমি এখনও চোখের সামনে দেখিনি—তার মধ্যে মানবতা, কিংবা দেবতা, কিংবা সুন্দরের কী আছে। শুধু জানি, সে খুনী, ডাকাত, এবং 'হয়তো বা' বিপ্লবীও। 'হয়তো বা' বলছি, তার কারণ—এই দলটির উদ্দেশ্য আর পন্থা সঙ্গতিহীন। এমনও হতে পারে, কোন অসাধারণ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি একদল অসামাজিক ধরনের মানুষ বেছে নিয়ে আসলে নিজের ব্যক্তিগত অর্থ লালসা চরিতার্থ করছে!...

এইসব ভাবতে ভাবতে এক সময় দেখি আমি সেই নদীর ব্রীজের কাছে এসে পড়েছি। ঘড়ি দেখলুম, প্রায় দশটা বাজে। রোদ চড়া হচ্ছে ক্রমশ। ব্রিজে এসে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশ বছর আগে এখানে নৌকোয় পারাপার হত। অনেক স্মৃতি ভেসে এল মনে।

বাঁদিকে নদীর দুধারে ঘন জঙ্গল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলা আর জঙ্গল ভর্তি। এখানটা উঁচু বলে বাঁদিকে—পশ্চিমে সেই দুর্গম এলাকার অনেকটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোন্‌টা কোন্ গ্রাম বোঝা যাচ্ছে না। ছেলেবেলাতেও ওই এলাকা আমার সম্পূর্ণ অচেনা ছিল।

ব্রিজের একধারে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়ালুম। হিজল গাছের ছায়ায় বাতাস দিচ্ছিল। কিটব্যাগের ভিতর থেকে ভিউ-ফাইন্ডারটা বের করে চোখে রাখলুম। আমি এখন নিছক প্রকৃতিপ্রেমিক—'ন্যাচারালিস্ট'। পাখি দেখারও শখ আছে। বুদ্ধি করে ক্যামেরাও সঙ্গে রেখেছি। যারা শিমুলিয়ার ডাক্তার কামরুল চৌধুরীর ছেলে আনোয়ারকে চেনে না—তাদের জন্যে এই মুখোশ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভিউ-ফাইন্ডারে দুর্গম বিস্তীর্ণ বনভূমি—একটা ব্যাপক পকৃতিজগৎ আমার সামনে ধরা দিল। কোথাও কোন মানুষ দেখলুম না। জলার ধারে কোথাও-কোথাও কিছু গরু-মোষ চরতে দেখলুম। রাখালেরা নিশ্চয় ধারে-কাছে কোথাও আছে। কিন্তু ওদিকটা মোটামুটি ফাঁকা—কোমর-সমান উঁচু উলুখড়ের ধূসর বিস্তার। কোন লোক গেলে এখান থেকেই দেখা যেত।

খুব খুঁটিয়ে নদীর দু'ধারের জঙ্গলগুলো দেখতে লাগলুম। কোন জনপ্রাণী নেই। তখন একটু ইতস্তত করে নদীর ধারে-ধারে হাঁটতে শুরু করলুম।

কতদূর যাব বা লাইলিকে পেয়ে যাব কি না সবই অনিশ্চিত। তবু এসব ক্ষেত্রে দেখেছি, আমার ইনটুইশান বা সহজাত বোধটা বেশ কাজ করে। সম্ভবত তার হাতের পুতুল হয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

নদীতে সোনালী বালির চড়া রয়েছে। একপ্রান্তে কয়েক ফুট চওড়া জায়গায় ঝিরঝিরে কিছু জল

বয়ে যাচ্ছে। নদীতে নেমে গেলে কারো চোখে পড়ে কৌতূহল সৃষ্টি করব বলে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে থাকলুম। ছোট-ছোট কাঁটাঝোপ আর সতেজ নানাজাতের গাছ রয়েছে। ঘন ছায়ায় ভরা বনভূমি আমাকে নির্জনতার প্রশান্তি দিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু এত অস্বস্তির মধ্যে নিসর্গের দিকে মন ছিল না একটুও। টের পাচ্ছিলুম হয়তো বা বোকার মতন কাজ করে নিজের বিপদ ডেকে আনছি! একটা গাছের ছায়ায় থমকে দাঁড়ালুম। হঠাৎ মনে হল, লাইলি বা তার লোকেরা কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রাখেনি তো? বুক কেঁপে উঠল। যদি হঠাৎ গুলি ছুড়ে বসে!

কিন্তু আর ফিরে যেতেও পারছিনে। বনটা আমাকে টানতে শুরু করল। অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। পাখি ডাকছিল। বিশ বছর আগের কিছু স্মৃতিও ভেসে আসছিল মনে। তবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে চারদিক দেখেশুনে অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে গেলুম। ক্রমশ একটা বিশ্বাস মনে দানা বাঁধতে লাগল যে লাইলি তো আমাকে চেনে, বীরেশ্বর বলেছে এবং আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখাও হয়ে গেছে কিছুক্ষণের জন্যে—সে আমার কোন ক্ষতি করবে না।

বেশ কিছুদূর যাবার পর এই বিশ্বাস পূর্ণতায় স্থির হল। লাইলি আর যাই করুক, তার বাল্যসঙ্গীকে হত্যা করতে গুলি ছুড়বে না—যদি কোনভাবে সব টের পেয়েও থাকে।

সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলুম। পাখি দেখার ছলে চোখে বার বার ভিউ-ফাইন্ডার রাখলুম। ঝোপের বুনো ফুলের সামনে মুগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ভান করলুম। গুন্ গুন্ করে গানও গাইতে থাকলুম। আমার এই আচরণের সঙ্গে বিশ বছর আগের এক কিশোরের আচরণের কোন পার্থক্য ছিল না। শিমুলিয়ার পীরের থানের সুন্দর নির্জন বনভূমিতে সে ঠিক এমনি বিহ্বলতায় ঘুরে বেড়াত।

সামনে গাছের ডালে একঝাঁক টিয়াপাখি ক্যাচর-ম্যাচর করছিল। একটা ঢিল ছুড়ে মারতেই তারা উড়ে গেল। তারপর ওই খেলা শুরু হল আমার।

প্রখ্যাত শিকারী জিম করবেট বাঘ শিকার করতে গিয়ে নানারকম লুকোচুরি খেলতেন বাঘিনীর সঙ্গে। তাঁরও একটা ইনটুইশন ছিল—যাতে আড়ালের প্রাণীটার সব সতর্ক চলাফেরা বা অবস্থিতি ঠিকঠাক টের পেয়ে যেতেন। একটা দুর্ধর্ষ বাঘিনীকে অনেক ছলে গুলি করার সুযোগ ব্যর্থ হলে অবশেষে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরম কৌশলটি প্রয়োগ করেছিলেন। তখন বাঘদের মিথুনঋতু। আসঙ্গ লিপ্সু মত্তা বাঘিনীটাকে তিনি পুরুষবাঘের ডাক নকল করে সামনে এনে গুলি করে মেরেছিলেন। এ হয়তো মারাত্মক অন্যায়—অনৈতিক, কিন্তু তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। বাঘিনীটা কয়েকশো লোককে খুন করেছিল। বেঁচে থাকলে আরও কত লোক তার হাতে মারা পড়ত।

আজ আমার ভূমিকা ঠিক একই। কিন্তু আসঙ্গলিপ্সু মত্তা সেই বাঘিনীটার সঙ্গে লাইলির কোন মিল তো নেই!

নাকি আমি বিশ্বাস করেছি যে লাইলি আমাকে দেখামাত্র ছেলেবেলার সেই হারানো ভালবাসার তীব্র টানে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার বুকে? সে-স্মৃতি কি তার মনে গেঁথে আছে?

যদি থাকে, তাহলে আমি সার্থক হতে পারি এবং তাহলেই আমার কণ্ঠের জিম করবেটের সেই ছলনা-ডাক শুনে তার ছুটে আসবার চান্স আছে।

হ্যাঁ, জিম করবেটের সেই ইনটুইশন আমার মধ্যেও কাজ করছিল তখন। গভীরতর ইন্দ্রিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা ছিল—প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, লাইলি এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। আবছা মনে হচ্ছিল—সে এখন কোন গাছের ছায়ায়, কোন ঝোপের পাশে চুপি চুপি আমাকে লক্ষ্য করছে। সারা বনভূমি ক্রমশ ছম-ছম করতে থাকল, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায়। এমন কি আমি যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম, দুর্গম সবুজের ঘন দেয়াল কাচের মতন স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল—ওর চোখের দৃষ্টি, ভুরুর কাঁপন, বুকের ওঠা-পড়া—সব যেন ভেসে উঠছিল। সে যন ভাবছিল, আনোয়ার এখানে কেন—কী করছে এই জনহীন বনভূমিতে? আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল যেন সে।...

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে গাছের নিচে দাঁড়ালুম একসময়। সব মিথ্যে। আমি হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত হচ্ছি সম্ভবত। লাইলি কতক্ষণ আগে নদীর ব্রিজের কাছে নেমেছে, তারপর যে এদিকেই এসেছে—তার কী মানে আছে? উল্টোদিকের কোন গ্রামেও তো গিয়ে থাকতে পারে!

কিন্তু সেই বোধটা কিছুতেই গেল না আমার। লাইলি এদিকেই এসেছে—এই বনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। বীরেশ্বরের বাড়ি গিয়ে একটুর জন্যে বেঁচে গেছে আজ। এবার সে খুব সতর্ক হয়ে পড়বে।

একই সময়ে বীরেশ্বরের বাড়ি বিশ বছর পরে আনোয়ারের উপস্থিতিটা কি সে নেহাত আকস্মিক বা কাকতালীয় বলে মেনে নেবে এখন?

কোথায় ঘুঘু ডাকছিল। আন্দাজে একটা ঢিল ছুড়ে বসলুম। পরক্ষণে চাপা গলায় ওদিক থেকে কে হয়তো মুখখিস্তি করে উঠল—ভাষাটা দুর্বোধ্য।

চমকে উঠেছিলুম। কিটব্যাগের ভিতর রিভলবারে হাত চলে গিয়েছিল। তারপর দেখলুম একটা অদ্ভুত মূর্তি বেরিয়ে এল সামনের ঝোপের ওদিক থেকে। মাথায় রঙিন ন্যাকড়া পেঁচানো, তার ওপর ছোট ছোট পাতায়-ভরা ডাল গোঁজা রয়েছে। খালি গা। হাঁটু অবধি ময়লা কাপড় মালকোঁচা করে পরেছে। পায়ে তালশাখার অদ্ভুত জুতো। হাতে একটা ছোট্ট লাঠি।

সে আমাকে দেখেই চমকে উঠল। তক্ষুনি হাত তুলে সেলাম বাজিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'মাফ করবেন হুজুর—হামি আপনাকে গালি দিইনি! হামি ভাবলাম, রাখাল আছে। ঢিল ছুঁড়ল তো হামার সব বরবাদ হয়ে গেল।'

লোকটা একটা মুসহর—ফাঁদ পেতে পাখি ধরছে এখানে। ছেলেবেলায় দেখেছি এরা বাংলাদেশের বাইরে থেকে দল বেঁধে আসে এবং রাস্তার ধারে গাছতলায় ঘরকন্না পাতে। পাখি ধরে, ইঁদুর-সাপ-ব্যাঙ মারে, কেউ ওষুধ বিক্রি করে—তারপর বর্ষার মুখে পাত্তাড়ি গুটিয়ে কোথায় চলে যায়।

হেসে বললুম, 'কী পাখি ধরছ সর্দার?'

সর্দার বললে এরা খুব খুশি হয়, জানতুম। লোকটা খুশি হয়ে বলল, 'জী হুজুর, যাকে ঘু-ঘু বলেন আপনারা—হামরা বলি ঢু-ঢু।'

'কোথায় আছ তোমরা, সর্দার?'

'জী হুজুর, বাবুগঞ্জের কাছে।'

ওকে একটা সিগ্রেট দিয়ে বললুম 'আমি শিমুলিয়ার লোক—শিমুলিয়া চেনো তো? এখন অবশ্য কলকাতায় থাকি। অনেকদিন পরে বেড়াতে এসেছি দেশে। তুমি পাখি ধর, আর আমি দেখি—এই যে দূরবীনটা দেখছ, এতেই। দ্যাখো না, চোখে রেখে দ্যাখো।'

সে কৃতার্থ হয়ে সিগ্রেটটা কানে গুঁজল। তারপর সাবধানে সযত্নে ভিউ-ফাইন্ডার নিয়ে চোখে রাখল। পরক্ষণে এক হাতে পাছা চাপড়াতে আর হাসতে লাগল আনন্দে। অব্যক্ত দুর্বোধ্য শব্দে সে আনন্দ প্রকাশ করছিল। তারপর সেটা দুহাতে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বড় বড় দাঁতে হেসে রইল নিঃশব্দ বিস্ময়ে।

বললুম, 'ঢিল ছুঁড়ে পাখি উড়িয়ে দিয়েছি তোমার। কী করব বল? জানতুম না তো! নাও, সিগ্রেট ধরিয়ে ফেল। তারপর চল দেখি কোথায় তোমার ঘু ঘু ধরার ফাঁদ। অন্য কোথাও পাতা যাবে বরং। কী বল?'

সিগ্রেট ধরিয়ে দিলে সে প্রায় নাচতে নাচতে এগোল। একখানে দেখি, উঁচু ঝোপের গায়ে একটা ক্যামাফ্লেজ-করা খাঁচা ঝুলছে, ওপরে একটা ছোট্ট মোটা কাঠি রয়েছে, তার ওপর একটা ছোট্ট জাল। খাঁচায় পোষা ঘুঘুটা ডেকে উঠছে বার বার। বুনো ঘুঘু সেই ডাক শুনে উড়ে এসে কাঠিতে বসলেই উল্টে পড়ে যাবে এবং তক্ষুনি জালটা তাকে ঢেকে ফেলবে।

কী চমৎকার ব্যবস্থা! জিম করবেটের সেই মরণ-ডাক, আমার সেই ভালবাসার স্মৃতির ফাঁদ। হঠাৎ কিছুক্ষণ সব খারাপ লাগল।

ফাঁদটা নিয়ে আরো গভীর জঙ্গলে গেলুম দুজনে। এক জায়গায় পেতে দিয়ে সে আমাকে ইশারা করল সরে আসতে। খানি দূরে গাছপালার ছায়ায় আমরা বসলুম। খাঁচার পাখিটাকে ডেকে ওঠার জন্যে সে মৃদু-মৃদু শিস দিতে থাকল। ধুরন্ধর বজ্জাত পাখিটা ঠিকই ডাকতে শুরু করল—ঘু ঘু ঘু.... ঘু ঘু ঘু। নির্জন বনভূমিতে সেই ডাকের গভীর মায়ার কোন তুলনা নেই।

চাপাগলায় ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলুম। এবার কেমন পাখি ধরার মরশুম, কোথায় পাখি

বেচে, কত দাম পায়, তার বউ-ছেলেপুলে আছে কি না, তারপর-কতক্ষণ সে এখানে এসেছে, আর কেউ তার পাখি ধরা পণ্ড করেছে কি না, এই জঙ্গলে বাঘ আছে কি না—কারো সঙ্গে দেখা না হলেই পাখি ধরা নিরাপদ। কিন্তু হঠাৎ বেমাক্কা আমার মত কেউ এসে পড়তেও তো পারে... কোন মেয়ে এসে পড়লে—বিশেষ করে কোন সুন্দরী ভদ্রমহিলা যদি হঠাৎ এসে পড়ে তো সে কি তাকে ভূত-প্রেত-পরী ভেবে বসবে—ইত্যাদি।

লোকটা হুঁ দিয়ে যাচ্ছিল আর মৌজ করে সিগ্রেট টানছিল। আমার শেষ কথাটায় সে নড়ে বসল। হলুদ দাঁত বের করে তাকাল আমার দিকে।... 'জী হুজুর, হাঁ—হাঁ। ঠিক বাত—বিলকুল ঠিক।'

'কেন? কী ব্যাপার?'

হ্যাঁ—একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একটু আগে সে থ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে আড়াল থেকে বেরোয়নি। কী জানি, জিনপরী না মানুষ—সাহস হয়নি তার। সে বিড়-বিড় করে মন্তর-তন্তর পড়ে নিজেকে অদৃশ্য বেড়ায় ঘিরে ফেলেছিল ভাগ্যিস! তার জীবনে এমন কখনও চাক্ষুষ করেনি সে। ফাঁদ গুটিয়ে তক্ষুনি পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তারপর সে টের পেল যে বিলকুল আদমি আছে। কারণ, একটু পরেই এক ভদ্দর আদমি—আমাব মতনই পোশাক, হাতে বন্দুক ভি আছে, ঔরতটার পিছু পিছু বেরিয়ে এল। মুসহর ভাবল, এখন হঠাৎ ওদের সামনে বেরিয়ে পড়লে চমকে গিয়ে কী জানি বন্দুকবাজি করে বসে—তাই আড়ালে থেকে গেল। হাতে যার বন্দুক আছে, জঙ্গলে তাকে চমকে দিতে নেই—মুসহর তার জঙ্গলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এটা জানে। অনেকবার ঠেকে শিখেছে। তো বন্দুক না থাকলে সে নিশ্চয় আলাপ করতে যেত—সিগ্রেট চেয়ে নিত। ....

আমি গুম হয়ে গেলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। কিন্তু লাইলির সঙ্গে সে কে? বীরেশ্বর কি?

একটু বসে থেকে উঠে পড়লুম.....'ঠিক আছে সর্দার। পাখি ধরো। ততক্ষণ আমি একটু ঘুরে বেড়াই।'

যেদিকে ওরা গেছে বলছিল, সেদিকে সতর্কভাবে পা বাড়ালুম। সামান্য কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি কী একটা চকচক করছে শুকনো ঘাসের ওপর। কুড়িয়ে নিলুম। চকোলেটের মোড়ক! কে এখানে চকোলেট খেতে পারে লাইলি ছাড়া? তীক্ষ্নদৃষ্টে চারপাশে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলুম। তাবপর একটা গাছের নিচে চোখ গেল। ধুঁয়ো! দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা সিগ্রেটের ফিলটার অংশ পুড়ছে। তার মানে এখানে বসেছিল এইমাত্র—উঠে গেছে। বুক কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে।

সামনের ঝোপ ঠেলে যেই এগিয়েছি, অমনি সেই জঙ্গল কাঁপিয়ে তীব্র ঝাঁঝালো শব্দে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল হঠাৎ। তারপর কে হিন্দী গান গেয়ে উঠল।

অবস্থা ও পরিবেশ অন্যরকম হলে একটুও চমকানোর কিছু ছিল না। হ্যাঁ, ট্রানজিস্টার বেজে উঠল কোথাও। তার মানে মানুষ আছে। ওরা কি ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে—এত বোকা হতে পারে ওরা?

যদি ট্রানজিস্টারটা ওদেরই হয়, তাহলে বুঝব, বীরেশ্বর বা লাইলি সেই জিপের ব্যাপার একটুও ধরতে পারেনি এবং আমার আসা কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি ওদের মনে। কিংবা নাকি এখানে ওরা নিজেদের সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করছে?

আওয়াজ লক্ষ্য করে কয়েক পা এগিয়ে দেখি, হা কপাল! একটা লোক মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে, মালকোচমারা গামছা পরনে, হাতের লম্বা লাঠিতে ভর করে ত্রিভঙ্গ ঠামে গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কোমরে একটা ক্ষুদে ট্রানজিস্টার ঝুলছে। সামনের দিকে একটা ফাঁকা ছোট্টমতন জলা—সেখানে বুক ডুবিয়ে একদল মোষ দাম চিবুচ্ছে।

লোকটা গোয়ালা। বিশ বছর পরে বাংলার পাড়াগাঁয়ে এইসব ব্যাপার চলছে তাহলে! আমার ভীষণ হাসি পেল।

ওকে এড়িয়ে গেলুম। ও নির্ঘাত এই এলাকার লোক। নানাদিক থেকে ভেবে ওর সামনে গিয়ে পড়াটা সঙ্গত মনে করলুম না।

অনেকটা ঘুরে আবার সেই পায়ে চলা সরু পথটায় উঠলুম। আবার একটা চকোলেটের মোড়ক পড়ে থাকতে দেখলুম। মোড়কটা মিলিয়ে দেখলুম, লাল ঝাপসা অক্ষরে একই কোম্পানির নাম লেখা

রয়েছে। তাহলে ঠিক পথেই চলেছি, যে কোন মুহূর্তে বাঘ ও বাঘিনীর দেখা পেয়ে যাব।

আবার থমকে দাঁড়াতে হল। কিন্তু তারপর?

লাইলি একা থাকলে নিঃসঙ্কোচে তার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারতুম। কিন্তু বীরেশ্বর তার সঙ্গে রয়েছে। অবস্থা কী যে দাঁড়াবে, কিছু বলা যায় না।

কাঁপুনিটা আবার পেয়ে বসল। উত্তেজনায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকল! শরীর দারুণ ভারি মনে হল। তারপর একটা প্রবল ঈর্ষা আচমকা ছুটে এল আমার মনে। লাইলি-বীরেশ্বর, বীরেশ্বর-লাইলি...দাঁতে দাঁত চেপে বসল। আড়াল থেকে দুটোকেই তো শেষ করে দিতে পারি। ওরা জানতেও পারবে না কে ওদের মারল!

আবার এগিয়ে গেলুম সতর্ক দৃষ্টিতে। আবার থমকে দাঁড়ালুম। মনে হলে, থাক—এখনও সময় আছে। ফিরে যাই। নতুন প্ল্যান ছকে শুরু করি। এই জঙ্গলে ওরা যে আজ নতুন এল না—তা বুঝতে পারছি। সম্ভবত নথিতে যে সন্দেহ করা হয়েছে, তা ঠিক —এখানেই ওদের দলের রেঁদেভ্যু। বৈঠক বা সিদ্ধান্ত যা কিছু হয়—সব এখান থেকেই। অতএব ছদ্মবেশী একটা পুলিস-বাহিনী নিয়ে এখানে ওৎ পেতে থাকাই ভাল হবে। কেউ পাখি-ধরা ব্যাধ সাজবে, কেউ রাখাল, কেউ কাঠুরিয়া, কিংবা জেলে-বাগ্দী, কিংবা উলুখড় কাটতে আসা মজুর।

সেই সময় আবছা একটা হাসির শব্দ কানে এল। দু পা এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে যেতেই টের পেলুম ওপাশে কোথাও কারা অনুচ্চস্বরে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। ওখানে মাথার ওপর বড় বড় গাছ—নিচেটা ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি। হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপটার ভিতর ঢুকে পড়লুম। কয়েক ফুট অতি কষ্টে এগোতেই ওধারটা নজরে এল।

কয়েক বর্গমিটার ফাঁকা ছায়াভরা ঘাসের জমি। একটা প্রকাণ্ড অথচ নিচু গাছের ঝাঁকড়মাকড় ডালপালা মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। একটা ডালে বসে আছে দুটিতে। পাশাপাশি। পা ছুঁয়ে আছে মাটিতে। একটা উঁচু বেঞ্চের মত ডালটা। পাশে একটা বন্দুক—উঁহু, রাইফেল খাড়া হয়ে আছে। বীরেশ্বরের পরনে ঘিয়ে রংয়ের প্যান্ট গায়ে ধূসর একটা অগোছাল শার্ট, কোমরে বেল্ট। একটা হাতে ছোট্ট ডাল ধরে আছে সে, অন্য হাতটা লাইলির কাঁধে রেখে অস্ফুটস্বরে কী বলছে আর দুজনেই হেসে উঠছে। লাইলি হাসতে হাসতে ওর বুকের ওপর ঝুঁকে আসছে।

কিন্তু এ লাইলির চেহারা অন্যরকম। আমার মাথায় 'প্রদীপের স্ত্রী'র ছবিটি ছিল। তন্মুহূর্তে তাই চিনতে পারিনি। গায়ের রংটা আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। একটু তামাটে মনে হচ্ছে। চুলগুলোয় সে-খোঁপা নেই। বেণী ঝুলছে। শাড়ি আর জামাটাও অগোছাল, -কটু ময়লা—সস্তা দামের আটপৌরে জিনিস। এখন লাইলির শরীরে, তার মুখ-চোখে যে বন্যতা দেখছি, তার সঙ্গে 'প্রদীপের স্ত্রী'র কোন মিল নেই।

অনেক মেয়েকে দেখেছি, চৌরঙ্গী এলাকায়, সারা গায়ে পেন্ট করে ঘোরে। হঠাৎ ধরা যায় না। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলে তবে বোঝা যায়, ওটা স্বাভাবিক চামড়ার রঙ নয়। লাইলি আজ আমার চোখকে ফাঁকি দিয়েছিল।

এখন তাকে এই অরণ্যজগতে প্রকৃতির একটা অংশ বলে মনে হল। আস্তে আস্তে পা গুটিয়ে বসে পড়লুম। কনুই ভর করে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে রইলুম ওদের দিকে।

এত আস্তে ওরা কথা বলছে যে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুধু হেসে উঠলে হাসিটা শোনা যাচ্ছে মাত্র। মনে হল, যেন বা আমাকে নিয়েই ওরা হাসাহাসি করছে। আর আমার রক্তে ঈষৎ উষ্ণতা জেগে উঠল।

এবার দেখি, লাইলি মুখটা বাড়িয়ে দিতেই বীরেশ্বর মুখ এগিয়ে দিচ্ছে—আমার দিকে বীরেশ্বরের মাথা, তাই ব্যাপারটা আমার দৃষ্টির আড়ালে ঘটল। প্রায় দুমিনিট ধরে গাছের মত নিস্পন্দ জড়াজড়ি করে ওরা চুমু খেল।

যেন নিজের অজানতে কিটব্যাগ থেকে আমার হাতে উঠে এল রিভলবারটা। পাঁচটা গুলি ভরা আছে। সেফটি ক্যাচটাও তুলে দিলুম। একটা অন্ধ আদিম শক্তি আমাকে গ্রাস করে ফেলছে টের

পেলুম। অসহায় হয়ে নিজের ঘাতক রূপটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। মহাকবি বাল্মীকির মত শোকার্ত একটা বোবা চিৎকার আমার মনের অন্যদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখলুম—মা নিষাদ....

হঠাৎ গলার কাছে খুব ঠাণ্ডা টের পেতেই দেখি একটা লাউডগা সাপ আমার কাঁধ বেয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসাড় পাথর হয়ে গেছি।....

তিন

সাপটা চলে যাবার পরও দীর্ঘ কয়েক মিনিট নিস্পন্দ বসে রইলুম। তারপর প্রচণ্ড ঘাম হতে লাগল। গলা শুকিয়ে গেছে। দারুণ জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু সেই নদী ছাড়া আর কোথাও জল পাবার আশা হয়তো নেই। জল খেয়ে ঘুরে এসে যদি ওদের হারিয়ে ফেলি।

আবার তাকিয়ে দেখি, বীরেশ্বর একই ভঙ্গিতে ডালে বসে রয়েছে। লাইলি তার সামনে দাঁড়িয়ে কী বলছে। তারপর সে তার ব্লাউজটা খুলে ফেলল—বীরেশরের দিকে পিঠ রেখে। বীরেশ্বর মৃদু হাসছে আর সিগ্রেট টানছে। এতক্ষণে ওদের পায়ের কাছে আমাব চেয়ে বড় একটা কিটব্যাগ দেখতে পেলুম। লাইলি হেঁট হয়ে তার চেন খুলে একটা শাড়ি, তোয়ালে আর কী সব বের করতে লাগল। স্নান করবে নাকি ? এখানে জল কোথায় ?

তোয়ালেটা বুকে জড়িয়ে সে পরনের শাড়িটা খুলে ফেলল। লাল সায়াটা রয়ে গেল। তারপর বীরেশ্বরও দেখি শার্ট খুলল, গেঞ্জি খুলে ফেলল, তারপর প্যান্টও পরনে শুধু আন্ডারপ্যান্ট রয়ে গেল। তার বিশাল বলিষ্ঠ শরীরটা দেখতে লাগলুম।

লাইলি তার বুকে একটা হাত রেখে কী বলে একটু ঠেলে দিতেই সে লাইলিকে দুহাতে শূন্যে তুলে নিল। লাইলি হাসছিল। তার বুকের তোয়ালেটা কাঁধ থেকে খসে পড়ল। তার সুডৌল স্তনদুটো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বীরেশ্বর তাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে আবার চুমু খেতে লাগল। তারপর সেই অবস্থায় ওদিকে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে চলে যেতেই অদৃশ্য হল ওরা। সেই সুযোগে বেরিয়ে এলুম ঝোপ থেকে। বাঁদিকে ঘুরে প্রায় বুকে হেঁটে একটু গিয়ে দেখি সামনে একটা ছোট্ট ডোবা—কিন্তু সুন্দর স্বচ্ছ কালো জলে ভরা। ডাইনে ওরা কোথাও আছে। দেখা যাচ্ছে না। জল দেখে তেষ্টাটা আবার বেড়ে গেল। কিন্তু জল খেতে গেলেই নির্ঘাৎ আমাকে ওরা দেখে ফেলবে।

কতক্ষণ সেই রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ক্রুদ্ধ আর হিংস্র জানোয়ারের মতন বসে ছিলুম হিসেব নেই। হঠাৎ দেখি, দুজনে হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে এল। তারপর জলে নামল। লাইলি জল ছিটোতে থাকল বীরেশ্বরের গায়ে। বীরেশ্বরও ওকে ধরে ফেলল।

জলের মধ্যে দুটি প্রাণীর সুখের শব্দ বাজতে থাকল। কতক্ষণ ধরে ওরা খেলা করল। স্বচ্ছ জলটা ঘুলিয়ে গেল।

কিন্তু ও জল তো আমার পক্ষে মুখে তোলা অসম্ভব। আমি উপুড় হয়ে মাটিতে চিবুক রেখে দেখতে থাকলুম নিঃশব্দে। তখন আমার আর কোন উত্তেজনা নেই, চমক নেই। সব অনুভূতির বাইরে চলে গেছি। সব পূর্বাপর ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে, আমি যেন রূপকথার সেই নির্বোধ রাজপুত্র—যে রাক্ষস-রাক্ষসীর জিয়নকাঠি-মরণকাঠি আনতে গিয়ে বারণ না শুনে পিছু ফিরে তাকিয়েছিল এবং তক্ষুনি পাথর হয়ে গেছে। আমি পিছু ফিরে তাকিয়েছি বইকি। ....

অথচ একটা চমৎকার সুযোগ চলে যাচ্ছিল। এখন খুব সহজে দুটো কাজ আমি করতে পারতুম। চুপি চুপি পিছন ঘুরে সেই আধশোয়া গাছটার কাছে বীরেশ্বরের বন্দুকটা হাতাতে পারতুম এবং লাইলির ব্যাগ খুলে কোন রিভলবার থাকলে সেটাও সামলে দেওয়া হত। এ হল এক নম্বর। তারপর ওদের সামনে হাজির হয়ে অস্ত্র তাক করে আদেশ দিতুম—ভালমানুষের মত চুপটি করে আমার আগে আগে চল হাইওয়ের দিকে। নৈলে কুকুরের মত গুলি করে মারব। ওরা প্রাণের ভয়ে আমার হুকুম তামিল করতে বাধ্য হত। তখন রাস্তা দিয়ে বাবুগঞ্জের থানার দিকে ওদের নিয়ে যেতুম। এই হচ্ছে দু

নম্বর। কিন্তু এই দু নম্বরটা যে এক নম্বরের মত সোজা নয় এবং কতখানি সার্থক হত, সংশয় দেখা দিল। এখান থেকে পাকা রাস্তা অর্থাৎ ব্রিজটা কমপক্ষে দেড় মাইলেরও বেশি দূর। জঙ্গলে যে ওরা কোন অনুচরকে পাহারায় রাখেনি, তার ঠিক কী? তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে তেমন ফাঁকা পথ নেই। একজনকে সামলানো হয়তো যায়, কিন্তু দুজনকে অসম্ভব। গাছপালা ঝোপঝাড় ঘাস ঠেলে এগোতে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে এগোন যাবে না প্রতিমুহূর্তে। তখন সে-সুযোগ ওরা যে কেউ একজন নিতে পারে। ধরা যাক, ব্রিজ অবধি পৌঁছানো গেল। কিন্তু তারপর? যেতে হবে রাণীহাটের সামনে দিয়ে। ব্রিজ থেকে বাবুগঞ্জ কমপক্ষে মাইল পাঁচেকের কম নয়।

ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার আছে। যত এসব ভাবলুম, শরীর ক্লান্ত লাগল তত, আর নিজের অসহায়তায় নিজের ওপর ক্ষেপে যেতে থাকলুম।

একসময় বীরেশ্বর জল থেকে উঠে পড়ল। তোয়ালেটা ঝোপের ডগা থেকে নিয়ে গা মুছল। তারপর ওদিকে চলে গেল। লাইলি এখন একা। মগজে ধু ধু আগুন জ্বলে উঠল আমার। লাইলির পরনে মাত্র সায়া—বাকিটা মুক্ত। মনে হল গ্রীক ভাস্কর্য দেখছি। এই আশ্চর্য সৌন্দর্য আমার চোখে অজানতে মোহ সৃষ্টি করছিল। এখন লাইলির হৃৎপিণ্ডে গুলি ছুঁড়ে মারলেই আমার কর্তব্য চুকে যায়। কিন্তু তা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। একজন ঘুমন্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার বুকে গুলি ছোঁড়া যা, এও তো তাই। সামনা-সামনি ডুয়েলে হয়তো সবই পারা যায়। কিন্তু আর যাই হই, আমি তো ভাড়াটে খুনী নই। বিশেষত অত সুন্দর যৌবনময় দেহে—নগ্ন দেহে মৃত্যু ছুঁড়ে দেবার মত ঘাতক পৃথিবীতে কেউ থাকতে পারে না।

লাইলি গুন গুন করে কী গান গাইতে গাইতে উঠে এল। তারপর ডাকল, 'বীরু, তোয়ালে কই?'

বীরেশ্বর দৌড়ে এল। ...'ভুলে গিয়েছিলাম। নাও। ঝটপট। দেরি করো না।'

'ক'টা বাজল?'

'এগারো প্রায়।'

'তাহলে এখনও অনেক দেরি। সন্ধ্যা ছ'টায় তো?' .... হঠাৎ ফিক করে হাসল লাইলি।... 'এই, চান করলেই আমার যে ক্ষিদে পেয়ে যায়!'

বীরেশ্বর একটু হাসল। ....'বেশ তো। তোমার মামুর ওখানে খাবে। বলা আছে।'

লাইলি হাসতে লাগল। ..'মামু ঝাঁটাপেটা করবে হয়তো। কতদিন যাব-যাব করে গেলুম না, অথচ ওদের বাড়ির পাশেই কতবার মিটিং করে এলুম। এই বীরু! মামু কাল বাবুগঞ্জ গিয়েছিল কেন, খবর নিয়েছ তো?'

বীরেশ্বর বলল, 'হুঁ-উ। কোদাল কিনতে গিয়েছিল। সুরেন ছিল পিছনে। ভোলানাথ হার্ডওয়ার স্টোর্সে কোদাল কিনল। তারপর এক পোঁটলা আম কিনে বাসে উঠেছিল। তুমি ভেবো না।'

লাইলি কয়েক মিনিট ধরে চুল ঝাড়ল। তারপর ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'এই! তোমার লজ্জাশরম বলতে কিছু নেই। আমার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ যে! চলে যাও—আমার লজ্জা করছে!'

বীরেশ্বর জিভ কেটে সরে যাচ্ছিল।

লাইলি ডাকল, 'শোন। ওখানে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাক আর আমার কথার জবাব দাও—কেমন?'

বীরেশ্বর পিছন ফিরে দাঁড়াল সকৌতুকে। ... 'হুঁ, বল!'

'আনোয়ারের ব্যাপারটা খুলে কিছু বলছ না কেন?'

'বলার মতন কিছু নেই। মনে হল, বেড়াতেই এসেছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক ওর পক্ষে। একটুও বদলায়নি। সেই খ্যাপাটে উদাস-উদাস ভাব'. বীরেশ্বর হাসতে লাগল।

'আমাকে একটা ঠিকানা দিয়েছে।'

'হু—বললে তো!'

'লক্ষ্মীটি, একবার কলকাতায় মৃগেনবাবুকে খবর দাও না। খবর নিক।'

'কার? অনোয়ারের?'

'হুঁ। আমার কী রকম লাগল যেন।'

'কেন?'

'জিপের ব্যাপারটা কেমন-কেমন লাগে না তোমার?'

'ও নিছক অ্যাক্সিডেন্টাল। আনোয়ার বেচারা কী করবে?'

'বীরু, একটা কথা ভাবছি।'

'কী?'

'আনোয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করব।'

বীরেশ্বর এত জোরে হাসল যে মাথার ওপর গাছের ডাল থেকে ডানা ঝটপট করে একটা পাখি উড়ে পালাল। 'লাইলি, তোমার বাল্যপ্রেমের স্মৃতি উথলে ওঠেনি তো?'

'হয়তো উঠেছে।' ... লাইলি মুখ টিপে হাসল। ...'জান বীরু, ও আমাকে একবাব চেপে ধরে চুমু খেয়ে ফেলেছিল। তখন আমি সবে—মানে, বুকটা ঢাকব কি না ভাবতে শিখেছি!'

'সর্বনাশ!'

'হুঁ-উ। সর্বনাশ বই কি। কতদিন চুপি চুপি কাঁদতুম জান? ভালবাসায় নয়—কী যেন দুঃখে। মনে হত, অসহায় পেয়ে ডাক্তারের ছেলে আমার কাছ থেকে ভীষণ—ভীষণ কী দামী জিনিস কেড়ে নিয়েছে!'

'লাইলি, আর নয়। এস।....'

বলে বীরেশ্বর হঠাৎ চলে গেল ঝোপের পিছনে। লাইলি বড় তোয়ালেটা বুকে ও কোমরে জড়িয়ে সায়া খুলল। নিংড়ে জল বের করল। ঝাড়ল। তারপর পাড়ে গিয়ে রোদ দেখে ঝোপে মেলে দিল।

বুঝলুম, না শুকোনো অবধি এখান থেকে ওরা যাবে না। আমি যেখানে উপুড় হয়ে ছিলুম, সেখানেই চিত হয়ে শুয়ে থাকলুম। আমার মনের ভিতর আরও তোলপাড় শুরু হয়েছিল। লাইলি একটা মারাত্মক জায়গা খুঁচিয়ে দিয়েছে।

সেই চুমু খাওয়া! ভুলেই গিয়েছিলুম ব্যাপারটা। ও মনে পড়িয়ে দিল। হ্যাঁ, পীরের মাজারের কাছে হঠাৎ আবেগে চুমু খেযে ফেলেছিলুম বটে। ওর দেহটাও প্রার্থনা করেছিলুম ফিসফিসিয়ে। কী লজ্জা! এখন লজ্জা হচ্ছে। আমার বয়স তখন অত কম!

কিন্তু সেটা চেপে গেল লাইলি। বীবেশ্বরের সঙ্গে তার একেবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—পরস্পর ওরা পরস্পরের কাছে সততা দাবি করে বলেই মনে হল। তাই হয়তো ওটুকু চেপে গেল।

পোকার সুড়সুড়িতে থাকা গেল না। মাথায মাকড়সার জাল জড়িয়ে গেছে। খুব সাবধানে বেরিয়ে এলুম। প্রায় বুকে হেঁটে আগের জায়গায় উপস্থিত হয়ে দেখলুম, লাইলি দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনী চালাচ্ছে। বীরেশ্বর প্যান্ট শার্ট পরে তৈরি হয়েছে। তার আন্ডারপ্যান্টটা শুকোচ্ছে রোদে। বীরেশ্বর বন্দুকটা নাড়াচাড়া করতে থাকল।

চাপা স্বরে কথা বলছিল ওরা। ভালভাবে শোনার জন্যে আরও একটু কাছে গেলুম।

'...হরেনদা আসছেন না কিন্তু।' ...বীরেশ্বর বলছিল। . . 'স্রেফ তোমার দায়িত্ব। দুপুর বেলায় গ্রামটা নির্জন হয়ে থাকে—কোন চিন্তার কারণ নেই। শচীন রহমান সায়েবের জিপটা ম্যানেজ করবে। তুমি যাচ্ছ— অ্যাজ ইফ, মেয়েদের সার্চ করার জন্যে তোমাকে আনা হয়েছে। শালা রাজেন মণ্ডল বাড়িতে সোনার পাহাড় জমিয়ে রেখেছে—খাঁটি খবর আছে কিন্তু। অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক—দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে। ওরে বাবা, একেবারে সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের লোক ! দেখবে, হেগে-মুতে এক কাণ্ড করবে শালা! কত লোককে সর্বস্বান্ত করে যখ হয়েছে—ওকে যদি তোমরা খতম করে দাও, অমি গ্যারান্টি দিচ্ছি—পার্টি কোন কৈফিয়ত চাইবে না।'

'... সব বুঝলুম।' ...লাইলি বলল! .... 'কিন্তু....।'

'কিন্তু কী?'

'আমার প্রস্তাবটার কী হল?'

'ও। ভেবে দেখি। আজ মিটিংয়ে তুলব বরং।'

লাইলি যেন বিরক্ত হল। ... 'নিজের চেনা লোকের সঙ্গে দেখা করব, তাতেও পারমিশান লাগবে।

মিটিংয়ে পাস করিয়ে নিতে হবে!'

'লাইলি, ভুলে যেও না—তুমি পার্টির একটা অংশ। নিজের খুশিমত ....'

'কোনদিন কি খুশিমত কিছু করেছি?'

'আহা, করনি। কিন্তু আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করার রিস্ক আছে ভাবছ না?'

'কোন রিস্ক আছে কি না, সেটাই তো দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে। সবাই ভেবে দেখি সেটা। ভুলে যেও না—তোমাকে রক্ষা করার জন্যে পার্টির প্রত্যেকটি সেল সারাক্ষণ সজাগ রয়েছে। তুমি তাদের নেত্রী বটে— কিন্তু....'

'এ নেতৃত্ব আমি চাইনে! অন্যের মত থাকতে চাই। বাবা! একটুও স্বাধীনতা নেই!'

'কী মুশকিল! আজ আবার পাগলামি শুরু করলে! মাঝে মাঝে হঠাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায় কেন বল তো?'

লাইলি চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'একটা সত্যি কথা বলব বীরু?'

'নিশ্চয় বলবে।'

'তোমাদের বিপ্লব-টিপ্লব কী' আমি বুঝিনে। ওসব নিয়ে মাথাব্যথা আমার নেই। হানিফের দলে বেশ ছিলুম—তুমিই আমাকে তোমার পার্টিতে টেনে আনলে। কী সব করে যাচ্ছি, মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারিনে। টাকাকড়ি মালপত্তর সব আসে, কোথায় চলে যায় কার কাছে। খুব অবাক লাগে মাঝে মাঝে। হানিফ ভাইয়ের ব্যাপার ছিল সোজা। টাকা পেত— ফুর্তি ওড়াত। কলকাতা গিয়ে কাটিয়ে আসতুম মাঝে মাঝে। কোন দায়-ঝক্কি নেই। ব্যস! আর এ কোথায় এনে ফেললে! আমি বোবার মত কাজ করে যাচ্ছি- শুধু হুকুম তামিল! এ আমার ভাল্লাগে না বীরু।'

'লাইলি, আজ তুমি আবার গোলমাল করে ফেলছ সব। পার্টি এগুলো বরদাস্ত করবে না। অন্য কেউ বললে আমিও বরদাস্ত করতুম না। কিন্তু তুমি—তুমি আমার ....'

'থামলে কেন? বল। ভালবাসার পাত্রী---প্রেমিকা!'

'নয় লাইলি?'

লাইলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গাছের পাতা ছিঁড়তে লাগল।

'লাইলি, জবাব দাও।'

'আমি তোমাকে ভালবাসতুম বলেই চলে এসেছিলুম তোমার কাছে। এ তো সোজা ব্যাপার, বীরু। নৈলে থেকে যেতুম কলকাতায়।'

'হঠাৎ এইমাত্র কী এমন ঘটল লাইলি, যে এখন আমাকে ভালবাসতে পারছ না?'

একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। লাইলি ধুপ করে বীরেশ্বরের কোলে বসে পড়ল। তারপর ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে পাগল করে রেখেছ বীরু। এত ভালবাসার সুখ আমাকে কেউ দিতে পারেনি!'

'হানিফগুণ্ডা পারেনি?'

লাইলি ওর চিবুকে ঠোনা মেরে বলল, 'এই মা! হিংসে হয়েছে গো! হানিফ-ভাইকে গুণ্ডা বলছে। জান, হানিফভাই আমার বাপের বয়সী? ছিঃ, বীরু! বেচারা আমি পাশে থাকলে অমন বেঘোরে মারা পড়ত না। কক্ষনো না। আমি বাতাসে গন্ধ পাই বিপদের। যেই আমি চলে এলুম, অমনি লোকটা মারা গেল। আমি জানি, কে মেরেছে! কিন্তু আর কী হবে! অনেক দূরে সরে এসেছি।'

'ওঠ—কাপড় শুকিয়েছে বোধহয়। তোমাকে তোমার মামুর ওখানে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরব। আবার টাইমলি এসে পড়ব। ততক্ষণ খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে নাও।'

দুজনে উঠে কাপড় তুলে আনল। ব্যস্তভাবে গোছগাছ করতে থাকল। আমার সারা শরীর ততক্ষণে ব্যথায় আড়ষ্ট। কিন্তু এত কাছে যে নড়ার উপায় নেই।

মনে মনে তবু প্রসন্ন আমি। অনেক তথ্য পাওয়া গেল—যা পুলিসের রেকর্ডে অজ্ঞাত। তাছাড়া আমার সঙ্গে লাইলির দেখা করার তীব্র ইচ্ছেটাও টের পেলুম। একটা আশার আলো দেখলুম। লাইলি যদি আগে অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে, তাহলে তো সহজেই কাজ চুকে যাবে। লোকজন তৈরি

রাখব। কিন্তু আপাতত তার কোন সম্ভাবনা দেখছিনে। তার পার্টির অনুমতি ছাড়া কি লাইলি দেখা করতে পারবে আমার সঙ্গে? অনুমতি দেবার আগে নিশ্চয় ওদের কলকাতার সেল সবিশেষ খবর নেবে আমার সম্পর্কে। জানি না, কী খবর যোগাড় করতে পারবে তারা। ধরা যাক, তেমন সন্দেহজনক কিছু নেই বলে রিপোর্ট পাঠাল। তারপর অনুমতি দিল লাইলিকে। লাইলি জেনেছে, আমি স্বভাবত শিমুলিয়ায় উঠেছি। সেখানে সে হঠাৎ উপিস্থিত হতেও তো পারে!

ওরা চলতে শুরু করেছে। আমি সাবধানে বেরিয়ে এলুম। বেশ কিছুটা দূরে থেকে অনুসরণ করলুম। ওরা নিশ্চয় কাছাকাছি কোন গ্রামে যাচ্ছে। জঙ্গল শেষ হলেই মুশকিলে পড়ব। তবে দূর থেকে গ্রামটাও দেখে নিতে পারি।

ক্রমশ জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। এখন জায়গায় জায়গায় কিছু ঝোপঝাড় আর বাকিটা বুক-সমান উঁচু কাশের বিস্তার। কোথাও উলুকাশ কেটে নেওয়া হয়েছে—সেখানে ফাঁকা। তার পিছনে একটা উঁচু বাঁধ দেখা যাচ্ছিল। ভরসার কথা, কোথাও কোন লোক নেই। উলুকাশের বনটার কাছে এসে চোখে বাইনাকুলোর রাখলুম। দেখলুম ওরা দুজনে হাত-ধরাধরি করে বাঁধে উঠল। একটু দাঁড়াল, বাঁধের ওপারে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। খুব উঁচু হলুদ মাটির বাঁধটা আকাশের গায়ে মিশে রয়েছে।

পরক্ষণে দেখি, কে একজন ওদের সঙ্গে কথা বলছে। গ্রামের চাষাভুষো লোক বলে মনে হল। লোকটা এদিকে আসতে লাগল। ওরা বাঁধের ওপাশে অদৃশ্য হল। আমার পক্ষে এখানে দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়। পিছিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকে পড়লুম। একটা উঁচু গাছ খুঁজছিলুম। পেয়েও গেলুম। অনেক কষ্টে গাছটায় উঠে সবচেয়ে উঁচু ডালটায় গেলুম। তারপর বাইনাকুলারে চোখ রেখে বাঁধের ওপারটা পুরো দেখতে পেলুম। নদীটা ওখানে গিয়ে বেঁকে গেছে। নদীর ওপারে ঘন গাছপালার ভিতর কিছু কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। লাইলি আর বীরেশ্বর গাঁয়ে ঢুকল। তারপর আর তাদের দেখা গেল না।

যে লোকটা এদিকে আসছিল, তার হাতে একটা লম্বা কাটারি। দেখলুম সে এক জায়গায় ঝোপ কাটতে ব্যস্ত হয়েছে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকার পর গাছ থেকে নেমে এলুম।...

মাথায় কিছু চমৎকার প্ল্যান এসেছিল। সন্ধ্যায় নির্ঘাৎ ওই গাঁয়ে লাইলিদের পার্টির বৈঠক বসেছে। ওই সময় তাদের ঘিরে ফেলা যায়। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। কিন্তু ওরা স্বভাবত হেরে যাবে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে।

কিংবা আরেকটা কাজ করা যেতে পারে। লাইলির সেই 'মামু'র বাড়িটা খুঁজে বের করার জন্যে এলাকার কোন বিশ্বস্ত ইনফরমারকে কোন ছলে সেখানে পাঠানো চলে। সে খবর আনলে ওদের বৈঠকের অনেক আগে সশস্ত্র পুলিশ গিয়ে লাইলিকে ঘিরে ফেলতে পারে। হাতে এর জন্যে যথেষ্ট সময়ও ছিল।

কিন্তু সব প্ল্যান ঘুলিয়ে দিল লাইলির সেই কথাটা : 'আনোয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করব।'

এই শব্দগুলো অবিশ্রান্ত আমার মাথার ভিতর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হল, সুযোগ অজস্র পাব লাইলিকে গ্রেপ্তারের—কিন্তু তার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় আর তাকে মুখোমুখি কোনমতে তো পাব না। তখন সে হয়ে উঠবে খাঁচায় ভরা হিংস্র বাঘিনী।

আমার মনে এখন শুধু তীব্র তাগিদ লাইলির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলবার—শুধু ব্যাকুলতা, কেন সে এমন হল, কী সেইসব ঘটনা-পরম্পরা, এগুলো জানবার।

আরও কিছু ছিল হয়তো অবচেতনে। স্মৃতিগত কোন আকর্ষণ, কিংবা কোন ব্যক্তিগত কামনা—যা অচরিতার্থতার দরুন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।

শিমুলিয়ায় পৌঁছে ফৈজুচাচার ঘরে সারা দুপুর সারা বিকেল এক অদ্ভুত অলস তন্ময়তায় কেটে গেল। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলুম না। জঙ্গল এলাকার চমৎকার একটা ম্যাপ ছকে ফেলেছিলুম কাগজের পাতায়। সেটা অর্থহীন মনে হল।

হঠাৎ মনে পড়ল, ওরা কোথায় যেন কোন রাজেন মণ্ডলের বাড়ি সরকারী লোক সেজে গিয়ে ডাকাতি করবে। কবে? কোথায় বাড়ি এই রাজেন মণ্ডলের? রহমান সায়েবের জিপ নিয়ে যাবে শচীন।

শচীন আর রহমান সায়েব কে?

আমার কর্তব্যবোধ বাঘের মতন ঘুম থেকে জেগে বসল। না—জেনে-শুনে এসব ক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থেকে চেপে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে। তাছাড়া এর শুধু চাকুরিগত দায়িত্ব ছাড়াও মানবিক দায়িত্বের দিকটাও তো আছে। রাজেন মণ্ডল ধনী গৃহস্থ—কারো ধনবান হওয়াটা আমার কাছে খুব অপরাধজনক বিবেচিত নয়। সবাই তো ধনবান হতে চায়। বীরেশ্বরও তো মোটামুটি ধনবান। তার বেলা?

ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অন্তত বাবুগঞ্জ থানায় খবর পৌঁছে দিতে পারলে ওরা সদরে সব বেতারে জানিয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সদর কোয়ার্টারের 'বুদ্ধি বিভাগ' লোকজন পাঠিয়ে সব খুঁজে বের করতে পারবে। লাইলি এবং তার দলবলকে বিধ্বস্ত করার জন্যে এ জেলায় বিশেষভাবে ঘাঁটি আর ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে।

ফৈজুচাচা বারান্দায় খাটিয়ায় শুয়েছিল। আমাকে বেরোতে দেখে বলল, 'আবার কোথায় চললে বেটা? অত ঘোরাঘুরি করলে অসুখে পড়বে যে।'

'আসছি, চাচা। একবার বাবুগঞ্জ ঘুরে আসি। শুনলুম, খুব বড় জায়গা হয়ে উঠেছে। দেখতে সাধ হচ্ছে।'

ফৈজুচাচা হাসতে লাগল। ...'বেটা আবার নিজের দেশে এসে পাগল হয়ে উঠেছে। তাই তো বলেছিলুম বাবা, ডাক্তার সায়েবের মতন এখানেই থেকে যাও। বিয়ে-সাদী করে বউ নিয়ে এস। শহরে কি মানুষ থাকতে আছে? খালি ইটপাথর!'

'সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পড়ব।' ... বলে বেরিয়ে গেলুম।

পাকা রাস্তায় গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা বাস পাওয়া গেল। বসবার জায়গা ছিল না, দারুণ ভিড়। দেখতে-দেখতে যাব ভেবে পাদানির কাছে দাঁড়ালুম। এখন সঙ্গে কিটব্যাগটা নেই। প্যান্টের পকেটে অস্ত্রটা আনতে সাহস পাইনি। কারণ আমার রিভলবারটা ৩৮ ক্যালিবারের এবং প্যান্টের পকেটকে বাইরে থেকে সন্দেহজনক করে রাখে।

তাই একটুখানি দ্বিধা থেকে গেল মনে। পাদানিতে আমাকে দাঁড়ানোর সুবিধে দিতে বাস-অ্যাসিস্ট্যান্টটা একটু তৎপর হয়েছিল। হয়তো আমার চেহারায় শোভন নাগরিকতার ছাপ দেখেই।

সে বলল, 'আরমসে দাঁড়ান স্যার।' এবং নিজে সরে এল। আমি হ্যান্ডেল ধরে বাইরে ঝুঁকে দাঁড়ালুম। একটা কারণ ছিল। ব্রিজের কাছটা লক্ষ্য করা।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল ব্রিজটা। যত কাছে গেলুম, তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেটা। সেই সময় মনে হল, কয়েকটি লোক সেখানে বসে রয়েছে। তারপর স্পষ্ট বীরেশ্বরকে চিনতে পারলুম। আশ্চর্য ওদের সাহস তো!

ব্রিজের কাছে যেতেই বাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাসটা দাঁড়াল। এখানে এই পাণ্ডব-বর্জিত জায়গায় কে নামবে? পাদানি ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে হল আমাকে। দুজন যুবক নামল। দুজনেই প্যান্ট-শার্ট পরা, কাঁধে কিটব্যাগ। চোখে গগলস। মাথায় কিন্তু সোলার টুপি। একজনের হাতে গোলাকার চামড়ার কেস—ভিতরে মাপের ফিতে, অন্যজনের হাতে একটা স্ট্যান্ড—ক্যামেরা স্ট্যান্ডের মত, ভাঁজ করে খবরের কাগজে জড়ানো। অ্যাসিস্ট্যান্টটা বলল, 'এই যে স্যার, এটাই আপনাদের সেই জায়গা।'

বাসের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা কি ইরিগেশন ডিপার্ট থেকে আসছেন?'

একজন যুবক মৃদু হেসে মাথা দোলাল।

'তাহলে বাঁধটা সত্যি হচ্ছে, স্যার?'...ভদ্রলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। .... 'ওহে নকড়ি, তাহলে দরখাস্তটা কাজে লাগল। স্যার, আপনারা ক্যাম্প করছেন তো এখানটায়? কাল আসব স্যার। আমার নাম নৃপেন সামন্ত। আদাইপুরে বাড়ি।'

ওদিকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বাসের ছাদ থেকে ত্রিপল-জড়ানো দুটো বোঁচকা নামাল। একটা বড় কালো বাক্স নামাল। তারপর বলল, 'আপনাদের সঙ্গে লোক নেই স্যার। এই তেপান্তরে এখন লোক কোথায় পাবেন?'

'লোক পাবার তো কথা ছিল!' .... চিন্তিতভাবে ইরিগেশানের লোক দুটো এদিক-ওদিক তাকাল।

ব্রিজের অন্যপাশে বীরেশ্বর ও সেই লোকগুলো বসে ছিল। আমি বললুম, 'ওখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা নন তো?'

অ্যাসিস্ট্যান্টটা বলল, 'ওনাবা তো ভদ্দরলোক, স্যার। মোটঘাট বইবার লোক কই?'

ড্রাইভার বাজখাঁই চ্যাঁচাল। ....'এই লখে! তোর হল? মাতব্বরী করা চাই!'....পরক্ষণে স্টার্ট দিল বাসটা।

পাদানিতে এক পা রেখেছি, হঠাৎ বীরেশ্বরের আওয়াজ পেলুম, 'আনোয়ার, কোথায় যাচ্ছ?'

পা নামিয়ে নিলুম। বাসটা গড়াচ্ছে, অ্যাসিস্ট্যান্টটা বলল, 'যাবেন না স্যার?'

জবাব দিলুম, 'থাক।' ... বলে পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে এগিয়ে গেলুম। ও হাত নাড়ল। অর্থাৎ, লাগবে না। এই সিকিমাইল বয়ে আনার ভাড়া আমার মতন ফিটফাট সায়েব-মানুষের কাছে নেবার মত আহাম্মুকী ওর নেই, বোঝা গেল।

বাসটা চলে গেলে দেখি বীরেশ্বর ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ....'কোথায় যাচ্ছিলে?'

সোজা হেসে বলে দিলুম, 'তোমার কাছেই। শিমুলিয়ায় একদম থাকতে ভাল্লাগল না। কথা বলার মত কেউ তো নেই! তাই ভাবলুম, আজও যখন থেকে যেতে হল— ফৈজুচাচা ছাড়ল না মোটে, তখন বীরুর কাছেই যাই। আড্ডা দিয়ে আসি। তা এখানে কী করছ?

বীরেশ্বর বলল, 'এই যে দেখছ! এনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আর বোল না, নদীর ওপারে অনেকটা জমি আছে পৈতৃক। বাঁধের অভাবে পড়ো হয়ে রয়েছে। তাই' .... বলে সে হ্যাটধারীদের দিকে এগোল। ....'নমস্কার স্যার! সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি। আর একটু দেখেই আমরা ফিরে যেতুম। কই রে পাঁচু, এদিকে আয় তোরা! স্যারদের জিনিসগুলো ওঠা।'

তিনটি লোক তখন বসেছিল ব্রিজের ওপাশের নীচু চত্বরে। দৌড়ে এল। গ্রাম্য লোক বলেই মনে হল। গায়ে শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি, পায়ে স্যান্ডেল। কিন্তু তিনজনের দেহই বেশ সুগঠিত। যা বোঝবার, আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম।

বীরেশ্বর বলল, 'বুঝলেন স্যার? গাঁয়ের লোক একদম কো-অপারেট করবে না বুঝতে পারছি। তাদের ধারণা, বাঁধ হলে বড়লোক জোতদাররা লাভবান হবে—তাদের কী? একটা লোক পেলুম না যে আপনাদের সাহায্য করবে। অগত্যা আমার ক্লাবের ছেলেদের আনতে হল। দেখছেন তো, সবাই একেকটা ছোট দৈত্য।'....খুব হাসতে লাগল সে। ....'এ একরকম ভালই হল, স্যার। আপনারা এ ব্রিজ ওপড়াতে বললে তাও গররাজি হবে না। না কী রে পাঁচু ? রঘু কী বলিস? আর সতু—তোর কী মত ?'

ইরিগেশানের একজন হ্যাটধারী বলল, 'ক্যাম্প করবার জায়গা ঠিক হয়েছে বীরেশ্বরবাবু?'

বীরেশ্বর বলল, 'হয়েছে স্যার। ওই যে ওখানটায়—উঁচু চটান মত। জঙ্গল আছে। তবে এক্ষুনি সাফ করে ফেলবে এরা। কোন অসুবিধে হবে না। পাঁচু, তোরা এগো বাবা। আমরা কথা বলতে বলতে যাই। এসো আনোয়ার।'

ব্রিজ পেরিয়ে ওধারে গিয়ে জঙ্গলের দিকে নামলুম আমরা। বীরেশ্বরদের মিটিংয়ের সঙ্গে এসবের কোন যোগাযোগ আছে কি না বুঝতে পারছিলুম না। এই দুটি লোক কি সত্যি ইরিগেশান বিভাগ থেকে এসেছে? যদি নাই এসে থাকে, অর্থাৎ দলের লোকই হয়—তাহলে এত হই-চই লোক দেখানো ব্যাপার কেন? ওদের কি আরও কোন গোপন প্ল্যান আছে—যা আমি জানিনে?

নদীর পাড়ের ওপর জায়গাটা সত্যি অপূর্ব। পাঁচুরা আগাছা ওপড়াচ্ছে, ঝোপঝাড় কাটছে, ভীষণ ব্যস্ত। শোলার টুপিধারীরা চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখছে।

বীরেশ্বর একটা সিগ্রেট দিল আমাকে।....'এস আনোয়ার, এখানে বসি।'

ঘাসের ওপর বসে পড়লুম দুজনে। বললুম, 'বাঁধের জরীপ হবে বুঝি ?

'হ্যাঁ।' .... বলে বীরেশ্বর কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'এসেছ যখন—ক'দিন থেকেই যাও। শিমুলিয়ায় খারাপ লাগলে আমার বাড়ি চলে এসো।'

হেসে বললুম, 'কাল রাতে বা আজ সকালে তো এ অফার দাওনি বীরু। অথচ মনে মনে তাই

চেয়েছিলুম, তোমার দিব্যি। মনে খানিকটা দুঃখও হয়েছিল।'

বীরেশ্বর হাসল না। চিন্তিত দেখাচ্ছিল ওকে। বলল, 'তাই বুঝি! হ্যাঁ—বলিনি। কারণ ছিল তখন।'

'কী কারণ, শুনি?'

বীরেশ্বর তেতো মুখে বলল, 'তোমাকে খুলেই বলি। কাল রাত্রে ফের শালা আই-বিরা আমাকে জ্বালাতে এসেছিল। এই ইরিগেশানের লোক সেজে এসেছিল। আমার চোখে ধোঁকা দেবে? আমি অমন কত টিকটিকি পুড়িয়ে খেলুম।'

'আই-বি! সেকী! কেন?'

'তোমাকে তো সবই বলেছি। লেফটিস্ট পলিটিক্স করতুম—সেই অপরাধ। অথচ কবে থেকে ছেড়েছুড়ে বাবার বিষয়-সম্পত্তিতে মন দিয়েছি। তবু গন্ধ গেল না গা থেকে। কাল রাতটা মনে মনে বড্ড উত্ত্যক্ত ছিলুম ভাই। তাই তোমাব সঙ্গে ভাল করে কথাও বলতে পারিনি। মন সর্বক্ষণ অন্য জায়গায় ব্যস্ত থাকলে যা হয়।'

'তারপর কী হল শেষ অবধি?'

'কী হবে!' ... বীরেশ্বর সিগ্রেটটা ঘাসে গুঁজে বলল, 'এসেছিল—চলে গেল। যাকগে আমি খুব রিলিফের মধ্যে আছি। একটু আগেই ভাবছিলুম, তোমার কথা—যাব নাকি একবার শিমুলিয়ায়! কিন্তু এদিকে এনাদের আসবার কথা।'

মনে ছটফটানি নিয়ে বললুম, 'এখান থেকে এখন উঠবে তুমি?'

'একটু দেরি হবে। কেন, এখানে ভাল লাগছে না তোমার? বসো না কিছুক্ষণ। বাড়ি সময়মত ফিরব। এসব নদীনালা মাঠ-ঘাট জঙ্গল তো তোমার ভাল লাগার কথা।'

ইরিগেশানের দুজনে তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত ওদিকে। ছোট্ট তাঁবু। ক্যাম্পখাটও রয়েছে দুটো। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম রয়েছে। হঠাৎ মাথায় এল, এঁদের পিওন বা আর্দালী বেয়ারা সঙ্গে অবশ্যই থাকবার কথা। কই? মুখ বুজে থাকতে পারলুম না। বললুম, 'বীরু, এঁদের সঙ্গে আর্দালী দেখছিনে যে?'

তক্ষুনি বীরেশ্বর চমকে গিয়ে বলল, 'আরে তাই তো! ও স্যার, আপনাদের বেয়ারা আর্দালী আনেননি কেন? রান্নাবান্না এসব কে করবে?'

প্রথম হ্যাটধারী হেসে বলল, 'জঙ্গলে যাচ্ছি শুনেই আমার বেয়ারার জ্বর। মিঃ দাশগুপ্তের বেয়ারার আমাশা। হঠাৎ লোক পাই কোথায় তখন? বলে এসেছি অফিসে। আগামী কাল বিকল্প লোক এসে যাবে। তাছাড়া অন্যান্য স্টাফও আসবে।'

দাশগুপ্ত বলল, 'সেনগুপ্ত মরিয়া হয়ে চলে এল—আমি ..কটু ইতস্তত করছিলুম। ও বলল, বীরেশ্বরবাবু যখন আছেন, ভাবনা নেই। আগাম গিয়ে তো বসে পড়া যাক্।'

বীরেশ্বর বলল, হ্যাঁ—তা ভাবনা নেই। এরা তিনজনই থেকে যাবে আপনাদের কাছে। বন্দুক আনবেন বলেছিলেন, আনেননি স্যার? বাঘ-টাঘ এখানে আছে কিন্তু।'

দাশগুপ্ত মাথা দোলাল।....'হুঁ-উ। আমার আবার শিকারের শখ প্রচণ্ড।'

সেনগুপ্ত বলল, 'আমারও। রিয়েলি, বেশ চমৎকার জায়গা এটা কিন্তু। বাঘ থাক বা না থাক, প্রচুর পাখি রয়েছে। কাজের দিনগুলো ভাল কাটবে। কাল-পরশুর মধ্যে আরও দুচারজন মিনিয়াল স্টাফ এসে যাচ্ছে। তখন আর কোন অসুবিধে হবে না।'

দুজনে এতক্ষণে দুটো বন্দুক বের করল। বিকেলের আলো কমে আসছে। একটু দুরে বসে রয়েছি বলে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম না বন্দুক দুটো কী- -আইনী কিংবা বে-আইনী। আইনী কি না সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন টের পেল—ও দুটো নিছক নিরীহ পাখিমারা ভদ্রলোক বন্দুক নয়—সম্ভবত বিদেশী জিনিস, এবং হয়তো বা এক *বিশেষ গড়নের রাইফেলই। এ ধরনের রাইফেল* আমি ইতিপূর্বে দেখেছি বলে মনে পড়ল। অমার গায়ে কাঁটা দিল সঙ্গে সঙ্গে।

বীরেশ্বর ঘড়ি দেখল হঠাৎ। .....'ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে আজকের মত উঠি। আমার লোকেরা রইল। কোন অসুবিধে হবে না। কাল ভোরে এসে পড়ব'খন। পাঁচু, তোরা রইলি, কেমন? এস আনোয়ার।'

এবার দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে বলল, 'এঁকে তো চিনলুম না!'

বীরেশ্বর আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমার বাল্যবন্ধু। আনোয়ারুল চৌধুরী। বহুকাল আগে ওই গাঁয়ে ওদের বাড়ি ছিল। এখন কলকাতায় থাকে। জন্মভূমির কথা মনে পড়েছে এতদিনে।' ... সে হেসে উঠল।

আমরা পরস্পর নমস্কার করলুম।

বীরেশ্বর অন্তরঙ্গভাবে আমার হাতটা হাতে নিয়ে বলল, 'আনোয়ারকে স্যার তাই বলে আমার দলে ফেলবেন না। ও নিরীহ ছাপোষা মানুষ, আমার মত জেলখাটা দাগী নয়, রাজনীতিরও ধারে-কাছে মাড়ায় না। কিন্তু বড্ড বাতিক আছে পদ্য লেখার। তাই না আনোয়ার?'

সেনগুপ্ত বলল, 'তাই বুঝি ? আপনি তাহলে পোয়েট ? আই লাইক টু রিড পোয়েমস। কোন কাগজে লেখেন?'

বিব্রত মুখে বললুম, 'না-না। তেমন কিছু না।'

বীরেশ্বর আমাকে টানতে টানতে ব্রিজে গিয়ে উঠল। তারপর হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, 'আমার ওখান থেকে এসে আর কোথায় ঘুরলি?'

তার মুখে তুই সম্বোধন শুনে খুশি হলুম। বললুম, 'বাবুগঞ্জ গেলুম। তারপর এই ব্রিজের কাছে নেমেছিলুম বাস থেকে।'

বীরেশ্বর যেন চমকাল। ....'তাই নাকি ? হঠাৎ এখানে কী?'

'এমনি। দেখতে ইচ্ছে হল নদীটাকে।'

'হুঁ! জঙ্গলে ঢুকেছিলে নাকি ? তোর আবার প্রকৃতি-ট্রকৃতির কী সব ব্যাপার আছে। নাকি সেগুলো আর নেই মাথায়? নেচার-নেচার করে কী তর্ক করতিস মনে পড়ে ?'

'পড়ে। এখনও রোগটা মাথা থেকে যায়নি রে বীরু। দুপুরে জঙ্গলে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও গেছি। একটা মুসহরের সঙ্গে দেখা হল। তার পাখি ধরা দেখলুম।'

বীরেশ্বরকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বলল, 'বাঃ! কিন্তু অমন করে জঙ্গলে যাওয়া তোর ঠিক হয়নি। আজকাল একজোড়া বাঘের উপদ্রব হয়েছে। খুব জ্বালাচ্ছে।'

'তুই তো ভাল শিকারী। মারছিস না কেন?'

'পারছি কই? আজ দুপুরে তো আমিও এসেছিলুম জঙ্গলে। বলেনি মুসহরটা? দেখা হয়েছিল আমার সঙ্গে।'

'না তো!' ... অবাক হবার ভঙ্গি করে বললুম, 'কী আকাট ! আমি জানতে পারলে কী আনন্দ না হত রে ! কাল বেরোবি বীরু? তাহলে তোর সঙ্গে আসতুম বরং। জঙ্গলে বেড়ানোর মত আনন্দ আর কিছুতে নেই, ভাই।'

বীরেশ্বর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, 'তা আসিস। কিন্তু বাঘ মারতে গেলে আমি কাকেও সঙ্গে নিইনে। অন প্রিন্সিপ্‌ল্। বাঘ মারা তো পড়েই না—নিজেকে বা সঙ্গীকে বাঁচানো কঠিন হয়।'

দুজনে এইসব এলোমেলো কথা বলতে বলতে হাঁটছিলুম রাস্তায়। সূর্য ডুবে গেল রাণীহাট পৌঁছতে। হঠাৎ বীরেশ্বর বলল, 'আচ্ছা আনু, তোর লাইলিকে মনে পড়ে ?'

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। বললুম, লাইলি...লাইলি....ওঃ হো। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়েছে। সে তো আমাদের গাঁয়ের মেয়ে ছিল। মৌলবীর কাছে পড়ত, মাঠে ছাগলও চরাত। বেশ ফরসা রং, চেহারাটা মোটামুটি সুন্দর...'

বীরেশ্বর হেসে বলল, 'মোটামুটি সুন্দর কী—সুন্দরীই বল্।'

'তাই হল। সেই লাইলির কোথায় বিয়ে হয়েছে রে? আমার একটুও মনে ছিল না তো ওর কথা—আশ্চর্য!'

'হুঁ, আশ্চর্য বটে !' ...বীরেশ্বর হাসতে লাগল।

'কী হল? হাসছিস যে?'

সে হঠাৎ আমার কাঁধে একটা আলতো ঘুষি মেরে বলল, 'আনোয়ার!' তুমি শালা বড্ড ন্যাকামি করতে পার দেখছি।'

আমার বুকে হাতুড়ি পড়তে লাগল। বললুম, 'কেন, কেন বীরু?'

'উরে শালা!'.. বীরেশ্বর বিকট হেসে উঠল। .... এক সময় মেয়েটার পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরত—ভালবাসাবাসির খেলায় চাঁদু আমার লাইলির মজনু সেজে বসেছিল—আর বলে কি না, কই, মনে তো পড়ে না লাইলিকে!'

আশ্বস্ত হয়ে বললুম, 'যাঃ—অত কিছু নয়। তা, কোথায় আছে রে সে?'

বীরেশ্বর অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে?'

'হচ্ছে বই কি।' ...মিটিমিটি হাসতে হল আমাকে। .... 'অত বলছিস যখন, এতকাল পরে এলুম—সব দেখে যাব, আর বাল্যপ্রণয়িনীকে দেখে যাব না একবারটি?'

বীরেশ্বর হঠাৎ দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এখানে আসার পর কিছু শুনিসনি লাইলি সম্পর্কে?'

'লাইলি সম্পর্কে? না তো? বললুম না—ওকে ভুলেই তো গিছলুম।'

'শিমুলিয়ার লোকে কেউ কিছু বলেনি? তোর ফৈজুচাচা?'

'না তো। তোর দিব্যি।'

'আশ্চর্য তো!' ... বীরেশ্বর কী যেন ভাবতে লাগল।

'কেন? লাইলির কী ব্যাপার?

বীরেশ্বর হাঁটতে লাগল...'সব বলছি, চল! লাইলি এখন এ এলাকায় —শুধু এ এলাকা কেন, সারা জেলাতেও বলতে পারিস, এক প্রখ্যাত কিংবা কুখ্যাত মেয়ে।'

'সে কী!'

'চল্, ঘরে গিয়ে সব বলব।...'

বাড়িতে পৌঁছে গত রাত্রে যে ঘরটায় ছিলুম, সেই ঘরের দরজা খুলে দিল বীরেশ্বর। তারপর ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই অন্যবেশে ফিরল। বলল, 'আনু, এক কাণ্ড হয়ে গেছে রে! পিসিমার হঠাৎ অসুখটা বেড়ে গেছে। এখনই আমাকে একবার বাবুগঞ্জ দৌড়তে হবে, ভাই! এখানেও ডাক্তার আছে। কিন্তু বাবুগঞ্জের ডাক্তারই ওঁর চিকিৎসা করছেন। তুই ততক্ষণ বিশ্রাম কর। বই-টই পড়—আলমারির চাবি দিয়ে যাচ্ছি। আমি ঘণ্টা দুতিনের মধ্যেই ফিরব। কোন অসুবিধে হবে না। লোক আছে—বলা রইল। তোকে চা-টা দিয়ে যাবে।'

সে বেরিয়ে গেল। একেবারে শিকারীদের পোশাক পরনে। হাতে বন্দুক। বাইরে মোটর সাইকেলের শব্দ শুনলুম। মোটর সাইকেল আছে বীরেশ্বরের। আলমারি ভর্তি বই রয়েছে। বীরেশ্বরের বাবার পারিবারিক লাইব্রেরি। এক সময় ওরা জমিদার ছিল। আলমারি খুলে একটা বই বেছে নিলুম। বইটা নতুন ইংরিজি এবং পেঙ্গুইন সিরিজের। নিশ্চয় ওর বাবার সংগ্রহ নয়। বীরেশ্বর এইসব বই পড়ে? অবাক লাগল। বইটা খুব বিখ্যাত বই—'আরবান গেরিল্লাস।' পাতা ওল্টাতে থাকলুম। .....

চার

বীরেশ্বরের মোটর সাইকেলের আওয়াজ যখন কানে এল, তখন রাত বারোটা দশ। এতক্ষণ লম্বা কয়েকটি ঘণ্টা আমার যা কেটেছে, অবর্ণনীয়। কিন্তু পেশাগত অভ্যাসে ধৈর্য বস্তুটা আমার মধ্যে পুরোপুরি থাকায় খুব একটা মাথা খারাপ করে ফেলেনি। নিঃঝুম সুমসান পাড়াগেঁয়ে রাত, একলা ঘরে থাকা, খাটের নিচে কোথাও ঘুণপোকার উৎকট অবিশ্রাম কট কট শব্দ—যা মনে হচ্ছিল আমার মাথার ভিতরেই রয়েছে, দেয়ালের প্রকাণ্ড সেকেলে বিলিতি ঘড়ির টক টক একঘেয়ে আওয়াজ ... উঃ, সে এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

বীরেশ্বর এসে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়িস নি দেখছি! বড্ড দেরি হয়ে গেল, ভাই। এক কাজে গিয়ে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়েছিলুম। ডাক্তার-ফাক্তার তো পেলুমই না, মাঝখানে .... থাক্ গে! তোর কোন অসুবিধে হয়নি তো? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ—তোর লোকটা কোন ব্যাপারে ত্রুটি রাখেনি।'

'বোস। আমি আসছি এক্ষুনি।'... বলে সে ভিতরে চলে গেল।

বাইরে ওর লোক মোটর সাইকেলটা কোথায় রাখতে গেল, শুনতে পেলুম। ওদের পার্টির গোপন মিটিং খুব জাঁকালভাবেই হয়েছে, বোঝা যাচ্ছিল। কিছু নিয়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল নাকি যে এত দেরি?

মিনিট দশেক পরে বীরেশ্বর একটা ডোরাকাটা পাজামা আর গেঞ্জি পরে ফিরে এল। হাতে জ্বলন্ত সিগ্রেট। মৌরী চিবুচ্ছে সে। মৃদু হেসে বলল, 'দেরি দেখে ভাবছিলি নাকি?'

'একটু ভাবনা হচ্ছিল বই কি।'

'আর বলিস নে! শালা কী পাপে যে রাজনীতি করতে গিয়েছিলুম, এখনও গায়ের গন্ধ গেল না। সরকার এক গাদা টিকটিকি লাগিয়ে রেখেছে পেছনে। সব সময় শালারা আমার ওপর নজর রেখেছে। জ্বালিয়ে শেষ করে দিলে, মাইরি!'

চোখে তীব্র কৌতূহল এনে বললুম, 'তাই নাকি? আজ এখন কিছু গোলমালে পড়িসনি তো বীরু?'

বীরেশ্বর মিটিমিটি হাসতে লাগল।

'বলছিস না যে?'

'ছেড়ে দে।' ...বলে দু তিন মিনিট সে নিঃশব্দে সিগ্রেট টানতে থাকল। তারপর মুখ খুলল। ... 'তখন তোকে লাইলির কথা বলছিলুম!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' ....সোৎসাহে লাফিয়ে উঠলুম। .... 'লাইলি খুব বিখ্যাত মেয়ে হয়ে উঠেছে, বলছিলি। নির্ঘাত কোন পলিটিক্যাল পার্টির নেত্রী—না কী?'

বীরেশ্বর সন্তর্পণে যেন চমকাল। এবং ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'তুই তো জানিস দেখছি!'

অপ্রস্তুত হয়ে তখুনি বলে উঠলুম, 'না—মানে তোর কথার আঁচে তাই মনে হচ্ছিল। তাছাড়া আর ওর মত মেয়ে খ্যাতি কুড়োবে কিসে?'

বীরেশ্বর কানের লতি চুলকে বলল, 'বিস্তর রাস্তা আছে। ডাকাত দলের সর্দারনী হতেও তো পারে। এর সঙ্গে একটা সিক্রেট পলিটিক্যাল পার্টি জড়িয়ে দিলেই লাইলি পরিষ্কার হল।'

'সে অসম্ভব। অবিশ্বাস্য।'

'কেন? মধ্যপ্রদেশের তামিনা বাঈ, হিমাচল প্রদেশের আজুরী, হরিয়ানার সিন্ধুমতী—এরা সব কে? কাগজে পড়িসনি এদের কথা? সরকারকে কেমন অতিষ্ঠ করে রেখেছে এখনও!'

'কিন্তু তাই বলে লাইলি! এক পাড়াগেঁয়ে ছাগলচরানী মেয়ে!'

বীরেশ্বর হো হো করে হেসে উঠল। ....'ওরা এক সময় সবাই ওই রকম পাড়াগেঁয়ে ছাগলচরানী মেয়েই ছিল। জীবনী খুঁজলে ওসব ব্যাপারই পাবি আনু। কার মধ্যে কী সম্ভাবনা আছে, কেউ বলতে পারে না। সময় আর পরিস্থিতি, সুযোগ আর তালিম সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব করে দেয়। এই লাইলির কথাই ধর।.....'

বীরেশ্বর এবার লাইলির যে কাহিনী শোনাল, তা এই :

আমরা চলে আসার এক বছর পরে লাইলির মা ওর বিয়ে দ্যায় পাশের গাঁয়ের একটা বয়স্ক চাষীর সঙ্গে। লোকটার বউ ছিল আর একটা। সেই বউটা সতীনকে কিন্তু মোটামুটি ভালই বাসত। স্বামীর সঙ্গে লাইলিকে শুতে দিয়ে নাকি আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকত। এ এক ধরনের যৌনবিকৃতির মনস্তত্ত্বও হতে পারে। লাইলির বয়স তখনও স্বামীসংসর্গ করার ঠিক উপযুক্ত হয়নি। ফলে লাইলি স্বামীর শয্যাসংক্রান্ত কার্যকলাপ অত্যাচার বলেই ধরে নিত এবং গায়ে হাত দিলেই ভীষণ চ্যাঁচামেচি কান্নাকাটি করত। পালিয়ে আসতে চেষ্টা করত বিছানা থেকে। তখন ওর বয়স্ক সতীন অকুস্থলে হাজির হয়ে আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত, সে স্বামীকে ভর্ৎসনাও করত। হঠাৎ একরাতে লাইলির সতীন করল কী, সে জোর করে লাইলিকে বিছানায় ধরে রাখল এবং স্বামীকে বলপ্রয়োগে

উৎসাহিত করল। ফলে যা অত্যাচার হবার হল। হুঁ, অত্যাচার ছাড়া কী? সদ্যোচ্ছিন্ন কুঁড়িকে গায়ের জোরে পাপড়ি খুলে বিকশিত ফুলে পরিণত করার চেষ্টাকে বীভৎস অত্যাচার বলাই উচিত। সে রাতে এত জঘন্য ব্যাপার হল যে লাইলি আহত হয়ে যন্ত্রণায় সারারাত কাঁদল, আর বিছানা ভেসে গেল তার 'কুমারী' (বীরেশ্বরের ব্যবহৃত শব্দ) রক্তে।

পরদিন সন্ধ্যায় সুযোগ পেয়ে আহত শরীরে কোন অবিশ্বাস্য শক্তিতে লাইলি প্রায় বুকে হেঁটে পালিয়ে এল স্বামীর বাড়ি থেকে।

কিন্তু ওর মা উল্টে ওকে লাঞ্ছনার একশেষ করল। এ তো গাঁয়ে-গাঁয়ে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার মেয়েদের জীবনে! দশ থেকে বারো-তেরোর মধ্যেই সব মেয়ের বিয়ে হয় চাষী-সমাজে। এ ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। মেয়েদের এটা সয়ে নিতে হয়। সয়ে যায় ক্রমশ। লাইলি কী এমন সৃষ্টিছাড়া যে তার সইবে না? তাছাড়া দারিদ্র্য--সেও একটা ভয়ানক কথা। বুড়ো বয়সে ঘুঁটে কুড়িয়ে নিজের পেটই চলে না। মেয়েকে পুষবে কেমন করে? ফলে লাইলীর লাঞ্ছনার সীমা রইল না।

মা তার জামাইকে খবব দিয়ে আনাল। জোর করে আবার সেই রাতেই পাঠিয়ে দিল স্বামীর ঘরে। লাইলির তখন প্রচণ্ড জ্বর।

ক'দিন বাদে অবশ্য বিনি চিকিৎসায় সে সেরে উঠল। সেই হাঁটি হাঁটি পা-পা অবস্থা থেকে যে মেয়েরা রোদ বৃষ্টি ঝড় শীত গায়ে নিয়ে বড়ো হয়েছে, আরণ্য প্রকৃতির পাঠশালায় যারা জীবন সম্পর্কে পাঠ নিয়েছে, তাদের প্রকৃতি যেন শক্তিও দিয়েছে প্রচুর। সহজে তারা কাবু হয় না। প্রকৃতির এক বীজাণু তাদের রোগ দেয়, অন্য বীজাণু সেই রোগ হবণ করে। 'নেচারকিওর' হয়তো সর্বশ্রেষ্ঠ স্বতঃচিকিৎসাপদ্ধতি প্রকৃতিচর আদিম মানুষের জীবনে। প্রকৃতিনন্দিনী লাইলি আবার উঠে দাঁড়াল সূর্যমুখীর মত।

একরাতে তখন আবার তার স্বামী তার স্বাভাবিক এবং আইনসঙ্গত কাম নিয়ে লাইলিকে আকর্ষণ করল। কামান্ধ পুরুষকে নিবৃত্ত করতে হাত ওঠাল লাইলি। পারল না। তখন হঠাৎ সে এক কাণ্ড করে বসল।

সে তৈরি হয়েই ছিল আগে-ভাগে। বালিশের পাশ থেকে একটা ধারালো কাটারি তুলে নিয়ে সে করল কী, এক ধাক্কায় পায়ের নীচে চিৎপাত স্বামীর যৌনাঙ্গটি কেটে ফেলল।

বাবুগঞ্জ থানায় হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হয়েছিল সে রাতে এক গ্রাম্য কিশোরী।.... 'আমি খুন করেছি দারোগাবাবু, আমার স্বামীকে খুন করে ফেলেছি।'

এই খুনের মামলায় ওর মায়ের ভিটেটুকু বিকিয়ে গেল। মেয়েকে বাঁচাতে চেয়েছিল মা। সেসন জজ কিন্তু জুরীদের রায় মেনে নিলেন না। লাইলি বেঁচে গেল আইনগত কী জটিলতায়। আর ফরিয়াদী পক্ষও গরিব। হাইকোর্ট অবধি যাবার সাধ্য ছিল না—উৎসাহও হয়তো ছিল না।

দীর্ঘ তেরো মাস বিচারাধীন হাজতবাস করে যে লাইলি ফিরে এল, সে তখন অন্য মেয়ে। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া আর ছায়ায় থাকাব ফলে তার স্বাস্থ্যসৌন্দর্য অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। মা আবার তার বিয়ের যোগাড় করতে ব্যস্ত হল। তখন এই রাস্তাটা হাইওয়ে হয়েছে সবে। কিছুদূর অন্তর-অন্তর একদল করে রোডকুলি নিয়মিত রাস্তা দেখাশোনা করছে। তাদের দলেই ছিল একটি যুবক। খুব শৌখিন প্রকৃতির মানুষ সে। পৈতৃক মাত্র কয়েক কাঠা চাষের জমি অবশিষ্ট ছিল তার। রোডকুলির চাকরি পাবার পরই সে জমিটা বেচে কিনে ফেলল একটা সাইকেল আর একটা ট্রানজিস্টার। প্রতি ভোরে সে সাইকেলের পিছনে কোদাল ঝুড়ি আর সামনে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে মহানন্দে রাস্তায় কাজ করতে যায়।

স্বামীহন্ত্রী লাইলিকে কেউ বিয়ে করতে চাইছিল না—এই যুবকটি কিন্তু রাজি হয়ে গেল। এখন লাইলি রাজি হলেই হয়ে যায়। তার মা এবার মেয়ের অমতে বিয়ে দিতেও ইতস্তত করছিল। ওকে আর তো বিশ্বাস করা যায় না!

আশ্চর্য, লাইলি রাজি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিয়ে হল। এবং এরপর যা দৃশ্য দেখা গেল, তা এই পাড়াগেঁয়ে জীবনে অভিনব, বিস্ময়কর।

রাতের অবসরে নতুন স্বামী কামাল হোসেন বাঁজাডাঙায় লাইলিকে সাইকেল চাপানো শেখায়। কিছুদিন পরে দেখা গেল লাইলি সালোয়ার-কামিজ পরে চুলে বেণী বেঁধে রাণীহাট মাইনর গার্লস স্কুলে পড়তে যাচ্ছে—সাইকেল চেপেই যাচ্ছে। ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হয়েছে চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের মেয়েটি—রীতিমত বউ সে!

ক্লাস সিক্সে ভালভাবে পাস করল লাইলি। ততদিনে বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে। প্রতিদিন হাইওয়েতে সাইকেল চেপে আসা মেয়েটি সম্পর্কে কৌতূহল হয়েছিল বীরেশ্বরের। লাইলির রূপ তখন ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদের মতন স্নিগ্ধ আর সোনালি জ্যোৎস্নায় অনুপম। একদিন হল কী, স্কুল থেকে ফেরার পথে হাইস্কুলের কিছু ছাত্র লাইলিকে অশ্লীল কথা বলে বসে। লাইলি তক্ষুণি সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল গাছে ঠেস দিয়ে রাখে এবং তাদের একজনকে চড় মারে। জামা ছিঁড়ে দ্যায়। অন্যেরা তখন তাকে ঘিরে ফেলে। ব্যাপারটা কদ্দূর গড়াত কে জানে, বীরেশ্বর এসে পড়ে হঠাৎ। বীরেশ্বরকে দেখা মাত্র ছেলেগুলো দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এভাবেই পরস্পর পরিচয় হয় ওদের। সেদিন শিমুলিয়া অবধি বীরেশ্বর লাইলির সঙ্গে গেল—পৌঁছে দিয়ে এল। পড়ন্ত বিকেলে এক দুর্ধর্ষ বিশালদেহী সুন্দর যুবক, তার পাশে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে কথা বলতে বলতে নির্জন হাইওয়েতে হেঁটে যাচ্ছে এক রূপসী সদ্যযৌবনা ছাত্রী—এই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসে।

বাবুগঞ্জে মেয়েদের হাইস্কুল আছে। কামাল হোসেন বাহান্ন টাকা মাইনে পায়। সে রাজি ছিল ওকে পড়াতে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

এক দুপুরে একজন মাতাল লরি-ড্রাইভার রাস্তার ধারে বিশ্রামরত রোডকুলিদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। ব্রেক ফেল করেছিল নাকি। কামাল হোসেন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। অন্যান্যেরা সাংঘাতিক আহত হয়ে পরে তিনজন মারা গেল—বাকি দুজন পঙ্গু হয়ে বাঁচল।

দু চোখে অন্ধকার দেখল লাইলি। তখন তার মা-ও বেঁচে নেই। বীরেশ্বর তাকে চাকরি করার পরামর্শ দিল। মাইনর পাস, তাছাড়া, মুসলিম অনগ্রসর সমাজের মেয়ে, চাকরি পাবার সম্ভাবনা লাইলির প্রচুর।

তখন গ্রামে-গ্রামে পাঠশালার পরিকল্পনা চলেছে সরকারের। কথা হল, শিমুলিয়ায় প্রাইমারি স্কুল হবে। লাইলি আপাতত বিনা বেতনে সেখানে পাঠশালাটা চালু করুক। লোকেরাও রাজি। জায়গা পাওয়া গেল স্কুলের। ক্লাসও শুরু হল। লাইলি একা পড়ায়। স্কুল মঞ্জুর হলেই তার চাকরিও হয়ে যাবে।

এমন সময় ঘটল দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। বীরেশ্বর হঠাৎ রাগের মাথায় একটা লোককে খুন করে বসল। বীরেশ্বরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করল। তারা সারা গায়ে রক্ত। তাকে বাবুগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হবে—বাসের অপেক্ষায় পুলিশ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় লাইলি উদ্‌ভ্রান্তের মত সেখানে গিয়ে হাজির। সাইকেল থেকে নেমে সবার সামনেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বীরেশ্বরের বুকে। রক্তে সে-ও লাল হয়ে গেল। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য।

কেউ জানত না এতদিন গোপনে কী ঘটছিল, আজ হঠাৎ তা প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হল। লাইলি যে এত 'প্যাসোনেট মেয়ে' (বীরেশ্বরের ভাষায়) তাও জানা ছিল না কারো। সে ফুলে ফুলে কাঁদে—'কেন, কেন তুমি এমন করলে! আমার যে কত সাধ ছিল! .....'

কী সাধ ছিল গোপনে রাখা—দুর্ভাগ্য কামালের, সে-ও জানত না। সে বেঁচে থাকলে এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে ঘৃণায় দুঃখে আত্মহত্যা করে বসত নির্ঘাত। এত বেইমান মেয়ে লাইলি!

চাষী মুসলিম মেয়ে। সৌন্দর্যবতী। মোটামুটি শিক্ষিতা। তার প্রতি লোকের একটা মোহ জন্মেছিল ক্রমশ। সেটা ভেঙে ঘৃণা জন্মাল। শিমুলিয়ার মুসলমান সমাজ ফেটে পড়ল ক্রোধে। ওকে একঘরে করল। ওর নামে দরখাস্ত গেল স্কুল বোর্ডে। স্কুলে অন্য মাস্টারের ব্যবস্থা করা হল। শুধু তাই নয়, হিন্দু যুবককে ভালোবাসার অপরাধে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তার ঘর জ্বালিয়ে দিল। তারপর তার চুল কেটে গলায় জুতোর মালা ঝুলিয়ে গাঁয়ের বাইরে রেখে এল। তারপর আর তাকে কেউ দ্যাখেনি।.....

বীরেশ্বর তখন হাজতে। সে শুনল সব। কিন্তু জামিন পেল না। তারপর তার ফাঁসির বদলে বয়স বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। বীরেশ্বরের বাবা এক সময়ের জমিদার—প্রভাবশালী লোক। মামলা তুললেন হাইকোর্টে। এবার বীরেশ্বরের ওপর ফৌজদারী তিনশো দুধারা চার্জ, পরে একশো চল্লিশধারা। মেয়াদ কমে দাঁড়াল এক বছরে।

বীরেশ্বরের বাবা এরপর মারা যান। হঠাৎ একদা বীরেশ্বর জেল থেকে পালিয়ে এল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—শুধু লাইলি—লাইলিকে সে দেখতে চেয়েছিল। কেন লাইলি তার সঙ্গে একবারটিও দেখা করল না আর, জানবার তীব্র কৌতূহল হয়েছিল তার।

তখন কোথায় লাইলি? কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। বীরেশ্বর হন্যে হল খুঁজে। লাইলি আশ্চর্যভাবে উবে গেছে যেন। তখন সে নিজেই ধরা দিল পুলিসের হাতে। জেল পালানোর ফলে তার মেয়াদ চারগুণ বেড়ে গেল এবার।...

জেল থেকে একদিন ফিরে এল বীরেশ্বর। লাইলিকে ভুলে গেল, কিংবা ভুলতে চেষ্টা করার ফলেই ভুলেই গিয়েছিল ইতিমধ্যে। দেশে এসে এবার সে পূর্ণোদ্যমে বামপন্থী রাজনীতি করতে ব্যস্ত হল। জেলে থাকতেই এ ব্যাপারে দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল তার। কয়েক বছরেই সে এই এলাকার একজন গণ্যমান্য নেতা হয়ে উঠল।

সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনাচক্রে কলকাতায় তার সঙ্গে লাইলির দেখা হয়ে যায়। রাস্তায় পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে। বীরেশ্বর বলে ওঠে, 'লাইলি না?'

লাইলি বলে ওঠে, 'বীরুদা!'

এন্টালি এলাকার এক বস্তীতে নাকি লাইলি থাকে—তার এক দূর-সম্পর্কের দাদা হানিফ আলির সঙ্গে। ক্রমশ বীরেশ্বর টের পেল, লাইলির বর্তমান পরিচয় কী এবং হানিফই বা কে?

যেদিন অপমানিতা লাঞ্ছিতা লাইলি মূর্ছাহতের মত হাইওয়েতে হেঁটে যাচ্ছিল, কোথায় যাবে জানত না—তাকে পথ থেকে তুলে নিল ইসমাইল নামে এক বাস-ড্রাইভার। ইসমাইল কামালের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। সেই সুবাদে পরিচয় ছিল ওদেব। ওই অদ্ভুত বিকৃত চেহারায় লাইলিকে পাগলের মত পথে যেতে-দেখে সে বাস থামিয়ে তার কাছে যায়। ভেবেছিল, হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে কামালের বউটা। গলায় জুতোর মালা, মাথা খাপ-ছাড়াভাবে কামানো, গা-ময় পাঁক। লাইলি মূর্ছিত হয়ে পড়ে তক্ষুনি।

বরহমপুরে ইসমাইলের বাড়ি। তার ছোটভাইয়ের নামই হানিফ। হানিফ কলকাতায় কুখ্যাত গুণ্ডা ছিল একদা। তাকে যোল বছরের জন্যে নির্বাসিত করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। বহরমপুরে গিয়ে দাদার বাড়ি বাস করছিল। বিয়ে করেনি। যোল বছর ধরে ফুটপাতে যন্ত্রপাতির সেকেন্ডহ্যান্ড পার্টস বিক্রি করা তখন তার পেশা। গুণ্ডামি একটু-আধটু করে—কিন্তু খুব সাবধানে। এবং পুলিশকে হাতে রেখেই করে। লাইলি যখন গেল, তখন হানিফের বয়স প্রায় ষাট—কিন্তু শক্তসমর্থ যুবকের মতই সে যে-কোন কাজ করতে পারে। ইসমাইল তার দু-বছরের বড়—ইসমাইলও ছোটভাইয়ের মত সমর্থ মানুষ। কিন্তু সচ্চরিত্র। ছোটভাইকে সে ধর্মোপদেশ দেয় দুবেলা। গাল-মন্দও করে। হানিফের ছোঁকছোঁকানি তার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হানিফকে ভালবাসেও খুব। তাই তাড়াতে পারে না আশ্রয় থেকে।

লাইলি হানিফের ফুটপাথের দোকানে গিয়ে বসে থাকতে লাগল তারপর। হানিফ এই মেয়েটির সব শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল তার প্রতি। আর লাইলিও এই বুড়ো গুণ্ডার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করত। তার অন্ধকার জীবনের কাহিনী শুনতে ভালবাসত। বুড়ো চাপাগলায় সব কুকর্মের কথা বলে যেত নির্দ্বিধায়। এতদিন যেন সে তার জীবনের যাবতীয় কীর্তি-কাহিনী বলে নিজেকে হাল্কা করার লোক খুঁজছিল, পেয়ে গেছে। সে যেন বলতে চায়, এই দ্যাখ, জীবনকে কী চোখে আমি দেখছি, জীবন আমাকে কী দিয়েছে, আর আমিই বা কী দিয়েছি তাকে!

আস্তে আস্তে পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করে নিচ্ছিল যেন। লাইলি ক্রমশ টের পেল, হানিফ এখনও লাইনে আছে। অনেক রাতে তার কাছে লোকেরা আসে। ফিস ফিস করে কথা বলে যায়। হানিফও চুপি চুপি বেরিয়ে যায়। লাইলি সব জানতে পারে। একদিন চুপি চুপি সে হানিফকে অনুসরণ

করল। সেদিনই আবিষ্কার করল গঙ্গার ওপারে যে বিজলী তারের লাইন গেছে, হানিফের লোকেরা সেই তার কাটছে। লাইলি সোজা গিয়ে হাজির হল হানিফের সামনে। হানিফ অস্ফুট চিৎকার করল। কিন্তু লাইলি হাসল শুধু।

সেই শুরু। তারপর লাইলি কাজে লাগে ওদের। সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। রাহাজানি ছিনতাই খুন-খারাবি—যত রকমের অপরাধ থাকে, বেড়ে যেতে থাকল বহরমপুরে। পুলিশ টের পেল, একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েও আছে এ দলে।

ইতিমধ্যে হানিফের নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সে লাইলিকে নিয়ে কলকাতা পালাল। লাইলি তার মেয়ে, লাইলি তার মা।

কলকাতায় লাইলি নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করল। সে নির্দ্বিধায় পিস্তল ছুড়ে মানুষ খুন করতে পারে তখন—একটুও হাত কাঁপে না। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ততদিনে। এক কামান্ধ পুলিশ অফিসারকে ও নিষ্ঠুর হাতে ভোজালিতে কুপিয়ে কেটেছে। বলা বাহুল্য, এটা নকশালদের নামে চালানো সম্ভব হয়েছিল।....

বীরেশ্বরকে দেখে লাইলি আবার অস্থির হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে হু হু করে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। 'বীরুদা, আমার আর একটুও ভাল্লাগে না এসব। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল। এখানে থেকে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আর পারছি না বীরুদা!'

বীরেশ্বরের মাথায় এক মতলব খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে কলকাতা গিয়েছিল বিশেষ একটা ব্যাপারে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে সদ্য। সে আরও সরাসরি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের পক্ষপাতী অর্থাৎ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস নেই। সে চায় প্রত্যক্ষ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু নকশালপন্থীদের সঙ্গেও তার মতের মিল নেই। সে-ও সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় বিশ্বাসী। কিন্তু 'অ্যাকশন' সম্পর্কে তার মতামত ভিন্ন। সে কিছু জোতদার বা পুলিশ কিংবা ওই ধরনের খুন-খারাবি করে প্রাথমিক পর্যায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির পথে বিশ্বাসী নয়। তার মত হল, আগে প্রচুর অস্ত্র চাই—সে জন্য চাই প্রচুর টাকাকড়ি। এসবের সঙ্গে সংগঠনের কাজও চলবে। সে বলে, নতুন ক্যাডারকে মানুষ মারতে শেখানোর চেয়ে যে ইতিমধ্যে মানুষ মারায় অভ্যস্ত এবং পাকা—সে-ই আমাদের কাজের প্রকৃত উপযোগী। নতুন ক্যাডারকে দিয়ে যে কোন 'অ্যাকশনে' ঝুঁকি অনেক—কিন্তু ওইসব ধরনের কাজে যাদের পেশাগত দক্ষতা আছে—তাদের দিয়ে নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সোজা। আপাতত যখন বিপ্লব আরম্ভ করছিনে—এ তো সবে প্রস্তুতির অঙ্গ—তখন আদর্শের বা আদর্শবাদী ক্যাডারের প্রশ্নই ওঠে না। ওসব আসে, যখন সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙতে যাচ্ছি—তখন।.....

এই মতামতের সপক্ষে একটা গোপন দল সবে গড়া হয়েছে। বীরেশ্বর গিয়েছিল, তাদেরই এক বৈঠকে। খুব উদ্দীপ্ত হয়েই এবার বাড়ি ফিরছিল সে। পথে লাইলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে।

হানিফ ঘরে ছিল না। লাইলি বীরেশ্বরের সঙ্গে চলে এল। রাতের ট্রেনে ফিরে এল ওরা। রাণীহাট পৌঁছল সকালে। লাইলিকে তখন এ এলাকায় আর কারো চেনার সাধ্য নেই। সবাই ভাবল, বীরেশ্বরের কলকাতার মাসতুতো বোন-টোন হবে।

বীরেশ্বরের বাড়িতে থাকবার মধ্যে শুধু এক রুগ্ণা পিসি। লাইলি ওখানেই থাকে। বোন পরিচয়েই থাকে—বাইরে একবারও বেরোয় না।

হ্যাঁ, গান্ধর্ব বিবাহ একটা হয়ে গেল বইকি লাইলির সঙ্গে বীরেশ্বরের। রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রীর মত এক শয্যায় শুয়ে থাকে। দিনের পরিচয়, ওই বোন।

কিন্তু লাইলির রক্তে তখনো বিষ ফুরিয়ে যায়নি। মুছে যায়নি অন্ধকারের রোমাঞ্চকর স্বাদ। বীরেশ্বর সাবধানে তা কাজে লাগাচ্ছিল। আস্তে আস্তে লাইলি আবার 'অ্যাকশনে' ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। এ না হলে জীবনটা যে আটপৌরে একঘেয়ে হয়ে ওঠে তার। বীরেশ্বর তাকে বিপ্লবের তত্ত্ব আর রাজনীতিতে দীক্ষা দিল। লাইলি একদা নেত্রী হয়ে উঠল দলের।

পুলিসের টনক নড়লে তখন লাইলি বীরেশ্বরের বাড়ি ছাড়ল। ওর থাকার কোন নির্দিষ্ট জায়গা রইল না। সে আজ এখানে কোন চাষীর বাড়ি, কাল সেখান থেকে দশ মাইল দূরে অন্য কোথাও,

পরদিন আবার অন্যখানে। আর ছদ্মবেশ ধারণে তার জুড়ি নেই। দিব্যি জেলের মেয়ে সেজে এক কোমর জলে জাল পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। কখন মজুরনী সেজে ক্ষেতে ধান পোঁতে। কখনও দরকার হলে চুড়িউলির বেশে মাথায় চুড়ির ডালা নিয়ে গাঁয়ের পথে চুড়ি বেচতে যায়। গেরস্থ বউয়ের সঙ্গে এই এলাকার দেহাতী ডায়ালেক্‌টে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। 'এগুলান দ্যাখো না বহিন, পসন্দ হয় না তুমার?' একবার পুলিশ একটা গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। লাইলি দিব্যি কুনাইপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কাঁখে কাঠ কুড়নো ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল বিলের দিকে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, উরুলি-ঝুরুলি আ-তেলা চুল, নাকে নাকছাবি, ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, গলা আর ঘাড়ের মাংসে একগাদা ঘামাচি! 'অ শৈল, অ এলোকেশী! ঘামাচিগুলোন কুট কুট করছে লো! গেলে দে না ভাই!' পুলিস কনস্টেবলগুলো হাসে। কুনাইবউটি বলে, 'আ মর! হেসে যে খুন, বলি, ও মিনসে, সাধ্যি থাকে তো দাও না পটাপট গেলে! কিন্তুক আমাদের মিনসে আবার বড্ড একরোখা। বউয়ের গায়ে হাত দিতে দেখলে গবরমেন্টোকেও গেরাহ্যি করে না!—হু!.... আরেকবার কোথায় পুলিশ গ্রাম ঘিরেছে। একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন লেডি ডাক্তার—হাতে স্টেথিসকোপ। ঝকঝকে ভব্য নাগরিকা, সুশিক্ষিতা স্মার্ট মেয়ে। পিছনে একটা লোক—ব্যাগ বয়ে আনছে। .... পুলিশ অফিসার এগিয়ে বললেন, 'শুনুন।' ....'বলুন।' বলে দাঁড়ালেন লেডি ডাক্তারটি। ....'আপনি কোত্থেকে আসছেন?' ....ব্যাগ থেকে একটা সুদৃশ্য কার্ড বের করলেন লেডি ডাক্তার। মিস আর. নন্দী এম. বি. বি. এস. ইত্যাদি ইতাদি। সাঁইথিয়ার ঠিকানা। ব্যাগে যথারীতি ডাক্তারি সরঞ্জাম। সঙ্গের লোকটা বলল, 'মায়ের ভীষণ ব্যামো দারোগাবাবু। বহরমপুরে একবছর দেখিয়ে সর্বস্বান্ত হলাম। আমার মামা সাঁইথের লোক। বললে ওখানে একজন ভাল লেডি ডাক্তার আছেন....'

লেডি ডাক্তার মিস নন্দী ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁটে বাঁকা হেসে বিশুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণে ইংরিজিতে বললেন—'এনিথিং মোর ইউ লাইক টু স্যাটিসফাই ইওরসেলফ অফিসার?'

'নো। থ্যাঙ্কস। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, মিস ডক্টর, দিস ইজ সিম্পলি আওয়ার রুটিন জব।'

হ্যাঁ—লাইলি তো অর্ধ-শিক্ষিতা মুসলিম চাষীর মেয়ে। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এলেই বা কী? অমন উচ্চারণে বিশুদ্ধ ইংরিজি বলবে, অমন সুভব্য চেহারা হবে? অসম্ভব! আসলে ক্রিমিনাল সে। সে তার চেহারা বাচনভঙ্গিতে অভিজ্ঞ ধুরন্ধর পুলিশ অফিসারটির চোখে ধরা পড়তে বাধ্য।

পুলিশের এই প্রবল আত্মবিশ্বাসই লাইলির আত্মরক্ষার যত শক্তি হয়ে উঠেছে। ....

দেয়ালঘড়িতে রাত দুটোর ঘণ্টা বাজল। বীরেশ্বর এবার থেমে সিগ্রেট ধরাল। আমি কোন প্রশ্ন করিনি এতক্ষণ। নিঃশব্দে শুনে গেছি। এবার হাই তুলে আড়মোড়া দিয়ে বললুম, 'হ্যাঁ—লাইলির কাহিনী সত্যি বড় অদ্ভুত। এখনও আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না রে! ভাবা যায় না!'

বীরেশ্বর হাসল না। গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে। গলা ঝেড়ে বলল, 'একটা কথা আনু। তুই আমার বাল্যবন্ধু। ঝোঁকের বশে তোকে এমন অনেক কিছু বলে ফেললুম, যা আমার বলা আদৌ উচিত ছিল না। পার্টির শৃঙ্খলাগত প্রশ্ন আছে। কিন্তু তবু সামলাতে পারলুম না—বলতে ইচ্ছে করল। আসলে কী হয়েছে জানিস, আজকাল আমার মধ্যে কেমন একটা ক্লান্তি এসে গেছে। মনে হচ্ছে, হয়তো রাজনৈতিক আদর্শের ছলে কে আমাকে বা আমাদের সবাইকে ব্যক্তিগত স্বার্থে এক্সপ্লয়েট করছে। দিনে দিনে কাজে আর উৎসাহ পাচ্ছি না। আমি শুধু একটা কথা ভাবছি। কিউবা বা অন্যত্র যা ঘটেছে, তা সেখানেই সম্ভব হয়েছে। কারণ, সে জায়গা ছোট্ট। আর ভারতবর্ষ একটা বিশাল দেশ। 'বিশাল' শব্দটা করার কথা নয়—প্রকৃত অর্থেই বিশাল। এর অর্থনীতি কিছু ঔপনিবেশিক কিছু সামন্ততান্ত্রিক আবার কিছু ধনতান্ত্রিক। ভীষণ কন্ট্রাডিকশন আছে—কিন্তু আসলে রাষ্ট্রযন্ত্রটি আধুনিক—ভীষণ সফিস্টিকেটেড। তাছাড়া ভারতের অধিবাসীদের রক্তে কী যেন সৃষ্টিছাড়া একটা ব্যাপার আছে। এরা ঝোঁকের মাথায় হিংস্র হতে পারে। হিংসায় যা খুশি করতে পারে—কিন্তু পরক্ষণে ব্যক্তিগত ভাবে নয়, যৌথ ও সমাজগত ভাবে ভীষণ অনুতপ্ত হয়। কল্পনা করতে পারিস, কোটি কোটি লোক এখনও প্রতিবছর গঙ্গাজলে পিতৃতর্পণ করে। এটা ভাববার ব্যাপার। আমাদের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বাইরে-বাইরে

অন্য রং বা হাওয়া লেগে যতই বদলাক, মূলে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে আদৌ বদলায় নি। শান্তি আমাদের গোষ্ঠীতে সামাজিক অবচেতনার প্রার্থিত একান্ত ধন। আমরা ব্যক্তিগত বিচারে এক মুখে অশান্তির জয়ধ্বনি দিই, আর এক মুখে সমাজগত সংস্কারে বিড় বিড় করে বলি, ওঁ শান্তি! আমরা বদলাতে চাইনে। সব বদলকে আমরা বাইরে-বাইরে মেনে নিলেও ভিতরে থেকে যাই গোঁড়া অপরিবর্তনীয়। ....যাক্ গে। এসব তত্ত্বকথা বলে লাভ নেই। আমার বিশ্বাস হচ্ছে ক্রমশ—ভারতবর্ষে এভাবে কিছু করা অসম্ভব—যেভাবে আমরা করতে যাচ্ছি। তাছাড়া সব দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার যারা মূল জিম্মাদার, সেই সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ বিপ্লবের সময় কাঁধে কাঁধ লাগায়। এদের বাদ দিয়ে কোথাও বিপ্লব ফলপ্রদ হয়নি—হতেও পারে না। আমাদের দেশে প্রদেশ, বর্ণ, আঞ্চলিকতা, নানান মানসিক গঠন ইত্যাদির এত সংস্কারগত জটিলতা রয়েছে—যা সেনাবাহিনীর মধ্যেও প্রকট। সে কারণেই তো চরম বিশৃঙ্খলার সময়েও এদেশে সামরিক শাসন হল না—হতে পারবেও না। আমাদের মিলিটারির উদ্ভব প্যাট্রিয়টিজম বা ন্যাশানালিজম থেকে হয়নি, হয়েছে ব্রিটিশসূত্রে। সেই সংস্কার সহজে হারাবে না—হারায়নি। এরা নিয়মনিষ্ঠ বীর, দেশরক্ষায় জীবন দিতে পারে—কিন্তু এদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ জন্মানোর সুযোগ হয়নি বা নেই। এরা রাষ্ট্রের অসচেতন যন্ত্র মাত্র। এদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা সম্ভব তাদেরই, যারা কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। আমার ধারণা, ওই কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী একদা পৃথিবীতে অজেয় আর দুর্ভেদ্য হয়ে উঠবে। যাই হোক, আমার পার্টি যা করতে যাচ্ছে, তা নিছক কাকতাড়ুয়া লেলিয়ে দেবার হাস্যকর চেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে ....'

বীরেশ্বর থামল। ....

আমি বলে উঠলুম, 'বীরু, আজ কোথায় গিয়েছিলি বলতে আপত্তি আছে?'

বীরেশ্বর মাথা দোলাল। ...'নাঃ বলেই তো ফেলেছি সব। আজ আমাদের এক মিটিং ছিল আঞ্চলিক কমিটির।'

'খুব তর্কাতর্কি করে এলি নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ!'

'বীরু, এতে তোর ক্ষতি হতে পারে তো?'

'পারে বই কি। আমাদের পার্টির শৃঙ্খলা সাংঘাতিক।'... বীরেশ্বর অন্যমনস্ক জবাব দিল। ... 'অবশ্য এখনও চরম কিছু করে ফেলিনি। আমার মতন প্রশ্ন তো আরও অনেকের মধ্যে আছে। নেতাদের মতে এটা নাকি থাকা ভাল—দল যে জ্যান্ত মানুষের তা বোঝা যায় এবং দলের গতিশীলতার লক্ষণ।'

একটু সাবধান হয়ে বললুম, 'লাইলির কী মত? তোর পক্ষে নিশ্চয়?'

বীরেশ্বর একটু হাসল। ....'প্রশ্নটা আসলে প্রথম কিন্তু লাইলিই তুলেছিল, তা জানিস? কী জানি কেন, ওর আগাগোড়া সন্দেহ, কোন সুচতুর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ব্যক্তিগত স্বার্থে আমাদের কাজে লাগাচ্ছে। আমি ওকে আমল দিচ্ছিলুম না। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম ও বিচিত্র ধরনের ক্রিমিনালদের সঙ্গে মিশেছে—অনেক ক্ষেত্রে অনেক সমাজপতি বা প্রখ্যাত কীর্তিমান ব্যক্তিও তাদের রিংলিডার বা আশ্রয়দাতা, তাও দেখেছে। লাইলি ঝানু মেয়ে। কত কৌশলে সুশিক্ষিত সুচতুর বুদ্ধিমান মানুষ পয়সা কামিয়ে বড়লোক হতে চায় লাইলি তো কম দ্যাখেনি। তাই তার সিক্সথ সেন্সের প্রতি আমারও বিশ্বাস বদ্ধমূল হল। যে পদ্ধতিতে ডাকাতির মাল আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠাই, তাতে আপাতত কিছু বোঝার উপায় নেই যে শেষ অবধি তার কী হিল্লে হল। অস্ত্র কেনার কথা। অস্ত্র যা লাগে, তা অবশ্য পাই। কিন্তু বিপ্লবের জন্যে যে অস্ত্রশক্তি দরকার, তার কদ্দুর কী হল—সে হিসেব কেন্দ্র ছাড়া কোন জানবার উপায় নেই।'

অবার সতর্কভাবে প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা বীরু, তোদের কেন্দ্রীয় অফিস তো কলকাতায়?'

বীরেশ্বর হাসতে লাগল। ....'উহুঁ, অতটা না শুনলেও তোর চলবে।'

'এমনি জানতে চাচ্ছি—কৌতূহল, বীরু।' মুখে-চোখে তীব্র কৌতূহল আর উদ্বেগ ফুটিয়ে বললুম। 'তোদের উঁচু তলার নেতাদের এখনও পুলিশ ধরছে না কেন?'

'পেলে তো ধরবে। অনেকে আন্ডারগ্রাউন্ডে গেছে। অনেকে এই বীরেশ্বরের মত গায়ে কোন গন্ধের গ'ও রাখেনি যে পুলিস কায়দায় ফেলবে। দলের অপারেশন তো সারা ভারতবর্ষ জুড়ে।'

ভাবলুম, এই নামগুলো আমার জানার দরকার ছিল খুবই। কিন্তু বীরেশ্বর তা বলবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে থাকলুম চুপচাপ। এবার শুধু লাইলি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার কথা ভাবছিলুম।

তার আগেই বীরেশ্বর নিজে থেকে বলে উঠল, 'লাইলিকে তোর কথা বললুম।'

'বললি নাকি?' ... উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। .. 'কোথায়? মিটিংয়ে নিশ্চয় দেখা হল?'

বীরেশ্বর মিথ্যে বলছে, আজ দুপুরে যা শোনার শুনেছি—তবু আমারও ওর সঙ্গে এবার সমানে অভিনয় করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বীরেশ্বর আমার কথার জবাবে বলল, 'হ্যাঁ—মিটিংয়ে এসেছিল। তোর কথা শুনে খুব খুশি হল। তোর কথা ওর মনে ছিল।' ...বীরেশ্বর একটু হেসে চাপা গলায় সকৌতুকে আবার বলল. 'শালা আনু! তুমিও কম যাও না। ওকে কবে নাকি চেপে ধরে চুমু খেয়েছিলি রে?'

হেসে উঠলুম। ...'ও বলছিল নাকি? যাঃ, স্রেফ গুল!'

'হুঁ, গুল বই কি! লাইলি এ নিয়ে গুল মারতে যাবে কোন দুঃখে? তা হ্যাঁরে আনু, বেশি কিছু করিসনি তো? দ্যাখ্, ও আমার রীতিমত স্ত্রী এখন। বেশি কিছু করে থাকলে বল। গঙ্গাজল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে নেব।' ... হা হা করে হেসে উঠল সে।

মনে মনে বললুম, তোমার কাছে গঙ্গাজলের মহিমা! অপরাধীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ঘুরেছি,—বিস্তর প্রেম দেখেছি, কিন্তু লাইলি-বীরেশ্বরের মত কোথাও দেখিনি। এ সব হিসেবের বাইরে।

প্রকাশ্যে বললুম, 'বীরু, লাইলিকে তুই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিস—এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে ভাই। তুই তো দেখেছিস, আমি ধর্মবিশ্বাসী ছিলুম না অতটুকু বয়সেই, এখন তো নয়ই। এ তোর দারুণ উদারতা শুধু নয়, মানবতা আর দুঃসাহসিকতাও বটে। তুই-ই এটা পারিস। কিন্তু কেন বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে আছিস দুজনে? কেটে বেরিয়ে আয়। স্বভাবিকভাবে ঘর-সংসার কর। ছেলেপুলে হোক। আমরা শুনে খুশি হই।....'

বীরেশ্বর হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল। কী যেন ভাবল। তারপর মাথা দোলাল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'আমাদের দুজনের রক্তে কী আছে রে ভাই। ওসব আমাদের বরাতে নেই। তাছাড়া লাইলির নামে অজস্র খুন আর ডাকাতির মামলা ঝুলছে। সরকার ওকে ঘরের সুখ আপাতত দিচ্ছে না। লাইলি সব ছেড়ে-ছুড়ে গৃহলক্ষ্মী হয়ে উঠলেও নয়। আইন তো ছেড়ে দেবে না ওকে।'

বললুম, 'হ্যাঁ—সেও কথা। তবে বীরু, এক কাজ করলে তো পারিস। যদি ধর, তোরা দুজনে এদেশের বাইরে কোথাও পালিয়ে যাস?'

বীরেশ্বর তাকাল। ...'কোথায়, শুনি?'

আমার মাথায় যা এল বলে দিলুম। ...'ক্যানাডা চলে যা দুজনে। আমার জানাশোনা কিছু ছেলে সম্প্রতি চলে গেল। ভাল কামাচ্ছে। ওরা লিখেছে, বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাবে। তুই যদি যাস, তাহলে আমি কিন্তু ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার লোক আছে। কোন অসুবিধে হবে না।'

এই কথাগুলো কিন্তু আমি বীরেশ্বরকে মন থেকেই বললুম। ওরা যদি সত্যি বাইরে চলে যায়, অন্তত আমি বেঁচে যাব ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওদের ক্ষতি করা থেকে। ক্যানাডা যাবার ব্যবস্থাটা আমার করে দেওয়ার স্কোপও রয়েছে।

বীরেশ্বর কিন্তু হেসে বলল, 'তুই পাগল হয়েছিস আনু? এই বাণীহাট থেকে চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব না? আজ অবধি এখানের মাটি ছেড়ে একবিন্দু নড়িনি—নড়তে পারবও না!'

'কিন্তু লাইলি তোর স্ত্রী। কতদিন ও বেচারা অমন করে লুকিয়ে থাকবে—সরি, আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকবে! তারও তো নিশ্চয় তোর মত ঘরকন্না করার একটা স্বাভাবিক সাধ-আহ্লাদ আছে!'

'হুঁ—আছে হয়তো।'....বীরেশ্বর আনমনে বলল। ....'কিন্তু ...ছেড়ে দে ওকথা। রাত হল। একটা কথা বলি শোন, আনু। লাইলি তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল আমার। বললুম, 'তাই বুঝি?'

'তোর ওকে দেখতে ইচ্ছে করে না, আনু?' ...বীরেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

'করে না আবার? ভীষণ ইচ্ছে করে রে। অতসব শোনার পর .....'

'কিন্তু আনু, তুই দেখেছিস ওকে।'

ভাব গোপন করে চমকে ওঠার ভাণ করলুম।—'আমি দেখেছি? কখন?'

'হুঁউ। দেখেছিস। কথা বলেছিস।'

'সেকী! যাঃ—অসম্ভব।'

'উঁহু—আজ সকালে বাস-রাস্তায় দেখেছিস। লাইলি তোকে প্রদীপের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিল। তুই নাকি আমার কথা মত আগেই ওকে প্রদীপে'র স্ত্রী ঠাউরেছিলি?'

'আশ্চর্য, আশ্চর্য! বীরু, কী বলছিস রে! সেই মহিলাই লাইলি?

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আশ্চর্য বীরু, আমি যে একটুও চিনতে পারিনি ভাই। বিশ বছরের তফাত হতে পারে—কিন্তু তবু কি চিনতে পারব না ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে?'

'লাইলি তখন পেন্ট চড়িয়েছিল।'.....বীরেশ্বর বোঝাতে থাকল। ....'তাছাড়া এটা স্রেফ সাইকোলজিকাল ব্যাপার। একজন চেনা মানুষের আসলে কতটুকু আমাদের স্মৃতি ধরে রাখে? অল্প কিছুটা মাত্র—হয়তো কোন ভ্রূভঙ্গি, নাকের গড়ন, কথা বলার বিশেষ ধরন, কাসির শব্দ, হাসির ধাঁচ, কণ্ঠস্বর—এ ধরনের বিশেষ কিছু জিনিস। অন্ধকারে বা আড়াল থেকে তাই শব্দ শুনে আমরা মানুষটিকে শনাক্ত করতে পারি। দূর থেকে দেখে ওই রকমই কোন বিশেষ ভঙ্গি আমাদের শনাক্ত করায় সাহায্য করে। এখন, সময়ের ব্যবধানে মানুষের এইসব অনেক ভঙ্গি আর শব্দ পুরো বদলে যাওয়া স্বাভাবিক। পুরো মানুষটিকে ইন টো টো কদাপি স্মৃতির পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই দীর্ঘ সময় পরে কারো কোন ভঙ্গির সঙ্গে স্মৃতিতে রাখা ভঙ্গিটির মিল থাকলে আমাদের শনাক্তকরণে সাহায্য হয়—তবে ভুলও হয় অনেক সময়। ভুল হলে বলি, হ্যাঁ—ঠিক এমনি একজন আমার পরিচিত ছিল বটে! যাই হোক, লাইলির ক্ষেত্রে তোর কী কী ফ্যাক্টর কাজ করেছে দ্যাখ্। প্রথম কথা : তোর লাইলি সম্পর্কে বাল্যের ইমেজ থেকে মনোমত গড়ে নেওয়া আর একটা ইমেজ তুই গড়লেও গড়তে পারিস—তবে বলছিস, নাকি লাইলির কথা মনেই ছিল না। তাহলে নিশ্চয় সেই বালিকা ইমেজ তোর অবচেতনে ছিল। দ্বিতীয় কথা : বিশবছরে লাইলির অসম্ভব পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার যে ভঙ্গিগুলো ছাগলচরানী মেয়ের মত ছিল, আজ তা অন্য ধরনের হতে বাধ্য। অত ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই। তৃতীয় কথা : আমার সাজেশানটা তোর মাথায় ছিল, অর্থাৎ প্রদীপের স্ত্রীর সঙ্গে তোর দেখা হতে পারে বলেছিলুম। কেমন? তাই ওকে না-চেনাটা খুবই নরম্যাল ব্যাপার। খুব স্বাভাবিকই।'

সকৌতুকে বললুম, 'কিন্তু ঠোঁট?'

'হুঁ, কবে চুমু খেয়েছিলি বলে বুঝি ঠোঁট দুটোও তোর এক্তিয়ারে থেকে গেছে! আরে হাঁদারাম, ঠোঁটের গড়ন বদলাতে লিপস্টিকের জুড়ি নেই। পাতলা ঠোঁট মোটা করে ফেলে। তার ওপর গগলস এক অসামান্য জিনিস। যাক্‌গে, রাত তিনটে বেজে গেল। শোন, লাইলি তোর সঙ্গে দেখা করবে। তুই দেখা করতে রাজি তো?'

'কেন? রাজি হব না কেন?'

'কারণ, একটু রিস্ক আছে—খুলেই বলছি। পুলিশ ওকে ধরার জন্যে চারিদিকে ফাঁদ পেতে বেড়াচ্ছে। তোমার সঙ্গে ওকে কেউ দেখে ফেললে পুলিশের কানে তুলে দেবে—পুলিশ ভাববে তুমি পার্টির নতুন আমদানি। এর ফলে তোমাকে বেকায়দায় পড়তে হতে পারে।'

. মনে মনে হাসলুম। মুখে গাম্ভীর্য আর ভাবনা রেখে বললুম, 'সেও কথা। তা বীরু, সবদিক বাঁচিয়ে কোথায় দেখা হতে পারে—ঠিক করেছিস?'

'করেছি।' ...বীরেশ্বর চাপা গলায় বলল। ....'আগামীকাল সকালে নটার মধ্যে দুজনে ইরিগেশানের সেই ক্যাম্পে যাব। কেমন?'

'তারপর, তারপর?' ....রুদ্ধশ্বাসে বললুম।

'আমি ইশারা দিলে তুই জঙ্গলের দিকে চলে যাবি। সরু পথটা ধরে যাবি কিন্তু। পথ ছাড়বিনে।'

'বেশ। তারপর?'

'কিছুদূর গিয়ে একটা টাটকা ভাঙা গাছের ডাল পথে পড়ে থাকতে দেখবি। ডালটার ডগা যেদিকে ঘোরানো সেইদিকে হাঁটতে থাকবি। সেদিকে যদি ঘন বন হয়, তবু যাবি কিন্তু। খুব সাবধানে লক্ষ্য রাখবি, কেউ তোকে ফলো করছে কি না। যদি কোন লোক— সে যে-ই হোক, জেলেনী, কাঠকুড়োনী, চাষী বা মুসহর, চোখে পড়ে—এগোবিনে। তোর কাছে একটা পাখি মারা বন্দুক থাকবে। বুঝতে পারছিস তো? তুই শিকারী।'

'হুঁ।'

'যদি সন্দেহজনক কিছু দেখিস, তাহলে সোজা ফিরে ক্যাম্পে চলে আসবি। আমি অপেক্ষা করব।'

'তাই হবে।'

'আর একটা কথা, আনু।'

'বল্!'

'যদি এইসব নির্দেশের কোন একটা অমান্য করে বা তুচ্ছ ভেবে লাইলির সঙ্গে বোকার মত দেখা করতে এগোও এবং তার ফলে লাইলির কোন বিপদ হয়, আমার পার্টি তোমাকে চরম দণ্ড দেবে, মাইন্ড দ্যাট।'

'চরম দণ্ড কী?'

বীরেশ্বর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল, 'মৃত্যু।'

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলুম। দেয়ালঘড়ির টক টক শব্দটা শুধু শোনা যেতে থাকল। বাইরে তাকিয়ে দেখি জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

ডাকলাম, 'বীরু!'

'উঁ?'

'লাইলির সঙ্গে তোর ঘরেও তো দেখা করা যেত।'

'উঁহু। কাল রাতে লাইলি এখানে ছিল। কীভাবে পুলিস টের পেয়েছিল সেটা। ইরিগেশানের জিপ নিয়ে রাতে অপেক্ষা করছিল। তারপর....'

বাকিটা আমি তো জানিই। বীরেশ্বর সেই ঘটনাটার বর্ণনা দিয়ে বলল, 'কাজেই আপাতত কিছুদিন রাণীহাট আসছে না।'

এবার সে উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে। শুয়ে পড়। সকাল আটটায় ওঠাব—কেমন! দরজাটা ভেতর থেকে ভাল করে আটকে দে।'

ও চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিলুম। জানলার ধারে এসে বসলুম। এই জানলা থেকে পুবের ফাঁকা মাঠটা দেখা যায়। জানালার নিচেই একদঙ্গল হাস্নুহানার ঝোপ। এতক্ষণে টের পেলুম কী পবিত্র বস্তু হারিয়েছি! ঘর ভরে গেল সুগন্ধে।

কাল রাতে ওই ঝোপের নিচেই পুলিশ অফিসার মুখার্জির। নাকি বসে ছিল। আজ কেউ নেই তো? সাবধানে লক্ষ্য করলুম। সন্দেহজন কিছু চোখে পড়ল না। তখন মন-প্রাণ ভরে হাস্নুহানার গন্ধে তন্ময় হয়ে স্মৃতির দরজা খুলে দিলুম। শিমুলিয়ার সেই ছেলেবেলার ওপর লাইলি নামে একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে হেঁটে আসতে দেখলুম!...

পাঁচ

রাণীহাটের ইনফরমারটি কে, যদি আমাকে বলা থাকত, তাহলে আসন্ন চতুর্থ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যেত। ইনফরমারদের নাম আমাকে গোপন রাখা হয়েছে নাকি আমারই নিরাপত্তার স্বার্থে! এর কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাইনে।

বৃথা এখন হাত কচলানো। ইনফরমাররা না হয় আমার নাম জানল না আমার গোপনীয়তা আর নিরাপত্তার স্বার্থে, কিন্তু তাদের নাম আমাকে জানালে কী ক্ষতি হত? বরং কত কাজে লেগে যেত এখন!

পরে ভেবে দেখলাম, ব্যাপারটা একই দাঁড়াত। আমি কিছু যোগাযোগ করলেই ইনফরমার আমাকে চিনে রাখত। এবং ইনফরমার যতই করুক, পুরো বিশ্বাস তাকে করা চলে না। ফলে তার আমাকে চিনে রাখাটা সঙ্গত নয়। কর্তৃপক্ষ ঠিকই করেছেন তাহলে। এই চতুর্থ সুযোগটাও যে ব্যর্থ হত না, তার তো কোন মানে নেই!

মনে এই ওঠা-পড়া নিয়ে চা খাচ্ছিলুম সকালে। আটটা বাজছে। বীরেশ্বর বলে গেছে রেডি থাকতে। আর কী রেডি হব? আমার নিজস্ব ধরনে রেডি হতে হলে তো এক্ষুনি শিমুলিয়া গিয়ে অস্ত্রটা আনতে হয়! সেটা সন্দেহজন হতে পারে বীরেশ্বরের কাছে।

তবে সবচেয়ে আক্ষেপ এই যে পুলিশ বিভাগকে আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলেছি কিছুকাল—যতক্ষণ না আমি ভিন্ন কিছু বলি। এখন ওদের কাক-পক্ষীটিও আমাকে এড়িয়ে চলবে আমার কথা মত। এমন কি এলাকায় নিজেদের নরম্যাল রুটিন ডিউটি ছাড়া বিশেষ কিছু করার জন্যে উপস্থিতই থাকবে না।

আমার এই নির্দেশ স্পষ্টত দেখছি পর পর ক্ষতি করে যাচ্ছে আমারই। এখন যা অবস্থা, দরকার হচ্ছে ফের ভিন্ন নির্দেশ দিয়ে আমার ধারে-কাছে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি—এবং গোপন তৎপরতায় আমার সঙ্গে মুহুর্মুহু যোগাযোগ রাখা।

এইসব ভাবতে ভাবতে বীরেশ্বর একটা বন্দুক নিয়ে এসে পড়ল। বলল, 'চল, বেরোনো যাক্।'

বাইরে গিয়ে বন্দুকটা আমার হাতে দিল সে। সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, 'ভয় নেই —লাইসেন্স আছে। বন্দুকটা আমার বাবার হাতের জিনিস। বিলিতি। কী ওজন দেখছিস? একটুও ধাক্কা মারে না। এই নে, কার্টিজগুলো রেখে দে পকেটে। কী? বন্দুক ছুঁড়তে পারিস তো?'

বললুম, 'পারি বইকি। কলেজ-জীবনে এন সি সি করেছি না? রাইফেলও ছুঁড়তে পারি।'

'বলিস কীরে!' ....বীরেশ্বর আমার কাঁধে থাপ্পড় মারল। ....'তাহলে তো তোকে আমাদের দলে টানতে হয়!'

'আলবৎ।' ...সোৎসাহে বললুম। 'খুব রাজি আছি।'

বীরেশ্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। 'ওসব তুই পারবিনে। ছেড়ে দে। আর আনু—'

'বল্।'

'কাল রাতে যা শুনেছিস, ভুলে যা।'

'চেষ্টা করব, ভাই। কারণ আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে আমার।' ...হেসে ফেললুম।

বীরেশ্বর আমার একটা হাত নিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস আছে ....তুই এ সব নিয়ে কোথাও আলোচনা করবি নে। আর করলেই বা কী? তোকে যা বলেছি—পুলিশ তা সবটুকুই জানে। আমার সম্পর্কে ওদের দরকার হচ্ছে—আইনের সামনে মেটিরিয়াল প্রমাণ দাঁড় করানো। সেটা পাচ্ছে না বলেই আমি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছি। আর সত্যি বলতে কী, কোন অ্যাকশনে তো আমি থাকিও নে। যা করার, ওরা সব করে।'

কথা বলতে বলতে আমরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই সময় দেখলুম, বাবুগঞ্জ থানার কয়েকজন পুলিশ আর একজন সম্ভবত গ্রামের দফাদার হন্তদন্ত হয়ে এদিকে আসছে। বীরেশ্বর থমকে দাঁড়াল। আমি বেশ খানিকটা চমকে উঠেছিলুম। বীরেশ্বরের গায়ে চিমটি কাটলুম। বীরেশ্বর হেসে বলল, 'ও কিছু না। আজ রাতে একটা ব্যাপার হয়েছে।'

কাছে এলে চিনতে পারলুম বাবুগঞ্জের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মল্লিকবাবু রয়েছে। আমি দেখলুম, মল্লিকবাবু আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। বীরেশ্বরকে নমস্কার করে বললেন, 'আপনাদের গ্রামেই আজ একটা পেটি কেস পড়েছে, বীরেশ্বরবাবু! জানেন না?'

বীরেশ্বর তাচ্ছিল্য করে বলল, 'ও! হ্যাঁ—শুনলুম গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।'

মল্লিকবাবু বললেন, 'দেখা যাক। পোস্টমর্টেম কী বলে।'

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল, 'মনের দুঃখে মলেও আপনাদের হাত থেকে রেহাই নেই দেখছি। সেই ভয়েই তো মরতে পারিনে!'

মল্লিকবাবু বললেন, 'উনি কে?'

বীরেশ্বর আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে আমি শুধু ছোট্ট একটা নমস্কার করলুম। ওঁরা চলে গেলে বললুম, 'গলায় দড়ি দিয়ে কে মরেছে?'

'ও একটা লোক—তুই চিনবিনে। কী খারাপ অসুখে ভুগছিল ক'বছর থেকে—আজ পুকুরপাড়ের গাছে গিয়ে ঝুলেছে। এইসব শালারা কেন যে জন্ম নেয় পৃথিবীতে—কী কাজে লাগে, বুঝিনে। শুধু তো বদমাইসি...' বীরেশ্বর নিষ্ঠুর মুখে বলতে বলতে থেমে গেল হঠাৎ।

বললুম, 'বদমাইসি করত বুঝি? কী বদমাইসি?'

বীরেশ্বর হাঁটতে হাঁটতে অস্পষ্টভাবে বলল, 'শালা পুলিসের টাউট ছিল।'

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। পলকে বুঝতে পেরেছি, এই লোকটি কে। তাহলে কি গত রাতে বীরেশ্বরের লোকেরা ওকে গলায় দড়ি পরিয়ে ঝুলিয়ে মেরেছে?

আমি শিউরে উঠলুম চুপি চুপি। আর কোন কথা বললুম না ও সম্পর্কে। শুধু ভাবলুম, হায়, এখন যদি কোন উপায়ে মল্লিকবাবুকে জানাতে পারতুম, আমি কোথায় যাচ্ছি—কার সঙ্গে দেখা হতে চলেছে!

কিন্তু কোন উপায় নেই। বীরেশ্বর আমার পাশে।

দুজনে নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে নদীর ব্রিজে গিয়ে পৌঁছলুম এক সময়। দেখলুম, তাঁবুটা এখনও রয়েছে। একটু অবাক লাগল। তারপর দেখলুম, দূরবীনটা দাঁড় করিয়ে তাতে চোখ রেখেছে দাশগুপ্ত—আর সেনগুপ্ত একটা বিশাল মাপকাঠি নিয়ে—সেটা চওড়া কাঠের তৈরি এবং কালো-সাদায় ইঞ্চি-ফুট কাটা রয়েছে, অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে রাখছে দাশগুপ্তর ইশারা মত। আশ্চর্য অভিনয়! আর সাহসই কম কোথায়?

দাশগুপ্ত আমাদের দেখে বলল, 'আসুন, আসুন। লোক আসবার আগেই ভাবলুম, নিজেরা কিছুক্ষণ কাজ করা যাক। আই কান্ট সিট আইডলি।'

সেনগুপ্ত সেই মাপকাঠিটা মাটিতে ফেলে সেখানেই বসে পড়েছে এবার। কী নিখুঁত অভিনেতা!

বীরেশ্বর বলল, 'রাত্রে ভয় পাননি তো সাব? আমার লোকেরা ছিল তো?'

দাশগুপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ—ছিল। ভোরে সব গেল। আমাদের কোন অসুবিধে হয়নি।'

আমরা ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় বসে পড়লুম। নদী সম্পর্কে নানা আলোচনা করতে লাগল বীরেশ্বর। ইতিমধ্যে একজন-দুজন করে নানা গ্রামের মাতব্বর লোকেরা কীভাবে খবর পেয়ে আসতে শুরু করেছে। বীরেশ্বরকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। বাঁধ সম্পর্কে সবাই নিজের নিজের মতামত জানাতে চায় এঞ্জিনিয়ার সায়েবকে। আমি মনে মনে সকৌতুকে হাসছিলুম। দাশগুপ্ত সমানে শুনছে আর গম্ভীরভাবে মাথা দোলাচ্ছে। এক সময় সে সবাইকে নিরস্ত করে আবার দূরবীনে চোখ রাখল। সেনগুপ্ত যথারীতি মাপকাঠি নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করতে থাকল দাশগুপ্তর ইশারা মত। ভিড়টা হাঁ করে ওদের কার্যকলাপ দেখছিল। এক ফাঁকে বীরেশ্বর আমার দিকে চোখ টিপে বলল, 'আনু, তাহলে দ্যাখ, পাখি টাখি কিছু মারতে পার নাকি। পিকনিকটা জমবে তাহলে।'

ভিড় থেকে একজন বলল, 'পাখি মারবেন তো স্যার—সোজা বিলে চলে যান। খুব হাঁস আছে। আমি দেখে এসেছি।'

লোকটা আমাকেও সরকারী লোক ভেবেছে। বীরেশ্বর বলল 'হাঁস-টাস নয়—জঙ্গলে হরিয়াল পাবে, চলে যাও আনু।'

আমি বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বুকটা আবার কেঁপে উঠল একবার। লাইলি—সেই লাইলির সঙ্গে দেখা হবে!

সেনগুপ্তর পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হল। দেখি, সে আড়চোখে কুটিল দৃষ্টিতে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল—তাকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আমার মুহুর্মুহু গা শিউরে উঠল।

জঙ্গলে ঢুকে সরু পায়ে-চলা পথে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দাঁড়ালুম। সিগ্রেট ধরিয়ে দ্রুত ভেবে নিলুম, কী করা উচিত—কী উচিত নয়, কী বলব—কী বলব না লাইলিকে। সবচেয়ে ভাইটাল হচ্ছে, ওকে কোন্ কায়দায়, কখন, কোথায়, কীভাবে গ্রেপ্তার করা যায়—তার একটা নিপুণ ব্যবস্থা করে ফেলা। এরপর আর সুযোগ না আসতেও পারে। বীরেশ্বরকে সবসময় পাব—লাইলিকে তো আর পাব না! কাজেই লাইলিকে ফের একা পাওয়া চাই। অতএব কোন বিশেষ ব্যাপারের ছলে ওকে আবার একা আমার মুখোমুখি আনতে হবে—সুবিধেমত জায়গায় অন্তরঙ্গতার সুযোগে নিরস্ত্র করে ফেলতেও হবে। তারপর ....

মন শক্ত করলুম। আর নয়। আমার দুর্বলতা সাজে না। লাইলি এখন বীরেশ্বরের স্ত্রী—তাতে কোন ভুল নেই! পরস্পর তারা গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত। যে লাইলিকে আমি ভালবাসতুম, সে তো এ লাইলি নয়। সে আমার মনে বেঁচে আছে—সেখানেই থাক। কাল দুপুরে বীরেশ্বরের সঙ্গে লাইলির ওই নির্লজ্জ নগ্ন কামকেলি দেখার পর আর তার প্রতি আমার কোন মোহ থাকাই উচিত নয়।

পা বাড়ালুম। সতর্ক চোখে চারপাশটা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কোন লোক কিংবা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। কিছুদূর চলার পর দাঁড়াতে হল। সামনে পায়ের নিচে একটা সদ্যভাঙা গাছের ছোট্ট পাতাভরা ডাল পড়ে রয়েছে। ডালের ডগাটা বাঁ দিকে ঘোরানো—তার মানে আমাকে বাঁ দিকে যেতে হবে।

বাঁ দিকে ঘন ঝোপঝাড়, ওপরে উঁচু সব গাছের ডালপালা ছড়ানো—তাই রোদ পড়ে না—ছায়ায় অন্ধকারপ্রায়। পা বাড়াতে গিয়ে ফের চারপাশটা দেখে নিলুম। কিছু চোখে পড়ল না। নির্জন বনভূমি তার নিজস্ব শব্দাবলীর মধ্যে সমাহিত। পাখির ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, বাতাসের মর্মর। হঠাৎ মনে হল, প্রকৃতি একটা আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখে আমাকে অভ্যর্থনা করছে। পলকে পলকে ছেলেবেলা আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমি উন্মন হয়ে পড়লুম।

সেই সময় কোত্থেকে রহস্যজনকভাবে ভেসে এল যেন কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ। সত্যি—না মিথ্যে গন্ধ? এখানে কোথাও কি কাঠমল্লিকার গাছ আছে? এই গ্রীষ্মে তার ফুল ফোটাবার সময়—সেটা ঠিকই। কিন্তু ....

নাঃ, ওটা একটা হ্যালুসিনেসানই হবে। স্মৃতির ছলনা মাত্র। আর পাওয়া গেল না গন্ধটা। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি ক্রমশ। একটা কিছু না পাওয়ার গভীর দুঃখ টলমল করছে। শত চেষ্টাতেও এই বিষাদের বোধ আর আবেগটা তাড়াতে পারলুম না।

আমর মুখ থেকে অস্ফুট একটা ডাক ছিটকে বেরিয়ে গেল—'লাইলি!'

আবার কান পাতলুম। কোন সাড়া নেই। ছায়াময় বনভূমিতে নির্জনতা থম থম করছে। আবার দুপা এগিয়ে ডাকলুম—'লাইলি!' কিন্তু কোন সাড়াই এল না।

শুকনো পাতার শব্দ হল কোথায়। চমকে উঠে ডাকলুম—'লাইলি!'

তবু সাড়া নেই। আবার হাঁটতে থাকলুম। বীরেশ্বর কি তাহলে আমার সঙ্গে রসিকতা করল? নাকি ওরা টের পেয়ে গেছে আমার সব খবর? আমি কি অবশেষে বোকামি করে ওদের ফাঁদে পা দিয়ে বসছি?

লক্ষ্য করলুম এত ঘেমেছি যে বন্দুকটা পিছলে যাচ্ছে হাতে। যদি হঠাৎ এখন আক্রান্ত হই, পাখিমারা ছররা কার্তুজ দিয়ে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারব জানি না। তবু শক্ত হতে চেষ্টা করলুম। হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে কোথাও। সামনে এখন ঘন দুর্গম ঝোপঝাড়। পা বাড়ানো কঠিন।

হঠাৎ স্পষ্ট শুনলুম, আমার নাম ধরে কে ফিস ফিস করে ডাকল—'আনু! আনোয়ার!'

তারপরই সামনে ঝোপের ওদিকে যাকে দেখা গেল, চিনতে পারলুম না। ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা, ব্লাউজবিহীন গা, তামাটে রং, নাকে নাকছাবি, রুক্ষ চুল, নিতান্ত একটি কাঠকুড়োনি মেয়েই বটে। তার কাঁখে একটা কাঠকুটো কুড়োবার ঝুড়ি দেখা যাচ্ছিল। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তার মুখে গাছের পাতার ফাঁক গলিয়ে আসা রোদ্দুর ঝকমক করছিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুট চেঁচিয়ে উঠলুম—'লাইলি!'

লাইলি হাত তুলে ইশারায় ডাকল।

সারা শৈশব ও কৈশোর ওর মুখে ঝলমল করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র ঘ্রাণ ভেসে এল কাঠমল্লিকার। পাখিরা ডাকতে লাগল। প্রজাপতিরা দৌড়ে এল। লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটতে দেখলুম চারপাশে। একটি সরল নিষ্পাপ ছেলে আমার বুকের ভিতর থেকে ভুলে যাওয়া ভাষায় চিৎকার করে উঠল—লাইলি, আমার লাইলি!

এক ঘন কাঁটাভরা ঝোপঝাড় যে প্রতিটি পা ফেলতে মনে হল এক একটা যুগ চলে যাচ্ছে। এ কি স্মৃতির দিকে—বয়সের উজানে পাড়ি দেওয়া? লাইলির কোমর ডুবে আছে ঝোপে। তার ঠোঁটের আর চোখের হাসি ছবির মত অনন্ত সময়ের পটে যেন আঁকা। যেন তা জীবন্ত নয়।

হঠাৎ আমার চমক খেলে গেল। ওই রোদরাঙা মুখে আর হাসিতে কী যেন একটা আছে। আন্দাজ পাঁচ মিটার দূরত্ব ছিল—প্রতিটি মিটার পার হতে হতে ক্রমশ সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে স্পষ্ট হল। ...চার ....সাড়ে তিন ....তিন .....আড়াই .... পথ ফুরোয় না, ফুরোয় না! 'লাইলি'—ডেকে উঠছিল একটি কিশোর। তারপর যেন লাইলি তার ঝুড়ি থেকে কী একটা তুলে নিল।

অমনি দুপা পিছিয়ে এলুম। দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতা আমার মাথায় অনেক যত্নে যে বিপদ সংকেতের যন্ত্র তৈরি করেছিল, সেখানে লাল বাল্ব জ্বলে উঠল এবং সেই পারমাণবিক অ্যাপারেটাস থেকে যথারীতি সাইরেন বাজতে থাকল কাঁপাকাঁপা সুরে।

কিন্তু আমার হাতে এখন বীরেশ্বরের পাখিমারা বন্দুক আর পকেটে কয়েকটা ছররা কার্তুজ। বড়জোর সাংঘাতিক আহত করা যায় কাকেও, অন্তত পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে।

এদিকে লাইলির সেই অদ্ভুত হাসিটা ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেছে এবং সেখানে এখন জেগে উঠেছে একটা সূক্ষ্ম বাঁকা রেখা, যা ক্রূর আর রহস্যময়। তার হাতে রিভলবার। রিভলবারটা তুলে সে তাক করেছে আমার দিকে। কয়েকটি সেকেন্ডে এসব ঘটল।

ভয় দুঃখ রাগ অপমানবোধ আমাকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। গলায় বোবা ধরে গেল। একটিমাত্র চিৎকারই করা যেতে পারে এখন —'লাইলি কি আমাকে খুন করতে চাও?' কিন্তু কিছু করা গেল না। বুঝতে পারলুম ফাঁদটা আমি টের পাইনি।

পরের মুহূর্তগুলো আমার স্বাভাবিক আত্মরক্ষার বোধটাকে জাগিয়ে দিল এবার। বন্দুক দিয়ে লাইলির রিভলবার ধরা হাতে আঘাত করা ও সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বা বাঁয়ে লাফ দিয়ে সরে যাওয়া দরকার। সে একেবারে মুখোমুখি রয়েছে।

লাইলি ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। তার দুচোখে ওই উজ্জ্বলতা ঘৃণা মেশানো হিংসা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মতলবটা কাজে লাগানোর জন্যে যেই তৈরি হয়েছি, ডান পাশের ঝোপ থেকে চাপা আওয়াজ এল—'বন্দুকটা ফেলে দিন!' বাঁ পাশেও কে হেসে উঠল।

তাহলে সত্যিসত্যি আমি ফাঁদে পা দিয়েছি এবং আটকে গেছি। ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলুম। ডান দিকের ঝোপ ঠেলে এগিয়ে আসছে সেই দাশগুপ্ত, তার হাতে সেই অদ্ভুত রাইফেলটা রয়েছে। আর বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে—আর কেউ নয়, ধূর্ত বীরেশ্বর!

আমি ধরা পড়ে গেছি নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার কতটুকু ওরা জেনেছে আঁচ না করে ধরা দেওয়া উচিত হবে না।

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল—'বন্দুকটা ফেলে দাও, আনু। লাইলি চায় না কেউ বন্দুক হাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসুক!'

বন্দুকটা তার দিকে ছুড়ে দিতেই সে লুফে নিল। তারপর লাইলির দিকে ঘুরে বলল—'ঠিক আছে লাইলি। তোমার প্রেমিকের দায়িত্ব এখন আমার। তুমি কেটে পড়ো।'

লাইলি ঘুরে পা বাড়াল। একটা ভারি প্রশ্বাসের আওয়াজ পেলুম যেন। লাইলিরই কি? একটানা উত্তেজনার অবসান ঘটলে এমন দীর্ঘশ্বাস পড়ে। আমি তার হাঁটুর নিচেকার নিটোল মাংস দেখছিলুম। কাঠকুড়োনি মেয়ের ভঙ্গিতেই সে এগিয়ে যাচ্ছে. আমি তার দিকে আর তাকাতে পারলুম না। মনে

হল, এর চেয়ে বড় অপমান জীবনে আর কিছু থাকতে পারে না।

এবার বীরেশ্বর কাঁধে হাত রাখল। হাতের ওজনটা বেশ জোরালো। নিশ্চয় বন্ধুত্বসূচক নয়। কাঁধ নাড়া দিয়ে বললুম—'বীরেশ্বর, এর কী মানে হয়?'

বীরেশ্বর হাসতে হাসতে বলল—'তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একটু ফাজলেমি করছি হয় তো।'

সতর্ক হলুম। বললুম—'কিছু বুঝতে পারছিনে বীরু। তুমি বললে, লাইলি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আমাকে তুমিই পাঠালে। তারপর ....'

বীরেশ্বর আমার কাঁধে তার থাবাটা আরও শক্ত করে বলল—'ওসব কথা থাক, আনু। আমি খুব দুঃখিত যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হয়। তপু, একে নিয়ে যা তাহলে।'

আতঙ্কে বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। সেই হাসিটা নেই, ভীষণ গাম্ভীর্য থমথম করছে ওর মুখে। হাত কাঁধ থেকে তুলে নিতেই দাশগুপ্ত অথবা তপু রাইফেলটা বুকে ঠেকিয়ে বলল—'টুঁশব্দটি করবেন না, স্যার। চলে আসুন।'

. শেষ চেষ্টায় বীরেশ্বরকে বলে উঠলুম—'বীরু, একি করছিস তোরা? বলবি তো খুলে? মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিনে যে!'

অমনি বীরেশ্বর আমার গালে চড় মারল। মাথা ঘুরে গেল। পড়ে গেলুম। তখন তপু, নামে লোকটা আমার জামার কলার ধরে টেনে তুলল। অভিনয় করা আমার পক্ষে বরাবর সহজ। অভিনয় ছাড়া আমার পেশায় কাজ হয় না। কিন্তু এত সহজে চোখে জল এসে যাবে—বিনা চেষ্টায়, ভাবিনি। এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে উঠলুম—'বীরু আমাকে মারলি তুই! কেন—কী করেছি আমি?'

বীরেশ্বর আমার পাছায় এক লাথি মেরে বলল—'শাট্ আপ শালা টিকটিকির বাচ্চা। তপু, নিয়ে যা। আমি ব্রিজে গিয়ে বসছি। ঝটপট ফিরে আসবি।'

তারপর বন্দুকটা নাচাতে নাচাতে চলে গেল সে। নাঃ, আর অভিনয় চলবে না। ওরা আমার পরিচয় যেভাবে হোক জেনে গেছে। রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, ওরা তার চেয়েও ধুরন্ধর এবং সতর্ক। ওদের লোক সবখানে ওঁৎ পেতে আছে, এতে কোন ভুল নেই। মুহূর্তের জন্যে আমার সন্দেহ জাগল, তাহলে কি পুলিশের মধ্যেও ওদের চর রয়েছে? তা না হলে আমার পরিচয় জানা কোন ভাবেও সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে।

তপু বা দাশগুপ্ত রাইফেলের নল ইসারা করে বলল—'চলে আসুন স্যার! বীরুদার মেজাজ খারাপ করেছেন, আমারটা খারাপ করবেন না প্লিজ! আমার ধাত আবার অন্যরকম।'

শান্তস্বরে বললুম—'কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'চলুন না! বলেছি, টুঁ শব্দ করবেন না। তাহলে পাছায় লাথি খাবেন ফের। হুঁ—এদিকে!'

আমার সঙ্গে আন্দাজ আড়াই মিটার দূরত্ব রেখে হাঁটতে থাকল। উঁচু গাছপালার ভিড় কমে ঝোপঝাড় দেখা যাচ্ছিল সামনে। ক্রমশ সন্দেহ বাড়ছিল। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে? মেরে ফেলতে নাকি? এই জঙ্গলে মানুষ মেরে পুঁতে ফেললে কেউ টের পাবে না কোনদিন। লোকটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তার শারীরিক সামর্থ্য মাপলুম। গায়ের জোরে এঁটে ওঠা কঠিনই হবে। তাছাড়া হাতে ওর অটোমেটিক রাইফেল। সম্ভবত বিদেশি জিনিস। খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছি টের পেয়ে সে ধমক দিল—'সামনে তাকিয়ে হাঁটুন!'

বুঝলাম তার চোখদুটো সবসময় আমার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল এতক্ষণে। একটা ভয়ঙ্কর শূন্যতা সামনে ভেসে উঠছিল। এই রোদঝলসানো উদ্ভিদজগৎ মুছে যাচ্ছিল বারবার। পাখির ডাক দূরের গভীরতায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। অথচ সারাক্ষণ সেই কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ভাসছিল। একটি স্মৃতি হালকা ও ভীরু প্রজাপতির মতো আমাকে অনুসরণ করছিল।

কিন্তু না—এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ঘৃণা ও হিংসা, ধূর্ততা ও ক্ষিপ্রতা—এইসব জিনিস চাই। কোন স্মৃতি নয়, প্রেম নয়, লাইলি নয়—কোন সৌন্দর্য নয়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালুম। প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী! আমার সামনে কয়েকটা ঘন বিশাল ঝোপ—নাটা ও কুঁচফলের জঙ্গল, তার ওদিকে একটা নিচু বাঁধের ওপর বুনো জামের দীর্ঘ দেয়াল।

জামফল পাকার ঋতু এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বল রোদে সবুজ জামগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আর তার ওপাশে কাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। আমি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে বসে পড়ল এবং ঠিক খরগোশের মতো নিচের উঁচু উলুকাশের মধ্যে ঢুকে গেল। কাশগুলো দুলেদুলে স্থির হল।

লাইলি! লাইলি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাহলে? একবার ভাবলুম, ওর নাম ধরে ডাকি—পরে ভাবলুম, যেভাবে ও লুকিয়ে পড়ল—তাতে বোঝা যায় এই তপুটাকে দেখা দিতে চায় না সে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে লোকটা তেড়ে উঠল 'চলে আসুন!'

কোথাও আর কোন লোক নেই। কোন রাখাল, কাঠকুড়োনি মেয়েরা, কিংবা কোন মুসহরও আজ জঙ্গলে যেন আসেনি।

সামনের ঝোপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার চমকে উঠলুম। তিনটে লোক চুপচাপ বসে রয়েছে। একটা কবরের সমান যথেষ্ট গভীর গর্ত খোঁড়া রয়েছে, তার দুধারে মাটি উঁচুকরা। তার ওপর তিনটে কোদাল পড়ে আছে। ঝোপের ছায়ায় বসে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজনকে বাবুশ্রেণীর মানুষ মনে হল। তার পরনে প্যান্টশার্ট, হাতে একটা বন্দুক। অন্য দুজন গ্রাম্য মজুর শ্রেণীর লোক। তাদের একজনের হাতে একটা বল্লম, অন্যজনের হাতে একটা লম্বা দা। মুহূর্তে সবকিছু সাদা বা ধূসর হয়ে পড়ল আমার চোখে। স্পষ্ট হল, কী ওরা করতে চায়। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় আমাকে চাঙ্গা থাকতেই হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগেও বারকয়েক পড়তে হয়েছে। কিন্তু সে ছিল শহর, এ হচ্ছে গ্রামের এক নির্জন জঙ্গল। যা করতে হবে, তা নিজেকেই। কোন সাহায্য মিলবে না।

একটু পস্তানি হল। এতক্ষণ একজনমাত্র লোক আর একটি রাইফেল ছিল। চান্সটা কেন নিলুম না? এবার এতগুলো সশস্ত্র লোকের সঙ্গে একা নিরস্ত্র লড়তে যাওয়ার মানেই মৃত্যুকে এগিয়ে দেওয়া।

তবু একটু বোঝাপড়া করে ফেললুম নিজের সঙ্গে—চান্স নেব, নাকি নিজের সঙ্গে মৃত্যুকে বরণ করব নিঃশব্দে? ঠিক করলুম—চান্স নেব।

লোকগুলো আমাকে দেখছিল। কিন্তু পাথরের মূর্তি যেন সব! প্রত্যেকটি চোখে জানোয়ারের হিংস্রতা জ্বলজ্বল করছে। বন্দুকধারী এবার উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর আমার দিকে বন্দুকের নল ইসারা করে গর্তে নামতে হুকুম দিল।

জায়গাটার একটু বর্ণনা দরকার। কবরটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। আমি দাঁড়িয়ে আছি পূর্বদিকে মাঝামাঝি জায়গায়—পায়ের এক মিটার দূরে মাটির স্তূপ শুরু হয়েছে। সেই রাইফেলধারী তপু রয়েছে আমার ডাইনে এবং একটু পিছনে আরও দু মিটার দূরে অর্থাৎ কবরের উত্তর-পূর্বে কোণ থেকেও সোজা দুমিটার দূরে বন্দুকধারী দাঁড়িয়েছে কবরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মাটির স্তূপে। বাকি দুজন বসে আছে কবরের দক্ষিণে মাটির ওপর। মাটি নরম এবং ভিজে। কবরের পশ্চিমে আন্দাজ ত্রিশ বর্গমিটার ফাঁকা জমি—তারপর উলুকাশের ঝোপ, তার পিছনে নিচু বাঁধ—যার ওপর ঘন জামগাছের দেয়াল। কবরের উত্তরে টানা ঝোপঝাড় নদী পর্যন্ত এগিয়েছে। নদী দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ মিটার দূরে। কবরের দক্ষিণে কিছু ঘন ঝোপ—তারপর বড়বড় কিছু হিজল ভাঁট শ্যাওড়া আর ভেলাগাছের জটলা। আমার পিছন অর্থাৎ কবরের পুবদিকেও তাই।

কয়েক মুহূর্তে পটভূমিকা জরীপ করে নিলুম। তারপর বললুম—'আমাকে আপনারা মেরে ফেলবেন তাহলে?'

সামনের বন্দুকধারী শিস দিয়ে ইসারায় বলল—'ঝটপট নামো।'

ঠোঁটে একটু হাসি ফুটিয়ে বললুম—'ঠিক আছে। কিন্তু আপনারা তো জানেন—আমি মুসলমান। মরার আগে অজু করে পবিত্র হতে চাই। আমাকে দয়া করে একটু জল এনে দিন।'

বসে থাকা বল্লমধারী বলল—'শালা বুলি জানে ভালোই।' তারপর হাসতে লাগল।

'ধরা গলায় বললুম—আপনারা দয়া করে আমার ধর্মকে অসম্মান করবেন না।'

'চোওপ শালা টিকটিকি! কবরে নাম শিগগির!' বন্দুকধারী খাপ্পা হয়ে বলে উঠল।

কবরে নামলে আর কিছু করা যাবে না ভালই জানি। কিছু করতে হলে এখনই। এরা আমাকে কথা

বলতে দিতে চায় না। তাছাড়া ভেবে দেখলুম, বেশি কথা বললে হয়তো ওরা কবরে নামা অবদি অপেক্ষা না করতেও পারে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠলুম—প্রচণ্ড বাজখাঁই চেঁচানি—'সাপ! সাপ! সরে যান!'

গলায় অমন একশোটা বিউগলের আওয়াজ আসতে পারে ভাবিই নি। রাইফেলধারী তপু এর জন্যে নিশ্চয় তৈরি ছিল না। এই ব্যাপারটা ওঁরা কল্পনাও করেনি। মানুষের সহজ স্বাভাবিক একটা চমককে কাজে লাগাতে দেরি করলুম না।

তপু লাফিয়ে সরে আসছিল। মুহূর্তেই ওর রাইফলটা এক হাঁচকা টানে কেড়ে নিয়ে বন্দুকধারীকে গুলি করলুম—ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে। সে কবরে গড়িয়ে পড়ল। তপু পড়ে গিয়েছিল হ্যাঁচকা টানে। দ্বিতীয় গুলি তারও দুইভুরুর মাঝখানে ঢুকল পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। সে একবার বেঁকে সোজা হয়ে গেল।

দা আর বল্লম তখনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে বসে আছে। তাদের দিকে ঘুরতেই বল্লমধারী ডিগবাজি খেয়ে পিছনের ঝোপে ঢুকল। দাধারী পা ফসকে পড়ে গেল কবরেই—বন্দুকধারীর ওপর। আরেক গুলিতে সে ঘাড় দুমড়ে পড়ে রইল। বল্লমধারী ঝোপের আড়ালে দৌড়চ্ছে। অবশ্য বল্লম কবরের ধারেই পড়ে আছে। রাইফেলটা দ্রুত পরখ করে নিলুম। পরপর পাঁচটা গুলি ছোঁড়া যায়। এ আসলে চীনা রাইফেল।

লোকটার চলে যাওয়া ঝোপ নড়া দেখে টের পাচ্ছিলুম। এখনও দুটো কার্তুজ রয়েছে। ওকে শেষ করার জন্যে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে তাকে হারিয়ে ফেললুম। সেই সময় মনে পড়ে গেল বাঘিনীটা খুব কাছাকাছি কোথাও আছে।

পরপর তিনবার গুলির প্রচণ্ড শব্দ হয়েছে। এতে তার কৌতূহল জাগতে পারে!

এবার বেশ বিপদে পড়ে গেলুম। কখন কোত্থেকে তার রিভলবারের গুলি আসবে জানি না। চারপাশে ঘন জঙ্গল। তাই মরিয়া হয়ে দৌড়ে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছবার চেষ্টা করলুম।

উল্টোদিকে অর্থাৎ উত্তরে কবরের পাশ দিয়ে এগোলে নদীতে নামা যায়। সেখানে পৌঁছতে পারলে বিপদ অনেকটা কমবে। কিন্তু ব্রিজে নিশ্চয় বীরেশ্বর অপেক্ষা করছে তপুর। দেখা যাক্।

প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হবার ভয় নিয়ে দৌড়ানোর চেয়ে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা আর থাকতে নেই। উদ্ভিদজগৎকে সহস্রচক্ষু প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর মনে হচ্ছিল।

কবরের কাছাকাছি আসতেই থমকে দাঁড়াতে হল। লাইলি!

লাইলি চেহারা বদলেছে কখন। মোটামুটি ভদ্র বেশ। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। হাতে সেই রিভলবারটাও নেই।

সে কবরের ধারে দাঁড়িয়ে মড়াগুলো দেখছে। দূর থেকেও তার মুখের বিস্মিত ভাব স্পষ্ট টের পাচ্ছিলুম।

হয়তো বিস্ময় আর আতঙ্ক বেশি বলেই আমার পায়ের শব্দ সে টের পায়নি। আমাকেও লক্ষ্য করেনি। তাই পা টিপে টিপে কবরের দক্ষিণ দিকে ঝোপের আড়ালে চলে গেলুম। তারপর রাইফেলটা তাক করে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে ডাকলুম—'লাইলি!'

ছয়

আমার ডাক এবার নিশ্চয় প্রেমিকের মতো ছিল না। হত্যার নিজস্ব নিয়ম নিজস্ব প্রবণতা আছে। হত্যার নেশা আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল। শুধু আমিই জানি, রাইফেলের একটি গুলির বদলে একটি মুখের শব্দ ছুঁড়তে আমার কতটা কষ্ট হয়েছিল। নিজের হাতের আঙুল—যা অটোমেটিক ট্রিগারে রাখা ছিল, তাকে থামিয়ে রাখতে আমার শরীরে রক্ত ঝড় তুলেছিল। কিন্তু মানুষই এমনটি পারে। বাঘ কোণঠাসা হলে সামনের কাকেও রেহাই দেয় না। মানুষ মুহূর্তের জন্যেও থমকে দাঁড়ায়।

পটভূমিটার কথা ভাবলে এখনও রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। গর্তে দুটো এবং ঝোপে ও ঘাসে একটা মানুষ পড়ে রয়েছে। তখনও তাদের কেউ বেঁচে থাকতেও পারে। গর্তের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে

একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং মরিয়া ঘাতক তার নাম ধরে ডাকল। অথচ তাকে বাঁচতে হলে তক্ষুনি পালাতে হবে। শুধু শত্রুদের ভয়ে নয়, নিজের নার্ভও তখন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে।

মনে পড়ছে, যখন ডাকলুম—আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপছিল। গলার স্বরও কেঁপে গিয়েছিল। আর, আমি তো সামরিক বিভাগের লোক নই—যাদের ফ্রন্টলাইনে যেতে হয়। তাই এরকম নার্ভাস হয়ে পড়া খুবই সহজ ছিল আমার পক্ষে।

আমার ডাক শুনেই লাইলি ঘুরল। তার মুখে ঘামের অজস্র ফোঁটা, মাথার ওপর গ্রীষ্মের খর সূর্য। ভীষণ লাল দেখাচ্ছিল মুখটা। নাকের দুপাশে একটু কুঞ্চন। ঠোঁট দুটোয় ভাঁজ। কিন্তু চোখে এখন সেই ক্রূরতার ছাপ নেই। ডানহাতটা সোজা উরু বরাবর ঝুলছে। বাঁহাতটা বাঁকানো রয়েছে পেটের দিকে এবং কনুইয়ের কাছে কালো একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, মাঝারি সাইজের। তার পরনে ফিকে খয়েরি একটা তাঁতের শাড়ি, জামাটাও একই রঙের—কিন্তু হাতকাটা নয়। মাটির স্তূপের ওপর তার সাদা দুটো খালি পা—স্থির।

লাইলি ঘুরে আমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কোন কথা বলল না। এর ফলে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। কী করা উচিত, কিছুতেই মাথায় এল না। এই স্ত্রীলোকটিকে জ্যান্ত বা মরা অবস্থায় গ্রেফতার করার অধিকার আমার আছে। এবং এর জন্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে এখানে। একে এবার পেয়েও গেছি মুখোমুখি একা। অথচ মাথায় আসছে না এখন ঠিক কী করা দরকার। তাছাড়া আর এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না। এখনই যে কোন চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জীবনে এমন পরিস্থিতি আসবে, ভাবতেও পারিনি। চেষ্টা করলুম একটা সিদ্ধান্ত নিতে। ট্রিগারে চাপ দিলেই সব রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু বীরেশ্বর বলেছিল, রাষ্ট্র একটা ভয়ঙ্কর খাঁচাকল কিংবা অন্ধ দানব। দ্রুত ভেসে এল কথাটা এবং আমার সিদ্ধান্তকে গুলিয়ে দিল।

একটা বিদ্রোহের ভাব পেয়ে বসল সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল চেঁচিয়ে বলি, আমি তোমাদের গোলাম হতে চাই না। রাষ্ট্র সরকার দেশ সমাজ অনেক বড় আর জটিল ব্যাপার। এই মেয়েটিকে খুন করে কাদের কতটা মঙ্গল হবে আমার জেনে কোন লাভ নেই।

লাইলির দিক থেকে কোন প্ররোচনা এলে অর্থাৎ সে তার সেই রিভলবারটা বের করে বসলেও অবশ্য একটা অজুহাত পেতুম। কিন্তু সে কিছুই করছে না। আমার হাত ঘামে পিছল হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ দেখি ওর ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তারপর সারামুখে একটা শব্দহীন আর্তনাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপর সে অস্ফুটস্বরে বলে উঠল—'আনুদা, আমাকে আপনি মেরে ফেলবেন?'

জবাব দিলুম না। তখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলুম।

ভাঙাগলায় ও ফের বলে উঠল—'আনুদা! কেন আমাকে মারবেন? কী করেছি আপনার?'

ভাবলুম, ধূর্ত স্ত্রীলোকটি সময় নিচ্ছে—কথা বলার ছলে দেরি করিয়ে দিতে চাচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে ধরে দ্রুত এদিক ওদিক তাকিয়ে নিলুম। কেউ কোথাও নেই। ওর কথার জবাব দেওয়ার মানে হয় না। ওকে খুন করা যে এখন অন্যায় কিছু নয়, তা কি ও বোঝে না? এ অবস্থায় অন্য কেউ হলে এতটা সময় দিত না, তাও কি ও টের পাচ্ছে?

হঠাৎ ও অস্ফুট কেঁদে ফেলল। ....'আনুদা, আমাকে মারবেন না—আমি ধরা দেব। চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে!'

ঠিক এই সিদ্ধান্তটাই নিতে চাচ্ছিলুম যেন। ওর কথা শোনামাত্র আমার চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। সত্যি বলতে কী, মনের জোরও ফিরে পেলুম এতক্ষণে। বললুম—'নদীর দিকে চলো! কুইক!'

ও আগে আগে হাঁটতে থাকল। আমি ওর যথেষ্ট তফাতে চারদিকে সতর্কচোখে লক্ষ্য রেখে এগোলুম। এদিকে নদীর পাড় খাড়া। একখানে ধস ছেড়ে নদীগর্ভে স্তূপের মতো মাটি জমেছে। লাইলি সেখানেই লাফিয়ে নামল। তারপর আমি নামলুম। নিচে একফালি হাল্কা স্রোত বইছে। স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জলে পা রাখতেই সব উত্তেজনা ও ক্লান্তি চলে গেল। তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিলুম। মুখে ও ঘাড়ে জল দিলুম। কিন্তু সব সময় ওর দিকে চোখ ছিল। লাইলি চরে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে তাকিয়েছিল। ব্রিজটা মাইলটাক পুবে রয়েছে চোখ ঝলসানো রোদে সেখানটায় সাদা ঢেউয়ের কাঁপন দেখা যাচ্ছে। গাছের

আড়ালে নকল ইরিগেশন অফিসারদের তাঁবুটাও দেখতে পেলুম। বীরেশ্বর ওখানে বসে অপেক্ষা করছে।

লাইলি ব্রিজের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। এগিয়ে এসে বললুম—'এক মিনিট! তোমার ব্যাগটা দাও।'

নিঃশব্দে ব্যাগটা আমাকে ছুঁড়ে দিল সে। খুলে দেখলুম, একটা তোয়ালে, গগলস, আর কী সব টুকিটাকি রয়েছে—রিভলবারটা নেই।

তখন বললুম—'রিভলবারটা কোথায়? বের করো শিগগির!'

লাইলি জবাব দিল—'ফেলে দিয়েছি।'

ধমক দিয়ে বললুম—'চালাকি করো না! শিগগির বের করে দাও।'

লাইলি হাসবার চেষ্টা করল। —'বিশ্বাস করছেন না? বেশ তো—আমাকে সার্চ করে দেখুন!'

একটু ইতস্তত করার পর কাছে এগিয়ে গেলুম। তারপরই টের পেলুম ওর শরীর হাতড়াতে যাচ্ছি! শরীর—লাইলির সেই শরীর!

লাইলি আমাকে থামতে দেখে হাসল। তারপর হঠাৎ নিজের শাড়িটা খুলে একপাশে গরম বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলল। তারপর পরনে একটা কালো সায়া আর গায়ে একটা ব্লাউস। হ্যাঁ—একটা অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য এবং যৌবন নিশ্চয় চোখের সামনে গ্রীষ্মের রোদে ঝলসাচ্ছে। কিন্তু আমার মন এখন অন্যসুরে বাঁধা। সে সায়ার ফাঁস খুলে সায়াটা ঝাড়ল, তার উজ্জল সাদা নাভি কয়েকপলক দেখা দিয়ে হারিয়ে গেল। তারপর সে আমার দিকে পিছন ফিরে পাছার দিকটা দেখিয়ে দিল। এবং আবার মুখোমুখি ঘুরে বলল—'আর কোথায় লুকিয়ে রাখব ভাবছেন?'

আমার দৃষ্টিতে সন্দেহ আঁচ করে সে সায়ার ফাঁসটা মুঠোয় ধরে বলল—'আপনার সাহস থাকলে নিজে দেখতে পারেন!'

ভুলেই গিয়েছিলুম যে সে গৃহস্থ মেয়ে নয়। এ ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুতেই ওকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই আর একটুও দ্বিধা না করে হাত বাড়ালুম। ডানহাতে রাইফেল এবং সেটা অটোমেটিক। তাই যথেষ্ট সাবধান হতে হল। বাঁহাতটা প্রথম ওর পাছার দিকটায় রাখলাম, তারপর হাতটা ঘুরতে ঘুরতে সামনে এল। তখন আমি যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। সায়াটা তুলে সে উরুদুটো দেখিয়ে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—'বোতামের ক্লিপগুলো খুলে দিন।'

ব্রেসিয়ারের ওপর আমার আড়ষ্ট হাত নেমে গেল। তার স্তনের কোমলতায় ঘুরে সেই অনুভূতিহীন হাত যখন আমার কাছে ফিরে এল, তখন দেখলুম—আমার কাজটা যথারীতি প্রফেশানাল হয়ে চুকেছে। এমন কাজ আগেও অনেকবার করতে হয়েছে। ফুলবাগান বস্তীর কুখ্যাত মেয়েগুণ্ডা অতসী দাসীর কথা মনে পড়ছিল। সেও এমনি করে বডিসার্চ করতে দিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল রাতের ব্যাপার। এখন তো দিন—উজ্জ্বল রোদ এবং এই মেয়েটির শরীর একদিন আমার কাছে সবচেয়ে কাম্য সবচেয়ে পবিত্র ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু বিকার মনে জাগল না। চমৎকার একটি মানুষ কুকুর তার রাষ্ট্র নামক প্রভুর নির্দেশ অদ্ভুত দক্ষতায় পালন করল।

কিংবা এমন হতে পারে যে আমি আসলে মৃত্যুভয়ের আদিম আবেগেই এই কাজটা ভালভাবে করে যেতে পারলুম।

বললুম—'ঝটপট শাড়ি পরে নাও। ওপারে চলো।'

সে শাড়িটা পরে ফেললে। ব্যাগটাও কুড়িয়ে নিল। তারপর গরম বালির ওপর লম্বা পা ফেলে এগোল। খালি পায়ে চলতে কষ্ট হচ্ছিল বোঝা যায়। ওপারটা বেশ ঢালু। তরমুজের ক্ষেতের মাথায় একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছিল। কুঁড়ের ভিতর কে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এতক্ষণে ঘড়ি দেখলুম—এগারোটা সাতচল্লিশ।

সামনে সোজাসুজি গেলে বিশাল বিল পড়ে। ডাইনে কাশবন ভেঙে কোনাকুনি চললুম। উঁচু সড়কে উঠতে হবে। তারপর বাস লরি যাহোক কিছু পেয়ে যাব। বাবুগঞ্জে গিয়ে পৌঁছতে পারলে নিশ্চিন্ত।

রাঢ় অঞ্চলের ওইসব বিশাল মাঠ বা বিলে গ্রীষ্মের দুপুরগুলো কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, অভিজ্ঞতা না

থাকলে অনুমান করা কঠিন। উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে আসায় ক্রমশ রোদের তাপ বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। গলা শুকিয়ে খসখস করছিল। কাছাকছি কোথাও জল নেই। ফোস্কা পড়ে যাচ্ছিল শরীরের খোলা জায়গাগুলোয়। টলতে টলতে এগোচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল, ওই সড়কটায় পৌঁছনোর আগেই হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে যাব।

কিন্তু লাইলি এতে অভ্যস্ত। সে বেশ হন হন করে হেঁটে চলেছে। এখন কাশখড় কাটার মরশুম। অথচ রোদের ভয়ে সব খড়কাটারাই পালিয়েছে। এখানে ওখানে কাটা খড় পড়ে রয়েছে। খড় বয়ে নেওয়ার জন্যে যে গাড়িগুলো আসে, তাদের চাকার চাপে দুফালি টানা পথ তৈরি হয়ে গেছে। একফালি দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। সড়ক তখনও আন্দাজ কোয়ার্টার মাইল দূরে। সামনে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখতে পেলুম। অমনি আর নিজেকে থামিয়ে রাখা গেল না। বললুম—'লাইলি। একমিনিট।'

লাইলি দাঁড়াল। ঘুরে সপ্রশ্ন তাকাল।

'এখানে এসো। একটু বসা যাক্।'

সে একটু হেসে ধুপ করে বসে পড়ল শুকনো ঘাসের ওপর। আমি তার বেশ খানিকটা তফাতে বসলুম। তারপর এতক্ষণে সিগ্রেট ধরালুম। দেশলাই কাঠিটা সাবধানে ঘসে নিবিয়ে দিলুম। কারণ আগুন ধরে গেলে আমরা আর বেরোতে পারব না। জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে। খড় ও ঘাসের জঙ্গল শুকিয়ে বারুদের মতো হয়ে আছে।

হু হু বাতাস বইছিল। লাইলি পাদুটো ছড়িয়ে পাশ ফিরে বসেছে। তার মুখটা এখন কালো হয়ে পড়েছে। তার পায়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। যে রক্ত দেখলে একটু আগে আরও খুন চড়ে যেত মাথায়, এখন তা মনে কষ্ট আনল। আহা বেচারা। বললুম—'জুতো পরোনি কেন?'

লাইলি জবাব দিল না। ঠোঁট শুকিয়ে রয়েছে। জিভ দিয়ে একবার চাটল।

ফের বললুম—'রিভলবারটা ফেলে দিলে কেন?'

এবার সে একটু হাসল। ....'ধরা দেব বলে!'

'ধরা দেবে বলে? চালাকি করে কোন লাভ নেই, লাইলি। তোমার মতো মেয়ে ক্রিমিনাল আমি কম দেখিনি। সত্যি জবাব দাও তো, কেন....'

সে বাধা দিয়ে বলল—'কী বললেন? মেয়ে ক্রিমিনাল?'

'হ্যাঁ!'

'কে ক্রিমিনাল? আমি?'

'ওকথা থাক। আমি যা জানতে চেয়েছি, তার জবাব দাও।'

'তার আগে আপনি বলুন না, কেন আমি ক্রিমিনাল?'

'সে জবাব দেবে কোর্ট। সরকার।'

'উঁহু! তারা কে? আপনি আমাকে কেন অ্যারেস্ট করতে এসেছিলেন?'

'শুধু অ্যারেস্ট নয়—মেরে ফেলতেও।'

'আমি—আমরা সবই জানি আনুদা! কিন্তু আপনার কী লাভ এতে?'

'আমি....' হঠাৎ থেমে গেলুম। এর জবাবে নিজেকে চাকর বলতে হয়। কিন্তু এখন তা ভাবতে কেন যেন তেতো লাগল। তাই বললুম—'বাজে কথার সময় নেই। তুমি রিভলবারটা ফেলে দিলে কেন?'

'বলেছি তো। ধরা দিতে চাইলুম, তাই।'

'হঠাৎ তোমার এমন সুমতি হয়ে গেল কেন লাইলি?'

'বললে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'আগে বলো, তারপর বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসবে।'

একটু চুপ করে থেকে সে বলল—'যদি বলি—আপনাকে ওরা মেরে ফেলবে বলে আমার কষ্ট

হয়েছিল?'

খাপ্পা হয়ে বললুম—'শাট আপ মিথ্যুক কোথাকার!'

লাইলি একইভাবে বলল—'বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছে। বীরুদার ষড়যন্ত্র আমি মনে মনে মেনে নিতে পারিনি। অথচ আমার কোন উপায় ছিল না। যখন পরপর তিনবার গুলিব শব্দ শুনলাম, রাগে দুঃখে আমি পাগল হয়ে গেলুম! আনুদা না হয়ে অন্য কেউ হলে নিশ্চয় অমন হত না!'

ব্যঙ্গ করে বললুম—'তোমার ছেনালির অন্ত নেই, লাইলি!'

লাইলি মুখ ঘুরিয়ে নিল। বলল—'যা খুশি বলতে পারেন! আমি যা করি যা বলি স্ট্রেট কাট। কোন ঘোর প্যাঁচ জানিনে।' একটু থেমে সে ফের বলল—'আসলে এতদিন আমার হাঁফ ধরে গিয়েছিল! আমি এদের হাত থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজছিলুম!'

'বাঃ চমৎকার! বলে যাও।'

'চলে আমি যেতুমই। হয়তো ধরাও দিতুম। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অমন করে লুকিয়ে বেড়ানো আর আমার সইছিল না! আপনি এসেছেন শুনে একটা প্ল্যানও এল মাথায়। কিন্তু পবে বীরুদারা খোঁজখবর নিয়ে জানল আপনি কেন এসেছেন। তখন আমার ভীষণ দুঃখ হল!'

'থেমো না। বেশ লাগছে শুনতে।'

'আপনাকে ওরা ফাঁদে ফেলতে চাইল। আমি আটকাতে পারিনি। কারণ, আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রোপোজাল দিয়েছিলুম বীরুদাকে। প্ল্যানমতো কিন্তু আজ যখন পর পর তিনবার গুলির শব্দ কানে এল, ভাবলুম—যাঃ! দুনিয়ায় অন্তত একজন মানুষ আমাকে ফিল করতে পারত, সেও রইল না। তারপর রিভলবারটা ঝোঁকের মাথায় ফেলে দিলুম। বীরুদাকে আমার ঘেন্না হচ্ছিল।'

কাটাকাটাভাবে কথাগুলো বলছিল সে। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। নিশ্চয় আমার দুর্বল অনুভূতিতে আঙুল ছুঁয়ে দিয়েছে সে—আমি বিব্রত হয়ে পড়ছিলুম। কিন্তু ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। লাইলি নিপুণ অভিনয় করতে পারে জানি। তাই হো হো করে হেসে তার কথাগুলো উড়িয়ে দিতে চাইলুম।

'আনুদা, আমি কিছু ভুলি না—ভুলিনি। আজ আপনি হাসছেন, কিন্তু ....'

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম। দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'ওঠ! ওসব মহাভারত শুনে কোন লাভ নেই।'

লাইলি উঠে দাঁড়াল না। বলল—'বুঝতে পারছি, আপনি বদলে গেছেন। অথচ একদিন পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার পা চুষে দিয়েছিলেন!'

গর্জে উঠলুম—'শাট আপ! ওঠ বলছি। কুইক!'

'আপনি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছেন আনুদা! আশ্চর্য, আমার বিশ্বাস ছিল আমার সব কথা শুনলে আপনিই আমাকে ফিল করতে পারবেন!'

'একটি কথা নয় আর। ওঠ—কুইক!'

'আনুদা, আপনার কিছু মনে পড়ে না?'

এবার ওর ব্লাউসটা কাঁধের কাছে খামচে ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলুম। ও নেতিয়ে পড়ে গেল। ঠোঁট কামড়ে বলল—'জোর করলে জ্যান্ত তুলে নিয়ে যেতে পারবেন না। ছাড়ুন।'

ছেড়ে দিয়ে বললুম—'বেশ। ওঠ।'

'লাইলি উঠল না। পড়ে রইল শুকনো ঘাসে। বলল—'আমার খুশি!'

'লাইলি! আমাকে তাহলে কিছুটা অভদ্রতা করতে হবে।

'করুন না। পুলিশের লোকের বিস্তর অভদ্রতা আমাকে সইতে হয়েছে।'

তার হাত ধরে টানলুম। কিন্তু নড়ানো গেল না। এবার বিপদটা টের পেলুম। একহাতে অটোমেটিক রাইফেল—বেশি টানাটানি—বা ধস্তাধস্তি করলে যে কোন মুহূর্তেই গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওর মতো হিংস্র ধূর্ত খুনী মেয়ে নাকি দুটি নেই এদেশে। এ অবস্থায় পড়ে আবার ঘামতে থাকলুম। কোথাও কোন লোক দেখতে পাচ্ছি না যে সাহায্য মিলবে।

ধমক, টানাটানি কোনকিছুতেই কাজ হল না। সবরকম পুলিশী কসরত প্রয়োগেও ও পাথর হয়ে

পড়ে রইল। শেষে বলে উঠলুম—'তাহলে তোমাকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করতে হয়!'

লাইলি চোখ বুজে পড়েছিল। সেভাবেই বলল—'বেশ তো। তাই করুন।

'তাহলে তুমি মরতে চাও?'

'খুশি আপনার।'

পিছিয়ে গিয়ে রাইফেল তাক করে বললুম—'তাহলে মরো। দশ গোনার মধ্যে হয় তুমি উঠে দাঁড়াবে, নয় তো মরবে। এক দুই তিন চার পাঁচ ....'

প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছিলুম এই মেয়েটির নার্ভ কত শক্ত, কত নির্বিকার হয়ে উঠতে পারে। ওর ঠোঁটে অদ্ভুত একটা হাসি সমানে জেগে রইল।

'ছয়... সাত ....' মন্থর হয়ে আসছিল গোনা। ভীষণ কাঁপছিলুম। ওর ভিজে মুখের ওপর ভুরুর মধ্যিখানে সাদা কপালটা ছাড়া সবকিছু মুছে আসছিল পরিবেশ থেকে। আর কিছু সহ্য করাও অসম্ভব। যে কোন সময় নিজেই মূর্ছিত হয়ে পড়ব। তিনটে মানুষকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে খুন করতে হয়েছে, নার্ভের চূড়ান্ত অবস্থা চলেছে। এখন ট্রিগারে আঙুলের সামান্য চাপই যথেষ্ট।

'....আট ... নয় ...'

একটু সময় নিলুম। 'দশ' বলতে গিয়ে টের পেলুম গলায় স্বর নেই। তারপরই মাথাটা ভীষণ ঘুরে গেল। ঝলসানো ধূসর কাশকুশের জঙ্গল পাক খেতে শুরু করল। বুকের ভেতর খিল ধরে আচমকা দম আটকে যাচ্ছে মনে হল। অমনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলুম। সানস্ট্রোকের লক্ষণ নয় তো?

তখন টলতে টলতে গাছের ছোট্ট ছায়াটুকুতে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভীষণ দুর্বলতায় শরীর থরথর করে কাঁপছে। তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। লাইলির মাথার কাছে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলুম। লাইলি তখনও চোখ খোলেনি। এবার বলে উঠল—'কী হল আনুদা?'

ক্ষেপে গিয়ে ওর পিঠে জুতোসুদ্ধ লাথি মারলুম। অ তক্ষুনি অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠে বসল। তারপর মুখে তীব্র ঘৃণা অথবা বিদ্রূপ রেখে বাঁকা ঠোঁটে বলল—'বাঃ! বাহাদুর! মনিবরা চমৎকার শিখিয়েছে কুকুরকে!'

কুকুর! ইচ্ছে হল, ওর দাঁতগুলো রাইফেলের কুঁদো মেরে ভেঙে ফেলি। কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরোটুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি ওর দেহটা। গুলি করে মারলে তো টেরও পাবে না আমার এই ভীষণ ঘৃণা আর দুঃখ, দুঃখ আর অভিমান!

দুঃখ আর অভিমান! চমকে উঠলুম নিজের দিকে তাকিয়ে। এই মেয়েটিকে আঘাত করেও গভীর যন্ত্রণা সইতে হবে, আবার ওকে রেহাই দিলে অনুতাপে অনুশোচনায় ছটফট করে জ্বলতে হবে—কারণ, কর্তব্যের দায়—স্মৃতি। নিজের এই দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিজেকে কী অসহায় মনে হল!

কোন্ অবস্থায় মানুষ কোন মানুষকে একটু একটু করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে-কেটে খুন করে, এখন বুঝতে পারছি। এসময় যন্ত্রণা যা সে দেয়, নিজেও তো পায় তার বেশি! একথা আদালত বোঝে না, কোন তৃতীয় পক্ষ বোঝে না।

লাইলি দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকল। তার পিঠটা ফুলেফুলে উঠছিল। টলতে টলতে ওর কাঁধের কাছে ফের ব্লাউজ খামচে ধরলুম। বললুম—'ন্যাকামি রেখে ওঠ—শিগগির!'

লাইলি ওই অবস্থায় বসে থেকে বলল—'আনুদা, আমার ওপর কিসের এত রাগ আপনার? কিসের গ্রাজ?'

'তোমার ওপর কোন পারসোনাল গ্রাজ নেই। এ আমার ডিউটি—জাস্ট রুটিন ওয়ার্কস। ওঠ!'

'আমি জানি, বীরুদার ওপর কেন হিংসে!'

'লাইলি, রাগ চড়িও না।'

'নিজের মনকে জিগ্যেস করুন!'

'করেছি।'

'কিন্তু কেন আমি এমন হলুম. তা তো ভাবলেন না একবারও।'

'তোমার তত্ত্বকথা আমি শুনতে চাইনে। তুমি ওঠ।'

'চেষ্টা করুন না।'

'দেখ লাইলি, তখন বললে—তুমি ধরা দেবে ঠিক করেছ। অথচ এমন কেন করছ? তোমার যাতে কঠোর শাস্তি না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব—কথা দিচ্ছি। এখন, ওঠ তো!'

খুব শান্ত ভাবে কথাগুলো বললুম। ভাবলুম, এতে কাজ হবে। কিন্তু ও সেই ভঙ্গিতেই বসে রইল। নিশ্চয় এভাবে সময় নিচ্ছে। কোন মতলব আছে মনে—তার জন্যে সময় দরকার হচ্ছে সম্ভবত।

এবার আমি পাগলের মতো উদ্ভট কাণ্ড শুরু করলুম। ওর পাঁজরে কাতুকুতু দিলুম। চুল ধরে প্রচণ্ড টানলুম। ওর শরীর কি নিঃসাড় ? একটুও নড়ল না। তখন মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল।

রাইফেলটা সাবধানে কিছু তফাতে রেখে ওর শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেললুম। তারপর যথাশক্তি শাড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলুম,। এতে বাধা দিল না। শুধু বলল—'এতক্ষণ বললেই তো হত উদ্দেশ্যটা কী?'

বুঝলুম কী বলতে চাইছে। শাড়িটা পুরো খুলে নিয়ে বললুম—'আমি বীরুর মতো জন্তু নই যে বনে বাদাড়ে মেয়ে নিয়ে কামকেলি করব।'

লাইলি সায়া ও ব্লাউস পরে বসে রয়েছে এখন। তার চোখে চমক লক্ষ্য করলুম। তার ভুরুর কুঞ্চনে একটা প্রশ্ন থরথর করে কাঁপছিল।

বললুম—'গতকাল সকাল থেকে দুপুর অব্দি ওই জঙ্গলে তোমাদের দুজনকে ফলো করেছিলুম। ইচ্ছে করলেই তোমাদের গ্রেফতার করতে পারতুম—করিনি। কিন্তু আড়াল থেকে সব দেখেছি। এমন কি ছোট্ট ডোবাটার ধারে যা কিছু করেছ....'

বাধা দিয়ে লাইলি ব্যঙ্গ করল—'খুবই স্বাভাবিক আপনার পক্ষে। ফেউরা তাই করে। বাঘের এঁটো মড়া ওদের ভীষণ মুখরোচক কিনা!'

কোনও কথা বললুম না। আমি প্ল্যানটা কাজে লাগানোর কথাই ভাবছিলুম।

'তাহলে আর দেরি কেন? আসুন—বাঘটা তো এখন নেই! ভয় কিসের? কেউ হামলা করবে না।' বলেই লাইলি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে সায়ার ফাঁসটা একটানে ঢিলে করে সায়াটা নামালো।

হাঁটু অব্দি নেমেছে, তখন আমি তার গালে একটা চড় মারলুম। আঙুল বোধ্র হয় দাঁতে লাগল। ওর ঠোঁটটাও কেটে গেল। তারপর চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টানে গাছের গুঁড়ির কাছে নিয়ে এলুম ওকে। তারপর শাড়িটা দিয়ে ওকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললুম। ও বাধা দিল না।

ওর মুখের দিকেও আমি তাকাচ্ছিলুম না। খুব শক্ত করে বাঁধার পর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে আটকালুম। গুঁড়ির পিছনে এমন জায়গায় গেরোটা রাখলুম, যেখানে কোনভাবেই ওর হাত পৌঁছবে না।

ওর শ্বাসকষ্ট যাতে না হয়, বুকের দিকটা ঢিলে করে দিলুম। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে একটু তফাতে এসে সিগ্রেট ধরালুম।

সিগ্রেট টানবার সময় আড়চোখে ওর মুখটা দেখে নিচ্ছিলুম। ঠোঁটের বাঁপাশে রক্ত জ্বলজ্বল করছে। মুখ নামিয়ে ও বসে রয়েছে একটি প্রাণীর মতো। সুন্দর একটি বন্য প্রাণীর মতো।

এবং সেই সময় আচমকা আমার মনে পড়ে গেল বীরেশ্বরের কাছে শোনা ওর আগের জীবনের একটি দিনের কাহিনী—যেদিন তাকে গাঁয়ের লোকেরা মারতে মারতে চুল কেটে বের করে দিয়েছিল রাস্তায়। ওই সেই রাস্তাটা দূরের ব্রিজ থেকে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, দুধারে উঁচু শিরীষ অর্জুন আকাশিয়ার পাঁচিল। ওই গাছগুলো এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে।....

কেন হঠাৎ অত ভয় পেয়ে গেলুম, বলতে পারব না। রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালুম। তারপর প্রায় দৌড়ে পালাতে থাকলুম। কয়েক একর কাশকুশ ও মাঝে মাঝে শূন্য রবিশস্যের ক্ষেত, তারপর টানা গুল্মজাতীয় কাঁটাঝোপের থুপি ছড়ানো উঁচুনিচু মাঠ, তারপর পাকা রাস্তা।

ছুটির নেশা, কিংবা তাড়াখাওয়া প্রাণীর ব্যস্ততা আমাকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা লরি থামাতে চেষ্টা করলুম। থামল না সেটা। হাতে মারণাস্ত্র দেখেই বুঝি ভয় পেয়ে

গেল ড্রাইভার। বাঁদিকের চাকা নিচে নামিয়ে প্রচণ্ড জোরে পাশ কাটিয়ে গেল আমাকে।

আবার একটা লরি এল। গতি কমাল। কিন্তু দাঁড়াল না। চেঁচিয়ে বললুম—'বাবুগঞ্জ যাবো, বাবুগঞ্জ!' আমার মুখে ধুলো খড়কুটো ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল লরিটা।

এবার এল একটা জিপ। তখন অমি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে রইলুম। জিপটা ব্রেক কষে অন্তত বিশ মিটার তফাতে দাঁড়িয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা ভয় পাওয়া সাদা লালনীল পুতুলের মতো মানুষ দেখতে পেলুম। বললুম—'ক্ষমা করবেন! আমি ডাকাত নই। প্লিজ, আমাকে বাবুগঞ্জ পৌঁছে দিন!'

ড্রাইভারের পাশে যে তুম্বোমুখো মোটা ভদ্রলোক বসেছিলেন, বললেন—'কে আপনি? কী ব্যাপার?'

'পরে শুনবেন।'

জিপটা বাবুগঞ্জ ব্লক অফিসের। লোকগুলো আর কোন প্রশ্ন করল না। পরস্পরের দিকে একবার তাকাতাকি করে নিল। কিছু বলার আগেই আমি লাফ দিয়ে ড্রাইভারের দিকে ঠেলে উঠলুম। জিপটা চলতে থাকল।

কিন্তু প্রত্যেকে ভয় পেয়ে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। কোন প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছিল না ওরা। একটু পরেই ব্রিজে পৌঁছে গেলুম। আড়াল হবার জন্যে ঝুঁকে বসলুম। কিন্তু চোখ রইল তাঁবুটার দিকে।

তাঁবুর বাইরে কোন লোক নেই। পেরিয়ে যেতে তাঁবুর ভেতরটাও নজরে পড়ল। কেউ নেই। বীরেশ্বর কি টের পেয়েছে ইতিমধ্যে? কোথায় গেল সে? জিপ যত এগোল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলুম সামনে—তাকে কোথাও দেখতে পেলুম না।

দেখতে দেখতে রাণীহাট পেরিয়ে গেল জিপ। তারপর যখন বাবুগঞ্জে ঢুকল, জিপের লোকগুলো আচমকা জ্যান্ত হয়ে উঠল এতক্ষণে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে থাকল। জবাবে শুধু বললুম—'আগে থানায় পৌঁছে দিন - প্লিজ।'

অবশ্য একথা বলার দরকার ছিল না। কারণ চতুর ড্রাইভার সোজা থানায় গিয়ে উঠারই মতলব ভেঁজেছিল।....

গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমোলে একধরনের স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ভারি অদ্ভুত সব স্বপ্ন। দেখছিলুম, বিশাল এক কাশবন পেরিয়ে যাচ্ছি আমি আর লাইলি। তার সঙ্গে ভীষণ ভালবাসার খেলা চলেছে। হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল চারপাশে। লাইলি হাসতে হাসতে আগুনের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে, আমি অসহায় হয়ে তাকে ডাকছি—কিছুতেই আমার কথা শুনছে না। কী যে কষ্ট হচ্ছে! আমার একটা কান পুড়ে যাচ্ছে আগুনে। ....

ঘুম ভাঙল ও. সি. মিঃ দত্তের ডাকে। জানালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে মুখে পড়ছিল। পর্দাটা রড়ে লেপটে রয়েছে। গলা শুকনো কাঠ। পাশের টুল থেকে গ্লাসটা নিয়ে আগে জল খেলুম। দত্ত একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তিনি কাঁচুমাচু হাসলেন।—'একটু বিরক্ত করতে বাধ্য হলুম, স্যার। দা ব্যাড নিউজ!'

'কিসের?' বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

'মুখার্জি ফিরে এসেছে। সেই গাছটার নিচে কাকেও দেখতে পায়নি! চারপাশে খুব খোঁজা হয়েছে—নো ট্রেস!'

'হোয়াট?' উঠে দাঁড়ালুম। মনে পড়ে গিয়েছে সবটা।

'হ্যাঁ স্যার লাইলি নিজেই বাঁধন খুলে পালিয়েছে কিংবা কেউ তাকে সাহায্য করেছে। হেমন্তবাবুরা এখনও ওখানে এনকোয়ারি করছেন। অদ্ভুত ব্যাপার স্যার, ওসময় কোন লোক কাছাকাছি কোথাও ছিল না! অথচ ....'

'বীরেশ্বরের খবর কী?'

'সে হাওয়া। ওর বাড়িতে আমাদের লোক রয়েছে এখনও।'

'ব্রিজের তাঁবুটা?'

'নেই। ফাঁকা সব।'

আমি কি খুব রেগে গেলুম, নাকি খুশি হলুম? বোঝা যাচ্ছিল না। হেরে যাওয়ার কষ্ট, নাকি মুক্তির সুখ আমাকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে রাখল, কে জানে। সিগ্রেট টানতে থাকলুম নিঃশব্দে। স্বপ্নের দৃশ্যটা ভাবছিলুম।

এসময় মুখার্জি এসে গেল। স্যালুট ঠুকে একটু তফাতে দাঁড়াল। বেচারার মুখটা রোদে কালো হয়ে গেছে।

বললুম—'গর্তের লাসগুলো দেখেছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। তিনটেই ছিল—ডেড! অ্যাম্বুলেন্স গেছে আনতে।'

একটু হেসে মিঃ দত্তের দিকে ঘুরে বললুম—'তাহলে ব্যাপারটা এবার ম্যানেজ করুন মিঃ দত্ত। দেখবেন, পলিটিকস এসে না জোটে।'

মিঃ দত্ত হাসলেন। 'সব ঠিক আছে স্যার। তিনটেই কুখ্যাত এবং ফেরারী আসামী। আমাদের রিপোর্টে থাকছে, স্কোয়াড বেরিয়েছিল ওই এলাকায়—মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। সদরে মেসেজ পাঠানো হয়েছে অলরেডি। ভাববেন না।'

মুখার্জি বলল—'পলিটিক্যাল পার্টিগুলো এতে খুশিই হবে। লাইলির দলের বিরুদ্ধে ওদের প্রচণ্ড গ্রাজ আছে। ভাববেন না—শহিদ বলে কোন শোকমিছিল বেরোচ্ছে না!'

ওরা দুজনে হাসতে লাগল। বললুম—'যাই হোক, বোকামি একটু হয়ে গেছে আমার। সেটা স্বীকার করা ভালো। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেলেই এটা ঘটত না। আসলে লাইলিদের অর্গানাইজেশ্যানাল দিকটা এত শক্ত হতে পারে ভাবিই নি! ঠিক আছে—একটু ভেবে নিই।'

এটা মিঃ দত্তের কোয়ার্টার। 'চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, স্যার।' বলে তিনি ভিতরে ঢুকলেন। মুখার্জি স্যালুট করে বেরিয়ে গেল অফিসের দিকে।

ভাবতে বসে দেখলুম, মগজ প্রচণ্ড খালি। কী-ই বা করার আছে এখন? আর শত চেষ্টাতেও লাইলিকে কি খুঁজে বের করা যাবে, নাকি কোন যোগাযোগ করার পথ রইল? বুদ্ধির দোষে, জেদে এবং গভীর দুর্বলতায় মুখোমুখি লড়াই দিতে গিয়েছিলুম, তাই হার মানতে হল।

এ হার গোয়েন্দা অফিসার আনু চৌধুরীর অফিসিয়াল হার নয়—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। হয়তো এই হার তার বাকি জীবনের সবকিছু নিষ্ফল করে ফেলবে।

শূন্যদৃষ্টে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালুম। আমি ব্যর্থ। আর কিছু করার নেই—অন্তত আমি আর কোন কাজেই লাগব না।

অ্যাসট্রে থাকা সত্ত্বেও সিগ্রেটটা মেঝেয় ঘষে নিভিয়ে দিলুম। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। শিমুলিয়া গিয়ে ব্যাগটা নিতে হবে। তারপর ....

তারপর জেলার সদরে গিয়ে একটা রিপোর্ট দিয়ে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাব।

উঠে জানলার কাছে গেলুম। পর্দা সরিয়ে দেখি থানার পিছনের আমবাগানে বিকেলের রোদ শুকনো ঘাসে শান্তভাবে শুয়ে রয়েছে। কিছু ছাতারে পাখি শুকনো পাতা খুঁটে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতিজগৎ আশ্চর্য নির্বিকার। কোন ছাপ পড়েনি ঘৃণা, দুঃখ, হিংসা, ঈর্ষা, রক্ত, কান্না কিংবা গভীরতর গোপন প্রেমের। অথচ স্মৃতি একটা হালকা রঙিন প্রজাপতির মতো সব কিছু ছুঁয়ে আবার উড়তে শুরু করছে। এবং সেই সময় হঠাৎ ভেসে এল সেই কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ। সচকিত হয়ে উঠলুম। সবটুকু চেতনা জরজর হয়ে পড়ল তীব্র গন্ধের ঝাঁঝে।

'চা!'

ঘুরে, দেখি, দত্তর মেয়ে চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে। ঠোঁটে হাসি।

'শোন—তোমাদের এখানে কাঠমল্লিকা ফুলের গাছ আছে নাকি?'

মেয়েটি অবাক চোখে বলল—'হ্যাঁ। ওই তো—কুয়োতলার পাশে।'

'ও।' বলে আমি চুপ করে গেলুম। এখন—এই মুহূর্তেই শিমুলিয়ার সেই পীরের মাজারে ভাঙা

ইটের কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শান্ত হওয়া যেত। সেই স্নেহময় পবিত্র প্রাচীন গাছ কি এখনও বেঁচে আছে? কিন্তু প্রকাশ্য দিনের আলোয় এই এলাকার কোথাও একা নিরস্ত্র বেরোবার সাহস আর আমার নেই। ....

শিমুলিয়ায় আমার সত্যিকার পরিচয় কেউ জানে না। কিন্তু ভয় ছিল যদি লাইলিদের দলের কেউ থাকে ওখানে, তাহলে আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে বেশি রাতে যাওয়াই ঠিক করেছিলুম।

তখন রাত বারোটা। কৃষ্ণপক্ষ চলেছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমাদের জিপ কাঁচা রাস্তা ভেঙে গ্রামে ঢুকল। একখানে বিশাল বটগাছ আছে। তার তলায় জিপটা আমার অপেক্ষায় রইল। আমি সাবধানে নেমে গেলুম। ফৈজুচাচার বাড়ি খুব কাছেই। কিন্তু টর্চ জ্বালতেও সাহস হল না। যেভাবে হেঁটে গেলুম, গ্রামের লোকে আমাকে চোর ভাবতে পারত।

ফৈজুচাচা বারান্দায় খাটিয়া পেতে শুয়েছিল। ঘুমোয়নি। আমার চাপাগলায় ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে বলল, 'বেটা আনোয়ার! এস, এস! তোমার জন্যে বড্ড ভাবছিলুম বেটা।'

চাপা স্বরে বললুম—'আস্তে ! চাচা, আমি চলে যাচ্ছি। ব্যাগটা নিতে এলুম।'

আলোর দম বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল ফৈজুচাচা, এবার থেমে অবাক হয়ে তাকাল। ....'কেন, কেন বেটা?'

'তেমন কিছু না। ব্যাগটা এনে দাও শিগগির!'

ফৈজুচাচা উঠে দাঁড়াল। সে যে ভীষণ অবাক হয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল। লণ্ঠন হাতে সে বাড়ির ভেতর ঢুকল। প্রতিমুহূর্তে আক্রান্ত হবার আতঙ্কে অস্থির থাকলুম, যতক্ষণ না সে ফিরে এল।

ব্যাগটা দিয়ে ফৈজুচাচা চাপা গলায় বলল—'বেটা, আজ জঙ্গলে নাকি পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদের দাঙ্গা হয়েছে—তিনটে খুন হয়েছে। এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়োনি তো?'

'না, না। ওসবে কেন জড়াতে যাব?'

'কী জানি বাবা, দিনকাল খারাপ।' ফৈজুচাচা সংশয়ান্বিত চোখে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

'তাহলে আসি চাচা। আবার দেখা হবে।'

বুড়ো আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর চোখ মুছে বলল—'যদিন বাঁচি, খবরাখবর দিও। আর এসো মধ্যে মধ্যে।'

লাইলির কথা তুলতে ইচ্ছে করছিল—বুড়োর প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। কিন্তু হাতে সময় কম।

পা বাড়াচ্ছি, সেই সময় ফৈজুচাচা হঠাৎ ডাকল—'আনু, শোন।' ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমার মুখ অব্দি মিটমিটে কালিপড়া লণ্ঠনটা তুলে অদ্ভুত দৃষ্টে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল—'আমার মনে ধাঁধা রয়ে গেল বেটা। আজ জঙ্গলে ওই খুনখারাবি হল, আর তুমি এমনি করে রাতবিরেতে হঠাৎ এসে চলে যাচ্ছ। ইদিকে আজ সন্ধেবেলা তোফাজেল জিগ্যেস করছিল তোমার কথা—ফিরেছে কি না। তোফাজেল তো চোরডাকাত লোক। তাতে রাণীহাটের বীরুবাবুর লোক। আমার কেমন গা বাজে বেটা। কিছু বিপদ বাধাওনি তো?'

তোফাজেল প্রসঙ্গ চমকে দিয়েছিল। কিন্তু বুড়োর কথায় পাত্তা না দিয়ে বললুম—'না না, তুমি ভেবো না চাচা! ওসবের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ? আমি এমনিই চলে যাচ্ছি।'

বাইরে দূরে কোথাও কুকুর ডাকল। বুড়ো লণ্ঠনটা বারান্দা থেকে রাস্তার দিকে ঝুঁকিয়ে কিছু দেখে নিয়ে বলল—'বেটা আনু, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। সাবধান করা দরকার ছিল। তল্লাটে এখন ভেতর-ভেতর বড্ড অশান্তি চলেছে।'

প্রশ্ন করলুম—'কিসের অশান্তি ?'

'স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে জমিজিরেতওলা জোতদার বড়লোকের গণ্ডগোল চলছে। বীরুবাবু লুকিয়ে স্বদেশী করে কি না. তল্লাটের বড়লোকেরা ওকে খুন করার তালে আছে। তাই সবসময় বন্দুক-হাতে

ঘোরে। তোমাকে বলেনি বীরু?'

'না তো!'

'তুমি বীরুবাবুর কাছে যেতে চাইলে, সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল আগেভাগে। পরে ভাবলুম, ফিরে আসুক ছেলেটা—তখন সব বলব।'

আমি ফের পা বাড়ালুম। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বুড়ো আমার হাত ধরে টানল। ....'শোন, শোন। আসল কথাটা তো বলাই হল না। বেটা, ঝুমরি বিবির বেটি লাইলি খাতুনের কথা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব আছে।'

বুড়ো এবার কী সব বলবে, জানা—তাই সে শুরু করা মাত্র থামিয়ে দিলাম। ....'শুনেছি। বীরু সব বলছিল। সে তো সাংঘাতিক মেয়ে হয়ে উঠেছে।'

বুড়ো ফিসফিস করে বলল—'আমার নাতনী দুপুরবেলা এল হরিণমারা থেকে। এখন তো বিলের দিকটা শুকনো। সোজা বিল পেরিয়ে আসছিল। বললে, বীরুবাবু লাইলি আর জনাতিন লোক বন্দুকপিস্তল নিয়ে উলুখড়ের জঙ্গল পেরিয়ে যাচ্ছিল। নাতনীর সঙ্গে ছিল দুটো বাচ্চা। ওরা সবাই মিলে নালায় পানি খেতে নেমেছিল। তখন সামনাসামনি বীরুবাবুরা এসে পড়ে। তারপর খুব শাসিয়ে বলেছে—ওনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে একথা কাকেও বললে খুন করবে, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। নাতনী তো ভয়ে সারা। বেটা আনু, এ কী দিনকাল পড়ল ভেবে পাই না!'

উত্তেজনা চেপে বললুম—'তাই নাকি? কোথায় যাচ্ছিল ওরা?'

'সড়কে উঠে নাতনী দেখে বীরুবাবুরা বকখালির দিকে যাচ্ছেন। বকখালি সেই শাঁখালা বিলের ধারে—বেশ বড় গেরাম। বাবু ভদ্রলোকের বাস আছে। হয়তো ডাকাতি গুণ্ডামি করতে গেল শয়তানগুলো'... বলে বুড়ো আফসোসে মাথা দোলাতে থাকল।

বকখালি! মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শিমুলিয়া থেকে খুব বেশি দূরে নয়। মাইল চারেক দূরত্ব বড় জোর। একটা কাঁচা সড়ক এখান থেকে চলে গেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে। বকখালি থেকে সোজা মাইল পনের এগোলে পড়বে নলহাটি আজিমগঞ্জ রেলপথ। একটা মাঝারি ধরনের স্টেশন মোহনপুরে কাঁচা সড়কটা শেষ হয়েছে। অবশ্য এখন কাঁচা সড়কটার নিশ্চয় পাকা হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আমার উত্তেজনা বেড়ে গেল। বকখালিতে আমার বাবার এক কম্পাউন্ডার শ্রীনাথবাবু ছিলেন। তাঁর ছেলে রবীন আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। কারণ তখন শ্রীনাথবাবু শিমুলিয়াতেই থাকতেন। আমরা কলকাতা যাবার পর নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে তিনি ডাক্তারি করতেন শুনেছিলুম।

শান্তভাবে বললুম—'বকখালি! আচ্ছা চাচা, বকখালির সেই শ্রীনাথবাবু কম্পাউন্ডার এখনও বেঁচে আছেন নাকি?'

ফেজু-বুড়ো বলল—'না। তিনি কবে মারা গেছেন।'

'তার ছেলে রবীনের খবর জানো?'

'রবীনবাবুই তো এখন ডাক্তার হয়েছেন গো! খুব বড় ডাক্তার। অনেক পাস দিয়েছেন। তার ওপর অঞ্চলপ্রধান তো তিনিই। গাঁয়ের কী উন্নতি করেছেন, চোখে না দেখলে বুঝতে পারবে না। বিজলী আলো এসেছে বকখালিতে। এখনই গিয়ে দীঘির পাড়ে দাঁড়াও না! দেখবে আলো জুগজুগ করছে। ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছেন একেবারে। আমাদের কপাল, শিমুলিয়া যা ছিল, তারও কম হয়ে গেল। তোমরা চলে না গেলে কি গাঁয়ের এ হাল হয় বাবা?'

আবার কোথায় কুকুর ডাকল। তারপর চৌকিদারের গলা শোনা গেল—'হেই! জা—আ—আ—গো—ও—ও—ও!'

আর দাঁড়ালুম না। বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। কোন রকমে ওকে আশ্বস্ত করে রাস্তায় নামলুম।

হুঁ, বীরুর চর তোফাজেল আমার খোঁজ করেছিল। এটা স্বাভাবিক। ব্যাগটা খুলে আগে রিভলবারটা দেখে নিলুম। ঠিক আছে। ফৈজুচাচা এসব ব্যাপারে খুবই নির্ভরযোগ্য মানুষ। অনোয়ারের শহুরে বস্তুতে জান গেলেও কাকেও হাত ছোঁয়াতে দেবে না, জানি।

বটতলায় এসে দেখি লণ্ঠনহাতে চৌকিদার মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছে। চৌকিদারকে আমি চিনি—সেও চেনে আমাকে। তবে ডাক্তারের ছেলে বলেই। তাই সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তখন মুখার্জি বলল—'নবীন, তোমায় জানিয়ে রাখলুম—সায়েব আমাদেরই লোক। কেমন?'

নবীন চৌকিদার মাথা নাড়ল। তারপব সেলাম ঠুকে বলল—'হুজুর আমাদের তিনপুরুষের মা বাপ।'

আমাদের জিপ চলতে শুরু করল। ....

পাকারাস্তায় পৌঁছে বললুম—'একমিনিট মুখার্জি। গাড়ি থামান।'

মুখার্জিই জিপ চালিয়ে এনেছিল। দাঁড় করাল রাস্তার এক পাশে। রাতের দিকে রাস্তায় লরি চলাচল বেশি হয়। সে বলল—'খবব আছে, স্যার। আপনি না বললেও দাঁড় করাতুম।'

'খবর আমারও আছে মুখার্জি। এখন আমি প্ল্যান বদলেছি। স্টেশনে যাচ্ছি না—অর্থাৎ কলকাতা ফিবছি না।'

'খুব আনন্দেব কথা, স্যার।'

'বকখালি যাবার রাস্তাটা কেমন বলুন তো?'

'খুব ভালো পিচের রাস্তা।'

'গাড়ি ঘোরান। আমাকে বকখালি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবেন।'

মুখার্জি একটু ইতস্তত করে বলল—'নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে আপনার। কিন্তু আমার খবরটা মনে হচ্ছে, বেশ জরুরী। চৌকিদার বলল, বীরুবাবু আজ সন্ধ্যায় গাঁয়ে ফিরেছেন।'

'রাণীহাটে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কিভাবে ফিরলেন চোখ এড়িয়ে, বোঝা যাচ্ছে না। ওঁর বাড়িতে তো একটা স্কোয়াড রয়েছে। যাই হোক, একবার দেখে আসা দরকার এখুনি।'

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—'দেখুন, আমার দরকার লাইলিকে, বীরুর ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু আমার এখনই একটা গাড়ি দরকার। সম্ভব না হলে বরং পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। অন্তত একজন লোক সঙ্গে পেলে ভাল হত।'

মুখার্জি বলল—'ভুল হয়ে গেছে। ড্রাইভারকে সঙ্গে আনলে গাড়িটা দেওয়া যেত। আপনাকে পৌঁছে দিত। কিন্তু আমাকে স্যার রাণীহাটে এখনই না গেলে নয়। আজ রাতেই ডি এস পি সায়েব এসে পড়তে পারেন রাণীহাটে। আমাকে সেজন্যেও অ্যাটেন্ড করতে হবে।

ডি এস পি রঞ্জন মৈত্রকে আমি চিনি। খুব গোঁয়ার মানুষ। মুখার্জির দ্বিধার কারণ বুঝতে পারছিলুম। তাছাড়া, মৈত্র আমাকেও বিশেষ পাত্তা দেয় না। আলাপ হবার সময় বলেছিল—'কোন প্রাচীন আমলের জানাশুনো কোন কাজে লাগবে না মশাই। এলাকা এখন হেড টু টেল বদলে গেছে। সুবিধে করতে পাববেন না। এ আউটসাইডারের কাজ নয়। লোকটি নিশ্চয় স্পষ্টভাষী। কর্তৃপক্ষের সব সিদ্ধান্তই তার কাছে উদ্ভট।

দেরি কবা যায় না। বললুম—'ড্রাইভ আমি নিজেও করতে পারি। আপনাকে রাণীহাটে পৌঁছে দিয়ে আমি বকখালি চলে যাব বরং।'....

সাত

রাণীহাট বাসস্টপে মুখার্জিকে নামিয়ে দিলুম তার কথামতো। তারপর গাড়ি ঘোরালুম।

ফের শিমুলিয়া হয়ে আসতে হল। কিন্তু একটা অস্বস্তি ক্রমশ জেগে উঠছিল। মুখার্জিকে কয়েক একর জমি পায়ে হেঁটে গাঁয়ে ঢুকতে হবে। তাকে সাবধান করা উচিত ছিল। তার সঙ্গে অবশ্য রিভলবার ও টর্চ আছে। তাহলেও মুখে সাবধান হওয়ার কথা বলা আমার কর্তব্য ছিল।

পরে মনে হল, সে তো একজন ঝানু অফিসার। তাকে সতর্ক হতে বলার কি কিছু দরকার আছে? বিশেষ করে এই এলাকায় সে বেশ ক'বছর আছে।

তবু অস্বস্তি গেল না। বারবার মনে হচ্ছিল, তাকে স্কোয়াডের কাছে পৌঁছে দিলেই ভাল করতুম। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

মুখার্জির নির্দেশমতো বাঁদিকে পিচের পথে মোড় নিলুম। দুধারে ফাঁকা শস্যশূন্য মাঠ। রাস্তাটাও ফাঁকা। বিশেষ গাছপালা নেই। শুধু দুধারে ছোট ছোট ঝোপঝাড় রয়েছে। মাইলটাক যাওয়ার পর লম্বা একটা কাঠের ব্রিজ পাওয়া গেল। এখন আমি বিশাল শাঁখালা বিলে চলে এসেছি। দুধারে বাবলাবন দেখা যাচ্ছিল। অনেকদূরে আলো ঝিকমিক করছিল উঁচুতে। বকখালি উঁচু মাঠের ওপর রয়েছে।

ক্রমশ একটা অদ্ভুত ভয় জেগে উঠছিল। এত রাত্রে কাকেই বা রবীনবাবুর বাড়ির কথা জিগ্যেস করব? ঝোঁকের মাথায় এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি। কথা আছে যে সকালে বাবুগঞ্জ থানা থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। কিন্তু তার আগে গ্রামে একটা তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। তার ফলেই সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। লাইলি সতর্ক হয়ে উঠবে।

একটা সুবিধে—বকখালিতে কেউ আমাকে চেনে না, রবীন বাদে। তাছাড়া রবীনও এতদিন পরে চিনতে পারবে কি না অনিশ্চিত। পরিচয় দিলে তখন চিনবে। কিন্তু রবীনকে কি বিশ্বাস করা যাবে?

হঠাৎ মনে পড়ল, ফৈজুচাচা বলেছিল—এলাকার বড়লোকেরা বীরুর প্রচণ্ড শত্রু। রবীন অঞ্চলপ্রধান যখন, তাছাড়া, ডাক্তারিতে নাম করেছে, তখন সে একজন বড়লোক তাতে ভুল নেই।

আশা জাগল প্রচুর। এখন তার বাড়ির চেনার সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। ভাবলুম, আজকাল অনেক বেসরকারী লোকও জিপে চড়ে। তাই জিপ দেখলে সরকারী লোক ভাববার কোন কারণ নেই। আমি তো ওষুধ কোম্পানির লোকও হতে পারি। উঁহু—তারা হয়তো জিপে চড়ে ওষুধ বেচতে যায় না। ...নাঃ, তাই বা কেন? ধরা যাক্, রবীনের কোন ব্যবসায়ী বন্ধু কোন বিশেষ কাজে এসেছে। ধরা যাক্, ওখানে দোকানটোকান খোলার প্ল্যান নিয়ে এসেছে! অথবা কোন কারখানা গড়তে চায়। ইলেকট্রিক আছে যখন, তখন অনেক কিছুই করা যেতে পারে। এইসব অনেক ভাবনাচিন্তা করা গেল। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলুম না। শেষে ঠিক করলুম, এসে যখন পড়েছি, সবরকম রিস্কই নেব।...

বকখালি দুভাগ করে রাস্তাটা চলে গেছে। অবাক হয়ে দেখলুম, এ যে রীতিমতো বাজার! দুধারে ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে। সার-সার দোকানপাট রয়েছে—দু-একটা তখনও খোলা। রাস্তায় লোকজনও নজরে পড়ছিল। একপাশে ট্রাক দাঁড় করিয়ে সর্দাবজীরা নিচে মদের আসর বসিয়েছে। ঘড়ি দেখলুম—রাত একটা পাঁচ। ফাঁকায় খাটিয়া পেতে কেউ শুতে যাচ্ছে, কেউ শুয়েও পড়েছে।

মনে হল, কোন কৈফিয়তের দরকার হবে না। জিপের মানুষ এখানে বেশ শস্তা হওয়াই উচিত। মাঝামাঝি এসে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর নেমে বাঁদিকে একটা পানসিগারেটের দোকানে গেলুম। পানওয়ালা অবাঙালি। এটা আজকাল পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক ব্যাপার। বকখালি অবাঙালি ব্যবসায়ীতে ভরে গেছে আর পাঁচটা বিদ্যুৎশোভিত বড় গ্রামের মতনই।

এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনে বললুম—'আচ্ছা দাদু, এখানে রবীনবাবু ডাক্তারের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?'

পানওয়ালা নির্বিকারভাবে জানান—'সিধা যাকে ডাহিনা দেখিয়ে। ফার্মেসি পড়ে গা—বড়া মাকান।'

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ডাইনে দৃষ্টি রেখে এগোলুম। ফার্মেসি একটা চোখে পড়ল—কিন্তু একতালা। বড় দালানবাড়ি থাকা চাই। আরও পঞ্চাশ মিটার দূরে আবার একটা নিয়নআলোজ্বলা সাইনবোর্ড দেখা গেল—'সেবা নিকেতন।' দোতলা বাড়ি। একদিকে গেট আছে। গেটে ঘন লতাপাতার ছাউনি। গেটের কাছে গাড়ি রেখে নামের ফলক দেখলুম। মিলেছে!

ডিসপেনসারিটা সামনে, গেট পাশে। সব বন্ধ। গেট দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ভিতরে প্রশস্ত উঠোন আর ফুলের গাছ। দূরে কয়েকটা একতালা ঘর। আমার মাথার ওপর দোতালার ঘরে আলো জ্বলছিল। এদিকে ব্যালকনি রয়েছে। মুখ তুলতেই একঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর ভারি গলায় কে বলল—'কে? কাকে চাই?'

'রবীনবাবুকে।'

'কোত্থেকে আসছেন?'

একটু হেসে বললুম—'কলকাতা থেকে। কিন্তু নিচে না এলে তো কিছু বলা যাচ্ছে না ব্রাদার।'

সংশয়াকুল গলায় প্রশ্ন এল—'নাম কী আপনার?'

'কী মুশকিল! আমি কি রবীনবাবুর সঙ্গে কথা বলছি?'

'আহা, কী দরকার বলুন না।'

'আপনার নামতে কি কষ্ট হচ্ছে?' ক্ষুব্ধ হয়েই বললুম কথাটা।

'দেখুন, রাতে আমি অচেনা লোকের সঙ্গে দেখা করিনে। সকালে আসবেন।'

'রবীন, আমি শিমুলিয়ার আনোয়ার।'

'আনোয়ার? মানে আনু?' আলোটা আমার মুখের ওপর টানা এক মিনিট পড়ে রইল।

তারপর ব্যালকনি থেকে ওকে হন্তদন্ত হয়ে সরে যেতে দেখলুম। ভাবা যায় না, সেই রবীনের গলার আওয়াজ এত রাশভারি হয়ে গেছে! আমার চেয়ে বয়সে বছর দুই বড় হতে পারে। চেহারা যা আবছা দেখলুম, তাতেও মনে হল শরীরকে ভীষণ মোটকা আর গুরুগম্ভীর করে ফেলেছে। পজিশানের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

গেট খুলে এসে সে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। তাপর প্রায় চেঁচামেচি করে বলল—'ওরে শালা! ওরে বাঞ্চোত! কোথায় ছিলিস্ অ্যাদ্দিন? বাপ রে বাপ রে বাপ! কত যুগ তোকে দেখিনি! হ্যাঁ রে ভোঁদড়, এখনও মুখ টিপে কথা বলা তুই ছাড়িসনি! ওরে, আমি যে আকাশ থেকে পড়লুম রে!'

বললুম—'চুপ। তোর পেসেন্টরা শুনবে।'

'থাম্ রে! আমি যে কে সেই আছি।' তারপর টানতে টানতে ভেতরে ঢোকাল এবং গেটটায় তালাচাবি আটকে গেল।

বললুম—'আমার গাড়ি রইল যে।'

'হ্যাঁ—তাও তো বটে! থাম্, ব্যবস্থা হচ্ছে! মোহান্ত, ওহে মোহান্ত!'

ওদিকের একতালা থেকে কে সাড়া দিল—'স্যার!'

'ঘুমিযে পড়োনি তো?' বলেই সে হেসে উঠল। 'ঘুমোলে আর সাড়া দেবে কেন? শোন মোহান্ত, এদিকে এস।'

একটা রোগা পাজামা গেঞ্জিপরা লোক এল।

'ওই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছ? আমার বন্ধুর। বুঝেছ? মাই গ্রেট ফ্রেন্ড! ওর বাবার নাম তুমি শুনে থাকবে। খুব বড ডাক্তার ছিলেন।....' এ সময় আমি ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পাত্তা দিল না—সমানে বলে যেতে থাকল।.... 'ডক্টর চৌধুরী শিমুলিযার হে! তাঁর ছেলে। আমার বাবার মনিব ছিলেন ওর বাবা। বুঝলে হে মোহান্ত, আমি ওদের চাকর [illegible]!' বলে সে হো হো করে হেসে উঠল!

মোহান্ত দাঁত বের করল।

'এখনই—যাও, জিপটা ভেতরে এনে রাখ।'

মোহান্ত চলে গেল। যতক্ষণ না সে জিপটা ভেতরে ঢোকাল, গ্যারেজের সামনে রাখল, ততক্ষণ তাকে নির্দেশ দিয়ে গেল রবীন, ..'হ্যাঁ—ডাইনে কাটাও, ডাইনে.... ব্যস, ব্যস! এবার বাঁয়ে—হ্যাঁ, ব্যস....'

তারপর গেটে নিজে তালা এঁটে আমার হাত ধরল। 'কাম অন আনু। আসলে আজকাল বড় খারাপ দিনকাল পড়েছে ভাই, তাই সবসময় সাবধান থাকতে হয়। প্রায়ই বড় বড় ডাকাতি হচ্ছে। জিপে চড়ে দিন দুপুরেই দোকানে বা গদিতে হামলা করছে [illegible]তরা। শাসনটাশনের বালাই নেই। সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকেছে হে!'

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে উঠে গেলুম। তা[illegible]ব একটা সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘরে ঢুকে সে বলল—'এভাবে রাতদুপুরে জিপে চেপে কেউ এসে ডাকলে আমার কী অবস্থা হয় জানো না। সব সময় বড় ভয়ে থাকি। বসো, বসো। উঃ, কদ্দিন বাদে দেখা বল তো! তারপর হঠাৎ এভাবে অসময়ে কোত্থেকে? কবে এসেছ?'

সমানে প্রশ্ন করে গেল সে। দেখলুম, রবীন ঠিকই বলেছে—এ বিশবছরে সে একটুও বদলায় নি।....

তেমন কোন কথা রবীনকে বলব না ঠিক করেছিলুম। কিছু কৌশলে ওর প্রতিক্রিয়া জানার দরকার ছিল। বীরেশ্বরের প্রসঙ্গ তোলা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তুলেই আঁচ করলুম, যা ভেবেছি তাই। রবীন তার ওপর খেপে রয়েছে। কারণ, বীরেশ্বর তলেতলে এলাকার সব জোতদার-বড়লোক এবং সরকারের স্তম্ভগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্তত রবীনের ধারণা, কাজে করুক বা না করুক, এতেই তাদের চোখের ঘুম কেড়েছে যে! তার ওপর জেলখাটা দুর্ধর্ষ লোক বীরেশ্বর—থাকে একলাষেঁড়ে হয়ে। মেশে শুধু ছোটলোকগুলোর সঙ্গে। ইলেকশান এলে ভোট দিতে বারণ করে সবাইকে। এতে রবীনের রাগ তো হবেই।

এমন কি বীরেশ্বর এলাকার সব ছোট বড় ডাকাতির পিছনে আছে বলেও রবীনের সন্দেহ। বলেছিলুম—'ওকে মিসা বা ভারতরক্ষা আইনে ধরছে না কেন পুলিশ? তোমরাই বা ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করছ না কেন?'

রবীন বলেছিল —সে চেষ্টা কি হয়নি? আমরা ডি এম-কে কতবার বলেছি। এড়িয়ে গেছেন। আসলে এই ডি এম ভদ্রলোক ফ্রেশ ইয়ং ম্যান। ভীষণ লিবার‍্যাল টাইপ। হত যদি সে আমলের ঝানু আই সি এস, দেখতে কবে বীরুটা কালাপানিতে গিয়ে খাবি খেত!'

অবশ্য কেন বীরেশ্বরকে ধরা হচ্ছে না সে খবর একমাত্র আমিই জানি। লাইলিকে না ধরা অব্দি তার গায়ে হাত দেওয়া হবে না। বীরু যতক্ষণ বাইরে স্বাধীন থাকবে, ততক্ষণ লাইলিকে ধরার চান্স প্রচুর পাওয়া যাবে।

তারপর উঠেছিল লাইলির প্রসঙ্গ। রবীনই তুলেছিল। খুব আচমকা সে আমার ডান বাহু খামচে ধরে বলে উঠেছিল—'আরে আনু! তোর সেই ছেলেবেলার লাভার—দ্যাট ভেরি বিউটিফুল মেয়েটির কথা জিগ্যেস করছিস না তো? ওবে, সে শুনলে তুই ভিরমি খাবি! বাপ রে বাপ রে বাপ! সে এক থ্রিলার। অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর!'

লাইলির কাহিনী তার কাছে ফের শুনতে হয়েছিল। স্বভাবত রবীন কল্পনার রঙটা বেশ চড়িয়েছিল তাতে। লাইলি নাকি চোখের পলকে চেহারা বদলাতে পারে। লাইলির গায়ে জড়ানো থাকে এক অদ্ভুত চীনা যন্ত্র—তার ফলে গুলি লাগে না। ইলেকট্রনিক এই অ্যাপারেটাসগুলো চীন নাকি প্রচুর বানাচ্ছে। এই বর্ম পরে থার্ড গ্রেটওয়ারে নামবে চীন। তারই দু-চারটে ভারতে পাচার হয়ে এসেছে।

কথা বলতে বলতে আড়াইটে বেজে গিয়েছিল। তারপর শুতে গেল রবীন। ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ হয়নি তখন। ঘুমোচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা।

আলাপ হল সকালে। স্বামীর উল্টো একেবারে। কম কথা বলেন। মনে হল সংসার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সারাক্ষণ।

আটটায় ডাক্তারখানায় গিয়ে বসে রবীন। সেই ফাঁকে অঞ্চল-অফিসের কাজও সারতে থাকে। অঞ্চল-অফিসটা ওর ডাক্তারখানার পাশের ঘরেই রয়েছে। অবশ্য আমি নিচে নামিনি। অপেক্ষা করছিলুম বাবুগঞ্জ থানার লোকের।

মুখার্জি নিজেই এল মোটর সাইকেলে। কিন্তু সে ইনটেলিজেন্সের লোক বলে সবসময় সাদা পোশাকেই থাকে। তাকে বাইরে চেনে খুব কম লোক। এখানে তো চেনেই না। অথচ প্রায়ই তাকে এখানে আসতে হয় নানা কাজে।

রবীন অবশ্য চেনে। আমাকে খবর পাঠিয়েছিল। পাশের অঞ্চল-অফিসে তাকে বসিয়ে রেখেছিল সে। আমি নেমে যাচ্ছি, দেখি রবীন ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ভেতরদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। আমার হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল—'টিকটিকি মুখুজ্যে তোকে ডাকছে কেন? কী ব্যাপার? পাকিস্তানী নাগরিক নোস তো? আমি তাহলে গেছি!'

একটু হেসে বললুম—'আরে না না! সে অন্য ব্যাপার—তোকে বলবখন।'

রবীন প্রচণ্ড উদ্বেগে বলল—'দেখিস ভাই, ডোবাসনে। তোর সঙ্গে বিশ বছরের ছাড়াছাড়ি। এর মধ্যে পাকিস্তান-টান হয়েছে। তোদের অনেক তো সেখানে গেছে-টেছে!'

ওকে আশ্বস্ত করে অঞ্চল-অফিসে ঢুকলুম। মুখার্জি ঝানু অফিসার। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনার

নাম আনোয়ারুল চৌধুরী?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'বসুন।'

বসলুম। রবীন ভীতমুখে দাঁড়িয়েছিল এসে। মুখার্জি একটু হেসে তাকে বলল—'জাস্ট এ রুটিন জব, ডাক্তারবাবু। এঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে—কনফিডেনশিয়াল!'

'অলরাইট, অলরাইট' বলে রবীন চলে গেল। বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।

দশটায় এ অফিস খোলে। তাই ঘরে এখন কেউ নেই। আমি বসার পর মুখার্জি উঠে গিয়ে দুদিকের দরজা বন্ধ করল। তারপর পাশের চেয়ারে বসে বলল—'কোন অসুবিধে হয়নি তো স্যার?'

'না না। ওক্কে! আপনাদের খবর বলুন।'

'বীরুবাবুকে আমরা ট্রেস করেছিলুম রাত সাড়ে তিনটেয়। নিজের বাড়ি ঢোকেনি। দুলেপাড়ায় একজনের বাড়ি ছিল। ট্রেস করেছিল চৌকিদার। তখন সে সেজেগুজে বেরিয়েছে। পুকুরপাড়ে জঙ্গলে ঢুকতে দেখার পর চৌকিদার এসে খবর দিল। আমরা তক্ষুনি দৌড়ে গেলুম। ঘিরে ফেললুম পুকুরটা। কিন্তু ওর কাছে যে স্টেনগান আছে, অনুমান করতে পারিনি। টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। লাকিলি আমি বেঁচে গেলুম। একটু উঁচু আলের আড়ালে শুয়ে পড়েছিলুম। তিনজন কনস্টেবল একেবারে শটডেড। দুজন সিরিয়াসলি জখম। ও সি দত্ত সায়েবের একটা আঙুল গেছে। মিনিট দশেক লড়াই করার পর আমরা এগোতে পারলুম। কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।'

একটু চুপ করে থেকে বললুম—তারপর?'

'তারপর আর কী!' মুখার্জি ম্লান হাসল।—'এখন সি. আর পি. এসে গেছে। গ্রামে তল্লাশি হচ্ছে। বাট আই থিংক্ অল ইন ভেন। মিছেমিছি গরিব লোকগুলোর ওপর অত্যাচার করে লাভ কী? ইভন, ডি এস পি সায়েবের সামনে আমি প্রটেস্ট করেছিলুম স্যার—আমাদের এখন চুপ করে গেলেই ভাল হত। এখন পলিটিক্স এসে জুটবে। অ্যাসেমব্লিতে উঠবে। আপনি তো রঞ্জন মৈত্রকে জানেন স্যার! ওঁকে বোঝাতে পাবে এমন কেউ নেই। ডি. এম. এসে যাচ্ছেন। বেশ বাড়াবাড়ি করা হয়েছে আমার মতে!'

ওকে সায় দিয়ে বললুম—'ঠিকই। কিন্তু বীরেশ্বরের তাহলে স্টেনগান আছে এবং এখন সে মরিয়া—এটা বোঝা গেল।'

'স্টেনগান কী বলছেন? লাইট মেসিনগানও আছে—এ আমার নির্ভুল খবর। রঞ্জন মৈত্রের ইচ্ছা, ডি. এম.-এর কাছে অর্ডার নিয়ে নদীর ধারে ওই জঙ্গল আর ওগুলো গ্রাম চষে ফেলবেন। এতে কী ফল হবে জানিনে—পুরো দলটা মাঝখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে, এতে কোন ভুল নেই। তখন আর টিকিও দেখতে পাবে না করো। আলাদা-আলাদা হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাবে। তাই মনে হয় না স্যার?'

'ঠিক। আচ্ছা মিঃ মুখার্জি, আপনি মৈত্রসায়েবকে আমার খবর কিছু বলেছেন?'

মুখার্জি মাথা নাড়ল। ... 'মোটেও না। আপনার ইন্সট্রাকশান যা ছিল, তাই বলেছি।'

'আমি বকখালি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, একথা শুনে মৈত্র কোন ইন্টারেস্ট দেখালেন না?'

'নাঃ! বললেন—হি ইজ এ রোমান্টিক টাইপ!' মুখার্জি হেসে উঠল।

'দেখবেন, বকখালিতে আবার সি আর পি নিয়ে হামলা চালাতে না আসেন মৈত্র!'

'না স্যার। এস পি সায়েব ছুটি কাটিয়ে আজই জয়েন করার কথা। আমি গিয়ে ম্যানেজ করে ফেলব।'

'কাল রাণীহাট বাস স্টপে আপনাকে নামিয়ে দেওয়ার পর ভীষণ ভেবেছিলুম—নিরাপদে পৌঁছলেন কিনা!'

মুখার্জি গুম হয়ে গেল হঠাৎ। বলল, 'বলা হয়নি, আমি জোর বেঁচে গেছি স্যার! এগিয়ে পিছন ফিরে আপনার জিপটা কদ্দূর গেল দেখছি, আচমকা গুলির শব্দ! কান ঘেঁষে যাওয়া বলতে পারেন।

রাস্তার নিচেই একটা গর্ত ছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। তারপর আর কোন পাত্তা নেই। আধঘণ্টা পরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পিছনের বাগানে উঠলুম। প্রায় বুকে হেঁটে যেতে হল। আমার ধারণা, রাইফেলের গুলি। সম্ভবত রাস্তার ওপাশে অর্জুন গাছের আড়াল থেকে কেউ আন্দাজে গুলি ছুঁড়েছিল। অন্ধকারও ছিল প্রচণ্ড। তা নাহলে নির্ঘাত একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটত।'

'পরে ওদিকটা দেখা হয়নি?'

'না। মৈত্রসায়েব উড়িয়ে দিলেন—বললেন, ইনটেলিজেন্সের লোকগুলো সবসময় হ্যালুসিনেশনে ভোগে।'

'দ্যাটস ভেরি ব্যাড। সময় বা সুযোগ এলে আমি বলব এস. পিকে।'

'এবার আপনার খবর বলুন স্যার।'

'এখনও কোন খবর নেই। আপনি বরং এখানে থেকে যান মুখার্জি। গাড়িটা কেউ নিতে আসবে তো?'

'হ্যাঁ। পুলিন ড্রাইভার অলরেডি এসে গেছে। ওখানে চায়ের দোকানে আছে। গিয়ে খবর দিচ্ছি।'

'পুলিনকে এখানে কেউ চেনে না তো?

'না।'

'ঠিক আছে। আমি রবীনবাবুকে বলেছি, বাবুগঞ্জের এক চেনাজানা ব্যবসায়ীর জিপ। লোক এসে নিয়ে যাবে।'

'তাহলে আমি স্যার থেকে যাচ্ছি। ওখানে তেমাথা রাস্তার কাছে একটা হোটেল আছে দেখবেন—ট্রাকড্রাইভারদের আড্ডা। সরযূ হোটেল। ওখানে থাকছি আমি। সরযূবালা হোটেলওয়ালি আমাদের লোক। অসুবিধে হবে না।'

'এখানে ফাঁড়িতে যোগাযোগ করা হয়েছে?'

'সব ঠিক আছে, স্যার। দরকার হলে সব হেল্প পাবেন। আর আমি তো থাকলুমই।'

'ওকে মুখার্জি। উইশ ইউ গুড লাক।'

মুখার্জি উঠে সেলাম দিল। তারপর বেরিয়ে গেল। আমি বেরিয়ে ভেতরের বারান্দায় গেছি, অমনি রবীন বলের মতো তার চেম্বার থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ল। চাপা ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল—'কী, কী? ব্যাপারটা কী?'

'বলব। তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। তুমি কখন ওপরে আসছ?'

রবীন ঘড়ি দেখে বলল—'সাড়ে বারোটার আগে নয়। কিন্তু ততক্ষণে আমি নিজেই মরব, নয় তো রুগী মেরে ফেলব। তোর দিব্যি আনু, আর অন্ধকারে রাখিস নে।'

'এক কথায় সব বলার নয়। এবং তোর পক্ষে একচুল ক্ষতিকর কোন ব্যাপারও নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর। খাওয়ার পর সব জানতে পারবি।' বলে ওকে কথা বলার ফুরসত না দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকলুম।

বাঁকে ঘুরে দেখি, রবীন তখনও নিষ্পলক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সেই ভ্যাবলা রবীন একটুও বদলায়নি। অথচ এত বড় ডাক্তার হয়েছে—অঞ্চলপ্রধান হয়েছে এবং এলাকার নিরীহ ধরনের রাজনীতির পাণ্ডা! ভাবা যায় না!

খুব বিশ্বাসী ও পুরনো ইনফরমার ছাড়া বাইরের কোন লোককেই আমার পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রবীনকে তাই কীভাবে ম্যানেজ করব ভাবছিলুম। এক শর্তে ওকে পরিচয় অবশ্য দেওয়া যায়—যদি সে আমাকে লাইলিকে ধরতে সাহায্য করে। চাইলে সাহায্য সে করবে, তা টের পেয়েছি। কিন্তু যে রকম পেট আলগা ঢিলে লোক, ওকে বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ ওর সাহায্য পেলে কাজটা সহজ হত।

শেষে ঠিক করলুম, ওকে কনফিডেন্সে নেব না।

তাই খাওয়ার পর যখন সে উদ্‌গ্রীব হয়ে মুখের দিকে তাকাল, তখন পুরো বানানো একটা ব্যাপার শোনালুম। আমি একটা চাকরির দরখাস্ত করেছি, তার একটা লোকাল এনকোয়ারি হচ্ছে। এবং লোকাল এনকোয়ারি হবে জেনেই কলকাতা থেকে এখানে চলে আসতে হয়েছে আমাকে। আর অঞ্চলপ্রধান রবীনের কাছে আসারও কারণ তাই।

রবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল—'কী কাণ্ড ! বিশবছর আগের হদিস আজকাল খোঁজা হয়। হ্যাঁ—আজকাল এরকম দেখছি রে। আমার কাছে প্রায়ই এসে এনকোয়ারি করে যায় আই বি-রা। আসলে বেকার বেশি, চাকরি কম—তাই এসব কড়াকড়ির কায়দা। পুরো জীবনী নখদর্পণে থাকা চাই সরকারের। অমুক সাল থেকে অমুক সাল কোথায় কে ছিল, কী করছিল—বাপ্‌স্! তা হ্যাঁ রে আনু, আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করল না? জিজ্ঞেস তো আমাকেই ওরা করে। করা উচিত তাই।'

হেসে বললুম—'সে কি আমার সামনে করবে তোকে? পরে নিশ্চয় করবে। আমি বাবুগঞ্জের সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে দিয়ে আই বি ঘুঘু ম্যানেজ করলুম, বুঝতে পারছিস না?'

রবীন মাথা দোলাল। খুব বুঝেছে।

'ও যে সকালে এসে পড়বে, তা ভাবিই নি। নয়তো রাতে বা আজ সকালে তোকে বলে রাখতুম!'

'বলা উচিত ছিল। তবে দ্যাখ, কী মাল ওরা! ঠিক টের পেয়ে গেছে যে তুই আমার বাড়ি এসেছিস! আমার ধারণা, তোর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হয়েছে। বি ভেরি কেয়ারফুল আনু। আজকাল চাকরি পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

এসব নিয়ে রবীন ঘণ্টাখানেক বকবক করার পর শুতে গেল। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। রাতের ঘুম পোষায় নি। তাই ঘুমিয়ে পড়লুম। সে ঘুম ভাঙল একেবারে পাঁচটা নাগাদ। রবীনের বউ এসে বলল—'ঘুমোচ্ছিলেন দেখে চা খেতে ডাকিনি!'

তার হাতে চায়ের কাপ। চা রেখে সে চলে গেল। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। একটা রাত একটা দিন বসে থেকে কেটে গেল! এর মধ্যে লাইলিকে খুঁজে বের করার কথা ভুলেই বসে রইলুম কেন? নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলুম। ওদিকে রঞ্জন মৈত্র যা ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু করেছেন, লাইলি নিশ্চয় এতক্ষণে কেটে পড়েছে দূরে কোথাও। সর্বনাশ, আমি এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লুম কেন?

রবীনের সাড়া নেই। দ্রুত তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি, রবীনের বউ এলো। —'রাতে ভাত খান, না ময়দা?'

'আপনারা যা খান, তাই হবে। ভাববেন না।'

'আমরা ময়দা খাই।'

'বেশ তো তাই। ইয়ে—রবীন কোথায়?'

'উনি তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। রাণীহাট না বাবুগঞ্জ কোথায় যাবেন বললেন। কী সব হাঙ্গামা হয়েছে নাকি। ডি এম এসে খবর পাঠিয়েছেন। উনি তো আবার অঞ্চলপ্রধান— যেতেই হবে।'

এমন কেজো মহিলা আমি দেখিনি। একটাও বাজে কথা খরচ করতে চান না। রবীনের উন্নতির মূলে কী আছে, জানতে পেরেছি।

বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় মুখার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিলুম। মুখার্জি বলল—'লোকাল ইনফর্মার ঘোরাঘুরি করছে, এখনও ট্রেস করতে পারেনি। তবে লাইলি এখনো এখানেই আছে, তার খবর ও জানে।'

'কী ভাবে জানল?'

'গতকাল বিকেলে ওর বৌ একটি ভদ্রমহিলা আর তিনজন লোককে বিলের মাঠ হয়ে গাঁয়ে ঢুকতে দেখেছিল—তাদের মধ্যে একজন লোক মনে হল বীরেশ্বর। বেশ লম্বা চওড়া সে।'

'তাহলে বীরেশ্বর তাকে রেখে আবার ফিরে যায়।'

'হ্যাঁ। বকখালি গ্রামটা অদ্ভুত। এদিকটা শহরের মতো—ওদিকে কিন্তু পুরো অজ পাড়াগাঁ। যত জঙ্গল, যত শ্রীহীন। ওদিকে যাবেন নাকি?

'সন্ধ্যার পর যাব।'
'সেই ভাল।'
'কিন্তু এখানে বীরেশ্বরের চেলা কারা জানা নেই আপনাদের?'
'একজন ছিল—অরুণ নামে এক ছোকরা। সে কমাস আগে মারা পড়েছে সি আর পির হাতে।'
'তার ফ্যামিলি তো আছে?'
'নাঃ। তেমন কেউ নেই। ছোকরা আগে ছিল মোটর মেকানিক। পরে প্রাইমারি স্কুলটিচার হয়। বাবা-মা বেঁচে ছিল না, জ্যাঠার কাছে মানুষ। জ্যাঠা তো তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। পুজোরি বামুন ভদ্রলোক। গুণ্ডা ভাইপোর চালচলন সইতে পারতেন না। তবে রবীনবাবুকে ধরে একটা মাস্টারি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তো....'

হঠাৎ থেমে গেল মুখার্জি। ভুরু কুঁচকে বাঁদিকে কী দেখতে থাকল। এখানে বাজার এলাকা শেষ। একটা মোটর গ্যারেজ রয়েছে। অনেক গাড়ি দাঁড় করানো আছে। কালিঝুলিমাখা মিস্ত্রীরা কাজ করছে। গাড়ির তলায় কেউ শুয়ে পড়েছে। পাশে পেট্রলপাম্প।

মুখার্জি বলল—'পেট্রলপাম্পের কাছে ওই ছোকরাটা দেখছেন—ওই যে রোগা মতো—'
'হ্যাঁ।'
'এতো অবাক কাণ্ড ! ও এখানে এসে জুটল কখন? আর গাড়িটাই বা কার? তেল নিচ্ছে গাড়িতে। স্ট্রেঞ্জ !'
'কী ব্যাপার?'
'ওর নাম জলিল। বাবুগঞ্জের এক ভদ্রলোকের এক সময় ড্রাইভার ছিল। কিন্তু ... এক মিনিট।' বলে গাড়ির নম্বরটা বিড়বিড় করে মুখস্থ করে নিল মুখার্জি। তারপর বলল—'নম্বরটা মনে রাখুন, স্যার। জলিল রিসেন্টলি বীরবাবুর সঙ্গে মাখামাখি করত। কিন্তু গাড়িটা কার?'

রাস্তায় প্রচুর লোক চলাফেরা করছে এখন। বুঝতে পারছিলুম, বিকেলের দিকে আশেপাশের গ্রাম থেকে অসংখ্য লোক কাজে অকাজে এই বাজারে এসে আড্ডা দেয়। আমরা এক বিশাল বটগাছের তলায় বাঁধানো গোল চত্বরে গিয়ে বসে পড়লুম। গাছটার গোড়ায় কয়েকটা সিঁদুর মাখানো নুড়ি রয়েছে। একজন সাধুসন্ত মানুষ ধ্যানস্থ হয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমরা সেই জলিলকে আর গাড়িটা লক্ষ্য করছিলুম। তেল নেওয়ার পরও গাড়িটা অনেকক্ষণ সেখানে রইল। জলিল গেল ওদিকে একটা চায়ের দোকানে। তখন মুখার্জি বলল—'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না স্যার। আমি গাড়িটার হদিস করছি। আপনি বরং ঘোরাঘুরি করুন ইচ্ছেমতো। দরকার হলে খুঁজে নেব আপনাকে।'

আমি সায় দিলে সে উঠে গেল। একা বসে রইলুম। বেলা পড়ে এসেছে ততক্ষণে। রোদের রঙ ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে এত নিষ্ক্রিয় আর ক্লান্ত মনে হচ্ছিল আমার! সব উদ্যম যেন ফুরিয়ে গেছে। লাইলি এখন আমার কাছে কবেকার ভাল-মন্দ স্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে দেখা একটা চেহারা শুধু। কেন এমন হচ্ছে, বুঝতে পারলুম না।

মুখার্জি পেট্রলপাম্পে গিয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছে দেখতে পাচ্ছিলুম। তারপর সে চলে গেল সেখান থেকে। কিছুটা দূরে ওর সেই সরযূ হোটেলের সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছিল—সদ্য আলো জ্বলে উঠেছে তাই। সে সেদিকেই যাচ্ছে। মোটর সাইকেলটা আনতে যাচ্ছে সম্ভবত। তেলটেল নেবে।

একটু পরেই মুখার্জি দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। চায়ের দোকানে সেই জলিল ছোকরাটার দিকে লক্ষ্য রাখতে অবশ্য ভুলিনি। দেখলুম, সে দোকানের বাইরে খোলামেলায় দাঁড়িয়ে গেলাসে চা খাচ্ছে। রাস্তার ওপারে আমার এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ গজ দূরে সে আছে। মুখের একটা পাশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চা খেতে সে অনেকটা সময় নিচ্ছে। তার দৃষ্টি মনে হল রাস্তাটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকেই অর্থাৎ পুবে, এবং আমি আছি তার পশ্চিম-উত্তর কোণে। নিশ্চয় সে কারো প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু মুখার্জি গেল তো গেলই, আর তার পাত্তা নেই। ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল। ঘড়ি দেখলুম, একঘণ্টা আমি বসে আছি। জলিল চা খেয়ে ইতিমধ্যে রাস্তায় পায়চারি করছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড় এবং সাইকেল, সাইকেল রিকশো, বাস, লরি, টেম্পোর আনাগোনা চলেছে সারাক্ষণ। জলিল

মাঝে মাঝে তার আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আর বসে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের কৌতূহল জাগতে পারে। অবশ্য ধ্যানস্থ সাধুটির দিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত আছি। সে গাছের গুঁড়ির দিকে ঘুরে চোখ বুজে বসে রয়েছে। আরও আধঘন্টা কেটে যাবার পর উঠে দাঁড়ালুম। রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলুম। এই সময় তিনটে লরি এসে পড়ল। জোরে হর্ন দিতে দিতে এবং ধুলোর ঝড় তুলে চলে গেল লরিগুলো। পায়ে হাঁটা লোকেরা দুধারে সরে গেল। তারপর চোখ মুছে দেখি, জলিল নেই। প্রথমে পাম্পটা দেখে নিলুম, কালো অ্যামবাসাডারটা যেখানকার সেখানেই রয়েছে অবশ্য। কিন্তু জলিল গেল কোথায়? খুব ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজতে থাকলুম। রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে দুপাশের দোকানগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখা হল। কিন্তু জলিল অদৃশ্য। তখন আরও কিছুটা এগিয়ে গেলুম। ডাইনে একটা পোড়ো জমিতে রোডস বিভাগের ড্রাম জড়ো করা রয়েছে। তাব পাশে সরু একফালি পায়ে চলা পথ। কোন আলো নেই ওখানে। চোখে পড়ল, জলিল হনহন করে এগোচ্ছে সেই পথে।

একটু ইতস্তত করে আমি সেইদিকে মোড় নিলুম। তাকে এগোবার সময় দিয়ে তারপর অনুসবণ করলুম। যতটুকু পথ আবছাভাবে রাস্তার আলো গিয়ে পডেছিল, ততটুকু পেরোতে আমাব প্রচণ্ড ঘাম হল। অভ্যাসমতো বগলের ফাঁকে রিভলবারটা জামার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। অন্ধকার জায়গায় পৌঁছেই দড়ির ফাঁস খুলে বের করে প্যান্টের পকেটে রাখলুম। আটত্রিশ ক্যালিবার রিভলবার, তাই বেরিয়ে রইল বাঁটের দিকটা। তখন প্যান্টের ডানপকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলুম।

দেখি একটা বাগানে গিয়ে ঢুকছে রাস্তাটা। জলিলকে আবছা দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ। এবার বাগানের তলায় ঘন অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

সমস্যা পড়া গেল নিশ্চয়। পায়ের নিচের সরু রাস্তাটা অনুমান করতে ভুল হচ্ছে না—কারণ পায়ের ঘষা লেগে সেখানে নগ্ন মাটি বেরিয়ে পড়েছে এবং দুধারে শুকনো ঘাস রয়েছে। খুব সাবধানে এগিয়ে চললুম। আমার জুতোয় রবারের সোল থাকায় নিঃশব্দে এগোনো যাচ্ছিল।

বাগানটা দেখলুম ছোট। পার হতেই একটা ফাঁকা মাঠে পড়া গেল। মাঠে আবার জলিলকে আবিষ্কার করলুম। প্রচণ্ড অন্ধকারে এতক্ষণ চলার পর দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছিল। আমাকে আশ্বস্ত করে জলিল এতক্ষণে গান গেয়ে উঠল। ওর গানটা একটু অদ্ভুত মনে হল। হিন্দি ফিলমের গান! হু হু করে বাতাস বইছিল বলে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। শুধু মনে হল, গানটা যেন সে সংকেতবাক্যের মতো ব্যবহার করছে।

সামনে গাছপালার মস্তো উঁচু কালো পাঁচিল। এবার তাকে নির্ঘাত হারিয়ে ফেলব বলে আরও কয়েক পা জোরে এগিয়ে গেলুম—আর এতক্ষণে জলিল দেখলুম সামনে মাটির ওপর টর্চের আলো ফেলল।

বুঝলুম, কত সাবধানী ছোকরা। আর অসুবিধে হল না অনুসরণ করতে। তার আলোর সাহায্যে বোঝা গেল পায়েচলা রাস্তাটা সম্ভবত একটা দীঘি বা পুকুরের পাড়ে উঠেছে। বড় বড় তালগাছও রয়েছে পাড়ে। সে উঁচুতে ওঠার পর একটু ইতস্তত করে পা বাড়াচ্ছি, হঠাৎ শুনলুম কে ওপরের দিকে চাপা গলায় কথা বলে উঠল।

আর এগোলুম না। রাস্তা থেকে সরে চষা জমির ওপর একটু এগিয়ে বসে পড়লুম একটা আলেব আড়ালে।

উঁচু জায়গায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জলিল কারো সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু বাতাস আর তালপাতার খড়খড় শব্দে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট গেল। তারপর দেখি জলিলের টর্চের আলো পড়ছে। সে ফিরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম আলোর নিচে। কিন্তু মাথাটা উঁচু করে রাখলুম।

চারজন লোক নেমে এল উঁচু জায়গাটা থেকে। আর কোন কথা বলছিল না ওরা। আলো এমনভাবে পড়ছে সামনের মাটিতে, পিছনের লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তারা আমার বিশগজ তফাত দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে আমি উঠে দাঁড়ালুম। ফের সেই বাগানে না ঢোকা অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতে হল।

বেশ কিছু সময় দিয়ে তখন আলপথে উঠলুম। নিঃশব্দে বাগানে ঢুকলুম। পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলুম। আর ওরা আলো জ্বালছে না। না জ্বাললেও ক্ষতি নেই। বড় রাস্তার বাজারে পৌঁছলে ওদের দেখতে পাব।

বাগান পেরিয়ে যাবার সময় ভাবছিলুম, জলিলকে অনুসরণ না করলেও হত। পাম্পের কাছে থাকলেও চলত। কিন্তু রিস্ক নিতে চাইনি। কিংবা ভেবেছিলুম....

হঠাৎ আমার পিছন থেকে কে টর্চ জ্বালল। তারপরই যা ঘটল, তা সাংঘাতিক এবং নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলুম, বলা যায়।

টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফিয়ে উঠলুম, এটাই আমাকে বাঁচাল। হয়তো সেই ইনটুইশানের কীর্তি।

আমি লাফ দিয়েই একটা গাছের আড়ালে পৌঁছবার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনলুম। শব্দটা রিভলবারের বলে মনে হল। আর একবার গুলি ছুঁড়তেই এক লাফে গড়িয়ে আরও মোটা একটা গাছের আড়ালে চলে গেলুম। টর্চটা নিভেই আবার জ্বলে উঠল। এদিক ওদিক ঘুরে লোকটা আমাকে খুঁজছিল। আমার আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার কখনও আমাকে নিরাশ করে না। টর্চের আলোটা গুঁড়িয়ে দিল প্রথম আঘাতেই। তারপর 'বাপরে' বলে কে চেঁচিয়ে উঠল। মনে হল, দ্বিতীয় বার কথা বলার ক্ষমতা ওর আর না আসতেও পারে।

আন্দাজে কদাচ গুলি ছুঁড়ি না। তাই অপেক্ষা করছিলুম। কিন্তু আর কোন শব্দ নেই। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর উঠে দাঁড়ালুম। এবং সাবধানে বাজারের দিকে এগোলুম। জলিলরা গুলির শব্দ শুনেছে কি না কে জানে। মরিয়া হয়ে বাগানটা পেরোলুম। কিন্তু ওদের কোন পাত্তা নেই। সম্ভবত গুলির শব্দে কিছু অনুমান করেই খুব ঝটপট হেঁটে গেছে।

রোডসের ড্রামগুলোর কাছে পৌঁছে ওদের আর দেখতে পেলুম না। মনে হল রাস্তা থেকে কেউ গুলির শব্দ শোনেনি। সতর্ক চোখে চারদিকে লক্ষ্য রেখে পেট্রোলপাম্পের দিকে চললুম।

গিয়ে দেখি রাস্তায় মুখার্জি মোটর সাইকেলে চেপে বসে রয়েছে, স্টার্ট দেওয়াই রয়েছে, তার দুচোখে ব্যস্ততা। আমাকে দেখেই বলল—'কুইক স্যার। ওরা বেরিয়ে গেল এইমাত্র। আর এক মিনিট দেখে আমি একাই ফলো করতুম!'

লাফিয়ে পিছনে উঠে বসতেই মোটরসাইকেল উড়ে চলল প্রায়। মুখার্জি একবার বলল—'ফাঁড়িতে খবর পাঠিয়েছি। জিপ নিয়ে আমাদের লোকজন এসে যাবে।'

বকখালি বেশ উঁচু জায়গায়—কারণ এর পর আমরা ঢালু উৎরাইয়ের রাস্তায় পড়লুম। দুধারে ফাঁকা মাঠ। রাস্তার দুপাশেই উঁচু গাছের সার। দূরে ও কাছে কিছু গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছিল। গাড়িগুলো ওদিকেই যাচ্ছে। কোন্‌টা সেই কালো অ্যামবাসাডার বোঝা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে সামনে থেকে লরি বা বাস এসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। মুখার্জি বিকৃতমুখে গাল দিয়ে উঠছিল।

এই রাস্তাটা মোহনপুর স্টেশনে শেষ হয়েছে। তাহলে ওরা ট্রেন ধরবে নিশ্চয়। খুব আশা জাগল। একসময় আমি জিগ্যেস করলুম—'লাইলিকে চিনতে পেরেছিলেন তো?'

মুখার্জি জবাব দিল—'আমি কিন্তু কাছাকাছি দেখি নি! পাম্পে গাড়িটা এনে তেল ভরালুম। তারপর আপনার খোঁজে রাস্তা চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিলুম। বারকতক চক্কর দেবার পর এসে দেখি অ্যামবাসাডারটা নেই। জিগ্যেস করলুম। একজন বলল —ওই তো চলে যাচ্ছে। তখন আমার অবস্থা বুঝুন! একবার ভাবলুম, একা ফলো করি—আবার ভাবলুম, আপনাকে ছাড়া এগোব না, ততক্ষণে ফাঁড়ির লোকেরাও এসে পড়বে। যাই হোক, অসহায় চোখে অ্যামবাসাডার চলে যাওয়া দেখলুম। আসলে স্যার, নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম যেন।'

'লাইলিকে তাহলে....'

বাধা দিয়ে মুখার্জি বলল—'মোটকথা গাড়িতে একজন স্ত্রীলোক আছে। পাম্পের লোকটা বলল। আমিও খানিকটা দেখতে পেয়েছিলুম রাস্তার আলোয়।'

'বীরেশ্বর নিশ্চয় সঙ্গে আছে!'

'বুঝতে পারছিনে। খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে পারিনি পাম্পের লোকটাকে। তবে সে কি না থাকবে?'

'তাহলে তো লড়াই না দিয়ে ও ছাড়বে না।'

'সে আর বলতে ? দেখা যাক্।'

আমরা আর কোন কথা বললুম না। উত্তেজনায় দুজনেরই দম বন্ধ হয়ে আসা স্বাভাবিক। সামনে একটা ছোট্ট বাজার এসে গেল। বাজারটা পেরিয়ে আবার ফাঁকা মাঠ। এসময় রিভলবারের খরচ করা গুলিটার কথা মনে পড়ল। তখন পা ছড়িয়ে প্যান্টের বাম পকেট থেকে একটা কার্তুজ বের করে রিভলবারটা তৈরি রাখলুম।

কিন্তু ক্রমশ আবার সেই নিস্তেজ ভাবটা ফিরে আসছিল। তাই মনে মনে ভাবলুম, তাহলে কি এবার লাইলিকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করা ছাড়া কোন উপায়ই নেই?

আট

অনেকবার এমন করে রাতের অন্ধকারে হানা দেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কম নয়! এখনও গা শিউরে ওঠে সে সব কথা ভাবলে। জীবনে আর যেন অমন রাত না আসে বলে কামনা জানাই।

অথচ ঠিকই এসে পড়ে তেমনি আর এক রোমাঞ্চকর রাত। আর সঙ্গে সঙ্গে কী নেশা এসে পাগল করে দেয়। উত্তেজনায় শিরা ফুলে ওঠে। একটা প্রচণ্ড নৈতিক সাহস এসে ভর করে বুকে। মনে হয়, এ অভিযান পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অসঙ্গতির বিরুদ্ধে। নিজেকে ভেবে নিই মানবতার প্রহরী। যে অসামাজিক মানুষটি অসংখ্য লোকের চোখের ঘুম কেড়েছে, কিংবা যার অস্তিত্ব দেশের পক্ষে বিপজ্জনক—তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যক্তিগত ভাবেও আশ্চর্য জোর পাই।

অথচ মোহনপুরের পথে এই নৈশ অভিযানে শুধু বারবার একটা চাপা ক্লান্তি আমাকে টেনে ধরছিল। সেই ক্লান্তি এক নিষ্পাপ শিশুর মতো পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছিল—কেন, কেন, কেন?

আর, মুখার্জি যখন বলল, 'মনে হচ্ছে সামনের ওই গাড়িটা'—অমনি কাল দুপুরে নদীর ধারে লাইলির কথাটা মনে পড়ে গেল।

লাইলি আমাকে কুকুর বলেছিল।

আমি রাষ্ট্রের মালিকদের এক দাসানুদাস কুকুর।

বীরেশ্বর বলেছিল, রাষ্ট্র আসলে মানুষকে বা ব্যক্তিকে আটকে রাখার খাঁচাকল। তারা নাকি দুনিয়াটা বদলাতে চায়। তাই রাষ্ট্র তাদের চোখে দুষমন। আগে রাষ্ট্রকে আঘাত হানতে চায় তারা। রাষ্ট্রের কাঠামো যা কিছু—সরকার, পুলিশ, আমলা, বিত্তবানশ্রেণী এবং সেনাবাহিনী—প্রত্যেকটা যন্ত্রাংশের ওপর তাদের ক্রোধ এবং সেগুলোই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য।

এবং লাইলি তাদের এক আঞ্চলিক নেত্রী।

লক্ষ্য যদি হয় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা, তাহলে রাষ্ট্রের যা কিছু আইন বা বিধান সবই তাদের চোখে অসঙ্গত। রাষ্ট্র যখন অন্যায়, তখন তার সব নির্দেশ ও নিয়মকানুনই অন্যায়।

আমার মাথা গুলিয়ে যেতে থাকল ক্রমশ। সত্যি কি আমার চোখে, এই দেশ সমাজ সভ্যতা রাষ্ট্র এবং দুনিয়া বাঞ্ছিত সুন্দর? আমি কি এর মধ্যে তৃপ্তি অনুভব করি। মোটকথা, আমি কি এই সমাজে সুখী?

সুখদুঃখ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাপার, খুবই জটিল। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে আমরা আজকাল সমাজকে মোটেও আর সুখের আধার ভাবি না? এবং ভাবি না বলেই তো যে-কোনভাবে বেঁচেও সুখী হতে চেয়ে চুরি ডাকাতি করি, ভেজাল দিই, জুয়া খেলি—সবরকমের অন্যায়কে গোপন থাবায় আঁকড়ে ধরি! দিনে দিনে আমাদের সমাজ-বিদ্রোহের ভাব বাড়তে বাড়তে আজ কি চরম পর্যায়ে পৌঁছায় নি?

গাড়িটা এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম—কালো অ্যামবাসাডার—পিছনে নাম্বারটা লাল আলোর তলায় উজ্জ্বল। সেই নম্বর!

প্রচণ্ড জোরে সেটা চলেছে। আর গতি বিস্ময়কর। আমার মন থেকে কে চেঁচিয়ে বলে উঠল—শাবাশ বীরেশ্বর! শাবাশ লাইলি খাতুন! তোমাদের গতির দোলায় জঙ্ধরা পুরনো লঝ্ঝড় পৃথিবীটা তার রাষ্ট্র সমাজ পরিবার নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে চুরমার হয়ে যাক্! তা না হলে নতুন পৃথিবী গড়ে ওঠার জায়গা পাবে না!

নিজের রিভলবারটা এত উদ্ভট আর হাস্যকর লাগল, এত তুচ্ছ মনে হল ওই গতির বিশালতা ও শক্তির তুলনায়, পকেটে ঠেসে দিলুম। প্রভুভক্ত কুকুরের একটা ছোট্ট দাঁত ঠিক জায়গায় বসে গেল।

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছিলুম ক্রমশ? কাল দুপুরে লাইলির সুন্দর শরীরটা নিয়ে যা সব করেছি, তীব্রভাবে মনে পড়ে যেতে থাকল, আর দুঃখে, নিজের প্রতি ঘৃণায়, অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়লুম। লাইলি, আমার সেই ছোট্ট কচি সুন্দর বালিকা, প্রিয়তম শরীর! লাইলি মনে করিয়ে দিয়েছিল তার পায়ে কাঁটার ক্ষত চুষে দেওয়ার প্রাচীন কাহিনী। তবু আমি পিছু ফিরিনি। আমি কুকুর ছাড়া কী? সে ঠিকই বলেছিল। নীচ কুকুরের মতো তাকে কামড়ে ধরে পৌঁছে দিতে চেয়েছি মনিবের কাছে! সেই লাইলি পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছে, এতে তো আমার সুখ হবার কথা সবচেয়ে বেশি। হতে পারে তাকে নিয়ে কোন ধুরন্ধর মতলববাজ খেলা করছে, কিন্তু তার ইচ্ছেটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ কি আগের দিন নদীর ধারে জঙ্গলে পাইনি?

লাইলি, তোমরা জয়ী হও! মনে মনে বারবার কথাটা বললুম। আর মুখার্জি পিছু ফিরে বলল—'কিছু বলছেন স্যার?'

'মোহনপুর কতদূর?'

'এসে যাচ্ছে। সামনের বাঁক পেরোলেই আলো দেখতে পাবেন।'

'মুখার্জি!'

'বলুন স্যার?'

'আপনাদের কোম্পানির পাত্তা নেই যে!'

মুখার্জি পিছু ফিরে দেখে নিয়ে বলল—'ওদের আঠারো মাসে বছর। পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মজবুত থাকলে কি দেশের এমন অবস্থা হয় স্যার? তাও তো আপনাদের কলকাতায় মোটামুটি সরকারের চোখের সামনে বলে কাজকর্ম চলছে। মফঃস্বলে—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যা হয়েছে, কহতব্য নয়। কানের কাছে বোমা ফাটলে বড় জোর হাই তোলে সব! তার ওপর সর্বের মধ্যে এখানে ভূত গিজগিজ করছে।'

'ট্রেন আসার পরও যদি আমাদের লোক না এসে পৌঁছায় কী করব বলুন তো?'

'আপনিই বলুন।'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন, কী করতে চান?'

'বীরেশ্বরের কাছে স্টেনগান থাকতে পারে, স্যার।'

'তাহলে মুখার্জি, দুটো রিভলবার দিয়ে কতটা সুবিধে করা যাবে?'

'একটুও না, স্যার।'

'তাহলে?'

'আপনি যা বলবেন।'

'আমি যদি বলি... যদি বলি, ওরা চলে যাক, আমরা ফিরে যাই?'

'স্যার?' মুখার্জি গতি কমাল।

'মুখার্জি কি অবাক হলেন?'

'খুব স্যার! ভীষণ।'

'কেন বলুন তো?'

'মিঃ চৌধুরী অদ্ভুতকর্মা কিংবদন্তির মানুষ—আমাদের স্টেটের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টে শুধু নয়, সারা পুলিশ মহলে তিনি এক ম্যাজিসিয়ান বলে বিখ্যাত। তাঁকে একথা বলতে শুনলে অবাক নিশ্চয় হবো। তবে অন্য কারণে। ভাবব, নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক প্ল্যান তাঁর মাথায় এসেছে, অথচ আমি

ধরতে পারছি নে, তাই অবাক হচ্ছি।'

'কোন প্ল্যান নেই ব্র্যাদার।' হাসতে হাসতে বললুম। ...'সত্যি বলছি—আমি টায়ার্ড। ফেড আপ। ছেড়ে দিন!'

'স্যার কি আমাকে পরীক্ষা করছেন?'

'না। আগে গাড়িটা দাঁড় করান। দুজনে সিগ্রেট খেয়ে নিই।'

'ওদের মিস করব স্যার! আর মাথা খুঁড়েও পাত্তা পাবেন না!'

'না পেলে কী? আপনার চাকরি যাবে?'

মুখার্জি চুপ করে গেল।

'এবং আমি ব্যর্থ হলে আমারও চাকরি যাবে না মুখার্জি!'

মুখার্জি গাড়ির গতি কমিয়েছিল। এবার বলল—'মনের জোরটা চলে যাচ্ছে স্যার। আর কী বলব?'

'অবশ্য আপনি খেতাব বা পদক চাইলে, অন্যকথা।'

'আমি কিছু বলছি না স্যার।'

'মুখার্জি, মনে হচ্ছে সামনে ব্রিজ। ওখানে দাঁড় করান।'

ব্রিজটা বেশ বড়। নিচে নদী বয়েছে। আমাদের মোটর সাইকেলটা থামল। দুজনে নেমে ব্রিজের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালুম। সিগ্রেট বের করে ওকে দিলুম। তারপর দেশলাই জ্বেলে প্রথমে ওরটা, পরে নি[illegible]টা ধরালুম। বাঁকের দিকে কালো অ্যামবাসাডার ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

'মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আপনি কি ভাবছেন, আমি বীরুর স্টেনগানের সঙ্গে লড়া যাবে না বলে ওদের ছেড়ে দিতে চাচ্ছি?'

'তা মোটেও ভাবিনি স্যার।'

'স্যার স্যার করবেন না প্লিজ। আমি আপনার বন্ধু হয়ে যেতে চাই।'

মুখার্জি অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে রইল!

ওই লাইলিকে আমি এক সময় কত ভালবাসতুম জানেন?'

'শুনেছি।'

'কিন্তু সেজন্যে আজ আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি না। আপনি আরও জানেন, ওকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতারের ক্ষমতা আমার আছে। এমন কি ওকে খুন করার হুকমও গোপনে আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

'জানি।'

'কাজেই যে কোনভাবে ওকে রিভলবারের গুলিতে খতম করা আমার পক্ষে সহজও বটে, বেআইনীও নয়। তাই, বীরুর স্টেনগান থাকা না থাকা আমার কাছে সমান। কিন্তু মুখার্জি, কাল দুপুরে ধরে আনার সময় লাইলি আমাকে কুকুর বলেছিল! এই চরম মুহূর্তে এসে হঠাৎ আমার মন বিদ্রোহ করে বসছে। আমি কুকুর হতে চাইনে—অন্তত এই একটা সময়ে—এই একটা বার। জীবনে অন্তত এই একটি মেয়ের চোখে আর আমার কুকুর হতে ইচ্ছে করছে [illegible] মুখার্জি! ডু ইউ ফিল ইট? ডু ইউ?'

আমি ওর কাঁধ ছুঁয়ে ঝাঁকুনি দিলুম। মুখার্জি আস্তে বলল—'আই ফিল ইট।'

'আরও অনেক কুখ্যাত অপরাধী আমি পা[illegible] তাদের পিছনে হানা দেব—কিন্তু কেউ মুখার্জি, কেউ অমন তীব্র ঘৃণায় বলবে না যে আমি মনিবের কুকুর! কেউ আমাকে বলে উঠবে না—তোমার কি কিছু মনে পড়ে না? তারা জানে—আনোয়ার চৌধুরী তার ডিউটি করছে, আর কিছু নয়। আসলে সে ভাষা লাইলি ছাড়া কারও জানা নেই।'

'আপনি এক্সাইটেড। একটু ড্রিঙ্ক করবেন?'

'আছে নাকি?'

মুখার্জি গাড়ির দিকে ঝুঁকল। তারপর একটা হুইস্কির বোতল বের করল। বলল—'এমনি খেতে

হবে কিন্তু। গ্লাস নেই।'

'খুব বুদ্ধিমান মশাই আপনি!' ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বোতলটা নিলুম।

মুখার্জি বলল—'সঙ্গে সবসময় রাখি স্যার।'

'ও—নেভার স্যার! আমরা বন্ধু।'

দুজনে তিনবার করে গলায় ঢেলে যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে নিলুম। এতক্ষণ কোন গাড়ির যাতায়াত ছিল না। এবার একটা লরি বকখালির দিক থেকে এসে প্রচণ্ড জোরে বেরিয়ে গেল। মুখার্জি বলল—'দেখছেন কাণ্ড ? আমাদের গাড়িটা এখনও এল না!'

হাসতে হাসতে বললুম—'তাহলে ইতিমধ্যে রঞ্জন মৈত্রের বাগড়া পড়ে গেছে।'

মুখার্জি লাফিয়ে উঠল।—'অসম্ভব নয় স্যার! খুবই সম্ভব। মনে হচ্ছে মৈত্র সায়েব হুকুম দিয়েছেন, বকখালির সব কোম্পানি বিলে নামুক এবং পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে রাখুক জঙ্গল এরিয়া।'

খুশি হয়ে হাসতে থাকলুম। খালি পেট এবং ক্লান্তির ফলে নেশাটা তক্ষুনি জমে এসেছিল। কিন্তু মুখার্জির কোন বৈলক্ষণ্য টের পাচ্ছিলুম না।

এবার বললুম—'ইচ্ছে করছে, লাইলিকে ট্রেনে চাপার সময় একবার হাত নেড়ে টা টা করে আসি! চলুন না ব্রাদার!'

'তাহলে নির্ঘাত বীরেশ্বর স্টেনগান চালাবে দেখবেন।'

'চালাক্ না! না হয় মরেই যাব। মরতে ভয় কিসের হে মুখার্জি? চলো, লেট আস প্রসিড !'

'স্যার, প্লিজ! একটু ভেবে নিন—কীভাবে কী করা যাবে।'

'আমার সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়েছি ব্রাদার। নাও, স্টার্ট !'

মুখার্জি কী ভাবল কে জানে—হয়তো ভাবল, এ আমার নতুন কোন চাল—সে মোটর সাইকেলে চাপল। আমি যথারীতি পিছনে বসলুম। গাড়ি আবার চলল। বেশ জোরেই এগোল মুখার্জি।..

তবু হলফ করে বলছি সত্যি সত্যি কী করব জানতুম না। খুব মুক্ত মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। আর নেশার ঘোরে পৃথিবীজুড়ে এক নিষিদ্ধ স্বাধীনতার স্রোত বইছে দেখছিলুম। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে লাইলি আর বীরেশ্বর—তারা দুজনেই আমার ছেলেবেলাকার সঙ্গী। তাই আমারও ভাসতে ইচ্ছে করছিল তাদের সঙ্গে।

কিন্তু লাইলি আমাকে কুকুর বলেছে! নিজেকে ঘৃণা করতে বলেছে—শিখিয়েছে। এটাই আমাকে গতকাল দুপুর থেকে ক্ষ্যাপামির চরমপর্যায়ে তোলার পর এখন ক্রমশ ক্লান্ত করে ফেলেছে। আর কোন শক্তি দেখতে পাচ্ছি না নিজের মধ্যে।

এখন লালবাজারের বড়কর্তাদের কেউ কিংবা জেলার ডি. এস. পি. রঞ্জন মৈত্র, অথবা নেহাত এই আই বি সাবইন্সপেক্টর মুখার্জিও আমার পাছায় লাথি ঝেড়ে যদি এগোতে বলে, আমার ভয় হচ্ছে বদমাস নচ্ছার কুকুরটা আমার ভেতর গরগর করে উঠবে এবং দাঁত বের করে তেড়ে যাবে বীরেশ্বর লাইলির দিকে।

একটা প্রচণ্ড ধরনের প্ররোচনা ছাড়া কিছু করতে পারব না।

দেখতে দেখতে স্টেশনের বাজারের আলো সামনে এসে গেল। অল্পস্বল্প ভিড় রয়েছে দোকানপাটে। ইলেকট্রিক আলো নেই এখানে—সব হ্যাসাগ, ডেলাইট কিংবা কারবাইড বাতি জ্বলেছে। স্টেশনটা উঁচুতে। ধাপের ওপরে গেট, নিচের মাঠে কয়েকটা গাড়ি রয়েছে। লরি, টেম্পো, প্রাইভেট কার সাইকেল রিকশো, এমন কি ঘোড়ার গাড়িও। ট্রেনের অপেক্ষা করছে সবাই।

একপাশে ঘোড়ার গাড়িটার আড়ালে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল মুখার্জি। দুজনে নামলুম। পরস্পরের দিকে একবার তাকালুম। তারপর মুখার্জি বলল—'এক মিনিট। আপনি এখানেই ছায়ার মধ্যে থাকুন। আমি একবার চক্কর দিয়ে আসি।'

সে চলে গেল। আমি সিগ্রেট ধরালুম। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলুম আবার। প্রশ্ন এখন দুটো।

আমি কি লাইলিকে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করব?

অথবা তাকে টা টা করব অর্থাৎ ছেড়ে দেব?

ঠিক করলুম, মুখার্জি যা খুশি করুক, আমি ছেড়েই দেব। আমার নার্ভ আর একটুও কর্তব্যপালনে সক্ষম নয়।

এবং ফিরে গিয়েই এ চাকরিটাও ছেড়ে দেব। হঠাৎ ছাড়ার অসুবিধে হলে লম্বা ছুটি নিয়ে চলে যাব কোথাও। আমার বিশ্রাম দরকার আপাতত, তারপর দরকার মুক্তি। স্বাধীনতা কী, দূর থেকে আমার দেখা হয়ে গেছে এবার।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। মুখার্জি ফিরে আসার আগেই ছায়া থেকে বেরোলুম। সেই সময় চোখে পড়ল, কালো অ্যামবাসাডার গাড়িটায় স্টার্ট দেওয়া হচ্ছে। বড় জোর পনের মিটার দূরে গাড়িটা ডাইনে বেঁকে রাস্তায় উঠল। সেই জলিল ড্রাইভারকে দেখতে পাচ্ছিলুম। গাড়ির ভিতরে কোন লোক নেই।

ওদিকে টিকিট কাটার ঘন্টা বেজে উঠল স্টেশনে। ডাউন ট্রেন আসছে মনে হল—তার মানে কলকাতা যাবে ট্রেনটা। যাত্রীদের ভিড় আছে। কারণ, কলকাতা যেতে হলে এ অঞ্চলে রাতের গাড়িই আরামদায়ক। টানা সাত-আট ঘন্টা ঘুমিয়ে কেটে যায়। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি টের পাওয়া যায় না।

গেট দিয়ে স্টেশনে ঢুকলুম। টিকিট কেনার লাইন পড়েছে লম্বা। পাশ কাটিয়ে স্টেশনের সামনের চত্বরে গেলুম। তাপর প্রথমে ডাইনে, পরে বাঁদিকে তাকালুম। এলাকা থেকে ব্যাপারীরা প্রচুর পটল চালান দেয়। পটলের বস্তা ডাঁই করা হয়েছে একখানে। জায়গায়-জায়গায় আরও অজস্র মাল জড়ো করা আছে। যাত্রীরা আছে ছড়ানো ছিটানো। প্লাটফর্মের ডানদিকটা পুরো ফাঁকা, কোন শেড নেই। বাঁদিকে কিছুটা গেলে একটা বড় শেড রয়েছে। শেডের পিছনে ওয়েটিং রুম। স্টেশনটার এখন উন্নতি হয়েছে তাহলে। আগে ছিল একটা ছোট্ট স্টেশন মাত্র।

শেডের দিকে গেলুম না। ভিড় ছিল সেখানে। ডানদিকটা ফাঁকা ছিল কিছুটা। সেদিকেই চললুম। বেড়ার ধারে উঁচু গাছ রয়েছে কয়েকটা। প্লাটফর্মের মধ্যে গোড়া বাঁধানো কৃষ্ণচূড়ার গাছ দেখলুম। ফুলে ফুলে ভরে আছে। কেরোসিন বাতি জ্বলছে ল্যাম্প পোস্টে। আলো এদিকটায় বেশ আবছা।

তারপর দেখতে পেলুম বীরেশ্বরকে। সে প্লাটফর্মের শেষপ্রান্তে বেড়ায় পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। তার পাশেই বেড়ার একটা ফ্রেম গলিয়ে লাইলির ভ্যানিটি ব্যাগটা ঝোলানো রয়েছে। বীরেশ্বর পশ্চিমদিকে মুখ ঘুরিয়ে হয়তো লাইলিকেই দেখছে।

আমার কাছ থেকে ওদের দূরত্ব বড় জোর পনের মিট ' আমি তক্ষুনি গোড়া বাঁধানো একটা পিপুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলুম।

এখন আচমকা ওদের চোখে পড়লেই আমাকে আক্রম ; করবে, তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমি আক্রমণ করতে তো আসিনি। মুখার্জি এ সময় এসে পড়লেই বিপদ। তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে খুঁজলুম—দেখতে পেলুম না। মনে মনে কামনা করলুম, ট্রেন আসা পর্যন্ত সে যেন না আসে এদিকে।

ওরা একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে আমার সামনে দিয়ে দুজন লোক গেল। আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না। বীরেশ্বর ঘুরতেই দেখলুম একজন তাকে টিকিট আর টাকাকড়ি দিল। বীরেশ্বর সেগুলো বুকপকেটে গুঁজে নিচু গলায় কী বলল। তখন লোকদুটো চলে এল। আসার সময়ও কোনদিকে তারা তাকাল না। বুঝলুম, ওরা বেশ নিশ্চিন্ত। ওরা ভাবেও নি যে কেউ ওদের গতিবিধি টের পেয়েছে।

এই সময় একদল সাঁওতাল পুরুষ ও স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চা লটবহর নিয়ে উত্তরের নির্জন অন্ধকার থেকে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এল এবং আমার গাছটার উল্টোদিকে ভিড় জমাল। এতে আমার আড়ালে থাকার খুব সুবিধেই হল। তারপর এল এক সবজিব্যাপারী, ঠেলায় তার মালপত্তর নিয়ে বেলকুলিরাও এল। ফলে বেশ কিছুটা ভিড় জমে গেল। বীরেশ্বর এদিকে একবার তাকিয়েই আগের মতো ঘুরে রইল। একবার তাকে লাইলিকে ডাকতে শুনলুম। জবাবে লাইলি কিছু বলল। কিন্তু তার কাছে সরে গেল না।

আমি ততক্ষণে প্রচণ্ড ঘামছি। প্রশ্ন—সামনে যাব, নাকি নিরপেক্ষ দর্শক হিসেবে আড়ালেই থেকে যাব?

সময় কেটে যাচ্ছিল। আমার বয়স বাড়ছিল সবকিছুর সঙ্গে। তখনও মুখার্জির পাত্তা নেই। কোন বিপদে পড়ল না তো? তবে এ সময় তার বিপদে পড়াটাই চাইছিলুম। সে যেন এদিকে পা বাড়াতে না পারে।

তারপর ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল—ডাউন ট্রেন ডিসট্যান্ট সিগন্যালের বাঁকের আকাশে আলো ফেলেছে। সবাই সেই আলো দেখছে। আলোটা বাঁক ছাড়াতেই দেখা গেল সামনাসামনি। আলোটা উজ্জ্বল হতে থাকল। সবকিছুর ছায়া সাঁৎ সাঁৎ করে ঘুরে যেতে লাগল। আরো কাছে এসে গেল ট্রেন। তীক্ষ্ণ হুইসলের শব্দ শোনা গেল। যারা লাইনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, পিছিয়ে গেল একটু। কিন্তু লাইলি স্থির দাঁড়িয়ে আছে কিনারায়। বীরেশ্বর এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকল। লাইলি স্থির।

হঠাৎ আমার মধ্যে সেই পুরনো ইনটুইশান জেগে উঠল। উজ্জ্বল আলো পড়েছিল লাইলির চোখে—শুধুমাত্র একটা চোখ দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু ওই চোখে কী ছিল—কিছু একটা ছিল। আমি গাছের আড়াল থেকে একলাফে বেরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম—'না, না, না!'

ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে ইঞ্জিন বেরিয়ে গেল, কামরাগুলো পেরিয়ে যেতে থাকল ঝড়ের মতো, আর বীরেশ্বরের নাড়ি ছেঁড়া আর্তনাদ শুনতে পেলুম—'লাইলি!'

ভিড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন। একটা চিৎকার মুখে মুখে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেনের সঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণের সীমান্তে—'অ্যাকসিডেন্ট ! অ্যাকসিডেন্ট !' আর, একলাফে বীরুকে আমি ধরে ফেললুম, সে লাইনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে দুহাত নেড়ে প্রচণ্ড চেঁচাচ্ছে।

তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতেই সে পড়ে গেল। তারপর আমাকে দেখতে পেল। চোখে পলকে দেখলুম, তার হাতে একটা রিভলবার। ভয়ে চোখ বুজলুম। তারপর একটা কিছু ঘটল। গুলির শব্দ শুনলুম মাথার ওপর। ট্রেনটা তখনও থামেনি, গতি ক্রমশ কমে আসছে। চোখ খুলে দেখি, মুখার্জি বীরুকে পিছন থেকে ধরে ফেলেছে। একজন সাহসী লোক সেই সময় বীরুর রিভলবারসুদ্ধ হাতের ওপর জুতো চাপিয়ে ঠেসে ধরল। ভিড়ে ডুবে গেল দৃশ্যটা। মুখার্জির চিৎকার শুনলুম—'চৌধুরীসাহেব, চৌধুরীসায়েব! এখানে আসুন!'

আমি অবশ্য লাইলিকে খুঁজছিলুম। তাকে কি তাহলে অবশেষে মৃত অবস্থায় গ্রেফতার করতে হচ্ছে? কিন্তু চারপাশে যেসব মুখ দেখছি, তা জীবিতের। কোথায় গেল সেই মুখ? ট্রেনটা শিরা টানটান করে দাঁড়াল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে চাকাগুলো থামল। ভিড়ে ঢুকে চাকার তলায় শুধু ঘন ভয়ঙ্কর এক অন্ধকারই দেখলুম। মানুষেরা সেখানে ঝুঁকে রয়েছে। আমি ঝুঁকে পড়তেই মনে হল, ওই তো লাইলি—রক্তাক্ত ঠোঁট বাঁকা করে চাকার তলা থেকে সে তীব্র ঘৃণায় বলে উঠল—'কুকুর, তুমি এখানেও?'

অমনি সরে এলুম। ভিড় ছাড়িয়ে ফাঁকায় যেতেই মনে হল, কোত্থেকে যেন কাঠমল্লিকা ফুলের গন্ধ ভেসে পিছু পিছু আসছে। মুখ তুলে কাঠমল্লিকা গাছ খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। নিশ্চয় কোথাও আছে। এখন গ্রীষ্মে শুধু তো শিমুলিয়ার পীরের কবরে কাঠমল্লিকা ফোটে না!

একটা কামরা থেকে কে বলে উঠল—'কী দাদু? দেখলেন! সুইসাইড নাকি?'

জবাব দিলুম না। মাথা ঘুরছিল। বসে পড়া দরকার। খালি বেঞ্চ খুঁজতে খুঁজতে যত এগোচ্ছি, কাঠমল্লিকা ফুলের সেই গন্ধ আরও তীব্র হচ্ছে, আমার পিছু ছাড়ছে না। পালাতে, পালাতে পালিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াতে হল। এবার গন্ধটা আমাকে ধরে ফেলছে। চারদিকে ঘিরে ঝড়ের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আসঙ্গলিপ্সু বাঘিনীর মতো ফুঁসছে।

তারপর আমার শরীরের রোমকূপ দিয়ে ঢুকে যেতে থাকল গন্ধটা। তখন আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলুম—'না, না, না!'

কেউ এসে আমাকে ধরে ফেলল হয়তো।.....

ওয়াগনব্রেকার

দিবাকর

এক জ্যোৎস্নার রাতে তিন ওয়াগনব্রেকার লালু, হারাই আর পান্না আমার রাস্তা আটকে দাঁড়াল। বলল, 'যাবেন না স্যার। ঝামেলা বাধবে এক্ষুনি।'

বললাম, 'আমায় যেতেই হবে। ঝুমের মায়ের অসুখ।'

'ডাক্তারের নাম বলুন। পাঠিয়ে দেব'খন।'

শিউরে উঠলাম। ডাক্তার তো সন্দেহ করতেই পারেন, এইসব আনসোশ্যাল এলিমেন্টের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে! আমি বড় ভীতু মানুষ। এ বয়সে স্কুলমাস্টারিটা গেলে না খেয়ে মরতে হবে। তাছাড়া, এরকম একটা কেলেংকারি! কাউকে আর মুখ দেখাতেই পারব না। দিবাস্যার বলে সারা শহরে আমি পরিচিত। লোকে থুথু ছেটাবে না?

এটা ভাল না মন্দ জানি না, আমার ছাত্রদের গায়ের গন্ধে চিনে নিতে পারি—যেখানেই দেখা হোক না কেন, একলা কিংবা ভিড়ের ভেতর, শহর কিংবা গ্রামে। দিন হোক বা রাতের অন্ধকার, কী এক প্রিয় পরিচিত গন্ধ ছড়িয়ে আছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ওদের মুখ দেখেই বুঝতে পারি ওরা দুঃখে না সুখে আছে।

এখন আমার বয়স পঞ্চান্ন বছর। তিরিশ বছর ধরে আমার এই একই রকম জীবন-যাপন। অথচ চারদিকে কী প্রচণ্ড রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। একটা পুরো জেনারেশনকে চোখের সামনে ডিমরালাইজড হয়ে যেতে দেখলাম। অনেক ফুটফুটে নিষ্পাপ মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম পাপের কুষ্ঠ-ক্ষত। বড় জ্বালা নিয়ে বেঁচে থাকা আমার।

জ্যোৎস্নার রাতে তিনটে সিল্যুট মূর্তি চাপা হাসছিল। সামনে একটু তফাতে বিস্তৃত রেল-ইয়ার্ডে লাল সবুজ সাদা আর হলুদ বাতি জ্বলছিল। তবু কী এক ছায়া থমথম করছিল সেখানে। একটা ইঞ্জিন শিস দিচ্ছিল চেরা গলায়। তার বুকের ভেতরকার দগদগে লাল আগুন দেখতে পাচ্ছিলাম। এখানে-ওখানে দাগড়া-দাগড়া ঘায়ের মতো টুকরো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মালগাড়ির ওয়াগন। দু-জন সেন্ট্রিকেও সাবধানে হেঁটে যেতে দেখছিলাম সিগন্যালের পাশ দিয়ে। মনে হচ্ছিল, ওরা অনন্তকাল ধরে হেঁটে চলেছে।

'এ বয়সে মিথ্যে বললেন স্যার! আমরা সব বুঝি।'

'না-না। বিশ্বাস করো তোমরা। ঝুমের মায়ের সত্যি বড্ড অসুখ।'

'এপারের ডাক্তার দিয়ে হল না?' ওরা খিকখিক করে হাসতে লাগল।

লালু ক্লাস নাইনে স্কুল ছেড়েছিল। ও কী করত, আমি জানতাম। একদিন ওকে ট্রেনের তলায় চাকার কাছে অ্যাক্সেলে চালের বস্তা নিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আর একদিন দেখেছিলাম প্ল্যাটফর্মে ওকে দুটো সেপাই প্রচণ্ড মারছে। আরও একদিন দেখেছিলাম গঙ্গার ধারে চাওলা বনহরির মেয়েটার সঙ্গে খুব হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে। সেদিনও লজ্জা ও ঘৃণায় পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলাম। এই রকম হয়ে গেছে লালুর জীবন!

হারাই কিন্তু স্কুল ফাইনাল পাস করে কলেজে কিছুদিন পড়েছিল। তাকে একটি রাজনৈতিক দলের

পোস্টার সাঁটতে দেখলাম। তারপর হারাই নাকি বোমা বানাতে শিখেছিল। শুনেছি, ওর মা রাগ করে বোমায় লাথি মেরেছিল, তার ফলে ওর মায়ের শরীর ঝলসে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। তবু হারাই বোমা বানাতে ছাড়েনি। এ ব্যাপারে ওর হাতযশের কথাও কানে এসেছে। আসলে এই বৃত্তিগত দক্ষতা ওর পৈতৃক সূত্রে রক্তগত। ওর বাবা ওমর মালাকারের তৈরি বাজির খুব সুনাম ছিল এতদঞ্চলে। আমাদের স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের রাতে শিক্ষামন্ত্রী ওর জাদুকর হাতেব কাজ দেখে মুগ্ধ হন এবং একটা প্রশংসাপত্র স্বহস্তে লিখে দেন।

আর পান্না বি কম পাস। স্কুলে পড়ার সময় ছুটি-ছাটার দিন বাবার সাইকেল রিকশোটা চালাত। ওরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু। সরকার ওর বাবাকে আট কাঠা জমি দেন। জমিটা উঁচু মাটিতে। অনেক কষ্টে কিছু ফলানো যায়। কিন্তু পুষ্যির সংখ্যা খুব কম নয়। পান্নার বাবার টিবি হয়েছিল। সুতরাং মারা পড়তে দেরি হয়নি। বলতাম, 'এত ছেলের তো চাকরি-বাকরি হচ্ছে। তোর কেন হয় না, পান্না?' পান্না বাঁকা মুখে বলত, 'তা আমি ক্যামনে জানব স্যার? জিগান না হালাগো!' পান্না এরকম। তবু চলে আসার সময় পিছু ডেকে বলেছে, 'স্যার কি রাগ করলেন? করবেন না। আমার হালা চোপাখানাই হেইরকম।' বরিশালের ছেলে; ওর শব্দ উচ্চারণে শ্বাস-প্রশ্বাসের জোরালো ঘাত আছে। ওর ভেতর আদিম জল-জগতের শক্তি আছে—পশ্চিমবাংলার রুক্ষ কঠিন মাটিতে নিষ্ফল মাথা কুটতে কুটতে সে শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

এই তিনটি ছেলেই ওয়াগন ব্রেকার হয়ে গেল। সেই জ্যোৎস্নার রাতে আমার স্ত্রী মরণাপন্ন। রেল-ইয়ার্ডের ওপারে হিমাংশুর কাছে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। হিমাংশুও আমার ছাত্র। তার বাবাও ডাক্তার ছিলেন। কাজেই তার ডাক্তার হওয়ার পথে বাধা আসেনি। জানতাম, হিমাংশু আমার কাছে এক পয়সাও চাইবে না।

কিন্তু তিন ওয়াগন-ব্রেকার আমার রাস্তা আটকাল। হিমাংশুর নাম করতে পারলাম না ওদের কাছে—পাছে হিমাংশু অন্যভাবে নেয় ব্যাপারটা। এর ফলে সমস্যা দেখা দিল। ওরা আমায় বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, 'আপনি আমাদের স্যার বলেই বলছি, এখন ওদিকে যাবেন না। এক্ষুনি আমাদের অপারেশন শুরু হবে। ঝামেলা বাধতেও পারে। রাত এগারোটায় আপনাকে দেখলে কোন পার্টিই খাতির করবে না।'

আমি অন্যদিকে ঘুরে যাব ভাবলাম। কিন্তু ওরা একটা অদ্ভুত কথা বলল। পেছনে শিরীষ গাছের তলায় একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। তার ইঞ্জিনের ঢাকনা তুলে ড্রাইভার টর্চের আলোয় কিছু করছিল। ভেবেছিলাম গাড়িটা বিগড়ে গেছে। এখন অবাক হলাম শুনে যে ওই ট্রাকে গিয়ে আমাকে বসে থাকতে হবে। তারপর সময় মতো আমাকে ওরা বাড়ির কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিয়ে যাবে।

ওদের কাকুতি-মিনতি করলাম। ওরা শুনল না। ওরা একদিন আমার ছাত্র ছিল। ওদের ইচ্ছেমত ধমকেছি। শাসিয়েছি। ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আজ আমাকে ওরা ধমকাল। শাসাল। ভয় পাইয়ে দিল। ট্রাকের ভেতর আমাকে বসিয়ে রেখে ড্রাইভারকে চাপা গলায় কিছু বলে ওরা চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'মাস্টারবাবুর সিগ্রেট-উগ্রেট চলবে?'

বললুম, 'না।'

'চুপসে বৈঠা থাকেন।'

মনে হচ্ছিল দিন ও রাতে কী আকাশ-পাতাল তফাত আজকাল! রাত যত বাড়ে, পৃথিবী তত অচেনা হয়ে যায়। ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠে তার রূপ। লোকগুলো বদলে যায়। অরণ্যের আইন চালু হয়ে যায়। এই ড্রাইভারটিকে দিনে দেখলে নিশ্চয় এত ভয় পেতাম না—কিংবা তার চেহারায় সাংঘাতিক হাবভাব ফুটে উঠত না। যেন সে বড় সহজে আমার পেট ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

দুঃখে ক্ষোভে আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। সময় যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল। রেল-ইয়ার্ডে সেই ইঞ্জিনটা সমানে বিরক্তিকর চিৎকার করছিল চেরা গলায়। লাল সবুজ হলুদ আর সাদা আলোর তলায় থমথমে কী এক অন্ধকার ভেদ করে একটা ট্রেন চলে গেল। অনেকক্ষণ প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তারপর ধুপধুপ শব্দ তুলে ওয়াগনব্রেকারদের দলটা এসে গেল। প্রত্যেকে একটা করে বস্তা কিংবা

ওইরকম কিছু বয়ে এনেছে। ওরা ট্রাকে সেগুলো নিঃশব্দে বোঝাই করল। দেখলাম অন্তত সাতজন আছে দলে। পান্না আস্তে ড্রাইভারকে বলল, 'স্যাররে শিবতলার মোড়ে লামাইয়্যা দিও।'

তারপর ওদের সিল্যুট মূর্তিগুলো এদিকে-ওদিকে জ্যোৎস্নার ভেতর মিশে গেল কোথায়। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ড্রাইভার বলল, 'মাস্টারবাবু, কোই পুছ করলে কী বলবেন?'

চুপ করে থাকলাম।

ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি বাঁদিকের রাস্তায় নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বোলবেন কী, মেদিগঞ্জ গিস্লাম—সেই রিলেটিভের বাড়িতে। তো এই ট্রাক দেখলাম ঔর পাকড়ে নিলাম। হাঁ—এহি কথা বোলবেন। নেহি তো মুশকিলে পড়বেন।'

শিবমন্দিরের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ট্রাকটা মাঠের রাস্তা ধরল। ওটা হাইওয়ে। এখানে শহরের শুরু। লোডশেডিং বসন্ত জ্যোৎস্নাকে ফিরিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি। হু হু করে হাওয়া বইছে। শিবমন্দিরের উঁচু চত্বরে কারা ঘুমোচ্ছে। একটা সাদা কুকুর আস্তে একবার ডেকে দৌড়ে এল। আমার হাঁটুর কাছটা শুঁকে লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরে গেল এবং ফের শুয়ে পড়ল। তবু জ্যোৎস্নায় তার সাদা লেজটা নাড়তে থাকল।

নিঃসাড় শরীরে হাঁটছিলাম। বাড়ির সামনে এসে মনে হল, নির্লজ্জের মতো আবার তারক ডাক্তারকে ডাকব নাকি ? মানুষ তো বটে।

কিন্তু যাওয়া হল না। আবার অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। জানলা খোলা ছিল। ভেতরে হেরিকেনের হলুদ আলো দেখা যাচ্ছিল। জানলা থেকে ঝুম বলে উঠল, 'বাবা! এত দেরি হল যে?'

তোর মা কেমন আছে রে?'

'হিমাংশুদা এল না?'

'তোর মা কেমন আছে?' প্রায় চেঁচিয়ে ফের জিগ্যেস করলাম।

'বুঝতে পারছি না। সাড়া দিচ্ছে না' ঝুম ধরা গলায় বলল। তারপর দরজা খুলে একটু সরে দাঁড়িয়ে ফের বলল, 'তোমার কী হয়েছে? অমন করে কথা বলছ কেন?'

কোন কথা না বলে ওর মায়ের কাছে চলে গেলাম। পেছনে জোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। ঝুমও কী অভদ্র হয়ে উঠছে দিনে দিনে! অমন শব্দ করে দরজা বন্ধ করার কী মানে হয়!

ঝুমের মা চিত হয়ে শুয়েছিল। বুকের ওপর দুটো হাত। চোখ একটু ফাঁক হয়ে আছে। মাথায় হাত রেখেই বুঝলাম বেঁচে নেই। ঊনত্রিশ বছর আমার সঙ্গে কাটিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী। এখন আমি কী করব?....

দীপু

দিবাস্যারকে কিছুদিন থেকে দেখছি গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গায় বসে থাকেন। আমার হাতে অনিঃশেষ সময়। এত বেশি সময় জুটে গেলে খরচে পরোয়া থাকে না। আমি যথেষ্ট ঘুরি। আসল ব্যাপারটা হল হাতে অঢেল সময় পেলেই তো হল না, অঢেল পয়সাও চাই। গঙ্গার ধারে অকাতরে একটা দীর্ঘ বিকেলকে যে মুঠোমুঠো উড়িয়ে দিলাম, তার বদলে পেলাম কী? কষ্টকর একটা উত্তেজনা। দম আটকানো একটা ক্রোধ। বরং যদি এখন এক প্রলম্বিত বিকেলকে পাওয়া যেত তাহিতি কিংবা চাগোস দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতীরে—যদি পেতাম সাহারার কোন ট্রাইবাল চিকের তাঁবুর সামনে। কিংবা নিছক চিল্কা বা বৈকাল হ্রদের ধারে এমন একটা শান্ত নরম বিকেল—শালিখ পাখির মুখের ভেতরকার মতো রক্তিম ও সিক্ত।

প্রতিদিন এই শেষ বেলাটায় খোঁড়া ভিখিরির মতো কিছু যেন চাইতেই আসি বরং। কারুর উদ্দেশ্যে যেন মাথা কুটে বলি, আমি তোমায় দিচ্ছি আমার বিশাল সময়ের ক্যানভাস, তুমি একটা ছবি আঁকো। হয়তো সে আঁকে। নিবিবিলি হিজল গাছটার তলা বসে থাকা একটা লোক। বড় অস্পষ্ট এই স্কেচ। আমাদের দিবাস্যার।

তিনদিনের দিন আস্তে আস্তে কাছে গেলম। প্রণাম করলাম। দিবাস্যার আমাকে যেন দেখেও দেখলেন না। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। একটু তফাতে বসলাম। তারপর বললাম, 'স্যার কি আমায় চিনতে পারছেন না?'

দিবাস্যার গঙ্গার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিলেন, 'পারছি না।'

'আমি দীপু স্যার। দীপঙ্কর।'

'ও। ভাল আছ?'

'খুব ভাল আছি স্যার! আপনি?'

'মন্দ কী?' দিবাস্যার একটু হাসলেন। কিন্তু মুখটা আমার দিকে ফেরালেন না। 'কী করছ এখন?' বলে উনি বাচ্চাদের মতো একটুকরো ঢিল কুড়িয়ে জলে ছুড়লেন। স্রোতের শব্দ এক সেকেন্ডের জন্য মুছে দিল। পেরেক বেঁধার মতো তার অদ্ভুত শব্দ।

'করার কিছু পাচ্ছি না আসলে।' হাসতে হাসতে বললাম। 'করার জন্য তো অনেক ঘুরলাম। পেলাম না।'

দিবাস্যার এতক্ষণে হঠাৎ আমার দিকে ঘুরলেন। 'কী পেতে চাও! একটা চাকরি তো?'

'তাছাড়া আর?'

'চাকরি তো পরাধীন ব্যাপার। স্বাধীনভাবে কিছু করছ না কেন?'

'ব্যবসা-ট্যাবসার কথা বলছেন তো স্যার? পুঁজি পাব কোথায়?'

'পুঁজি লাগে না ... এমন কিছু করো।'

'যেমন?'

দিবাস্যার চাপা কণ্ঠস্বরে বললেন, 'ওয়াগানব্রেকিং! খুব সোজা কাজ। বুঝেছ? স্বচক্ষে দেখেছি। ভীষণ সহজ। রাতের বেলা রেল-ইয়ার্ডে চলে যেও। সঙ্গীর অভাব হবে না। কাকেও না কাকেও পেয়ে যাবে।'

তামাসা করছেন ভেবে হাসতে লাগলাম। 'যা বলেছেন স্যার!'

'তুমি লালু পান্না হারাইদের চেনো?'

'একটু-একটু।'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

পাশে চটান-মতো ঘাসজমিতে একদঙ্গল ছেলে হইচই করে ক্রিকেট খেলতে আসায় আর কথা এগোল না। দিবাস্যার মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে গঙ্গার ওপারে শেষবেলার আকাশ দেখতে থাকলেন। বাঁশবনের মাথার ওপর একটা কালো ঢাউস মেঘ কিছুক্ষণ ঝুলে রইলো। তারপর তার শরীর থেকে রক্ত ঝরার মতো ধারায় ধারায় লাল-হলুদ আলো গড়িয়ে পড়ছিল। আমি মনে মনে হাসছিলাম। দিবাস্যারও তাহলে ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছেন!

পরদিন আর একটু তফাতে একটা আকন্দ-ঝোপের পাশে দিবাস্যারকে আবিষ্কার করলাম। আমাকে দেখেই কেমন একটু হেসে বললেন, 'এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'আজ লালুর সঙ্গে দেখা হল স্যার!'

'কথা হয়েছে কিছু?'

'না। ওর চেহারা দেখে আমার ভয় করছিল।'

'তুমি একটা ওয়ার্থলেস! কেটে পড়ো।'

দিবাস্যারের মাথায় সম্ভবত একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ওঁর এসব কথাবার্তা নিছক তামাসা ভেবেছিলাম। কিন্তু ওঁর মুখে ক্লাসে পড়ানোর সময়কার সিরিয়াস ভাবভঙ্গি ফুটে উঠেছে। আমার কষ্ট হচ্ছিল। আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান্ শিক্ষক বলে জেনেছি ওঁকে। ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত ইতিহাস পড়াতেন স্কুলে। এখনও হয়ত পড়ান। লম্বা রোগাটে গড়নের এই মানুষটিকে বাইরে বাইরে বড় নির্জীব এবং বিষণ্ণ মনে হবে। কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, উদাত্ত। প্রতিটি শব্দ মনে গেঁথে দেবার শক্তি ওঁর দেখেছি। এমন মানুষের মাথার গণ্ডগোল হওয়া খুব দুঃখের ব্যাপার।

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, 'কী ভাবছ?'

'এসব কথা কেন বলছেন, বুঝতে পারছিনে স্যার।'

'না বোঝার কী আছে? একদিকে পুঞ্জীভূত সম্পদ, অন্যদিকে পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য। নিকৃষ্টতম জীব ইঁদুরও বেঁচে থাকার জন্য শস্যের গুদামে হানা দেয়।'

শুকনো হাসলাম। 'তাহলে বরং বিপ্লব করাই উচিত।'

'সেও তো পারছ না!' দিবাস্যার সশব্দে থুথু ফেললেন।

ওঁকে এমন করে কখনও থুথু ফেলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। থুথুটা কি আমারই উদ্দেশে? আমার খারাপ লাগল। ক্ষুব্ধভাবে বললাম, 'পারছি না বলেই কি ওয়াগনব্রেকিং করতে হবে? স্যার, সামাজিক ন্যায়-অন্যায় ব্যাপারটা এখনও নিশ্চয়ই ঠুনকো হয়ে ওঠেনি?'

দিবাস্যার নিঃশব্দে হাসলেন। কোন্‌টা সামাজিক অন্যায়? দারিদ্র্য না সম্পদ? যে সম্পদের শতকরা নিরানব্বুই ভাগ অপচয় করা হয় মুষ্টিমেয় লোকের নিছক ভোগবিলাসের জন্য, তা অপহরণ করা সামাজিক অন্যায় নয়।'

উঠে আসছিলাম। দিবাস্যার ডাকলেন, 'শুনে যাও।'

'বলুন!'

'তুমি কি আমায় উন্মাদ ভাবছ?'

'না স্যার!'

'এটা কত সাল?'

'১৯৭৭।'

'তিরিশ বছর আগে আমাদের মর‍্যালিটির মৃত্যু হয়েছে। ঠিক তার পরের বছর দিল্লিতে বিড়লাদের বাড়িতে ঈশ্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কাজেই যা খুশি করা যায়।'

আস্তে আস্তে চলে এলাম। দিবাস্যারের হাসিটা আমার পিঠের ওপর থাপ্পড়ের মতো পড়তে থাকল। এতক্ষণ ধরে একটা যন্ত্রণা আমার ভেতর শুঁয়োপোকার মতো ঘুরে বেড়াল। কোথাও বুঝি সৌন্দর্য নেই, ভালবাসা নেই। শুধু নষ্টামির প্ররোচনা। আসলে আমার এ নিঃশেষ সময়ের ক্যানভাসে এক অদৃশ্য চতুর চিত্রকর আজকাল এইসব বিদঘুটে ছবি আঁকে।

এক বিকেলে হঠাৎ কী খেয়াল হল, শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দিবাস্যারের বাড়ি চলে গেলাম। একপ্রান্তে গাছপালা আর আগাছার ভেতর বাড়িটা মনে হয় যেন অসংরক্ষিত পুরাকীর্তি। কার্নিশে বটের চারা। দেয়ালে সবুজ-কালো শ্যাওলার দাগড়া-দাগড়া ছোপ। নোনাধরা ইটের সার।

ঝুম আমাকে চিনতে একটু বেশি সময় নিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'ও! আপনি দীপুদা! আপনার দাড়ি-ফাড়ি দেখে চিনতে পারছিলাম না। আসুন, আসুন।'

চার বছর পরে ওদের বাড়িতে ঢুকলাম। দেখলাম বাড়ির ভেতরটাতেও ক্ষয়ের ছাপ পড়েছে একদিকে।

ঝুম

দীপঙ্করকে আমি চিনতে পারিনি। আমার মনে আঁকা ছিল একটা ধারালো ঝকমকে চেহারার ছেলে। চোখ দুটো ছিল একটু ভিজে ধরনের। যে চোখ দেখার জিনিসটার সঙ্গেও ওতপ্রোত জড়িয়ে যায়, তেমন চোখ। লুকিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। লজ্জা পেতাম। আবার লজ্জা পেতে ভালও লাগত।

দীপঙ্করকে তুমি বলতাম বুঝি? সে আমায় মনে করিয়ে দিল। হ্যাঁ, বাবার ছাত্রদের আমি তুমি বলতাম বটে। কিন্তু বয়স বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটাকে সম্মান দিতে ইচ্ছে করে।

বারান্দায় খানিকটা অংশ খোলামেলায় উঠোনে চারকোনা হয়ে ঢুকেছে। ঠাকুর্দার আমলের লাইম কংক্রিটের বেঞ্চ মতো করা আছে। সেখানে দীপঙ্কর বসল হেলান দিয়ে। সারাক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে কথা

বললাম ওর সঙ্গে। ও খুঁটিয়ে আমার মায়ের মৃত্যুর কথা জেনে নিল। তারপর বলল, 'স্যারের সঙ্গে ইদানীং আমার দেখা হয় গঙ্গার ধারে। বড় অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম ফ্রাস্ট্রেশন। পরে মনে হয়েছে, কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে যেন।'

আস্তে বললাম, 'কী?'

দীপঙ্কর হাসল। 'সেটা তুমিই বলতে পারো আমাব চেয়ে বেশি। কথাগুলো যেন অন্য কেউ বলছিল—উনি নন। কেমন যেন স্প্লিট পারসন্যালিটির ব্যাপার।'

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, 'কী বলছিলেন বাবা?'

'ওয়াগনব্রেকার হতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন।'

'বসো। চা নিয়ে আসি।'

বাবার প্রাক্তন ছাত্ররা কেউ ভুলেও আসে না। শুনেছি তাদের কেউ বড়লোক হয়েছে। কেউ বড় চাকুরে হয়েছে। দু-একজন নানা ব্যাপারে নামও করেছে। আসলে স্কুলমাস্টারদের কথা তাদের কারুরই মনে থাকার কথা নয়-- -যারা কিনা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙিয়ে যেতে পেরেছে। তারা গল্প করে অধ্যাপকদের। ছাত্রজীবনের স্মৃতি বলতে তাদের কাছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্মৃতি। এটাই কিন্তু নিয়ম। স্কুলের গল্প করলে বেচারাকে অর্ধশিক্ষিত ভাবা হবে যে!

আর বাবারও ভারি অদ্ভুত স্বভাব। সবার মধ্যে উনি নিজের প্রাক্তন ছাত্রকে আবিষ্কার করেন। গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়ে অপমানিতও হন অনেক সময়। তাতে ওঁর কোন দ্বিধা নেই। হাসতে হাসতে বলেন, 'ওর মনে নেই। পৃথিবীতে অনেকেরই স্মৃতিশক্তি বড় ক্ষীণ।'

কুকারের সামনে বসে বাবার প্রাক্তন ছাত্রদের কথা ভাবছিলাম। দীপঙ্কর এখনও বাবাকে স্যার বলছে শুনে ভাল লাগছিল। অথচ জানি ওই স্যার পদবিটা বাবার ক্ষেত্রে সচরাচর ঠাট্টা করেই বলা হয়! রিকশোওলা, বাসের কন্ডাক্টর, চাওয়ালা, বাজারের মাছওয়ালাও স্যার বলে। আড়ালে সবাই বলে 'দিবাস্যার।' বাবা ভাবেন বুঝি এই তাঁর সম্মান। কিন্তু এ ভুল আমি ভাঙিয়ে দিতে চাইনি। আমার পক্ষে সম্ভবও নয়।

চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে বললাম, 'কী যেন বলছিলে দীপুদা?'

দীপঙ্কর বোধহয় কিছু ভাবছিল। হাত বাড়িয়ে চা নিয়ে বলল, 'কৈ—কী?'

'ওয়াগনব্রেকার না কী বলছিলে?'

'ও!' দীপঙ্করের সেই ভিজে চোখ থেকে হাসি উপচে পড়ল। 'যখনই দেখা হয়, বলেন ওয়াগনব্রেকার হয়ে যাও। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।'

'কে বলেন? বাবা?'

দীপঙ্কর আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার ধারণা, ওঁর একটু প্রপার কেয়ার দরকার। ছুটি নিতে বলো না ওঁকে! ছুটি নিয়ে ধরো কোথাও কিছুদিন কাটিয়ে আসতেন।'

একটু হেসে বললাম, 'অত পয়সা কোথায়?'

'তোমাদের সংসারটা তো ছোট।'

'মায়ের অসুখে ফতুর। বাবার মাইনের অর্ধেক টাকা কেটে নেয় ধার শুধতে। আছি কোথায়?'

হাসছিলাম। দীপঙ্কর গেরস্থ মানুষের গলায় বলল, 'হুঁ—তার ওপর বাজারদর। সর্বত্র একই প্রব্লেম।'

ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কিন্তু তোমার কথা তো কিছু বলছ না দীপুদা?'

'বলার মতো কিছু না। প্রতিদিনকার কাজ হচ্ছে খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন খোঁজা। অদ্ভুত ব্যাপার, অসংখ্য চাকরির বিজ্ঞাপন বেরোয় রোজ। কিন্তু একটা পোস্টের জন্যও কোয়ালিফায়েড দেখি না নিজেকে। যেটা নেহাত কানের পাশ ঘেঁষে যায়, সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে দিই কপাল ঠুকে। আর ওই পোস্টাল অর্ডার! এ পর্যন্ত কত টাকা যে গচ্চা গেল, কহতব্য নয়।' দীপঙ্কর হাসিমুখে শুরু করেছিল। শেষদিকটায় মুখের ওপর রাগের ছাপ পড়ল। দম নিয়ে বলল, 'স্যার ঠিকই বলছিলেন, এর চেয়ে ওয়াগনব্রেকার হওয়া ভাল। কাজটাও নাকি খুব সোজা।'

'আচ্ছা, ওয়াগনব্রেকিং ব্যাপারটা কী?'

দীপঙ্কর চায়ে আলতো চুমুক দিয়ে বলল, 'সে কী! তুমি জানো না?'

'না। শুনেছি—মানে প্রায়ই শুনি, রেল-ইয়ার্ডে এসব হচ্ছে। অনেক রাতে প্রচণ্ড বোমা ফাটার শব্দও শুনতে পাই। ওমাসে দুটো ছেলে মারা পড়েছিল সেন্ট্রির গুলিতে। কিন্তু সত্যি বলছি। ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।'

দীপঙ্কর মুখের ভয়ের ভঙ্গি ফুটিয়ে ফিক করে হাসল। বলল, 'তাহলে আর জানার বাকি কী রইল?'

উল্টোদিকের লাইম-কংক্রিটের পলেস্তারাহীন ফাটলধরা বেঞ্চে ওর মুখোমুখি বসে পড়লাম। বললাম, 'না। তুমি ডিটেল্স বলো। ব্যাপারটা আমি বুঝতেই পারি না।'

দীপঙ্কর দীর্ঘ চুমুকে চা-টুকু গিলে পাশে কাপ-প্লেট রাখল। তারপর শার্টের বুকপকেট থেকে একটা দোমড়ানো সিগারেট বের করে সেটা সোজা করতে করতে বলল, 'দেশলাই দাও।'

জমাটি একটা গল্পের আশায় খুশি হয়ে তক্ষুনি দৌড়ে ওকে দেশলাই এনে দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে ও বলল, 'ওয়াগন বোঝো তো? মালগাড়ির টুকরো-টুকরো অংশ। কেমন? দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লোক অথবা কোম্পানি অথবা গভর্নমেন্ট ওইসব ওয়াগনে জিনিসপত্র পাঠায়। নানা ধরনের জিনিস। ধরো, স্টেশনের রেলইয়ার্ডে মালভর্তি ওয়াগনগুলো এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওয়াগনের দরজা ভেঙে মালগুলো হাতিয়ে নাও। তারপর চুপি চুপি বেচে দাও—কেনার লোকের অভাব নেই। কিন্তু এটা একটা ক্রাইম, এ কাজ যারা করে, তারা ক্রিমিনাল। তবে ওয়াগনব্রেকিং একটা অর্গানাইজড ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটি। তাই তাদের একটা র‍্যাকেট আছে—মানে চক্র আছে। খুঁজলে দেখা যাবে, তার র‍্যাকেটের মাথায় বসে আছে হয়তো দেশের এক খ্যাতনামা বিশিষ্ট লোক। তার প্রচণ্ড প্রভাবও আছে। তাই শেষ পর্যন্ত র‍্যাকেটটা অক্ষত থেকে যায়। দৈবাৎ ভেঙে গেলে আবার গড়েও ওঠে! সর্ট অফ মাফিয়া। তুমি মাফিয়ার কথা শুনেছ কি?'

দীপঙ্করের বলার ভঙ্গিটা শিক্ষকদের মতো। বাবা ইতিহাস পড়াতে ভাল বাসেন। আমাকে ঠিক এই ভঙ্গিতে ইতিহাস বোঝাতেন।

দীপঙ্কর মাফিয়ার কথা বলতে থাকল। হঠাৎ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'থাক্। ভয় করে এসব শুনতে।'

'ভয়? তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি আসলে আমাকে কথা বলাতে চাইছ!'

'ভ্যাট্! তা নয়—সত্যি বলছি, এসব শুনলে বড্ড ভয় করে আমার।'

'ঝুম, আলোর তলায় অন্ধকার থাকবেই। যে পৃথিবী-রাষ্ট্র-সমাজ দেখছি, তার দুটো পার্ট! একটা আলোর, অন্যটা অন্ধকারের। কখনও অন্ধকার পার্টটা ওভারল্যাপ করে রাহুর মতো আলোর পার্টে ঢুকে যায় আবার অনেক সময় দুটো পার্ট আলাদা করাও কঠিন হয়। এখন ঠিক এই অবস্থাটা চলেছে।'

'দীপুদা, তুমি....'

'কখনও পুরো একটা রাষ্ট্র মাফিয়ার করতলগত হয়ে যায়।' দীপঙ্কর একটু হাসল। 'কী বলছিলে যেন?'

'তুমি কখনও ভূত দেখেছ?'

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বলল, 'ও! তুমি আসলে গল্প শোনার তাল করেছ? আমি কিন্তু সবটা সিরিয়াসলি নিয়েছিলাম।'

'বলো না একটা ভূতের গল্প!'

'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমি চলে গেলে তোমার ভয় করবে না?'

'তুমি থাকবে যতক্ষণ বাবা না ফেরেন।'

দীপঙ্কর সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো স্যান্ডেলের তলায় ঘষটে নিভিয়ে বলল, 'জানো? এই যে এতক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করছি, এত কথা বলছি—বিশ্বাস করো, গত একটা বছর কোথাও এমন করে আড্ডা দিইনি বা মন খুলে কথা বলিনি। অন্যভাবে নিও না ঝুম, জাস্ট এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট

বলছি—আমার খুব ভাল লাগছে।'

শ্বাস চেপে আস্তে বললাম, 'আমারও।'

'বুঝতে পারি, তুমি ভীষণ একা থাকো।'

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'থাক্। আর সিম্প্যাথি দেখাতে হবে না। ভূতের গল্প হোক।'

দীপঙ্কর একটু হেসে বলল, 'সত্যি বলছি—আমি ভূতের গল্প একটাও জানিনে। ভূত আমি দেখিও নি, যদিও ভূতের ভয় আমার আছে। আর তার চেয়ে বড় কথা, ভূতে আমার বিশ্বাস নেই।'

'নেই তো আমারও। নেই বলেই গল্প শুনতে ভাল লাগে। তুমি বানিয়ে-বানিয়ে একটা বলো বরং।'

দীপঙ্করের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, ও আমাকে অস্বীকার করতে পারছিল না। ভুরু কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এবং দাড়ি চুলকে ও তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় বাইরের ঘরের দরজায় কড়া নড়ল। বাবা এর মধ্যেই এসে পড়লেন ভেবে ও ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর দরজা খুলেই চমকে উঠলাম। কলোনিপাড়ার পান্না! ওরা ভীষণ বদমাস শুনতে পাই। বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। বললাম, 'বাবা তো নেই পান্নাদা!'

পান্না চাপা গলায় বলল, 'আর্জেন্ট দরকার। গেলেন কোহানে স্যার, কও তো মণি? টুঁইড়্যা বার করুম অনে।'

'গঙ্গার ধারে কোথাও আছেন হয়তো!'

পান্না চলে গেলে কাঁপা-কাঁপা হাতে দরজা বন্ধ করে ফিরে এলাম। দীপঙ্কর বলল, 'কে ?'

'ও একটা লোক। বাবাকে খুঁজছিল।'

দীপঙ্কর একটু হেসে বলল, 'পান্নার গলা মনে হল?'

ওর পাশে বসে বললাম, 'তোমার গল্প বানানো হয়েছে? বলো, শুনি।' তখনও আমার শরীর ভারি হয়ে আছে। নার্ভাস বোধ করছি। কেন পান্না বাবাকে খুঁজছে? পান্না নাকি ওয়াগনব্রেকার!

দীপঙ্কর একটু কেশে শুরু করল। ....'ঠিক বানানো নয়—সত্যিকার এক্সপিরিয়েন্স। পরে এক্সপ্লানেশন দেব—আগে গল্পটা বলি। সেবার অমাবস্যার রাতে কালীপুজোর সময় আমরা কয়েকজন মিলে বেড়াতে বেরিয়েছি। গঙ্গার ধারে শ্মশানের বটগাছটা আছে—ওখানে এক সাধুবাবা থাকতেন দেখেছ নিশ্চয়। তো আমরা ভাবলাম সাধুবাবার অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা করা যাক্। ওঁকে ভূত সেজে.....'

পান্না কেন বাবাকে খুঁজছে, আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না। দীপুদা গল্পটা বলছে শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার মন পান্নার দিকে। উঠোন যত অন্ধকার হয়ে উঠছিল, তত পান্নার সাড়া পাচ্ছিলাম। আবছা কালো মূর্তি এক ওয়াগনব্রেকার অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল আমার ছোট্ট নিরীহ সংসারের দিকে।.....

দিবাকর

আজকাল আমার ঘুমের ভেতর থেকে গমগমে গলায় বলে ওঠে, ওয়াগন! ওয়াগন। তিব্বতী গুম্ফার ঘণ্টার মতো। ওয়াগন ওয়াগন ওয়াগন .... শব্দটা গম্ভীরতর হয়ে গুহার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে আসে। একবার গয়া থেকে ফের বিহারের দিকে আসতে ট্রেন যখন সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকল, ক্রমশ সে কী অন্ধকার! সেই অন্ধকার কামরার ভেতর কেউ ঠিক অমনি গমগম আওয়াজে বলছিল। সেই লোকটাকে পরে আর আবিষ্কার করতে পারিনি। তার ফলে একটা গোপন রহস্যময় বস্তুর মতো অন্ধকার সুড়ঙ্গের একটা লোক মনে থেকে গেছে। ঠিক সেই লোকটাই বটে ! ঝুমের মা যে রাতে মারা যায়, সেই রাতে প্রগাঢ় ধরনের জ্যোৎস্নার ভেতর খানিকটা অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল। বড় অদ্ভুত সে-অন্ধকার। আমি জানতাম, ওর ভেতর লোকটা চুপচাপ বসে আছে। সময় হলেই সে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলবে, ওয়াগন .... ওয়াগন ..... ওয়াগন!

কাল রাতেও তো একই ব্যাপার হল। শব্দটা শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে গেল। তারপর দূরের রেল-

ইয়ার্ডে মালগাড়ির একটানা আওয়াজ হচ্ছিল। একটার পর একটা ওয়াগন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার যন্ত্রণাকর আওয়াজ। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ওজনদার লাল রঙের অসংখ্য ওয়াগন। দুচ্ছাই বলে অমি উঠে বসলাম। কী করব ভেবেই পেলাম না। শেষে উঠোনের চারকোনা রোয়াকে গিয়ে বসে রইলাম।

ঝুম আজকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো আঁচ করেছে আমার একটা নতুন কষ্ট শুরু হয়েছে। এমন কী স্কুলে আমার সহকর্মীরা এবং ক্লাসের ছেলেরাও। কানে আসে, 'দিবাস্যারের বউ মারা গেছে। এ বয়সে বউ মারা যাওয়া ঠিক না।' আমি চুপ করে থাকি। কাকে কী বোঝাব? কুমু মরেই না এতদিনে নিজের দিকে তাকানোর সময় পেলাম! একটানা ঊনত্রিশ বছর আমার অস্তিত্বের সঙ্গে একাকার হয়েছিল একটি মেয়ে। যৌনতার দিক থেকে ব্যাপারটা যত অর্থপূর্ণ এবং সুখপ্রদ মনে হোক, এ একটা এমন অবস্থা, যখন প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যায় না।

কাল বিকেলে গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গাই আর পেলাম না। শহরে লোক বাড়ছে, তাতে ভুল নেই। বাড়তি লোকেদের কাছেও নদী জনপ্রিয় হচ্ছে। শুনেছি কিনারা বরাবর বন-দপ্তর পার্ক আর ভূমি-ক্ষয়রোধী জঙ্গল বানাবে। সে জঙ্গল খুব অহিংস হবে নিঃসন্দেহে। যুবক-যুবতীদের সুদিন আসছে। আমার মতো বুড়ো-হাবড়ার আশা করার কিছু নেই। ভাবতে ভাবতে আমি ইটখোলার ধার দিয়ে হাইওয়েতে উঠলাম। পথে সত্যচরণের সঙ্গে দেখা হল। সাইকেলে আসছিল সে। একটু থেমে বলে গেল, 'যে খবরটা দিয়েছিলাম, যোগাযোগ না করে থাকলে আর করবেন না দাদা! বেহাত হওয়ার চান্স আছে শুনলাম।' মাথা নেড়ে সায় দিলাম বটে, কিন্তু মনে পড়ল না কী খবর দিয়েছিল। সত্যচরণ ইদানীং আড়তও খুলেছে। কয়লা দিয়ে শুরু করেছিল, এখন আলুতে পৌঁছেছে। আমি কোথাও পৌঁছতে পারলাম না। কিন্তু খবরটা কী ছিল? বেহাত-ই বা কী হল কে জানে!

বাঁদিকে আদিবাসী আর হিন্দুস্থানী মজুরদের বস্তি, ডাইনে কমলাকান্তের পেট্রল পাম্প আর গ্যারেজ। ওকে ডাকতাম গুঁফোকমলা বলে। গোলগাল গড়ন ছিল। এখন আরও ফুলে পাকা কুমড়ো হয়েছে। সেখানে দেখি একটা ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে হাবাই সিগারেট টানছে। চোখে চোখ পড়লে সিগারেট লুকিয়ে একটু হাসল।

কমলাকান্ত 'দিবু! মাস্টার!' বলে চড়া গলায় হাঁকছিল। খুব রসে-বশে আছে। কাছে গিয়ে বললাম, 'তোমার সত্যি বুদ্ধিসুদ্ধি আছে হে কমলা! সত্যি বলছি, যখন বাইরে এতদূরে পাম্প করতে এলে, ভেবেছিলাম করছে কী! এই ফাঁকা বেহদ্দ জায়গা! পরে দেখলাম সব খালি জায়গা ভরে গেল চোখের সামনে।'

'আরও স্প্রেড করবে।' কমলাকান্ত ধূর্ত হেসে বলল। 'হাইওয়ে ব.লে কথা। কিন্তু তুমিও এদিকে চলে এস মাস্টার! কোথায় একটেরে পড়ে আছ জঙ্গলে!'

কমলাকান্ত একটা সিগারেট দিলে কিছুক্ষণ টানলাম। সিগারেট খেতে কোনদিনই ভাল লাগে না। কদাচিৎ কেউ দিলে একটু টানি। টানতে টানতে হঠাৎ মনে হল, কমলাকান্ত আমাকে এত খাতির করছে কেন? কুমুর অসুখের সময় একদিন চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ওর কাছে পাঁচশো টাকা ধার চাইতে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল কুমুকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করাব। হাজার-দুই হাতে রাখার দরকার ছিল। হাজারখানেক গয়না-গাটি বেচে জোগাড় করেছিলাম এবং শ-পাঁচেক ডাকঘরে জমা ছিল। প্রভিডেন্ট ফান্ডে হাত পাতার ইচ্ছে ছিল না। ঝুমের বিয়ের কী হবে তাহলে?

কমলাকান্ত একশো কথা বলার পর আসল কথাটা বেরিয়ে এসেছিল। অর্থাৎ সে গুড়ে বালি।

এদিন আমি ওর কাছে ঋণ চাইতে আসিনি, ব.[illegible]ণ কুমু বেঁচে নেই। সে জন্যেই কি এত খাতির? অবশ্য অভাবী মানুষ এবং ঘরে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত অনূঢ়া আছে, তখন ঋণ চাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বৈকি! চতুর কমলাকান্ত তবু খাতির করছে কী সাহসে?

চায়ে-কফিতে মিশিয়ে খাওয়াল। তার সঙ্গে বিস্কুট পর্যন্ত। তারপর আমাকে পাম্পের পেছনে ফুলের বাগান দেখাতে নিয়ে গেল। বাগানটা ছোট হলেও ছিমছাম সুন্দর। এই ফুল-টুল তো প্রকৃতির দান। তবু তাও দেখেছি পয়সাওলাদের প্রতি ফুলের পক্ষপাতিত্ব বেশি। আমি মাথা ভাঙলেও প্রকৃতি মুঠো খুলবে

না। এর রহস্য কি শুধু সার—নিছক সার? বুঝতে পারি না।

কমলাকান্তের প্রতি আমার কোন ঈর্ষা ছিল না। পয়সাওলা লোকদের প্রতি আমার কোন ঈর্ষাই নেই। কিন্তু ওঁর ফুলের বাগান দেখতে দেখতে নিজেকে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর প্রাণী বোধ হচ্ছিল। জীবনের দীর্ঘ পঞ্চান্নটা বছর আমি করলাম কী? ব্যর্থতায় আমার মন ভাজা-ভাজা হচ্ছিল।

নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'চলি কমলা!'

'মাঝে মাঝে এসো।' কমলাকান্ত মিষ্টি হাসল। 'আর ঝুমুকে একদিন আসতে বোলো আমাদের বাড়িতে। সাগরিকা তো এখন এখানেই থাকছে। গার্লস কলেজে লেকচারার হয়ে যাচ্ছে শিগগিরি। যাই বলো ভাই, কলকাতায় আর সে-সুখ নেই। সাগরিকা বলছিল, সে এক জঘন্য অবস্থা। ভিড় আর ভিড়। পা ফেলার জায়গা নেই।'

কমলাকান্ত কথা বলতে বলতে রাস্তার ধারে গভীর নয়ানজুলির ওপর তৈরি কংক্রিটের সাঁকো পর্যন্ত এল।

হন হন করে ফাঁকা মাঠের দিকে যেতে যেতে ভাবছিলাম, হারাই যে ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই কি সে-রাতে আমাকে শিবমন্দিরের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল; ভাবছিলাম আর বারবার পিছু ফিরে দেখছিলাম ওটাকে। বিকেলের রোদে ঝকমক করছিল ট্রাকটা। খুব অবাক লাগছিল। রাতের বিপজ্জনক খুনে এবং ষড়যন্ত্র-সংকুল একটা ট্রাক দিনের আলোয় কেমন ভালমানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে নিরীহ চোখে তাকিয়ে।

একটা জ্বালাকর কষ্ট ঠেলে উঠল বুক থেকে মাথার ভেতর। ওই হারামজাদা নির্দয় ট্রাকটার খোঁদলে সেই জ্যোৎস্নারাতে যখন বসেছিলাম, তখন হয়তো কুমু আমাকে খুঁজছিল—হয়তো অস্ফুটস্বরে ডাকছিলও। হয়তো ঝুম বলেছিল—এখুনি বাবা এসে যাবে, মা!

আমি যদি হঠাৎ কোন অলৌকিকতায় দৈত্যের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠি, এখনই দু-হাতে ট্রাকটাকে শূন্যে তুলে এত জোরে আছাড় মারব যে ওটা ছাতু হয়ে যাবে। যে প্রতিবাদ করবে, তখন আমি তাকেই এমনি করে আছাড় মারব! দলা-দলা রক্ত ঘিলু, মাংসে স্যাঁতসেতে হয়ে যাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে নম্বর ৩৪!

বিশাল শিরীষ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ট্রাকটাকে দেখতে থাকলাম। আমার চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাবার অবস্থা—কিন্তু জলই বেরুল। নাক ঝাড়লাম। একটা সাংঘাতিক কিছু—বিপজ্জনক কোন ঘটনা। ওই রকম একটা করে আছাড় মারতে মারতে গুঁড়ো করতে করতে জাতীয় মহাসড়ক নম্বর ৩৪ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে কলকাতা এবং কলকাতা থেকে দিল্লী। সমস্ত দীর্ঘ পিচে রক্ত ছড়াতে ছড়াতে দিল্লী। .....

ওয়াগন! ওয়াগন! কে ভারী গলায় ষড়যন্ত্র-সংকুল কণ্ঠস্বরে বলো উঠলো, ওয়াগন! ওয়াগন! শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ানো, দমকা বাতাসের শন-শন করে ওঠার মতো—ওয়াগন। ওয়াগন।

চমকে উঠে তাকালাম। টুকরো অন্ধকার সামনে এগিয়ে আসছিলো. সেই অন্ধকার একটু লম্বা হলো তারপর কালো টেকো সেই টুকরো এসে কাছাকাছি দাঁড়াল।

তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, হারাই। হারাই বলল, 'পান্না আপনাকে খুঁজছিল স্যার। দেখা হয়নি?'

ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'না। কেন?'

'জানি না পান্না বলছিল কী কাজ আছে আপনার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে কী কাজ?' বলে রাস্তায় উঠলাম। হারাই রাস্তার ধারে গিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলল। আমি হন হন করে হাঁটতে থাকলাম।

কাল রাত আটটা পর্যন্ত স্টেশনে গিয়ে বসেছিলাম। প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকটায় গোড়া বাঁধানো বকুল গাছের তলায়। বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। একটা গ্রাম্যলোক এসে বসল কিছুক্ষণ পরে। সে কলকাতা যাবে রাত বারোটার ডাউন ট্রেনে। গ্রামের লোকদের যা অভ্যাস, প্রথমে কিছুক্ষণ সে উসখুস করল। দেশলাই চাইল। তারপর দেখি নিজের পকেট থেকে বের করল দেশলাই। বলল, 'ভুলো মন

বাবুমশাই। আসলে হয়েছে কী, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা!'

বললাম, 'কেন হে?'

'আজ্ঞে মামলা। হাইকোর্টে উঠেছে এখন। আর বলবেন না।'

'কী?'

'আজ্ঞে অবস্থা। যা দিনকাল পড়েছে, আর বাঁচাই কঠিন হয়ে পড়েছে।'

সে তার জমির মামলার কথা তুলল। তারপর পুরো ইতিহাস শুনিয়ে ছাড়ল। শেষে নিজের জীবনী বলতে শুরু করল। হয়তো সব মানুষই নিজের জীবনটা জানে বা তৈরি করে নেয় এবং মুখস্থ রাখে। শুনতে শুনতে আমার একটা শিক্ষা হয়ে গেল বটে। আমার জীবনী আমার জানা নেই। কী আশ্চর্য কথা এটা! আমার এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ছিল। এই লোকটা যদি জানতে চাইত বড় জোর বলতাম 'আমি রানী বরদাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের একজন শিক্ষক। পঁচিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছি। ইতিহাস ছাড়া আর কিছু পড়াতে পারিনে... কারণ আর কোন সাবজেক্ট আমাকে পড়াতে দেওয়া হয় না। আমার বয়স পঞ্চাশ বছর দু-মাস। আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে।' আর কী বলা উচিত! হুঁ—'আমি ঋণভারে জর্জরিত। আমার সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। অবশ্য আমার একটা ছোটখাট পৈতৃক বাড়ি আছে। বাড়িটা জরাজীর্ণ। যে-কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে।'....

ওয়াগন-সম্পর্কিত ঘটনাটা বলা উচিত হবে না। বড় জোর বলা যায়, আমার বাড়িতে শুয়ে সারারাত সারাদিন অসংখ্য ওয়াগন—ভারী এবং কষ্টকর লাল রঙের ওয়াগন টেনে টেনে বয়ে নিয়ে চলার বিরক্তিকর শব্দ শোনা যায়। ওই ওয়াগনগুলিতে কী আছে আমার অবশ্য জানা নেই।'.....

বাড়িতে ফিরে বকুনি খেলাম একচোট। ঝুম আমাকে আজকাল গ্রাহ্য করে না। বলল, 'কী সব বলে বেড়াচ্ছ যাকে-তাকে? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?'

আস্তে বললাম, 'কী রে?'

'দীপুকে কীসব যা তা বলেছ?'

'দীপুর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে বুঝি?'

'এসেছিল।' বলে ঝুম কিচেনের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে ফের বলল, 'তুমি যদি কাউকে ওসব আজেবাজে কথা বলো, সোজা তোমাকে রাঁচি পাঠিয়ে দেব বলে দিচ্ছি।'

চুপ করে থাকলাম। অন্যায় কী বলেছি নির্বোধ ছেলেটাকে? চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওর লজ্জা করে না, কারও চাকর হতে? জোয়ান সমর্থ ছেলে। রাস্তায় গেঞ্জি বা চানাচুর বেচতেও যখন পারবে না, তখন ওয়াগন ব্রেকার হোক। এই যে আমি—ইতিহাসের মাস্টার, আমি বরদাসুন্দরী ইনস্টিটিউশনের এক চাকর বৈ তো না। আমার যদি বয়স থাকত, আমি নিশ্চয় ওয়াগন ব্রেকার হতাম। চোখের সামনে অসংখ্য ওয়াগন টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি কি চুপ করে বসে থাকতাম?

মনটা খারাপ হয়ে গেল। দীপুর ওপর ভীষণ রাগও হল। আমাকে পাগল ভেবেছে। অথচ আমি সজ্ঞানে ওকে ওসব কথা বলেছি।

অনেক রাতে আমার মাথার কাছের জানলায় খুট-খুট শব্দ হচ্ছিল। এত কিছু না ভেবে সাড়া দিলাম, 'কে?'

'আমি পান্না স্যার!'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঝুম ওর মায়ের মৃত্যুর পর দিনকতক এ ঘরে এসে শুত। আবার নিজের ঘরে ফিরে গেছে। ও যেন জানে না, এমনভাবে জানলা খুলে দিলাম। লোডশেডিং। বাইরে ঘন অন্ধকার। বহুদূরে জুগজুগ করছে স্টেশন এলাকার বাতি। পান্না বলল, 'খিড়কির দরজাটা খোলেন স্যার। জরুরী কাম আছে আপনার লগে।'

'দেখ পান্না....'

পান্না ফণা তুলে ফোঁস করল। 'আহ্! কী যে করেন স্যার ঝুট-ঝামেলা!'

কথা না বাড়িয়ে ঘরের দরজা খুলে বেরুলাম। টর্চটা ঝুমের কাছে। স্বপ্নের ঘোরে হাঁটার মতো গিয়ে খিড়কির দরজা খুললাম। এবার বারের জন্য মনে হল, পান্না কী আমাকে খুন করতে এসেছে কোন অজানা

কারণে? তারপর মনে হল, আমার মরে যাওয়াই ভাল। মারে তো মারুক।

পান্নার সঙ্গে আরও জনাতিনেক দাঁড়িয়েছিল। পান্না বলল, 'বড় বিপদে পইড়্যাই আপনার লগে আইছি স্যার। দয়া কইর‍্যা বাঁচান আমাগো। আপনি ছাড়া আর কার কাছে যামু, কন!'

অবাক হয়ে গেলাম, যখন ও আমার পা ছুঁয়ে প্রণামও করল। বললাম, 'কী হয়েছে?'

'হয় নাই কিছু।' পান্না হাসছিল। 'হেই মাল দুইহান আপনারে থুইতে হইব। মাত্র চাইর-প্যাঁচ দিন ব্যস! তারপর লইয়া যামু গিয়া। এট্টু গণ্ডগোল বাধছে। হালার বেজম্মা আইছে এক।' ... বলে সে সঙ্গীদের ইশারা করল। 'কাম অন! কাম অন!'

শুনতে শুনতে কাঁপছিলাম। ওরা আমার পাশ কাটিয়ে দুটো মাঝারি গড়নের বাক্সের মতো জিনিস নিয়ে ঢুকে গেল। তারপর পান্না টর্চ জ্বালল। 'আপনের ঘরে উঁচা খাট দেখছি স্যার। তার তলায় ঢুকাইয়া রাহি—কী কন? অ্যাই লালু! ওঠা মাল।'

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা আমার ঘরে ঢুকল।

৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ছুটে এসেছিল যারা, তারাই কী? একের পর এক সাজানো সংসার-সভ্যতা নীতি-সৌন্দর্য ভাঙচুর করতে করতে গল্‌দেশ পেরিয়ে স্পেন, স্পেন থেকে উত্তর আফ্রিকা, তারপর উত্তরমুখী হয়ে রোমে ঢুকেছিল। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল সভ্যতা, এর চিৎপ্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যা কিছু। ওদের বলা হত ভ্যান্ডাল। ওরাই কী?

আমার ঘরের অভ্যন্তরকে ভাঙচুর করল যেমন খুশি। অভ্যন্তরে ছিল নীতি, বিবেক, ধর্ম, ন্যায়বোধ। বড় সুন্দর সাজানো-গোছানো সামগ্রী। সারা জীবন ধরে লালন করেছিলাম প্রযত্নে। সব চূর্ণ হল।

ওরা চলে যাবার কতক্ষণ পরে খেয়াল হল, খিড়কির দরজা খোলা আছে। বন্ধ করে এসে কিছুক্ষণ উঠোনের রোয়াকে বসে থাকলাম। উদ্দাম বাতাস বইছিল। কুয়োতলার কাছে জবাগাছের ঝোপ অন্ধকারে দুলছিল। যেন ভূমিকম্প চলেছে পৃথিবীতে। ঝড়ের রাতের সমুদ্রে টালমাটাল নৌকোর মতো জীর্ণ বাড়িটা কাঁপছিল। টাল খাচ্ছিল। ....

তারপর গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণে বুঝলাম, আমি ওয়াগন ব্রেকারদের একজন হয়ে গেছি। ....

দীপু

সাগরিকাকে প্রথম দেখি নরেন্দ্রের বিয়ের সময় বছর পাঁচেক আগে। নরেন্দ্রর বিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বয়সেই হয়েছিল। পয়সাওলা ফ্যামিলির একমাত্র ছেলে হলে যা হয়। তাছাড়া মফস্বলের ছেলে নরেন্দ্রের তত কিছু উচ্চাকাঙক্ষাও ছিল না জানি। এ শহরে ওদের একটা অয়েল মিল আর একটা সিনেমা হল আছে। বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হয়েছিল। ভিড় হয়েছিল প্রচণ্ড। ভিড় আমার চক্ষুশূল। তাই ওদের বাড়ির পেছন দিকে পুকুর আর বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন একদল মেয়ে হল্লা করতে করতে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে সাগরিকাকে খুব সহজে চোখে পড়ে যায়।

পরে নরেন্দ্রের বোন রমিতা আলাপ করিয়ে দিলে অবাক হয়ে যাই যে সে এখানকারই মেয়ে এবং তার বাবার নাম কমলাকান্তবাবু। তার বাবাকেও এ নামে চিনতাম না। নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কমলাকান্তবাবু কে রে?' নরেন্দ্র বলেছিল, 'সে কী! তুই গুঁফোকম্‌লাকে চিনিস নে?'

চিনতাম। তখন ওঁরা থাকতেন শহরের ভেতর দিকটায়। এখন হাইওয়ের ধারে চলে গেছেন। ওদিকটায় অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে। একটা হাউসিং এস্টেটও হয়েছে। উঠতি ধনীদের এলাকা।

সাগরিকা এখানকারই মেয়ে। অথচ তাকে প্রথম দেখতে আমার তেইশ বছর বয়েস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এটা খুব অবাক লাগে ভাবতে। সে যে তেমন কিছু অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে, তা নয়। অথচ তার চেহারায় কী একটা আছে, ভিড়ের ভেতর সবার আগে তার ওপরই চোখ পড়ে যায়।

ব্যাপারটা আমারই দেখার ভুল হতে পারে। কিন্তু এই মুগ্ধতার অর্থ কী? আমি নিশ্চয় মনে মনে ওর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। ওকে দেখলেই মনে হত, পৃথিবীতে এখনও প্রচুর ভালো ভালো জিনিস

আছে। ক্ষুধার্তদের মিলিয়ে দেবার মতো আছে এখনও প্রচুর খাদ্য, পরার মতো অসংখ্য পোশাক-আশাক, বাস করার মতো ছাদে ঢাকা ঘর। একদিন সকালে পোস্ট অফিসের রাস্তায় দেখা হলে সাগরিকা হেসে বলেছিল, 'কেমন আছেন'—অমনি চারদিকে হাততালির শব্দের মতো লক্ষ লক্ষ ফুল ফুটে গেল। পাখিরা ডাকতে লাগল। প্রজাপতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে লাগল। ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইলাম। তখন ও ফের বলল, 'কী? চিনতে পারলেন না বুঝি ?'

বললাম, 'খুব ভালো আছি। আপনি ভালো তো?'

সাগরিকা বলল, 'এ কী! আবার আমায় 'আপনি বলছেন?'....

একটু পরে পোস্টাপিসে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করলাম, আমার এই চাকরিটা হয়েই যাবে। কিংবা ঠিক এটা যদি নাও হয়, অন্য একটা হয়ে যাবে।

নীলম—আমার বন্ধু সে, বলত, 'গুঁফোকম্‌লার মেয়ের সঙ্গে কী প্রেম করছিস দীপু? খুব সাবধান। বড্ড লেজে খেলানো মেয়ে। পঞ্চাশ জনকে গঙ্গায় ছুঁড়েছে ইতিমধ্যে।'

তারপর তো সাগরিকা চলে গেল কলকাতায়। শুনলাম এম. এ. পড়তে গেছে। আমি টেনে-টুনে বি. এ. পাস ছেলে। আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে শিক্ষাগত যোগ্যতাও আমার কাছে চাকরির দরখাস্তের ফরমে 'এসেনশিয়াল' মার্কা কলামটার মতো নিচে লেখার বিষয়। কিছুদিন থেকে দেখছি সাগরিকাকে। মেধাবী মেয়ে। কিসে যেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। শুনছি গার্লস কলেজের লেকচারার হয়ে যাচ্ছে শিগ্‌গির। দূর থেকে দেখলে এড়িয়ে চলি তাকে। নিজের—আর কিছু না, 'শিক্ষাগত যোগ্যতা' ব্যাপারটাই এখন আরও ছোট করে দিয়েছে, আমায়। কারণ আমি বুঝতে পারি, প্রেমের ব্যাপারে অর্থনীতির সূত্র অনেক সময় ঠুঁটো হলেও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে দেখেছিও হতে —সিনেমায় নয়, এই শহরের বাস্তব জীবনেই—কিন্তু একটা এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে, যে শিগ্‌গির অধ্যাপিকা হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে বি. এ.-তে টেনেটুনে পাস এবং বেকার ছেলের প্রেম—ভাবলেই হাসি পায়। কোন গাধাও এমন কিছু আশা করে না।

চকবাজারের মোড়ে, যেখানে চৌমাথার কেন্দ্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি রয়েছে, বৃত্তাকার রেলিঙে হেলান দিয়ে একদিন দুপুরে সিগারেট টানছিলাম। চড়া রোদে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানার কোন মানে হয় না। অথচ খাওয়ার পর সিগারেট কিনতে এসে এমন একটা ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসল। তারপর শুনি, 'আরে। দীপুবাবু যে।' তাকিয়ে দেখি রঙিন ছাতির তলায় সাগরিকা। খুব লজ্জায় ফেলে দিল দেখছি। আমার পরনে ময়লা পাজামা, গায়ে তেমনি একটা সস্তা পাঞ্জাবি, পায়ে ছেঁড়া চপ্পল। একটু হেসে বললাম, 'ভালো তো?'

সাগরিকা বলল, 'রোদে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

'কিছু না। কোথাও চললেন?'

'আগে আমায় তুমি বলতেন কিন্তু!'

'তাই বুঝি ? ভুলে গেছি।'.....

স্বীকার করছি, এমন করে কোন মেয়ে 'তুমি' বলতে চাইলে কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদয়ঘটিত কোমল কিছু সম্ভাবনা জেগে ওঠে। কিন্তু সাগরিকার বেলায় এ কিছু নতুন নয়। যখন ওকে তুমি বলতাম, তখনও প্রেমের দশমাইল দূরত্বেও সে ছিল বলে মনে হয়নি। একতরফা প্রেমের পরিণতি সব সময় এ রকম অভিমানী ঔদাসীন্য—যেন 'আর একবার ডাকিলেই যাই'।

আমি রেলিং ছেড়ে নিচে নামলাম। খুব ব্যস্ততার ভঙ্গিতে পা ফেলে ফের বললাম, 'আচ্ছা চলি পরে দেখা হবে। কেমন!'

সাগরিকা নিশ্চয় অবাক হল। ডাকল, 'শুনুন দীপুবাবু!'

আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। ঘুরে বললাম, 'কিছু বলছেন—সরি, কিছু বলছ?'

ও হাসল। 'আপনি কি কোনো কারণে রাগ করে আছেন আমার ওপর?'

'না তো। কেন ওকথা মনে হচ্ছে তোমার?'

'হচ্ছে।' সে মুখ টিপে একটু হাসল।

ভরাট গলায় বললাম, 'আজকাল পৃথিবীর কারুর ওপর আমার রাগ হয় না। তারপর জোরালো ধরনের হাসলাম। 'সব্বাইকে আমি আগাম ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আমার কী অবস্থা জানো? হাঁটু গেড়ে বসে সবসময় বরং নতজানু প্রার্থনা.. '

সাগরিকা পা বাড়িয়ে বলল, 'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

একটা বাড়ির উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে আসা কী একটা গাছের ছায়া রাস্তার খানিকটা ঢেকেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল, এতক্ষণ রোদে দাঁড়ানোর সুফলটা হাতে-নাতে পেয়ে যাচ্ছি। আমার প্রায়ই মনে হয়, আগে থেকে সাজানো স্থান পাত্র-পাত্রী ঘটনার মধ্য দিয়ে সময়ের পথে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে—তার নিজের কিছু করার নেই। ভবিষ্যৎ যেন ঠিক করাই আছে। এই যে সাগরিকা আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, এও আমার বা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার যেন বাইরে।

দার্শনিক উদাসীনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমার কিছু হয়নি, সাগরিকা! কী আর হবে নতুন করে?' বলে মুখ উঁচু করে সিগারেট টানতে থাকলাম।

সাগরিকা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, চলি।'

সে একটা চলন্ত রিকশো দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসল। তারপর হুডের পেছনকার পর্দা তুলে ফের আমাকে দেখে নিয়ে হাসিমুখে একটা ভঙ্গি করল। অর্থাৎ 'চলি!'

তাহলে দেখা গেল, এই হচ্ছে আগে থেকে সাজানো ভবিষ্যতের একটা অংশ, যা দ্রুত বর্তমান পেরিয়ে অতীতে চলে গেল। বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বেকার গরিব-গুরবো ছেলের প্রেম কিংবা তার উল্টোটা ইতিমধ্যে বস্তাপচা মাল হয়ে গেছে ভাবনাযোগ্য বিষয় হিসেবে। তাছাড়া এটা সিনেমায় গল্পে উপন্যাসে এবং বাস্তব জীবনে বহু-পরীক্ষিত ব্যাপার। আমার কথাটা হল, অ্যাকাডেমিক শিক্ষার ব্যবধান থাকলে কী ঘটতে পারে—এটা নিয়ে এখনও ভাবা চলে। কোন শিক্ষিতা গৃহকর্ত্রী তাঁর নিরক্ষর চাকরের প্রেমে পড়তেই পারেন। হয়তো যৌন অতৃপ্তিও এক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর হতে পারে। কিন্তু একজন এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে এবং আমার বেলায় কী ঘটতে পারে?

মাথায় একটা জেদ চেপেছে পরীক্ষা করে দেখার। অথচ ভরসা হচ্ছে না। রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়, কালচার নামে একটা ব্যাপার তো আছে। সেটা অবশ্যই অ্যাকাডেমিক শিক্ষাব বাইরের জিনিস। কালচার একটা রফা নিশ্চয় করে দিতে সক্ষম। কিন্তু মুশকিল হল, আমার যে কালচারই নেই! বই পড়লে হয়তো কালচার মেলে। বইপড়া আমার চক্ষুশূল। আমার কালচার নিজের মনগড়া এবং তা ভীষণ আনকালচার্ড, ক্ষয়াটে, বিষণ্ণ, জন্ডিসগ্রস্ত হলুদরঙের বস্তু।

সেই ঘটনার কদিন পরে দিবাস্যারের মেয়ে ঝুমের সঙ্গে নতুন করে আলাপ হয়েছিল। ওর বেলায় দেখলাম আমি কত নিঃসঙ্কোচ হতে পারছি। ওর সঙ্গে সন্ধ্যার পরও কতক্ষণ গল্প করলাম। ওকে বানিয়ে-বানিয়ে কত ভূতের গল্প শোনালাম। ওর মধ্যে বালিকাদের অন্যমনস্কতা আর কৌতূহল দেখে খুব ভাল লাগছিল। আসলে ঝুম ও আমার গোত্র বা বর্ণ এক। শ্রেণীচরিত্র বলতে যা বোঝায়, তাও এক। তাই দুজনেই দ্রুত ঘনিষ্ঠ হতে পারি। সাগরিকার বেলায় তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় বলেই জেদ। হাতে খরচ করার মতো অঢেল সময় থাকলে কোমর বেঁধে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া যায়। কদিন থেকে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছিলাম এ রাস্তা থেকে সে রাস্তা হয়ে হাইওয়েতে। কমলাকান্তের পেট্রল পাম্প আর গ্যারেজের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য আর দেখাই হচ্ছিল না সাগরিকার সঙ্গে।

আজ বিকেলে ফের গিয়ে পড়লাম দিবাস্যারের পাল্লায়। হাতে একটা লাঠি নিয়েছেন এতদিনে। চেহারা আরও খারাপ হয়ে গেছে। দেখে চোখ নাচিয়ে হাসলেন। 'কী হে? এদিকে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছ! দলে ভিড়ে গেছ বুঝি?'

'কী যে বলেন স্যার!'

'শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।' পেট্রল পাম্পের দিকটায় চোখের ইশারা করে বললেন, 'আসল ঘুঘু কে, আশা করি, তাও জেনে গেছ?'

বুঝতে না পেরে বললাম, 'আজ্ঞে? কার কথা বলছেন?'

দিবাস্যার ফিস-ফিস করে বললেন, 'কাকেও বোলো না। গুঁফো কম্‌লাই নাটের গুরু। রাজ্যের ওয়াগনব্রেকার পুষে রেখেছে।'

দিবাস্যারের মাথায় গণ্ডগোল সত্যি হয়েছে। কথাটা এড়িয়ে বললাম, 'স্কুল করছেন তো স্যার?'

'না করার কী আছে? তবে ....' থেমে নাক চুলকে উনি আমার হাত ধরে টানলেন। 'এস—কিছুদূর ঘুরে আসি। স্বাস্থ্য ভাল হবে।'

উত্তরমুখী হয়ে হাঁটছিলাম রাস্তার ধার ঘেঁষে। বড় বড় ট্রাক যাতায়াত করছে। ধুলো উড়ছে। আজ বিকেলে বড় বেশি হাওয়া দিচ্ছে। দিবাস্যার বললেন, 'জানো? আজ আমাকে ক্লাস করতে দেয়নি। কদিন থেকে ছুটি নিতে বলছিল। আজ বলল, কিছু ক্ল্যারিকাল কাজ জমে আছে। যদি একটু হেল্প করি, ভাল হয়। বুঝলাম, জল অনেকদূর গড়িয়েছে। দয়া করে ছাঁটাই করবে না। তবে আর ক্লাস করতে দেবে না।'

'সে কী! কেন?'

'প্রসূনকে চেনো তো! তুমি চিনবে না। সম্প্রতি এসেছে। বর্ধমানের ছেলে। আমায় খুব ভক্তি-টক্তি করে। সে চুপিচুপি সব জানাল। আমি নাকি আবোল-তাবোল পড়াই। ছাত্রদের কেউ-কেউ নালিশ করেছে। সেক্রেটারির কানেও গেছে। যাক্ গে, আমার লবডংকাটি।'

দিবাস্যার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। ....'আমিও ওয়াগনব্রেকার হয়ে গেছি। বুঝতে পারলে কিছু?'

'না স্যার।'

'বুঝবে। তুমিও শিগগির ওয়াগনব্রেকার হয়ে যাও।' চাপা গলায় বললেন দিবাস্যার। কলকারখানা এখান-ওখান থেকে প্রচুর ওয়াগন আসছে। অসংখ্য। সারারাত তুমি শব্দ শুনতে পাবে কান পাতলে। ঘড়্-ঘড়্ ..... ঘটাং ঘটাং .... ঘট্ ঘটাং। শুধু চাই একটা বস্তু হাতুড়ি। ব্যস! তারপর তুমি রাজা। বুঝলে কিছু?'

'পারছি স্যার।'

'পার নি।' দিবাস্যার শক্ত মুখে বললেন। 'রাশীকৃত চোখ ঝলসানো পণ্যে ঠাসা একেকটা ওয়াগন। মানুষের সভ্যতার সেরা ফসলে ভরা। শহরে-বন্দরে খালাস হচ্ছে। চলে যাচ্ছে দোকানে-দোকানে। তুমি খামোকা হ্যাংলার মতো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ। কী পাচ্ছ? লবডংকা। নেড়ি কুকুরের মতো জিভ চাটছ।'

অগত্যা বললাম, 'ঠিক বলেছেন স্যার!'

'কচু বুঝেছ! সভ্যতার ইতিহাস এই ওয়াগন চলাচলের ইতিহাস আর ওয়াগন ব্রেকারদের ইতিহাস। তুমি গিবনের 'ডিক্লাইন অ্যান্ড কল অফ দি রোমান এম্পায়ার' পড়েছ কি? পড় নি। ইস্কুলের মাস্টাররাও পড়ে না। কী লাভ? আমি পড়েছিলাম বাতিকগ্রস্ত হয়ে। তার মানে টানা বছরের পর বছর ইতিহাস পড়াতে গিয়ে ইতিহাস আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। তখন ইচ্ছে হত, মূল বইগুলো পড়ে ফেলি। আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরিটা উনিশ শতকে সায়েব ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে গড়া। এখানে যা সব বই আছে, কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতেও পাবে না।.... '

এভাবে দিবাস্যার অনর্গল শিক্ষকসুলভ কথা বলতে থাকলেন। উনি এত সব বড় ব্যাপারে মাথা ঘামান, জানতাম না। জ্ঞানী মানুষ বলেই মানতে হয়। কিন্তু আমার অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয়। কাঁধে হাত রেখে হাঁটছেন। কেটে পড়ার সুযোগ পাচ্ছি না।

'—ভ্যান্ডালদের কথা বলছিলাম। সব সভ্যতা ভ্যান্ডালরাই ভাঙে। রোমানরা সব সভ্যতা গড়ে, ভাঙে ভ্যান্ডালরা। তবে সব সময় যে ওরা বাইরে থেকে আসে তা নয়, সভ্যতার ভেতর থেকেই গজায়। জীবনের বীজের ভেতর মৃত্যুর বীজের মতো। তুমি বলবে একালের সভ্যতা পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো আর সব প্রাচীন সভ্যতা ছিল নিছক স্থানিক—একটা নির্দিষ্ট স্থানের পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কেমন তো? কিন্তু এর বয়স মেরে কেটে তিনশো বছরও হয়নি। ইতিহাসের বিরাট পটে এ তিনশোটা বছর মহাসমুদ্রে তিন ফোঁটা জল মাত্র। এর ভেতর ইতিমধ্যে ভ্যান্ডালরা জন্মে গেছে। ভাঙচুর শুরু হয়েছে। কান পাতলেই শুনবে ভাঙার শব্দ। ধসে পড়ার শব্দ। তুমি বলবে বিপ্লব! কারণ তুমি অন্ধ! তুমি

দেখতে পাচ্ছ না ওয়াগনে করে এবার পাঠানো হচ্ছে ভয়ংকর সব মারণাস্ত্র। ওয়াগনগুলো মিলেমিশে আছে। চোখ ঝলসানো সুন্দর সুন্দর পণ্যের ওয়াগনের ঠিক পেছনের ওয়াগনটাই যে নিউক্লিয়ার বোমায় ভর্তি নয়, কেমন করে জানবে? সভ্যতার ইতিহাসে এটাই নিয়ম। কোন কোন ওয়াগনে থাকে সাংঘাতিক ধ্বংসের অস্ত্র। জীবনের সঙ্গে জোড়া মৃত্যুর মতো। আর জীবনমৃত্যুময় দীর্ঘ এক মালগাড়ি চলতে থাকে ঘড় ঘড় .... ঘট্ ঘটাং ... ঘট্ ঘটাং....... ঘট্ ঘটাং .....।'

'বড় ভয়ের কথা স্যার! সুযোগ পেয়ে বললাম। 'তাহলে তো দেখে-শুনে ওয়াগন ভাঙা দরকার।'

দিবাস্যার কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে ফের নাক চুলকে বললেন, 'সে তোমার বরাত বাপু! সে হচ্ছে নিয়তি। একটা ওয়াগন ভেঙে হয়তো দেখলে স্রেফ ভূষির বস্তা। অন্যটায় হয়তো দামী কলকব্জা। রিস্ক তো নিতেই হয়। তবে আগে থেকে খোঁজ-খবর নেবারও ব্যবস্থা আছে বৈকি। তুমি গুঁফোকম্লাকে ধরো গিয়ে। ও ব্যাটা সব খবর রাখে। ওর লোক আছে নানা জায়গায়।'

ওঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বললাম, 'এবার ফেরা যাক্, চলুন।'

উনি লাঠির ডগা দিয়ে বাঁদিকের জঙ্গলটা দেখিয়ে বললেন, 'আমি ওখানটায় যাব। ওই যে চুড়োমতো দেখছ—ওটা শিবমন্দিরের ধ্বজা। গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাট আছে। খুব নিরিবিলি জায়গা। তুমি এবার এস।'

বলে উনি শুকনো নয়ানজুলি পেরিয়ে চষাজমির ওপর দিয়ে চলতে থাকলেন। আমি ফিরে এলাম হাইওয়ে ধরে। দিবাস্যার শিগ্গির হয়তো পাগল হয়ে যাবেন! ঝুমের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সাগরিকার আশা ছেড়ে দিলাম এবেলার মতো। ঝুমদের বাড়ির দরজায় ব্যস্ততা দেখিয়ে কড়া নাড়লাম। ঝুম দরজা খুললে ব্যস্ততা দেখিয়েই বললাম, 'স্যারের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। একটা ব্যাপারে তোমাকে বলা জরুরি মনে হল, ঝুম। আমার ধারণা, ওঁর মানসিক গণ্ডগোল .....'

ঝুম বিরক্ত মুখে বলল, 'আঃ! ভেতরে এস না।' .....

ঝুম

দীপঙ্করের এই একটা স্বভাব লক্ষ্য করছি। খুব সহজে এবং ঝটপট সে সবকিছুর ওপর একটা ধারণা গড়ে নেয়। সহজে সে অবাক হয়। চমকে ওঠে। হয়তো প্রেমেও পড়ে যায়।

তবে স্বীকার করছি, এজন্যই ওকে হয়তো ভালও লাগে। স্কুলে পড়ার সময় তো ভারি মুখচোরা লাজুক ছেলে ছিল। এখন ওর বয়স কত হবে? আটাশ-উনত্রিশ হওয়া উচিত—আমার যখন পঁচিশ হয়ে এল। এখন সে খুব স্মার্ট হবার ভান করে ভারি-ভারি কথা আওড়ায় সবজান্তার মতো। আবার হঠাৎ খুব হাল্কা, হ্যাংলা, পাগলাটে হয়ে পড়ে। বুঝতে পারি, এটাই তার আসল চেহারা। তার দাড়ি রাখাটা তো ছদ্মবেশ ধারণ।

বাবার মানসিক গণ্ডগোলের খবর নিয়ে সেদিন খুব ব্যস্তভাবে এসেছিল দীপঙ্কর। আমার ভাবভঙ্গি দেখে শেষে দমে গেল। বাবার বাইরে ও ভেতরে দুরকম চেহারা থাকা স্বাভাবিক—সব মানুষেরই তাই থাকে। স্কুলমাস্টার বাবা এবং এই বাড়ির গৃহকর্তা, অভিভাবক ও আমার জন্মদাতা বাবা নিশ্চয় দুই মেরুর মানুষ ছিলেন। আসলে হয়েছে কী, বাড়ির ভেতরকার বাবা আমার মায়ের মৃত্যুর পর বাইরেকার স্কুলমাস্টারের চেহারাকে আক্রমণ করেছেন। তার ফলটা নিশ্চয় ভাল হয়নি। স্কুলে ওঁকে পড়ানোর বদলে কেরানীগিরি দেওয়া হয়েছে দয়া করে। বাবা আমাকে কিছু বলেননি। প্রসূনবাবু বলে গেলেন কাল।

প্রসূনবাবুও দীপঙ্করের মতো বাবার মানসিক গণ্ডগোলের কথা তুলেছিলেন। ওঁকে বললাম, 'বাবার একটু পাগলামি বরাবর আছে। মায়ের মৃত্যুর পর একটু বেড়েছে। ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রসূনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'শুনলাম, শহরের যুবকদের ধরে-ধরে প্ররোচনা দিয়ে বেড়াচ্ছেন—ওয়াগনব্রেকার হয়ে যাও সবাই। ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

চমকে উঠেছিলাম প্রচণ্ডভাবে। দ্রুত সামলে নিয়ে বললাম, 'ওই যে ঝিলের ওপাশেই রেল-ইয়ার্ড। প্রায় রাত্তিরে গণ্ডগোল হয়। বোমবাজি আর গুলি। একে তো ঘুম কম, তার ওপর ওইসব উপদ্রব। রাগ করে বলেন আর কী!'

'আচ্ছা!' প্রসূনবাবু উদ্বিগ্ন মুখ করে বললেন, 'তাই আমাকে মাঝেমাঝে বলতেন, শহরটা ওয়াগনব্রেকারদের হাতে চলে যাচ্ছে।'

প্রসূনবাবুর চেহারা ও ভঙ্গিতে মাস্টার-মাস্টার ছাঁদ। অতিমাত্রায় ভদ্রলোক। চোখে-চোখে তাকাতে পর্যন্ত পারেন না। বাবা একদিন ওঁকে ছুটির দুপুরে নেমন্তন্ন করেছিলেন খেতে। তারপর কখনও-সখনও দৈবাৎ এসে পড়েন। বাবার সহকর্মী বলে ভীষণ খাতির করি। দীপঙ্করের চেয়ে বয়সে একটু ছোট বলেই মনে হয়। ফর্সা রঙ, আগের দিনের মতো ব্যাকব্রাশ করা চুল এবং প্রচণ্ড পাওয়ারের চশমা চোখে। বাবার কাছে শুনেছি, জুয়েল ছেলে! চান্স পেলেই কলেজে চলে যাবেন। স্কুলে নেহাত দায়ে পড়ে জুটেছেন। আমার ভক্তি হয় আর না হয়।

দীপঙ্কর—পড়াশোনার কথা ধরছি না, সব ব্যাপারে ওঁর বিপরীত চরিত্র। দীপঙ্করের চুলের ছাঁদে এখনকার মাস্তানী আছে। ময়লা কোঁচকানো পোশাক পরে থাকলেও শহরের নব্যযুবকদের ভিড়ে মিশে যাওয়ার মতো চেহারা। বাইরে খুব একটা বেরোই না বা মেলামেশা কম করি বটে, ঘরের জানলায় বসে রাস্তার দিকে সারাক্ষণ-তাকিয়ে থাকি বলে সময়ের হালচাল টের পাই। কত দ্রুত প্রতিদিন যেন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আমাদের এই শহরটা বদলে যাচ্ছে। এবেলা-ওবেলা কোত্থেকে বেরিয়ে পড়ছে নতুন-নতুন ছাঁদের চেহারা। নতুন হাবভাব। কম বয়সী মেয়েরাও দেখতে পাই ছেলেদের হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা কত বেপরোয়া, কত নির্লজ্জ!

দীপঙ্করের সঙ্গে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করলাম। দীপঙ্কর বলল, 'রিফ্লেকশন আর কী!'

'কিসের?'

'কলকাতার। কলকাতা ছড়িয়ে পড়ছেও বলা যায়।' সে পকেট থেকে দোমড়ানো একটা সিগারেট বের করে দেশলাই চাইল। এনে দিলে ফের বলল, 'তো ঝুম মন্দ কী? স্বাভাবিকতাকে জোর করে আটকে রাখা কি ভাল হয়েছে এতদিন? এই যে তুমি আর আমি কথাবার্তা বলছি, বাড়িতে আর কেউ নেই—এটাও কি সম্ভব ছিল এখানে কোনদিন? শুধু হাত ধরে হাঁটলেই দোষ হবে কেন? দুটো হাতই যখন মানুষের!'

'ভ্যাট্ ! আমি কিন্তু মরে গেলেও পারব না।'

'তুমি বড্ড সেকেলে, তাই।'

'আমায় তুমি বলো, যার-তার সঙ্গে হাত ধরে হাঁটব কেন?'

দীপঙ্কর হাসল। 'যার-তার সঙ্গে কেউ কি হাত ধরে হাঁটে?'

মুখ নামিয়ে লজ্জাটুকু সামলে নিলাম। তারপর বললাম, 'তুমি নিশ্চয় কারুর হাত ধরে হাঁটতে পারো?'

'খুব পাবি—যদি সে আমার প্রেমিকা হয়।'

'রাস্তায়?'

'হুঁউ—রাস্তায়।'

'এই শহরের?'

'এই শহরের।'

'থামো! খুব বাহাদুর! খালি বড়-বড় কথা মুখে।'

দীপঙ্কর মুখে হঠাৎ দুঃখ ফুটিয়ে বলল, পারি—কিন্তু আমার যে প্রেমিকাই নেই। আসলে কি জানো? চাকরি-বাকরি না থাকলে ওসব হয় না। চাকরি বলেই বলছি—কথাটা হচ্ছে আর্থিক একটা স্টেবিলিটি।'

'ভ্যাট্। অত হিসেব করে কেউ প্রেম করতে যায় না।'

'আলবাত যায়।'

'যায় না।'

'বেশ তাই হল। দীপঙ্কর হাসতে লাগল।' 'আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বললাম। তুমি নিশ্চয় তোমার এক্সপিরিয়েন্স বলছ।'

সন্ধ্যা থেকে হাতে টর্চ নিই। বারান্দায় টিমটিমে হেরিকেন জ্বলে। যখন-তখন বিদ্যুৎ চলে যায়, যখন-তখন ফিরে আসে। কেউ যেন আলো নিয়ে মজার খেলা খেলতে বসে রাতের মতো। এ রাতে জ্যোৎস্না ছিল। বোশেখ গেছে নিঃশব্দে। দিনমানে লু হাওয়া বয়েছে। এখন একটু কমেছে। গরমটা আর টের পাচ্ছি না। বিদ্যুৎ নিভলে হেরিকেনের দম বাড়াতে গেলাম। দীপঙ্কর বলল, 'থাক না বেশ লাগে জ্যোৎস্নাটা।'

'আমার যে বড্ড ভূতের ভয়।' উঠোনের রোয়াকে ফিরে এলাম আবার। 'তুমিই বলেছ, আলো থাকলে ভূত আসে না।'

'ভূত!' দীপঙ্কর খুব হাসল। তারপর বলল, 'আর একটা সিগারেট থাকলে ভাল হত। দেখি তোমার টর্চটা।'

টর্চ নিয়ে সে পায়ের কাছটা খুঁজে তোলপাড় করল। তারপর সিঁড়ির ফাটল থেকে অতি কষ্টে পোড়া সিগ্রেটের টুকরোটা বের করল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বুঝতে পারিনি ও কী খুঁজছে। 'ছিঃ। ওটা তুমি আবার টানবে? নোংরায় পড়েছিল—তাছাড়া জুতো দিয়ে তুমি ওটা ঘষেছ দেখেছি। ওটাকে মুখে ঠেকাতে ঘেন্না হচ্ছে না?'

দীপঙ্কর কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'কী করব? আর তো নেই সঙ্গে। একটা দুটো কিনি—পাছে....'

ওর কথা কেড়ে বললাম, 'একটু থামো। দেখছি।'

সে তাকিয়ে রইল। আমি বাবার ঘরে ঢুকলাম। বাবা কদাচিৎ কেউ অফার করলে সিগারেট খান। কখনও ওঁকে পয়সা খরচ করে কিনে খেতে দেখিনি। কদিন আগে বাবার বিছানায় বালিশের পাশে একটা সিগারেটের প্যাকেট দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'পান্না জোর করে দিল। না নিলেও বিপদ!'

পান্না কলোনিপাড়ার ছেলে। ওকে দেখলে আমার গা ছমছম করে। ওর চেহারায় কুৎসিত একটা নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, কিছুদিন আগে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘুটে গেছে। এক সকালে বাবার ঘর সাফ করতে খাটের তলায় দেয়াল ঘেঁষে একেবারে কোনার দিকে দুটো কাঠের বাক্স আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিলাম। বাবা বল্‌লেন, 'চুপ করে থাক্। প্রাণে মেরে দেবে ওরা। শিগ্‌গির নিয়ে যাবে বলেছে।' বুঝতে পেরেছিলাম, খুব নিরাপদ একটা আশ্রয় বের করেছে পান্নারা। কেউ ভুলেও ভাবতে পারবে না স্কুলটিচার ভাল মানুষ ন্যালাভোলা দিবাকর রায়ের ঘরে চোরাই মাল লুকোনো আছে।

দু-দিন পরে অনেক রাতে ওরা এসে কাঠের বাক্স দুটো বের করে নিয়ে গেল। ওই দুটো দিন আমার কীভাবে যে গেছে বলার নয়। একটু শব্দে চমকে কান পেতেছি—এই বুঝি পুলিশ এল। বাবাকে কী বলব? আমি জানি, বাবা ওদের যেচে পড়ে ডেকে আনেননি। নিরীহ দুর্বল মানুষ বলে ওরা সুযোগ নিচ্ছে।

যাবার সময় পান্না দাঁত বের করে আমার হাতে টাকা গুঁজে দিতে এসেছিল, দ্রুত ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিলাম। সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'টাকা নাওনি তো?' বাবা বললেন, 'মাথা খারাপ?' কিন্তু সিগারেটের প্যাকেটটা জোর করে গছিয়ে দিয়েছে দেখছি।

খুলে দেখি, প্যাকেটটা তেমনি আছে। বাবা খোলেননি।

এখন সেটা দীপঙ্করকে দেওয়া যায়। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলব, ফেলে দিয়েছি।

দীপঙ্কর সিগারেটের প্যাকেটটা পেয়ে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বলল, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ যে আস্ত একটা প্যাকেট।' সে জ্যোৎস্নায় ওটা তুলে দেখতে দেখতে মুহুর্মুহু যেন শিউরে উঠতে থাকল। 'জীবনে কখনও কি পুরো এক প্যাকেট সিগারেটের মালিক হতে পেরেছি—মনেই পড়ে না। দামের কথা বলছি না। কেমন একটা অপরাধবোধ থেকে গেছে এর পেছনে। আমার মতো

লোকের পক্ষে এই বিলাসিতা কি সাজে?' সে হঠাৎ হেরিকেনের কাছে চলে গেল! তারপর প্যাকেটটা খুঁটিয়ে দেখে ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে বসল।

'কি হল? খাবে না?'

'ঝুম, এটা ভীষণ দামী সিগারেট দেখছি। বিলিতী জিনিস।'

'পুড়িয়ে যা ছাই করে দেবে, তার জন্য অত মাথাব্যাথা কিসের? দিলাম, খাও।'

'এ আমি প্রাণ গেলেও খেতে পারব না।'

'তাহলে ফেরত দাও।'

'দিচ্ছি। এক মিনিট। একটু ভেবে নিই।'

'না—ভাববার জন্য দিইনি। ফেরত দাও।'

দীপঙ্কর শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে বলল, 'এ তুমি কোথায় পেলে ঝুম?'

'যেখানেই পাই। তোমার জেনে দরকার কী?'

'স্যারকে সিগারেট খেতে দেখিনি কখনও।' দীপঙ্কর আস্তে বলল। 'তুমি কোথায় পেলে ডানহিল সিগারেট?'

এতক্ষণে টের পেলুম, ভুল করেছি। ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াচ্ছে। ওকে একটা কৈফিয়ত না দিলেই নয়। রাগের ভঙ্গিতে বললাম, 'তুমি তো ভারি আশ্চর্য মানুষ দীপুদা! যাই বলো তুমি, এতে শেষ পর্যন্ত বাবাকেই ছোট করা হচ্ছে কিন্তু। কেন? যে জিনিস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, বাবা কি ঝোঁকের বশে কিনে আনতেও পারেন না? তাছাড়া বাবা সিগারেট একেবারে না খান, তাও নয়। তুমি একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাজে মাথা ঘামাচ্ছো। কেন তুমি এত ....'

আমাকে থামিয়ে দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যস, ব্যস! বুঝে গেছি। স্যার বড্ড খেয়ালি মানুষ কিন্তু।'

সে ভক্তি ও নিষ্ঠায় পুজোআচ্চা কবার মতো একটা সিগারেট ধরাল। তারপর প্যাকেটটা ফেরত দিয়ে বলল, 'এ জিনিস আমার কাছে দেখলে লোকে সত্যি ভাববে আমি ওয়াগনব্রেকার হয়ে গেছি। তুমি যত্ন করে রেখে দাও। মাঝে মাঝে এসে চাইব। তবে তুমি কি সিওর যে স্যার এগুলো খাবেন না?'

'জানি না। কদিন থেকে দেখছি বিছানায় রেখে দিয়েছেন।'

'তাহলে খাবেন শিওর।' দীপঙ্কর লম্বা সিগারেটটা খুব উপভোগ করছিল। ফের বলল, 'কিন্তু এই যে একটা কমে গেল, জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?'

খাপ্পা হয়ে ওর হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা কেড়ে নিতে গেলাম। ওকে ঠাস ঠাস করে মারতে ইচ্ছে করছিল। ও হাতটা পেছনে লম্বা করে সিগারেটটা বাঁচা[illegible] গেল এবং আমি ওর ওপর পড়ে গেলাম।

কিন্তু অবাক লাগল, দীপঙ্কর কোন সুযোগ নেবার চেষ্টা করল না—যে ভয়টা সহজাতবোধে সঙ্গে সঙ্গে মনে ঝিলিক দিয়েছিল। দীপঙ্কর আস্তে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তুমি ভীষণ ভারি তো! তোমাকে রোগাটে দেখায়, কিন্তু ওজন আছে।'

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল বাড়িটা। পাঁচিলের ওপর লতাপাতার ঝালর শব্দ করে কাঁপছিল রাতের বাতাসে। ভিজে, ভারি ক্লান্ত শরীর নিয়ে একটু তফাতে বসে পড়লাম। প্যাকেটটা আমার মুঠোয় ধরা ছিল। দীপঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আবার একটা প্রচণ্ড রাগ ঠেলে উঠল মাথায়। প্যাকেটটা ওর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। জানলা দিয়ে খানকটা জ্যোৎস্না এসে বিছানায় পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

'ঝুম! ঝুম!' দীপঙ্কর ডাকছিল।

সাড়া না পেয়ে সে দরজায় চলে এল হাতে হেরিকেন। সেটা তুলে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার? হঠাৎ রেগে গেলে যে?'

'জ্বালিও না। এখন যাও।'

'ও। আচ্ছা।'

বাইরে হেরিকেন রাখার শব্দ হল। তারপর ওদিক থেকে তার গলা ভেসে এল। 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও। আমি গেলাম।'

বার দুই ডেকে আমার সাড়া না পেয়ে সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর আমার ভীষণ কান্না পেল।

বুঝতে পারছিলাম না নিজেকে কেন এত ব্যর্থ মনে হচ্ছে। এমন একটা নির্জন বাড়িতে জ্যোৎস্নার রাতে আমার যেন কিছু পাওনা ছিল—পেলাম না। বেঁচে থাকার দীর্ঘ পঁচিশটা বছর আহত সাপের মতো লেজ আছড়াতে থাকল নিষ্ফল আক্রোশে। নিজেকে এমন একলা আর অসহায় কখনও লাগেনি।....

দিবাকর

গুঁফো কমলার সঙ্গে ইচ্ছে করেই ভাব জমিয়েছি। ওর গ্যারেজে একদিন হারাইকে দেখার পর আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, ওই ব্যাটাই রিংলিডার। দিন কতক পরে টোপ ফেললাম যা থাকে বরাতে ভেবে। চুপিচুপি বললাম, 'ভাই কমলাকান্ত, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে।'

গুঁফো বুঝি ভাবল টাকা ধার চাইব। চোখ টেরিয়ে বলল, 'কী? ঝুমের বিয়ে লাগিয়েছ বুঝি?'

'ধুস বিয়ে!' হেসে ফেললাম। 'মেয়েকে স্বয়ম্বরা করে ছেড়ে দিয়েছি। ও কথা নয়।'

গুঁফো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বলল, 'হুঁ—বলো।'

পান্নাদের আমার ঘরে কাঠের প্যাকেট লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা বলে ওর হাবভাব আঁচ করার চেষ্টা করলাম। মহা ঘুঘু! গভীর জলের মাছ! শিউরে ওঠার ভান করে বলল, 'সর্বনাশ! তোমায় ভালমানুষ পেয়ে ওরা দেখছি বিপদে না ফেলে ছাড়বে না। তুমি পুলিশে গেলে না কেন? আমি হলে ব্যাটাদের ধরিয়ে দিতাম।'

'তুমি পারতে ভাই। আমি সামান্য মানুষ। আমি পুলিশে যাই আর ওরা আমার শ্বাসনালী কেটে ফেলে রাখুক। ভন ভন করে মাছি বসুক মুখে। বলছো ভালো!'

গুঁফো গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল, 'হু—ওদের কিছু বিশ্বাস নেই। তোমার কি মনে পড়ছে দিবা? গতবার আবদুলের বাড়িতে রেলব্যাটারি চুরে করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল। আবদুল গোপনে পুলিশকে খবর দিয়েছিল। ব্যাটারিগুলো উদ্ধার হল বটে, কদিন পরে আবদুলকে কালীমাতলার খালে পাওয়া গেল। তুমি যা বলেছ, ঠিক তাই; শ্বাসনালী কাটা। মুখে মাছি ভন ভন করছিল।'

'তাহলেই বোঝো।'

কমলাকান্ত জিজ্ঞেস করল, 'আর কাকেও বলেছ নাকি ব্যাপারটা?'

'তোমার মাথা খারাপ? তুমি বলেই বললাম।'

'উঁহু—আমাকেই বা কেন বললে? এমনি করে আবাব কাউকে বললেই তো বিপদ। বুঝে দেখ দিবাকর।'

নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'বলব না। আমার মরে যাওয়াটা যত দরকার হোক, ওভাবে মরাটা ভারি অসম্মানজনক।'

গুঁফো ফিস ফিস করে বলল, 'একবার যখন চোরাই মাল রাখতে দিয়েছ, তখন ওরা রাখতে আসবে। তখন কী করবে?'

'সেই তোমায় জিজ্ঞেস করছি। কী করব?'

কমলাকান্ত গুম হয়ে কী ভাবল। তারপর বলল, 'তুমি নিরীহ মানুষ। নিরিবিলি জায়গায় থাকো। তার চেয়ে ভাবনার কথা, বাড়িতে একা এক সোমত্ত মেয়ে। তুমি আপত্তি করলে ওরা একটা কিছু করে বসলেই বিপদ। ধরো—কথার কথা বলছি, এই যে তুমি সারাদিন স্কুলে থাকো—তারপর সন্ধ্যা অবদি বাইরে কাটাও। ওদিকে ঝুম একা থাকে।'

এ পর্যন্ত শুনেই বুক কাঁপতে লাগল। বললাম, 'কমলা! এদিকটা আমি সত্যি ভাবিনি। কী করি

বলো তো?'

'একটু ট্যাক্টফুলি ম্যানেজ করা ছাড়া উপায় নেই তোমার।' কমলাকান্ত সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। আঙুল ভর্তি নানা রঙের পাথর বসানো আংটি। সাদা ধপধপে পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম ঝকঝক করছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো দিবা? ওরা আজে-বাজে মাল তোমার বাড়ি রাখতে আসবে না। খুব দামী কোনো জিনিস হলে—তবেই, কারণ তুমি তো ব্যবসায়ী নও। কথার কথা বলছি—ধরো, ওয়াগন ভেঙে সরষের তেলের পিপে, কিংবা খন্দের বস্তা এনেছে। কিংবা ধরো, কোন মেসিনারি এনেছে। এ সব তোমার বাড়িতে সামলানোর স্পেস কোথায়! তারা তখন কোন বিজনেসম্যানের দ্বারস্থ হবে। আজকাল তো আর মরালিটির প্রশ্ন কেউ তোলে না। লোকে জেনে গেছে টাকাই সব।'

'ঠিক, ঠিক।' মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

'কাজেই কম স্পেসে সহজে লুকোনো যায়, অথচ জিনিসটা খুব দামী—এমন কিছু তোমার কাছে রাখতে আসবে।'

'আবার আসবে?'

গুঁফো হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। 'তুমি মাইরি বরাবর নাবালক থেকে গেলে। আমি কেমন করে জানব আসবে না আসবে না? কথার কথাই বলছি।'

'ঠিক আছে। এলে কী করব?'

'অত আমি বলতে পারব না।' গুঁফো রেগে গেল। 'তুমিও জানো ওরা দারুণ ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট। ওদের মাথার ওপর বিরাট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মুরুব্বি আছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম। 'কমলা, ঝুমের মায়ের মৃত্যুর কারণও হয়তো ওরা।'

কমলাও অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

ওকে সেই রাতের ঘটনাটা সবিস্তারে বললাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, ও যদি সত্যি ওদের বস হয়, জানুক কতখানি নিষ্ঠুরতা ওর লোকেরা করে বেড়ায়। আমার মতো মানুষের জীবনটাকে কোথায় এনে ফেলেছে, কমলা বুঝুক। একটা মুমূর্ষু মেয়েকে ভাল ডাক্তার এবং সুচিকিৎসা থেকে ওরা বঞ্চিত করেছে!

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে সিগারেটে একটা টান দিলাম। কমলাকান্ত মুখ তুম্বো করে সহানুভূতি দেখাল। বলল, 'উচিত হয়নি ওদের। তবে ওরা যে তোমাকে রেল-ইয়ার্ড পেরিয়ে যেতে দেয়নি—এটা ঠিক করেছিল। হাঙ্গামার মুখে পড়ে আরও বিপদ ঘটতে পারত। দৈবাৎ গুলি লাগত গায়ে। আফটার অল, তোমার ভালই চেয়েছিল ওরা। তুমিই তো বললে, স্কুলে ওরা তোমার ছাত্র ছিল।'

আরও একটু বসে থেকে উঠে আসছিলাম, কমলাকান্ত ডাকল, 'শোনো দিবাকর!'

'বলো।'

'মেয়ের বিয়ের কদ্দূর কী করলে?'

'কী করব? খোঁজ-খবর করে যাচ্ছি। যদি বা কেউ এসে দেখে যায়, আর খবর দেয় না।'

'দেখতে শুনতে তো ভালই। কেন এমন হচ্ছে বলো তো?'

'আমি কেমন করে জানব?'

'বি. এ. পাস করেছিল না ঝুমু?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলে না কেন? আজকাল চাকুরে মেয়েদের বাজারদর হয়েছে।'

'একটা মাস্টারি পেয়েছিল গতবার। সে একেবারে সেই পদ্মার ধারে পাড়াগাঁয়ে। এদিকে তখন ওর মায়ের অবস্থা শোচনীয়। যায়নি।'

'এবার তো আর সে ঝামেলা নেই। বরং লোকালি একটা কিছু খুঁজে দেখ। পেয়ে যাবে।'

'তুমি দেখে দাও না!'

'বললে যখন দেখব।'

আমি ভালই জানি, কমলা সেই ধরনের লোক—মৃত্যুর সময় যদি কেউ জলের অভাবে ওর পেচ্ছাপ ভিক্ষে করে, কমলা দেবে না। এই যে আমায় সিগারেট অফার করে, তার কারণ কি আমি বুঝি ! ওর সঙ্গে কথা বলে ঠিক বুঝে গেছি, ও ব্যাটাই ওয়াগনব্রেকারদের লিডার।

রাস্তায় যেতে যেতে ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে ওর গায়ে থুথু ছেটালাম। তাতেও রাগ পড়ল না। ওকে দু হাতে তুলে এমন আছাড় মারলাম যে ওর শরীর ছাতু হয়ে গেল। বললাম, 'ওরে গুঁফো! এবার ? এবার ?'

কিন্তু কাউকে মারধর করলে শেষে দেখি আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আহা, মানুষ তো! মানুষের মধ্যে ভালমন্দ দোষগুণ দুই থাকে। কমলা যে এমন হয়েছে, তার জন্যে হয়তো তত দায় নেই। এই যে আমি এমন হয়েছি, তার জন্যে নিজেকেই বা কতটুকু দায়ী করতে পারি? ইচ্ছে থাকলেও তো ভালমানুষ হওয়া যায় না। সমাজের কলকব্জাটা ভারি জটিল। তার চেয়ে বড় কথা, কমলা করতটা কী? গরিব হয়ে থাকাটা তো সম্মানজনক নয়, আদর্শ হিসাবেও কাম্য নয়। সমাজে থরে থরে সাজানো রয়েছে পণ্যসম্ভার—বাঁচার আরাম, স্বস্তি, সুখ। যার বুদ্ধি আছে, সে ভোগ করছে। আমি পারছি না—কারণ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই।

কমলাকান্তকে ক্ষমা করে দিলাম। বেশ করছে। করে চলুক।

শাবাশ গুঁফো! চালিয়ে যাও। ওয়াগন ভাঙো! একটা ওয়াগন, দুটো ওয়াগন, তিনটে ওয়াগন ... ক্রমে ক্রমে একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার ওয়াগন।

ওয়াগনের সারি সাজিয়ে গুছিয়ে মালগাড়ি আসছে ঘটাং ঘট্ দিল্লি থেকে, বোম্বাই থেকে, আসাম থেকে, কলকাতা থেকে ঘটাং ঘট্ ধটাং ঘট্ .... বিবর্ণ, ক্ষয়াটে, তোবড়ানো ওয়াগন। ঝনাৎ ঝনাৎ করে দরজায় হাতুড়ির ঘা। জ্যোৎস্না অন্ধকার, মেঘবৃষ্টি ঝড়ে খালি ঝনাৎ ঝন হাতুড়ির শব্দ। কালো কালো হাত। কালো-কালো ছায়া রেল-ইয়ার্ডে। চুপিসাড়ে। ....

অনেক রাতে মেঘ ডাকছিল। তারপর কেটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। তারপর বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কান পেতে মালগাড়ির শব্দ শুনছিলাম। একটু পরে দরজা খুলে বেরিয়ে ঝুমুকে ডাকলাম। অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া দিয়ে দরজা খুলল। বললাম, 'জানলা বন্ধ করে দে। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে যে!'

ঝুম রাগ করে বলল, 'নিজেও ঘুমোবে না—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। জানলা বন্ধ করা আছে।'

নিজের ঘরে ফিরে দেখি, আমারই বিছানা ভিজছে। মেঝেয় জল গড়াচ্ছে। ঝটাপট দুটো জানলাই বন্ধ করে দিলাম। এত গণ্ডগোল হয়ে যায় কেন বুঝি না। আলো নেভাতে হাত বাড়িয়েছি, আপনা থেকেই নিভে গেল। লোডশেডিং।

একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সেই প্যাকেটটা বিছানা হাতড়ে কোথাও পেলাম না। দেশলাই নেই। অন্ধকারে যতটা পারা যায় খুঁজলাম। নেই। ঝুম কোথাও রেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু ওকে আর ডাকার সাহস হল না। পুরনো আমলের টেবিল ফ্যানটা থেমে গেছে। ঘরে ভ্যাপসা গরম। হঠাৎ ধরা পড়ল, আসলে ওই ফ্যানটাই সারারাত মালগাড়ির শব্দ করে। কী কাণ্ড ! এতদিন বুঝতে পারিনি এটুকু !

দরজা খুলে দিলাম। বারান্দাটা উত্তরে। তাই তত ভেজেনি। দরজার পাশে চেয়ার পেতে বসে রইলাম। ঝড় কমে এল ক্রমশ। বৃষ্টি টিপটিপ করে পড়তে লাগল। গরমটা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। বরং শীত শীত ভাব করছিল। ভাবলাম এবার শোয়া যাক। আর তখনই জানলায় খট্ খট্ শব্দ। প্রচণ্ড একটা গর্জন করে উঠব ভেবে উঠে দাঁড়িয়েছি, শ্বাসনালী কাটা আবদুলকে মনে পড়ে গেল—মুখে ভনভন মাছি। খালের পাড়ে কয়েকটা শকুন।

জানলা খুললে পান্না বলল, 'বিরক্ত করতে আইলাম অসময়ে! এট্টু কষ্ট করতে হবে স্যার। ব্যাবাক ভিজ্যা গেছি।'

'পান্না, কথা শোনো বাবা!'

'পরে যা কবার, কইয়েন। পেছনকার দোরটা এট্টু খোলেন স্যার।'

'কেন আমার ওপর এ জুলুম করছ তোমরা?'

'আহ্! ট্যাম্পার ঠিক নাই স্যার' যা করার পরে কইয়েন।'

কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দিলাম। এবারকার কাঠের প্যাকেটটা বেশ লম্বা। কী আছে ওতে! আমার ঘরে সেবারকার মতো ঢুকে ওটা তেমনি করে রেখে ওরা চলে গেল। খিড়কির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ঝিলের পাশে টর্চের আলো দেখলাম। রেলপুলিশ কি?

সকালে ঘুম ভাঙল ঝুমের ডাকে। বোকার মতো ঘুম এসে গিয়েছিল। স্বপ্নে দেখছিলাম পুলিশ আমায় তাড়া করেছে। ধরতে পারছে না। কারণ আমি পাখির মতো একগাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে বেড়াচ্ছি। কী মজা!

ঝুম ঘরে ঢুকেই আমার খাটের তলায় উঁকি দিল। চুপ করে থাকলাম। ঘরে মেঝেয় কাদা আর জুতোর ছাপ। বারান্দা জুড়ে খিড়কি পর্যন্ত জুতোর ছাপ অনেকগুলো। ঝুম কোন কথা বলল না। কোমরে আঁচল জড়িয়ে কাদা আর ছাপগুলো জল ঢেলে ধুতে শুরু করল।

বললাম, 'আমাদের এখানে থাকা যাবে না। কোথাও চলে যেতেই হবে।'

ঝুম কোন কথা বলল না তবু। নিশ্চয় টের পেয়ে গেছে, যেভাবে হোক আমবা ওয়াগনব্রেকাবদের ফাঁদে পড়ে গেছি।

দীপু

এ কোন নতুন ঘটনা নয়। আমাদের এই শহরে খুন জখম হাঙ্গামা লেগেই আছে। ছেলেবেলায় অবশ্য এত কিছু ঘটতে দেখিনি। মোটামুটি শান্ত আর ভদ্র ছিল বলে মনে পড়ে। এখন দিনে দিনে অবস্থা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যেন। মানুষজনও একেবারে নির্বিকার হয়ে উঠেছে। গা-সওয়া হয়ে গেছে দিনে দিনে।

তাই ঝিলের জলে মুণ্ডুকাটা লাশ দেখতে ভিড়ভাট্টা আদপে হয়নি। আমি গিয়ে দেখি মোহন ধোপা ধপাস ধপাস করে কার একটা প্যান্ট আছড়াচ্ছে পাটে। জিজ্ঞেস করলে একটু হেসে জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

ঝিলটা বেশ বড়ো। এক চক্কর ঘুরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে দেখি, করালী ডোম আর তার ছেলে মন্টু লাশটা তুলেছে। আমার অচেনা এক জেলে হাঁটু দুমড়ে বসে বিড়ি টানছে, তার দুপায়ের ফাঁকে জাল। বুঝলাম, মুণ্ডুটা হাতড়েছে ঝিলের জলে পায়নি।

দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছে। একজন হাড়কুড়ানি মুদ্দফরাস মেয়ে কাঁখে হাড়ে ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে কাপড় মোড়া লাশটার দিকে তাকিয়ে ছিল। থুথু ফেলে চলে গেল। খুব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার।

মন্টুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে—কাব লাশ রে মন্টু?'

মন্টু একটু হেসে বলল, 'কেমন করে বলব বলুন? বডি দেখে কি চেনা যায়?'

করালী চাপা গলায় বলল, 'গুলি খাওয়া বডি বাবু। বুকে জখমি দাগ আছে।'

খুনখারাবি দেখলে আমার মন খাবাপ হয়ে যায়। সারাটা দিন বুকের ভেতর একটা কষ্ট খচ্ খচ্ করে বেঁধে। পৃথিবী আরও নিরানন্দময় হয়ে পড়ে। কী এক আতঙ্ক পেছনে ছায়ার মতো চুপিসাড়ে সারাক্ষণ—এবার কার পালা?

হাতে অঢেল সময়। খরচ না করলেই বিপদ। তা না হলে ঝিলের জলে মুণ্ডুকাটা লাশ দেখতে আসতাম না। ইচ্ছে ছিল, পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ—যা রাষ্ট্রের তরফে করণীয়, খুঁটিয়ে দেখে যাব। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রহরীরা অপমানজনক ভঙ্গিতে বেটনের সাহায্যে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

আনন্দেব চায়ের রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চা খেলাম। ভেতরে বড্ড ভিড় এবং এটা প্রকৃত অর্থে রেস্তোরাঁ বলাই চলে না। মাটির ভাঁড়টা ডাস্টবিনে ফেলে সিগারেট কিনলাম একটা। দড়ির আগুনে সেটা ধরাচ্ছি, কেউ বলল, 'দেখি আগুনটা।' ঘুরে দেখি, লালু।

লালু সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'দীপুদাকে ঝিলের ধারে দেখছিলাম। দেখলেন নাকি বডিটা?'

'না। কাপড়ে ঢাকা ছিল।'

লালুর চেহারায় আগে এমন নৃশংসভাব ছিল না। ওকে ছেলেবেলা থেকে চেনার কারণ, স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। পরে কিছুদিন ওকে সকালবেলায় একটা ছোট্ট পেতলের সাজি হাতে দেখলাম। সাজিতে কিছু ফুল, একটা শাঁখ, একটা ছোট্ট ঘন্টা, কোষা-কুষি, গঙ্গাজলের ছোট্ট ঘটি—এইসব জিনিস থাকত। দোকানপাট খুললেই সে প্রসাদী ফুল বিলিয়ে বেড়াত। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পট্টবস্ত্র, গলায় মোটাসোটা পৈতে, কপালে সিঁদুরের দাগ। পরে লালুকে সাইকেলে চালের বস্তা নিয়ে রাস্তায় ঝুঁকে প্যাডেল করতে দেখতাম। চেহারায় একটা রাগী আর ক্লান্তভাব তখন ফুটে উঠছিল ক্রমশ, এখন সে কী করে, দিবাস্যারের কাছে শুনেছি। শোনার পর তাকে দেখলেই ভয় করে।

আমার কথা শুনে লালু তেমনি ভয় জাগানো চেহারা নিয়ে হাসল। 'আপনি তাও তো কাছ থেকে দেখে এলেন! আমার শালা বডি পড়েছে শুনলেই পা কাঁপে। মাইরি—আপনার দিব্যি!'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। নিজেই যে মূর্তিমান ভয়, তারও ভয় করে নাকি? চালাকি করছে। বললাম, করালী বলল, 'বুকে গুলির জখম আছে। তাহলে মুণ্ডু কাটার মানেটা কী, লালু?'

লালু সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কেমন করে জানব? পুলিশকে জিজ্ঞেস করুন না!'

ওকে আর ঘাঁটালাম না। হাঁটতে হাঁটতে ব্যাপারটা ভাবছিলাম। নিশ্চয় কোন ওয়াগনব্রেকারের লাশ। সেন্ট্রির গুলিতে মারা পড়েছিল। সঙ্গীরা তার মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে ঝিলের জলে ফেলে যায়। বডিটা শনাক্ত করা কঠিন হবে এর ফলে। ক্রিমিন্যালদের সেই চিরাচরিত কৌশল।

দিবাস্যারের সঙ্গে একটা জমাট আলোচনার আশায় দরজায় কড়া নাড়লাম। একটু পরে ঝুম দরজা খুলে আমাকে দেখে কেমন যেন চমকে গেল। আমার চোখের ভুল হতেও পারে। তার মুখের এ গাম্ভীর্য আমি অবশ্য আশা করেছিলাম। সেদিন সিগারেট প্যাকেটটা নিয়ে তার অদ্ভুত আচরণের মানে বুঝতে পারিনি। সমস্যা হল আমি বড্ড ভীতু মানুষ। প্রত্যেককে ভয় পাই। বিশেষ করে ঝুমের হাবভাবে কী যেন একটা প্রিমিটিভ জংলী ধরনের ব্যাপার আছে।

বললাম, 'কী? এখনও রাগ পড়েনি বুঝি?

ভেতর থেকে সেই সময় দিবাস্যারের সাড়া এল, 'কে রে ঝুম?'

ঝুমের পাশ কাটিয়ে ঢুকে গেলাম। আমাকে দেখে দিবাস্যার ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক তাকালেন। 'ও দীপু? এস।'

'স্কুলে যাবেন না স্যার?'

'শরীরটা ভাল নয় হে। এস, গল্প করা যাক্।'

উঁচু বারান্দায় নড়বড়ে একটা চেয়ার টেনে দিবাস্যার বসলেন। একটু তফাতে মোড়ায় বসে বললাম, 'ঝিলে একটা মুণ্ডুকাটা বডি পাওয়া গেছে শুনেছেন স্যার?'

'কখন শুনেছি।' দিবাস্যার খুব বিমর্ষভাবে বললেন। 'ভোরবেলায় একটু হঁাটাচলা ধরেছি ইদানিং। হাঁটতে হাঁটতে রেলফটক অব্দি গিয়ে ফিরছি, দেখলাম ভিড় জমেছে ঝিলের ধারে। তবে তখন বডিটা তোলা হয়নি। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। গা ঘিনঘিন করছিল।'

'কোন ওয়াগনব্রেকারের বডি সম্ভবত। কী মনে হয় আপনার?'

'আমার? আমার আর কী মনে হবে? বডি ইজ বডি।'

'কাল রাতের ঘটনা। কারণ গতকাল কেউ ওখানে কিছু দেখেনি।'

দিবাস্যার আড়চোখে আমার মুখটা দেখে নিয়ে বললেন, 'খুব চিন্তাভাবনা করছ বুঝি এসব নিয়ে?'

হাসতে হাসতে বললাম, 'করছি। কারণ আপনি স্যার আমায় ওয়াগনব্রেকার হতে বলেছিলেন। ভাবুন, কী অবস্থা হত তাহলে? রেল পুলিশের গুলিতেও ব্যাপারটা শেষ হচ্ছে না, মুণ্ডুটাও কাটা যাচ্ছে। ওঃ! হরিব্‌ল!'

দিবাস্যার গুম হয়ে রইলেন মিনিট খানেক। তারপর ঝুঁকে বারান্দার নিচে থুথু ফেলে বললেন,

'তোমার সঙ্গে কথা আছে। প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল।'

মুখ বাড়িয়ে সদর দরজাটা দেখে নিলেন! ঝুম তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, 'ঝুম, দরজা আটকে দে। আর শোন, আমাদের জন্য দু'কাপ ভীষণ কড়া চা কর।'

দিবাস্যার আমাকে ঘরের ভেতর ঢোকালেন। ঘরে কেমন একটা প্রাচীন গাম্ভীর্য ছম-ছম করছিল। খুব ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে আমি মুখখানা যতটা পারি গম্ভীর করে ফেললাম। উনি বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আমাকে একটা জীর্ণ ইজিচেয়ারে বসতে ইশারা করলেন। জানলার ধার ঘেঁষে বসানো ছিল ওটা। পাশে দেওয়ালের তাকে অসংখ্য পুরনো বই। পাশে একটা টেবিল। নীলচে কভার ঢাকা। তার ওপর চশমার খাপ, রকমারি জিনিসপত্র। একটা তোবড়ানো টেবিল ল্যাম্পও ছিল। দেওয়ালে একটা নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার ঝুলছিল—তাতে কোন ছবি নেই। দেওয়ালের অবস্থা শোচনীয়। দাগড়া-দাগড়া কালো ছোপ, ফাটল, ইটের খানিক দাঁত। কয়েকটা পারিবারিক বাঁধানো ফটো ঝুলছিল। মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল। ঝুমের ওপর রাগ হচ্ছিল। সে কিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেও জানে না। নিজের মতোই সংসারের ওপর তার কেন এত অবহেলা বুঝতে পারছিলাম না।

হঠাৎ ঘুরে দেখি, দিবাস্যার যেন অনেকক্ষণ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু হেসে বললাম, 'বলুন স্যার!'

দিবাস্যার একটু কেশে গলা সাফ করলেন। তারপর বললেন, 'আমি খুব বিপদে পড়েছি, দীপু।'

'সে কী! কী বিপদ?'

দিবাস্যার করুণ মুখে বললেন, 'তুমি মনে মনে একশো ওয়াগন ভাঙো, দুশো ওয়াগন ভাঙো, তিনশোটা ওয়াগন ভাঙো—মানে, যথেচ্ছ ভাঙো আর মাল হাতাও। ওতে রিস্ক নেই। আমি তো তাই করি! কিন্তু তবু আমি কেন বিপদে পড়ে গেলাম বলো তো?'

পাগলামি শুরু হল ভেবে সতর্ক হলাম। এ সময় সব কথায় সায় দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। বললাম, 'ওটাই তো নিয়ম স্যার! তবে মনে মনে বিপদে পড়লে তত ভাবনার কিছু নেই।'

'আছে।' উনি কড়া গলায় বললেন। 'আজ শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলাম, পুলিশ আমায় তাড়া করছে।'

'বলেন কী! হাতে বন্দুক ছিল কি?'

'ছিল কি না মনে পড়ছে না।' দিবাস্যার অন্যমনে বললেন, 'কিন্তু ও বয়সে তাড়া খেলে বুঝতেই পারছ, কী অবস্থা হয়! দৌড়ানো যায় না। দম .....'

'খুব স্বাভাবিক। তারপর?'

'তারপর আমি চেষ্টা করলাম যদি উড়ে গিয়ে গাছে বসতে পারি।'

'গাছে চড়ার চেয়ে সেটাই ভাল স্যার।'

'হ্যাঁ সে জন্যেই আমি গাছে উড়ে গিয়ে বসলাম। তারপর এ গাছ থেকে সে গাছে....'

'আর পুলিশ কী করল?'

'সে ব্যাটাকে আর দেখতেই পেলাম না।' দিবাস্যার এবার গলা চাপলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'তারপর একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হল। ঝুমের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দিলাম। তখন ঝুম ঘরে ঢুকে আমার এই খাটের তলায় উঁকি দিল, তুমিও উঁকি দাও। শিগ্‌গির!'

খাটের তলায় ঠাসা অন্ধকার। উঁকি দিতেই হল—নৈলে দিবাস্যার আমার মুণ্ডুটিকে কাত করে ছাড়তেন, হাত বাড়িয়েই ছিলেন। বললাম, 'কিছু দেখা যাচ্ছে না স্যার!'

'একটা লম্বাটে কাঠের প্যাকিং বাক্স দেখতে পাচ্ছ না?'

'না স্যার!'

সেই মুহূর্তে ঝুম ঘরে ঢুকে শ্বাসজড়ানো স্বরে বলে উঠল, 'দীপুদা লজ্জা করে না পাগলের সঙ্গে পাগলামি করতে! ছিঃ!'

লজ্জা পেতেই হল। কাঁচুমাচু মুখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। দিবাস্যার নড়ে বসলেন। 'এ আমাদের জীবনমরণ সমস্যা। আর তুই আমাকে পাগল বলছিস। ঝুম! বড্ড ইয়ে হয়েছিস তুই।'

'চুপ করো তুমি!'

'তাই বলে আমায় পাগল বলবি?'

আমি বললাম, 'অহ্‌! ছেড়ে দাও ঝুম! বাবার সঙ্গে তর্ক করতে নেই।'

ঝুম কী বলতে যাচ্ছিল, দিবাস্যার বললেন, 'আমাদের এখন সিরিয়াস কথাবার্তা হচ্ছে। এর মধ্যে তোর নাকগলানোর দরকার নেই। যা—চা এনে দে।'

ঝুম মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে আমি সিরিয়াস হলাম। আসলে বরাবর আমার এটা হয় দেখেছি, সবকিছুই বড্ড দেরিতে বুঝি। বিশাল সেকেলে খাটের তলায় হুমড়ি খেয়ে বসে দেশলাই জ্বাললাম। দিবাস্যার চাপা গলায় সতর্ক করে দিলেন, 'সাবধান দীপু। ছুঁয়ো না। আঙুলের ছাপ খুঁজে পাবে পুলিশ।'

'কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না স্যার। দুটো প্যাঁটরা আর একটা ছেঁড়া তোশক রয়েছে দেখছি।'

'তাহলে ঝুম আড়াল করে দিয়েছে। জিনিসটা পেছনেই আছে দেখ।' বলে দিবাস্যার আমার দিকে হাত রেখে ঠেলে দিলেন।

দম আটকে আসছিল। তাছাড়া ভ্যাপসা গন্ধ আর মাকড়সার জাল। তোশকটা সরিয়ে ফেব দেশলাই জ্বাললাম। তারপর সত্যি সত্যি একটা ফুট তিনেক লম্বা ফুট দুই চওড়া প্যাকিং বাক্স দেখতে পেলাম। ওপর থেকে দিবাস্যার বললেন, 'দেখতে পেলে?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি রেখে বেরিয়ে এস।'

বেরিয়ে ইজিচেয়ারে বসে চুল ঠিকঠাক করলাম। দিবাস্যার সস্নেহে আমার চুল, কাঁধ, পিঠ ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে দিলেন। বলালম, 'সত্যি আপনার বড্ড বিপদ। কারা রেখে গেছে? পান্নারা?'

'আবার কারা?'

'কাল রাতে?'

'কাল রাতে।'

দুজনে চুপচাপ বসে থাকলাম মিনিট দু-তিন। তারপর ঝুম চা রেখে গেল টেবিলে। দিবাস্যার চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আবদুলের ব্যাপারটা মনে আছে তোমার? আমি তার চেয়ে দুর্বল মানুষ। কারণ আমি ভদ্রলোক। তাছাড়া আমার একটা মেয়েও আছে। অরক্ষণীয়া মেয়ে। আমাকে স্কুলের চাকরিটা করতেই হবে। ঝুম বাড়িতে একা থাকে। ওদেরকে তো বিশ্বাস করা যায় না!'

একটু ভেবে বললাম, 'আসলে আপনার বাড়িটা এমন জায়গায় হয়েই বিপদ হয়েছে। পাড়ার ভেতর-টেতর থাকলে ওরা সুযোগ নিতে পারত না। বাড়িটা বেচে দিয়ে বরং ভেতরে কোথাও থাকুন। যতদিন বিক্রি না হয়, একটা বাসা ভাড়া করেও থাকতে পারেন। একখানা ঘর হলেই তো চলে যাবে আপনার। তাছাড়া ঝুমের সম্পর্কেও নির্ভাবনায় থাকতে পারবেন।'

দিবাস্যার আস্তে বললেন, 'তা কি আমি ভাবিনি? কিন্তু পান্নারা যদি চটে যায়? গোটা শহর তো ওয়াগনব্রেকারে ভর্তি! শ্বাসনালী কেটে দিলেই হল।'

'না, না। এত কিছু ভয়ের কারণ নেই! অ্যাদ্দিন ওরা চোরাই মাল যেখানে রাখত, সেখানেই রাখবে। নেহাত আপনাকে ভালমানুষ পেয়ে গেছে, তাই।' আশ্বাস দিয়ে বললাম। 'ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে।'

দিবাস্যার গুম হয়ে রইলেন। ঝুম বাইরে থেকে ডাকল, 'দীপুদা শোনো তো?'

দিবাস্যারের দিকে তাকালাম—যদি আপত্তি করেন। কিন্তু উনি তেমনি গুম হয়ে বসে জানলার বাইরে আগাছার জঙ্গল দেখতে থাকলেন।

বারান্দায় গেলে ঝুম চাপা স্বরে বলল, 'পান্না কোথায় থাকে জানো?'

'স্টেশনের ওধারে কলোনিতে থাকে শুনেছি। কেন?'

'তুমি আমার সঙ্গে একটু যাবে?'

'সে কী! পান্নার কাছে গিয়ে কী করবে?'

'সে আমি যা করার করব। সঙ্গে যাবে কি না তাই বলো।'

ঝুমের মুখে জেদ লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন হলাম। বললাম, 'পান্নার কাছে গিয়ে মিছিমিছি অপমান হবে। হয়তো উল্টে আরও সাংঘাতিক বিপদে পড়বে। কী দরকার? ভীষণ ডেঞ্জারাস ছেলে শুনেছি।'

'তুমি যাবে কি না বলো?'

'ঝুম, তাহলে পান্না জেনে যাবে যে আমিও ব্যাপারটা জানি।'

'বুঝেছি। নিজের কথা ভেবেই যেতে চাইছ না। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।'—বলে সে বাবার ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, 'আমি একটু আসছি। তুমি বাইরের দরজা আটকে দাও।'

'কোথায় যাবি?' দিবাস্যার বেরিয়ে এলেন। মুখে সন্দেহের ছাপ।

'আসছি।' বলে ঝুম বেরিয়ে গেল।

অগত্যা আমি তাকে অনুসরণ করলাম। দিবাস্যার কিছু বলছিলেন, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

আমাদের শহরটা খুব গোছালো নয়। এদিকে সেদিকে বেখাপচা ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। শুধু গঙ্গা একটা সীমানা জোর করে বেঁধে দিয়েছে। নইলে এদিকেও নালীঘায়ের মতো ছড়িয়ে যেত। স্টেশন এলাকায় খ্রীষ্টান গোরস্থানের পেছনে কলোনী এলাকায় ঢুকলে গ্রাম বলে মনে হয়। একটুকরো বাজার অবশ্য আছে স্টেশনরোডের মোড়ে। বাজার ছাড়িয়ে ঘন গাছপালার ভেতর ছোট-ছোট ছিমছাম সব বাড়ি। বেশির ভাগই মাটির দেয়াল, টালির চালা, কদাচিৎ একটা ইটের দালান। সাইকেল রিকশো ছেড়ে দিলাম বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে।

গোড়াবাঁধানো একটা প্রকাণ্ড বকুলগাছের তলায় কয়েকটি বাচ্চা খেলা করছিল। পান্নার বাড়ি জিজ্ঞেস করলে তারা ভেতর দিকে একটা মাটির বাড়ি দেখিয়ে দিল।

আমার ডাক শুনে পান্না বেরিয়ে এল। পরনে যেমন তেমন একটা সবজে রঙের লুঙি, খালি গা। পায়ে একটা রবারের চটি। রোদেপোড়া রুক্ষ চেহারা। চওড়া কাঁধ। শক্ত কাঠামো। 'আরি। আহো আহো'—এইরকম কিছু বলে অনেকটা হেসে সে সম্ভাষণ করল। 'কী কাণ্ড! আহো, বহো!'

সে নিচু খলপার শিলিং দেওয়া ঘরে ঢোকাল আমাদের। দুটো চেয়ার, একটা টেবিল—অমসৃণ সস্তা আসবাব। একটা তক্তপোশ আছে। আমরা বসলে সে বলল, 'চা খাইয়া কইবা, না অ্যাহনই কইবা?'

একটু হেসে বললাম, 'পান্না, তোমার ওই সাংঘাতিক ভাষায় কথাবার্তা বললে কিছু বুঝব না।'

'বোঝবা না ক্যান?' পান্না হা হা করে হাসতে লাগল। আমাগো মাদার টাং! আমি যে ঘটিগো কথা কইতে পারি না—হেইডা তো ভালই জানো। স্কুলে কতো জ্বালাতন করতা!'

'তেমার মনে আছে?'

'আছে বৈকি।' পান্না তার বুকে আঙুলের টোকা মারল। 'হগ্গল কথা হেইখানে গাঁথা আছে। ভুলি নাই। বলে সে ঝুমের দিকে তাকাল। 'ঝুম যে কিছু কও না দেহি! হইল কিডা?'

ঝুম বলল, 'কেন এসেছি বুঝতে পেরেছ পান্নাদা?'

'হু! না বোঝার কী আছে?' সে একটু হাসল। 'পুলিশ সার্চ কইরা মাল পাইছে তো?'

'না।'

পান্না আমার দিকে তাকাল। আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সে আস্তে বলল, 'তাহলে আর প্রব্লেমটা কী হইল? আমার স্ট্রেটকাট কথাবার্তা। দীপঙ্কর জানে।

বললাম, 'পান্না, ওরা বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। ওরে আমায় ছাড়া আর কাউকে বলেননি—তুমি বিশ্বাস করো। আমি....'

কথা কেড়ে পান্না বলল, 'হুঁ জানি! আইজ কাল তুমি স্যারের বাড়ি ঘন-ঘন যাও।'

'না—না। ঘনঘন যাইনে। মাঝে মধ্যে যাই-টাই।'

'বেশ। তা হইছে কিডা? প্রব্লেমটা কী কও তো দেহি!'

'প্লিজ পান্না, তুমি নিজেও বুঝতে পারছ। দিবাস্যারের মতো নিরীহ ভদ্রলোককে কী সাংঘাতিক রিস্কের মধ্যে ফেলেছ তোমরা। ওঁর মানসম্মান বিপন্ন।'

পান্না গুম হয়ে বসে নিজের গোঁফ একটা-একটা করে টেনে যেন সোজা করতে থাকল। ওর এই ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগছিল না। একটু পরে বলল, 'আইজ আমার মন ভাল নাই। বেশি কথা কমু

না। ঠেলায় পইড়্যা মালডা রাখছিলাম আমাগো স্যারের জিম্মায়। স্যার দেহি পাঁচকান কইর‍্যা ফ্যালাইলেন। ঠিক আছে। উঠাইয়া লইমু অনে।'

'পান্না, আর একটা রিকোয়েস্ট।'

'কইয়া ফেলাও।'

'দিবাস্যারকে প্লিজ আর কখনও যেন বিব্রত কোরো না।'

পান্না আমার চোখে চোখ রেখে নির্বিকার মুখে বলল, 'করুম না।' তারপর সে 'বউ' বলে উঠে দাঁড়াল এবং ভেতরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

ঝুম বলল, 'আমরা উঠি পান্নাদা।'

পান্না হাসল। 'আইয়া পড়ছ যহ্ন, এট্টু মিষ্টিমুখ না করাইয়া ছাড়ুম না। বও, বও।'

সে ভেতরে চলে গেল। ঝুম আমার দিকে তাকাল। ওর চোখের ভাষায় বুঝতে পারছিলাম একজন ওয়াগনব্রেকারের বাড়িতে মিষ্টিমুখ করতে ভীষণ অনিচ্ছা। কিন্তু উপায় নেই। ওকে চোখের ইশারায় বললাম, আপত্তি কোরো না।

একটু পরে পান্না ফিরে এসে বসল। তার হাতে চারমিনারের প্যাকেট। সিগারেট দিল আমাকে। নিজেও ধরাল। তারপর মিটিমিটি হেসে বলল, 'তোমার খবর কও দীপু। কী করছ অ্যাহন?'

'কিছু না। বেকার।'

'আমার মতন বিজনেস করলেই পারতা।'

মনে মনে হেসে বললাম, 'কী বিজনেস?'

সে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'গাঁওয়ালে রিকশা লইয়া গিয়া নানা রকম তরিতরকারি কিনি—যেমন ধরো, আলু, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, ঝিঙে যখন যা পাই চাষীগো কাছে। কিনিয়া মার্কেটে চালান করি। কহনও কইলকাত্তা পাঠাই রেলে করিয়া। রিকশাহান রাখছিলাম। কাজ দিল।'

বুঝলাম এটা ওর বাইরের কারবার। এখন ওকে ওয়াগন-ব্রেকিং সম্পর্কে প্রশ্ন করা চলে না। সে তার কারবারের গল্প শোনাতে থাকল। তারপর তার সংসারের বিবরণ দিল। বিয়ে করেছে। কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে। তার দায়িত্ব বেড়েছে। এখন তাকে কত বুঝেসুঝে চলতে হয়।

স্বীকার করছি, এসব কথা শুনতে শুনতে তার ওয়াগনব্রেকার সত্তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে মনে হচ্ছিল পরিশ্রমী, সৎ, দায়িত্ববান যুবক। সে বি. কম পাস করেছে। চাকরি পেলে এর চেয়ে বেশি রোজগার করতেই পারত না। তবে চাকরিটা আরামের, আর বিজনেসটা বড় খাটুনির।

একটি পছর পাঁচেকের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে দরজায় উঁকি দিচ্ছিল। পান্না জানাল তার বড় মেয়ে। আমি তাকে ডাকলাম। এল না। একটু পরে পান্নার বউ এল মাথায় ঘোমটা দিয়ে। হাতে দুটো সন্দেশের প্লেট। পান্না পরিচয় করিয়ে দিল। ঝুমের চেয়ে বয়স হয়তো কম। হাসিখুশি চেহারা।

যাই হোক, একজন ওয়াগনব্রেকারের চমৎকার একটা সংসার দেখা হল। আমার কাছে অবিশ্বাস্যই বলতে হয়। তবে আমি চাইছিলাম ঝুম একটু বেশি করে কথা বলুক। সমস্যাটা যখন তাদেরই। কিন্তু ঝুম মুখ খুলল না বিশেষ।

চাও না খাইয়ে ছাড়ল না পান্না। তার বউ ঝুমকে বারবার বলল, 'আবার যেন আইয়েন।' ঝুম শুধু মাথা নাড়ল। আমরা বেরুলে পান্না বলল, 'আমি আর তোমাগো লগে যামু না। আর দীপু, চুপচাপ বইয়া কাটাইও না। যা হয় একটা কিছু করো। দিনকাল ভাল না। বুঝলা তো?'

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। নির্জন রাস্তার দুধারে ঘন গাছপালায় ঢাকা ঘরবাড়ি। পাখপাখালির ডাক। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'ঝুম, অবিশ্বাস্য!'

'কী?'

'যা দেখলাম। মানে, পান্না—পান্নার সংসার। ঝুম, তুমি কি টের পাচ্ছিলে আমরা একজন ওয়াগনব্রেকারের বাড়িতে বসে আছি?'

ঝুম বাঁকা মুখ করে বলল, 'আমার গা ঘিনঘিন করছিল!'

'সে কী!'

ঝুম চুপচাপ হাঁটতে লাগল। বাজারের তেমাথায় পৌঁছে সে বলল, 'চলো হাঁটতে হাঁটতে যাই।'

প্রায় এগারোটা বেজে গেছে। গ্রীষ্মের কড়া রোদ্দুর। তবু ঝুমের সঙ্গে হাঁটতে ভাল লাগছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ গোপনীয় চক্রান্তের সুরে মনের ভেতর বাজছিল একটা প্রশ্ন। ঝুমকে ভালবাসছি কি — কিংবা ঝুম আমাকে ? প্রশ্নটা ভারি জটিল দেখে শেষে হাল ছেড়ে দিলাম। এখনও বুঝতে পারছি না আমার পক্ষে ঝুমকে ভালবাসা ঠিক হবে কি না। কারণ সাগরিকার ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়নি।

ঝিল দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম এতক্ষণে। বললাম, 'ওই যাঃ! সেই মুণ্ডুকাটা গুলিবিদ্ধ বডিটা!'

ঝুম বলল, 'কী হয়েছে?'

'পান্নাকে জিজ্ঞেস করা হল না!'

ঝুম ঝাঁঝালো স্বরে বলল, 'থামো তো! তোমার সবটাতেই থাকা চাই।'

চুপচাপ হাঁটতে থাকলাম। পান্নার সুন্দর সংসার দেখে এসব কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এখন ভয় হচ্ছিল, পান্নাও কি একদিন ...

ওর ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটার কথা মনে পড়ল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ....

দিবাকর

অনেক রাতে আবার মালগাড়ির শব্দ ঘটাং ঘটাং। তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল। বিবর্ণ, তোবড়ানো, ভারি আর জঙধরা পুরানো ওয়াগনের মালা গলায় পরে পৃথিবী যেন ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। তারপর সেই টানা হ্যাঁচড়ার ভেতর থেকে অন্ধকারে কেউ গম্ভীর গলায় বলে উঠল, ওয়াগন.... ওয়াগন... ওয়াগন!

এঞ্জিনের কালো মুখের ভেতর গনগনে ক্রুদ্ধ আগুন জ্বলছিল। ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানদের মড়াগুলো ঝুলে পড়েছিল দুধারে। ঘট ঘটাং ... ঘটাং ঘটাং .... ধারাবাহিক আওয়াজ। রুগ্ণ, ঢ্যাঙা, বিষণ্ণ গার্ডকে দেখতে পাচ্ছিলাম শেষ দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে রেললণ্ঠনের লাল আলো দুলছে। নিষ্ফল, অসহায় লণ্ঠন। একপলক দেখেই মনে হল গার্ডের মুখে আমার আদল। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আর সেই গম্ভীর গলায় ওয়াগন ... ওয়াগন .... ওয়াগন। হুড়মুড় করে উঠে বসলাম বিছানায়।

আবার একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক রাত চলে গেল।

ঝুম চা দিয়ে বলে গেল, 'ওটা তো নিয়ে গেল না ওরা!'

বললাম, 'কথা দিয়েছে যখন, নিশ্চয় নিয়ে যাবে ওরা। সুযোগ পায়নি আর কী।'

ঝুম খাপ্পা হয়ে বলল, 'তুমিই তো প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন বোঝো ঠেলাটা।'

'ভুল করছিস ঝুম।'

'প্রথম যেদিন রাখতে এল, কেন সাহস করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দাওনি?'

'তুই পারতিস?'

'নিশ্চয় পারতাম।'

'পারতিস না। ওরা ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট।'

ঝুম শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলল, 'আজ রাতে যদি না নিয়ে যায় আমি ওটা ঝিলের জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

ভয় পেয়ে বললাম, 'না—না। কখনো ওসব করতে যাস্‌নে মা। সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছিস না, এ শহরে আমাদের বাঁচাবার কেউ নেই? শহরটা ওয়াগনব্রেকারদের হাতে চলে গেছে। ঝুম, এখন যাকেই দেখি, তাকেই মনে হয় লোকটা ওয়াগনব্রেকার। তুই কি ভাল করে লক্ষ্য করিসনে মানুষগুলোর মুখের চেহারা? প্রতিটি মুখে চক্রান্ত আর মারাত্মক খুনীর আদল। এ শহর ছেড়ে আমাদের চলে যেতেই হবে।'

এত কথা বলে ক্লান্তি এল। আমার কী হয়েছে, আগের মতো কথা বলতে পারিনে। আমায় ক্লাস করতে না দিয়ে ভালই করেছে বরং।

আজ ঝুম বাজার করতে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'স্কুলে যেও না। খুব গণ্ডগোল হচ্ছে।

বাজারের ওপারে বোমাবাজি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। নোটনবাবুদের পার্টি বন্‌ধ ডেকেছে। মিছিল বেরিয়েছে দেখলাম।'

কিছু বুঝতে পারলাম না। প্রায়ই তো এমন হচ্ছে। হাঙ্গামা, খুনখারাবি, বন্‌ধ। আজ আবার হলটা কী?

কিছুক্ষণ পরে দীপু এল। তার কাছে ব্যাপারটা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ঝিলের মড়াটা হারাইয়ের। সকালে মিছিল করে নোটনবাবুদের পার্টির লোকেরা গিয়েছিল মর্গ থেকে বডি আনতে। হারাই নাকি তাদের দলের কর্মী। কী উদ্ভুটে ব্যাপার না ঘটেছে আজকাল।

ছেলেটার জন্য দুঃখ হচ্ছিল। একথা সত্যি যে একসময় রাজনীতি করত—তার মানে, পোস্টার লিখত বা দেয়ালে সেঁটে বেড়াত। মিছিলে স্লোগান দিত। পরে সে ওয়াগনব্রেকার হয়েছিল, সবাই জানে। আমি তো বেশি করেই জানি। অথচ তাকে শহিদ বানিয়ে ছাড়ল ওরা।

দুঃখে হাসি পেল। দীপু বলল, 'যে কোন সুযোগ পেলেই সেটা কেউ মিস করতে চায় না। ওই দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা ওঠাতে চায়। যাক্‌গে আজ আপনার একটা ছুটি মিলে গেল স্যার।'

'দীপু, তুমি দুপুরবেলা আমাদের সঙ্গে খাও বরং।'

'দীপু ইতস্তত করছিল। শুনতে পেয়ে ঝুম বলল, 'এস দীপুদা, আজ বনভোজন করি। তোমায় রাঁধতে হবে কিন্তু।'

'দীপু বলল, আমায় শেখাতে হবে আগে।'

'শেখাব। চলে এস।'

রান্নাঘরের সামনে মোড়া নিয়ে গিয়ে বসলাম। একটা কুৎসিত দিন এভাবে কাটানো যাক। বললাম, 'বাজারে তো হাঙ্গামা বললি। কী এনেছিস ঝুম?'

ঝুম বলল, 'বলব না আগেভাগে। যথাসময়ে দেখবে।'

দীপু বঁটি নিয়ে বসেছে। কী কাটবে তার প্রতীক্ষা। ঝুম তোলা উনুন নিয়ে উঠোনে চলে গেলে সে বলল, 'জানেন স্যার? অনেকদিন নেমন্তন্ন খাইনি কোথাও?'

'সে কী। এখন তো বিয়ের মাস পড়েছে হে।'

'দীপু কাঁচুমাচু মুখে বলল, নেমন্তন্ন খেতে তো খালি হাতে যাওয়া যায় না। কাজেই যাওয়া হয় না।'

বাইরে থেকে মাইক্রোফোনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। কারা কী ঘোষণা করতে করতে যাচ্ছে। শোনার চেষ্টা করলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না। মনে হল বাইরে একটা বড় কিছু ঘটতে চলেছে আজ। না বেরুনোই ভাল। দীপুর সঙ্গে গল্পে মন দিলাম। 'হুঁ—তা তো ঠিকই। খালি হাতে কোথাও নেমন্তন্ন খেতে গেলে নিজেকে ভিখিরি মনে হয়। তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও তাই পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি।'

দীপু হাসল। ঝুম কোথায় আছে যেন দেখে নিয়েই বলল, 'ঝুমের বিয়েতে কিন্তু দারুণ খাব স্যার। খালি হাতে এলেও চলে—আপনার মেয়ের বিয়ে যখন! অবশ্য ঝুমকে আমি একটা কবিতার বই প্রেজেন্ট করব।'

'খুব ভাল।' ওর প্রশংসা করলাম। 'তাই দিও বরং। কবিতা ভাল জিনিস।'

'কিন্তু বিয়েটা লাগাচ্ছেন কবে?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কী বলব ভেবে পেলাম না।

দীপু আস্তে বলল, 'কোথাও কি যোগাযোগ করেছিলেন? আমার ধারণা, ঝুমকে যে দেখবে তারই পছন্দ হয়ে যাবে।'

ঝুম আঁচ দিয়ে এসে পড়ায় সে চুপ করে গেল। বললাম, 'দীপু, তোমরা ক'ভাইবোন?'

'দুই বোন দু'ভাই।'

'তুমি....'

'আমিই বড় স্যার।'

'তোমার বাবার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। কী করতেন?'

‘বাবা জৈনদের অয়েলমিলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। কী সব হিসাবের গণ্ডগোল ছিল। ইনকাম ট্যাক্স থেকে ধরল। দোষটা পড়ল বাবার ঘাড়ে।’

‘বলো কী! তারপর তারপর?’

‘এখন রেজিস্ট্রি অফিসে ডিডরাইটার।’

‘ভাল। বোনেরা কে কী করছে? কার কত বয়স হল?’

দীপুদের বাড়ির কোন খবর আমার জানা ছিল না। নিছক জানবার জন্যই জানতে চাওয়া। দীপু কী ভাবল কে জানে। অসংখ্য ছেলেকে এত বছর ধরে পড়িয়ে আসছি। তাদের কারুর কোন পারিবারিক খবর আমার জানা নেই। জানা উচিত ছিল। কেন আমি ওদের প্রশ্ন করে জেনে নিইনি এতকাল? কিন্তু এখন আর পস্তে লাভ নেই। আমাকে আর পড়াতে দিচ্ছে না। ভাবছে, আমার মাথার গণ্ডগোল হয়েছে। দশচক্রে ভগবানকে মানুষ ভূত বানিয়ে ছাড়ে তো আমি কোন ছার।

দীপুর বোনেদের বয়স বাইশ আর উনিশ। কেউ স্কুল ফাইনালের পর এগোতে পারেনি। কাজেই অরক্ষণীয়া। ভাইটা সবার ছোট। ক্লাস এইটে পড়ে। আমাদের স্কুলে নয়। তাহলে চিনতাম।

সব শুনে বললাম, ‘হুঁ—তাহলে তো প্রব্লেম!’

দীপু হাসতে হাসতে বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেন স্যার! ওয়াগনব্রেকার হয়ে গেলে সব প্রব্লেম সল্‌ভ হয়ে যায়।’

ঝুম চটে গিয়ে বলল, ‘হয় বৈকি। তারপর মুণ্ডুকাটা মড়া হয়ে ঝিলে ভাসতে হয়।’

দীপু না দমে বলল, ‘কী বলছ? তারপর তো ফুলের মালা পরিয়ে শহিদ বানাবার জন্য অসংখ্য লোক অপেক্ষা করছে।’

ওর কথা শুনে খুব হাসি পেল। হাসি সংক্রামক। দেখলাম, ঝুমও হাসছে। অনেকদিন পরে এই জীর্ণ বাড়ির ভেতর একটু ভিন্ন আবহাওয়া এল। সেটা নিশ্চয় দীপুর জন্য। এই যুবকটিকে নতুন চোখে দেখছিলাম। আমার আবছা ধারণা হল, ঝুমের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ভেতরে-ভেতরে গড়ে উঠেছে। তা মন্দ কী! অনন্তকাল তো দীপু বেকার থাকবে না। কেউ তা থাকে না। বেকারদের বেঁচে থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত কিছু আঁকড়ে ধরতেই হয়। অবিবাহিতারাও অনন্তকাল অবিবাহিতা থাকে না। ইচ্ছে করে তেমন থাকতে চাইলে আলাদা কথা।

ওরা দুজনে বেশ সুস্বাদু একটা খিচুড়ি রান্না করে ফেলল। তার সঙ্গে বেগুন ভাজা, পাঁপর ভাজা, আলু ভাজা। তারিফ করে খেলাম এক সঙ্গে। এ একটা চমৎকার দিন বলা যায়। অনন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শোক দুঃখ উৎকণ্ঠার মেঘ সরে গিয়ে কিছুক্ষণ ঝরঝরে রোদ। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে আমরা তিনটি প্রাণী জীবনের আস্বাদ পুরোপুরি নিচ্ছিলাম।

ঝিমুনি চেপেছিল। বিকেল পর্যন্ত শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। ওরা লুডো খেলতে ডাকছিল। আমার হালগতিক দেখে নিজেরা খেলতে বসল। ওদের টুকরো কথাবার্তা আর হাসির চাপা শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার ভালই লাগছিল।.....

দীপু

দিবাস্যার ঘরে ঢুকলে নিরাপদে ঝুমের দিকে তাকালাম। আমি বুঝতে পারি আমার মধ্যে যেন একটা শেয়ালের ভীরুতা আছে। বারান্দায় শতরঞ্জি পেতে খেলছিলাম। সাপলুডোর এই বিপদ। হঠাৎ গুটি মুখে ঢুকে যায় এবং লেজে চলে আসে। বারবার হেরে ভূত হচ্ছিলাম। ঝুম আস্তে বলল, ‘তুমি মন দিয়ে খেলছ না। হাবার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কেমন করে খেলবে।’

আসলে আমার ভেতর একটা শেয়াল সাবধানে চলাফেরা করছিল। তার কী অভিসন্ধি আঁচ করা যায়। শক্ত এবং উঁচু পাঁচিলের মতো ঝুম সামনে বসে আছে। তার চারপাশে নিঃশব্দে ধূর্ত প্রাণীটা চলাফেরা করছে।

হাই তুলে বললাম, ‘ঘুম পাচ্ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে না ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। বড় বদ্ অভ্যাস।’

ঝুম রাগ করে ছক গুটিয়ে ঘরে রেখে এল। তারপর বলল, 'নাও! ঘুমোও।'

শতরঞ্জিটা ছোট। শুয়ে পড়লাম। পা দুটো মেঝেয় বেরিয়ে রইল। চোখ বুজে বললাম, 'একটা বালিশ পেলে মন্দ হত না।'

'নেই।' বলে ঝুম খিড়কির দরজায় নেমে গেল। তারপর দরজা খুলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। গাছপালা লু হাওয়ার ঝাপটানিতে শনশন করে দুলছিল। ঝিঁঝিপোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল। চোখের ফাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম, ঝুম খিড়কির কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুমের সঙ্গে ঠিক প্রেম না হোক, ওই ধরনের কিছু কথাবার্তা বলার কত সুযোগ হারিয়ে ফেলছি ভেবে দুঃখ হচ্ছিল। কাল একটা লম্বা নির্জন পথে পাশাপাশি হেঁটেছি বহুক্ষণ। তখনও অনেক কষ্টে লোভ সামলে থেকেছি। আজও তাই থাকতে চাইছি। এ যেন একটা কৃচ্ছ্র সাধন। কেন এই কৃচ্ছ্র সাধন!

সম্ভবত আমার অবচেতনায় একটা সমস্যা দানা বেঁধেছে। আমি হয়তো সাগরিকার সঙ্গে প্রেম করার বহুমূল্য আশায় ঝুমের সঙ্গে প্রেম না হোক, আনুষঙ্গিক কিছু কথাবার্তা বলতেও ভয় পাচ্ছি। হয়তো মনে হয়েছে, ঝুমের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেলে সাগরিকা আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। সাগরিকার সঙ্গে আমাকে প্রেম করতেই হবে।

হবে! অবাক হয়ে গেলাম নিজের স্পর্ধা দেখে। আমার যোগ্যতাটা কী? আমি যুবক—এটুকু ছাড়া আর কী যোগ্যতা? অযোগ্যতা তো মাত্রাছাড়া। একটা গভীরতর অসহায়তার বোধ আমাকে নির্জীব করে ফেলল। এভাবে চোখ বুজে থাকতে থাকতে মৃত্যু হয় তো বেঁচে যাই।

আমার পা দুটো আঁকশি জড়ানো অবস্থায় টান-টান হয়ে নড়ছিল। হঠাৎ পায়ের তলায় সুড়সুড়ি খেয়ে সরিয়ে নিলাম। দেখি, উঁচু বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে ঝুম হাসছে।

'কী হচ্ছে!' বলে ফের চোখ বুজলাম। কিছুক্ষণ পরে চুলে টান পড়ল। ঝুম মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। বললাম, 'আঃ! কী হচ্ছে!' তারপর চোখ বুজে ফের পা নামাচ্ছি দাড়িতে টান পড়ল। চোখ খুলে দেখি, ঝুম নিঃশব্দে হাসতে হাসতে ওর ঘরের ভেতর ঢুকল।

এতক্ষণে আমার শরীরের ভেতরকার নীলচলু শেয়াল চঞ্চল হয়ে উঠল। উঠে বসলাম।

ঝুম ওর ঘরের ভেতর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'এবার?'

ঝুম বাধা দিচ্ছিল না। শুধু আস্তে বলল, 'ছাড়ো। বাবা আছেন ওঘরে।'

'আমি তোমায় চাই ঝুম।'

ঝুম চুপ করে থাকল। তার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ যেন।

কিন্তু সে-মুহূর্তে বুঝতে পারিনি। আমি, না আমার শরীর তাকে চাইছিল!....

ঝুম

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, দীপঙ্কর নয়—তার শরীর চাইছিল আমার শরীরকে। ঠিক এটাই জানতে চেয়েছিলাম। জেনে নিলাম। হঠাৎ এক ধাক্কায় তাকে ঠেলে দিলে সে আবার জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আমাকে চুমু খেতে এল। তখন তাকে চড় মারলাম।

দীপঙ্কর কাঁচুমাচু মুখে একটু পিছিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে চড় মারতে পারলে ঝুম।'

'তুমি চলে যাও।'

'কী আশ্চর্য।' বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দেখলাম খিড়কির দরজা খুলে সে চলে গেল। ঠিক তখনই আমার বুক ঠেলে কান্না এল—দৌড়ে গিয়ে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। ডেকে নিয়ে আসি এবং আত্মসমর্পণ করি।

কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল। খিড়কির দরজায় গিয়ে দেখলাম, সে ঝিলের দিকে চলেছে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ঝিলটা দেখামাত্র আমার ওয়াগনব্রেকারদের কথা মনে পড়ে গেল। অমনি ভয় পেয়ে গেলাম। দীপঙ্করকে শত্রু করে ফেললাম না তো? যদি সে পুলিশকে জানিয়ে দেয়, আমাদের

ঘরে চোরাই জিনিস লুকোনো আছে।

সারা বিকেল অস্থির হয়ে কাটালাম। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম, পুলিশ এসে হানা দেবে। বাবার মনটা আজ কেন জানি না, খুব ভাল মনে হচ্ছিল। অনেকদিন পরে ওকে চুল আঁচড়াতে দেখলাম। একটু সেজেগুজে ছড়ি হাতে বেরিয়ে গেলেন। বারণ মানলেন না।

বাবা বরাবর যেন আমার সম্পর্কে এরকম উদাসীন। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে এই যে আমি একা নিরিবিলি এলাকার একটা বাড়িতে থাকি, ভুলেও কি ভাবেন না কোন আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। দিনকাল ভাল নয়। কিন্তু কথা তুললেই বলবেন, 'কোন ভয় নেই। দিবাস্যাবের বাড়ি এ শহরে নিরাপদ দুর্গ। কেন জানিস তো? তাবৎ বদমাশ আমার প্রাক্তন ছাত্র। তারা আমাকে কত খাতির করে জানিস তো?'

বাবা বেরিয়ে যাবার পর বাড়িটা আজ গিলে খাচ্ছিল আমাকে। কিছুক্ষণ পরে তালা এঁটে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় গিয়ে মনে হল কোথায় যাই? আনমনে হাঁটতে হাঁটতে শর্বরীদের বাড়ি যাচ্ছিলাম। দুদিন আগে শর্বরীর বোন তিতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল, 'দিদির আসার কথা আজকালের মধ্যেই।' নিশ্চয় এসে গেছে সে। আমার কলেজের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র শর্বরীর সঙ্গেই আমার এখনও যোগাযোগ আছে। আর সব কে কোথায় নিপাত্তা হয়ে গেছে এই তিনটে বছরে। কারুর সঙ্গে দেখা হয় না। চিঠিও লেখে না কেউ।

বন্‌ধ তত একটা জমেনি মনে হচ্ছিল। কিছু কিছু দোকানপাট খোলা আছে দেখছিলাম! কিন্তু ভিড়টা কম। কেমন খাঁ খাঁ করছে চারদিক। জৈন মন্দিরের কাছে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। ঘুরে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সুশান্ত না?

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। সুশান্তের মতো ছেলে আমার সঙ্গে রাস্তায় কথা বলবে এবং যারা দেখবে, তারা কীভাবে নেবে ভাবনার কথা। সুশান্ত পুলিশের খাতায় দাগী বলে শুনেছি। কমাস আগে রেলডাকাত বলে ধরেছিল পুলিশ। ভেবেছিলাম নিশ্চয় জেল হয়েছে। এখন দেখছি তেমন কিছু ঘটেনি।

সুশান্তও বাবার একজন প্রাক্তন ছাত্র। কলেজেও ঢুকেছিল। পাস করে বেরোয়নি। ও বরাবর গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। এমন ছেলের সঙ্গে আমার ভাব থাকার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ওর বোন মঞ্জু আমার বন্ধু। মঞ্জুর বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। তার সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই আমার।

সুশান্ত হাসতে হাসতে বলল, 'কী খবর ঝুম? স্যার কেমন আছেন?'

'ভাল। তোমার খবর কী শান্তদা?'

'তুমি আমায় অশান্ত বলতে ঝুম!'

'তাই বুঝি?'

'হুঁউ। মনে করে দেখ।' সুশান্ত পা বাড়িয়ে বলল। 'একটু পরে তোমাদের বাড়ি যেতাম। দেখা হয়ে ভালই হল।'

ওকে এড়িয়ে যাবার জন্য হাঁটছিলাম। একটু অবাক হয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার?'

সুশান্ত গলার স্বর একরকম রেখেই বলল, 'ব্যাপার সিরিয়াস। কাল রাতে লালুকে অ্যারেস্ট করেছে। পান্না গা ঢাকা দিয়েছে।'

বুক ধড়াস করে উঠেছিল। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বললাম, 'কিছু বুঝতে পারছি না। এসব আমায় কেন বলছ শান্তদা?'

সুশান্ত হাসল না। 'শোনো মালটা এখন থাক। পান্না আমাকে বলে গেছে, শিগ্‌গির যা করার করে ফেলব। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'শর্বরীদের বাড়িতে।'

'কে সে?'

'তুমি চিনবে না।'

'আহা, বলোই না। আমি কাকে চিনি না ভাবছ?'

'আশুবাবু উকিলের মেয়ে।'

'হুঁ—গেটওয়ালা বাড়ি! ওয়াটার ট্যাংকের কাছে। গেটে ল্যাভেন্ডার ফুলের ঝাড়।'

'আচ্ছা। চলি।'

'স্যারকে বলো—ওঁর একবিন্দু ক্ষতি হলে আমরা জান লড়িয়ে দেব। উনি যেন খামোকা অস্থির না হন।'

সুশান্ত আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বাঁদিকে খেলার মাঠ, ডাইনে একটা সিনেমা হাউস। ম্যাটিনি শো বন্ধ ছিল সম্ভবত। ভিড় ভনভন করছে ইভনিং শোয়ের আশায়। কতদিন সিনেমা দেখা হয় না! আজ যদি দীপঙ্করের সঙ্গে গণ্ডগোলটা না হয়ে যেত, সিনেমা দেখতে আসতাম ওর সঙ্গে!

সিনেমা হাউস ছাড়িয়ে খালপোল। সেখানে সুশান্ত বলল, 'একটু দাঁড়াও ঝুম। কথাটা শেষ করে নিই। দেখা যখন হয়েই গেল, আর কষ্ট করে স্যারের কাছে যাচ্ছি না। সিচুয়েশন ভাল না। এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে কোন সময় হুলোগুলোর পাল্লায় পড়তে পারি। তবে ভেবো না। আমাকে কোন ঘুঘু ফলো করছে না। পান্নার সঙ্গে আমি আছি, ওরা কল্পনাও করে না। কারণ আমার লাইন আলাদা। বলবে, তাহলে পান্নার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ছিল না —সম্প্রতি হয়েছে।'

'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে শান্তদা!'

'কথা আছে। শোনো।' সুশান্ত সিগারেট ধরাল। 'স্যার জানবেন আমি পান্নার সঙ্গে আছি। এটা ভাবতে লজ্জা হয়। তাই পান্না যখন দায়িত্বটা দিল, না করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর বাঙালের গোঁ—তাতে বরিশালের ছেলে। বোঝোই তো!' সে হাসতে লাগল। 'পেট ফাঁসিয়ে দেবে শালা! কী আর করা।'

সে আমার হাবভাব লক্ষ্য করল এতক্ষণে। 'তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? ওই যে অত সব লোক কথা বলছে, আমরাও বলছি। এতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যাই বলো, একটা ভুল করে ফেলেছ তুমি বা স্যার, যেই হোক। দীপঙ্করকে বলতে গেলে কেন? ও ব্যাটা একটা বুদ্ধু। কাজটা ভাল করেননি।'

'দীপুদা কাকেও বলবে না।'

'ওকে বিশ্বাস নেই। বদ্ধ পাগল। ওকে বলেও রিস্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছো। সবার মন তো সমান নয়। দীপুকে বলবে একটু সাবধানে থাকতে। ভুলেও যেন মুখ ফসকে কাকেও কিছু বলে না। আর'... একটু থেমে সে ফের বলল, 'বাড়ি থেকে যেন এখন কিছুদিন বেরোয় না।'

পাদুটো থরথর করে কাঁপছিল। মনে পড়েছিল, দীপঙ্কর একদিন 'মাফিয়া'র গল্প শুনিয়েছিল। আমরা তো বটেই, সে নিজেও মাফিয়ার কবলে পড়ে গেছে। বাবা যদি সাহস করে প্রথম দিনই পান্নাকে বাধা দিতেন!

'আচ্ছা। চলি শান্তদা।'

সুশান্ত খালপোলের কংক্রিট রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আড়ষ্ট পায়ে হাঁটছিলাম। রাগে ক্ষোভে-দুঃখে অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত শর্বরীর কাছে গেলামই না। একটা রিকশো করে ঘুরপথে বাড়ি ফিরে এলাম।

দীপঙ্করের জন্যই বেশি ভয় হচ্ছিল। সত্যি, বড্ড বোকামি হয়ে গেছে। তবে দোষটা তো বাবারই। উনি ওকে না বললে আমি তো কিছুতেই বলতাম না ব্যাপারটা।

কিন্তু দীপঙ্করকে আমি চড় মেরেছি। দীপঙ্কর আর এ বাড়ি আসবে না। কেন আমি ওকে চড় মারতে গেলাম? আমি নিজেই তো ওকে প্ররোচিত করলাম। ওর সঙ্গে কী এক খেলায় মেতে উঠতে চাইছিলাম—আমিই তো। তা না হলে ও আমাকে জড়িয়ে ধরার সাহসই পেত না।

বাবা একটু সকাল-সকাল ফিরে এলেন। লোডশেডিং নেই দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে আবার সুদিন ফিরে আসবে। সুলক্ষণ অনেক দেখলাম আজ। আর জানিস? ভকতলালের সঙ্গে দেখা হল। একথা ওকথার পর বলল সুবিধে মতো জায়গা খুঁজছে—গোডাউন বানাবে। তখন আমি বললাম, আমার বাড়িটা বেচব। বেচে টাউনের ভেতরে চলে যাব। ভাল হবে না?'

আমি চুপ করে আছি দেখে বাবা বললেন, 'কী হয়েছে ঝুম? মন খারাপ করছে?'

কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বাবা আমার দুকাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে এলেন। তখন সামলে নিয়ে বললাম,

'তাই করো বাবা আমরা আর এখানে থাকব না।'

'তার জন্য কান্নার কী আছে রে? বলছি তো!'

'আমরা এ শহরেই আর থাকব না।'

'তা মন্দ বলিসনি।' বাবা সায় দিলেন। 'নে—আর কান্নাকাটি নয়। খুব কড়া করে চা খাইয়ে দে। ভকতলালের কথায় মনে বড় জোর পেয়েছি। ও রেল-ইয়ার্ডের কাছাকাছি জায়গা খুঁজছে ওয়াগনে করে মাল আসবে ওর। ডেলিভারি নিয়ে গোডাউনে ঢোকাবে। ওর খুব সুবিধেই হবে। দাম কত চাইব ভেবে পাচ্ছি না। দীপুর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।'

কেরোসিন কুকার জ্বেলে কেটলি চাপিয়ে ফিরে এলাম বাবার কাছে সুশান্তর কথা বলার জন্য।....

দীপু

ভেবে দেখলাম, খোলা আকাশের তলায় ঘুরে বেড়ানো—কোথাও আটকে না থেকে চক্কর মেরে বেড়ানোই নিরাপদ। এতকাল তো তাই করেছি। সেদিন বিকেলে ঝিলের ধারে ঘাসের ওপর বসে ভাবতে ভাবতে আমার ঘিলু সাফ হয়ে গেছে। পাঁই-পাঁই করে ঘুরে বেড়াব চরকির মতো। কারুর তোয়াক্কা করব না। কাউকে পাত্তা দেব না। কারুর নাগালের মধ্যে আর যাবই না। বাইরে বাইরে থাকব।

বাড়ি ঢুকতেও আজকাল বড় গা ছমছম করে। আমাকে দেখামাত্র সবগুলো মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। হওয়া নিশ্চয় স্বাভাবিক। এত মানুষের কাজকর্ম জুটছে, আমার কিছু জোটে না। যদি বা তেমন কিছু জোটার সুযোগ আসে, আমিই নাকি তা বরবাদ করে ফেলি। আসলে কেউ বোঝে না, আমি আমার যোগ্য কিছু চাইছি—মহৎ কোনো কাজ—যথার্থ ভদ্রলোকের করার উপযোগী কাজ। বাবা একবার তিরিশটে টাকা দিতে চেয়ে বলেছিলেন, 'কলকাতা চলে যা। গেঞ্জি কিনে ফুটপাতে ফিরি করগে।' রাগ করে কদিন সত্যি কলকাতা চলে গিয়েছিলাম, তারপর এখানে-ওখানে হন্যে হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। ওঁরা বুঝি ভেবেছিলেন, আমি আর ফিরব না। খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। কখনও বাবা বলেছেন, 'বরং পানবিড়ির দোকান দে।' কখনও বলেছেন 'রেজিস্ট্রি অফিসে ডিডরাইটার হতেই বা লজ্জা কী? স্বাধীন পেশা।' নিদেনপক্ষে প্রাইভেট টিউশনি করাও তো যায়। মাঝে মাঝে তাও না করি যে, তা নয়। কিন্তু কামাই করা আমার স্বভাব। ব্যাপারটা ক্রমশ রটে যাওয়ার ফলে আমি চাইলেও হয়তো আর টিউশনি পাব না।

আসল কথাটা হল, আমি ভাল কিছু, মহৎ এবং উপযুক্ত কিছুর প্রত্যাশায় আছি। সকালে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ঢুঁড়ি। কদাচিৎ তেমন পেয়ে গেলে দরখাস্ত লিখি। ডাকে পাঠাই। প্রতীক্ষা করি। কোন একদিন আমার ডাক আসবেই আসবে। তখন এই নোংরা, ক্ষয়াটে, ক্রিমিনালে ঠাসা, কুৎসিত শহরটার মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

ঝুমের হাতের চড়টা খেয়ে অন্তত এই শিক্ষাটুকু হয়ে গেছে যে এমন জঘন্য একটা শহরে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারটাও খুব বোকামি। আমার প্রেম-ভালবাসার সাধটা খতম হয়ে গেছে। সাগরিকার সঙ্গে প্রেম করার নেশাটাও চিড় খেয়ে গেছে। ঝুম মেরেছে চড়, সাগরিকা মারতেই পারে স্লিপার। অনেক আগেই এটা বোঝা উচিত ছিল, আমার। সবকিছু দেরিতে বোঝাই হয়তো আমার মূল সমস্যা।

দুদিন পরে বাড়ি ফিরেই শুনলাম, দিবাস্যার আমাকে খুঁজছেন। যাইনি। সন্ধ্যায় শুনলাম ঝুম এসেছিল আমার খোঁজে। বাড়িতে হিড়িক পড়ে গেছে টের পেয়েছি। ওরা আমাকে কেন খুঁজছে, এ যেন একটা ধাঁধা। আমি কিন্তু ভারি মজা পেয়ে গেছি। রোজ বেশির ভাগ সময় ঝিলের অন্যদিকে ঘুরে রেল-ইয়ার্ডে চলে যাই। সারবাঁধা ওয়াগন দেখি। রহস্য ঘনীভূত হয়। কী আছে ওদের ভেতর—সত্যকার সেরা সম্পদ, নাকি ভূষির বস্তা, কয়লার চাঙড়, রাসায়নিক সার? সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে দেখতে বন্দুকবাজ প্রহরীরা দীর্ঘ সময় ধরে শিকারী চিতার মতো ওয়াগনের আড়ালে হেঁটে যায়। বাতিগুলি লাল হয়, নীল হয়। হুইস্‌ল বেজে ওঠে ঈশান কোণে! স্টেশনের দিকে ঘণ্টাধ্বনি হয়।

জোরালো শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ফেলতে কালো ইঞ্জিনের পরিশ্রমী শরীর ভেসে যায়। তারপর কতক্ষণ ঝড়ের শব্দ। চোখ বুঝে শুনি বড় রহস্যময় এইসব শব্দ, এবং লাল-নীল বাতি—এইসব সবুজ ও লাল রেলগাড়ি।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেষ দিকটায় বেঞ্চে একা বসেছিলাম। মাথার ওপর কৃষ্ণচূড়ার বর্ণাঢ্য ছাতা। সবে সন্ধ্যার বাতি জ্বলে উঠেছে। ডাউন ট্রেন একটু আগে ছেড়ে গেলে যে কোলাহল জেগে উঠেছিল, ধীরে থেমে গেছে। স্তব্ধতা আর নির্জনতা স্টেশনে ও রেল-ইয়ার্ডে ছমছম করছে। এমন সময় কেউ এসে আমাকে ডাকল। তাকিয়ে দেখি, সুশান্ত।

'আরে শান্ত যে!' খুশি হয়ে ওকে ডাকলাম, 'আয়, বস্। অনেককাল তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।'

সুশান্ত পাশে বসে বলল, 'তোকে খুঁজছিলাম দীপু!'

ওর মুখে হাসি নেই দেখে একটু অস্বস্তি হল। সুশান্তও আমাকে কেন খুঁজছে বুঝতে পারছিলাম না। এ শহরে তার বড্ড বেশি দুর্নাম। একবার কয়েক মাস যেন জেলও খেটেছিল। মুখে তেমনি হাসি রেখে বললাম, 'আমি হঠাৎ সবার কাছে এত প্রয়োজনীয় হয়ে গেছি দেখছি। অনেকেই আজকাল আমাকে খোঁজে। ব্যাপার কী?'

সুশান্ত বলল, 'ঝুম তোকে কিছু বলেনি?'

হকচকিয়ে গেলাম। 'না তো! কবে আমাকে খুঁজতে গিয়েছিল বাড়িতে। কী ব্যাপার রে শান্ত?'

সুশান্ত আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে প্ল্যাটফর্মের বাতির ছটা পড়েছে। চোখদুটো জ্বলছে। গলার ভেতর বলল, 'তুই আমার ক্লাসমেট ছিলিস বহুবছর। নৈলে ট্রাবল হত। একটা কথা বলি শোন্ তুই কিন্তু আমাদের নেটের খুব কাছে এসে গেছিস। এই নেটের আওতায় যে আসে, তার বেরুনো অসম্ভব।'

শুকনো হেসে বললাম, 'কী সব বলছিস রে! মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না।'

'পারবি।' সুশান্ত চারমিনারের প্যাকেট খুলে সিগারেট দিল। 'এই সেটআপটার মধ্যে সবাই কিন্তু তোর আমার মতো লেখাপড়া জানা লোক নয়। একেবারে ইলিটারেট আর গোঁয়ার গোবিন্দ লোকও আছে। দরকার হলে তারা নিজের ফাদার-মাদারকে ....' সে অদৃশ্য ড্যাগারে পেট ফাঁসানোর ভঙ্গি করল।

শিউরে উঠলাম। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বললাম, 'আমি কী করেছি শান্ত?'

সুশান্ত দেশলাই জ্বেলে আমাকে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই যেটুকু জেনেছিস, সেইটুকুই ডেঞ্জারাস। পান্নার কাছে যেদিন গিয়েছিলি, সেদিন থেকে তোর লাইফ রিস্ক। আমি তোর দায়িত্ব নিয়েছি। নৈলে....'

'নৈলে?'

সুশান্ত হাসল। 'বাঁচতিস না।'

'কিন্তু আমি তো কাকেও বলিনি। বলবও না।' প্রাণের ভয়ে কাকুতি মিনতি করার মতো বললাম। 'বিশ্বাস কর, আমি প্রাণ গেলেও বলব না। তাছাড়া দিবাস্যারের মানসম্মানের প্রশ্নও কম নয়—ভেবে দ্যাখ্ শান্ত!'

সুশান্ত আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মালটা সাধারণ কিছু হলে কথা ছিল না। ওটা যাদের নেওয়ার কথা, নিতে আসছে না। সেটাই প্রব্লেম। আগে এক দফা নিয়ে গেছে—সেটাও ঝুমদের বাড়িতে ছিল। কিন্তু এ দফায় ট্রাবল দেখা দিয়েছে।'

'কী আছে ওর মধ্যে?'

সুশান্ত বলল, 'বলব না। বুঝতেই পারছিস, ওয়াগনব্রেকাররা আজেবাজে মাল নিয়ে তত ভোগে না। বিস্তর বিজনেসম্যান হাঁ করে আছে গেলার জন্য। ওই মালটা ঝুমদের বাড়ি রাখার কারণ আছে বলেই রাখা হয়েছে। একটা ভীষণ সেইফ জায়গা খুঁজে বের করা হয়েছে বুঝলি না? ভুলেও কারুর মাথায় আসবে না দিবাস্যারের বাড়ির কথা।'

সে হাসতে লাগল। বললাম, 'ঠিক আছে। আমি কাউকে বলব না। কথা দিচ্ছি।'

'তুই তো আউটসাইডার হয়ে বলছিস ওকথা। তোর কথার কী দাম আছে?'

'বললি তো, নেটের মধ্যে এসে গেছি।'

'মধ্যে নয়, খুব কাছাকাছি।'

মরিয়া হয়ে বললাম, 'ধরে নে না, আমিও তোদের একজন।'

'ধরে নেওয়ার ব্যাপাব নয, দীপু। তুই একটা ডিসিশান নে।'

'কিসের?'

'কী করবি, তার।'

'বললাম তো, প্রাণ গেলেও কাউকে বলব না।'

ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং প্রচণ্ড মানসিক তোলপাড় চলছিল, তাই কিছু লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ দেখলাম পেছন থেকে আরও তিনজন ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল। একজন আমার অন্যপাশে বসল। দুজন সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রেল-ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশের জনকে আমি চিনি। ধনহরি চাওলার ছেলে ফটিক। সে একটু হেসে বলল, 'কী বলছে দীপুবাবু?'

আমার মাথার খুলির ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া শনশন করছে খুলির ভেতর। একটা লোকও এগিয়ে আসছে না।

সুশান্ত বলল, 'বলছে অনেক কিছু। কিন্তু ......' সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা যুবকদের উদ্দেশে বলল, 'কী রে?'

ওদের একজন বলল, 'চল্, যাই।'

সুশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারা করল, 'আয়।'

'কোথায়?'

'আয় তো।'

আমাকে কি খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে! আমার শ্বাসনালী কেটে ফেলবে কি? ফটিক বলল, 'উঠুন দীপুবাবু। ঝটপট।' সে আমার একটা হাত ধরল। ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

সুশান্ত হিসহিস করে বলল, 'দীপু, গোলমাল করলে তোকে বাঁচাতে পারব না। চলে আয়।'

ফটিকের হাতে যেন ড্যাগার দেখলাম, চোখের ভুল হতেও পারে। সুশান্ত আমার কাঁধে হাত রেখে এগোলো। ওরা একটু তফাত রেখে আসতে থাকল পেছনে। স্টেশন ঘরের সামনে গিয়ে লোকজনের সামনে ইচ্ছে হল, 'বাঁচাও' বলে চেঁচিয়ে উঠি। কিন্তু এমন দৃশ্য নিজেও কতবার দেখেছি। কেউ বাঁচাতে আসে না। সুশান্ত আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছে—এমন ও অন্তরঙ্গ ভঙ্গি। সে কিছু অনর্গল বলছে। কানে ঢুকছে না। ওভারব্রিজে উঠে গিয়ে শেষবার পৃথিবী দেখার চোখে তাকালাম।

ওরা আমাকে উল্টো দিকে নিয়ে গেল। নিচে নেমে ফটিক রুমালে আমার চোখ বেঁধে দিল। লাইনের ধারে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে আমি হাঁটছিলাম, সুশান্ত আমার কাঁধে হাত রেখে নিয়ে যাচ্ছিল। আর কেউ কোন কথা বলছিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাঁদিকের এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় ঘোরালো আমাকে। প্রতিমুহূর্তে প্রতীক্ষা করছিলাম ফটিকের ড্যাগার আমাকে ছোঁবে। ছুঁচ্ছে না বলেই ব্যাপারটা একঘেয়ে লাগছিল। একখানে ঠোক্কর খেয়ে পড়লে সুশান্ত আমাকে ধরে বলল, 'সরি!'

সেই সময় মনে হল, অনেক আগেই ড্যাগারটা ঢুকে গেছে পিঠের দিকে—নৈলে শিরদাঁড়া শির শির করছে কেন?

আস্তে আস্তে আমার ভয়টা চলে গেল। ফাঁসির মুহূর্তে আসামীর হয়তো এরকমটি হয়। ইচ্ছে করলেই এখন আমি 'মরণরে তুঁহু মন শ্যাম সমান' বলে গান গাইতে পারি। বরং মন্দ লাগছিল না—বেকার হয়ে থাকার চেয়ে মন্দ কী! যন্ত্রণার নিশ্চয় একটা লিমিট আছে। শ্বাসনালী কাটুক, কিংবা পিঠে ড্যাগার ঢুকিয়ে হার্ট ফুটো করে দিক, সামান্য দু-এক মিনিটের ব্যাপার। চোখ বুজে পড়ে থাকা যাবে।

একবার জজকোর্টের সামনে ফাঁসির রায় হয়ে যাওয়া এক আসামীকে দেখেছিলাম। তাকে একজন

কনস্টেবল বোঝাচ্ছিল, 'দুনিয়া বহৎ ঝকমারি জায়গা। তার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল। আরে, তুমি তো মালুম করতেই পারবে না কী হল বেপারটা। চাক্কা খেঁচল কী হইয়ে গেল! বাস!'

আসামী লাল চোখে তাকিয়ে শুনছিল। ....

পছন্দমতো জায়গা পাচ্ছে না বুঝি। কতদূর নিয়ে গেল। চোখে রুমাল। তবু টের পাচ্ছিলাম আগাছার ঝাড়, গ্রাম, জলকাদা পেরিয়ে যাচ্ছি। তারপব শক্ত মসৃণ রাস্তায় পৌঁছলাম।

একটু পরে সুশান্ত বলল, 'চৌকাঠ আছে। সাবধানে।'

ভ্যাপসা গরম সেখানে। কেমন একটা লোহালক্কড়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম। কোথায় কারা কথা বলছিল। তারপর সুশান্ত আমার চোখ থেকে রুমাল খুলে নিল। চোখ জ্বালা কবছিল। একটা ছোট্ট ঘর। নোংরা মেঝে আর দেয়াল। মিটমিটে বাল্ব জ্বলছে। একটা তক্তপোশে মাদুব পাতা রয়েছে। ময়লা একটা বালিশও আছে।

সুশান্ত বলল, 'চিনতে পারছ দীপু?'

বললাম, 'না'।

'ঠিক আছে।' বলে সে বেরিয়ে গেল।

ফটিক এবং তার দুই সঙ্গী মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে বইল। দেখলাম ফটিকের হাতে কিছু নেই। সুশান্ত ফিরে এসে বলল, 'এখানেই থাক্ তুই। বুঝলি? কোন অসুবিধে হবে না। খাবি-দাবি, ঘুমাবি। কিন্তু সাবধান, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবি নে। তাহলে বাঁচাতে পারব না।'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না। পালাব কেন? আমার তো অফিস নেই যে অ্যাবসেন্ট হয়ে যাব—মাইনে কাটবে।'

সুশান্ত হাসল না। 'আমার নিজের রেসপনসিবিলিটিতে তোকে বাঁচিয়ে রাখলাম, দীপু।'

'বুঝতে পেরেছি। আমি এখানেই থাকব।'

একটা রোগা ঢ্যাঙা লোক—তার গোঁফ আছে। প্রকাণ্ড কেটলি ভরে চা আনল আর কয়েকটা মাটির ভাঁড়! সবাই বন্ধুর মতো একসঙ্গে তক্তপোশে বসে চা খেলাম। সুশান্ত লোকটাকে বলল, 'বাবুকে সিগারেট যা লাগবে দেবে।' সে চলে গেলে সুশান্ত তার প্যাকেট আর দেশলাইটা দিয়ে বলল, 'এটা রাখ্। ও আবার দিয়ে যাবে।'

সিগারেট টানতে টানতে বললাম, 'ভীষণ গরম লাগবে যে শান্ত !'

'একটা হাত পাখা চাইবি।'

'মশা নেই তো?'

'মশারি দেবে!' বলে সুশান্ত উঠে দাঁড়াল। তাবপর 'আচ্ছা, চলি—যা বললাম, মনে রাখবি।' বলে সে ইশারায় ফটিকদের ডেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। চাপা গলায় কাউকে কিছু বলছে শুনলাম। হাঁসকল নড়ার শব্দ হল। তারপর তালা দেওয়ার ক্লিক।

এদিকের দরজাটা একটু বড়ো। উঁকি মারতে গিয়ে দেখি বেঁটে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের ঘরে। ক্ষীণ আলো টেরচা হয়ে পড়েছে। সার-সার বস্তা আর টিনের পিপে দেখলাম। এ তাহলে কারুর গুদাম ঘর। বেঁটে লোকটার পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি। গোল মুণ্ডু। একচিলতে গোঁফও আছে। তাকে নেপালি বলে মনে হচ্ছিল। তার কুতকুতে চোখে হাসি জ্বলজ্বল করছিল। সে ইশারায় সরে যেতে বলল আমাকে। তারপর ভারি দরজাটা হ্যাঁচকা টানে বন্ধ করে দিল। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তক্তপোশে বসে পড়লাম ভ্যাবলার মতো।

তারপর ক্রমশ আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। বুঝলাম, বাইবেল গ্রন্থে ঠিকই লিখেছে, জ্ঞান হচ্ছে পাপ। আমি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছি। আমার অবস্থাও অ্যাডাম বাবাজীর মতো কতকটা—স্ত্রীলোকের প্ররোচনা পেছনে আছে। ঝুম যদি আমাকে পান্নার বাড়ি ডেকে না নিয়ে যেত, এসব কিছু ঘটত না।

ছোট্ট এই গুমোট ঘরটার ভেতর চোখ বুলিয়ে এতক্ষণে মনে হল, এর চেয়ে শ্বাসনালী ফাঁক হয়ে গিয়ে আবদুলের মতো ঘাসে চিৎ হয়ে পড়ে থাকাও ভাল ছিল। মেঝেয় ইঁদুরের গর্ত, আরশোলার

চলাফেরা, জানলাহীন দেয়ালের ওপর দিকে শুধু একটা ঘুলঘুলি, আর এই নোংরা মাদুর, তেল চিটচিটে দুর্গন্ধ বালিশ, তক্তপোশটাও নড়বড়ে এবং নিশ্চয় ছারপোকায় ভর্তি, এ দেখছি একটা সাংঘাতিক নরক !

ফের ইচ্ছে হল, জোরে চেঁচাই—'বাঁচাও বাঁচাও।' কিন্তু ভরসা পেলাম না। তখন ফের একটা চারমিনার ধরালাম।

কান দুটো এখনও জ্বালা করছে। ফটিকের রুমালের গন্ধটা কিছুতেই যাচ্ছে না। মুখ ধুয়ে ফেলতে পারলে ভাল হত। ঘরের ভেতর কি জলের কুঁজো আছে। খুঁজে পেলাম না। তক্তপোশের তলাটা দেশলাই জ্বেলে খুঁজলাম। ইঁদুরের গর্ত আর মাটির স্তূপ উঁচু হয়ে আছে। এ ঘরে সাপ নেই তো? তক্তপোশের ওপর উঠে পা তুলে বসলাম।

কতক্ষণ পরে মনে হল, এই বিছানায় নিশ্চয় কেউ শুয়েছে এতদিন। আমি তার শোবার জায়গা দখল করেছি। সে জীবিত না মৃত কে জানে। মনকে বোঝালাম, নিশ্চয় সে জীবিত মানুষ এবং এই গুদামঘরের একজন পাহারাদার। ওই নেপালি লোকটাও হতে পারে। এবং তা যদি হয়, তাহলে সাপের ব্যাপারে আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

আরও একটু ভাল জায়গায় আমাকে ওরা রাখতে পারত।

আমার কোন ঘড়ি নেই। বালিশটা মাদুরের তলায় রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ঠ্যাং দুটো উঁচু করে নাড়াচ্ছি, তখন বিকট শব্দ করে ভেতরের দরজা খুলে গেল। সেই লোকটা একটা টিফিন কেরিয়ার এনেছে। অন্য হাতে টর্চ। ন্যাকা হেসে বলল, 'খান বাবু দু-মুঠো। আমি জল নিয়ে আসি।'

খিদে পেয়েছিল। এনামেলের বড় ঘটিতে সে জল আনলে মুখটা ইঁদুরের গর্তের কাছে রগড়ে ধুলাম। রুমাল বের করে মুছে বললাম, 'এ ঘরে সাপ নেই তো দাদা?'

লোকটা বলল, 'আজ্ঞে না বাবু। সাপ নেই। তবে বিছে দু একটা থাকতেও পারে।'

'একটু ভাল ঘর পাওয়া যায় না?'

সে খিক খিক করে হাসল। 'এ কি শ্বশুরবাড়ি পেয়েছেন বাবু? এ হল গোডাউন।'

টিফিন কেরিয়ারের ঢাকনা খুলে আগে শুঁকলাম। গন্ধটা মন্দ নয়। খিদে চাঙ্গা হয়ে উঠল।...

দিবাকর

গুঁফো কমলার কথা শুনে দমে গেলাম। ভকতলাল নাকি একেব নম্বর চিট। তার ওপর সস্তাখেকো লোক। কমলাকান্ত বলল, 'কখনো ওর পাল্লায় পড়ো না। ও তুমি চেনো না—চেনার কথাও না। তুমি ছেলে ঠেঙানো মাস্টার। আমি বিজনেসম্যান। আমি চিনি। পূর্ণিয়া থেকে যখন এল, তখন খৈনি বেচত। চিটিংবাজি করে এখন আড়তদার হয়েছে।' কমলাকান্তের কথার মানে বুঝলাম না। যে লোকটা খৈনি বেচে, তার আড়তদার হবার মধ্যে গণ্ডগোলটা কী? তবে চিটিংবাজ হলে ভয়ের কথা। বললাম, 'ঠকাবে বলছ?'

'আলবাৎ ঠকাবে। তোমার ওই বাড়ির জায়গাসুদ্ধ দাম হওয়া উচিত কমপক্ষে তিরিশ হাজার।'

'অত হবে না।'

গুঁফো খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল। 'তাহলে তো মাথা পেতে দিয়েই আছ দেখছি। আমি বলি শোনো, তোমায় খদ্দের দেখে দেব। ওকে পাত্তা দিও না।'

'কীভাবে ঠকাবে ভকতলাল? আমি তো নগদ টাকা গুনে নেব- -তারপর দলিলে সই করব।'

কমলাকান্ত গম্ভীর হল। 'একবারে টাকা ও দেবেই না। ইনস্টলমেন্টে দেবে দেখবে। তোমার তো জানার কথা না। আমি জানি। গতমাসে হাজারীপুরের ঘাটে—গঙ্গায় ব্রিজ হয়নি এখনও। নৌকোয় ট্রাক পারাপার হয়। ইচ্ছে করে নৌকো ডুবিয়ে বদমাশরা মালগুলো উদ্ধার করে। গোপনে বেশিটাই বেচে দেয়। কোম্পানির লোকেরও এতে যোগসাজশ থাকে। ভকতলাল নাকি সেইসব মাল কিনে ধরা পড়েছিল। প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে গেছে। গোডাউনে ভেজা মাল দেখে কেউ

পুলিশের কানে তুলেছিল। তার ফলে ভকতলালের পয়সাকড়ির নাকি খুব টানাটানি চলছে। জায়গা কিনবে কোত্থেকে?'

গল্প শুনে হাসতে হাসতে বললাম, 'আমার বাড়ি কিনে গোডাউন বানিয়ে তাহলে চোরাই মাল রাখার ইচ্ছে ভকতলালের!'

'তাছাড়া আর কী? নিরিবিলি একটেরে পড়ে থাকা জায়গা। ওখানে কেউ বসবাসের জন্য আসবে না। ওদিকে রেল দফতর, এদিকে রোডস দফতর—তার ওপাশে ঝিল আর ময়লা ফেলার জায়গা। তোমায় কবে বলেছিলাম, ওই বেহদ্দ জায়গা ছেড়ে চলে এস।'

জায়গাটা এমন বেহদ্দ ছিল না। বছরে বছরে শহরের চেহারা বদলে এই অবস্থা হয়েছে। আমার ছেলেবেলায় এখানটা ছিল শহরের বাইরে একটা ছোট্ট গ্রামমতো। ক্রমশ উচ্ছেদ হয়ে গেছে রোডস দফতরের চাপে। কী সুন্দর শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ ছিল। কত গাছ ছিল। পাখি ছিল। এখন খাঁ খাঁ করে চারদিক। পোড়ো জায়গা জুড়ে খালি আগাছার জঙ্গল। শহরের ডাম্পিং গ্রাউন্ড। দুর্গন্ধ ছোটে। রাস্তার ওধারে পুরনো শিবমন্দিরের চত্বরে গাঁজাখোরদের আড্ডা। গা ঘিন ঘিন করে বাড়ি থেকে বেরুলেই।

ভেবেছিলাম সন্ধ্যাবেলা ভকতলালের গদি হয়ে আসব। গঙ্গার ব্রিজের মুখে একটা নতুন বাজার হয়েছে। সেখানেই ওর বিশাল কারবার।

কিন্তু গুঁফো যা বলল, আর ওর নাগালে যেতে ইচ্ছে করল না। মনটা তেতো হয়ে গেছে। দিনকাল ভেতর ভেতর কত সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে; অতটা তলিয়ে ভাবিনি। চারদিকে খালি ঠক, জোচ্চোর, ওয়াগনব্রেকার গিজ গিজ করে বেড়াচ্ছে। কাকে বিশ্বাস করব?

আবার একবার দীপুদের বাড়ি গেলাম ওর খোঁজ নিতে। ছেলেটার ওপর বড্ড মন বসেছিল। প্রাণ খুলে কত কথাবার্তা বলতাম। হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিল কেন বুঝতে পারছি না। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, ঝুম ওর সঙ্গে হয়তো খারাপ ব্যবহার করেছে। ঝুমকে কিছু বিশ্বাস নেই। ওর বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। কিন্তু ঝুমও তার খোঁজে গিয়েছিল যখন, তখন বোঝা যায়, দীপুর না আসার কারণ ঝুম নয়।

দীপুর জন্য ভাবনায় পড়ে গেছি। খামোকা নিরীহ ছেলে আমার বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আমারই ভুলে। হারামজাদা খুনীগুলো যে ওর ওপর তাক করেছে, ওকে জানানো দরকার।

হরিসাধন—দীপুর বাবা, রোয়াকে বসে বিড়ি টানছিল। বলল, 'দীপু সেই দুপুরে বেরিয়েছে শুনছি। ওর কথা আর বলো না মাস্টার।' তারপর সে গলা খাটো করে ফের বলল, 'একটু খুলে বল দিকি কী ব্যাপার? রোজ ওকে খুঁজতে আসছ। ব্যাপারটা আমার ভাল মনে হচ্ছে না। শুনলাম, তোমার মেয়েও এসেছিল খুঁজতে।'

সে রোয়াক থেকে উঠে আমার পাশে-পাশে হাঁটতে থাকল। বললাম, 'আরে না, না! তেমন গোপনীয় কিছু নয়, দীপু স্কুলে আমার প্রিয় ছাত্র ছিল। তাছাড়া.....'

'সে কি জানিনে? তুমি বিনে পয়সায় ওকে প্রাইভেট পড়াতে।' হরিসাধন হাসছিল। তুমি ওকে কত স্নেহ করতে, কে না জানে।'

'ভাই হরি, আসল কথাটা তবে বলি।' ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালাম। হরিসাধন আমার চেয়ে লম্বায় খাটো। আমার মুখের দিকে তাকাল। রাস্তার আলো ওর চোখে পড়েছে। কাঁচা পাকা পুরু গোঁফ, শক্ত নাক, গালে একটা জড়ুল। লোকটাকে আমার বড় ভাল লেগে গেল ওর ছেলেটার মতোই। আহা, কত কষ্ট করে অতবড় একটা ফ্যামিলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কথাটা হল, 'দীপু আমাদের ওপর রাগ করেছে। তাই হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।'

'রাগ! তোমার ওপর?' হরিসাধন আবার হাসল। ইঃ ভারি আমার রাগ! নিষ্কম্মার ধাড়ি—নির্লজ্জ! শোনো মাস্টার, 'ওকে পাত্তা দিও না বেশি। মাথায় উঠবে। কিন্তু তোমার ওপর রাগের কারণটা কী হল বাবুর?'

'ওকে বকেছিলাম! কাজকম্মের চেষ্টা না করে খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো......'

হরিসাধন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বলেছিলে .... বেশ করেছিলে। ওকে থাপ্পড় মারোনি কেন? হতভাগা গাড়োল গোমুখ্যু! বাড়ি ফিরুক, ওকে কান ধরে তোমার কাছে নিয়ে যাব—পায় ধরে ক্ষমা চাওয়াব। বাঁদর কোথাকার!'

ওর কাছ থেকে চলে এসে আপন মনে খুব হাসলাম। অতি সরল লোক হরিসাধন। সেজন্যেই বেচারাকে এ বয়সে দলিল লিখে খেতে হচ্ছে। চালাক-চতুর হলে এবং অসৎ লোক হলে এ শহরের মাতব্বর হয়ে যেত এতদিনে।

চকবাজারে চৌমাথা পেরিয়ে এসে হঠাৎ হাসিটা নিভে গেল। আমি কোন্ মুখে হাসছি? ছেলেটা যে কোন সময় বিপদে পড়তে পারে। ওকে ওয়াগনব্রেকাররা শ্বাসনালী কেটে আবদুলের মতো শুইয়ে রাখতে পারে ঘাসের ওপর এবং ভন ভন করে মাছি উঠতে পারে ওর মুখে, আর তার জন্য আমিই ধর্মত দায়ী—অথচ আমি হাসছি। বাড়ি ফিরে এলাম অস্থির হয়ে। একটা ক্ষীণ আশা জেগেছিল, হয়তো ওকে দেখতে পাব ঝুমুর সঙ্গে গল্প করছে উঠোনের রোয়াকে। কিন্তু ঝুম দরজা খুললে দেখলাম, দীপু নেই। তাকে জিজ্ঞেস করলাম না কিছু। অভ্যাসমতো বললাম, 'কড়া করে চা দে তো মা! আজ অনেকদূর হাঁটাহাঁটি করেছি।'

চা এনে ঝুম বলল, 'দীপুদার দেখা পেলে?'

'না রে। তবে ওর বাবাকে বলে এলাম।'

'কী বলে এলে?' চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

হাত নেড়ে অশ্বস্ত করলাম ওকে। 'অত বোকা আমি নই। কিন্তু .....' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামালাম।

ঝুম বলল, 'কী?'

'কেন দীপু আসা ছেড়ে দিল বল তো?'

'এক কথা কতবার বলব? লুডো খেলতে ঝগড়া করল। তারপর বেরিয়ে গেল।'

'ঝুম! নিশ্চয় তুই ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলি। তোর মেজাজ তো আমি জানি।'

ঝুম সরে গেল সামনে থেকে। ঝুমের জন্য আমার বড় ভাবনা হয়। ওর যা মেজাজ, পৃথিবীসুদ্ধ লোককে চটিয়ে ফেলে বিপদ ডেকে আনবে।

রাতে খাওয়ার পর রোয়াকে একটু বসেছি, লোডশেডিং চলছে, দরজায় কড়া নড়ল। 'ঝুম! নিশ্চয় দীপু এসেছে বলে হন্তদন্ত গিয়ে দরজা খুললাম। আমার পাশ দিয়ে কে হুড়মুড় করে বাড়ি ঢুকল। বললাম, 'দীপু?'

'আমি সুশান্ত স্যার!'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। দরজা আটকে দিয়ে বারান্দায় এলাম। ঝুম বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। সেও হয়তো দীপুর কথা ভেবেছিল। হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দিল।

সুশান্তকে কতকাল পরে দেখলাম, স্মরণ নেই। ওর বাবা ভেলু মুখুজ্যে ছিল তুখোড় মাতাল। ওদের জমিদারি ছিল একসময়, পরে অবস্থা ভীষণ পড়ে যায়। ভেলু মুখুজ্যে খুব কষ্ট পেয়ে রোগে ভুগে মারা পড়ে। সুশান্ত বরাবর দুর্ধর্ষ চরিত্রের ছেলে ছিল। কলেজ থেকে নাকি ওকে বের করে দিয়েছিল। তারপর ও ক্রিমিন্যাল হয়ে পড়ে। ওর সম্পর্কে কত ভয়ংকর সব গল্প শুনেছি। আশ্চর্য, ওর ছেলেবেলার সেই রাঙা টুকটুকে চেহারাটা এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সুশান্ত বলল, 'ঝুম নিশ্চয় আপনাকে সব বলেছে স্যার?'

'বলেছে।' মোড়াটা দেখিয়ে বললাম, 'বসো সুশান্ত! অনেকদিন পরে তোমাকে দেখলাম।'

সুশান্ত আমাকে প্রণাম করল না তো! ক্রিমিন্যাল হোক—যা খুশি হোক, আমার প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে একটা প্রণাম প্রত্যাশা করি। সুশান্ত মোড়ায় বসে বলল, 'একটা জরুরী কথা বলতে এলাম আপনাকে। ঝুম, তুমিও শুনে রাখো। যদি কেউ দীপুর খোঁজে আসে, বলবেন জানি না।'

কথাটা শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বললাম, 'তা তো ঠিকই। দীপুর সঙ্গে তিনদিন আমার দেখা হয়নি। ঝুমেরও। কিন্তু একথা কেন বলছ সুশান্ত?'

'কারণ বলা যাবে না স্যার।'

'ওকে কি তোমরা মেরে ফেলেছ?'

সুশান্ত জিভ কাটল। 'না—না। কী যে বলেন স্যার? ওকে আমরা এক জায়গায় পাঠিয়েছি। ফিরতে দেরি হবে।'

ঝুম হাসল একটু। 'বাঃ! দীপুদা তাহলে তোমাদের দলে ঢুকে গেল?'

সুশান্ত বলল, 'হুঁউ। নেটের কাছাকাছি যে আসে, সেই নেটে ঢুকে যায়। আর বেরুনো হয় না। কারণ বেরুলেই বডি হয়ে যায়।'

'নেটটা কী সুশান্ত?'

আমার প্রশ্ন শুনে সে হাসল। 'চিন্তা করলেই বুঝবেন। আপনারা কিন্তু নেটের মধ্যে এসে গেছেন স্যার। বোথ ইউ অ্যান্ড ঝুম।'

'সুশান্ত, এসব কি উচিত হচ্ছে তোমাদের? নিরীহ নির্দোষ মানুষদের কেন তোমরা এমন করে জড়াচ্ছ?' আমার গলা ধরে এল বলতে বলতে। চোখ ফেটে জল এল। গলা ঝেড়ে বললাম, 'আমাদের জীবনটা নষ্ট করে কী লাভ হচ্ছে সুশান্ত?'

সুশান্ত চোখ কটমট করে তাকাল। 'পান্নাকে প্রথম দিনই না করতে পারেননি? এখন এসব বলে কী হবে?'

'ভয়ে পারিনি—বুঝতে পারছ না?'

'ভয়ে হোক, যেভাবে হোক, একবার মাথা গলিয়েছেন যখন, তখন আর উপায় নেই।' সুশান্ত একটু চুপ করে থেকে ফের বলল, 'গোড়া থেকে এই দলটার সঙ্গে জড়িত থাকলে আমি পান্নাকে বাধা দিতাম। কিন্তু পরে আমার কাঁধে রেসপন্সিবিলিটি এসে গেছে। আমি এখন মাল কোথায় সরাব বলুন? চারদিকে চোখ। এই যে আপনার বাড়ি এলাম, সেটা আমি বলেই। পান্নার গ্যাং বলে পরিচিত যারা, তারা কেউ আর আপনার বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবে না। তাহলে চোখ পড়বে। মালটাও যাবে—আপনার হাঙ্গামার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। ভীষণ হিড়িক পড়ে গেছে বুঝলেন না?'

'ওতে এমন কী আছে সুশান্ত, যার জন্যে ......'

সুশান্ত কথা কেড়ে বলল, 'আপনি কাগজ টাগজ পড়েন না বুঝি ?'

'না। ভাল লাগে না। খালি খুনোখুনি চুরি ডাকাতি আর রাজনীতিওলাদের খেয়োখেয়ির খবর। আমি সহ্য করতে পারি না সুশান্ত।'

সুশান্ত ঝুমের দিকে ঘুরে বলল, 'ঝুম পড়ো না?'

ঝুম আস্তে মাথাটা দোলাল।

'গত পরশুকার কাগজটা কোথাও পেলে পড়ে নেবেন স্যার।' সে উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ—আর একটা কথা, এখন কিছুদিন বাইরে কারুর সঙ্গে আপনারা মেলামেশা পারতপক্ষে করবেন না। কেউ বাড়ির ভেতর যেন না আসে। আত্মীয়-স্বজনের কথা আলাদা। কিন্তু অন্য কাউকে বাড়ির ভেতর অ্যালাউ করবেন না। আত্মীয়-স্বজনকে ভুলেও কোন হিনট্স দেবেন না।'

'আমায় তো স্কুলে যেতে হবে।'

'যাবেন। কিন্তু কোন আজেবাজে কথা কাউকে বলবেন না। এসব বলছি শুধু আপনাদেরই সেফটির জন্য কিন্তু। চলি ঝুম!'

সে চলে গেল। বাড়ি প্রচণ্ড নিঃঝুম। চাপা সন্ত্রাসে আচ্ছন্ন। ঝুম বাইরের দরজা বন্ধ করে এসে বলল, 'তুমিই ভুল করেছ। যদি পান্নার ডাকে ভয় পেয়ে দরজা না খুলতে!'

কিছু বলালম না। ভয় তো পেয়েই ছিলাম। যেদিন আবদুলের মড়াটা দেখি, সেদিন থেকেই ভয় আমার পিছু নিয়েছিল। তারপর ওরা আমাকে হিমাংশু ডাক্তারের কাছে যেতে দিল না—কুমুর মৃত্যু হল। বুঝলাম, আমি কত অসহায়।

ঝুম বলল, 'যা হবার হবে! শুয়ে পড়ো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

সে তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। ঘরে যা গরম। আকাশে নক্ষত্র

ঝকমক করছে। বাতাস বন্ধ। কানে আসছে রেলইয়ার্ডে ইঞ্জিনের চেরা গলার চিৎকার। মাঝে মাঝে চাপা গুড় গুড় শব্দ। তারপর শুনি, আচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আবার সেই লোকটা ভারি গলায় বলে উঠল, ওয়াগন...... ওয়াগন......ওয়াগন!

ঘটাং ঘট্ ..... ঘট্ ঘটাং .... অন্ধকারে টেনে হিঁচড়ে মালগাড়ি নিয়ে চলেছে কালো ইঞ্জিন—তার বুকের ভেতর লাল আগুনের দাপট। কাত হয়ে ঝুলছে ড্রাইভার, ফ্যায়ারম্যানদের মড়া। একটার পর একটা রোদবৃষ্টি খাওয়ায় রঙচটা পুরনো ওয়াগন ঘটাং ঘট্ .... ঘটাং ঘট্। শেষ দিকটায় রোগা টিঙটিঙে চেহারার গার্ড —তার চোখ দুটো থেকে হলুদ আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে এবং আমার দিকে তাকাতে তাকাতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। .....

পরদিন স্কুলের লাইব্রেরিতে খবরের কাগজের ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে আড় চোখে দেখে নিলাম কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে নাকি। প্রসূন এসে একটু হেসে বলল, 'কাগজ পড়ছেন? তারপর সে চলে গেল একটা বই খুঁজে নিয়ে। ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেছে। লাইব্রেরী ফাঁকা। শুধু কোনার দিকে সতীশ সিঙ্গি বসে রেজিস্ট্রারে কলম চালাচ্ছে।

দিন হিসেব করে কাগজের পাতা টুঁড়ছিলাম। খুঁজে পেলাম না। তেমন কোন খবর। তখন সতীশকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাঁ হে সিঙ্গি, সম্প্রতি কাগজে এখানকার কথা কিছু লিখেছে নাকি? পড়েছ?'

সতীশ রেজিস্ট্রার থেকে মুখ তুলে বলল, 'হুঁউ। ফিফ্‌থ্ মে। পাঁচেব পাতা দেখ। একেবারে নিচের দিকে।'

খুঁজেই পেলাম না। বললাম, 'কৈ— তেমন কিছু তো.....'

সতীশ সিঙ্গি খিক করে হাসল। 'কখনও তো কাগজ পড়তে দেখি না। অভ্যাস না থাকলে তো খুঁজে পাবেই না। নিয়ে এস—দেখিয়ে দিচ্ছি। ছোট করে ছেপেছে বটে, খবরটা সাংঘাতিক।'

সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল জায়গাটা, দেখি, পেন্সিলে কে একটু দাগ দিয়েও রেখেছে। 'ডিনামাইট চুরি।' ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম ছোট হরফের হেডিংটার দিকে। আমার গায়ে ঘাম গড়াতে লাগল। .... প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতাপগড়ে অবস্থিত অস্ত্রকারখানা থেকে সম্প্রতি রেলে কিছু ডিনামাইট এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম কলকাতা পাঠানো হয়। কৃষ্ণগঞ্জ স্টেশনের রেলইয়ার্ডে ওয়াগনব্রেকাররা একটি ওয়াগন ভাঙাব সময় সেন্ট্রিরা চার্জ করে। একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। বাকিরা তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় পুলিশ নিকটবর্তী জলায় একটি মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে পবে। কিন্তু প্রতিরক্ষা দফতরের চালান অনুসারে দেখা যায়, ডিনামাইটের একটি বাকসো উধাও। জোর তদন্ত চলছে।'.......

আমার ঘরে খাটের তলায় তাহলে ডিনামাইটের বাকসোটাই নির্দোষ চেহারায় পড়ে আছে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল। আচ্ছন্ন চোখে পরের প্যারাটাও পড়ে ফেললাম। আমার জানা দরকার .... আরও বেশি জেনে রাখা দরকার।

'কৃষ্ণগঞ্জ রেলইয়ার্ডে ওয়াগনব্রেকারদের দৌরাত্ম্য নতুন নয়। ইতিপূর্বে আর এক দফা ওয়াগন ভেঙে দুষ্কৃতকারীরা প্রতিরক্ষা বিভাগেরই পাঠানো কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগের ধারণা, এ দুটি ঘটনা নিছক ওয়াগনব্রেকারদের কর্ম নয়—এর পেছনে উগ্রপন্থীদের হাত আছে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের উদ্দেশ্যেই এবারে অস্ত্রশস্ত্র চুরি করা হয়েছে। কুখ্যাত ওই রেলইয়ার্ড সম্পর্কে রেলবিভাগকে সচেতন করা হয়েছে বহুবার। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। ....

হুঁ—পান্না প্রথমবারও এমনি একটি বাকসো রেখে গিয়েছিল।

কাগজ বুজিয়ে রেখে আমি চুপচাপ বসে আ৷ সতীশ বলল, 'পড়লে? কী অবস্থা তাহলে বোঝ।' সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। তারপর আমার দিকে একটা সিগারেট আর দেশলাই ছুঁড়ে দিল। 'খাও! শরীর-টরির সেরেছে তো? তোমায় দিনে দিনে বড় রোগা দেখাচ্ছে দিবু, কোবরেজী করাচ্ছ না কেন? আসলে বায়ুদোষ থেকেই ব্রেনে চোট পড়ে। বুঝলে তো? আর ব্রেন হল তো তোমার স্বাস্থ্যের ভাইটাল পয়েন্ট। ঘুম হবে না। আহারে রুচি হবে না।'

বললাম, 'সিগারেট খাব না ভাই। মাথাটা কেমন করছে।'

'হেডবাবুকে বলে বাড়ি চলে যাও তাহলে।'

তাই করলাম শেষ পর্যন্ত। রিকশো করে বাড়ি ফিরলাম। ঝুম উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'শরীর খারাপ নাকি ?'

ভেতরে ঢুকে চাপা গলায় ওকে সব বললাম। শুনে ঝুম খুব ভয় পেয়ে গেল। যদি হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যায়, কী হবে? এতদিন এক ভয়ে ছিলাম, এবারকার ভয়টা আরও সাংঘাতিক। জেনেশুনে বিছানার তলায় ডিনামাইট নিয়ে শোয়া।

. রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট্ট ঘর আছে। ওটা একসময় ভাঁড়ারঘর ছিল। এখন রাজ্যের ভাঙাচোরা অকেজো জিনিস রাখার জায়গা হয়েছে। দু'জনে অতি সাবধানে বাকসোটা বের করে ওঘরে নিয়ে গেলাম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ যদি ফেটে যায়! ভাঙাচোরা নানান জিনিসের তলায় কোনার দিকে ওটা ঢুকিয়ে রাখলাম। আমাব গায়ে আর একটুকুও জোর ছিল না। ঝুম ছেঁড়া দুর্গন্ধ তোশক আর ছোবড়া গদি আস্তে করে চাপিয়ে দিল ওদিকটায়। তারপর দরজা এঁটে দিল।

কিছুটা দুর্ভাবনা চলে গেল। জামাকাপড় ছেড়ে এক গ্লাস জল খেয়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম। ঝুম পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। 'আর নয় বাবা। যথেষ্ট হয়েছে। এবার একটা কিছু করা দরকাব।'

'কী করব বল্ তুই?

'পুলিশকে জানিয়ে দাও।'

'তুই পাগল হয়েছিস? তাহলে আমরা আব বেঁচে থাকতে পারব? শহর জুড়ে ওদের লোক।'

'আমরা পুলিশ প্রটেকশান চাইব।'

'বোকার মতো কথা বলিসনে, ঝুম। চুপ করে থাক্। আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

ঝুম রুষ্ট মুখে একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমরা হয়তো ভুল করছি। ওদের যত ক্ষমতা আছে ভাবছি, তত ক্ষমতা মোটেই নেই। আমরা হয়তো মিথ্যা ভয় পাচ্ছি।'

আস্তে বললাম, 'তুই ছেলে হলে ভয় পেতাম না ঝুম।'

ঝুম আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝুম

এতদিন পরে এই প্রথম সন্দেহ জেগেছে বাবার ওপর। সন্দেহটা তাড়ানোর জন্য নিজর সঙ্গে সবসময় তর্ক করে যাচ্ছি। অথচ যাচ্ছে না সেটা।

ধরা যাক প্রথমবারের ঘটনাটা। রাতে পান্নারা যে চোরাই জিনিস রেখে গেল ঘরে, বাবার তখনই আমাকে ঘুম থেকে উঠানো উচিত ছিল। কেন ওঠাননি? এমন কি, পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানতেও দেননি। দ্বিতীয়বারও ঠিক তাই করলেন। কিন্তু সকালে বারান্দায় কাদা আর জুতোর ছাপ আর ছাপগুলো বাবার ঘরের ভেতরও আবিষ্কার করলাম। তা নাহলে বাবা এবারও চেপে যেতেন।

বাবা নিশ্চয় ওদের প্রশ্রয় দিয়েছেন। ছেলেদের ওয়াগনব্রেকার হবার পরামর্শ দেওয়ার মধ্যে যেন নিছক পাগলামি বা খেয়ালিপনার পরিচয় ছিল না। আগাগোড়া ভাবতে গিয়ে খালি মনে হচ্ছে, বাবার এসবে যেন সায় থেকেছে। উনি বুঝি একটা গণ্ডগোল চাইছেন। চাইছেন একটা হুলস্থূল, ভাঙচুর, বিশৃংখলা। বাইরের লোকে ওঁর আচরণে পাগলামি দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। একটু-আধটু খামখেয়ালি চালচলন বাবার বরাবরই আছে।

অথচ ছেলেবেলা থেকে জানি এবং দেখে আসছি বাবার মতো সৎ ভদ্র নীতিবাদী মানুষ খুব কমই আছেন। সারাজীবন অভাব-অভিযোগের মধ্যে কাটিয়েও শান্ত এবং অবিচল থেকেছেন।

যদি উনি টাকা পাওয়ার লোভে পান্নাদের চোরাই মালের জিম্মাদার হতেন, তারও একটা মানে থাকত। আমি জানি, বছরের পর বছর মায়ের অসুখের চিকিৎসা করতে বাবাকে দেনাদার হতে হয়েছে। ওয়াগনব্রেকারদের টাকায় দেনা শুধলেও বুঝতাম এর পেছনে একটা যুক্তি আছে।

তাহলে কেন বাবা তাদেব সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন? আমি বিশ্বাস করি না, সরকারের

ক্ষমতার চেয়ে ক্রিমিন্যালদের ক্ষমতা বেশি। পুলিশ হয়তো ঘুষ খেয়ে ওদের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু তাই বলে পুলিশ ওদের শায়েস্তা করবে না, এটা যুক্তিই নয়। দীপু 'মাফিয়া'র গল্প করেছিল। কিন্তু আমাদের দেশে কি সত্যি সে অবস্থা এসেছে? আমার মনে হয় না তা।

বাবার ওপর সন্দেহটা আরও জোরালো হচ্ছে কাগজের খবরটা জানার পব। সত্যি যদি এই লম্বাটে বাকসোটাই সেই ডিনামাইটের বাকসো হয়, তাহলে যেন বাবার অনেক টুকরো-টুকরো কথার সঙ্গে একটা যোগসূত্র পেয়ে যাই। তারক ডাক্তারের সঙ্গে মায়েব অসুখের ব্যাপারে ঝগড়া করে এসে বাবা বলেছিলেন, 'সব ভাঙচুর করা দরকার। সব উড়িয়ে দেওয়া দরকার। ঘরবাড়ি মানুষজন কল-কারখানা ডিস্পেন্সারি হাসপাতাল চরমার করে ফেলো। সব পচে বিষাক্ত হয়ে গেছে। আগুন জ্বালিয়ে দাও।'

দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলেছিলাম, 'ওসব কী করছ বাবা? অত চেঁচামেচি করছ কেন রোগীর কানের কাছে?'

বাবা বাইরে গিয়ে থুথু ফেলেছিলেন সশব্দে। বাবাকে সেই প্রথম থুথু ফেলতে দেখেছিলাম। তারপর থেকে মাঝে মাঝে বিকৃত মুখে থুথু ফেলতে দেখি। এ তো একটা প্রচণ্ড ঘৃণার প্রতীক।

তারপব দীপঙ্করেব হঠাৎ আবির্ভাব, বাবাব সঙ্গে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথাবার্তা—আর সুশান্ত বলে গেল, তাকে ওরা কোথায় কী কাজে পাঠিয়েছে—সব মিলিযে মনে হল, আমার অজান্তে একটা বড় ব্যাপার ঘটেছিল। দীপঙ্করও আসলে একই দলের লোক।

বিকেলে বাবা অভ্যাসমতো বেড়াতে বেরুলেন। তার কিছুক্ষণ পরে প্রসূনবাবু এসে বললেন, 'দাদা কখন স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এলেন, দেখা হয়নি। শুনলাম শরীর খারাপ। তাই ভাবলাম—যাই একবার খোঁজ নিয়ে আসি।'

একটু হেসে বললাম, 'থাক। অত কৈফিয়ত আপনাকে কে চেয়েছে?'

লাজুক প্রকৃতির ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'না—না। কৈফিয়ত নয়। শুনলাম....'

'আপনি বসুন।'

বাধ্য ছেলেব মতো উঠোনের রোয়াকে বসলেন প্রসূনবাবু। বললেন, 'দাদা নেই বুঝি?'

'না। বিকেলে তো কোনদিন বাবা থাকেন না।'

'বেড়াতে-টেড়াতে যান বুঝি?'

আমি ভাবছিলাম, এই ভদ্র নিরীহ চেহারার তরুণ শিক্ষকটি নিশ্চয় ভেতরে-ভেতরে দীপুদের দলে নেই! সাবধানে, যতটা পারি ঢেকে-চেপে ওঁকে কি ব্যাপারটা জানিয়ে পরামর্শ চাইব?

প্রসূনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরালেন। বললাম, 'গ্রীষ্মের ছুটি পড়ছে কবে?'

'এই তো আগামী শুক্রবার থেকে।'

'দেশে যাবেন নিশ্চয়?'

প্রসূনবাবু হাসলেন। 'আর কোন্ চুলোয় যাব বলুন? আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'দেখি—এখনও কিছু ঠিক করিনি।'

'দাদার স্বাস্থ্যের যা অবস্থা, কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যান বরং। হিমালয় এলাকায় যাওয়াই ভাল।'

মনে মনে হাসছিলাম। এ জীবনে কি কোথাও বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হবে? মায়ের দার্জিলিং দেখার সাধ ছিল। মেটেনি। আমার কোথাও যাবার সাধ নেই। বললাম, 'আপনি গেছেন কখনও হিমালয়ে?'

'পাগল!' প্রসূনবাবু শুকনো হাসলেন। 'পয়সা কোথায়? বিরাট ফ্যামিলি বার্ডেন কাঁধে।'

কথার কথা হিসেবে বললাম, 'আমার মনে হয়, বেড়াতে যাওয়াটা আসলে নেশার ব্যাপার। এমন অসংখ্য লোককে জানি, পয়সাওলা নয়—অথচ প্রতি বছর কত জায়গায় ঘুরে আসে। আমরা আসলে ঘরকুনো কেউ-কেউ।'

এইসব এলোমেলো কথার ফাঁকে প্রসূনবাবুকে চা খাওয়ালাম। মনের ভেতর একটানা অন্য কথার গুনগুনানি চলেছে। ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না কিছু।

উঠোনের পাঁচিল থেকে ফিকে রোদটুকু আস্তে আস্তে পাংশুটে হয়ে গেল। তারপর বললাম, 'আচ্ছা

প্রসূনবাবু, বাবা বলছিলেন, কৃষ্ণগঞ্জ নিয়ে কী একটা সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে যেন। পড়েছেন?'

'ও হ্যাঁ। রেলইয়ার্ডে একটা ওয়াগন ভেঙে ডিনামাইট লুঠ করেছে কারা।'

'ওয়াগনব্রেকারদের কীর্তি। কৃষ্ণগঞ্জে তো ছারপোকার মতো গিজগিজ করছে ওরা।'

প্রসূনবাবু চশমা খুলে ধুতির খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, 'মূল প্রব্লেম হল আনএমপ্লয়মেন্ট। তার ওপর ল অ্যান্ড অর্ডারের দুরবস্থা। তবে যাই বলুন, লোকে কাজ না পেলে করবে কী? মাঝে মাঝে আমি স্টেশনে বেড়াতে যাই। গিয়ে দেখি, এতটুকু সব বাচ্চা থেকে শুরু করে নানা বয়সী মেয়েরা পর্যন্ত চালের পুঁটুলি নিয়ে ট্রেনে উঠছে। কখনও দেখি, সবার চোখের সামনে ইঞ্জিন থেকে কয়লা পাচার হচ্ছে। প্রব্লেমটা হল অন্যত্র। এদিকে প্রতিদিন কাগজ খুললেই দেখবেন, ব্যাংক ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই। সর্বত্র ক্যাওস। আনম্যানেজেবল অবস্থা।'

'কিন্তু ডিনামাইট চুরির মানে কী? ও দিয়ে কী হবে?'

প্রসূনবাবু চাপা গলায় বললেন, 'কাগজে ঠিকই লিখেছে। কোনো এক্সট্রিমিস্ট গ্যাং ওয়াগনব্রেকারদের দিয়ে এটা করিয়েছে। ওয়াগনব্রেকাররা টাকা পাবে ডিনামাইটটার বদলে।'

'এক্সট্রিমিস্টরা কী করবে ডিনামাইট দিয়ে?'

'ডেস্ট্রাকশন। ব্রিজ ওড়াতে পারে। কলকারখানা ওড়াতে পারে।'

'তাতে লাভ কী ওদের?'

প্রসূনবাবু শিক্ষকোচিত ভঙ্গিতে বললেন 'ধ্বংসের একটা নেশা আছে। তবে বিদেশী কোনো শক্তির হাত থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে-ক্ষোভ থেকেই ধ্বংসের নেশা চাড়া দেয়। বিদেশী কোনো শক্তি তার সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিতেই পারে। তাছাড়া আর্থিক ব্যাপারটা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তবে আপনি লক্ষ্য করবেন, সারা পৃথিবীতে যেন ধ্বংসের নেশা মানুষকে পেয়ে বসেছে। একটা সভ্যতার চরম মুহূর্ত আসন্ন।'

হাসলাম। 'আপনি বাবার মতোই বলছেন!'

'দিবাদার ইতিহাসে নেশা আছে। বলতেই পারেন।'

হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা প্রসূনবাবু, ধরুন—হঠাৎ যদি ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করেন, চুরি যাওয়া ডিনামাইটটা আপনার বিছানার তলায় কেউ লুকিয়ে রেখে গেছে, আপনি কী করবেন?'

প্রসূনবাবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'তক্ষুনি পুলিশকে জানিয়ে দেব।'

'ধরুন, তার আগেই আপনাকে ডিনামাইট চোর প্রাণের ভয় দেখিয়ে শাসালো?'

প্রসূনবাবু একটু দমে গেলেন। 'রহস্য-রোমাঞ্চের বইতে এমন পড়েছি বটে!'

'কী বলছেন! রহস্য রোমাঞ্চ আর বইয়ের পাতায় নেই। আমাদের বাস্তব জীবনে নেমে এসেছে।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছেন। আজকাল যা ঘটছে, তাই বটে।'

'কিন্তু বলুন, কী করবেন? পুলিশে যাবেন এরও পরে?'

'দেখুন, ব্যাপারটা সত্যি ভাববার মতো। কারণ পুলিশের কাছে যাওয়াটাই আজকাল অত সহজ হয়ে নেই। শুনেছি, পুলিশকে কেউ ভালমানুষি করে কিছু জানাতে গিয়েও বিপদে পড়ে। ক্রিমিন্যালরা ঠিকই জেনে যায় তার নামধাম।'

'আমার প্রশ্নটার জবাব দিলেন না কিন্তু!'

প্রসূনবাবু শুকনো মুখে একটু হাসলেন। 'যদি ব্যাপারটা তাই হয়—মানে আমার ক্ষেত্রে, তাহলে তো সত্যি বিপদ। আমাকে তো সবসময় পুলিশ গার্ড দিতে পারবে না। আমার ফ্যামিলি বার্ডেন আছে। আমার কিছু হলে একদঙ্গল মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তবে হ্যাঁ—ডিনামাইটটার জন্যে মোটা পুরস্কার ঘোষণা করা হোক। ধরুন হাজার দশেক। আমি তাহলে ভয় পাব না। আমাকে মেরে ফেললে আমার ফ্যামিলি দশহাজার টাকা পাবে। জানেন? জীবনে আমাদের বাড়িতে কেউ—কোনো পুরুষেই একসঙ্গে দশ হাজার টাকা দেখেনি?'

জোরে নিঃশ্বাস পড়ল আমার। উত্তেজনা গোপন রাখতে পারছিলাম না। 'তাহলে বলছেন, পুরস্কার ঘোষণা না করলে পুলিশকে জানাবার রিস্ক আপনি নেবেন না। এই তো?'

প্রসূনবাবু পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। ঠোঁটের কোনায় সেই ক্ষীণ হাসিটা। 'হঠাৎ একথা কেন বলুন তো? নিশ্চয় ডিনামাইট বক্সটা আপনাদের বাড়িতে কেউ লুকিয়ে রাখেনি?'

বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। তারপর শক্ত হলাম। খুব আস্তে বললাম, 'রেখেছে।'

'আপনি যা বললেন, আর একবার স্পষ্ট করে বলুন প্লিজ!'

'আঃ! বলছি তো—রেখেছে।'

'আপনাদের বাড়িতে?' প্রসূনবাবু দম আটকানো গলায় বললেন। 'মানে—ঘরে? কোন্ ঘরে?'

চুপ করে থাকলাম। ওঁকে লক্ষ্য করছিলাম। ওঁর মুখ ফাঁক হয়ে গেছে। জিভের ডগা দেখা যাচ্ছে.....যেন ব্লটিং পেপারের মতো মুখ দিয়ে বাতাস শুষে নিচ্ছেন।

ফের শ্ব'স-প্রশ্বাস জড়ানো গলায় হাঁসফাস করে বলে উঠলেন, 'ওটা এক্সপ্লোসিভ। বিপজ্জনক। দৈবাৎ এক্সপ্লোশান ঘটে গেলে বাড়িসুদ্ধ উড়ে যাবে। ওটা ফেলে দিয়ে আসা উচিত—ওই তো বাড়ির পেছনে এত জঙ্গল!'

ঝাঁঝালো স্বরে বললাম, 'হ্যাঁ—তারপর ওরা এসে আমাদেব মেরে ফেলুক।'

'মেরে ফেলবে বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

বারান্দায় এগিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলাম। আবছা আঁধাব নিয়ে সন্ধ্যা ঘিরেছে। রান্নাঘরের তাক থেকে হেরিকেনটা নামিয়ে ধরালাম। তারপর বাবান্দায় থামের কাছে রেখে দেখলাম, প্রসূনবাবু গুম হয়ে বসে আঙুলের নখ কামড়াচ্ছেন। আমি কাছে গেলে বললেন, 'দাদা জানেন তো?'

'জানবেন না কেন?'

'যে রেখেছে, তাকে শিগ্‌গির নিয়ে যেতে বলুন তাহলে।'

'ওদের নাকি কী অসুবিধা আছে। সময় হলে নিয়ে যাবে।'

প্রসূনবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কিন্তু দৈবাৎ কোনোভাবে টের পেয়ে পুলিশ এলেই তো কেলেংকারি।'

'সে জন্যই আপনার পবামর্শ চাইছি। বলুন, কী করা উচিত।'

'আমার মাথায় কিছু আসছে না। কিছু আসছে না। বিশ্বাস করুন—আমার জীবনে এমন কিছু ঘটলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। দাদার অবস্থা এজন্যেই অমন হয়েছে।'

প্রসূনবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তাবপর বললেন, 'আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। বাড়ির ভেতর অমন সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আপনারা কাভাবে যে কাটাে ''—ইস। কী বিপজ্জনক অবস্থা।'

গলা চেপে ফের বললেন, 'এক কাজ করুন না। কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যান কোথাও। দাদাকে আমিও বলছি বরং। যত শিগ্‌গির হয়, ধরুন—কালই চ'লে যান। যারা জিনিসটা রেখেছে, তারা যখন খুশি নিয়ে যাক তালা ভেঙে। পুরো গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফিরবেন আপনারা। ততদিনে নিশ্চয় আপদ বিদায় হয়ে যাবে।'

পরামর্শটা ভাল লাগল। বললাম, 'একটু বসুন না প্লিজ! বাবা ফিরে আসুন। তারপর .....'

প্রসূনবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, 'সাতটায় দুটি ছেলে পড়তে আসবে। আমি বরং কাল সকালে আবার আসব। কেমন?'

প্রসূনবাবু চলে গেলে কথাটা ভাবতে থাকলাম। ভদ্রলোক বুদ্ধিমান। এটা কেন যে আমার মাথায় আসেনি কে জানে! হয়তো বাড়ি ছেড়ে বাইরে গিয়ে কাটানোর অভ্যাস তত নেই বলেই আসেনি।.....

দিবাকর

ঝুমের ওপর রাগ করে রাতে আর খেলামই না। ও নিজেও খাবে না জানি। কিন্তু কী করব? আমার খুব রাগ হয়েছিল ওর কথায়। বলে কী, ভেতর-ভেতর আমি এক্সট্রিমিস্টদের সিম্প্যাথাইজার হয়ে রয়েছি। ওকে বোঝাতে পারলাম না, ধ্বংস শুধু আমি একা নই—প্রত্যেকটি মানুষ আজ মনে প্রাণে

চাইছি—কিন্তু সেই ধ্বংস, যা ভাল করে গড়বার জন্য। কিন্তু এদের এ ধ্বংস তো নিছক ধ্বংসের জন্য। ভ্যান্ডালিজম।

ঝুমের ওপর আরও রাগ হল, প্রসূনকে কোন্ আক্কেলে ব্যাপারটা জানিয়ে দিল সে? ঠিক এভাবেই দীপু বেচারাকে হঠকারিতায় প্রায় ছুরির ডগায় ঠেলে দিয়েছিল—সম্ভবত দীপু বাধ্য হয়ে ওদের দলে ঢুকে গেছে। এবার যদি ওরা জানতে পারে, প্রসূনও ব্যাপারটা জানে—তাহলে তার বরাতে কী ঘটবে বুঝতে পারছি না। সুশান্ত বলেছিল, আমরা ওদের নেটের মধ্যে চলে গেছি। দীপুও নেটে ঢুকে গেছে। এবার প্রসূনও ঢুকল।

প্রসূন নাকি পরামর্শ দিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন বাইরে গিয়ে থাকি এবং ওরা সময়মতো সাংঘাতিক জিনিসটা নিয়ে যাক। আমরা না থাকলে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকবে। তাতে ক্ষতি নেই।

কিন্তু বিকেলে গুঁফো কমলা যা বলেছে, তাতে আরও ভয় পেয়ে গেছি। আগেই আঁচ করেছিলাম ও-ব্যাটাই ওয়াগনব্রেকারদের রিং-লিডার। প্রথমবারের চোরাই মালটার কথা ওকে জানিয়েছিলাম। তাতে আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ, গুঁফো আমাকে পুলিশের কাছে যেতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এবারকার জিনিসটার কথা তাকে ভুলেও বলিনি। অথচ দেখলাম, সে ব্যাপারটা হয়তো জানে। কথায়-কথায় হঠাৎ কাগজের খবরটার প্রসঙ্গ তুলে চোখ নাচিয়ে গোঁফের তলায় হেসে বলেছিল, 'ডিনামাইটটা তোমার ঘরে রাখেনি তো ব্যাটাচ্ছেলেরা? শুনছি একেবারে কম্বিং অপারেশন শুরু হবে শিগ্‌গির। ওটা যদি ওরা নিয়ে যেতে দেরি করে, বরং কোথাও ফেলে দিয়ে এসো।'

বললাম, 'কী যে বলো! ওসব জিনিস আমার ঘরে রেখে গেলে কবে তোমার পরামর্শ চাইতে আসতাম।'

'জিনিসটা এবার কিন্তু সাংঘাতিক।'

'হুঁ—কয়লা বা ভুসির বস্তা নয়। উত্তরপ্রদেশের সর্ষের বস্তাও নয়। কিংবা লোহালক্কড় যন্ত্রপাতিও নয়। তোমার গিয়ে ডিজেলের পিপেও নয়।'

'হল কী মাস্টার? ডিলিরিয়াম বকছ কেন?'

দেখি, গুঁফোর গোঁফ ফুলে উঠেছে। চোখ টেরা হয়ে গেছে। মুচকি হেসে বললাম, 'ওই যে ডিনামাইট জিনিসটা সাংঘাতিক বললে!'

কমলাকান্ত মুখ গোমড়া করে বলল, 'এক্সপ্লোসিভ সব সময় সাংঘাতিক। তবে আরও সাংঘাতিক, ওটা মিলিটারির জিনিস বলে। কম্বিং অপারেশন কাকে বলে এখনও তো দেখনি। মিলিটারি নামিয়ে দেবে ঝাঁকে ঝাঁকে। চিরুনি দিয়ে যেমন করে চুল আঁচড়াও—অমনি করে কৃষ্ণগঞ্জকে আঁচড়াবে। তুমিও বাদ পড়বে না মনে রেখো। ওদের কাছে স্কুলের পণ্ডিত যা, ওয়াগনব্রেকারও তাই।'

একদমে কথাগুলো বলে গুঁপো ধুপ ধুপ করে মাটি কাঁপিয়ে 'ন্যাপলা ন্যাপলা' বলে কাকে পাম্পের পেছনে ডাকতে গেল। আমি একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। মনে মনে তখন খুব খুশি, গুঁফোকে মুখের ওপর জব্দ করেছি বলে।

কিন্তু এখন রাত যত বাড়ছিল, তত ওর 'কম্বিং অপারেশন' কথাটা মনে পড়ছিল। ভয়ে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল। যদি বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই কিছু দিনের জন্য এবং সুশান্তরা জিনিসটা নিয়ে যাবার আগেই কম্বিং অপারেশন সত্যি শুরু হয়, তাহলে তো আর বাড়ি ফেরা যাবে না। বাকি জীবনের জন্য গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াতে হবে। ব্যাপারটা কল্পনা করতেই হাত পা সিঁটিয়ে পেটে ঢোকার অবস্থা।

টেবিল ফ্যানটা হাঁপানি রুগীর মতো হাঁসফাস করছিল রাত দশটা থেকে। যতক্ষণ চলে, মনে হয় অনন্তকাল ধরে একটা মালগাড়ি চলেছে। কান পাতলেই শুনি ষড়যন্ত্র সংকুল কণ্ঠস্বরে 'ওয়াগন .... ওয়াগন ...... ওয়াগন!' আদিম যুগের তৈরি রোদবৃষ্টি খাওয়া বেরঙা অসংখ্য ওয়াগন পায়ে চাকা বেঁধে ঘটাং ঘটাং করে চলেছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে। জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তার কালো ইঞ্জিন। কী আছে ওইসব ওয়াগনে—জীবন, না মৃত্যুর শস্য? অমৃত, না বিষ? পথে প্রস্তুত চোরাগোপ্তা হানাদার ওয়াগনব্রেকারের গ্যাং। সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে আসে পা টিপে। নেপথ্যের অদৃশ্য প্ররোচনাকারী গমগমে গলায় বলে ওঠে, 'ওয়াগন ..... ওয়াগন .... ওয়াগন!' তারপর শাবলের

শব্দ। হাতুড়ির শব্দ। ....

হঠাৎ মৃত্যুব মতো থেমে গেল নিঃশ্বাস ফেলে টেবিল ফ্যানটা। লোডশেডিং। একটু পরে ভ্যাপসা গরমে ছটফট করতে থাকলাম। ঝুমের ঘরটা এমন গুমোট নয়। পূর্ব ও দক্ষিণের জানলা আছে বলে হাওয়া ঢোকে। নৈলে ওর কষ্ট হত।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম। বারান্দার লাগোয়া বোয়াকে খোলামেলায় গিয়ে দেখি, কৃষ্ণপক্ষের এক টুকরো চাঁদ উঠেছে। ঝিলের দিকে প্যাঁচা ডাকল। তারপর একদল কুকুর ডাকতে লাগল। চমকে উঠলাম। আমাব বাড়িতে মধ্যরাতে হানা দিতে আসছে কি কেউ? কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কতক্ষণ পরে কুকুরের চিৎকার থেমে গেল। হাইওয়ের দিকে চাপা গবগর শব্দ করে চলে গেল রুষ্ট ক্লান্ত একটা ট্রাক। আবার স্তব্ধতা। টুকরো চাঁদের জ্যোৎস্নাটুকু অন্ধকারে ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতে থাকল।

খিড়কির দরজা খুলে দেখতে গেলাম। তারপব দেখি, আবে এ কী? আমার দরজার দিকে কালো কী একটা বিভীষিকা লাল চোখে তাকিয়ে আছে। আতঙ্কে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তারপর ভারি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

ঝিলের ওধারে রেলইয়ার্ড থেকে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল রাতের কালো এক ইঞ্জিন। ঘটাং ঘট্ ...... ঘট্ ঘটাং! তার পেছনে সারবদ্ধ ওয়াগন। শব্দটা বাড়তে থাকল। মনে হল ঝড় উঠেছে। ঘটাং ঘট্ ..... ঘট্ ঘটাং। শব্দপুঞ্জ এগিয়ে আসছে। কাছে আগাছাব জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে আসছে এক অলীক মালগাড়ি। পথভ্রষ্ট স্থবির ইঞ্জিনের বুকে দগদগে লাল ক্ষতের মতো আগুন। তার পেছনে একটার পর একটা টলখাওয়া, এলোমেলো, আহত অজগরের লেজের মতো, ঝড়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ওয়াগন আর ওয়াগন। কী চাও তোমরা? কেন এত কাছে চলে এসেছ? বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলাম তাদের। অন্তিম শ্বাস টানার শব্দে থমকে দাঁড়াল মধ্যরাতের অলৌকিক মালগাড়ি। ওয়াগনের পাল গম্ভীর কোরাসে বলল, 'ডিনামাইট।' ওরা হারানো ডিনামাইট দাবি করতে এসেছে আমার কাছে। আমি বললাম, 'দেব। তোমাদের ডিনামাইট তোমাদেরই ফিরিয়ে দেব। অপেক্ষা করো। এখনই দেব।'........

ঝুম

রাতে ভাল ঘুম হয়নি। একবার যেন দরজা খোলার শব্দ শুনেছিলাম। বাবা রাতে বারবার বেরোন জানি। ভাবছিলাম, আমাকে আবার ডাকবেন। ডাকেননি। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ভোরবেলা বাবা এসে ডাকলেন। 'ঝুম, ঝুম! একবার দরজা খোলো তো!'

কয়েকবার ডাকার পর উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। চোখে ঘুমের ঘোর লেগে আছে তখনও। বাবার পাশে আবছা অনেকগুলো মূর্তি দেখে থমকে উঠলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, পুলিশ। শক্ত হয়ে উঠল সারা শরীর। তাহলে এতদিনে ওরা সব টের পেয়ে গেছে।

বাবা বললেন, 'এঁরা তোমার ঘরটা একবার দেখবেন।'

'কেন?' এই প্রশ্নটা করলাম বটে, তাতে জোর ছিল না।

আমার পাশ দিয়ে দুজন পুলিশ ঢুকে গেল ঘরে। ঘরের ভেতর তখনও আবছা অন্ধকার। তারা টর্চ জ্বালল। তারপর শুরু হয়ে গেল তাদের উপদ্রব। খাটের তলা তোশক, বাক্সো-পেঁটরা, কাঠের আলমারি হুলস্থূল করে খুঁজল। ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। উপদ্রবের ওই শব্দ শিলাবৃষ্টির মতো আমার মাথার ভেতর পড়তে থাকল। আর একদল তখন রান্নাঘরের দিকে চলে গেছে। আবর্জনায় ঠাসা ভাঁড়ার ঘরটা কি এরা তন্নতন্ন খুঁজবে? খুঁজলেই পেয়ে যাবে বাকসোটা। তারপর কী হবে? বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন, 'খুঁজুক ওরা। যা খুশি করুক।'

দেখলাম, ভাঁড়ার ঘরের শেকল খুলে ঢুকল ওরা। ওঘরে তালা দেওয়া থাকে না। আবার বাবা আস্তে বললেন, 'কী পাবে? কিছু নেই।'

বাবা আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। মুখে শান্ত হাসি। ওরা দাপটে খুঁজছে ডিনামাইটের

বাকসোটা। দুমদাম শব্দ হচ্ছে। ভাবছি, এখনই যদি হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে যায়, কত ভাল হয়।

একজন অফিসার এগিয়ে এলেন। 'একটু বিরক্ত করলাম মাস্টারমশাই। কিছু মনে করবেন না।'

বাবা হাসলেন। 'আপনারা কী খুঁজতে এসেছিলেন বলুন তো?'

'বলা যাবে না। যাই হোক, আপনি কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই।'

'মনে করার কী আছে? পেলেন কি তেমন কিছু?'

পুলিশ অফিসারটি বিনয় করে বললেন, 'জাস্ট রুটিন সার্চ। না করলেই নয়।' তারপর আমার দিকে ঘুরলেন সহাস্যে। 'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য দুঃখিত।'

বাবা বললেন, 'ঘুম এমনিতেই ওর ভাঙার কথা। অন্যদিন ছটার আগেই উঠে পড়ে। চা করে আমায় ডাকে।'

কনস্টেবলদের নিয়ে অন্য অফিসারটি কুয়োর পাশটা এবং ল্যাট্রিন পাঁতি পাঁতি খুঁজছিলেন। এবার খিড়কির দরজা খুলে বাড়ির চারপাশটা খুঁজতে গেলেন।

তারপর ফিরে এসে বললেন, এনাফ। এভরিথিং ওকে স্যার।

ওঁর ওপরওয়ালা বললেন, 'ঠিক আছে। গাড়িতে গিয়ে ওয়েট করুন। একটু কথা সেরে নিই।'

ওবা চলে গেলে বাবা বারান্দার চেয়ারটা দেখিয়ে বলেলেন, 'আপনি বসুন স্যার।'

অফিসারটি জিভ কেটে বললেন, 'আমায় স্যার বলবেন না মাস্টারমশাই। জাস্ট একটা-দুটো কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব।'

বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'একশোটা জিজ্ঞেস করুন। আপত্তি কিসের?'

'আপনি কি লালু নামে কাউকে চেনেন?'

'হুঁউ। আমার ছাত্র ছিল। ক্লাস নাইনে স্কুল ছেড়ে দেয়। তারপর দেখেছি চাল পাচারের দলে ঢুকেছিল। একদিন দেখলাম ট্রেনের তলায় পুঁটুলি নিয়ে......'

'ইদানিং কি লালুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'না তো। তাকে তো শুনেছি আপনারা পাকড়াও করেছেন। বেশ করেছেন। জানেন, ওই বদমাশগুলোর জন্যে আমার স্ত্রীর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছিল?'

'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'রেলইয়ার্ডের ওপারে হিমাংশু ডাক্তার থাকে। চেনেন কি ওকে? আমারই ছাত্র ছিল এক সময়। এখন নামকরা ডাক্তার হয়েছে। গত এপ্রিলে রাত প্রায় এগারোটা—হিমাংশুকে ডাকতে যাচ্ছি, আমার স্ত্রীর সিরিয়াস অবস্থা, রেল-ইয়ার্ডের কাছে যেতেই লালু, পান্না, আর হারাই আমার পথ আটকাল।'

'এক মিনিট। লালু, পান্না আর হারাই?'

'হ্যাঁ।' বাবা ভিজে চোখ মুছলেন। 'ওরা তিনজনে আমাকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দিল। ওদের লুটের মাল আনতে যে লরিটা গিয়েছিল, তাতে আমাকে জোর করে ওঠাল। বলল, এখন রেল-ইয়ার্ড পেরুতে গেলে সেন্ট্রি গুলি ছুঁড়েবে।'

অফিসারটি একটু হেসে বললেন, 'মাস্টারমশাইয়ের প্রতি কী দয়া!'

'শিবমন্দিরের কাছে নামিয়ে দিল আমাকে। বলল, কাকেও বললে শ্বাসনালী কেটে ফেলবে।'

'হুঁ। তারপর?'

'এসে দেখি ঝুমের মা বেঁচে নেই।'

'বুঝলাম। ভাববেন না মাস্টারমশাই, এবার গ্যাংটা আমরা খতম করে দিচ্ছি শিগ্‌গিরই।'

'পারবেন না।' বাবা শক্ত মুখে বললেন। 'ওদের পেছনে লোক আছে। তাকে আপনারা ছুঁতেও পারবেন না। সে খুব শক্ত খুঁটি। মহামান্য গণ্য লোক।'

'আপনি জানেন কে সেই মহামান্য লোকটি?'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। 'আঃ কী সব আজেবাজে কথা বলছ?'

বাবা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গুঁফো কমলার গায়ে হাত দিতে পারবেন আপনারা?'

অফিসার শান্তভাবে বললেন, 'প্লিজ, উত্তেজিত হবেন না মাস্টারমশাই। দেখুন, এবার কী হয়।

আপনি এখন আমার দুএকটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

বাবা থুথু ফেলে বললেন, 'বলুন!'

'পান্নার সঙ্গে ইদানিং কি আপনার দেখা হয়েছে?'

'না।'

'আপনি সুশান্ত চৌধুরীকে চেনেন?'

'হুঁউ। সেও আমার ছাত্র ছিল।'

'সে আপনার বাড়ি এসেছে ইদানিং?'

'না।'

'পথে কোথাও তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।'

পুলিশ অফিসার আমার দিকে ঘুরে আবার একই প্রশ্ন করলেন। বাবার মতো আমিও 'না' বললাম একটার পর একটা। তারপর উনি বাবাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। বাবা মিটিমিটি হাসছিলেন। বাইরে পুলিশের গাড়ির শব্দটা শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেলে ডাকলাম, 'বাবা!'

'কী রে ঝুম?'

'রাতে সুশান্ত এসেছিল তাহলে?'

বাবা মাথা নাড়লেন।

'আসেনি? তাহলে কে নিয়ে গেল ওটা?'

'ওয়াগনবৃন্দ।'

'আঃ! কী বলছ!'

বাবা রহস্যময় ভঙ্গিতে গলার ভেতর বললেন, 'ওই যে কালো ইঞ্জিনের পেছনে যোতা থাকে একটার পর একটা। কাল দুপুর রাতে ওরা এসেছিল, বুঝলি তো? বলল, ফেরত দিলাম।'

ফুঁসে উঠলাম। 'এ কী পাগলামি করছ। আমাকে কি ভাবছ এখনও এতটুকু বাচ্চা হয়েই আছি?'

বাবা বললেন, 'চেপে যা। বরং ঝটপট চা করে আন্। আমি মধুর দোকান থেকে গরম গরম জিলিপি নিয়ে আসি। খামোকা রাতটা উপোস করলি—আমিও করলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে রে!'

বাবা পা বাড়ালে ডাকলাম. 'শোনো! ওটা কি তুমি ফেলে দিয়ে এসেছ কোথাও?'

'বেশ করেছি।' বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন।

পুলিশের হঠাৎ আবির্ভাবে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার যে ভয় এসে চেপে ধরল, তা মৃত্যুর। সে-মৃত্যু বড় যন্ত্রণাদায়ক হবে। পুলিশের কাছে ধরা পড়লে গঞ্জনা, অপমান যতই হোক, সুখ-দুঃখের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যেত। কিন্তু এবার সামনে মৃত্যু। আমাদের তাহলে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। হয়তো বাবা সে সিদ্ধান্ত করেই ডিনামাইটের বাকসোটা ফেলে দিয়ে এসেছেন কোথাও। কুকার জ্বালতে পাঁচটা দেশলাইকাঠি নষ্ট করে ফেললাম।.....

দীপু

মশা আর ছারপোকা না থাকলে মন্দ হত না। খাওয়া দাওয়াটা ভালই চালিয়ে যাচ্ছি বলতে হয়। মশা আর ছারপোকার কামড়ে সারা শরীর দাগড়া-দাগড়া ফুলে গেছে। মশারি আর ছারপোকা মারা বিষের কথা বললেই বেঁটে লোকটা কুতকুতে চোখে তাকিয়ে হাসে। রোগাটা বলে, 'দেব, দেব। ভাববেন না।' এই করে দুটো রাত চলে গেল। শেষ পর্যন্ত পেলাম শুধু একটা হাতপাখা। তাও ভাঙাচোরা। মশা তাড়ানো যায় না।

তবে লোকদুটো ভালই মোটামুটি। মাঝে মাঝে তাস খেলতে আসে আমার সঙ্গে। তখন একটা বাড়তি লোকও জুটিয়ে আনে। এ লোকটা নাকি ড্রাইভার। সে ট্রাকের গল্প করতে করতে তাস খেলে। পরস্পরকে নাম ধরে ডাকার ফলে তিনটি নামই জেনে ফেলেছি। গদা, বাহাদুর আর মাব্বু। কোথায়

আছি জিজ্ঞেস করলে ওরা শুধু বলে, 'গোডাউনে।' কার গোডাউন, তা কিন্তু কিছুতেই বলবে না।

কাল সন্ধ্যায় ফটিক এসেছিল। মুখটা তুম্বো করে বলল, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো দীপুবাবু?'

বললাম, 'না, না। খুব ভাল আছি, ফটিক! খাচ্ছি-দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি।'

'শান্তদা খোঁজ নিতে বললে, তাই এলাম।'

'খুব ভাল করেছ। খুব ভাল কবছ।' খুশি হয়ে বললাম। 'তা সুশান্তকে একবার আসতে বলো!'

'শান্তদার সময় হলে আসবে।' .... বলে সঠিক ঘরের ভেতরটা এদিক ওদিক খুঁটিয়ে দেখে চলে গেল।

কী দেখছিল? সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালাবার তালে আছি কি না? সত্যি বলতে কী, দেওয়ালের নিচে এতসব ইঁদুরের গর্ত দেখে সে মতলব একবার গজিয়েছিল মাথায়। কিন্তু সাহস হয়নি। প্রথম কথা, খোঁড়ার মতো কোন জিনিস নেই ঘরে—দ্বিতীয় কথা, প্রহরীরা সব সজাগ। নড়বড়ে তক্তপোশটা একটু মচমচ করলেই সাড়া দিয়ে বলে, 'অ্যাই! কী হচ্ছে?' যদি বলি, 'বাথরুম পেয়েছে,' দরজা খুলে বলবে, 'আসুন লিয়ে যাই।' বস্তার সারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে একটা ছোট্ট দরজা। তারপর উঠোন এক টুকরো। সেখানে লাট্রিন আর টিউবেল। পাঁচিলের ওধারে বড় বড় গাছ। ট্রেনের শব্দ শুনেছি কাছাকাছি। মাটিও কাঁপে। তাই বুঝতে পেরেছি রেললাইনের খুব কাছে কোথাও আছি।

আজ শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কীভাবে। তারপর ঝুমকে স্বপ্ন দেখলাম। জেগে উঠে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে মনে বললাম, 'মেরেছ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?' বেঁচে বর্ত্তে ফিরে যেতে পারলে মুখোমুখি বলব, 'আরও গোটা কতক চড় মারো। চড় খেতে খেতে যদি প্রেমের পদ্ধতিটা শিখে ফেলতে পারি।'

আর যদি এরা আমার শ্বাসনালী কেটে এ ঘরে ফেলে, তাহলে আর কী করা যাবে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনার গর্তের কাছে এনামেলের ঘটি নিয়ে মুখ ধুতে গেলাম। গর্তটার অবস্থা শোচনীয় করে ফেলেছি। ইঁদুরগুলো আমাকে নিশ্চয় মাথা কুটে শাপ দিচ্ছে।

কাল ইঁদুরের কথা উঠেছিল। গদা বলেছে, 'ভাববেন না। একটা বেড়াল এনে দেব।' মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়ল কথাটা। তারপর ভেতরের দরজা খুলে গদা চা আর সিঙাড়া আনলে। বেড়াল প্রসঙ্গ তুলব ভাবছি, সে ফিক করে হেসে বলল, 'ঝট করে খেয়ে নেন বাবু! আপনার ছুটি।'

'ছুটি মানে? ও গদাদা, ছুটি কী বলছ?'

'হ্যাঁ। গণ্ডগোল বেধে গেছে। আমাদের বাবু বললেন, ওঘরের বাবুকে খিড়কি দিয়ে বের করে দিবি।'

'তোমাদের বাবু বড় ভাল লোক। ওনাকে আমার নমস্কার জানিও।'

গদা গলা চেপে বলল, 'আপনার বরাত বাবু! এবেলা মাংসের ঝোল করব ভাবছিলাম। দুদিন খালি মাছ খাইয়েই রাখলাম।'

'তাহলে থেকে যাই গদাদা।'

'আজ্ঞে না। বাবুর হুকুম হয়েছে আপনার ছুটি। আর দেরি করবেন না।'

বাহাদুর উঁকি মেরে বলল, 'জলদি!'

ঢকঢক করে গিলে ফেললাম। মুখে তখনও সিঙ্গাড়ার দলা। চিবুতে চিবুতে উঠে দাঁড়ালাম। গদা বলল, 'ইদিকে আসুন।'

সে সারবন্দী বস্তার ফাঁক দিয়ে সেই ছোট দরজায় নিয়ে গেল। তালা খুলে ফের বলল, 'আসুন।' উঠোনের শেষে আর একটা ছোট্ট দরজা। সেটাও তালা আটকানো। জঙধরা তালাটা অনেক মেহনতে খুলল গদা। তারপর কপাট টেনে ফাঁক করল। কপাটে ঝাঁপিয়ে এসেছে লতাগুল্মের দঙ্গল। কত বছর এ দরজা খোলা হয়নি কে জানে।

আমি ইতস্তত করছি দেখে সে আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে লতাগুল্মের ওপর ফেলে দিল। তারপর দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। হামাগুড়ি দিতে দিতে এগোলাম। মাকড়সার জাল, শুকনো পাতা, পোকা মাকড়ে ভরে গেল শরীর। ফাঁকায় বেরিয়ে দেখি একটা গভীর ডোবা। তলায় একটু সবুজ রঙের জল।

একটা কুকুর হাড় শুঁকছিল। আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়তে থাকল।

পাড়ের ঘন জঙ্গল পেরিয়ে যেতে টের পেলাম মাতালের মতো টলছি। গায়ে এতটুকু জোর নেই। শেষ প্রান্তে একটা বেঁটে গাছের গুঁড়িতে ধুপ করে বসে পড়লাম। সামনে নিচে চষাজমি। কোথাও কচি আখের চাবা মাথা তুলেছে। তারপর গভীর নালার মতো নয়ানজুলির মাথায় রেল লাইন। ডাইনে কিছু দূরে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে ওদের দেওয়া চারমিনাবের প্যাকেট বের করলাম।

সকালের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে পৃথিবী। এই পৃথিবীতে আমি ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। কিন্তু মাংসের ঝোলের কথা মনে পড়ে একটু খারাপ লাগল। ছুটিটা ওবেলায় পেলে মন্দ হত না।

কিছুক্ষণ পরে শুকনো নযানজুলি পেরিয়ে অতি কষ্টে হাঁপাতে-হাঁপাতে রেললাইনে উঠলাম। স্টেশন পৌঁছতে কতবাব থমকে দাঁড়াতে হল। মাথা ঘুরে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম না, কেন হাঁটছি—কোথায় যেতে চাই।..... ...

দিবাকর

গুঁফো কমলা তার পেট্রল পাম্পের সামনে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তার দিকে আর না তাকিয়ে হাইওয়েতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ শুনি, সে ডাকতে ডাকতে পিছু নিয়েছে—'দিবু! ও দিবু! ওহে মাস্টার!'

একটু ভয় হল। পুলিশকে ওর নাম বলেছি—আমাকে আক্রমণ করতে আসছে না তো? ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। কিন্তু গত রাত থেকে আমি মরিয়া হয়ে গেছি। এস্পার না হয় ওস্পার। কেউ যদি আমার শ্বাসনালী কাটতে আসে, আমি এই বেঁটে লাঠিটা তুলে বলব, 'খবর্দার! ছাতু করে ফেলব।'

গুঁফো এসে বলল, 'অত ডাকছি, শুনতেই পাচ্ছ না।'

সে হাঁফাচ্ছিল। প্রকাণ্ড শরীর। এটুকু দৌড়তে এই অবস্থা দেখে সাহস পেলাম। চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললাম, 'কী বলবে বলো।'

গুঁফো হাসল। 'মাইরি বলছি দিবু, তোমার নামে পুলিশকে কিছু লাগাইনি। বিশ্বাস করো তুমি।'

আমিও হাসলাম। 'যদি লাগিয়েও থাকো, বেশ করেছ। কিছু পেল কি পুলিশ? কচু আর লবডংকাটি।'

গুঁফো আমার কাঁধে হাত রাখলে আপত্তি করলাম না। সে বলল, 'আহা শোনই না। দুপুরে আমারও পাম্প, গ্যারেজ, বাড়ি পর্যন্ত সার্চ করে গেছে। তাহলেই বোঝো, আমি তোমার নামে লাগাইনি।'

মনে মনে খুশি হলাম। বললাম, 'তাই বুঝি? ভারি অদ্ভুত তো!'

'তোমায় বললাম না কাল, কম্বিং অপারেশন হবে শহরে? এই তার শুরু।' কমলাকান্ত চাপা গলায় বলতে থাকল, 'ডিফেন্স ডিপার্টের জিনিস। সি বি আইয়ের গোয়েন্দারা ছুটে এসেছে। দেখবে কী হয়।'

মিটিমিটি চেয়ে বললাম, 'কিন্তু মালটা আর খুঁজে পাবে?'

'পেতেও পারে। পুলিশের সোর্সেই শুনলাম, হারামজাদা লালুটাকে ধরেছিল—সে নাকি সব কবুল করেছে।'

থমকে দাঁড়ালাম। তাহলে লালুই বলেছে পুলিশকে আমাব বাড়িতে জিনিসটা রেখেছিল? খামোকা প্রসূন বেচারাকে সন্দেহ করে বসে আছি। ওর মুখ দেখতে হবে বলে আজ স্কুলে যাইনি পর্যন্ত। কাল থেকে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হচ্ছে' অন্তত একটা মাস ওর মুখদর্শন হবে না ভেবে অকারণ গায়ের ঝাল মিটিয়েছি। কাল ওকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিতে হবে। আহা! বড় ভাল ছেলে প্রসূন।'

বললাম, 'তা ওহে কমলা, আব কাকে সব ধরেছে-টরেছে শুনলে?'

গুঁফো কমলা আঙুলের গেরো গুনে বলল, 'ফটিক—ধনহরির ছেলে, তারপরে হেদো, তারপরে বাবলু—ও যে ক্ষ্যান্তবালা ছিল, প্রভাসের বিধবা, তারপরে .... কত নাম বলব। লালু অন্তত পঞ্চাশটা নাম বলেছে।'

'সুশান্তকে ধরেনি?'

'সুশান্ত—মানে চৌধুরীদের?'

'হুঁ।'

'তার নাম তো শুনলাম না।'

'আর পান্নাকে?'

'ধরে ফেলবে। সেই তো পালের গোদা। কতক্ষণ লুকিয়ে বাঁচবে?'

'তাহলে শহরের প্রায় সব ওয়াগনব্রেকারদের ধরে ফেলেছে বলছ?'

গুঁফো খিক খিক করে হাসল। 'ধরেছে তো কী হবে? এমন তো কতবার ধরছে। আবার ছেড়ে দিচ্ছে। কারুর জেল হচ্ছে। ফিরে এসে আবার নতুন উদ্যমে ওয়াগন ভাঙতে শুরু করছে। যা একবার চালু হয়, চলতেই থাকে। বন্ধ হয় না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ কমলা।'

'নাও। সিগারেট খাও।'

গুঁফো আজ আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুল দেখছি। মন্দ লাগছিল না। কথা বলতে বলতে আমরা আধমাইল হাঁটলাম। আজ আর গঙ্গার ধারে যেতে ইচ্ছে করল না। ঝুম একলা আছে। সূর্যাস্তের আগেই ফিরব বলে এসেছি।

বাঁকের মুখে ব্রিজ। সেখান থেকে ঘুরলাম আমরা। বৃষ্টি না হওয়ার কথা, কমলাকান্তের মেয়ের অধ্যাপিকা হবাব কথা, আমার মেয়ের বিয়ে অথবা চাকরির কথা—এমন অসংখ্য কথা আলোচনা করলাম দুজনে। তারপর আমার বাড়ি বেচার কথাও উঠল। কমলা আশা দিল, ভাল খদ্দের শিগ্‌গির দেখে দেবে। তারপর সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'মালটা কি সুশান্ত নিয়ে গেছে?'

আমার দম আটকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তাহলে ঠিকই ধরেছিলাম। আর লুকোচুরি করে লাভ নেই। মনে মনে তৈরি হয়ে নিয়ে বললাম, 'না।'

'কোথায় রেখেছ তাহলে?'

'রেখেছি। কেন?'

গুঁফো আরও তুম্বোপানা মুখ করে বলল, 'খুলেই বলি দিবু, যেভাবে হোক—ব্যাপারটার সঙ্গে আমাকেও শুওরের বাচ্চারা জড়িয়ে ফেলেছে। তা না হলে আমি কেমন্ন করে জানব? এখন প্রশ্ন হল, ওটার একটা উপায় করা দরকার। সব প্ল্যান ভেস্তে গেছে। বুঝলে না? ওটা এখন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ওটা কোথাও ফেলে দাও গে—আজ রাতের মধ্যে।'

একটু হেসে বললাম, 'ঝিলের জলে ফেলে দিয়ে এসেছি কাল রাতে।'

'আচ্ছা!' গুঁফো থমকে দাঁড়াল। 'বাড়ি সার্চ হবে টের পেয়েছিলে তাহলে?'

'অনুমান করেছিলাম।'

'বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে এলাম দুজনে। একদঙ্গল ট্রাক চলে গেল। প্রচণ্ড ধুলো উড়ল। দুজনে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলাম। নাক ঢেকে। তারপর ফের পিছে উঠে বললাম, ঠিক করেছি বলছ তাহলে?'

'হুঁউ।'

'যদি ঝামেলা মিটে গেলে পান্নারা ফেরত চাইতে আসে?'

'চাইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

একটু পরে হাসতে হাসতে বললাম, 'তুমি কীভাবে জড়ালে ওদের সঙ্গে?'

'কতকটা তুমি যে-ভাবে জড়িয়েছ।' গুঁফোর মুখে আর হাসি নেই। 'তবে তোমার জড়ানোটা দৈবাৎ। আর আমি বিজনেসম্যান। ওরা কম দামে চোরাই মাল বেচে। সব বিজনেসম্যান কেনে। আমিও কিনি। এটাই ব্যবসাজগতের রীতি মাস্টার। উপায় নেই—ব্যবসা করতে হলে এই রীতি মানতেই হবে। ডিনামাইটের ব্যাপারটাতে আমায় ওরা জোর করে জড়িয়েছিল। যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে।'

কমলাকান্তের সঙ্গ ছেড়ে বাড়ির পথ ধরলাম। মনে আনন্দ না দুঃখ—বুঝতে পারছিলাম না। আমি ভীত না সাহসী, তাও বুঝে ওঠা গেল না। শুধু বুঝলাম, একটা অন্ধকার আবর্তে আটকে গিয়ে ঘুরপাক

খাচ্ছি। বেরুনোর পথ নেই।

দরজা খুলে ঝুম বলল, 'দীপুদা এসেছে।'

দেখলাম উঠোনের রোয়াকে দীপু কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে ওর? দিনের আলো কমে এসেছে। তবু ওর প্রচণ্ড ধরনের একটা রূপান্তর চোখে পড়ল। আমাদের মতোই বেচারা জড়িয়ে গিয়েছিল একই আবর্তে। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বললাম, 'বসো! বসো! কোথায় ছিলে? তোমাকে দেখে এমন লাগছে কেন? যেন ডেড বডি!'

'ডেড বডিই বটে স্যার! মশা আর ছারপোকারা মিলে সবটুকু রক্ত শুষে নিয়েছে।'

ঝুম বলল, 'ওকে আটকে রেখেছিল সুশান্তরা। দুদিন দুরাত কোথায় একটা গোডাউনের ভেতর রেখেছিল।'

দীপু বলল, 'তবে খাওয়াদাওয়াটা ভালই হয়েছে স্যার। ওদের নিন্দে করাটা অন্যায় হবে।'

'আশ্চর্য!' পাশে বসে ওর গায়ে হাত রাখলাম। 'কেন তোমায় আটকে রেখেছিল?'

ঝুম বলল, পুলিশকে জানিয়ে দেবে বলে।'

'তারপর? তারপর?'

দীপু বলল 'আজ হঠাৎ বলল, আমার ছুটি হয়ে গেছে। তারপর অনেক কষ্ট করে বাড়ি ফিরলাম সকালে। বললাম, গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম। তবে এখন আমি অলরাইট স্যার। দুপুরে প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে নিয়েছি। খাওয়াটা অবশ্য ওদের মতো হয়নি।'

'তুমি রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে। ঝুম, থলে দে। সন্ধ্যার মুখে স্টেশনবাজারে মাছ ওঠে।'

'স্যার, আমার এবেলা ওদের ওখানে মাংসের ঝোল খাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ ছুটি হয়ে ....'

হাসতে হাসতে বললাম, 'বেশ। তাই হবে।'

ঝুমের মুখে আনন্দ লক্ষ্য করলাম। আমি জানি, আমি বুঝতে পারি—

ঝুম বড় একা এ পৃথিবীতে। দীপুর মতো একজন সঙ্গী ওর কত দরকার। ....

দীপু

দিবাস্যার বেরিয়ে গেলে ঝুম আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম, 'কী দেখছ ঝুম? তুমি কি আবার চড় মারবার মতলব করছ? কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, আমি তোমাকে আর চুমু খাবার চেষ্টা করব না।'

ঝুম আমার পাশে ধুপ করে বসে বলল, 'কালই দাড়িগুলো কেটে ফেলবে কিন্তু।'

'তখন বললাম তো, কাটব। কারণ দাড়ির ভেতর যথেষ্ট ছারপোকা আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।'

ঝুম আমার একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'আমরা কোথাও বেড়াতে গেলে মন্দ হত না। তুমি, আমি, বাবা—অনেক দূরে কোথাও কিছু দিন। আমার এখানে থাকতে আর একটুও ভাল লাগছে না জানো?'

'যেতে তো ইচ্ছে করে!' কিন্তু আমার যে পয়সাই নেই।'

'সে ভাবনা আমার। তুমি যাচ্ছ কিন্তু।'

'কোথায় যাবে, আগে ঠিক করো।'

'বাবা আসুন। তারপর ঠিক করা যাবে।'

আমার হাত ঝুমের হাতে। সাগরিকার সঙ্গে আর প্রেম করার আশা রইল না। গায়ে যথেষ্ট রক্ত না থাকলে একজন টেনেটুনে বি এ পাস করা ছেলের এম এতে ফার্স্টক্লাস পাওয়া মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে যাওয়া মূর্খতা। দিবাস্যার কি সত্যি মাংস আনতে গেলেন? একবেলা মাংস খেলে কতটুকু রক্ত হবে?'

'কী ভাবছ বলো তো?' ঝুম বলল।

'আচ্ছা ঝুম, ডিনামাইটটা জলে না ফেলে কোথাও পুঁতে রাখলে ভাল করতেন স্যার।'

'কেন?'

'তাহলে একটা সাংঘাতিক কিছু করা যেত সময়মতো।'

'থামো! খুব হয়েছে।' ঝুম হাসল। 'বরং সেই গোডাউনের ইঁদুরগুলোর গল্প বলো।'

'কিন্তু ডিনামাইটটা .....'

'আবার?'

'একটা ব্যর্থতা। দৈবাৎ হাতের কাছে একটা সাংঘাতিক জিনিস চলে এসেছিল। ধরে রাখা গেল না। ভাবতে পারো ঝুম, কী প্রচণ্ড ব্যর্থতা?'

ঝুম আমাকে কাতুকুতু দিতে থাকল। 'বলবে? বলাচ্ছি।'

আমার শরীর কী নিঃসাড়! আস্তে ওর হাত দুটো নিয়ে বললাম, 'ঝুম ব্যাপারটা ....'

'না। তখন ইঁদুরের গল্প বলতে বলতে বাবা এসে পড়লেন—সেই গল্পটা বলো।'

'হ্যাঁ—ইঁদুরগুলো। জানো? ওদের নাম দিয়েছিলাম ওয়াগনব্রেকার।'

'সে কী! কেন?'

তাই তো! মালগাড়ির সারবন্দী ওয়াগনের মতো বস্তা। ইঁদুরগুলো সারা বাত বস্তা কেটে লুঠ চালিয়ে যায়। গদা বলেছিল, একটা বেড়াল এনে দেবে। আমি জানতাম, ধোঁকাবাজি। কারণ ইঁদুরগুলো যা চালাক। বেড়ালের সঙ্গে একটা রফা করে নিতই।

ঝুম হাসতে হাসতে আমার দিকে ঝুঁকে এলে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে শান্ত হয়ে গেল ক্রমশ। গ্রীষ্মের নিঃঝুম সন্ধ্যায় জরাজীর্ণ এক বাড়ির ভেতর কিছুক্ষণের জন্য মুখের ভাষা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেল। তাহলে কি অবশেষে এই ব্যাপারটাকেই প্রেম বলব?..........

দিবাকর

অনেক রাতে একটা হাওয়া উঠল। শনশন শব্দে বাড়ির চারপাশে হাওয়াটা ঘুরপাক খেতে থাকল। তারপর মেঘ ডাকল। বুঝলাম ঝড় আসছে। জানালা দুটো বন্ধ করে দিলাম। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গরম। শোবার সময় থেকে বিদ্যুৎ বন্ধ। কিন্তু আজ রাতে আর দরজা খুলব না। ওরা যদি আবার একটা ডিনামাইট এনে দরজায় ধাক্কা দেয়! ভয়ে ভয়ে বসে রইলাম। বাইরে তুমুল তোলপাড় চলতে থাকল। মেঘের ডাক, ঝড়ের শনশন শব্দ। এমন রাতেই ওরা এসেছিল। গুঁফো কমলা যাই বলুক, ওরা অজর অমর রক্তবীজ। ওরা এতক্ষণ বেরিয়ে পড়েছে শাবল আর হাতুড়ি নিয়ে। দূরের স্টেশন থেকে ডিনামাইট বোঝাই ওয়াগনের সারি নিয়ে ঘটাং ঘটাং করে এগিয়ে অন্তিম শ্বাস টানার শব্দে থামল স্থবির এক ইঞ্জিন—তার বুকে দগদগে ঘায়ের মতো আগুন। ষড়যন্ত্রসংকুল গমগমে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কে বলে উঠল, ওয়াগন.... ওয়াগন ..... ওয়াগন। তারপর ঝনাৎ ঝন্ ভাঙার শব্দ। সিল্যুট সব মূর্তি অন্ধকারে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতে-বৃষ্টিতে। আর্তনাদ করছে ভয় পাওয়া কালো জীর্ণ এক ইঞ্জিন। ঝনাৎ ঝন ... ঝনাৎ .... ঝন ভাঙার শব্দ। খালি ভাঙার শব্দ।

পিছনের আততায়ী

আনন্দময় বিকেলে ঘাটের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললেন, নিরু ঘাটে ইন্দ্রকে দেখলাম জানিস?

নিরু বাবুর জন্য চা করছিল। মা এখনও গঙ্গাস্নান করে ফেরেননি। দেরি হবে আজ—সে তো জানাই। আজ গুরুপূর্ণিমা। সাধুবাবার আশ্রমে ভিড় হবে। বিকেলে সামিয়ানা টাঙাতে দেখেছিল নিরু!

আনন্দময় চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ফের বললেন, সামনাসামনি হলে হয়তো কথা বলত। এড়িয়ে গিয়ে ঘাটোয়ারিজীর গদিতে বসলাম। ঘাটোয়ারিজী বললেন, হাইকোর্টে খালাস পেয়েছে। কী যে হচ্ছে আজকাল!

উঠোনে অনেকটা জ্যোৎস্না পড়েছে। টিউবেলের পাশে বুগানভিলিয়ার ঝাড় পাঁচিল ঘেঁষে উঠে বাইরে ছড়িয়ে গেছে। খুব হাওয়া দিচ্ছে বলে শব্দ করে দুলছে। নিরু সেদিকে তাকিয়ে নাক খুঁটছিল। চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠল। রুটি বেলতে বেলতে চা করছিল সে।

নিরু কথা বলছে না টের পেয়ে আনন্দময় একটু হাসলেন খুক খুক করে। হাসিটা অসহায় মানুষের। বললেন, এভাবেই ক্রিমিনালে দেশ ভরে যাচ্ছে। আবার যেন মধ্যযুগ ফিরে এল। যাক্ গে, আমাদের কী? কারুর সাতেও না পাঁচেও না। নিরু রাত্তিরে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না রে! এই যে চা খেলাম এতেই মনে হচ্ছে পেটটা ফুলে গেল।

নিরু একবার মুখ তুলে আবার রুটি বেলতে থাকল। আনন্দময় অভ্যাসমতো উঠোনে চেয়ার পেতে বসে আছেন। চায়ের কাপ প্লেট নামিয়ে মুখ তুলে চাঁদ দেখছেন। ভরা গঙ্গার শিয়রে পূর্ণিমার চাঁদটা দেখার ইচ্ছে ছিল আনন্দময়ের। ইন্দ্রকে দেখে মন খারাপ হয়ে গেছে।

নিরু আস্তে বলল, আমি একবার আশ্রমে যাব বাবা। মা বলে গেছে।

আনন্দময় চমক খাওয়া গলায় বললেন, তুই যাবি? কী দরকার?

নিরু একটু হাসল। —একা থাকলে বুঝি ভূতে ধরবে তোমাকে? যাব বলছি, যাব।

আনন্দময় চুপ করে থাকলেন। এই পুরনো বাড়িতে ভূত যদি সত্যি থাকে তবে সে মা ও মেয়ে দুজনকেই অনেক আগে ধরে ফেলেছে। বাধা দিলেও নিরুকে নিরস্ত করা যাবে না। কারণ সব তাতেই তার মা তাকে সমর্থন করবেন। এখন যদি ইন্দ্রের অছিলায় নিরুকে জোর করে আটকান, সুচরিতা এসেই আকাশপাতাল করে ছাড়বেন—সে রাত দুপুর হোক না কেন।

মরুক গে। যার যা খুশি করুক। আনন্দময় হাল ছেড়ে দিলেন। সময় কী রকম খেলছে মানুষকে নিয়ে সেইসব কথা ভাবতে থাকলেন।

এই রানীরঘাটে একসময় বাঘের উপদ্রব ছিল। এখন বাঘের আত্মা মানুষের ভেতর ঢুকেছে। চাঁদুবাবুর ইটখোলার দিকটায় ছেলেবেলায় আনন্দময় একটা প্রকাণ্ড সাপ মেরেছিলেন। ওপারের শহর তখন গোপাল শিঙ্গির শিকারী বলে খুব নামডাক। সে ডোমপাড়ার পেছনে খালের ধারে একটা বাঘ মেরেছিল। সেটাই রানীঘাটের শেষ বাঘ। কারণ তারপর আর বাঘের কথা শোনা যায়নি।

তবে মানুষের দিনকাল তখন ভালই ছিল বলা যায়। দু'একজন চোর ছিল। তারা প্রায়ই ধরা পড়ত আর ফাঁড়ির জমাদারবাবু বদ্রীনাথের হাতে বেদম পেঁদানি খেত। জগন কামারের ছোটভাই রতন ছিল দারুণ চোর। রোগা শুঁটকো চেহারা। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত। একবার নিশুতি রাতে টিপ টিপ করে বৃষ্টি

হচ্ছে। বাড়ির পেছনে শেয়াল ডাকল। আনন্দময়ের মা গলা চড়িয়ে বললেন, অ আনু! ঘুমোস নে! রতনা এসেছে। —মা ঠিক টের পেতেন।

আজকাল চোররা শেয়াল ডাকে না। সোজা ঘরে ঢুকে পিস্তল ছোরা বাগিয়ে যা নেবার নিয়ে যায়। মান্ধাতা আমলের ফাঁড়ির চেহারা তেমনি ক্ষয়াটে হয়ে থাকলেও পুলিশের রকমসকম বদলে গেছে। জমাদারবাবুকে এ এস আই না বললে খাপ্পা হন। চুরির খবর গেলে সবিনয়ে বলেন, ফুটাপাত্রে আর মিছিমিছি জল ঢালেন ক্যান? ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার। দেখিয়াও বোঝেন না কিছু? কী দেখে কী বোঝা যাবে কে জানে! কেউ পারতপক্ষে ফাঁড়ির সামনেকার ঘাস মাড়ায় না। সেপাইরা গাবগাছের তলায় বসে খৈনি খায় আর তাস পেটে। বন্দুকগুলো দেখে বিশ্বাস হয় না নল থেকে গুলি নামে একটা সাংঘাতিক কিছু বেরোয়।

আনন্দময় এসব কথা ভাবতে বসলেই রেগে যান। মনের রাগ মনের ভেতর কিছুক্ষণ ছটফট করে একটু পরে উবে যায়। তখন টের পান, শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। তিনি সত্যি বুড়ো হয়ে গেছেন।

নিরু রান্নাঘর সামলে বলল, ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিও। কেমন?

আনন্দময় গলার ভেতর বললেন, বললাম তো পেট ভার। খাব না।

দুধটা খেও তাহলে। গেলাস ঢাকা রইল।

নিরু টানা বারান্দা ঘুরে ঘরে চলে গেল। বারান্দায় মিটমিটে একটা আলো জ্বলছে। বাল্‌বটা সাফ করা দরকার। বললেও করে না। সংসারটা দিনে দিনে কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছে আনন্দময়ের কাছ থেকে। সরে যাওয়া দেখে যে তিনি তার পেছন পেছন দৌড়ে সঙ্গ ধরবেন, তাও না। কিছু ভাল লাগে না আনন্দময়ের। বয়স বলেও না, ভেতর থেকে একরাশ আলিস্যি উঠে এসে তাঁকে সারাক্ষণ চেপে ধরে থাকে।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে একটু সেজে নিরু বেরিয়ে এল। —তাহলে গেলাম। তুমি দুধটা খেয়ে নিও যেন। দরজার কাছে গিয়ে একবার ঘুরে ফের দুষ্টুমি করে বলল, নইলে মা এসে দেখবে গরম গরম দুধ গেলাবে।

নিরু বেরিয়ে গেলে আনন্দময় আবার কিছুক্ষণ মুখ তুলে প্রকাণ্ড চাঁদটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই চাঁদে মানুষ গিয়েছিল বিশ্বাস করা যায় না। কোথায় এই গঙ্গার ধারে এঁদো গঞ্জ রানীরঘাট, কোথায় চাঁদ! ঘাটোয়াবিজী দীননাথ চৌবে বলেছিল, নেহি বাবুজী। ঔর কৈ চান্দ হোগা।

ঠিক বলেছিল। ওদিকে তুমি চাঁদে মানুষ পাঠাচ্ছ, এদিকে হারামজাদা ইন্দ্রের মতো ছেলেরা সাংঘাতিক কাজ করেও খালাস পাচ্ছে! আনন্দময় কার উদ্দেশে এ অনুযোগ করলেন, নিজেও বুঝলেন না। ঈশ্বর-টিশ্বরে তাঁর বিশ্বাস নেই। বারান্দার রোগাটে আলো চটাওঠা থামের পাশ দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে। তার কয়েক ইঞ্চি দূরে ধপধপে জ্যোৎস্না। বুগানভিলিয়ার ঝাড়টা খুব আছাড় খাচ্ছে কয়েক ইঞ্চি দূরে পাঁচিলের মাথায়। কদিন গুমোটের পর এই পুবের হাওয়াটা আসছে গঙ্গা পেরিয়ে। বিকেল থেকে বেশ আরাম আসে আবহাওয়ায়। সারা আকাশ দিনের মতোই নির্মেঘ। এখনও মনে হচ্ছে ঘন নীল হয়ে আছে। এখানে-ওখানে কয়েকটা করে তারা।

উঠে গিয়ে দরজাটা আটকে দিয়ে এলেন আনন্দময়। বাইরের রাস্তায় লোকজন চলাচলের চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আশ্রমে সংকীর্তন শুরু হবে কখন কে জানে! মাইক তো বাজবেই। ওই এক জ্বালা। তবে এমুহূর্তে মনে হচ্ছে, জোর আওয়াজ দরকার রানীরঘাটে। একটা হইচই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাক। বদমাস ইন্দ্রটা দিব্যি ফিরে এসে হেসে হেসে মনোহরের দোকানে চা খাচ্ছিল। গায়ে নীল গেঞ্জি, পরনে আরও নীল প্যান্ট। চোখ জ্বলে গেছে আনন্দময়ের।

বেচারা রাজেন এতদিন রানীরঘাটে থাকলে তার খুব কষ্ট হত। ছেলের খুনী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত চোখের সামনে! রাজেন কিছুতেই সহ্য করতে পারত না। রাজেন বাসের কন্ডাক্টার হতে পারে, কিন্তু সে তো একজন বাবা। বাবার সামনে ছেলেকে ছুরি মেরেছিল! আনন্দময়ের বুকের ভেতর আবার কষ্টটা *ঠেলে* উঠল। স্নেহাকর আর ইন্দ্র দুজনেই তাঁর ছাত্র ছিল। স্নেহাকরকে দেখে বুঝতেন, সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই জন্মেছে। ইন্দ্রকে দেখে কিছু বুঝতে পারেননি। একটু গোঁয়ারগোবিন্দ ছিল

কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই যে তুই পাশে বসে আছিস, কথা বলছিস—আমার খালি মনে হচ্ছে এ কে? অত দূর থেকে কেন কথা বলছে? শুনে আমি খুব হাসলাম। তবে একথা ঠিক, কিছুদিন থেকে ওকে খুব অন্যমনস্ক মনে হত। মুখে দাড়ি রাখতে শুরু করেছিল। বলত, রাতে একেবারে ঘুম হয় না। জেগে কাটায়।

আনন্দময় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হয়তো ইন্দ্র নিমিত্ত মাত্র।

না।—শুভ একটু ঝুঁকে এল। —মাস্টারমশাই, আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র মিথ্যা বলছে না।

আনন্দময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

শুভ বলল, সেশান কোর্টে ইন্দ্রের যাবজ্জীবন হয়েছিল সারকামস্ট্যানসিয়্যাল এভিডেন্সের জোরে। হাইকোর্টের রায়ে নাকি বলেছে, এক্ষেত্রে সারকামস্ট্যানসিয়্যাল এভিডেন্সের চেয়ে বড় কথা সাক্ষীরা সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। অথচ কেউ স্বচক্ষে ইন্দ্রকে স্ট্যাব করতে দেখেনি—এমন কী ইন্দ্রের হাতে ড্যাগারও দেখেনি।

অ। —আনন্দময় কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

মাস্টারমশাই, ইন্দ্র আমার জ্যাঠতুতো ভাই বলেই জানি, তাব মধ্যে কিলিং ইন্সটিংকট আছে। আমি তো ওকে বর্নকিলার বলে ভাবতাম বরাবর। যখন স্নেহাকরের স্ট্যাব হওয়ার খবর পেয়ে দৌড়ে গেলাম, গিয়ে কী দেখলাম জানেন? ইন্দ্র দু হাতে স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। একটা ছেলে ওর তলপেটে রুমাল চেপে ধরেছে।

আনন্দময় শিউরে উঠে বললেন, আমি দেখতে যাইনি। সহ্য করতে পারতাম না।

শুভ বলল, বাসের ড্রাইভার আর কন্ডাক্টাররা ইন্দ্রকে টেনে তুলে মারধর শুরু করল। মবের ব্যাপার তো। ভাগ্যিস গঙ্গাপুজোর দিন বলে পুলিশ ছিল ঘাটে। তারা ইন্দ্রকে বাঁচায়। নৈলে ইন্দ্রও মারা পড়ত।

আমি এসব কিছু শুনিনি, শুভ। যাই হোক, তুমি যখন বলছ, তখন কথা নেই।

আনন্দময় চাপা গলায় ফের বললেন, কিন্তু তাহলে কে স্ট্যাব করল স্নেহাকরকে? কার রাগ ছিল ওর ওপর? আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, বাবা!

শুভ উঠে দাঁড়াল।—এখনও চা এল না দেখছি! নীলি নিশ্চয় বলেনি মাকে।

শুভ বেরিয়ে গেল, আনন্দময় পা দোলাতে দোলাতে অসমাপ্ত সাইনবোর্ডটার দিকে ঝুঁকলেন। কিছু বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়ালেন। বুক শেলফের কাছে যেতে যেতে টের পেলেন, কাল সন্ধ্যার পর থেকে একটা গভীর অস্বস্তি তাঁকে ঠেসে ধরেছিল, সেটা বাড়তে বাড়তে তাঁকে বেকায়দায় ফেলেছে। শুভও বিশ্বাস করছে ইন্দ্রের কথাটা?

শুভ স্নেহাকরের খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। শুভও এমন কিছু আজেবাজে ছেলে নয়। ছাত্র হিসেবে তো ভালই ছিল। বি এ-তেও ভাল রেজাল্ট করেছিল। এম এ পড়া হয়নি শক্তিব্রতের বাড়ি করার খেয়ালে। সব পয়সা বাড়িতেই শেষ। কলকাতায় ছেলেকে রেখে পড়াবেন কী করে?

তবে শুভ বলত, আর্টস্কুলে ভর্তি হবে। শান্তিনিকেতন যাবার কথা বলত। কিন্তু শক্তিব্রত বলতেন, মাথা খারাপ? ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করবি এ দেশে? ও আনু, একটু বুঝিয়ে দিও তো ওই পাগলটাকে!

আসলে শুভ বাবার বড় অনুগত ছেলে ছিল। এই পরিবারের সঙ্গে আনন্দময়ের দু পুরুষ ধরে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পরস্পর সব খবর জানা। হাঁড়ির খবরও। আনন্দময় টের পেয়েছিলেন, শক্তিব্রতের মৃত্যুর পর থেকে শুভ নিজের পথে চলার চেষ্টা করছে। যেন খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল সে।

শুভ চায়ের কাপ এনে বলল, নীলির কাণ্ড। বলেনি কিছু। আর অনিকে তো জানেন। একটা বাচ্চা সামলাতে নাকি লাইফ হেল্ হয়ে যাচ্ছে!

শুভ হাসতে লাগল। আনন্দময় বললেন, বউদি নেই বুঝি?

মা? মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শুয়ে আছেন।

ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?

ওপারের জ্ঞানবাবু দেখছেন।

আনন্দময় চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, ভাল চা হয়েছে। তুমি করে আনলে নাকি?

না। অনি।

আনন্দময় ইজিচেয়ারে বসে বললেন, বউমাকে অনেকদিন দেখছি না। কলকাতায় বাপের বাড়ি কাটাচ্ছে?

শুভ আস্তে বলল, হুঁ। তারপর টুলটা টেনে নিয়ে সামনাসামনি বসে বলল, জানেন মাস্টারমশাই? কাল ইন্দ্রকে দেখার পর স্নেহাকরের ব্যাপারটা আমার মাথা থেকে যাচ্ছে না। বছর দুই কলকাতায় ছিলাম। ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। সেবার গঙ্গাপুজোয় হঠাৎ করে কদিনের জন্য বাড়ি এলাম। এসে ওই সাংঘাতিক কাণ্ড। আমি বুঝতে পারছি না তাহলে কে ওকে স্ট্যাব করল?

কথা কেড়ে আনন্দময় একটা হাত নেড়ে রায় দিলেন, ইন্দ্র বলছে যখন, তখন ইন্দ্র নয়। আমারও মনে হচ্ছে অন্য কেউ। তুমিও খোঁজো, আমিও খুঁজে দেখি।

শুভ হেসে ফেলল। —তাতে লাভ কী?

সত্যোদঘাটন! —আনন্দময় ভরাট গলায় বললেন। তাছাড়া শুভ, ভেবে দেখ কথাটা। আমাদের এই সুন্দর পিসফুল জায়গায় একজন খুনী দিব্যি গা বাঁচিয়ে ভালমানুষ সেজে কাটাবে, এটা কি অস্বস্তিকর নয় সমাজের পক্ষে? কে বলতে পারে, আবার সে কাউকে স্ট্যাব করবে না? রক্তের স্বাদ যে একবার পেয়েছে, সে মানুষখেকো বাঘ। তোমাদের তখন জন্মই হয়নি। আমরাও এতটুকু ছেলে। রানীরঘাটের ওপাশে শেয়ালমারা বলে যে গ্রাম আছে, সেখানে সেবার মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য শুরু হল। তো....

শুভ বেগতিক দেখে বলল, আমরা ছেলেবেলায় বাঘেব কথা শুনিনি। তবে স্কুলের পেছনে কাশবনের ভেতর খরগোস দেখতে পেতাম। বড় বড় কান। কী যে ভাল লাগত। আর মাস্টারমশাই, পাখিও কম ছিল না তখন। আজকাল আর তত পাখিও দেখি না। কী হল বলুন তো?

আনন্দময়ের এই স্বভাব। কথা বলতে যেমন ভালোবাসেন, শুনতেও তেমনি। একটু পরে শুভ বলল, এই রে। একেবারে ভুলে গেছি। ওপারে একটু কাজ ছিল যে।

আনন্দময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে রেডি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণ নীলির সঙ্গে কথা বলি গে। ঘাট পর্যন্ত যাব তোমার সঙ্গে। বাড়ি বসে থাকতে একদম ইচ্ছে করে না। যা গরম পড়েছে!

বিকেলে ইন্দ্র ডোমপাড়ার ঘাটের মাথায় ঘাসে ঢাকা পাড়ে বসে সিগারেট টানছিল। পায়ের দিকে একটা প্রকাণ্ড আকন্দঝোপ। সাদা ফুলে গাছটা ঝলমল করছে—ফুলেব ভেতর বেগুনি ছোপ। ডাইনে একটু তফাতে ঘাটে কাপড় কাচছে একটা মেয়ে। মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে ইন্দ্রকে দেখে নিচ্ছে। মাথায় ঘোমটা।

ইন্দ্রকে সবাই বড় খুঁটিয়ে দেখছে ফিরে আসা অব্দি। বড্ড বেশি খাতিরও করছে যেন।

সিধু ভেরেন্ডা ডালের দাঁতন দাঁতে ঘষতে ঘষতে আনমনে ঘাটে নামছিল। হঠাৎ ঘুবে ইন্দ্রকে দেখে দাঁত বের করে এগিয়ে এল। বাবুদা যে! শুনেছি ছাড়া পেয়েছেন। কেমন আছেন বাবুদা?

ইন্দ্র সংক্ষেপে বলল, ভাল।

হ্যাঁ গো, পেরায় বছরটাক খামোকা ভোগান্তি হল—কী বলেন? সিধু থমকে দাঁড়াল। ইন্দ্রের হাতে একটা মাঝারি গড়নের ড্যাগার। ঠোঁটে সিগারেট ধোঁয়াচ্ছে। ড্যাগারের ডগা দিয়ে ঘাসের ওপর আঁচড় কেটে ফালাফালা করছে।

ইন্দ্র বলল, কী দেখছিস রে? চান করগে না!

সিধু অগত্যা হাসতে হাসতে ঘাটে গিয়ে নামল। ঘোমটাপরা বউটি রামভকতের ছেলে সুরিনের দ্বিতীয় পক্ষ। সুরিন আজকাল ট্রাক চালায়। প্রথম পক্ষের বউ সরস্বতীয়ার সঙ্গে ইন্দ্রের পরিচয় ছিল। সুরিন ডাকত বুঢ়িয়া বলে। সরস্বতীয়া সত্যি বুড়ি হয়ে গিয়েছিল রোগে ভুগে। তবে তার মেয়ে

কমিলাবতীর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। কমিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকছিল, ছোটি মা গে!

তারপর ইন্দ্রকে দেখে চমকাল। ইন্দ্র বলল, কী রে কমিলা! তোর বাবা আছে বাড়িতে?

মাথা নাড়ল কমিলা।

ইন্দ্র হাত তুলে ডাকল।—শোন্ কাছে আয়।

কমিলা দৌড়ে এল। ঘাট থেকে তার ছোটমা—তারই বয়সী মেয়েটা ঘোমটার ফাঁক থেকে তাকিয়ে আছে। সিধুও গা কচলাতে কচলাতে নজর রেখেছে। কমিলা বলল, কী? বোলেন!

ইন্দ্র ড্যাগারটা তুলে বলল, তোকে চাক্কু মারব।—সে হাসছিল।

কমিলাও হাসল। .... মারবেন তো মারেন!

তোর ভয় করছে না?

কমিলা মাথাটা জোরে দোলাল।

করছে না?

উঁহু।

বাবা এলে বলিস আমি এসেছিলাম।

কমিলা নিষ্পলক চোখে ইন্দ্রকে দেখতে দেখতে বলল, বোলবে।

কী দেখছিস রে অমন করে?

কুছ্ দেখছি না।

দেখছিস!

কমিলা হঠাৎ চলে গেল ঘাটের দিকে। ছোট-মার সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলতে থাকল। ইন্দ্র আবার ঘাসে আঁচড় কাটতে লাগল।

বাঁদিকে শ্মশানের পাশে সাধুবাবার আশ্রম ফুলে-ফুলে রঙিন হয়ে আছে। পাড়ে বটগাছটায় অসংখ্য পাখি চেঁচামেচি করছে। বাছুরের গলায় ঘণ্টা বাজল কোথায়। গাভীর হাম্বা ডাক শোনা গেল। দিন শেষ হয়ে আসছে। সামনে ভরা গঙ্গার বুকে এপারের ছায়া ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওপারের শহরের প্রতিবিম্ব এলোমেলো হয়ে কাঁপছে লালচে জলের তলায়। পালতোলা নৌকোটা দেখতে দেখতে ভাটির দিকে সরে গেল কতদূরে। বাঁকের দহের মাথায় বাঁশ ঝাড়টা হেলে আছে। এবারই তলিয়ে যাবে গঙ্গায়। ইন্দ্র দেখছিল। দেখছিল, অথবা চোখে ভাসছিল এসব—নিরর্থক।

তারপর আশ্রমের দিক থেকে কাঁসর ঘণ্টা শোনা গেল। আরতি হচ্ছে। ঘাট থেকে মেয়ে দুটো চলে গেছে ঘরে। সিধু বহুক্ষণ ধরে সাঁতার কাটছে। ইন্দ্র রাগী চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কাল পূর্ণিমা গেছে। চাঁদটা দেরি করে উঠল। তারপর পায়ের শব্দ হল কাছে।

ইন্দ্র মুখ তুলল।

ও! ইন্দ্র! আমি ভাবলাম.... শশাংক হাসল একটু। -- এসেছিস, শুনেছি। তারপর আছিস কেমন? মানে—ছিলি কেমন?

আয় বোস।

এ কি বসবার জায়গা?—শশাংক খিক খিক করে হাসতে লাগল। —এখানে বসলেই লোকে ভাববে তালে আছে! না রে, বসব না। এসেছিলাম দুটো মজুর খুঁজতে ডোমপাড়ায়। হঠাৎ দেখি তুই বসে আছিস! আমি ভাবলুম কুমু নাকি?

কুমু?

আবার কে? সুরিনের মেয়ের সঙ্গে ভাব করার তালে আছে শালা! নাকি সুরিনের বউয়ের সঙ্গেই।

ইন্দ্র উঠল। পা বাড়িয়ে বলল, কুমুর সঙ্গে দেখা হয়েছে।

তোর হাতে ওটা কী রে?

ড্যাগার।—ইন্দ্র ছোরাটা দেখাল। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ফলাটা।

শশাংকের বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। বলল, কী ছেলেমানুষী করিস! পকেটে ঢুকিয়ে রাখ্।

ইন্দ্র কোনো জবাব দিল না। সরু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে মাঝারি একটা রাস্তায় মিশেছে। খোয়াঢাকা রাস্তা। যথেষ্ট ফাঁকা—কিছু ঝোপঝাড় চারদিকে। ওপাশে খেলার মাঠ, স্কুল। ইন্দ্র হঠাৎ বলল, তুই যা! আমি একটু ঘুরব।

শশাংক হন হন করে চলে গেল। যেন পালিয়ে বাঁচল।.....

শুভদের বাড়ির পেছন দিয়ে ইন্দ্রদের বাড়ি ঢোকার রাস্তা। রাস্তাটা হাতচারেক চওড়া। অন্যপাশে আগাছার বন। কতকাল থেকে একটা ভাঙাচোরা মরচেধরা মোটরগাড়ি ওই জঙ্গলে পড়ে আছে। একসময়ে ওই গলিরাস্তায় একটা গোখরো সাপকে শুয়ে থাকতে দেখা যেত। বড় শান্ত আর নিরীহ সেই সাপ। ঘাটের বাজারে অনেকটা রাত অব্দি আড্ডা দিয়ে ইন্দ্রের বাবা ভক্তিব্রত বাড়ি ফিরতেন। তখন বিদ্যুৎ ছিল না রানীরঘাটে। ভক্তিব্রতের হাতে থাকত একটা লণ্ঠন আর ছড়ি। গলির মুখে এসে চাপাস্বরে ধমক দিতেন সর্ সর্। সরে যা না হারামজাদী! তারপর ছড়ি নাচিয়ে মাটিতে থপাস থপাস করে লাথি মারতেন।

সাপটা থাক আর নাই থাক, ভক্তিব্রতের এই ছিল অভ্যাস। বাস্তুসাপ মারতে নেই। বেদে ডেকে এনে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার কথা ভুলেও ভাবতেন না। নেশার ঘোরে মাঝে মাঝে সাপটার সঙ্গে তাঁকে বাক্যালাপ করতেও দেখা গেছে।

তাঁর লিভার পচে মৃত্যুর পর ইন্দ্র সাপটাকে মেরেছিল। বাবার কথা শুনে শুনে তার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল সাপটা মেয়ে। তাকে মেরে তার জোড়াটাকে খুব খুঁজেছিল ইন্দ্র। জরাজীর্ণ বাড়িটার তিনপাশেই জঙ্গল আর গর্ত। একটা ঘর ধসে গিয়েছিল। পুরুষ সাপটা সেখানেও লুকিয়ে থাকতে পারে। ইন্দ্র তার পাত্তা পায়নি।

বাস্তুসাপ মারলে নাকি অকল্যাণ হয়। নতুন করে কী আর হবে? ইন্দ্র জ্ঞান হওয়া তক দেখেছে একটা পুরনো ক্ষয়াটে, হাড়জিরজিরে, প্রচণ্ড গরিব সংসারে সে আছে। বাড়ির পেছনে পঞ্চাশ পা হাঁটলে গঙ্গা। বাড়ির ওপর সারাক্ষণ একটা বটগাছের কালো ছায়া পড়ে আছে। উঠোনে একচিলতে রোদ পড়ে সেই বেলা গড়িয়ে। চিরদিন চুল শুকোতে তার মাকে যেতে হয়েছে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গঙ্গার পাড়ে। ঘাসে বসে চুল শুকোতেন মলিনা। পাশে একটা ছোট্ট ডালায় মাসকলাইয়ের বড়ি! কখনও দুখিনীর মতো ওখানে বসেই চালের কাঁকর বাছতেন।

খিড়কির দরজায় কখনও দাঁড়িয়ে ইন্দ্রের হঠাৎ মনে হয়, ঘাসের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে তার মা গঙ্গামুখো হয়ে বসে আছেন। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে সে বাড়িতে মাকে না দেখলে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে চেরা গলায় ডাক ছাড়ত। চমকে উঠে পেছন ফিরতেন মলিনা। শেষবেলা রোদে মুখে হাসি চকচক করত।

জামাইবাবু হরিশংকর ডাকছিল, ইনা! ও ইনা! মাস্টারমশাই এসেছেন!

ইন্দ্র খিড়কিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ড্যাগারটা দিয়ে আনমনে একটা শুকনো ডাল চাঁছছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, কে, মাস্টারমশাই? যাচ্ছি।

বারান্দার খানিকটা চৌকো অংশ এগিয়ে উঠোনে ঢুকেছে। খোলামেলা একটু চত্বরের মতো। ওখানে বসে ইন্দ্রের বাবা ভক্তিব্রত মাতলামি করতেন। ডোমপাড়ায় তাড়ি গিলে এসে বলতেন, রাঘব আজ হুইস্কি খাওয়ালে। ধুশ শালা। হুইস্কি না ঘোড়ার পেচ্ছাপ! দিশি জিনিস তালের তাড়ির কোনো তুলনা হয় না। ও আনু, হবে নাকি একপাত্তর? ... সরি, তুমি তো ছেলেঠ্যাঙানো পণ্ডিত! তোমাকে বললেও পাপ হয়।

আনন্দময় চত্বরে মোড়ায় বসে যেন তাড়ির গন্ধ পাচ্ছিলেন। আগের দিনের মতোই। কে জানে ভক্তিব্রতের জামাই হরিশংকরও একই লাইনের লোক কি না। ঘাটে কল্যাণ ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে কম্পাউন্ডারি করে হরিশংকর। চেহারা দেখে মাতাল-মাতাল লাগে।

ইন্দ্রের কথা কানে এলে আনন্দময় দ্রুত সাড়া দিলেন।—ইন্দ্রনাথ! এস বাবা, একবার দেখি তোমাকে।

ইন্দ্র এসে উঠোনে দাঁড়াল।

আনন্দময় ওর হাতে ছোরা দেখে চমকে উঠেছিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, দুদিন থেকে ভাবছি আসব-আসব। ভরসা পাচ্ছিলাম না বাবা, খুলেই বলছি তোমাকে। ছিলে কেমন—আছ কেমন বলো?

ইন্দ্র আস্তে বলল, যেমন রেখেছিলেন স্যার।

আনন্দময় কাঁচুমাচু মুখে বললেন, একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বাবা ইন্দ্রনাথ। সেই এক্সপ্লানেশান দিতেই এসেছি। আফটার অল, তুমিও আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে। দেখ, আমার সব আঙুলই সমান। চোট পড়লে সব আঙুলেই ব্যথা লাগে।

ইন্দ্র একটু হাসল।—ছাড়া পেয়েছি বলে স্যার কি খুব ভয় পেয়েছেন?

আনন্দময় জোরে হাসবার চেষ্টা করলেন।—আমাকে দারোগাবাবু খামোকা সাক্ষী করেছিলেন। আমি কী বলেছিলাম সেশানকোর্টে, সেও তো নিজের কানে শুনেছিলে ইন্দ্রনাথ! বলো, তোমার বিরুদ্ধে একটা বাক্যও উচ্চারণ করেছিলাম নাকি। স্রেফ বলেছিলাম, আমি কিছু দেখিনি স্বচক্ষে। তবে ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলাম। সবই শোনা কথা।

ইন্দ্র বললে, ছেড়ে দিন।

ইন্দ্রের দিদি শ্যামলী পাতকুয়োর ধারে বসে কাপড় কাচছিল। ঘুরে একটু বাঁকা হেসে বলল, ইনাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে রানীরঘাটে কেউ চেষ্টার ত্রুটি করেনি মাস্টারমশাই! তখন তো দেখেছি, চেনা লোক মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। এই বাড়ির অংশ বন্ধক রেখে যে মামলা চালাব, তাতেও কত ভাঙচি দিয়েছে সবাই। বলেছে, শুভরা জমির শরিক। গণ্ডগোল আছে।

হরিশংকর বউকে চাপা গলায় ধমক দিল।—তুমি থামো দিকি! যা হবার তা হয়ে গেছে, আর ও নিয়ে কথা কী?

শ্যামলী তবু আপনমনে গজগজ করতে থাকল। আনন্দময় বললেন, তুমি আমার প্রিয় ছাত্র ছিলে ইন্দ্রনাথ। তোমাকে ভয় করব কেন? তাছাড়া আমি বুড়োমানুষ। নানান অসুখে ভুগছি। তুমি যদি মারো আমাকে, বেঁচে যাই।

শুকনো হাসি হাসলেন আনন্দময়। ইন্দ্র বলল, ফিরে এসে দেখছি, হঠাৎ যেন খাতির বেড়ে গেছে আমার। আগে যারা পাত্তা দিত না, এখন ডেকে আলাপ করে। আমি তো অবাক। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে শালারা।

বলেই সে ফের খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। আনন্দময় অপমানিত বোধ করছিলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। হরিশংকর চাপা গলায় বলল, ইনার একটু যেন মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বুঝলেন মাস্টারমশাই? এমন তো ছিল না। একটু-আধটু দুষ্টুমি বা মারপিট করত কখনও-সখনও। কিন্তু এমন সব সময় মেজাজ করে থাকত না।

শ্যামলী শক্ত মুখে বলল, হবে না মেজাজ? ঘেন্না ধরবে না মনে?

এই মেয়েছেলেটার বেজায় মুখ হয়েছে দেখছি।—হরিশংকর তেড়ে গেল। —মানুষজন মানামানি নেই। সবার সামনে খালি ধানাই-পানাই কথা। মুখ বুজে থাকতে পার না একটুও।

শ্যামলী পাল্টা চেঁচাল। ..... তুমি মুখ বুজে থাকো। আমি থাকব না। কাকে ভয়—কিসের ভয়?

আনন্দময় বেগতিক বুঝে বললেন, উঠি হরিশংকর।

গলি রাস্তায় পেছন পেছন এগিয়ে হরিশংকর চাপা গলায় বলল, কী বলব মাস্টারমশাই! এদের বংশটাই এমনি তেজী। তাও যদি পয়সাকড়ি থাকত, তাহলে তো হাতে মাথা কাটত। আমার হয়েছে জ্বালা। না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে।

আনন্দময় আনমনে বললেন, কিসের?

আমার এই ভুতুড়ে বাড়িতে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না মাস্টারমশাই। হরিশংকর সাবধানে বলল।—বেশ ছিলাম বর্ধমানে। শাশুড়ি মারা গেলে শ্বশুরমশাই ভুজুং-ভাজুং দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে

এলেন। বললেন, রানীরঘাট উঠতি জায়গা। কিছুদিন পরে নিজেই ডিসপেন্সারি খুলে বসতে পারবে। তো......

আনন্দময় বললেন, খুললেই পারো। তোমার তো ভালই এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।

হরিশংকর সে কথায় কান করল না।—বলল, কেন ডেকে এনেছিল পরে টের পেলাম। ঘরের কথা বাইরে বলতে নেই। তবে আপনি সজ্জন মানুষ। আপনাকেই বলি। আমি না এলে শ্বশুরমশাইকে ভিক্ষে করে খেতে হত। ভাইয়ের সঙ্গে মামলা করে তাকে চটিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে ঘরে ওই ধর্মের পাঁঠা—মানে, কার কথা বলছি বুঝতে পারছেন তো?

আনন্দময় একটু হেসে বললেন, ইন্দ্র?

আবার কে!—হরিশংকর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল।—দুঃখের কথা কাকে কী বলব মাস্টারমশাই—ইনা এত বাড় বেড়েছিল আমার গায়ে পর্যন্ত হাত তুলতে শুরু করেছিল!

আনন্দময়ের ভাল লাগছিল না এসব কথা শুনতে। ভুলবোঝাবুঝিটা মেটাতে এসেছিলেন। তার চেয়ে বড় কথাটা বলার ছিল ইন্দ্রকে, স্নেহাকরের প্রকৃত খুনী তাহলে কে? তাকে খুঁজে বের কবা দরকার। ফুলের মতো নিস্পাপ একটা তাজা জীবনকে ব্যর্থ করে দিল যে শয়তান, তার একটা যোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত নয় কি?

বললেন, আসি হরিশংকর। আজ বুঝি ডিসপেন্সারিতে যাবে না?

হরিশংকর সঙ্গ ছাড়ল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল পাপের ফল ভুগছে ইনা। নেহাত শ্বশুর শাশুড়ির মুখ চেয়ে এ মামলায় আমি ছোটাছুটি করে বেরিয়েছি। যেখানেই থাকুন, ওনাদের, আত্মার তো অগোচর নেই কিছু। কি বলেন মাস্টারমশাই?

আনন্দময় হুঁ দিলেন।

তবে আর না, খুব হয়েছে। —হরিশংকর চাপা স্বরে বলল।—এই নরকে পড়ে থাকলে আবার কী ঝামেলা পোয়াতে হবে কে জানে! ইনার হাতে ড্যাগার দেখলেন তো! কোন ড্যাগারটা বলুন তো?

আনন্দময় থমকে দাঁড়ালেন।

হরিশংকর চারদিক দেখে নিয়ে গলা আরও খাটো করে বলল, সেই ড্যাগারটা। যেটা দিয়ে রাজেনদার ছেলেকে স্ট্যাব করেছিল!

আনন্দময় হেসে ফেললেন। বললেন, না হে, না! ইন্দ্র স্নেহাকরকে খুন করে নি। কাজেই ও মার্ডার-উইপন পাবে কোথায়? তাছাড়া মার্ডার-উইপন পুলিশও খুঁজে পায়নি।

হরিশংকর সন্দিগ্ধ ভাবে বলল, কিন্তু ইনা যে ওর দিদিকে বলেছে, ওই দিয়েই.....

মিথ্যা বলেছে।

কথাটা শুনুন না! ওর দিদিকে বলেছে, ড্যাগারটা বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা ঝোপে পড়ে ছিল। পরে একজন ওটা কুড়িয়ে পায়। সে-ই নাকি ইনাকে ড্যাগারটা দিয়েছে।

আনন্দময় হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে বললেন, না, না। সব বাজে কথা।

হরিশংকরের মনঃপুত হল না একথা। বলল, দিদিকে মিথ্যা বলে না ইনা। আমি তো জানি। তবে আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না মাস্টারমশাই! ইন্দ্র আবার কাউকে ঝাড়বার তালে আছে। ওর মতিগতি একেবারে ভাল ঠেকছে না।

আনন্দময় পা বাড়ালেন। দশটা নাগাদ শহরে যাবার তাগিদ আছে। নিরুর মাকে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তবাবু উকিলের বাড়ি যাবেন। উকিলগিন্নি নিরুর ব্যাপারে একটা খবর দিয়েছেন। ছেলেটি নাকি কালেক্টরিতে চাকরি করে। সদ্বংশজাত। শহরে নিজেদের বাড়িও আছে।

খোয়াঢাকা রাস্তার একধারে কয়েকটা নতুন গড়নের বাড়ি, অন্যধারে আগাছার বন আর গাছপালার ফাঁকে পুরনো বসতি। টালি ও টিনের চাল, কোনটা একতালা পুরনো দালান। হরিশংকর তখনও সঙ্গ ছাড়েনি। নিজের বিড়ম্বনার কথা বলতে বলতে আসছে। .... দেখবেন, আর এই দুটো মাস। তারপর এ শর্মা কাট্ করবে। সাপে-নেউলে একজায়গায় থাকা চলে না। কিছুতেই না। মাস্টারমশাই, ইনা যতই সাধু সাজুক এখন, খুন যে সেই করেছিল তাতে কোনো ভুল নেই। নিজেও

তো এতকাল ধরে কিছুকিছু দেখেছি ওর মস্তানী! ডিসপেনসারি থেকে লক্ষ্য করতাম, বাঁদরটা ঘাটোয়ারির গদির কাছে ঠিক ঘাটের মাথায় বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকা থেকে কোনো মেয়ে এলে কিংবা নৌকোয় চাপতে গেলেই প্যাঁক দিচ্ছে হারামজাদা। একবার কী হয়েছিল আপনি হয়তো জানেন না। এস ডি ও সায়েবের বউয়ের পেছনে প্যাঁক দিয়েছিল। তারপর সে এক কেলেংকারি। রোজ এসে বাড়িতে হামলা করে। ইনা গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। শেষে আপনা-আপনি থেমে গেল। বললাম, এসব তুই কেন করিস বল্ তো? নাকি বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে? হয়ে থাকলে বল, পাত্রী দেখি। শুনে শুয়োরের বাচ্চা দড়াম করে এক ঘুষি আমার থুতনিতে। ওর দিদির সামনে!

হরিশংকর দম নিয়ে বলল, পরে ওর দিদির কথায় পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিল। আমিও ভাবলাম, বয়স কম—তার ওপর বাবা-মার শাসন ছিল না। কী আর করা? তবে ওর মধ্যে খুনী যে ছিল, সেটা আমি ভালই জানতাম। আমার শাশুড়ি বলতেন, ইনার দিদিও বলত—ছেলেবেলায় কেমনধারা চালচলন ছিল, সব বলত। রানীরঘাটে শেয়ালের বংশ নাকি ইনাই শেষ করে দিয়েছে। গঙ্গার পাড়ে শেয়ালের গর্তে আগুন ধরিয়ে দিত ইনা। গর্ত খুঁড়ে ছানাগুলোকে বের করে মুণ্ডু কাটত।

আনন্দময় দাঁড়ালেন। বললেন, সেটা সত্যি হে! একবার বেড়াতে বেরিয়েছি, দেখি ডোমপাড়ার ওখানে ইন্দ্র একদল ছেলে নিয়ে খেলছে। আমাকে দেখেই সবাই পালিয়ে গেল। গিয়ে আমার চক্ষুস্থির। কাদা দিয়ে বেদি বানিয়েছে! তার ওপর একটা মূর্তিটুর্তি বসিয়ে রেখেছে। তার সামনে ঘাসের ওপর মুণ্ডুকাটা কয়েকটা শেয়ালের বাচ্চা পড়ে আছে। রক্তারক্তি ব্যাপার। বীভৎস!

হরিশংকর সায় পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে বলল, শুধু শেয়াল? পাখি? শাশুড়ি বলতেন, ইনার ভয়ে রানীরঘাটে আর আগের মতো রঙবেরঙের পাখি আসে না বাবা! কত পাখি বাসা করত গাছপালায়। ডিম ভেঙে বাসা তছনছ করে ইনা পাখির বংশ উজাড় করে ফেলেছিল। আসলে ওর রক্তে এসব আছে মাস্টারমশাই। কেউ যদি হলপ করে বলে, রাজেনদার ছেলেকে ইনা মার্ডার করেনি, আমি বিশ্বাস করি না—করবও না। শুওরের বাচ্চার প্রাণে দয়ামায়া এতটুকু নেই মাস্টারমশাই।

আনন্দময় নড়ে উঠলেন। —সর্বনাশ! দশটা বেজে এল যে! ওপারে যেতে হবে। বলেই হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হরিশংকর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল শিরিষ গাছের তলায়। .....

লনের কোনায় কদমগাছটার তলায় ইজেল রেখে শুভ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ইজেলে ক্যানভাস আঁটা। একটা সাদামাঠা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকবে, নাকি মানুষ—সাদাসিদে ধরনেরই কোনো মানুষ এই গঞ্জেরই মানুষ—ঠিক করতে পারছিল না। মাথায় একটা থিম খেলছে কখন থেকে। সেটা হল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। নদীর স্রোত, গাছের ঋজুতা, বিস্ফোরণের মতো কাঁটায় ভরা একটা ক্যাকটাস—পরমাণুশক্তির বিস্ফোরণের সঙ্গে যার মিল থাকবে, কিংবা কোনো নৌকোর স্টিমলাইনে গতিব্যঞ্জক কিছু সংকেত, যে-নৌকোর কোনো মাঝি নেই—এসব উপসর্গ তাকে জ্বরভাবে আক্রান্ত করছিল।

শুভ ভাবছিল, মানুষের মুখচোখে, অবয়বেও কি প্রাকৃতিক স্বাধীনতার সংকেত নেই? একজন সাদাসিদে মানুষের মধ্যেই তা তো থাকা উচিত—এমন মানুষ যার মধ্যে সভ্যতার আব্রু নেই, সংস্কার নেই, সাবলীলতা আছে। অথচ নিজে যে টের পায় না কিছু। টের পায় না তার দুহাতের দৈর্ঘে তার পদক্ষেপে স্বাধীনতা উপচে পড়ে।

পুবের হাওয়াটা চলে গেছে। আকাশ বরং আরও নীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবহাওয়া তত গুমোট নেই। গাছতলা জুড়ে কদমফুলের হলুদ রেণু ছড়িয়ে রয়েছে। শুভ টেনশান ঘোচাতে সিগারেট ধরাল ফের। আগের টুকরোটা এখনও কচি ঘাস ও শুকনো পাতার ফাঁকে ধোঁয়াচ্ছে। খুব বেশি ছবি সে আঁকে না। কলকাতায় তার ছবি আঁকার নেশা বেড়ে যায়, অথচ এখানে এলেই কী বিশ্রি আলস্যি! এই থিমটাকে তার মুক্তি দিতেই হবে। ক্যানভাসে সাদা বেশ তৈরি করে আরও মুশকিলে পড়ে গেছে সে পারস্পেকটিভ খুঁজে বের করতে পারছে না।

সিগারেট টানতে টানতে সে ঘুরে ফাঁকা জমিটার ওপর দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর আরও একটু বাঁদিকে ঘুরে বটগাছটার দিকে তাকাল। দেখল, একটা ঝুরিতে হেলান দিয়ে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। দূরত্ব বেশি নয়, একশো গজের মতো। ইন্দ্রদের বাড়ির পেছনে ওই বটগাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বাড়িটাকে গিলে ফেলতে চাইছে কতকাল থেকে। ওটা শুভদেরও বাড়ি ছিল একসময়। ইন্দ্র ও তারও ঠাকুরদা নাকি ওই বাড়িতে শৈশব কাটিয়েছিলেন। শুভর বাবা শক্তিব্রত এবং ইন্দ্রের বাবা ভক্তিব্রত পরস্পর বিরোধী-চরিত্রের মানুষ। শক্তিব্রত লায়েক হয়েই পৃথাগান্ন হন। তারপর বাড়িটার অবস্থা এখনও তেমনি হয়ে আছে। শ্যামলী আর তার বর আসার পর ছাদটা একটু মেরামত করেছিল। নৈলে এতদিনে ভেঙে পড়ত।

শুভ বুঝতে পারছিল না ইন্দ্র ওখানে কী করছে। সে কয়েক পা এগিয়ে নিচু পাঁচিলের কাছে গেল। সেইসময় ইন্দ্রও ঘুরে তাকে দেখতে পেল। হনহন করে এগিয়ে আসছিল সে। পোড়ো জমিটা পিটুলিঝোপে ভরা। তার ভেতর দিয়ে ইন্দ্রকে আসতে দেখে শুভ হাসল। ইন্দ্র বরাবর এমনি করে বনবাদাড় ভেঙে চলাফেরা করে। সাপের ভয় করে না। পুরনো বাড়ির যে বাস্তুসাপটাকে অথবা সাপিনীকে ইন্দ্র মেরেছিল, পারিবারিক বিশ্বাস—তাদের বংশধবরা এখনও আনাচে কানাচে জীবনযাপন করছে।

ইন্দ্র বলল, ছবি আঁকছিস নাকি?

শুভ বলল, চেষ্টা করছি। আসছে না রে! আয় আড্ডা মারি।

নিচু পাঁচিল ডিঙিয়ে ইন্দ্র লনে ঢুকল। তারপর ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ধুস! কিছুই তো দেখছি না।

শুভ ঘাসে বসে বলল, বোস্। সিগারেট খা। —সে ইন্দ্রকে সিগারেট দিল।

ইন্দ্রের হাতে ড্যাগারটা আছে। জেল থেকে ফেরার পর যখন কাকিমার সঙ্গে দেখা করতে এল, তখনও তার হাতে এটা ছিল। ড্যাগার দিয়ে ঘাসেব ওপব আঁচড় কাটতে গিয়ে ইন্দ্র বলল, সরি।

শুভ বলল, তোকে একটা কথা বলি ইনা। এভাবে ছুরিটুরি নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুবিস না। আসলে এ দিয়ে কিছু হয় না।

ইন্দ্র সিগারেটটা শুভর সিগারেটের আগুনে ধরিয়ে নিয়ে আনমনে বলল, কিসে হয়? রিভলবার দিয়ে? না বোমা দিয়ে?—সে খিক খিক করে একটু হাসল।

ছেলেমানুষী করার বয়স তোর নেই ইনা। —শুভ বলল শান্ত ভাবে। —তুই বলেছিস বলে নয়, আমি জানি তুই স্নেহাকরকে স্ট্যাব করিসনি। তোকে বুদ্ধির দোষে খামোকা ভুগতে হয়েছে। কিন্তু যেভাবেই হোক, ব্যাপারটা যখন চুকে গেছে, আর ও নিয়ে ঝামেলা করতে যাস নে।

ইন্দ্র মুখ নামিয়ে গলার ভেতর বলল, আমি ভুগেছি বলে না।

তবে?

স্নেহাকরের জন্যে।

স্নেহাকরের জন্যে কী? —শুভ একটু ঝুঁকে গেল ওর দিকে।—শোধ নিবি? তুই কি জানিস কে ওকে অন্ধকারে গণ্ডগোলের মধ্যে স্ট্যাব করল?

ইন্দ্র মাথা দোলাল।

শুভ বলল, আমি বিপুলদার দোকানে বসে ছিলুম তখন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাসস্ট্যান্ডের ওই অংশটা ছিল পুরো অন্ধকার। তার মধ্যে অসংখ্য লোক থিক থিক করছিল। হঠাৎ খুব হইচই শুনতে পেলাম। বিপুলদার ছেলে নন্যু দৌড়ে এসে বলল, ইনাদা রাজেন কন্ডাক্টারের ছেলেকে স্ট্যাব করেছে। শুনেই দৌড়ে গেলাম। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কেউ টর্চ জ্বালল। তখন দেখলাম, তুই স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে আছিস। পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছিস, সরে যাও! সব সরে যাও! তারপর ইসলাম ড্রাইভার আর সব কারা এসে তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইন্দ্র আস্তে বলল, আমার খুব অবাক লেগেছিল, জানিস পুটুদা?—ইন্দ্র শুভর ছেলেবেলার ডাকনাম উচ্চারণ করল।—আমি ভীষণ ভাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। স্নেহাকরকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম গঙ্গাপুজোর মেলায়। তারপর টপ টপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। বাসস্ট্যান্ডের পেছনে

বাঁশবনটার ভেতর একটা ভাঙাচোরা বাস দাঁড় করানো ছিল, দেখেছিস তো?

মনে পড়ছে না।

ছিল। সুরিনদা—মানে ডোমপাড়ার সুরেন ড্রাইভার বাসটা চালাত। অ্যাকসিডেন্টে সামনের দিকটা দুমড়ে গিয়েছিল। কী যেন মামলা-টামলা হয়েও ছিল—মনে নেই। হাজরাবাবুর বাস।

সে মুখ নামিয়ে কী ভাবতে থাকল। শুভ বলল, তারপর?

ইন্দ্র মুখ তুলে বলল, কী খেয়াল হল—ভাবলাম ওই বাসটার ভেতর গিয়ে বসি। ভিড় ঠেলে কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ স্নেহাকরের চ্যাঁচানি শুনতে পেলাম। কী বলে চ্যাঁচাল মনে নেই। কিন্তু গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম স্নেহাকরের কিছু হয়েছে। আমি চেঁচিয়ে সাড়া দিলাম। তারপর স্নেহাকর সে বাসটার কাছ থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে গেল। তখনও বুঝিনি স্ট্যাব হয়েছে। ওকে দুহাতে তুলে নিয়ে আসছিলাম আলোর দিকে। সেই সময় চেঁচিয়ে উঠল, খুন! খুন! ইনা খুন করেছে!

শুভ তাকাল ওর দিকে। বলল, কে চ্যাঁচাল?

ইন্দ্র বলল, বুঝতে পারিনি। গলাটা খুব চেনা লেগেছিল। ওই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা কঠিন। টর্চের আলো ফেলল কেউ। দেখি স্নেহাকরের তলপেট পুরোটা লাল। তারপর মুকুল, মানু, আর কারা এসে গেল। ওরা বলল, পেটটা বেঁধে দিতে হবে রুমাল দিয়ে। আর আমার কিছু খেয়াল ছিল না।

শুভ ফের বলল, কে চেঁচিয়েছিল বুঝতে পারিসনি?

নাঃ।

শুভ একটু পরে বলল, যে চেঁচিয়েছিল, সেই স্ট্যাব করেছিল, ইনা! বুঝতে পারছিস না!

ইন্দ্র একটু হাসল! আমার বুদ্ধি একটু দেরিতে খোলেরে পুটুদা। পরে জেল-হাজতে ঘটনাটা তন্নতন্ন করে ভাবতাম। এ একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল যেন।

শুভ বলল, কিন্তু স্নেহাকরকে কে মার্ডার করতে পারে ভেবে পাই নে। এত ভাল ছেলে। দোষের মধ্যে খালি ওই একটা—লোকের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলা। কোথাও কিছু ঘটলে নাক না গলিয়ে ছাড়ত না। প্রতিবাদ করতে গিয়ে ইনসাল্টেড হত। অথচ ওই অভ্যাস।

ইন্দ্র বলল, কেসটা এমন করে সাজিয়েছিল যেন আমি গঙ্গাপুজোয় আসা মেয়েদের পেছনে লেগেছিলাম আর স্নেহাকর তাতে প্রটেস্ট করেছিল। তাই আমি ওকে স্ট্যাব করেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার পুটুদা কোন গাঁয়ের একটা মেয়েকেও যোগাড় করেছিল পুলিশ। মামলা চলার সময় তুই কলকাতায়। মেয়েটা কোর্টে দাঁড়িয়ে দিব্যি বলে গেল, এই বাবু আমাকে জ্বালাতন করছিল।

কোথাকার মেয়ে কী নাম?

ইন্দ্র হাসল।—এমন করে বলছিস যেন নাম বললেই চিনে যেতিস। সুরেন ড্রাইভার চেনে। কাল দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। বলল, মেয়েটা প্রস। পুলিশ কেস সাজাতে ওকে যোগাড় করেছিল।

থাকে কোথায়?

ওপারে মেছোপট্টিতে। —ইন্দ্র হাসতে লাগল।—আরতি নাম। থাকে মেছোপট্টির গলিতে। কোর্টে বলেছিল কোনো এক ....

শুভ কথা কেড়ে বলল, কোনো এক গাঁয়ের বধূ! তারপর সেও হাসতে লাগল।

ইন্দ্র বলল, নীলি নেই পুটুদা?

কলেজে। কেন?

চা খাওয়াবি?

গিয়ে নিয়ে আয় না! —শুভ একটু চটে ওঠার ভঙ্গি করল। —ওঠ্, যা। বড়দি আছে দ্যাখ গে।

ইন্দ্র পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, উঠতে ইচ্ছে করছে না। জেলে গিয়ে কী এক আলিস্যি ধরে গেছে মাইরি! শুধু চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

শুভ উঠল। আড়ামোড়া দিয়ে হাই তুলে লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে চলে গেল। ইন্দ্র আনমনে হঠাৎ ড্যাগারটা কদমগাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। ফলাটা ইঞ্চি দুই ঢুকে স্থির হয়ে রইল। ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে সে শুভর ইজেলের সামনে দাঁড়াল। ক্যানভাস সাদা রঙে ঝকমক করছে।

এপাশে-ওপাশে নিচের ঘাসে কয়েকটা পেন্টের কৌটো, ব্রাশ, তুলি ছড়িয়ে রয়েছে। ইন্দ্র একটা ধাবড়া তুলি নিল। তারপর একটার পর একটা রঙ মাখাতে শুরু করল সাদা ক্যানভাসে।

বাইরের বারান্দা থেকে দেখেই শুভ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ইনা! কী করছিস তুই।

সে দৌড়ে লন পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল।—মাই গুডনেস! করেছিস কী! ইমপসিবল! রিয়েলি ইট ইজ কোয়াইট আনবিলিভেবল!

ইন্দ্র নির্ভয়ে মিটিমিটি হাসছিল। তুলিটা রেখে শুকনো পাতায় আঙুলের রঙ মুছতে থাকল।

শুভ বলল, একটা মজার গল্প বলি শোন। একবার ইউরোপে ছবির একজিবিশান হচ্ছে। বাঘা-বাঘা সব আর্ট-ক্রিটিক এসেছেন। একটা ছবির প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ! সব আর্টস জার্নালে তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ছবিটা সম্পর্কে লিখলেন-টিখলেন। শেষে পেইন্টার নিজেই ফাঁস করে দিলেন—ছবিটা তাঁর পোষা শিম্পাঞ্জীর আঁকা!

শুভ হো হো করে হেসে উঠল। ইন্দ্র বলল, শিম্পাঞ্জীর চেয়ে খারাপ নিশ্চয় আঁকিনি।

সেই তো বলছি।—শুভ ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মারল।—তোর হিউমার বোধ কোনোদিন দেখলাম না ইনা!

চা কই?

আসছে। ততক্ষণ আরেকটা সিগারেট খা।.... বলেই শুভর চোখ পড়ল কদমগাছের গুঁড়িতে। সে লাফিয়ে উঠল। সর্বনাশ করেছে! নীলির চোখে পড়লেই কেলেংকারি। গাছটা ওর প্রাণ।

সে টানাটানি করে ড্যাগারটা খুলে আনল। ইন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিল সেটা। বলল, ভাল্লাগে না। চা খেয়ে একবার ঘাটের দিকে যাব। পুটুদা, জানিস? কিছুক্ষণ আগে আনুমাস্টার এসেছিল আমাদের বাড়িতে।

তাই বুঝি? —শুভ রঙ-বেরঙের ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর একটা ব্রাশ তুলে নিয়ে ঘষতে শুরু করল।—ইনা, পারস্পেকটিভ পেয়ে গেছি। তোকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইন্দ্র বলল, আনুমাস্টারের ব্যাপারটা দেখে আমার গা জ্বলে যায় মাইরি! যেন ভগবানের অবতার। তুই ডিটেলস জানিস না পুটুদা! আনুমাস্টার ভেতর ভেতর আমার যাতে সাংঘাতিক কিছু হয়, তার চেষ্টা কম করেনি। ফিরে এসে সব কথা কানে আসছে।

শুভ আনমনে বলল, স্নেহাকরকে স্নেহ করতেন মাস্টারমশাই। মনে জোর বেজেছিল রে। তাছাড়া স্ট্রং মরালিটির মানুষ বরাবর। ওঁর দোষ নেই!

কী বললি? মরালিটি?

হ্যাঁ।—শুভ হেঁট হয়ে একটা তুলি তুলে নিল। পেন্টের কৌটোয় চুবিয়ে তুলিটা ঝুলিয়ে রাখল। ফোঁটা ফোঁটা রঙ পড়তে থাকল। বলল, তোর ওপর রাগ থাকতেই পারে। কেন তা আশা করি জানিস?

মেয়েদের প্যাঁক খাওয়ানোর জন্যে তো?

শুভ একটু হাসল।—সম্ভবত তোকে সচ্চরিত্র মনে করেন না মাস্টারমশাই।

ইন্দ্র বলল, শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

শুভ তুলিটা নিয়ে ক্যানভাসের ওপর ঝুঁকে বলল, তোর মনে আছে নিশ্চয়—স্কুলে কো-এডুকেশনের কথা উঠলে উনি ভীষণ আপত্তি করেছিলেন। শেষে সব কেঁচে গেল। মাস্টারমশায়ের খানিকটা ইনফ্লুয়েন্স তো আছেই রানীরঘাটে। কিন্তু তার ফলটা ভালই হয়েছিল। তাই না?

ইন্দ্র ড্যাগারে ঘাসের বুকে আঁচড় কাটছে। কিছু বলল না।

শুভ একটু পিছিয়ে ক্যানভাসটা দেখতে দেখতে বলল, কেন, মাইনর গার্লস স্কুলটা হল না? ক্রমশ হাইস্কুল হয়ে যাবে দেখবি। শুনলাম, ইটখোলার চাঁদুবাবু কলেজ করার চেষ্টায় আছে। একদিন এপারটাও পুরো টাউন হয়ে যাবে। কলকাতা আর হাওড়ার মতো আর কী!

শুভ এগিয়ে গিয়ে ফের তুলিটা বুলিয়ে বলল, তবে তখন আমি শেয়ালমারায় চলে যাব। বুঝলি ইনা। আই হেট দা ব্ল্যাডি ফুল রানীরঘাট টাউনশিপ। ছেলেবেলায় কি ছিল এখানটা। হেভেন অ্যান্ড

হেল ডিফারেন্স! তুই কী বলিস?

ধুস! চা কোথায়?

এসে যাচ্ছে। বস্ না। —শুভ বাড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, বরং গিয়ে দেখ্ না তুই!

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। তারপর হন হন করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। শুভ চেঁচিয়ে উঠল, ইনা! কী হচ্ছে? এই ইনা! এটা কিন্তু ইনসান্টিং!

ইন্দ্র কোনো জবাব দিল না। সোজা এগিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। শুভ ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার মনে হল, ইন্দ্র ঠিকই করেছে। অনিমার মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিল, ইচ্ছে করেই দেরি করবে। ইন্দ্রকে সে যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি মাও তাকে পছন্দ করেন না। ইন্দ্র বাড়ি ঢুকলে হঠাৎ বাড়িটা কেমন গুমোট হয়ে যায়। বরাবর একরকম।

শুধু নীলি ইন্দ্রকে খাতির করে। ইন্দ্রের নামে বদনাম হলে প্রতিবাদ করে নীলি। নীলি থাকলে কখন চা এনে দিত। পাশে বসে গল্প করত। ইন্দ্র নীলিকে জেলের গল্প শোনাবে বলেছিল।

শুভর মনটা তেতো হয়ে গেল। আসলে তার এই ভাগ্য। সবাই তাকে অপমান করে অকারণে। তাকে কী সহজে যে ভুল বোঝে লোকেরা! এত কাছে এসেও যদি রত্নার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে ভুল বুঝতে পারে, অন্যরা তো বুঝবেই। শুভ ক্যানভাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কালো নীল সাদা লাল সবুজের ভেতর থেকে একটা অপমানিত ক্রুদ্ধ অসহায় মুখ বেরিয়ে আসছে। স্বাধীনতাহীন, ক্রীতদাস, ভাঙাচোরা সেই মুখ শুভর নিজেরই।.....

নিরু সদর দরজা খুললে ইন্দ্র তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তারপর দরজা আটকে দিল। নিরু একটু তফাতে সরে গিয়েছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরে ইন্দ্রকে দেখছিল।

ইন্দ্র বলল, চ্যাঁচাবে ভাবছ নাকি?

নিরু শক্ত গলায় বলল, আগে ওটা ফেলে দাও!

ইন্দ্র হাসল। এটাকে কেন এত ভয় নিরু? এটা তো তুমিই যত্ন করে কুড়িয়ে রেখেছিলে।

নিরু ছোট করে শ্বাস ফেলে বলল, তোমাকে ওটা সারাক্ষণ সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানোর জন্য দিইনি!

বড় রোদ! চলো, বারান্দায় যাই।—বলে ইন্দ্র সিঁড়ি বেয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল।

নিরু এসে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

একটু চা খাওয়াবে?

আঁচ নিভে গেছে।—নিরু আস্তে বলল।—এত বেলায় চা কেন? ভাত খাবে তো বলো!

ইন্দ্র মাথা নাড়ল। এত সকাল-সকাল ভাত-ফাত খাওয়া অভ্যাস নেই।

একা আছি কেমন করে জানলে? সবসময় ওঁত পেতে বেড়াও নাকি?

ঘাটে তোমার গার্জেনদের সঙ্গে দেখা হল। তুমি অত গম্ভীর কেন নিরু? একটু হেসে-টেসে কথা বলো। আজ আমার কিচ্ছু ভাল্লাগছে না! কী যে করি! .... ইন্দ্র ড্যাগারের উল্টো পিঠে বাঁহাতের মুঠোর ওপর মৃদু আঘাত করতে থাকল।

নিরু বলল, কুমু কী করে বেড়াচ্ছে শুনেছ?

কুমু? কী করছে বলো তো?

তোমার নামে পিটিশন লিখে সই করিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমাকে মিসায় ধরিয়ে দেবে!

মিসা? ইন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বলল, কে বলল তোমাকে?

কাল সন্ধ্যার পর বাবার সই নিতে এসেছিল।

সই দিলেন মাস্টারমশাই?

নিরু চুপ করে থাকল।

ইন্দ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, বলো!

আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? আমি দেখিনি। রান্নাঘরের বারান্দায় ছিলাম।

ইন্দ্র একটু হাসল। লুকোনোর দরকার নেই নিরু। স্যার সই দেবেন আমি জানি। আমি খালাস পাওয়াতে স্যার ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। কিন্তু বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নিরু ওর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বলল, অসভ্যতা কোরো না তো!

আমি কি সত্যি খুব অসভ্য? কুমুর মতো? ইন্দ্র ওর মুখটা দেখে নিয়ে ফের বলল, স্নেহাকরের মতো?

নিরু হিসহিস করে বলল, জেলে ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে কাটিয়ে তুমি কী নির্লজ্জ হয়ে উঠেছ ইনা। ছিঃ!

ইন্দ্র মিটিমিটি হাসছিল।—আমি বরাবর জানি, তুমি স্নেহাকরকে .... নিরু শক্ত গলায় বলল, না।

কিন্তু কতদিন দেখেছি আশ্রমের ঘাটে তুমি আর স্নেহাকর বসে আছ।

নিরু চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এমনি গল্প করতাম। ও কিছু না। কেন? কুমুর সঙ্গে তো গল্প করেছি কতদিন। কুমুদের বাড়িতে গেছি। কুমুও এসেছে। সবসময় বাবা মা যে থাকতেন, তাও না। আর তোমার সঙ্গেও কি নিরিবিলি গল্প করিনি কতদিন? যাইনি তোমাদের বাড়িতে?

ইন্দ্র বলল, তোমার বাবার চেয়ারটাতে বসব?

ন্যাকামি কোরো না!

কী জানি, পাপী তাপী-মার্ডারার মানুষ—যা ছোঁব তাতেই পাপ লাগবে। রক্ত মেখে যাবে। জানো? আমাকে সবাই খাতির করছে অথচ কেউ বসতে বলে না?.... ইন্দ্র চেয়ারটাতে বসে বাঁকা মুখে বলল, ঘেন্না ধরে যায় শালা মানুষের ওপর!

আসছি বলে নিরু চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। একটু পরে ফিরে এল চা নিয়ে। ইন্দ্র বলল, ম্যাজিক নাকি?

নিরু পাশে ন্যাড়া তক্তাপোষটার ওপর বসে বলল, কুমুকে তুমি কিছু বলবে না?

কী বলব বলো তো?—ইন্দ্র খিকখিক করে হাসতে লাগল। চা ছলকে পড়ল কাপ থেকে। সামলে নিয়ে ফের বলল, লোকের ওপর বেশি ঘেন্না হলে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করে।

নিরু বাঁকা হেসে বলল, ইস! জেলে গিয়ে সাধুমহাত্মা হয়ে গেছ দেখছি। বাবার আশ্রমে গিয়ে না ঢোকো শেষ পর্যন্ত!

ইন্দ্র ভুরু কুঁচকে ওর চোখে চোখ রেখে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ—এই ড্যাগারটা দিয়ে কুমুকে...

আমি তোমার মতো ছেলে হলে ঠিক তাই করতাম!

আমি জানি, তোমার সাহস আছে! ক্ষমতা আছে। তুমি ভীষণ ডানপিটে মেয়ে।

—ইন্দ্র নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলতে থাকল। ..... হয়তো কুমু এমন সাংঘাতিক কিছু করেছে, তুমি ওকে ক্ষমা করতে পারছ না! কিন্তু কুমুর ওপর আমার রাগ হয় না। কেন জানো? ও মানুষ নয়—একটা ছুঁচো। ছুঁচোর গায়ে হাত দেওয়ার অর্থ হয় না। তাছাড়া আর আমার জেলে যেতে একটুও ইচ্ছে নেই। আর নিরু, তুমি হয়তো বলতে চাইছ, স্নেহাকরকে কুমুই স্ট্যাব করেছে—তাই না?

নিরু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, করেছে। আমি দেখেছি।

ইন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বলল, দেখেছ? তখন ওখানে ছিলে তুমি?

ছিলাম। ভাঙা বাসটার ভেতর আমি আর স্নেহাকর বসে কথা বলছিলাম। বৃষ্টি এসে গেল তাই...

ওকে থামিয়ে ইন্দ্র বলল, অন্ধকারে তুমি দেখতে পেলে কুমু স্ট্যাব করছে স্নেহাকরকে?

আঃ! বলতে দাও ব্যাপারটা।

ইন্দ্র চা-টুকু গিলে কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বলো!

নিরু আস্তে বলল, আমরা কথা বলছি। হঠাৎ অন্ধকারে বাসটার দরজায় কে এসে টর্চ জ্বালল। অমনি স্নেহাকর বলল, কে? জবাব এল না। আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তাছাড়া ভীষণ ভড়কে গিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে বসেছি! টর্চ নিভছে না দেখেই স্নেহাকর উঠে গেল। ওর রাগ হয়েছিল। তাবপর যেই নেমেছে টর্চ নিভে গেল—তারপরই স্নেহাকর গোঙিয়ে উঠল।

তুমি কী করলে?

আমি তক্ষুনি নেমে এলাম।

নিরু মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। ইন্দ্র বলল, তারপর পালিয়ে গেলে?

হুঁ।

সেটা স্বাভাবিক। তুমি মেয়ে। তাছাড়া আনু-স্যারের মেয়ে। কিন্তু সে কুমু—কীভাবে বুঝলে?

ওটা বোঝা যায়। তাছাড়া আর কে হতে পারে?

ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল হঠাৎ।—নিরু চলি। আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু থাক। তোমার প্রব্লেম আসতে পারে। বাড়িতে আর কেউ নেই।

নিরু ঝাঁঝাল স্বরে বলল, তুমি মহাপুরুষ! তাই অমন করে দরজা এঁটে দিলে তখন।

ইন্দ্র একটু হাসল।—বারবার ইচ্ছে বদলে যাচ্ছে, জানো। মনের ভেতর হাজারটা ইচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছে। দবজা খুললে যখন, তখনকার ইচ্ছে কোথায় সরে গেছে। আসলে আমার কিছু ভাল লাগছে না নিরু। কী যে করি!

সে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে উঠোনে নামল। তারপর বেবিয়ে গেল দরজা খুলে।

নিরু কতক্ষণ পরে গিয়ে দরজার বাইরে উঁকি দিল। রাস্তা নির্জন। সে দরজা এঁটে ঘুরে একটুখানি দাঁড়িয়ে রইল। ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে কলতলার দিকে হেঁটে গেল।...

একটানা খরার পর রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিটা জমিয়ে দিল দিনের দিকে। গঙ্গার ওপর ধূসর পর্দা কাঁপতে থাকল। ঘাটোয়ারীজির গদিতে এসেই বিপদ হয়েছে আনন্দময়ের। পুরনো ছাতাটা যে বেজায় কমজোর হয়ে গেছে, অনুমান করতে পারেননি। আসার সময় বারতিনেক উল্টেছে। ভিজেছেন আষ্টেপিষ্টে।

জামাকাপড় গায়ে শুকিয়ে গেল। চৌবেজী মাথার ওপর বেড়াজালে ঘেরা ছোট্ট ফ্যান খুলে দিয়েছিলেন। ইটের পলকা দেয়ালের মাথায় টালির তেচালা ঘর। সামনে উঁচু তক্তাপোষ। তার ওপর তোষক সাদা চাদরে ঢাকা। বড় বড় কয়েকটা তাকিয়া আছে। তক্তাপোষের পেছনে খানিকটা অংশে টিনের পার্টিশান। ওখানে চৌবেজী স্বপাক খান। দড়ির আলনায় একটা গামছা ঝুলছে মাত্র। বোঝা যায় না লাখপতি লোক। বছরে আটানব্বুই হাজার টাকায় ঘাট ডেকে নেন কালেকটরিব নিলামে।

ভাতিজা রামলাল বাঁশের বেড়ার মুখে বসে পারানি গুনে নে গাড়িটাড়ির ফটক নিচের দিকে। এ বৃষ্টিতে একদঙ্গল গরুর গাড়ি এসে আটকে গেছে। তুফান কমলে নৌকো পাবে। কিন্তু মানুষ পারাপারের কমতি নেই। শম্ভু মাঝি ডিউটি করছিল ভোরবেলা থেকে। দশটায় তার ছুটি। এখন ভাদুয়া আর শংকরা নৌকো বাইছে। তারাও বড় দড় মাঝি।

শম্ভু মেঝেয় বসে হুঁকো টানছে। মুখ থেমে নেই। তার মাথার ওপর ময়নার খাঁচা। বিষ্টিবাদলার দিন ময়নাটা কেমন ঝিম মেরে বসে থাকে। কেউ না শুনলে ময়নাটাকেই কথা শোনায় শম্ভু।

পটল ভিজতে ভিজতে কেটলি করে চা আনল। আনন্দময় বললেন, বিষ্টির দিনে চায়ের একটা মজা আছে। তবে চৌবেজী, ফ্যানটা এবার বন্ধ করুন। শীত করছে।

চৌবেজী সুইচ অফ করে দিলেন। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, এ শম্ভুয়া! কাহে ওত্‌না বকবক করছিস? চায় পি লে!

শম্ভুর এক হাতে মাটির ভাঁড়ে চা। কিন্তু হুঁকো ছাড়তে মন চায় না! বলল, মাস্টারমশাই বললেন, বিষ্টির দিনে চায়ের একটা মজা আছে। আমার মজা হুঁকোয়! সেবার টিপটিপ করে বিষ্টি হচ্ছে—এত জোরে না, যাকে বলে টিপটিপানি! তো রাজেনবাবু—কনডেকটার গো মাস্টারমশাই, বুঝলেন?

শম্ভুর বাক্যরচনা এইরকম। চৌবেজী বিরক্ত হয়ে বললেন, খালি বকবক!

আনন্দময় বললেন, রাজেন খুব হুঁকোর ভক্ত ছিল। মোট আপিসে সবসময় দেখেছি টেবিলের পাশে হুঁকো ঠেস দিয়ে রেখেছে। ফুড়ুক ফুড়ুক করে টানছে, আর পয়সা হিসেব করছে।

ভাতিজা রামলাল বলল, রাজেনবাবুর সঙ্গে উওরোজ দেখা হল।

আনন্দময় বললেন, কোথায়, কোথায়?

উপ্‌পার—টাউনে—। —রামলাল বলল। ওন্‌হেক বাত করল রাজেনবাবু। আপনার কোথা বলল।—সকলকার কোথা বলল।

শম্ভু বলল, দেখা আমার সঙ্গেও কি হয়নি? একদিন না, দুদিন পরপর। পেত্থম দিন নৌকো একটুখানি ভাটিয়ে গিয়েছিল। দেখি উইখেনে—শম্ভু বাইরে ঝুঁকে বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে থাকা গঙ্গার দিকে কোথাও আঙুল তুলল। তারপর বলল, চুপচাপ বসে আছে গাছতলায়। দেখে বলল, ভাল তো? বললাম, পারে আসবেন নাকি? হাত নেড়ে বলল, না। তা'পরে একদিন ফের নৌকো ভাটিয়ে গেছে, সেদিনও দেখি সেই গাছতলায় চুপ করে বসে আছে। লোকটা ছেলের শোকে ক্ষ্যাপা না হয়ে যায়!

আনন্দময় কান করে শুনছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, তবে যে বলেছিল কাটোয়ায় পৈতৃক ভিটেয় গিয়ে থাকবে?

রামলাল বলল, আমারও কী রোকম লাগল মাস্টারমশাই। ওনহেক বাত কোরলেন, লেকিন সবকুছ সমঝতে পারলাম না। উনহির কুছু গড়বড় হইয়েছে!

চৌবেজী উদাস মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বলল, বেটার জন্যে বহৎ দুখ্‌ বেজেছে। পাগলা হোবে না কেন?

আনন্দময় গম্ভীর হয়ে গেছেন। আস্তে বললেন, তাহলে রাজেন ওপারেই আছে। আশ্চর্য!

একটা বাস এসে থেমেছে স্ট্যান্ডে। যাত্রীরা নেমে বৃষ্টির মধ্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে আশ্রয় নিচ্ছে। কয়েকজন এসে পাশের আটচালায় গাড়োয়ানদের দঙ্গলে ঢুকে গেল। কজন সোজা ভিজতে ভিজতে ঘাটের মুখে এল। কেউ-কেউ ছাতা মাথায় এসে দাঁড়াল। নৌকো এখনও ওপারে। বৃষ্টি-বাদলার দিন পারাপারে বড় দেরি হয়। গদীর ভেতর ভিড় হয়ে গেল।

আনন্দময় বললেন, উঠি চৌবেজী।

দমকা হাওয়ার দাপট আছে। ছাতার শিক চেপে ধরে আনন্দময় কিছুটা এগিয়ে কল্যাণ ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে ঢুকলেন। হরিশংকর চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিল। ঘর ফাঁকা। সিগারেট লুকিয়ে বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়েছেন মাস্টারমশাই?

আনন্দময় রোগীদের বেঞ্চে বসে ছাতাটা একপাশে রাখলেন। .... কল্যাণ কোথায় হে হরিশংকর? বলে গত কালকের খবরের কাগজটা টেনে নিলেন।

হরিশংকর বলল, ডাক্তারবাবু ভেতরে। ডাকব নাকি?

থাক।

রুগীপত্তর নেই-টেই। হরিশংকর মুচকি হাসল।—এমন দিনে কি কারুর বেরুতে ইচ্ছে করে? আমিও বেশিক্ষণ থাকব না।

আনন্দময় কাগজে চোখ রেখে বললেন, একটা কথা বলতে এলাম হরিশংকর!

বলুন মাস্টারমশাই?

তুমি আমার নাম কোরো না—ইন্দ্রনাথকে বোলো একটু সাবধানে চলাফেরা করবে। হরিশংকর গ্রাহ্য করল না। বলল, ধুস্‌! ও আবার একটা মানুষ, না ইয়ে। ইনার কথা আর বলবেন না মাস্টারমশাই! পেয়েছিল আমার মতো একটা মানুষ। কাঁধে চেপে খুব স্ফূর্তি উড়িয়ে বেড়াল। তবে আর না। আপনাকে বলেছিলাম, এ শর্মা আর রানীরঘাটের জল খাবে না। তখন ইনা বুঝবে কী করে মুখের সামনে অন্ন আসে।

আনন্দময় বললেন, আহা! কথাটা শোনোই না হে! শ্যামলীকে বলে আসব ভাবছিলাম, কিন্তু ও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না। ইন্দ্রনাথ আমাকে ফের ইনসাল্ট করে বসবে। তো...

হরিশংকর বলল, বলছেন যখন, বলব।

কথাটা না শুনেই কী বলবে?—আনন্দময় বিরক্ত হয়ে বললেন। ... রাজেন—মানে স্নেহাকরের বাবা শুনলাম রোজ ওপারে কোথায় এসে বসে থাকে। পাগলামির লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। কথাটা শুনে

আমার কেমন যেন লাগল। রাজেনের তো বরাবর একটু মাথা গরম ছিল।

আচ্ছা, বলব।—বলে হরিশংকর বৃষ্টি দেখতে লাগল। মনে মনে সে বিরক্ত। এই লোকটার মাথায় কী যেন আছে। সারাক্ষণ খালি ইনা আর ইনা। দেখা হলেই ওসব কথা নিয়ে ফুসুর-ফাসুর! হরিশংকরের ভারি অবাক লাগে।

অবশ্য কিছু কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক এ সংসারে দেখেছে হরিশংকর। তাদের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রক্ষে নেই। হরিশংকর হাই তুলে বলল, বিষ্টি ভালও বটে, আবার মন্দও বটে। এতক্ষণ জায়গাটার কী অবস্থা হত। কাঁসরঘণ্টার মতো ঝমঝম করে বাজত। এখন দেখুন, যেন শ্মশানঘাট। মানুষজন যেন মড়া। চা আনব মাস্টারমশাই?

চা খেয়ে এলাম। থাক।

আনন্দময় বাসস্ট্যান্ডের ওদিকে মোটর আপিসের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাতে খোলা কাগজ। হরিশংকর একটু হেসে বলল, আপনি এখনও খালি চোখে দেখতে পান মাস্টারমশাই?

পাই।

পান বটে। আসলে আপনারা আগের দিনের লোক। আর আমার অবস্থা দেখুন না! কবে থেকে চশমা নেব-নেব করছি, হয়ে উঠছে না।

বয়স কত হল হরিশংকর?

চল্লিশ পেরিয়েছি। আপনার কত হল মাস্টারমশাই?

পঁয়ষট্টি।

হারশংকর মেয়েদের ভঙ্গিতে বলল, যাঃ! বিশ্বাস হয় না।

আনন্দময় একটু হাসলেন। .... কেন হে? আমাকে বুড়ো লাগে না দেখে?

আজ্ঞে না। —হরিশংকর সপ্রশংস দৃষ্টে তাকিয়ে বলল। —দেখে পঞ্চাশ-টঞ্চাশ লাগে। তাছাড়া আপনার হেলথখানাও দেখবার মতো।

না হে! বাইরেই এমনি। ভেতরটা ফোঁপরা।—আনন্দময় আনমনা হয়ে বললেন। —তবে যৌবনে নিয়মিত শরীরচর্চা করতাম। উঠতাম খুব ভোরবেলায়। এই ঘাটের আড়তের মুটেরা ওই সময় গঙ্গার ধারে ডনবৈঠক করত। কুস্তি করত। তাগড়াই চেহারা ছিল হিন্দুস্তানীগুলোর। প্রথম প্রথম আমাকে খুব ঠাট্টাতামাশা করত। শেষে ওদের আখড়ায় ভিড়ে গেলাম। আখড়া মানে ভোরে একবার, সন্ধ্যায় একবার, ঘাটের নীচে চৌকো একটা জায়গায় ফিজিক্যাল একসারসাইজ।

তারা কোথায় গেল বলুন তো?

আনন্দময় গাল থেকে মাছি তাড়িয়ে বললেন, মোহনবাবুর আড়তে বেছে বেছে তখন হিন্দুস্থানী নেওয়া হত। বেশির ভাগই পূর্ণিয়ার লোক। ঘাটোয়ারীও ছিলেন ঐ তল্লাটের বাসিন্দা। তিনিই আনিয়ে দিতেন মোহনবাবুকে। এখন মোহনবাবুর নাতির আমল। যাকে পায় রাখে। রোগা পটকা মুটেগুলো দেখলে এখন আমার হাসি পায়। দেড় মণ বস্তা পিঠে টানতে ধকায়। মোহনবাবুর আমলে আড়াই মণ-তিন মণ খন্দের বস্তা নামাতে দেখেছি পিঠ থেকে। তখনও গরুর গাড়ির চল ছিল বেশি। লরি-টরি এ রাস্তায় এল যুদ্ধের সময়। তার আগে ছিল গোরুমোষের গাড়ি। সাঁইথিয়া থেকে বোঝাই হয়ে আসত। ঘাট জুড়ে খালি গাড়ি আর গরুমোষের বাথান। চেঁচামেচি হট্টগোলে কানপাতা দায় হত।

বৃষ্টিটা একটু বাড়ল। হাওয়া থেমে গেছে। ঝমঝম করে ঝরছে আর আয়তক্ষেত্রের গড়ন চৌকো বাজার এলাকার সব জল রাস্তা উপচে ওপাশের গভীর খালে গিয়ে পড়ছে। খালের পাড় বাঁশ আর কাঠের বেড়ায় আটকানো। নৈলে দোকানপাট কবে ধসে গিয়ে খালে পড়ত।

হরিশংকর বলল, ব্যস! এবেলার মতো বেধে গেল। মাস্টারমশাই, কেলেংকারি দেখছি!

আনন্দময় হাত বাড়িয়ে ছাতা নিয়ে বললেন, কেলেংকারি কিসের হে? ভিজতে তোমার ভাল লাগে না?

সর্বনাশ! এর মধ্যে বেরুচ্ছেন?

হুঁ। যাবে তো এস।

হরিশংকর আঁতকে দাঁত বের করে বলল, আমার সইবে না মাস্টারমশাই! একটুখানি ভিজলেই নাক দিয়ে জল গড়াতে শুরু করে। এই যে বৃষ্টির মধ্যে ডিসপেনসারিতে এসেছি, সে নেহাত চাকরির দায়ে।

বলে সে সন্দিগ্ধভাবে ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়ে নিল একবার। আন্দময় ধুতি গুটিয়ে স্যান্ডেল এক হাতে, অন্য হাতে ছাতা নিয়ে বেরুলেন। হরিশংকর দেখল, বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে মোটর-আপিসে গিয়ে ঢুকলেন।

হরিশংকর দেখেছে, আনুমাস্টারের এই স্বভাব। সকাল-বিকেলটা ঘাটের এখান-ওখান করে আড্ডা দিয়ে কাটান। বৃষ্টিবাদলাতেও এ স্বভাবের নড়চড় নেই। অদ্ভুত মানুষ এই আনুমাস্টার।

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টিটা বেশ কমে এল। তখন হরিশংকর ডাক্তারবাবুর চাকর ভোলাকে ডেকে দরজা বন্ধ করতে বলে বেরুল। যাবার পথে দেখল, তখনও আনুমাস্টার বাড়ি ফেরেননি। এখন মনোহরের চায়ের দোকানে ঢুকেছেন।

বাড়ির উঠোনে জল জমেছে। খিড়কির দিকে পাঁচিলের তলা দিয়ে জল যাওয়ার ফোঁকর আবর্জনায় ঠাসা। হরিশংকর এ হে হে হে করে দৌড়ে গেল! স্যান্ডেল দুটো ছুঁড়ে ফেলল বারান্দায়। আবর্জনা পায়ে ঠেলে সরিয়ে পাতকুয়োর কাছে এল। বাড়ি সুনসান স্তব্ধ। ইন্দ্রের ঘরের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। হরিশংকর বুঝল, বাবু তবে আজ টোটো করতে যাননি। খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছেন।

পাতকুয়োর কাছটা খোলামেলা। বৃষ্টি থেমেছে ততক্ষণে। জল তুলে পা হাত মুখ রগড়ে ধুয়ে হরিশংকর বারান্দায় গেল। তারে গামছা ঝুলছে। টেনে নিয়ে চাপা গলায় ডাকল, শ্যাম!

শ্যামলী ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বটতলার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা দেখছিল। বেরিয়ে এসে বলল, ভিজেছ তো? ফের জ্বর বাধাও। বিনি পয়সার ওষুধ পেলে এমনি সাহস বাড়ে মানুষের।

হরিশংকর খ্যা খ্যা করে হাসল। .... কী বলে শোনো! বৃষ্টির দিন। শুকনো থাকব কেমন করে বলো দিকি?

সে কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকলে শ্যামলীর চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। বড়-বড় চোখ করে ফিসফিসিয়ে বলল, ইনা যা করছে, আর সহ্য করা যায় না! কী নির্লজ্জ—কী নির্লজ্জ! ছি! ছি! ভাই না হলে আমি কেলেংকারি করে ছাড়তাম!

হরিশংকরও গলা চেপে বলল, ব্যাপার কী?

আনুমাস্টারের মেয়ে আছে ও ঘরে।

অ্যাঁ।—হরিশংকরের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

শ্যামলী বলল, আমি রান্না করছিলাম। পেছনে তো আমার চোখ নেই। কখন এসে ঢুকেছে তাও দেখিনি। কতক্ষণ পরে রান্না শেষ করে ইনাকে ডাকতে গেলাম। দেখি দরজা বন্ধ । ভেতরে কথা বলছে কার সঙ্গে। দরজায় কান পেতে শুনি, আনুমাস্টারের মেয়ের গলা।

হরিশংকর সন্দিগ্ধ মুখে বলল, আর কেউ নয় তো?

আবার কে হবে? রানীরঘাটে অমন দুকানকাটা মেয়ে আর আছে নাকি?

তুমি গলার স্বর শুনে বুঝলে আনুমাস্টারের মেয়ে?

বলছি তো!

হরিশংকর হঠাৎ ফিক করে হাসল।... দরজা বন্ধ করলো কেন বলোদিকি?

শ্যামলী ওর বুকে থাপ্পড় মেরে বলল, ন্যাকার মতো হেসো না! গা জলে যায়। শোনো, আমরা আর এখানে থাকব না। বর্ধমানে ফিরে যাই, চলো। ইনা যা খুশি করুক—জানব আমার একটা ভাই ছিল, গঙ্গায় ভেসে গেছে।

সে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল। হরিশংকর গুম হয়ে ঠোঁট কামড়ে জানলার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দেখ শ্যামু! আমি পারি। হ্যাঁ—আমি পারি বইকি শায়েস্তা করতে। আমার অধিকারও আছে। কিন্তু খালি ভাবি কি জানো শেষে তুমিই হয়তো ভাইয়ের হয়ে আমার সঙ্গে লাগতে আসবে।

শ্যামলী আঁচলে নাক মুছে কী বলতে যাচ্ছিল, ইন্দ্রের ঘরের দরজা খোলার শব্দ হল। খুব চাপা শব্দ। হরিশংকর বলল, হারামজাদী মেয়েছেলের বড় বাড় হয়েছে! আমি যে পুরুষ মানুষ—নৈলে চুলের ঝুঁটি ধরে অ্যায়সা আছাড় মারতাম, প্রেম-ট্রেম কেলিয়ে লাট হয়ে যেত!

বলতে বলতে তার গলা ফুটে বেরুল।—পেয়েছ কী সব? এটা কী বেশ্যাবাড়ি? অ্যাঁ? ছোটলোকের মেয়ে! এখনই যাচ্ছি তোর বাপের কাছে। বাপ বেড়াচ্ছে আড্ডাবাজি করে, এদিকে মেয়ে বেড়াচ্ছে বেশ্যাগিরি করে।

রাগের নিয়মই এই। আচমকা সাহস বাড়িয়ে দেয়। হরিশংকর বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্র সিগারেট টানছে। হরিশংকর জলদগম্ভীর স্বরে বলল, ইনা টেক কেয়ার বলে দিচ্ছি! খুব বাড়াবাড়ি করছ তুমি! হ্যাঁ—খুব বেড়ে গেছ।

ইন্দ্র আস্তে বলল, চেঁচাচ্ছেন কেন?

হরিশংকর গর্জন করল, ঘরে কে ছিল? অ্যাঁ? কে ছিল ঘরে? এ কি প্রসকোয়ার্টার? অ্যাঁ?

ইন্দ্র সিগারেট উঠোনের জলে ছুঁড়ে বলল, যেই থাক, ও নিয়ে ভাববেন না জামাইবাবু। আমার ব্যাপারে নাক গলাবেন না বলে দিচ্ছি।

হরিশংকর ক্ষোভে ভাঙা গলায় শ্যামলীর উদ্দেশে ঘুরে বলল, শুনছ? যদি নাক না গলাতাম, অ্যাদ্দিন কী হত ভাবছ না? কে পয়সা খরচ করে হাইকোর্টে লড়তে গিয়েছিল? তখন তো সারা রানীরঘাটে মাথা ভাঙলেও কাকেও পাওয়া যায়নি! নেমকহারাম! স্বার্থপর! বেইমান!

ইন্দ্র নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, হাইকোর্টের টাকা মায়ের গয়নাগাঁটি বেচে। মাথা খারাপ করবেন না জামাইবাবু! আমি সব জানি।

শ্যামলী দরজায় উঁকি দিচ্ছিল। বেরিয়ে বলল, ধিক্ শত ধিক তোকে। নির্লজ্জ! আমি বাড়িতে আছি—আমার সামনে মেয়ে ঢোকাচ্ছিস ঘরে? ছি ছি ছি! ছিঃ!—সে মুখে আঁচল ঢেকে হু হু করে কাঁদতে থাকল।

স্ত্রীর কান্নায় হরিশংকর আরো খেপে গিয়ে চেঁচাল, লম্পট। চিরকালের লম্পট!

ইন্দ্র প্যান্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করল। ফলা খুলতেই হরিশংকর কয়েক পা পিছিয়ে গেল। সে হাঁকতে হাঁকতে বলল, শামু! শামু! উরে ব্বাস! তোমার ভাই আমাকে স্ট্যাব করতে আসছে!

শ্যামলী তাকাল। ইন্দ্র ছোরাটা দিয়ে থামে আঁচড় কাটছে। শ্যামলী বোবাধরা গলায় বলল, ইনা!

হরিশংকর হঠাৎ মরিয়া হয়ে গেল। একলাফে ঘরে ঢুকে একটা মরচেধরা শাবল নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর আকাশ ফাটিয়ে বলল, আয় শালা! চলে আয় শুওরের বাচ্চা! তোর একদিন কী আমার একদিন! হয় আমি মরব, নয় তুই! আয়! কাম অন!

সে লাফাতে শুরু করেছে শাবলটা নিয়ে। ইন্দ্র আপনমনে জীর্ণ পলেস্তারাহীন থামে আঁচড় কেটে চলেছে। এই সময় আবার বৃষ্টিটা ঝাঁপিয়ে এল। শ্যামলী ছিটকে গিয়ে উঠোনে নামল। তারপর সদর দরজা দিয়ে ছুটে গেল।

হরিশংকর সমানে লাফাচ্ছে আর হুংকার ছাড়ছে—আও! কাম অন! শুয়ারকা বাচ্চা! কাম অন!

শুভ ছাতা মাথায় দৌড়ে এল শ্যামলীর সঙ্গে। শুভকে ডাকতে গিয়েছিল শ্যামলী।

শুভ ঘুমোচ্ছিল। মুখটা ফোলা একটু, চোখ দুটো লালচে। বারান্দায় উঠে বলল, জামাইবাবু! চুপ করুন তো!

হরিশংকরের তেজ বেড়ে গেল শুভকে দেখে। শুভ তার হাত থেকে শাবলটা কেড়ে নিয়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর ইন্দ্রের হাত থেকে ড্যাগারটা কাড়তে গেলে ইন্দ্র ফলা বুজিয়ে ঝটপট পকেটে চালান করে দিল। শুভ বলল, মারব এক থাপ্পড় রাস্কেলকে! আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে! লজ্জা করে না তোর?

সে ইন্দ্রের নীল স্পোর্টিং গেঞ্জির কলার খামচে ধরে বলল, আয় আমার সঙ্গে।

ইন্দ্র বলল, আঃ পুটুদা! ছিঁড়ে যাবে যে!

ছিঁড়ুক। তুই চলে আয়।

ছাড়ো, যাচ্ছি।

ছাতার তলায় ইন্দ্রের কাঁধ বেড় দিয়ে শুভ উঠোনে নামল। তারা যখন সদর দরজার কাছে, শ্যামলী ভাঙা গলায় বলে উঠল, শুভ! ইনা এখনও খায়নি।

শুভ জবাব দিল না। গলিতে গিয়ে বলল, কী নিয়ে বাধল রে?

নিরু এসেছিল।

বলিস কী!

হঠাৎ ভিজতে ভিজতে এসে ঘরে ঢুকল। দরজা আটকে দিল। আমি কী করব?

নিরুকে বিয়ে করবি?

ধুস! ওসব কে ভাবছে?

তাহলে ওকে নষ্ট করছিস কেন?

নষ্ট মানে?

শুভ হাসল।—থাপ্পড় মারব বলে দিচ্ছি! ন্যাকা!

বিশ্বাস কর, পুটুদা, আজ অব্দি একটা চুমুও খাইনি ওকে। ... ইন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলল, নিরু চায়, আমি ওকে নিয়ে যা খুশি করি। কিন্তু ওকে আমার ভাল লাগে না। এবার যেন জোঁকের মতো লেগেছে আমার গায়ে।

কেন? ওর সঙ্গে তো তোর অনেক কালের প্রেম!

প্রেম!—ইন্দ্র হাসল।—পুটুদা, বিয়ে করে তুই মাইরি কী যেন হয়ে গেছিস!

বাঁদিকের পোড়ো জমিতে ঘুরে শুভ বলল, তাহলে কেন তুই ওর সঙ্গে এত মিশতিস?

ইন্দ্র সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, নিরুকে আমি বুঝি না পুটুদা! স্নেহাকরের সঙ্গেই ওর ছেলেবেলা থেকে বেশি ভাব ছিল। স্নেহাকর ওর বাবার কাছে বিনিপয়সায় পড়ত দুবেলা। অনেকদিন ওদের বাড়িতেই খেয়ে স্কুলে যেত। আবার দেখেছি, কুমু শালাও নিরুর সঙ্গে মাখামাখি করছে।

শুভ হাসতে লাগল। .... মাস্টারমশাই বেশি কড়াকড়ি করতে গিয়েই হয়তো মেয়ের বারোটা বাজিয়েছেন। আয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার মানে হয় না।

ইন্দ্র ইতস্ততঃ করছিল। শুভ তাকে কাঁধ জড়িয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। এপাশের দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে শুভ বলল, বস্‌। সিগারেট খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর। আসছি।

শুভ ভেতরে চলে গেল। একটু পরে নীলি একটা বই হাতে করে ঘরে ঢুকল। বলল, কী হয়েছে গো ইনাদা? জামাইবাবু হঠাৎ খেপলেন কেন? খুব চেঁচাচ্ছিলেন শুনছিলাম!

ইন্দ্র বলল, এমনি। তুই বুঝি কলেজ যাস্‌নি আজ?

নীলি জানলার কাছে গিয়ে বলল, মাথা খারাপ? রেনিডেতে বেরুব? নৌকো উল্টে মারা পড়ি আর কী? তারপর ঘুরে ফের বলল, হ্যাঁ গো ইনাদা, কাল বিকেলে ঘাটের ওখানে কী হয়েছিল? মারামারি করেছিলে নাকি?

ইন্দ্র হাসল।—তুই দেখেছিস?

কলেজ থেকে আসছিলাম। দেখলাম তোমাকে সবাই হাতমুখ নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে।—নীলি খিলখিল করে হাসতে লাগল।—আর তোমাকে দেখলাম, খুব মন দিয়ে শুনছ।

ইন্দ্র বলল, শশাংক আর কুমুকে একটু ধোলাই দেবার ইচ্ছে ছিল। হল না।

সে কী! কেন?

ইন্দ্র বলল, এমনি।

নীলি বলল, পারতে ওদের সঙ্গে? এখন তো তোমার সার্পোটার নেই। তুমি তো একা।

তুই জানিস?

নীলি মাথা নেড়ে জানলার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল, ইনাদা! দেখছ আমার গাছগুলো রাতারাতি পেখম মেলেছে? ইস! মিরাকল! ইনাদা! বৃষ্টিতে কী থাকে বলো তো? হঠাৎ সবকিছু কেমন চেঞ্জ—কেমন একটা লাইফ। তাই না গো?

এই মেয়েটা বরাবর এরকম। আপন মনে বিড়বিড় করে। মাথায় ছিট আছে নির্ঘাৎ। ইন্দ্র বাড়ির পেছনে বটগাছটার ওখানে দাঁড়িয়ে নীলিকে তাদের বাগানে অদ্ভুত ভঙ্গিতে—নাচের মতো শরীর নিয়ে খেলতে দেখেছে। ছেলেবেলাতেও এই অভ্যাস ছিল নীলির।

কিন্তু 'তুমি তো একা' কথাটা ইন্দ্রের বুকে নতুন করে পেরেক বিঁধিয়ে দিয়েছে। সত্যি, এভাবে তো দেখেনি ব্যাপারটা। মুকুল, কানু, অরুণ—ছায়ার মতো ঘুরতো তার সঙ্গে যেসব ছেলেরা, তারা যেন রানীরঘাট থেকে উধাও হয়ে গেছে। অথবা গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে ইন্দ্রের চোখের আড়ালে। কেউ তাকে ডাকতে আসে না। ইন্দ্র প্যান্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করে হাতের নখ কাটার চেষ্টা করল। নীলি এদিকে পেছন ফিরে আছে। জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। হঠাৎ ঘুরে ড্যাগরটা দেখে ভয় পাবে ভেবে ইন্দ্র তক্ষুনি ফলা বুজিয়ে দিল। প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলল। তারপর আনমনে ডাকল, পুটুদা। কী করছিস রে ভেতরে?......

আজকাল আনন্দময় হঠাৎ-হঠাৎ কী এক বোধে আক্রান্ত হন। দ্রুত পেছন ফেরেন, পেছনে পায়ের শব্দ। ভিড়ের ভেতর চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয়, সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিব্রত বোধ করেন। মনোহরের চায়ের দোকানের সামনে সেদিন কারা চুপিচুপি কথা বলছিল, আনন্দময়ের মনে হচ্ছিল যেন তাঁকে নিয়েই কী সব কথাবার্তা চলেছে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সরে এলেন। লোকগুলো তাঁর চেনা নয়।

এসবের সঙ্গে ইন্দ্র ফিরে আসার কোন সম্পর্ক আছে কি না বুঝতে পারেন না আনন্দময়। একেক সময় তাঁর মনে হয়, পৃথিবীতে তিনি বড্ড বেশি একা হয়ে পড়েছেন। সবকিছু তাঁর কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে এবং সরে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

স্ত্রী সুচরিতাও তাঁকে ত্যাগ করার মতলবে আছে যেন। দিনরাত্রি প্রায় সারাক্ষণ সাধুজীর আশ্রমে কাটান তিনি। আচার-ব্যবহারে আগের চেয়ে একেবারে উল্টো হয়ে গেছেন। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে। মধুর কথাবার্তা বলেন। বলেন খুব কম কথাই—কিন্তু যেটুকু বলেন, অনেক ওপর থেকে মধু দিয়ে মাখিয়ে বলেন। আর নিরুকে তো কোনোদিনই আয়ত্তে রাখতে পারেননি আনন্দময়। ছেলেবেলায় উঠোনের পেয়ারাগাছে বেঁধে রাখতেন। ওর পাড়াবেড়ানি আর দস্যিস্বভাব শায়েস্তা করতে বেদম পিটুনি দিতেন। ও যে ছেলে নয়, মেয়ে এবং মেয়েদের জন্য ছেলেদের শাস্তি প্রয়োগ করার নিয়ম নেই, শিক্ষক হয়েও তা গ্রাহ্য করতেন না আনন্দময়। সুচরিতা একটা বয়স অব্দি স্বামীকে একটু ভয় করে চলতেন, তারপর শক্ত হতে শুরু করেন। শেষে আনন্দময়কে কথায়-কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে বা মুখনাড়া দিয়ে শাসন করতেও সফল হয়েছিলেন। এতে আনন্দময়ও যেন স্ত্রীকে উল্টে ভয় পেতে শুরু করেন এবং নিরুর অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করেন। নিরু বরাবর মায়েরই অনুগামিনী ছিল। ফলে নিরুও মায়ের তালে তাল দিয়ে বাবাকে অগ্রাহ্য করতে থাকে। তারপর আনন্দময় একদিন বুঝতে পারেন, নিরু তার মায়েরও তোয়াক্কা করছে না আর।

ঘরে-বাইরে অনেক যুদ্ধ করে মানুষকে বাঁচতে হয়। আনন্দময়ের বেশি যুদ্ধটা ঘরের ভেতর হয়েছে। এখন হার মেনে একপাশে সেঁটে গেছেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে।

ক'দিন বৃষ্টির পর আকাশ একটু পরিচ্ছন্ন হয়েছে আবার। গঙ্গার ধারের মাটিটা জমানো দুধের মতো। জল শুষতে দেরি করে না। প্রবল বৃষ্টির পরও কাদা জমে না তত। ডোমপাড়া ছাড়িয়ে ডাইনে চাঁদুবাবুর ইটভাটার পর আউস-পাটের খেত। কোথাও আখের চারা হাঁটুভর উঁচু হয়েছে। নিচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আনন্দময় জমিজমা দেখছিলেন। এদিকটা শেয়ালমারা মাঠ। এ মাঠে কিছু পৈতৃক জমি আছে আনন্দময়ের। শেয়ালমারার গরিব শেখ জমিগুলো চষে। ফসল তুলে ভাগ দিয়ে আসে।

গরিব আর তার ছেলে ইসলাম হাঁটু দুমড়ে দিনভর আউসের জমিতে আগাছা উপড়েছে। বিকেলে কাজ শেষ করে চলে গেল গাঁয়ের দিকে। ঘন বাঁশবনে ঢাকা গাঁয়ে পাখিদের চেঁচামেচি কানে ভেসে আসে। নীলচে কুয়াশা এখনও জড়িয়ে আছে দূরের বাবলাবনে। হঠাৎ আনন্দময়ের মনে হল, এই অবেলায় তাঁকে নির্জনে দেখে ইন্দ্র কোথাও ওঁত পাতে নি তো?

আসার সময় ডোমপাড়ার কাছে ইন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। ইন্দ্র তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ওখানে কী করছিল সে?

পাছে তাঁকে দেখতে পায়, আনন্দময় হন্তদন্ত হয়ে লিচুর বাগানে ঢুকে পড়েছিলেন। এখন সেই বাগানের ভেতর দিয়ে একটু ঘুরে ইটখোলার অন্য প্রান্ত দিয়ে রাস্তায় উঠবেন কি না ভাবলেন। রোদ মরে এসেছে। ফিকে, ছাইরঙা একটা ব্যাপকতা ছড়িয়ে আছে চার ধারে। আনন্দময় সতর্ক দৃষ্টি রেখে পা বাড়ালেন।

বাঁধের ডাইনে নিচে এলোপাথাড়ি আগাছার জঙ্গল আর টুকরো-টাকরা সবজিখেতের পর গঙ্গা কলকলিয়ে বইছে। বাঁদিকে আদিগন্ত মাঠ। লিচু-বাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ওপাশে ইটখোলার ধারে ঢিবির ওপর কে দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর আলোয় তার সিল্যুট মূর্তিটা স্থির। ও কি ইন্দ্র? তার হাতে নিশ্চয় সেই সাংঘাতিক ছোরাটা আছে। আশ্চর্য, ওভাবে প্রকাশ্যে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেলফেরত দাগী এক খুনী। কেউ কিছু বলছে না—ফাঁড়ির পুলিশও চুপ করে আছে। আনন্দময়ের ভীষণ রাগ হল। ওদিকে দৃষ্টি রেখে সোজা হাঁটতে থাকলেন। বাঁধটা ঘুরে গেল ডোমপাড়ার পেছনে। বাঁধ থেকে নেমে সরু একফালি রাস্তা। দুধারে নিশিন্দা গাছের সারি। প্রতিমুহূর্তে আনন্দময়ের আশংকা হচ্ছিল, হঠাৎ ইন্দ্র সামনে এসে দাঁড়াবে।

একটু পরে দেখলেন, সমান তালে পা পড়ছে না। মাতালের মতো টলছেন। ধূসরতা ঘন হচ্ছে দ্রুত। পশ্চিমের দিগন্তের মাথায় পাহাড় থেকে লাল রঙটা মুছে গেছে। একটু দাঁড়িয়ে শক্ত হবার চেষ্টা করলেন আনন্দময়। চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। নিস্পলক চোখে পেছন ফিরে ইটভাটার দিকে তাকালেন এবার। কালো প্রকাণ্ড চিমনি থেকে এখন ধোঁয়া উঠছে না। মজুর-মজুরানীদের কুঁড়েঘরের ওপর চাপ চাপ ধোঁয়া। তারপর ঢোলকের শব্দ ভেসে এল। ঢোলক বাজিয়ে গানের আসর বসছে। অনেকটা রাত অব্দি চলবে। কিছুদিন আগেও জমি দেখে ফেরার সময় দাঁড়িয়ে আনন্দময় ওদের নাচগান উপভোগ করেছেন। এখন এ এক সাংঘাতিক অবস্থা!

স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা শেষ। কয়েকটা ছেলে গোল হয়ে বসে চাপা গলায় কথা বলছে। আনন্দময় ভাবলেন, ওদের ডেকে বলবেন নাকি বাড়ি পৌঁছে দিতে। কিন্তু লজ্জাবশত ওদের ডাকতে পারলেন না।

শুভদের বাড়ি পর্যন্ত এসে মনে হল, এখন অনেকটা নিরাপদ। ওদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাইরের বারান্দায় আলো। কারা সব বসে আছে। গেলে এক কাপ চা পাওয়া যায় এবং ভীষণ ক্লান্তিটাও ঘোচে। কিন্তু এখন শিগগির বাড়ি ফেরাটাই বড় কথা।

এবড়োখেবড়ো রাস্তার ধারে অনেকটা দূরে দূরে একটা করে কাঠের খুঁটিতে বাল্ব জ্বলছে। রানীরঘাট মিউনিসিপ্যালিটি নয়, ব্লকের হাতে। সেই সুবাদে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। আলোয় হাঁটতে হাঁটতে কাছাকাছি এসে আবার পিছনে তাকালেন। দূরে আলো-আঁধারি জায়গায় কেউ আসতে আসতে যেন তাঁর মতো থমকে গেছে। আবার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। রাস্তা থেকে ভেরেন্ডাগাছে ভরা ইটপাটকেলের স্তূপে ঢাকা একটু জমি। তার কিনারা দিয়ে বাড়ি ঢোকার এক চিলতে পথ। আনন্দময় ওই পথটুকু কোনমতে পেরিয়ে দরজার কড়া প্রচণ্ড জোরে নাড়তে থাকলেন। নিরু দরজা খুলে বলল, দরজা ভেঙে ফেলছ যেন। কী হয়েছে?

আনন্দময় বারান্দায় গিয়ে ন্যাড়া তক্তাপোষটায় বসলেন। নিরু ফের বলল, কথা বলছ না কেন? কী হয়েছে?

আনন্দময় চাপা গর্জন করলেন।—কী হবে? চা নিয়ে আয়।

সুচরিতা ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, কী রে নিরু?

নিরু হাসছিল।—বাবার কাণ্ড। এমন করে কড়া নাড়ছেন যেন বাঘে তাড়া করেছে!

সুচরিতা একটু হেসে বললেন, গরিবের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে এলে নাকি? অমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

আনন্দময় স্ত্রীর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, বেরুচ্ছ নাকি?

কখন বেরোতাম। তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

ক্রূর দৃষ্টে একটু বাঁকা হেসে আনন্দময় বললেন, রোজই কি আশ্রমে কেত্তন লেগে আছে? আশ্চর্য!

আজ ভাগবত পাঠ। যাবে নাকি ?— সুচরিতাও বাঁকা হাসলেন।—যাবে তো এস। আশ্রমের দরজা সবার জন্য খোলা।

নিরু ঝটপট চা বানাতে পারে। চায়ের কাপপ্লেট পাশে রেখে বলল, বললে না তো বাবা?

কী বলব?

সুচরিতা থপ থপ করে উঠোনে নামলেন। তারপর একটু দাঁড়িয়ে চোখ বুজে কিছু আওড়ে এবং করজোড়ে প্রণাম করে বেরুলেন। পরনে চওড়া নকসিপাড় তাঁতের শাদা শাড়ি। হঠাৎ যেন বয়স কমে গেছে। আনন্দময় তাকিয়ে একবার দেখে চায়ে চুমুক দিলেন। নিরু আঙুল মুচড়ে বলল, জমি দেখতে গিয়েছিলে—তাই না বাবা?

হুঁ।

এবার যখন যাবে, আমাকে নিয়ে যাবে?

হুঁ।

হুঁ নয়, সত্যি যাব। ছেলেবেলায় যেতাম না বুঝি ?

নিরুকে নিয়ে আনন্দময় শেয়ালমারার মাঠে যেতেন। তবে সেখানেও বই-খাতা সঙ্গে নিয়ে যেতে হত। হিজলগাছের ছায়ায় বসে পড়াতেন মেয়েকে। গরিব শেখ আউসের খেতে আগাছা ওপড়াত। একবার একটা সাপ ফোঁস করে উঠেছিল তার সামনে। আনন্দময় ছড়ি দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় সাপটা মেরেছিলেন। নিরু অবাক হয়ে গিয়েছিল তার বাবার ক্ষমতা দেখে। আরও ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে।

একটু পরে আনন্দময় আস্তে বললেন, যাবি বৈকি। আমি না থাকলে তোকেই তো এসব দেখতে হবে।—

সে রাতে ভালো ঘুম হল না আনন্দময়ের। যখনই ঘুম আসে, একটা করে অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে গিয়ে পড়েন। ভোরের দিকে দেখলেন, ইন্দ্র তাঁকে ড্যাগার নিয়ে তাড়া করছে। আনন্দময় আতঙ্কে উড়তে শুরু করলেন। দিব্যি উড়তে পারছেন। একটু পরে দেখলেন, চারদিকে প্রকাণ্ড সব ইটের স্তূপ, ইটের পাহাড়। তার মধ্যে ইন্দ্র মরে পড়ে আছে। শ্বাসনালী কাটা। খুনটা আনন্দময়ই করেছেন। ইট কুড়িয়ে লাস চাপা দিচ্ছেন। প্রচণ্ড আতঙ্কে দুহাতে ইট টেনে ফেলছেন।

ঘুম ভেঙে টের পেলেন স্বপ্ন। অথচ মনে হল, সত্যই ঘটছিল। মনে সেই আতঙ্কের ছোঁয়াচ তখনও লেগে আছে। দরজা খুলে দেখলেন, সূর্য ওঠেনি। আকাশে মেঘ করেছে। পাশের ঘরে নিরু তার মায়ের কাছে শোয়। ডেকে চা করতে বলবেন ভাবলেন। কিন্তু এত ভোরে ওরা উঠবে না। মাথা ভাঙলেও না।

ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকে আনন্দময় ছড়িটি নিয়ে বেরুলেন। পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সদর দরজা ভেজিয়ে রাস্তায় গেলেন। কালকের আতঙ্কটা চলে গেছে।

ঘাটের দিকে সবে জাগরণের সূচনা। চায়ের দোকানের সামনে উনুন ধোঁয়াচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডে সার সার কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাস ছাড়বে এখনই। ঘাটের মাথায় গিয়ে নৌকোর যাত্রীর আশায় দাঁড়িয়ে আছে মধু কন্ডাক্টার। ওপারের আপ ট্রেনে কলকাতা থেকে লোক আসবে। গঙ্গা পেরিয়ে এই বাসটা ধরবে অনেকে।

ঘাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে গঙ্গার ধারে বসলেন। ছড়ি দিয়ে জলে আঁকজোক কাটতে থাকলেন আনন্দময়।

একটু পরে মুখ ধুয়ে ফেরার সময় আটচালায় নজর গেল। থমকে দাঁড়ালেন। নগ্ন মেঝেয় কাত হয়ে রাজেন শুয়ে আছে। পরনে নোংরা প্যান্ট, ছেঁড়া শার্ট, মুখে একরাশ দাড়ি। রাজেন ছেলের শোকে সত্যি পাগল হয়ে গেল তাহলে?

রাজেন হঠাৎ উঠে বসতেই আনন্দময় হন হন করে ঢাল বেয়ে উঠে গেলেন উপরে। মনোহরের চায়ের দোকানের ঝাঁপ উঠেছে ততক্ষণে। আনন্দময় বললেন, রাজেনকে দেখলাম আটচালায়।

মনোহর বলল, হ্যাঁ। কাল রাত্তিরে এসেছে। নেচে-নেচে গান গাইছিল—আবোল তাবোল কাণ্ড।

সব্বাইকে বড্ড জ্বালিয়েছে সারারাত। যতক্ষণ জেগেছিলাম, শুনি ফটাস ফটাস করে ঢিল ছুঁড়ছে বাসে। অমলবাবুর গলা পেলাম কবার। বকাবকি করছিলেন।

চা খেয়ে বেরিয়ে য়েতেই রাজেনের সামনে পড়ে গেলেন আনন্দময়।

রাজেন মাটির দিকে তাকিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গাছের মতো। ধুলোকাদামাখা নোংরা চেহারা। আনন্দময় অগত্যা আস্তে ডাকলেন, রাজেন!

রাজেন একবার তাকিয়েই মুখ নামাল। তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। মধু কণ্ডাক্টার এসে চ্যাঁচাতে লাগল, এই রাজেনদা! ঝামেলা করো না তো! সারারাত একটু ঘুমোতে দাওনি। এখন রাস্তা ছাড়ো।

রাজেন চোখ লাল করে বলল, তোর বাপের রাস্তা!

মনু ড্রাইভার হর্ন বাজাতে বাজাতে তার পিঠের কাছে বাসটা নিয়ে এল। মনু হাসছিল। কারা রাগ করে বলল, ধাক্কা মারুন না মশাই! পাগলামি ঘুচে যাবে। মারুন ধাক্কা!

মধু রাজেনকে টানতে টানতে একপাশে রেখে এল। রাজেনের গায়ে একফোঁটা জোর নেই। বাসটা বেরিয়ে গেলে রাজেন টের পেল তাকে ফাঁকি দিয়েছে। সে ইট কুড়িয়ে তাড়া করল বাসটাকে। পেট্রল পাম্পের কাছে বাঁকের মুখে বাস আর রাজেন অদৃশ্য হলে আনন্দময় বাড়ির রাস্তা ধরলেন।

ঘাটের আড্ডায় আসাটাও এবার যেন বন্ধ হয়ে যাবে। পাগলকে বিশ্বাস নেই। ইট ছুঁড়ে বসলেই হল। আনন্দময় টের পেলেন, সত্যি তাঁকে কোণঠাসা হয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এবার।.....

শুভ ওপারে শহরে যাবে বলে বেরিয়েছিল। পেট্রলপাম্পের কাছে এলে শশাংক তাকে ডাকছে শুনল।—পুটু! কোথায় চললে সেজেগুজে? শোনো, শোনো।

শুভ দাঁড়াল। একটু হেসে বলল, কী রে শশাংক? এত পালোয়ান হয়ে যাচ্ছিস যে! খাচ্ছিস কী?

শশাংক পাম্প দেখিয়ে বলল, পেট্রল। তারপর হা হা করে হাসতে লাগল।

কাচের ঘরের দরজায় কুমু দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। শুভকে দেখতে পেয়ে কাছে এল।—তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার ছিল, পুটু। আজই যোগাযোগ করব ভাবছিলাম। ব্যস্ততা নেই তো?

শুভ পাঞ্জাবির হাত সরিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, তত কিছু নেই ওপারে যাব।

ভেতরে এস না!—কুমু শশাংকের দিকে ঘুরে বলল, এই ভোঁদড়! তুইও আয়।

কুমুর বাবা পরেশ বাবুকে দেখতে পেল না শুভ। তিনি থাকলে কুমুর হাবভাব এমন স্মার্ট থাকে না। আজকাল কুমু পাম্পে এসে বাবাকে সঙ্গ দিচ্ছে। পাশে একটা গ্যারেজ করেছে। কয়েকটা ট্রাক আর বাস দাঁড়িয়ে আছে। মিস্তিরিরা কালিঝুলি মেখে কাজে লেগেছে। নানারকম শব্দে কানে তালা ধরে যায়।

শুভ বসে বলল, বলো কুমু!

কুমু চাবির একটা রিং আঙুলে নাচাতে নাচাতে বলল, মাইরি, ইনা বড্ড গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। কী ছেলে বলো তো? দিব্যি ভালয়-ভালয় ফিরে এলি, ভদ্রলোকের মতো থাকবি। তা নয়, খালি—

শশাংকর ওর কথার ওপর বলল, কদিন আগে ঘাটে দাঁড়িয়ে আছি। কুমুও আছে। হঠাৎ ইনা এসে বলে কী, তোরা আমার নামে পিটিশান সই করে বেড়াচ্ছিস! কে কী লাগায় মাইরি!

কুমু বলল, থাম তো তুই। বুঝলি পুটু? ইনাকে একটু কেয়ারফুলি ট্যাকল করা দরকার। তোকে তো ও ভীষণ মানে-টানে। তুই প্লিজ ওকে বুঝিয়ে বল, ওর পেছনে কেউ লাগে নি। লাগবেও না। যা হবার হয়ে গেছে। আর কেন? বরং ইনা যদি কিছু কাজকম্ম করতে চায়, আমি ওকে হেল্প করতে রাজি। আমাদের একটা নতুন বাস আসছে। ওপারে একটা রুটে লাইসেন্স পেয়ে গেছি। ইনাকে বল, ওই রুটের ব্যাপারে অল রেসপন্সিবিলিটি ওকে ছেড়ে দেব। ভাল মাইনেকড়িও পাবে ইনা।

শশাংক বলল, অ্যান আইডল ব্রেন ইজ দি ডেভিলস ওয়ার্কশপ!

শুভ বলল, ভেরি গুড প্রপোজাল কুমু। নিশ্চয় বলব। তবে—

কুমু বলল, তবে কি?

ইনাকে তো জানিস!—শুভ হাসল।—বরাবর দেখেছি, ওর একটা নিজস্ব লাইফ-স্টাইল আছে।

শশাংক মুখ বাঁকা করে বলল, পুটু! লাইফ স্টাইল সবারই আছে। হরিশংকরদা না থাকলে ইনার লাইফস্টাইলটা কী দাঁড়াত বল্? হুঁঃ, লাইফস্টাইল!

শুভ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সেটা ঠিকই। হরিশংকরদা না থাকলে ওকে নিশ্চয় পেটের ধান্দায় একটা কিছু করতে হত। তবে সেটা হয়তো সাংঘাতিক কিছু হত। মানে ডাকাতি-টাকাতি করত আর কী!

কুমু হাত নেড়ে বলল, না না। এ তুই কী বলছিস শুভ? ইনাকে আমি তোর চেয়ে হয়তো ভালই জানি। হতে পারে ইনা তোর জ্যাঠতুতো ভাই। কিন্তু আমি সেই এতটুকু বয়স থেকে ওর সঙ্গে মিশেছি। ইনার মধ্যে গুড এলিমেন্ট প্রচণ্ড আছে। আসলে একটু মিসগাইডেড ছেলে হলে যা হয়।

শশাংক ফুট কাটল।—তাই বুজম ফ্রেন্ডকে স্ট্যাব করতে হাত কাঁপেনি। কুমু, শুভ নিজের জ্যাঠতুতো ভাইটিকে ভালই চেনে। এই যে সব সময় হাতে ড্যাগার নিয়ে ঘুরছে, শুভই হলফ করে বলুক, ওর গা ছমছম করে কি না।

সে শুভর দিকে তাকাল। শুভ বলল, ঠিকই বলেছিস শশাংক! ওকে আমি চিরদিন ভয় পাই।

কুমু বলল, ইনার আসলে ক্ষোভ হয়েছে। কিসের ক্ষোভ বলব? ওকে আমরা কেউ বাঁচাবার চেষ্টা করিনি! উল্টে ওর যাতে সাজা হয়, তারই চেষ্টা করেছি।

শশাংক খাপ্পা হয়ে বলল, বাঃ! কী বলছিস কুমু? স্নেহাকরকে মার্ডার করবে, আর আমরা ওকে ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করব। এটা বিবেকের প্রশ্ন। শুভ যাই ভাবুক, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন না এটা?

শুভ বলল, শশাংক, আমি অন্যায়ের সাপোর্টার নই। কিন্তু ইন্দ্র খুন করেনি।

করেনি?—শশাংক ট্যারা চোখে তাকিয়ে রইল শুভর দিকে!

না। আমি দেখেছি ইনা স্নেহাকরকে জড়িয়ে ধরে বসে ছিল। মুকুল আর কারা যেন স্নেহাকরের পেটে রুমাল বেঁধে দিচ্ছিল।

শশাংক অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। কুমু বলল, ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ইনাই করুক, আর যেই করুক স্নেহাকর ইজ ডেড।

শশাংক রাগিচোখে তাকিয়ে বলল, কী বলছিস মাইরি? স্নেহাকরকে আর কে স্ট্যাব করবে। তার সঙ্গে কার শত্রুতা ছিল? অত ভাল ছেলে—কারুর সাতে-পাঁচে থাকত না। আমাদের কয়েকজন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশত না। তাকে ভূতে খুন করল?

কুমু থাপ্পড় তুলে বলল, শাট আপ! রামভোঁদড় আর কাকে বলে? যত বলছি, ও সব বাজে কথা চাপা থাক, তত খুঁড়ে বের করছে। শুভ, তুই ইনাকে বল, যা হবার হয়েছে, লেট আস স্টার্ট ক্লিন। ডোমকল রুটে ওর মতো সাহসী আর ডানপিটে কাউকে আমাদের দরকার। বাবার এতে আপত্তি নেই। কথা বলে নিয়েছি।

শুভ বলল, বলব।

সে উঠলে কুমু বলল, তুই বলে দ্যাখ, কী বলে। তারপর না হয় আমার সঙ্গে মিট করিয়ে দে। তুইও থাকবি। এ মাথা গরম ভোঁদড়টা থাকলে গণ্ডগোল বাধাবে।

শশাংক রাগ করে চলে গেল। কুমু গ্রাহ্য করল না। বাস স্ট্যান্ডের কাছে এসে কুমু ফের বলল, ইনা আমার উপর ভীষণ চটে আছে। আসার দিনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কথা বলতে গেলাম, টন্টিং টোনে বলল, 'ফাঁসির পরও বেঁচে থাকে মানুষ। ভূত হয়েও বেঁচে থাকে' আরো কী সব আবোল-তাবোল বলতে লাগল। আমার খারাপ লাগল। কোনো কথা না বলে সরে এলাম।

শুভ সিগারেট ধরিয়ে বলল, মুশকিল হয়েছে কী জানিস? তুই তো সাক্ষী দিয়েছিলি মামলায়।

দিয়েছিলাম। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে তো একটা কথাও বলিনি। বলেছিলাম, অন্ধকারে কে স্ট্যাব করেছে দেখিনি। তবে লোকেরা বলছিল, ইনা.....

কথা কেড়ে শুভ বলল, সেটাই ওর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। আচ্ছা, চলি রে!

কুমু আবার মনে করিয়ে দিল ইন্দ্রকে কী বলতে হবে। শুভ হনহন করে হেঁটে ঘাটের দিকে গেল। সে বুঝতে পারছিল, কুমু খুব ভয় পেয়েছে ইন্দ্রের হাবভাব দেখে। মিটমাট করতে চায়। আসলে ইন্দ্রকে গঙ্গার ওপারে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ হতে চায়।

কিন্তু কেন কুমুর এত ভয়? স্নেহাকরকে কি কুমুই খুন করেছিল?

নৌকোর ভিড়ের ভেতর বসেও শুভ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকল। কুমু একটা সৌখিন প্রকৃতির ছেলে। ফিল্মের হিরোর মত চেহারা। লুকিয়ে একটু আধটু মদ খায় কোনো উপলক্ষে। মনে পড়েছে, সেই গঙ্গাপুজোর দিন কুমুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঘাটে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছিল। শুভকে দেখে জড়িয়ে ধরেছিল। শুভ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেলার ভিড়ে ঢুকে যায়। তখনও বৃষ্টিটা শুরু হয়নি। হাল্কা রোদ্দুর ছিল।

হয়তো মানুষ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে কিছু বলা যায় না তার আচরণ দেখে। বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের চেহারার তো কোনো মিল নেই মানুষের। অনেক সময় মানুষের নিজের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়, সে আসলে কী। হঠাৎ কোনো এক, মুহূর্তে আসল চেহারা বেরিয়ে আসে বাইরে। নিজেই অবাক হয়ে যায় নিজেকে জেনে।

ইন্দ্র বলছিল, আনুমাস্টারের মেয়ে নিরুর সঙ্গে কুমুরও নাকি সম্পর্ক ছিল একসময়। মেয়েটা কী! কেন অমন স্বভাব নিরুর? বাবার ওপর শোধ নিতেই কি?

অথবা কোনো-কোনো মেয়ে এমন হয়। নিজেও জানে না নিজের আচরণের অর্থ। এ যেন অজান্তে মানুষের সমাজের খুব কাছ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক স্বাধীনতার চোরা স্রোতের টান। যাকে টেনে নেয়, তার আর উদ্ধার নেই। নিরু কি সেই চোরা স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে বহুদিন থেকে?

তা না হলে সেদিন বৃষ্টির মধ্যে নির্লজ্জের মতো ইন্দ্রের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছিল—বাড়িতে তখন শ্যামলীদি ছিল, এই বেপরোয়া আচরণের মানে কি? নিরু ইন্দ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।

যেমন করে সে হয়তো স্নেহাকরকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল।

শুভ শিউরে উঠল। মনে হল, ইন্দ্র বিপন্ন। তাকে সাবধান করা উচিত। কুমুর প্রস্তাবটা এমন সময়ে মেঘ না চাইতে জলের মতো অভাবিত ভাল। ইন্দ্র পালিয়ে যাক্।

শম্ভু মাঝি ডাকল, পুটুদা! ও পুটুদা! পারে নামবেন, নাকি নৌকো চাপার সখ হয়েছে?

শুভ দেখল, সে নৌকো থেকে নামেনি। নৌকো ওপারে ভিড়ে রয়েছে। দুজন যাত্রী এসে নৌকোয় পা দিল। একটু হেসে শুভ লাফ দিয়ে নেমে গেল ঘাটের পাটাতনে। সামনে গলিরাস্তায় সার সার সাইকেল রিকশ দাঁড়িয়ে আছে।

ডোমপাড়ার ঘাটের পাশে সবুজ ঘাসের চটানে সুরিন ড্রাইভারের মেয়ে কমিলাবতী একটা দড়ি নিয়ে 'স্কিপিং' খেলছিল। স্কুলের মেয়েদের দেখে শেখা। তার ছোটমা ঘাটে নামতে গিয়ে বকে গেছে—সরম নাহিক গে ছোকড়ি? কমিলার সরম নেই। পনের-ষোল বছর বয়সে এখনও আইবুড়ি হয়ে আছে। সুরিন ড্রাইভারি করে বাবুর চালে চলে। স্কুলে পাঠিয়েছিল মেয়েকে। যেদিন মেরে ধরে পাঠায়, সেদিনই একটু পরে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে আসে। একদিন আর বাড়িই ফেরেনি। শ্মশানের জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। রামভকত লণ্ঠন নিয়ে অনেক রাতে নাতনিকে বের করে আনে। সিধু দেখেছিল ভাগ্যিস।

সুরিনের পরবর্তী ইচ্ছে, বুদ্ধিসুদ্ধি পাকলে 'বিভা' দেবে। সুতরাং কমিলাকে বহুড়ী সেজে ঘোমটা টেনে কারুর সংসারে এখনও ছেলেপুলের মা হতে হয়নি। এ বয়সে তাদের ঘরের মেয়েদের অন্তত গোটা দুয়েক বাচ্চা হওয়ার ট্রাডিশান। সুরিন ট্রাডিশান ভাঙছে।

বিকেলের গঙ্গায় চাপ চাপ নীল মেঘের ছায়া টলমল করছে। পশিমে সূর্যের থমথমে চেহারা এবং রোদে ঘোর লেগেছে। ডোমপাড়া সারাদিন খাঁ খাঁ করে এতক্ষণে গতর খাটিয়ে মেয়েমরদরা দু-একজন করে ফিরে আসছে। কমিলা তাদের চোখের কাঁটা হয়ে খেলছে।

স্কুলের দিক থেকে কুমু আসছিল। কাছাকাছি আসার পর বাঁদিকে হঠাৎ ঘুরে দেখল, একটু দূরে আশ্রমের বেড়ার কাছে ইন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে। অমনি সে থমকে দাঁড়াল। তারপর যেদিক থেকে আসছিল, সেদিকে চলে গেল।

কমিলা খেলা থামিয়ে ব্যাপারটা দেখে একটু হাসল। তার বাবা বলেছে, ইনাবাবু কুমুবাবুর জান খতম করে দেবে। সেজন্যেই ইনাবাবু হরঘড়ি হাতে ছোরা নিয়ে ঘুরছে।

একটু পরে ইন্দ্র এদিকে আসতে থাকল। তখন কমিলা ফের খেলায় মন দিল। মুখে হাসিটা লেগে আছে তার। ইন্দ্র গঙ্গার বুকের কাছে আকন্দ ঝোপের কাছে বসে বড়ল। তারপর সেই ছোরাটা দিয়ে ঘাসে আঁচড় কাটতে থাকল।

খেলতে খেলতে ইন্দ্রের কাছে এগিয়ে কমিলা খিলখিল করে উঠল। ইন্দ্র বলল, কী রে? হাসছিস কেন?

কমিলা দূরে স্কুলের দিকে হাত তুলে বলল, কুমুবাবু ভাগ গেল।

কে? কুমু?

হাঁ। আসতে আসতে তুমাকে দেখল। দেখ্‌কে ভাগ গেল তুরন্ত!

আমাকে দেখে ভাগবে কেন? কী বলছিস যা তা?

হামি সব জানে, হাঁ।

কী জানিস?

তুমি ওকে চাক্কু মারবে।

ইন্দ্র একটু হেসে বলল, তোকেও মারব। ভাগ্‌ এখান থেকে।

কমিলা বুক চিতিয়ে বলল, হুঁ, মার দো। মারো!

কুমু এখানে কেন আসে রে?

হামি জানে না কুছু।

রোজ আসে?

নাহিক্‌ কৈ কৈ রোজ আসে।

তোর বাবা ফিরেছে?

নাহিক্‌!

তুই এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে খেলে বেড়াচ্ছিস, লজ্জা করে না? ভাগ।

কমিলা আবার খেলতে শুরু করল। ইন্দ্র গঙ্গার পাড়ে ঢালের শেষে বসে আছে, কমিলা ওপরদিকে খেলছে। সূর্যের গায়ে কমিলার সিল্যুট চেহারা আর ওঠা নামা, একটা দড়ি, দড়িটা ওপরে-নিচে এবং কমিলাও ওপরে-নিচে পর্যায়ক্রমে—ইন্দ্র দেখতে থাকল। তারপর ড্যাগারটার ফলা বুজিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ইন্দ্র লাফিয়ে উঠল।—কমিলা! এবাব আমি একটু খেলি। বলে সে ওর হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে স্কিপিং খেলতে শুরু করল। কমিলা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্র থামল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেলা পড়ে গেছে। ধূসরতা ঘন হয়ে ঘিরেছে চারদিকে। বসতির দেয়াল ঘেঁষে ডোমপাড়ার লোকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখছিল এতক্ষণ। খেলা থামলে তারা যে-যার বাড়ি গিয়ে ঢুকল। ইন্দ্র কমিলাকে খুঁজছিল দড়িটা ফেরত দেবে বলে, কিন্তু কেটে পড়েছে সুরিনের মেয়ে।

দড়িটা ইন্দ্র ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গার ঢালু পাড় বেয়ে আশ্রমের দিকে চলল আবার। শরীরে প্রচণ্ড ক্লান্তি। কেন হঠাৎ কমিলার মতো দড়ি ডিঙোনোর খেলা খেলতে ছুটে গেল সে? আবাক লাগছিল নিজেকে। লোকগুলোও নিশ্চয় তার কাণ্ড দেখে খুব হাসাহাসি করেছে।

আশ্রমে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু হল। তারপর টিপটিপ করে বৃষ্টি। আশ্রমের গেটের মাথায় একটুখানি খড়ের চাল আছে। তার ওপর বুগানভিলিয়ার বিশাল ঝাঁপি। তলায় দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাতে গেলো। আশ্রমের ভেতর একটা সুন্দর আটচালা, তার ওপাশে ছোট্ট মন্দির। আটচালায় ভক্তদের ভিড় আছে। মাথার ওপর উজ্জ্বল বাল্ব জ্বলছে। ইন্দ্র ভেতরে যাবে কি না ভাবছিল।

বৃষ্টিটা সমান তালে টিপটিপিয়ে পড়ছে। দ্রুত আকাশ কালো হয়ে গেছে। তাই সন্ধ্যা হতে না হতেই এত অন্ধকার। ইন্দ্রর বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হল। সে মাথায় রুমালচাপা দিয়ে হন হন করে চলতে থাকল। আশ্রমের পশ্চিম ঘুরে পোড়া জমি আর আমবাগান, তারপর টানা আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে সিধে হেঁটে যাচ্ছিল ইন্দ্র। সামনে বাঁয়ে শুভদের বাড়ি পড়বে। ডাইনে ঘুরে ফের গঙ্গার পাড়ে গেলে সামনে ঝুরিওয়ালা বটগাছ—তারপর তাদের বাড়ির খিড়কির দরজা।

শুভদের বাড়ির আলো এতদূরে পৌঁছায়নি। গাছপালার দঙ্গল সামনে। হঠাৎ ইন্দ্রের ভীষণ ভয় করতে থাকল। কিসের ভয়, ঠিক বুঝতে পারছিল না সে। ভূত, অথবা মানুষের ভয়, কিংবা বৃষ্টিপড়া অন্ধকার আগাছার বনে কী একটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ভেবে তার বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকল। পা টিপে টিপে এবং চারপাশে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সে যখন বটতলায় পৌঁছুল, তখন কোথাও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ হল। ইন্দ্র বলল, কে ?

এবার মচমচ শব্দটা আরও কাছে। ইন্দ্র অন্ধকারে শেকড়বাকড় আর ঝুরির সঙ্গে টোক্কর খেতে খেতে খিড়কির দরজায় গিয়ে জোরে ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে শ্যামলীর গলা শোনা গেল, ইনা নাকি ?

ইন্দ্র বলল, দিদি, একটা আলো নিয়ে আয়! শিগগির!

ঠিক সেই সময় ইন্দ্রের কানের পাশ দিয়ে কী একটা জিনিস প্রচণ্ড জোরে চৌকাঠে গিয়ে পড়ল। ইন্দ্র ছিটকে সরে দাঁড়াল। তারপরই শ্যামলী দরজা খুলে বলল, পোকামাকড় নাকি রে ? তার হাতে টর্চ আছে। কিন্তু আলো তত জোরালো নয়।

ইন্দ্র টর্চটা কেড়ে নিয়ে চারদিকে আলো ফেলল। ঝুরিগুলোর ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে দরজার ওপর আলো ফেলে দেখল, একটা ইটের আধলা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে। চৌকাঠে ইটের ছাপ লেগে আছে।

ইন্দ্র ড্যাগারটা বের করে এগিয়ে গেল। শ্যামলী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল কী হয়েছে ইনা? কোথায় যাচ্ছিস অমন করে?

বটতলায় কোথাও একটুকরো ইট পড়ে নেই। তাহলে নিশ্চয় কেউ ইট হাতে নিয়ে তাকে অনুসরণ করছিল এতক্ষণ। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে বলেই ইটটা ছোঁড়েনি। দরজায় ধাক্কা দেওয়ার সময় ছুঁড়েছে। ইটটা মাথার পেছনে লাগলে ইন্দ্র নির্ঘাত মারা পড়ত।

ইন্দ্র চাপা গর্জন করছিল, সাহস থাকলে সামনে আয়! লুকিয়ে আছিস কেন?

সে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করলে শ্যামলী ভাঙা গলায় বলল, বলবি তো কী হয়েছে? ও ইনা! চুপ করে আছিস কেন?

বারান্দায় উঠে ইন্দ্র বলল, কোন শালা ইট ছুঁড়ল!

শ্যামলী আঁতকে উঠে বলল, তাই অমন ফটাস করে শব্দ হল। আমি ভাবলাম তুই দরজা ভেঙে ফেলেছিস।

এক সেকেন্ড অগে খুললে ইটটা তোকেই লাগত। .... বলে ইন্দ্র তার ঘরে ঢুকল। শ্যামলী দরজার কাছে এসে ভয়ার্ত স্বরে বলল, আমার মনে হচ্ছে, রাতবিরেতে বাড়িতে ওরা হামলা করবে। শুভকে ডাকব? ও ফাঁড়িতে গিয়ে খবর দিক।

ইন্দ্র সিগারেট খুঁজছিল বালিশের নিচে। প্যাকেটটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে বিরক্তভাবে বলল, কারা হামলা করবে ভাবছিস?

ওই যারা তোকে ইট ছুঁড়ে মারল।

ইন্দ্র হাসল বাঁকা ঠোঁটে।—ধুস! এটা মনে হচ্ছে রাজেন কাকার কাণ্ড। প্রথমে ততটা বুঝতে পারি নি। এখন মনে পড়ল। কাল আমাকে ঘাটে দেখে ইট তুলেছিলেন। আমি ড্যাগার দেখাতেই দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

শ্যামলী শুনেছে, স্নেহাকরের বাবা পাগল হয়ে গেছে। কিছুদিন থেকে ঘাটে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিশংকরকেও ইট নিয়ে তাড়া করেছিল সেদিন। হরিশংকর ওঁর ভয়ে ঘুরপথে ডিসপেন্সারিতে যায়।

পাগলকে বিশ্বাস নেই।

শ্যামলী বলল, ওঁকে কেউ পাগলা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে না কেন বল তো? ব্রজবাবুদের বাসেই তো চাকরি করতেন। ব্রজবাবুর সে ব্যবস্থা করা উচিত।

ইন্দ্র বলল, আর আমিও যেন কেমন হয়ে গেছিরে দিদি! মধুবাবুদের আমবাগানে এসে হঠাৎ কেমন ভয় করছিল। তারপর বটতলায় আসতেই মচমচ শব্দ। শেষে আধলা ইট পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য, রাজেন কাকার কথাটা একেবারেই মনে আসেনি। খালি মনে হচ্ছিল, কুমু কিংবা তার কোনো পোষা নেড়িকুত্তার কাণ্ড।

কুমু মোটেই না।—শ্যামলী মাথা দোলাল।—কুমু তো তোর সঙ্গে মিটমাট করতে চাইছে! চাকরি দিতে চাইছে। তুই ঠিক ধরেছিস, রাজেনবাবুই বটে।

একটু চা খাওয়াবি দিদি? —ইন্দ্র ভেজা শার্ট খুলতে খুলতে বলল। বৃষ্টিটা বেশ জমেছে এবার। উঠোনের মাথায় গাছের ডালপালার ভেতর জোনাকিগুলো কোথায় লুকিয়ে গেছে। ইন্দ্র পেছনের জানলা খুলতে গিয়ে সাহস পেল না। আবার যদি ইট ছোঁড়েন রাজেন কাকা!

কিছুক্ষণ পরে চা এনে শ্যামলী গুছিয়ে বসল তক্তাপোষের বিছানায়। বলল, শুভকে বলব বলেছিলি, বলেছিস?

কী রে?

আবার কী? কুমু যা বলেছে!

ইন্দ্র মুখ নামিয়ে বলল, ধুস! আসলে তো বাসকন্ডাক্টারি। ও আমার পোষাবে না। তাছাড়া কুমু শালার চাকর হবার জন্য আমার জন্ম হয়নি।

বলে সে মুখ তুলে হাসতে লাগল। .... জানিস দিদি, আজ কুমুর কাণ্ড? বিকেলে ডোমপাড়ায় আসছিল। আমাকে দেখে ব্যাটা দূর থেকে লেজ তুলে পালিয়ে গেল! ওর নোকর হব আমি? তোর মাথা খারাপ দিদি?....

শুভর দাদামশাই চলে গেছেন। অনিমাও গেছে। বাড়ি এখন ফাঁকা বললেই চলে। নীলি সারাদিন কলেজে। শুভর মা বিভাবতী রুগ্‌ণ মানুষ। বেশির ভাগ সময় ঘরে শুয়ে থাকেন। যখন ওঠেন, তখন কারণে-অকারণে একটু আধটু চেঁচামেচি করে বেড়ান। সেটা লক্ষ্মী ঝিকে কেন্দ্র করেই।

আবার রত্নার চিঠি এসেছে। রত্না কলকাতা ফিরেছে হিমালয় থেকে। হিমালয়ে এখন প্রবল বর্ষা নেমেছে। নীলিকে লিখেছে অন্ততঃ দুচারদিনের জন্য কলকাতা যেতে। বিভাবতী কড়া মুখে বলেছেন, না। লিখে দে, পরীক্ষা চলছে।

বিভাবতী জানেন, বউমা তাঁর ছেলেকে চিঠি লেখেনি একটাও। যাবার সময় তেমন কিছু ঝগড়াঝাঁটিও তো হয়নি। কলকাতার মেয়ে সম্পর্কে বিভাবতীর ধারণা ভাল ছিল না। এখন তো আরো খারাপ। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কষ্ট হয়। মনে হয়, শুভ ভেতরে-ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। কত চঞ্চল হাসিখুশি তেজী প্রকৃতির ছেলে ছিল শুভ। এখন চুপচাপ বসে থাকে। ছবি সে ছেলেবেলা থেকে আঁকে। কিন্তু এখন যেন নিজেই ছবি হয়ে যাচ্ছে। কদাচিৎ বাইরে বেরোয়। সারাক্ষণ ঘরের ভেতর হাতে তুলি নিয়ে কি ভাবে। কখনও রোদের দিনে লনে কদমতলায় ইজেল নিয়ে যায়। বিভাবতী জানেন, ক্যানভাসে আঁচড় পড়ে সামান্যই।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, শুভ সংসারের ভবিষ্যৎ একেবারেই ভাবছে না। শক্তিব্রতের সঞ্চয় দিনে দিনে শেষ হয়ে আসছে। শুভ কি টের পায় না এটা? মধ্যে দুটো বছর কলকাতায় চাকরি করত বটে, পয়সাকড়ি নিয়মিত কিছুই পাঠাত না। মাঝে মাঝে বাড়ি এলে তখন দু-একশো টাকা এবং কিছু কাপড়-চোপড় মা বোনের জন্য। বিভাবতী কিছুদিন থেকে ভাবছিলেন, সংসারের ব্যাপারটা তুলবেন ছেলের কাছে। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে যান। নীলিকে কলকাতায় রেখে এম. এ. পড়ানোর কথা শুভ কোন মুখে বলে? তারপর তো নীলির বিয়ের প্রশ্নও আছে। শক্তিব্রত বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েই ফতুর হয়েছিলেন।

রাতে খাওয়ার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে, বিভাবতী সংসারের গল্পটা শুরু করবেন ভাবছিলেন তখন। হঠাৎ শুভ হাসতে হাসতে বলল, নীলি! মা! সাবধান। রাজেন কন্ডাক্টার নাকি রাত্রে বাড়ি বাড়ি ঢিল ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে। জানলা খুলে বেখো না কেউ।

বিভাবতী রাগ করে শুতে গেলেন। নীলি বলল, সত্যি রে দাদা। ঘাটে ওর হাতে ইট দেখেছি, জানিস?

শুভ বলল, ইনাকে সেদিন রাতে চুপি চুপি নাকি ফলো করেছিল। তারপর দড়াম করে থান ইট!

বলিস কি!—নীলি চোখ বড় করে বলল। —ইনাদা নিশ্চয় ড্যাগার নিয়ে তাড়া করেছিল?

অন্ধকারে দেখতে পেলে তো!—শুভ ফের হাসতে লাগল। —আজকাল স্নেহাকরের বাবা রানীরঘাটে সেন্সেশান এনেছে। ইট খাবার ভয়ে সবাই তটস্থ।....

নিজের ঘরে ঢুকে বিভাবতী কিন্তু সত্যি পিছন দিকের জানালা বন্ধ করেছেন ততক্ষণে। একটু পরে ডাকলেন, নীলি! ও নীলি! শুনে যা।

নীলিমা জমিয়ে গল্প শুনছিল কলকাতার এক পাগলের! বিরক্ত হয়ে উঠে গেল মায়ের ঘরে। শুভ তাকে মনে করিয়ে দিল, জানলা বন্ধ করে রাখিস যেন।

নীলি বলল, কী?

বিভাবতী চটে গেলেন।—কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত আছিস বাতবিরেতে যে—কী? কথা শোনো মেয়ের।

নীলি একটু হেসে বসল মায়ের বিছানায়। বলল, আস্তে! রাজেন পাগলা ইট ছুঁড়বে।

ছিঃ!—বিভাবতী ভর্ৎসনার সুরে বললেন।—অমন অশ্রদ্ধা করে কথা বলছিস কেন? খুব যে লেখাপড়া শিখেছিস! না হয় বাস কন্ডাক্টারি করতেন ভদ্রলোক! মানুষ তো কম কষ্টে পাগল হয় না!

নীলি বলল, আচ্ছা বাবা আচ্ছা! হয়েছে! বেশি কথা বললে নাকি তোমার বুক ধড়ফড় করে?

বিভাবতী একটু চুপ করে থাকার পর চাপা গলায় বললেন, শুভ আমার কথায় তো কোনদিন কান করে না। আমাকে বলেও না খুলে কিছু। ও কি ফেব কলকাতা যাব-টাব বলছে শুনেছিস?

না তো! কেন?—বলেই নীলি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে চোখে হাসল।—বউদির ব্যাপারে বলছো তো?

বিভাবতী আবার চটলেন।....যা বললাম তার জবাব নেই—কোন কথা এনে ফেলল!

নীলি হতাশ ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে বাবা। বলছি। দাদা কলকাতা যাবে না। নাও, হল তো?

সে না যাক্।—বিভাবতী অন্যমনস্ক ভাবে বললেন। যেতেও আমি বলছি না। কিন্তু এমন করে দিন কাটালে কি চলবে ওর? নিজের ভবিষ্যৎ আছে। আমার যা অবস্থা, কখন আছি কখন নেই—তারপর কী হবে?

কী হওয়া উচিত?

তুই বড্ড চালিয়াত হয়েছিস নীল! ওপারের মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশেই এইসব শিখেছিস!—বিভাবতী দুঃখিত ভাবে বললেন।—তোর বয়সে আমরা এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতে শিখিনি। কলেজে না হয় পড়িনি—কিন্তু আমার বাবার বাড়ি কেষ্টনগর। মনে রাখিস!

নীলি হাসতে লাগল।....কেষ্টনগর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়! এর মানে কী মা?

বিভাবতী খাপ্পা হয়ে বললেন, লজ্জা করে না হাসতে? আর কিছুদিন পরে যখন বাপের এই অট্টালিকা বেচে খেতে হবে, কলেজের মাইনে দিতে হবে, তখন হাসি বেরিয়ে যাবে!

শুভ ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মায়ের তখন অমন করে তার ঘরে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে টের পেয়েছিল একটা গুরুতর কিছু বলতে চান বিভাবতী। কিছুদিন থেকে মায়ের এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে শুভ। কিছু বলতে গিয়ে যেন পারেন না। কিন্তু শুভ তো সবই বোঝে।

মায়ের ঘরে সটান ঢুকে বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তেমন কিছু ঘটার আশংকা নেই।

বিভাবতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘোরালেন।

শুভ হাসছিল। ফের বলল, কেন ওসব তুমি ভাবো আমার মাথায় আসে না! আমি কী ইনার মত লক্ষ্যহীন বাউন্ডুলে? কী ভাবো তুমি আমাকে?

নীলি একবার দাদার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শুভ বলে উঠল, ঢিল খাবি, সাবধান কিন্তু!— অমনি নীলি দৌড়ে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল!

বিভাবতী তাকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, ধিঙ্গি মেয়ের ঢঙ দেখ না! শোগে যা। রাত হয়েছে।

নীলি বলল, তোমার কাছে শোব। তারপর সে উঁচু বিশাল খাটে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যপ্রান্তে চলে গেল। সত্যি শুয়ে পড়ল। দুষ্টুমি করে নাক ডাকার শব্দ তুলল।

বিভাবতী দরজায় উঁকি মেরে লক্ষ্মীর উদ্দেশে বললেন, লক্ষ্মী! দরজা আটকে শুয়ে পড়। নীল আমার কাছে থাকছে।

লক্ষ্মীর তিনকুলে কেউ নেই। বিধবা মেয়ে। নীলির ঘরের মেঝেয় সে শুয়ে থাকে। সে দরজা বন্ধ করা পর্যন্ত বিভাবতী উঁকি মেরে রইলেন।

শুভ বলল, আমি ওপারে একটা ঘর পেয়ে গেছি। ভাড়া তেমন বেশি কিছু না।—ম্যানেজ করা যাবে। সাইনবোর্ডের স্টুডিও করব। ফেস্টুন টেস্টুনেরও কাজ পাওয়া যাবে প্রচুর। পরে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেওয়া যাবে অবস্থা বুঝে। অতএব তোমার ভাবনা-চিন্তা নিষ্ফল।

বলে সে জোকারের ভঙ্গিতে দরজার কাছে এল।.. আজ তোমার নিশ্চয় সাউন্ড স্লিপ হবে!

বিভাবতী গুম হয়ে বললেন, সাইনবোর্ড আঁকবি? এইজন্যে এত লেখাপড়া শিখেছিলি?

কেন? এটাকে ছোট কাজ ভাবাব কারণ কী? কাজটা তো আর্টিস্টের। কলকাতার বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে গোলামী করতাম। এখন স্বাধীন ভাবে একই ধরনের কাজ করব।

শুভ চলে গেলেও বিভাবতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিটা সমানতালে ঝরছে। বাল্বে পোকা থিক থিক করছে। নীলি ঘুম ঘুম স্বরে ডাকল, মা! শুয়ে পড়ো আলো নিভিয়ে। বড্ড পোকা।

মশারী টেনে দিয়ে বড়ো আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বাললেন বিভাবতী। বাইরের আলোটা সারা রাত জ্বলবে। দরজা আটকে আস্তে বললেন, নীল, ঘুমোলি?

না। কেন?

বউমার চিঠিটা আরেকবার পড়ে শোনাবি?

না। ঘুম পাচ্ছে।

বিভাবতী অনেকক্ষণ পরে ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে শুতে গেলেন। টের পেলেন, নীলি ঘুমোয়নি। মাকে জড়িয়ে গালে গাল রেখে ফিসফিস করে বলল, জানো মা? দাদার স্কেচের খাতার ভেতর একটা চিঠি ছিল। ইনকমপ্লিট চিঠি। বউদিকে কবে লিখতে লিখতে আর লেখেনি। চিঠিটা আমি চুপি চুপি বউদির নামে পোস্ট করে দিয়েছি। দাদা এখনও টের পায়নি। শোনো মা, দাদা যখন টের পাবে, আমার অবস্থা শোচনীয় হবে। বুঝতে পারছ তো? তখন কিন্তু আমি তোমার কোলের ভেতর ঢুকে পড়ব।

বিভাবতী শুধু বললেন, ঠিক করিসনি।. .

হরিশংকর সকাল সাতটা নাগাদ ঘাটে গিয়ে বাজার করে আনে। গাঁ-গেরাম থেকে বাসে চেপে যে সব মেছুনী ঘাটে পৌঁছয় এবং গঙ্গা পেরিয়ে শহরে যায় মাছ বেচতে, তাদের প্রচণ্ড গরজ। চৌবেজী বললেও তারা মাছের ঝুড়ির ডালা খুলতে রাজি না। কিন্তু চৌবেজী তো মাছই খান না। এদিকে হরিশংকর ডাক্তারখানার লোক হলেও তার খাতির করে না। তবে ফেরার সময় তাদের কারুর চোখের সামনে নাপিত দেখলে নখ বাড়ার মতো ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে। এভাবেই হরিশংকর ভাগো-ভোগায় সেই দুষ্প্রাপ্য মাছ পেয়ে যায় কোনো ওষুধখাকী মেছুনীর কাছে।

মাছ তরিতরকারীর বাজার রোজ সকালে রানীরঘাটেও বসে। কিন্তু লোকের এক অদ্ভুত ধারণা, ওপারের শহরে যায় যা কিছু সবই উৎকৃষ্ট বস্তু। হরিশংকর নিজের ওপর এবং অন্যদের ওপরও খাপ্পা হয় অনেক সময়। কিন্তু সকালবেলা থলে হাতে ঠিক সে চৌবেজীর গদীর পাশে গিয়ে অপেক্ষা করে।

থলের বাজার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফের আটটায় গিয়ে ডিসপেন্সারি খুলতে হয়। দশটায় কল্যাণবাবু যান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। ফেরেন ঘণ্টাখানেক পরে। ওই একঘণ্টায় হরিশংকরের

কিছু উপরি রোজগার হয়। ইঞ্জেকশান দেয়। চুপি চুপি মিক্সচার-বড়ি এসবও দেয় বিশ্বস্ত কোন রুগীকে। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে ইঞ্জেকশান দিয়ে আসারও কিছু রোজগার আছে হরিশংকরের। ইঞ্জেকশান পিছু একটা করে আধুলি।

কল্যাণবাবু সব বোঝেন। মাইনে প্রথমে দিতেন মাসে পঞ্চাশ। পরের বছর ষাট, এখন পঁচাত্তর। এই বেতনবৃদ্ধির পেছনে হরিশংকরের শাসানি ছিল। সে কম্পাউন্ডার হিসেবে পাকা লোক। বর্ধমানে বড় হাসপাতালে চাকরি করত। সে চাকরি ছেড়ে আসতে হয়েছিল শ্বশুরমশাইয়ের নানা প্রলোভনে পড়ে। এখন পস্তায়।

আজ আটটা বাজলেও হরিশংকর ফিরছে না দেখে শ্যামলী একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। রানীরঘাটের ইদানিংকার হালচাল ভাল না। তার ওপর ইন্দ্রের জন্য ভাবনা হয়। হরিশংকর ইন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করুক আর মারামারি করতেই যাক, শ্যালকটিকে সে স্নেহও করে। শ্যামলী দেখেছে, খুনের মামলায় ইন্দ্রের জন্য কী ছুটে না বেড়িয়েছে সে।

ইন্দ্র এখনও শুয়ে আছে। দরজা বন্ধ। শ্যামলী তাকে বলতে যাচ্ছিল, কী হল ঘাটে গিয়ে দেখে আসতে—সেই সময় হরিশংকর ফিরল হন্তদন্ত হয়ে। বাজারের থলে রেখে বলল, যা সবাই বলাবলি করছিল, ঠিক তাই হল। এই জন্যে বলে, পাগলকে কিছু মনে করিয়ে দিতে নেই। একবার এক পাগল দুষ্টুমি করছে দেখে একজন যেই বলেছে, ওরে! দেখিস যেন ঢিল ছোঁড়ে না—অমনি পাগল বলল, এই তো মনে করিয়ে দিয়েছ বাবা! ব্যস! ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল ব্যাটা। এও হয়েছে তাই। একজ্যাক্টলি তাই! সবাই বলে বলে ....

শ্যামলী চেঁচিয়ে উঠল, ভাষণ থামাও। হয়েছে কী?

আরে, ওই রাজেন পাগলার কাণ্ড !

হুঁউ! তুমিও খোকা সেজে মজা দেখছিলে বুঝি ! ঢিল যখন খাবে তখন বুঝবে।.... বলে শ্যামলী থলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

হরিশংকর বলল, ইনার সাবধান হওয়া দরকার, বুঝলে? কবে না আনুমাস্টারের মতো মাথা থেঁতলে দেয়। সে-রাতে চেষ্টা করেছিল তো। খুব বেঁচে গেছে ইনা।

শ্যামলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আনুমাস্টারকে ঢিল মেরেছে?

বলছি কী! সেই জন্যে তো এত দেরি।—হরিশংকর ঘরে ঢুকে লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট পরতে গেল।

শ্যামলী দরজার কাছে গিয়ে হাতমুখ নেড়ে বলল, তোমার অর্ধেক মুখে অর্ধেক পেটে। আনুমাস্টারকে মেরেছে?

হ্যাঁ। সে এক কাণ্ড। মাস্টারমশাই গেছেন আর পড়েছেন রাজেনের পাল্লায়। ইট নিয়ে তাড়া করেছে। মাথার পেছনে লেগে এক ইঞ্চি ক্র্যাক। মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। ডিসপেন্সারি খুলে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। স্টিচ করে দিয়েছি কোনোরকমে।

তারপর, তারপর?

রিকশোয় করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম।

হ্যাঁ গো, বাঁচবেন তো?

হরিশংকর শার্ট বদলে বলল, শক্ত মানুষ। অন্য কেউ হলে লাইফ রিস্ক হত। শোনো, ঘাটে কিছু সিঙাড়া-টিঙাড়া খেয়ে নেব।

রুটি সেঁকে রাখলাম যে! কে খাবে অত ?

তাহলে দাও। ঝটপট গিলে নি। সাড়ে আটটা বাজে।

খেতে দিয়ে শ্যামলী বলল, হ্যাঁ গো, রাজেনবাবুকে কেউ বেঁধে রাখছে না কেন? না হয় পাগলা হাসপাতালে দিয়ে আসুক কোথাও!

হরিশংকর রুটি চিবুতে চিবুতে বলল, পাগলের ওষুধ প্রহার! আজ ধোলাই খেয়েছে লোকের হাতে।

শ্যামলী শিউরে উঠে বলল, আহারে!.....

আনন্দময় মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে বারান্দায় তক্তাপোষে কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বাইরের দরজা বার বার খুলতে হচ্ছে বলে নিরু বিরক্ত হয়ে খুলে রেখেছে হাট করে। রানীরঘাটে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে যেন। তখন থেকে কত লোক এল। স্কুল থেকে ক'জন মাস্টারমশাই বিশাল এক ছাত্রবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। উঠোন থৈ থৈ করছিল। চৌবেজী এলেন। দুপুর অব্দি এতসব লোক দেখে গেল। আনন্দময় একটুও কাবু হননি সামান্য একটুকরো ইটের ঘায়ে, সেটা বুঝতে চায় না কেউ। কিন্তু প্রমাণ হল, রানীরঘাটের মানুষ আনুমাস্টারকে কতটা শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে হরিশংকর আবার দেখতে এল। আনন্দময় বললেন, তেমন, কিছু না হে! বেলা হয়েছে, খাওয়াদাওয়া করগে, যাও।

হরিশংকর বলল, যাই। ব্যথা-বেদনা কেমন আছে এখন। টনটন করছে না তো?

হাসলেন আনন্দময়। .... কী ট্যাবলেট খাওয়ালে! কোনো সেন্সেশান নেই মাথায়।—বলে কপালে একবার হাতও বোলালেন।

হরিশংকর বলল, চান করবেন না যেন। এ টি দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। ভয়ের কিছু নেই।

সুচরিতা কাতর চেহারায় থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, হ্যাঁ গা, ভাত খাওয়া চলবে তো?

খুব চলবে।—হরিশংকর হাসল।—মাছের ঝোল ভাত দিন। সন্ধ্যায় বরং আরেকবার এসে দেখে যাব।

সুচরিতা বললেন, সন্ধ্যায় কল্যাণবাবুকে একবার আসতে বলো না বাবা!

বলছেন যখন, বলব। .... বলে হরিশংকর বেরিয়ে গেল। তার কথায় আস্থা নেই দেখে একটু বিরক্ত হয়েই গেল।

আনন্দময় সুচরিতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। ... তোমার ধর্ম কর্ম সব পণ্ড হল এদিনটা। নাকি আজ কোনো অনুষ্ঠান নেই আশ্রমে?

সুচরিতা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, নেই কেন? আছে।

আহা! সেভাবে বলিনি।—আনন্দময় দেয়ালে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—এ একটা সামান্য ব্যাপার। এজন্যে তোমার উদ্বেগের কারণ ছিল না।

পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ বসে পড়লেন। সুচরিতা ব্যস্তভাবে এক পা এগিয়ে বললেন, কী হল?

মাথাটা একটু ঘুরে উঠল। ও কিছু না।

সুচরিতা ডাকলেন, নিরু! নিরু! আয় তো এখানে!

নিরু টিউবওয়েলের পাশে শিউলি গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। বলল, কী হয়েছে?

সুচরিতা চটে গেলেন। .... ত্রিভুবন ডুবে গেলেও তোর হাঁটু জল সর্বক্ষণ। কৈ, ওঠ—ঘরে গিয়ে শোবে। আহা, ওঠ না!

আনন্দময়ের মনে হচ্ছিল সুচরিতা অনেকটা দূরত্ব বিদ্যুদ্বেগে ডিঙিয়ে কাছে এসে গেছেন। কতকাল পরে এত কাছে দেখছেন নিরুর মাকে। ইচ্ছে করেই তাঁর কাছে সমর্পণ করলেন নিজেকে। কোনো-কোনো মুহূর্তে পুরুষের জীবনে মেয়েরা করুণা হয়ে আসে। সব রুক্ষতা ঘুচিয়ে দেয়।

বিছানায় বসিয়ে সুচরিতা বালিশ আনতে যাচ্ছিলেন। নিরু নিয়ে এল বাইরের তক্তপোষ থেকে। সুচরিতা বললেন, এখানেই মেঝেয় আসন করে দে। আমি ভাত বেড়ে আনছি।

নিরু বালিশ দুটো বাবার পেছনে গুঁজে দিয়ে আসন আনতে গেল।

অনেককাল পরে সুচরিতা সামনে বসে খাওয়ালেন। আনন্দময় তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন বটে, মনে মনে বললেন, রাজেন! এ তোমারই কীর্তি! ইটটা না মারলে এসব কিছুই ঘটত না।

সুচরিতা লক্ষ্য করলেন আনন্দময় মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, কী হল? হাসছ কেন?

হাসছি। রাজেনটা ... খামোকা মারধর খেল লোকের কাছে। কী যে করে!

সুচরিতা ঝাঁঝাল করে বললেন, বেশ করেছে ওকে মেরেছে। পাগল হয়েছে বলে মাথা কিনে

নিয়েছে। ওকে পুলিশে দিলে না কেন?

নিরু বারান্দা থেকে বলল, মা! তুমি ওখানেই খেয়ে নেবে?

হুঁ। তোর বাবার পাতেই বসছি। একটুখানি ভাত তরকারি দিয়ে যা। বেশি না—একটুখানি।—সুচরিতা উঠে স্বামীকে ধরে আঁচাতে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। হাতে জল ঢালতে ঢালতে ফের বললেন, তুই খেয়ে নে নিরু। বেলা হয়ে গেছে।

আনন্দময় বললেন, পান খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি খেয়ে নাও আগে। তারপর সেজে দিও।

কিন্তু সুচরিতা পান সেজে দিয়ে তবে খেতে বসলেন।

খাওয়ার পর বিছানায় স্বামীর মুখোমুখি বসে নিজের খিলিটা মুখে পুরে বললেন, একটু শোও। খালি তো দিনরাত ঘাটে গিয়ে আড্ডা। সময়মতো খাওয়া নেই, ঘুমনো নেই। রোজ রাতে শুনি বার বার বেরুচ্ছ দরজা খুলে। ঘুম হয় না বুঝি?

আনন্দময় পা ছড়িয়ে শুলেন। সুচরিতা পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দময় বললেন, আসলে রিটায়ার্ড লাইফটা মানুষের বড় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। একটা কিছু নিয়ে থাকলে হয়তো চলে যায় কোনোরকমে। অনেক সময় ভাবি, প্রাইভেট টিউশনি ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। কিন্তু আর সইছিল না। সারাজীবন অন্যের ছেলেপুলের কাছে বকবক করে কাটিয়ে দিলাম। খামোকা! সবটাই অর্থহীন লাগে। কে কী শেখে? কে কী হবে, মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় সেটা ঠিক হয়ে যায়। লম্পট হবে, না খুনী—কিংবা জজসায়েব!

কথা বল না! ঘুমোও দিকি চুপচাপ!

বলতে ইচ্ছে করছে। কতকাল পরে তোমাকে পেলাম!

সুচরিতা তাকিয়ে মুখ নামালেন। আস্তে বললেন, কে কাকে পায়! আমি কি পেয়েছিলাম তোমাকে?

পাও নি?

উঁহু।

কেন ওকথা বলছ সুচি?

সারাজীবন তো শুধু স্কুল আর ছাত্র, ছাত্র আর স্কুল করে কাটালে।

হুঁ, এখন মনে হয় শিক্ষকজীবনের মতো অভিশপ্ত জীবন আর নেই। অবশ্য যারা নেহাত চাকরি হিসেবে কিংবা বৈষয়িক উন্নতির জন্য শিক্ষকতা করছে, তাদের কথা আলাদা। আমার একটা ব্রত ছিল।

এবার চুপ করো। ঘুমোও।

সুচি, কিছুদিন থেকে স্নেহাকরের কথা খুব করে মনে পড়ছিল। অনেকবার ব্যর্থতার পর ভেবেছিলাম, এই ছেলেটি অন্তত আমাকে ফাঁকি দেবে না। অত ভাল ছেলে! শান্ত নিরীহ। আবার অন্যায়ের প্রতিবাদে ওর জুড়ি ছিল না। কিন্তু পরেশের ছেলে কুমু আর ওই মাতাল ভক্তিব্রতের ছেলে ইন্দ্র স্নেহাকরকে নষ্ট করে ফেলল। তুমি জানো না সুচি, স্নেহাকরের কলেজের মাইনে মাঝে মাঝে আমিও দিয়েছি। বই কেনার টাকাও দিয়েছি। আমার একটা স্বপ্ন ছিল ছেলেটাকে নিয়ে। আনন্দময় একটা জোরালো নিঃশ্বাস ফেললেন।

সুচরিতা স্বামীর গালে একটা হাতের ছোঁয়া দিয়ে আদর করে বললেন, চুপ করো না এবার। মাথা ঘুরবে যে!

আনন্দময় বললেন, কথা বলতে ইচ্ছে করছে। জানো সুচি? ইদানিং প্রায় স্বপ্ন দেখতাম স্নেহাকরকে। খুব কষ্ট হত। এ ঘরে আমি একা। ঘুম ভাঙার পরও সে কি অসহ্য কষ্ট। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করত।

সুচরিতার ভাতঘুমের অভ্যাস আছে। ঢুলছিলেন। এবার স্বামীর পায়ের কাছে শুয়ে পড়লেন।

আনন্দময় বললেন, সব কথা হয়তো তুমি জানো না। স্নেহাকর নিরুর সঙ্গে আমার অসাক্ষাতে মেলামেশা করত। একদিন হঠাৎ বাড়ি ঢুকে দেখি, বারান্দায় থামের কাছে ....

সুচরিতার সাড়া নেই দেখে থেমে গেলেন আনন্দময়। চোখ বুজে স্নেহাকরকে দেখতে গিয়ে

দেখলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্রের হাতে সেই ছোরাটা। সাদা বাঁট। ছ'ইঞ্চি লম্বা, ইঞ্চিটাক চওড়া ফলা। ভয়ে চোখ খুললেন তক্ষুনি।

সেবার গঙ্গাপুজোর দিন নিরুপদ্রব রানীরঘাটে এক আততায়ীর আবির্ভাব ঘটেছিল। স্নেহাকরের রক্তাক্ত দেহটা চোখে দেখতেও সাহস হয়নি আনন্দময়ের। তারপর থেকে প্রতিমুহূর্ত কেটে গেছে অস্বস্তিতে। বারবার চমকে উঠেছেন। পেছনে সেই নিষ্ঠুর আততায়ী নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করছে যেন। গাছের শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ শুনে একদিন ইটখোলার কাছ থেকে হন্তদন্ত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। হয়তো জঙ্গলে একটা গরু চরে বেড়াচ্ছিল। অথচ গিয়ে দেখারও সাহস হয়নি। তারপর আস্তে আস্তে সয়ে গিয়েছিল ভয়টা। স্নেহাকর খুব কাছের বলেই যেন ওই আতঙ্ক। নিজের ছেলে নেই। শুধু ওই এক মেয়ে। তাই স্নেহাকরকে একসময় নিজের ছেলে বলে মনে করতেন। তার নিষ্ঠুর ভয়ংকর মৃত্যুতে সেই আতঙ্ক স্বাভাবিক ছিল।

কিন্তু ইন্দ্র ফিরে আসার চাইতে ইন্দ্রের হাতের ওই ড্যাগারটা তাঁর সেই পুরনো আতঙ্কটা খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিল। আবার বড় অস্বস্তিতে জীবনযাপন করেছেন আনন্দময় অথচ আঘাতটা পেছন থেকে যে করল, সে ইন্দ্র নয়। রাজেন।

মরে যেতে পারতেন এক টুকরো ইটের ঘায়ে। মাথার পেছনে ঘা। শক্ত মানুষ বলে বেঁচে গেছেন।

আনন্দময় ডাকছিলেন সুচি! সুচি! শুনছ? একবার ওঠ না লক্ষ্মিটি!

সুচরিতা সাড়া দিলেন।—কী? মাথা ঘুরছে নাকি?

শীত করছে যেন। একটা চাদর দিতে পারো?

সুচরিতা উঠে বসলেন। গলার কাছে হাত রেখে বললেন, জ্বর বলে তো মনে হচ্ছে না!

আমার ভীষণ শীত করছে কিন্তু।

সুচরিতা একটা চাদর এনে ঢেকে দিয়ে বললেন, ফ্যানটা বন্ধ করে দেব? ফ্যানের জন্যে হয়তো শীত করছে।

ফ্যান বন্ধ করো।—বলে আনন্দময় একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। শুনেছি, স্নেহাকরকে স্ট্যাব করার পর সে বলেছিল, এত শীত কেন? মনোহর বলেছিল। মনোহরকে চেনো তো? ঘাটের চা-ওলা। হয়তো ব্লাড চলে গেলে শরীরের ভেতরটা হিম হয়ে যায়।

কেন তুমি অত বকবক করছ। চুপ করো তো।

আনন্দময় ঠোঁট দুটো এদিক-ওদিকে নাড়িয়ে বললেন, আমার কথা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে দেখছ? চোয়ালটায় কী হল? একটু দেখতো সুচি। এখানটা।

সুচরিতা ঝুঁকে দেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, মুখটা কেমন বেঁকে আছে কেন বলো তো? কৈ, হাঁ করো! পারছ না? সত্যি ঠোঁটের একটা দিক বেঁকে আছে। নিরু! নিরু!

নিরু নেই। সুচরিতা বাইরে বেরিয়ে ডাকাডাকি করে সদর দরজায় গেলেন। বাইরে থেকে ভেজিয়ে কোথায় বেরিয়েছে সে। সুচরিতা হন্তদন্ত হয়ে পাশের বাড়ির জানলায় ডাকতে থাকলেন, মুকুল! মুকুল আছিস?

মুকুল তাস খেলছিল। উঁকি মেরে বলল, কী গো মাসিমা?

নিরু আছে ওখানে?

না তো!

তুই একবার আয়তো বাবা!—সুচরিতা ব্যাকুল ভাবে বললেন।—শিগগির আয় বাবা! তোর মামাবাবুর কী রকম হয়েছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। মুখ বেঁকে গেছে।

মুকুল বলল, সর্বনাশ! টিটেনাস নয় তো?

বিছানায় আনন্দময় একপাশে কাত হয়ে আছেন। একটা পা বেঁকে রয়েছে। চোখ লাল—নিষ্পলক। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন, এদিকটা সেন্সেশান নেই। স্নেহাকরকে ডাকো।

সুচরিতা চেঁচিয়ে বললেন, কাকে ডাকতে বলছ?

কল্যাণবাবুকে।.....

আজ হরিশংকর নীরব। শ্যামলী মাঝে মাঝে গজগজ করছে চাপা গলায়। হরিশংকর দরজা এঁটে স্ত্রীকে ঠেসে ধরে শুয়ে আছে।

ইন্দ্র ঘরের দরজা বন্ধ করতে দেয়নি নিরুকে। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছে। নিরু একটু তফাতে তার পায়ের কাছে বসে আছে।

ইন্দ্র বলল, বউদি আসছে জানো? এলে সেবারকার মতো নৌকো ভাড়া করে পিকনিকে যাব। যাবে নাকি?

নিরু ভুরু কুঁচকে বলল, বউদি! কে তোমার বউদি?

ইন্দ্র চটে গেল। .... তুমি মাইরি মাঝে মাঝে একেবারে ন্যাকা হয়ে যাও। পুটুর বউ।

নিরু হাসল। .... তাই বলো! সেই কলকাতার মহিলা! যা দেমাক ওঁর!

দেমাক? তুমি মিশেছ ওর সঙ্গে?

দায় পড়েছে। যেচে আমি কারুর সঙ্গে মিশি নাকি?

তুমি মেশো নি, তাই বলছ। কদিন পরেই আসছে, আলাপ করিয়ে দেব। দেখবে কত ভাল।

নিরু ঠোঁট কামড়ে মিটিমিটি হেসে বলল, আমার মতো আনএডুকেটেড মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে কী হবে? ইংরিজি বলতেই তো পারব না।

মাস্টারমশায়ের মেয়ে। ইংরিজি শেখনি কেন?—ইন্দ্র হাসতে লাগল। আমার বাবা অবশ্য মাতাল-টাতাল ছিল। আমিও শেষ পর্যন্ত তাই হব কি না কে জানে? পয়সা নেই, তাই।

নিরু মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, বিনিপয়সায় তো রোজ খেতে যাও ডোমপাড়ায়।

ধুস! কে বলল?

দেখতে পাই দূর থেকে।

কী দেখ? মদ খাচ্ছি?

নিরু মুখ তুলে একটু হাসল। ... একটা ব্যাপার নিশ্চয় দেখতে পাই।

কী সেটা?

সুরেন ড্রাইভারের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা।

প্রেম?

তাই তো মনে হয়।

ইন্দ্র সিগারেটে শেষ টান মেরে জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। তারপর বলল, দুঃখ শুধু এটাই, আমার সঙ্গে প্রেম করার মতো বুদ্ধিসুদ্ধি ছুঁড়িটার নেই। একেবারে নাবালিকা। তবে দেখতে বিউটিফুল!

বাঃ! তাহলে তো আর কথাই নেই!

তোমার কি ঈর্ষা হয় নিরু?

নিরু ওর পায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, শাট আপ!

এই যে! এবার ইংরেজি বলে ফেললে কেমন। ওতেই চলবে। বলে ইন্দ্র উঠল। কোনায় টাঙানো দড়ি থেকে শার্টটা টেনে নিয়ে পরতে থাকল। তারপর লুঙ্গিটা ফেলে আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় বলল, এদিকে তাকিও না। সাবধান।

সে প্যান্ট পরে চুল আঁচড়াতে থাকল। নিরু বলল, কোথায় চললে?

ডোমপাড়ায় প্রেম করতে।

চলো, আজ আশ্রমের ঘাটে গিয়ে বসি।

তোমার মা দেখতে পেয়ে পিট্টি দেবেন।

মা আজ বাবার সেবায় ব্যস্ত।

ইন্দ্র বালিশের তলা থেকে ড্যাগারটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর বলল, মাস্টারমশাইকে দেখে আসব ভাবছিলাম। একবার গিয়েছিলাম, জানো? গিয়ে দেখি বাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। চলে এলাম। খুব সিরিয়াস কিছু কি? জামাইবাবু অবশ্য বলল, ততটা না। একটু চিরে গেছে মাথার পেছনটা।

নিরু উঠল। .... এই চলো না আশ্রমের ঘাটের ওদিকে।

কেন?

অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

এতক্ষণ বললেই পারত।

দেয়ালেরও কান আছে।

একটু হিন্ট্ দাও না।

নিরু রাগ করে বলল, ঠিক আছে। শুনে কাজ নেই। চলি।

নিরু দ্রুত বেরিয়ে গেল। খিড়কির দরজা খুলে বটতলায় গেল। জানালায় গিয়ে ইন্দ্র দেখল, নিরু, বটতলা ঘুরে আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হনহন করে চলে যাচ্ছে।...

এবেলা আকাশ ময়ূরকণ্ঠী নীল। গাছপালার মাথায় ঝিলমিলে রোদ খেলে বেড়াচ্ছে। গঙ্গা আজ আশ্চর্য শান্ত। তার বুকের ভেতর ওপারের রঙিন শহরের প্রতিবিম্ব একটু-একটু কাঁপছে। এপারে ছোট্ট এই গঞ্জের শরীরও স্থির, চাঞ্চল্যহীন। বড় নিরুপদ্রব লাগে। ইন্দ্র আনমনে ধীরে হাঁটছিল।

সে দূর থেকে দেখল, শুভদের লনে শুভ, নীলিমা আর বিভাবতী বেতের চেয়ার পেতে বসেছেন। শক্তিব্রত সপরিবারে ঠিক এমনি করে লনে বসে থাকতেন। একটু সাহেবী চালচলন ছিল শুভর বাবার। কুকুর আর ছড়ি নিয়ে গঙ্গার পাড়ে ঘাসের চটানে দাঁড়িয়ে থাকতেন কোনো-কোনো বিকেলে।

আর ঠিক সেই সময় তাঁর দাদা ভক্তিব্রত ডোমপাড়ায় কারুর বাড়ির উঠোনে বসে তাড়ি গিলতেন।

ইন্দ্র এই দুরকম জীবনের কোনোটাই বেছে নেয়নি। নিতে চাইলেও কি মেলে? কিন্তু কে জানে কোন জীবনে কত সুখ—লনে বতের চেয়ার, কুকুর ও ছড়ি নিয়ে ঘোরা কিংবা ডোমপাড়ায় তাড়ি গেলা!

ডোমপাড়ার চটানে কমিলা আজ এক্কা দোক্কা খেলছে। মেয়েটা একা খেলতেই ভালবাসে। ওর খেলার সঙ্গীরা কখনও থাকে, কিন্তু তারা কাল্পনিক। কমিলা খেলতে খেলতে তাদের সঙ্গে কথা বলে। মাথায় কি ছিট আছে মেয়েটার?

সেদিন গঙ্গার ঢালে বসে ইন্দ্র কমিলাকে সূর্যের ভেতর স্কিপিং করতে দেখেছিল। আজ কমিলার পেছনে প্রথম শরতের ভরা গঙ্গা। আর দূরের রঙিন শহর। ইন্দ্র শুভর মতো ছবি আঁকতে পারে না। পারলে এরকম কত ছবি আঁকত কমিলার।

ইন্দ্রকে দেখে কমিলা খেলা থামাল। ইন্দ্র বলল, থামলি কেন রে?

কমিলা বলল, তুমার চাক্কু কাঁহা গে বাবুদা?

সিধুর কাছে বাবুদা শিখেছিস দেখছি! —ইন্দ্র হাসল। —চাক্কু আছে রে! পকেটে।

দেখাও?

বিশ্বাস হচ্ছে না?—ইন্দ্র প্যান্টের পকেট থেকে ড্যাগারটা বের করে দেখাল।

খুলো! খুলো না বাবুদা!

ইন্দ্র ফলা খুলে বলল, তারপর? তোর পেটে মারব নাকি?

মারো! মার দো!—কমিলা সিধে হয়ে বুক চিতিয়ে সামনে দাঁড়াল।

কমিলাবতী! তোর শাড়িটা তো ভারি সুন্দর! কোথায় পেলি?

বাবা দিসে।

কানের দুলদুটো?

বাবা দিসে।

সবই বাবা দিসে?—ইন্দ্র হাসতে লাগল।—আর কেউ দেয় না তোকে?

নাহিক্।

নাহিক্!—ইন্দ্র ভেংচি কাটল।—কেন? কুমুবাবু, শশাংবাবু—এরা যে তোদের বাড়ি আসে? দেয় না কিছু?

কমিলা তাকে অবাক করে হেসে ফেলল। ... হামি লিবে তব্ তো? বোলে কী, চলো কমিলা উপ্পার শহরমে। ছিন্মা দেখাব। হামি যাবে, তব্ তো? হামি বোলে কী, বাবাকে বোলব, হাঁ! তোখন ভাগ্ যায়।

ইন্দ্র জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ফের যদি তোকে ওসব কথা বলে, বলবি বাবুদাকে বলে দেব। ইন্দ্রবাবুকে। বুঝলি?

ইন্দরবাবুকে?—কমিলা একপায়ে লাফাতে থাকল আবার। সুর ধরে বলতে থাকল, ইন্দরবাবুকো বোল দেগা। ইন্দরবাবুকো বোল দেগা.... বোল দেগা .... বোল দেগা! তারপর হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঘাসে। কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে তবে উঠল। সে খিলখিল করে হাসছিল।

ইন্দ্র ঘাসে বসে পড়ে। সিগারেট ধরিয়ে বলে, তুই খেল্ কমিলা। আমি দেখি।

কমিলা কোনো কথা বলে না আর। খেলেও না—অথবা এ তার অন্য এক খেলা। ঘাসের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়। ইন্দ্রের চারপাশে বিশাল বৃত্তের পথে দৌড়তে থাকে। বৃত্তটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। ইন্দ্র চোখ বুজে নিজের চারিদিকে ধারাবাহিক ধুপ্‌ধুপ্ শব্দ শোনে। শব্দটা ঘুরেঘুরে আঁটো হতে থাকে। কমিলার রঙিন শাড়ির বাতাস তার গায়ে ঝাপটা মারে। ইন্দ্র চোখ বুজে বলে আমি, তোর বুড়ি কমিলা!

কমিলা তার মাথা ছুঁয়েই ছিটকে সরে যায়। ধুপ করে বসে। ইন্দ্র চোখ খুলে দেখে, সে চোখ বুজে মাথাটা দোলাচ্ছে। ঘূর্ণির ঘোর লেগেছে কমিলাকে। ইন্দ্র বলে মাথা ঘুরছে তো? এই কমিলা!

কমিলা হাসে। ঘাসের ওপর অবেলায় সাদা প্রজাপতিরা ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। রোদের রঙে লালের আভাস। সামনে গঙ্গার জলে চোখ ধাঁধানো লাল রঙ ঝলমল করছে। ইন্দ্র বলে, কী হল? এই কমিলা!

কমিলা হঠাৎ উঠে বাড়ির দিকে চলে গেল।

ইন্দ্র আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ওঠে। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিমে ইটখোলার কালো মস্ত চিমনী থেকে ধোঁয়া উঠছে। চলতে চলতে কানে এল মজুর মজুরনীদের বস্তিতে ঢোলকের বাজনা বাজছে। এবড়ো-খেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তাটা ডিঙিয়ে সে একটা ঢিবির উপর গিয়ে দাঁড়াল। ঢিবির মাথায় বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওলা একটা গাছ। তার ফল কালো—বাঘের নখের মতো নাকি, তাই বাঘনখা নাম গাছটার। ইন্দ্র ভীষণ চমকাল।

গাছটার তলায় শুয়ে আছে স্নেহাকরের বাবা। কপালে ঠোঁটে কালো রক্ত জমে আছে। পরনের জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। ইন্দ্র চলে আসবে কি না ভাবছিল, রাজেন হাত তুলে ডাকল। ইন্দ্র বলল, বলুন!

রাজেন শুয়ে থেকেই কপাল, ঠোঁট, তারপর ছেঁড়া জামা সরিয়ে বাহু, পিঠ দেখিয়ে বলল, আমাকে মেরেছে।

ইন্দ্র বলল, আপনি আনুমাস্টারকে ইট মেরেছেন কেন?

বেশ করেছি। তোর কি?

ইন্দ্র একটু হাসল। —আপনি সেদিন রাতে বটতলায় আমাকেও ইট ছুঁড়েছিলেন।

আমি না। মাইরি!

আবার কে ইট ছুঁড়বে আমাকে। আপনিই ছুঁড়েছিলেন।

মাইরি, তোর দিব্যি। তোকে মারব কেন? তোকে কত ভালবাসি! .... রাজেন হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

ইন্দ্র বলল, এখানে শুয়ে আছেন কেন? এই জঙ্গলের ভেতর শোয় না। ঘাটে যান।

উঁহু! ওরা মারবে। রাজেন চোখ মুছে উঠে বসল। —একটা সিগ্রেট দে না বাপ, খাই! তোরা আমার কত আপনজন। দে না, খাই!

স্নেহাকরের বাবাকে সিগারেট দেওয়ার কথা একদিন ভাবা যেত না—হলই বা কন্ডাক্টার। কিন্তু এখন অন্য সময় ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে সিগারেট ধরে ফুঁক ফুঁক শব্দে টেনে ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল রাজেন। ধোঁয়া গিলছিল না। ইন্দ্র দেখল, হাতের আঙুলও ফেটে গেছে মারের চোটে। বলল, কে এমন করে মারল রাজেনকাকা?

রাজেন আপন খেয়ালে জড়িয়েমড়িয়ে কী সব বলে চলেছে, একটা শব্দও বুঝতে পারছিল না ইন্দ্র।

অন্ধকার ঘনিয়ে এল ধীরে। ইন্দ্র বলল, আপনি আমাদের বাড়ি যাবেন? যাবেন তো চলুন।

ভাত খাওয়াবি তো?—সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে রাজেন নড়বড় করে উঠে দাঁড়াল।—বল, ভাত খাওয়াবি নাকি?

খাওয়াব। আসুন।

খপ করে ইন্দ্রের বাঁ বাহুটা ধরে রাজেন বলল, তুই ভাল ছেলে। তুই আমার আপনজন বাপ।

ইন্দ্র হাত ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারছিল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। এভাবে ধরে রাজেন একটা টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সেইরকম জড়িয়ে-মড়িয়ে কী সব দুর্বোধ্য কথা বলছিল সে। স্কুলের সামনে এসে ডাইনে আগাছার ভেতর সরু পায়ে চলা পথ ধরল ইন্দ্র।

শুভদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। লনে চেয়ারগুলো পড়ে আছে। ওরা কেউ নেই। পেছনের গলিরাস্তা দিয়ে বাড়ি ঢুকল ইন্দ্র। শ্যামলী বারান্দার লাগোয়া খোলামেলা উঁচু চত্বরটাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চমকে উঠল সে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রাজেন উঠোনে থেবড়ে বসে পড়ল। তারপর বলল, আজ প্রচুর ভাত খাব। দে, আমাকে অনেক ভাত দে। কম দিলে ইট মারব বলে দিচ্ছি। দে! শিগগির ভাত দে। খাব খাব খাব খাব হাঁঃ!

ইন্দ্র শ্যামলীর কাছে গিয়ে বলল, ভাত-টাত আছে রে দিদি?

শ্যামলী ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল. তুই এবার সত্যি মরার রাস্তা ধরেছিস ইনা! বার বার ইচ্ছে করে নিজের ঘাড়ে ঝামেলা [illegible] ফেলেছিস! কেন ওঁকে নিয়ে এলি? এতটুকু বুদ্ধি নেই তোর?

ইন্দ্র চটে গেল। .... [illegible]। ভাত না থাকলে বলে দে না। হোটেলে নিয়ে যাব তাহলে!

শ্যামলী গলা চেপে বলল, রাতে ভাত কোথায় পাব? রুটি বেলে দিচ্ছি। আর শোন, দরজাটা এঁটে দিয়ে আয়। ওঁকে [illegible] দেখলে লোকে কেলেংকারি করবে। আনুমাস্টারের টিটেনাস হয়েছে। ওপারের হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে এই একটু আগে নিয়ে গেল। এখনও বোধ হয় নৌকোয় পেরুচ্ছে।

ইন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, ঠিক আছে। ঝটপট রুটি বেলে দে!

কেরোসিন কুকার সামনে রেখে ইন্দ্র রান্নাঘরের দরজার কাছে বসল। শ্যামলী ময়দা মেখে রুটি বেলতে থাকল। উঠোনে রাজেন সমানে বকবক করে চলেছে। শ্যামলী চাপা গলায় বলল, হঠাৎ ওঁকে খেতে ডেকে আনলি যে? কোথায় পেলি? তোর জামাইবাবু বলছিল, কুমুরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশকে ধরিয়ে দেবে। আনুমাস্টারের অবস্থা ভাল না।

ইন্দ্র বলল, তরকারি আছে তো দিদি?

হাঁটুতে নাকটা ঘষে শ্যামলী জবাব দিল, আছে। দরজাটা এঁটে দিয়ে আসতে বললাম যে তোকে!

থাক।

কুকারটা ধরিয়ে দে। নাকি তাও পারবি না?

দিচ্ছি।

ইন্দ্র কুকার ধরাতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেলল। তখন শ্যামলী তার হাত থেকে দেশলাই কেড়ে নিয়ে ধরাল। বলল, জীবনে একটা কিছুও তো পারবি ইনা? কেমন করে কী করবি রে? যদি আমরা না থাকতাম!

ইন্দ্র হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালায় রুটি তরকারি আর একটু গুড় নিয়ে ইন্দ্র বারান্দায় গেল। ডাকল রাজেনকাকা!

উঠোনে কেউ নেই। ইন্দ্র আবার ডাকল, রাজেনকাকা! কোনো সাড়া এল না। তখন সে শ্যামলীকে থালাটা দিয়ে দৌড়ে উঠোনে নামল। দরজায় গিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকল আবার, রাজেনকাকা! কোথায় গেলে?

গলিতে অন্ধকার। অনেকটা গিয়ে খুঁজে ফিরে এল ইন্দ্র।

শ্যামলী দুঃখিত ভাবে বলল, খেতে দেবো বলেই তো কষ্ট করে রুটিগুলো করলাম এই সাত সকালে। তোর জামাইবাবুর গরম গরম না হলে চলে না! তুই বরং খেয়ে নে রে!

ইন্দ্র আস্তে বলল, আরো কিছুক্ষণ দেখি। যদি ফিরে আসেন!

পাগল রাজেন আর এল না। এল হরিশংকর হাঁফাতে হাঁফাতে। .. . শামু খবর খারাপ। আনুমাস্টার মারা গেছে। মুকুল ফিরে এসে খবর দিলে। হাসপাতালে যাবার পথেই শেষ। আসলে এই শালা—এক নদী বিশ ক্রোশ না? তার ওপর ঘাটের মাঝিগুলোও মাইরি বড্ড অলস। অ্যাম্বুলেন্স পার করে আনতেই দেড়ঘণ্টা লাগল। বড় ভাল মানুষ ছিল গো আনুমাস্টার! সামান্য পাগলের হাতে মরা ওর কপালে ছিল! কী আর বলব? শোন—আমি যাচ্ছি ওপারে। এপার থেকে ঝেঁটিয়ে সবাই যাচ্ছে। আমি না গেলে ভাল দেখায় না।

শ্যামলী চুপ করে থাকল। ইন্দ্র তার ঘরে বসে শুনছিল। সেও চুপ করে থাকল। হরিশংকর বলল, ইনা নেই? ও, ওই তো! ইনা! এস। তুমিও এস। তোমারও তো....

ইন্দ্র ভেতর থেকে বলল, আপনি গেলেই হবে। আমার শরীর ভাল না।

ও, আচ্ছা! ... হরিশংকর শ্যামলীর দিকে ঘুরে বলল, ফিরতে অনেক রাত হতে পারে। কুমুরা চেষ্টা করবে যাতে বডি মর্গে না যায়। মর্গে গেলে সেই কাল বেলা বারোটার আগে বডি পাওয়া যাবে না। দেখা যাক্। কল্যাণবাবুকে নিয়ে গেছে কুমু। হরিশংকর চলে গেলে শ্যামলী দরজা বন্ধ করে এল। তারপর ডাকল, ইনা!

কী?

রাজেনবাবুকে তো তাহলে সত্যি পুলিশ ধরবে—তাই না রে?

জানি না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামলী আপন মনে বলল, দ্যাখ ইনা। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল হঠাৎ। তোকেও তো ইট ছুঁড়েছিল। যদি বাইচান্স লাগত তোর মাথায়।

ইন্দ্র কোনো কথা বলল না। সে ড্যাগারটা খুলে অভ্যাসমতো জীর্ণ দেওয়ালে আঁচড় কাটছে।

শ্যামলী বলল, আর কী বুদ্ধি তোর! সেই পাগলা লোকটাকে তুই দিব্যি নিয়ে এলি খাওয়াবি বলে! পাগলের কি দিগ্বিদিক জ্ঞান আছে? কথায় বলে, পাগলের গোবধেও আনন্দ।.....

কদিন পরে এক সন্ধ্যায় গঙ্গার আকাশে বিশাল চাঁদ, ইন্দ্র আশ্রমের ঘাটে বসে আছে। আশ্রমে সংকীর্তন শুরু হয়েছে। শান বাঁধানো ঘাটের ওপর জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না জলে। পেছনে পায়ের শব্দে ইন্দ্র চমকাল।—কে ?

নিরু বলল, আমি?

ইন্দ্র বলল, কদিন ধরে তোমাকে খুঁজছিলাম।

বাড়িতেই ছিলাম। গেলেই পারতে !

বসো। কথা আছে। —নিরু বসলে ইন্দ্র বলল, তোমার মা বুঝি আশ্রমে?

হুঁ। মায়ের সঙ্গে এসেছি। হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম।

আচ্ছা নিরু, ওই ড্যাগারটা তুমি সত্যি কি বাসস্ট্যান্ডের পেছনে ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলে? নাকি ....

ও কথা তুলে লাভ কি ?

তুমি এটা তোমাদের বাড়িতে পেয়েছিলে। তাই না?

নিরু আস্তে বলল, হ্যাঁ। বাবার খাটের তলায় জুতোর বাক্সে ভরা ছিল। রক্ত লেগে না থাকলে ....

ইন্দ্র ওর একটা হাত নিয়ে বলল, থাক্ গে। এসো, এবার আমরা অন্য কথা বলি। তারপর ঘুরে নিরুর দিকে তাকিয়ে দেখল সে নিঃশব্দে কাঁদছে। ইন্দ্র ড্যাগারটা গঙ্গার বুকের তলায় চাঁদকে লক্ষ্য

করে ছুঁড়ে মারল। একটা শব্দ হল দূরে। জলটা হয়তো কাঁপল, কিংবা কাঁপল না। জ্যোৎস্না ঝলমল করতে থাকল। ইন্দ্র বলল, রত্নাবৌদি যদি আসেন, আমরা মহুলার বিলে নৌকা নিয়ে যাব। সেবার খুব জমেছিল, জানো?

নিরু চুপ করে থাকল।

গঙ্গার আকাশের সেই বিশাল লাল চাঁদের আকার আরও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। তার গায়ে ক্রমশ ফুটে উঠছিল সোনালী আভা। জলের বুকে তার প্রতিবিম্বও বদলাতে বদলাতে তরল সোনার ঝলমলানি দেখা দিচ্ছিল। দূরের শ্মশান থেকে একটু পরে ছুটে এল কী এক বাতাস। বাতাসটা দুজনকে কয়েকমুহূর্ত ঘিরে রেখে চলে গেল। তারপর খুব কাছে কোথাও ছায়ার ভেতর একটা পেঁচা ক্র্যাঁও ক্র্যাঁ করে বারতিনেক ডাক দিল। তখন ইন্দ্র নিরুর দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কেন কান্না, নিরু? বাবার জন্য ? আমি বিশ্বাস করি না। আমার খালি মনে হত—মানে তুমি যেদিন এসে ড্যাগারটা দিয়ে গেলে, সেদিন থেকেই—যে, তুমি বাবার মৃত্যু চাইছ। কিছুতেই বাবাকে ক্ষমা করতে পারছ না। পারনি।

নিরু চোখ মুছে নিজের দুইহাঁটুর মাঝখানে মুখ রেখে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আগের বছর কালী পুজোর মেলায় বাবাকে ড্যাগারটা কিনতে দেখেছিলাম। জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, জিনিসটা দেখতে ভাল লাগল। তাই কিনলাম। তখনও বুঝতে পারিনি বাবার উদ্দেশ্য কী।

ইন্দ্র বলল, সেই সন্ধ্যায় অন্ধকার বাস থেকে যখন স্নেহাকর ছিটকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরল, কেউ চেঁচিয়ে উঠেছিল—"খুন! খুন! ইনা খুন করেছে।" তখন গণ্ডগোলের ভেতর গলার স্বরটা চিনতে পারিনি। তারপর বহুদিন ধরে স্মৃতি থেকে সেই স্বর চেনার চেষ্টা করেছি। তারপর জেল থেকে ফিরে যখনই তুমি ড্যাগারটা দিলে, আমার হঠাৎ মনে হল, ওটা মাস্টারমশাইয়ের গলা। কিন্তু তবু বুঝতে পারলাম না, কেন মাস্টারমশাই একাজ করলেন।! তাছাড়া ওঁর মত শান্ত ভদ্র মানুষ...

কথা কেড়ে নিরু বলল, কে শান্ত ভদ্র মানুষ? বাবাকে তুমি তাহলে চেননি।

ইন্দ্র একটু হাসল। হয়তো তাই। কোনো মানুষই একজন মানুষ নয়।

নিরু মুখ তুলে বলল, তুমি জানো? এর পর বাবার লক্ষ্য ছিলাম আমি?

ইন্দ্র হেসে ফেলল। যাঃ! কী যা তা বলছ? দৈবাৎ ঝোঁকের মুখে একটা ঘটে গেছে বলে ...

নিরু বাধা দিয়ে বলল, না। দৈবাৎ নয়। সেই সব কথাই তোমাকে বলতে এসেছি। আজ বিকেলে বাবার বাক্সো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ডাইরি বই পেলাম। টুকরো টুকরো অনেক কথা তাতে লেখা আছে।

বলো কী!

নিরু আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে চঞ্চলভাবে মাথা নেড়ে ভাঙা গলায় বলল, তুমি কিছু জানো না—কিছু জানো না ইন্দ্র! আমার এত ভাল বাবা ভেতর-ভেতর কেন ভীষণ পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন—কেন সব কিছুর ওপর ওঁর অত রাগ ছিল—অথচ সব চেপে রাখতেন, এতদিনে বুঝতে পেরেছি। সবকিছুর জন্য আসলে আমি দায়ী, ইন্দ্র!

ইন্দ্র আস্তে বলল, ডাইরিটা আমাকে দেখাবে?

নিরু মুখ নামিয়ে বলল, দেখাতাম! কিন্তু তাহলে যে তুমিও আমাকে আর ভালবাসতে পারবে না ইন্দ্র। আমাকে তুমি ভীষণ ঘেন্না করবে।

ইন্দ্র ওর পিঠে হাত রাখল। .... ছেলেমানুষী করে না। আমি তো সব জানি, তুমি স্নেহাকরকে সবকিছু দিয়েছিলে—তোমার কুমারীত্ব, তোমার স্বপ্ন....

ইন্দ্র শ্বাস ছেড়ে চুপ করল। কয়েক মুহূর্ত পরে ফের বলল, দেখ নিরু, ওসবে আমার কিছু যায় আসে না। ওই যে সব—কুমারীত্ব কিংবা সতীত্ব—শরীর! শরীর-টরির নিশ্চয় একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার ওসবে বিশ্বাস নেই। তা যদি থাকত, তোমাকে সত্যি ঘৃণা করতাম, নিরু! তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

নিরু ওর দিকে তাকাল। নিরুর চোখে জ্যোৎস্না ঝকমক করছিল। বলল, ঘৃণা কর না?

না।

তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে?

সেটা অন্য প্রশ্ন, নিরু।

বুঝেছি। তাহলেই দেখ ইন্দ্র, মুখে ওসব বড়-বড় কথা বলা কত সোজা।

ইন্দ্র ঝাঁঝালো স্বরে বলল, বিয়ে করাটাই কি বড় কথা? আমার চাকরি-বাকরি নেই। পরাশ্রিত। অবশ্য বলতে পারো, তোমার দাঁড়াবার মতো একটা মোটামুটি শক্ত জায়গা আছে। কিন্তু তুমি কি ভাবছ, আমি তোমাদের বাড়ি গিয়ে থাকব?

ইন্দ্র শেষ বাক্যটা বলতে গিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল। ফের বলল, আমার জামাইবাবুর ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স দেখতে পাও না! ছাড়ো এসব কথা। ডাইরিটা আমি দেখতে চাই।

নিরু সংযত ভাবে উঠে দাঁড়াল। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকল শান্ত পা ফেলে। ইন্দ্র তাকে অনুসরণ করল না। কিছু বললও না। ওপরে উঠে নিরু ঘুরল। বলল, দেখবে না?

এবার ইন্দ্র হাসতে হাসতে উঠল। আমি ভাবলাম, তুমি আমার কথা শুনে রাগ করে চলে যাচ্ছ।

আশ্রমে খোলকত্তালের উদ্দাম বাজনার সঙ্গে জোরালো গলায় কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বেড়ার ধারে একফালি পায়ে চলা পথে ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। আশ্রম পেরিয়ে আগাছার জঙ্গলের রাস্তায় পৌঁছে নিরু হঠাৎ বলল, তুমি সুরিন ড্রাইভারের মেয়ের প্রেমে পড়েছ। তাই না ইন্দ্র?

ইন্দ্র আনমনে হাঁটছিল। আনমনেই বলল, তুমি একথাটা অনেকদিন ধরে বলছ কিন্তু!

বলছি। দেখছি, তাই।

আমি শশাংক নই, নিরু।

তফাত বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্র মনে মনে রুষ্ট হয়ে বলল, ছেড়ে দাও! সে তুমি বুঝবে না।

নিরু দাঁড়িয়ে গেল। তুমি বুঝিয়ে বললে কেন বুঝব না ইন্দ্র?

বুঝবে!

তুমি বলো।

ইন্দ্র পা বাড়িয়ে বলল, তুমি দুঃখ পাবে হয়তো। তোমার কষ্ট হবে।

না। নিরু শক্ত গলায় ফের বলল, হবে না। তুমি বলো।

জেল থেকে ফেরার পর কেন কে জানে.... ইন্দ্র শ্বাস ফেলে বলল, কেন জানি না, ইনোসেন্স ব্যাপারটা আমাকে এত টানে নিরু! ভীষণ অবাক হয়ে যাই কোথাও ইনোসেন্স দেখতে পেলে। ওই মেয়েটা—কমিলা! এসেই ওকে দেখলাম, কতো বড় হয়ে উঠেছে। দেখে গেছি, ফ্রকপরা একরত্তি মেয়ে। এবার দেখলাম, 'সবুজ ঘাসের ওপর আশ্চর্য ঝলমলে একটা ফুলের মতো।' বলোতো কার লেখা এই লাইনটা?

স্নেহাকরের।

হ্যাঁ, স্নেহাকরের। এই পদ্যটা আমাকে শুনিয়েছিল। আমি তখন কিচ্ছু বুঝি না। এখনও পদ্য বুঝিনা। কিন্তু ওই লাইনটা বুঝি। ওটা ইনোসেন্স। আমার ইচ্ছে করে, কোথাও ইনোসেন্স থাক মানুষের জীবনে। মুগ্ধচোখে দেখি, উপভোগ করি। চারপাশে যখন এত কালো দাগ খাপচা-খাপচা ছড়ানো, তার মধ্যে একটু সাদা ফাঁকা জায়গা।

ইন্দ্র একটু হেসে ফের বলল, পুটুদার সংসর্গে একটু-একটু করে ওর ছবি চিনতে শিখেছি। ওর ছবির মধ্যে নাকি এসব কথা থাকে। কিন্তু আমার—ওই যে বললাম, হঠাৎ কোথাও এতটুকু ভাল জিনিস—মানে ওই ইনোসেন্স .....

ইন্দ্র থেমে গেল হঠাৎ। নিরু বলল, চুপ।

কারা যাচ্ছিল দল বেঁধে। তাদের পাশ দিয়ে তাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। তারপর নিরু বলল, বুঝেছি।

বুঝেছ?

হুঁউ। আমি তো কম বয়সে নষ্ট হয়ে যাওয়া মেয়ে, ইন্দ্র!

ছিঃ নিরু! আমি এমন করে কিছু বলিনি। তাছাড়া তোমার ব্যাপারটা ওভাবে আমি দেখি না।

কিভাবে দেখ?

রাগ করো না নিরু! আমি জানি, তুমি মাস্টারমশাইয়ের কড়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলে—খুব কম বয়স থেকেই। তুমি তাই একই সঙ্গে কুমু, স্নেহাকর আর আমার—এমন কী ঐ গাড়োল শশাংকের সঙ্গেও চুপি চুপি মেলামেশা করতে। কিন্তু আমি তোমাকে সেভাবে কখনও চাইনি, তুমি ভালই জানো। একবার মুক্তকেশীর মন্দিরের পেছনে কল্কেফুলের জঙ্গলে ঢুকে তুমি আমাকে ....

নিরু ওর দিকে ঘুরে ধমকের সুরে বলল, চুপ করো তো!

নির্জন রাস্তায় চকরাবকরা ছায়া। গাছপালার গায়ে কুয়াশার নীল জামা। সদর দরজার তালা খুলে নিরু একটু হাসল। ... মা যদি টের পায়, আমি তালাচাবির এই সব সদ্‌গতি করছি, আর চাবি পাব না। শোনো ডাইরিটা আমি নিয়ে আসছি। তুমি অন্য সময় পড়বে।

ইন্দ্র বলল, ঠিক আছে। এখানেই থাকছি। তুমি নিয়ে এস।.....

নিরুকে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফিরল ইন্দ্র। তখনও হরিশংকর বাড়ি ফেরেনি। শ্যামলী বারান্দায় বসে ট্রানজিস্টারে গান শুনছিল। ইন্দ্রকে দেখে আওয়াজ কমিয়ে বলল, কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ? পুটু খুঁজছিল তোকে। টাউনে স্টুডিও খুলছে বলল। তোকে ওর সঙ্গে থাকতে হবে। আর সব কী যেন বলল! তুই দেখা করে আয়।

ইন্দ্র হাসল। বাঃ! তাহলে আমারও একটা গতি হবে! কিন্তু আমি কি ছবি আঁকতে জানি নাকি?

শ্যামলী আওয়াজ বাড়িয়ে ফের গানে মন দিল। ইন্দ্র তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শুভর সঙ্গে থাকাটা মন্দ নয়। সাইনবোর্ডে ধ্যাবড়া করে রঙ বুলোতে অন্তত পারবে ইন্দ্র! সে তাক থেকে মোম খুঁজে নিয়ে জ্বালাল। কালো ডাইরি বইটা কিছুক্ষণ হাতে ধরে রাখল। মনটা খুশি-খুশি লাগছে। সে বুঝতে পারছে না কেন—কিসের জন্য এই মনের ভাব হাল্কা হয়ে ওঠা আনন্দ তাকে পেয়ে বসেছে! এমন সময় আনুমাস্টারের ডাইরিটা পড়া উচিত হবে কি?

দ্বিধা নিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। কতক্ষণ চোখ বুজে সিগারেট টানার পর চোখ খুলে দেখল, ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। জানালা খুলে দিল। তারপর ডাইরিটা খুলল।

অনেক কাল আগের এই ডাইরির পাতার রঙ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার ওপর টুকরো টুকরো কিছু বাক্য ডট পেনে লেখা। জায়গায় জায়গায় অস্পষ্ট। ....

.... সারাজীবন এরকম হচ্ছে। আমি চাইছি যা, তার উল্টো হয়ে যাচ্ছে। কেন? আমি ভাগ্যফল মানি না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, এর পেছনে যেন কার কারচুপি আছে। কে সে? তাকে সামনে পেলে দেখে নিতাম।'

'....সুচরিতাকেও আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সেই অদৃশ্য পেছনের চক্রান্তকারী। আমি একা হয়ে গেলাম। বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এ কি আমারই ব্যর্থতা?.... প্রবল সন্দেহ। এই সাধু পূর্বাশ্রমে সুচরিতার খুব আপনজন ছিল। ..... এ বয়সে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবী উচ্ছন্নে যাক।'

ইন্দ্র ডাইরির পরের পাতা ওল্টালো। আবার এক টুকরো লেখা।

'.... নিরুর সঙ্গে স্নেহাকরের বিয়ে দিলে কত ভাল হত। কিন্তু ভয় হচ্ছে, স্নেহাকর নিরুকে সামলাতে পারবে না। নিরু বড় দুরন্ত। ও কারুর শাসন মানবার পাত্রী নয়। দেখা যাক। দুটিতে বড় হয়ে উঠুক।'

'নিরুকে আজ উঠোনের পেয়ারাগাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম। ওর মা এসে ছাড়িয়ে দিল। আমারই কষ্ট হচ্ছিল। নিরুও আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ কী ব্যর্থতা!'

পরের পাতায় :

'....স্নেহাকরকে খুব ভাল ছেলে মনে করতাম। ওর ভাবগতিক ভাল মনে হচ্ছে না। ওকে আশ্রয় দিয়েছি। ওকে মানুষ করতে চাইছি। কিন্তু ওর মন অন্য কোথাও বাঁধা আছে। ও পদ্য লেখে। কিন্তু এই বল্‌গাছাড়া মানসিকতার পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে। কী সেটা? খুঁজে দেখতেই হবে।'

পরের পাতায় :

'....নিরুর জ্বর বলে স্কুলে যায়নি আজ। স্কুলে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে আবিষ্কার করলাম স্নেহাকর নেই। অথচ সে স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছিল। মুক্তকেশী মন্দিরের পেছনের জঙ্গলে ওদের একটা আড্ডা আছে জানি। সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, মাথা ঘুরে গেল। নিরু আর স্নেহাকর বসে আছে। স্নেহাকর সিগারেট দিল নিরুকে। নিরু টানতে লাগল। দেখে চুপিচুপি সরে এলাম। একটা বড় শাস্তি সময় মতো ওদের দিতে হবে।'

পরের পাতায় স্নেহাকর ও নিরুর এমনি সব টুকরো ঘটনা। ইন্দ্র পাতা ওল্টাতে থাকলো। স্কুল জীবনের অনেক ছোটখাট ঘটনাও লিখে রেখেছেন আনুমাস্টার। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একখানে চোখ পড়ল ইন্দ্রের।

'..... কাল দুপুরে স্নেহাকরকে বললাম, তোমার কলেজের মাইনে বাকি পড়েছে শুনলাম! আমার কাছে নিয়ে যেও। স্নেহাকর বলল, ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই! আপনি অনেক দিয়েছেন। আর কেন? ও আমি ম্যানেজ করে নেব। ভাববেন না। ও চলে গেলে আমার খুব রাগ হল। পাটোয়ারিজির গদিতে গিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলাম। স্নেহাকরের আত্মমর্যাদায় লেগেছে। সেটা ভালই। কিন্তু ও তো জানে নিরুকে ওকেই গ্রহণ করতে হবে। শ্বশুরের টাকায় কি কেউ লেখাপড়া শেখে না এদেশে? রাজেনকে বুঝিয়ে বলতে হবে।'

আরো কয়েক পাতা পড়ার পর ইন্দ্র বুঝল, ভেতরে-ভেতরে আনুমাস্টার স্নেহাকরকে জামাই করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। রাজেন কন্ডাক্টারের আপত্তি ছিল না। কিন্তু স্নেহাকর বেঁকে বসছিল ক্রমশ।

আবার একখানে দৃষ্টি আটকে গেল ইন্দ্রের। চমকে উঠল।

'.... যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই হল। নির্বোধ মেয়েটার সর্বনাশ করেছে শুওরের বাচ্চা। অথচ আশ্চর্য, সুচরিতা কী নির্বিকার! মেয়েকে নির্লিপ্ত মুখে ওপারে কোথায় নিয়ে গেল। আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম বাড়িতে। সন্ধ্যায় ফিরে সুচরিতা বলল, নিরুকে একমাসের জন্য নৈহাটীতে রেখে আসব। তুমি যেন হৈ চৈ বাধিও না। আমি বললাম, যা ভাল বোঝো, করো। আমি আর সাতে পাঁচে নেই।'

ইন্দ্রের মনে পড়ছিল, আগের বছর পুজোর সময় মাসখানেক নিরুকে দেখতে পায়নি বটে। ডাইরিতে আর তার চোখ রাখতে ইচ্ছে করছিল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানার পর আনমনে সে একটা পাতা ওল্টাল।

'.... কালীপুজোর দিন স্নেহাকরকে ধরেছিলাম। অনেকদিন সে আমার চোখের আড়ালে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল! বলল, ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই! আপনার মেয়ের সর্বনাশ আমি করিনি। অন্য কেউ করেছে। তখন আমি ওকে চার্জ করলাম, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। স্নেহাকরের কী স্পর্ধা! বলল, তাহলে হাতেনাতে ধরেননি কেন? আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। নিরু আমার মেয়ে! মেয়ের বাবা হয়ে, ছিঃ!'

'....কালীপুজোর মেলায় আজ বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। একখানে দেখি, ছুরি বল্লম এসব বিক্রি করছে। হঠাৎ খেয়াল গেল, একটা ছোরা কিনে ফেললাম। ছোরাটা ভারি সুন্দর মনে হচ্ছিল। বাড়ি ফিরে দেখি, নিরু চুপচাপ একা বসে আছে। ওর শরীরটা এতদিনে সেরেছে। ওকে একা বসে থাকতে দেখে চোখ ফেটে জল এল। নিজের ওপর রাগ হল তখন। আমি না শক্ত মানুষ! বললাম, নিরু! এই ড্যাগারটা কিনলাম মেলায়। কেমন সুন্দর না? নিরু দেখে বলল, ড্যাগার কী হবে? বললাম, তোর জন্য। নিরু অবাক হয়ে গেল। কিন্তু ও কিছু বোঝবার আগে ওটা দ্রুত ঘরে নিয়ে গেলাম।'

পরের পাতায় :

'.... কেন বেঁচে আছি? নিজের শক্তির বড়াই আর আমার সাজে না। ড্যাগারটা আমাকে খালি তাতাচ্ছে ভেতর-ভেতর। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে ওটা বের করে দেখি। ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝতে পারি, আড়ালের চক্রান্তকারীকে টিট করার শক্তি আমার আছে। অথচ তারপর ক্লান্তি আসে। মনে হয়, কেন বেঁচে থাকা আর? নিজের যে শক্তি আমি ব্যবহার করতে পারছি না, কেন তাকে দেখে বৃথা উত্তেজনা? নাঃ, আমার দ্বারা কিছুই হবে না।'

পরের পাতায় :

'আজ বিকেলে স্কুল থেকে বেরিয়ে কী খেয়াল হল, ইটখোলার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল, দূরে একটা ঢিবির ওপর ঝোপের আড়ালে কারা বসে আছে—একজন মেয়ে। সন্দেহক্রমে চুপিচুপি এগিয়ে গিয়ে দেখি, অবিশ্বাস্য! আবার স্নেহাকরের সঙ্গে মিশছে নিরু! নির্লজ্জ মেয়ে! আমারই শরীরের এক দুষ্টব্রণ। সঙ্গে ড্যাগারটা যদি থাকত! আফসোস করতে করতে পিছু হটে এলাম। একটা প্ল্যানিং দরকার।

ইন্দ্র ডাইরিটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। আনুমাস্টারের পরিকল্পনা যেভাবেই হোক, একটু বদলে গিয়েছিল। ড্যাগারের প্রথম বলি হল স্নেহাকর। কিন্তু এরপর কি নিরুকেও খুন করবেন বলে সেই রক্তাক্ত ড্যাগার লুকিয়ে রেখেছিলেন আনুমাস্টার?

ইন্দ্র শিউরে উঠল। নিরুর জন্য তার কষ্ট হচ্ছিল। ইন্দ্র দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। শ্যামলী ট্রানজিস্টারে মগ্ন।

ইন্দ্র আশ্রমের দিকে চলতে লাগল। আশ্রমে ঢুকে নিরুর কাছাকাছি বসে সে আজ রাতে কিছু ধর্মসঙ্গীত শুনবে।......

কামনার সুখদুঃখ

সেই একদিন আর আজ।

তেমনি ধূলিধূসর রাস্তা, রুক্ষ মাঠ, উন্মাদ ঝাঁঝাল বাতাস আর আকাশের বিশালতার সামনে নিজেকে তুচ্ছ লাগছে। তেমনি ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকাল। যখন জিভ শুকিয়ে খড়ের মতো লাগে, বুকে খিল ধরে যায়, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। বারবার জল খেলেও গলার জ্বালা একটুও কমে না।

সব অবিকল তাই আছে। অন্তত তার মনে হচ্ছিল, বাইরে-বাইরে সবকিছু সেদিনের মতোই অবিকৃত। সেদিনও এই রাঙামাটির কাঁচা রাস্তাটার দুপাশে ছিল নিশিন্দা গাছের ঝোপঝাড। দূর মাঠে দাঁড়িয়েছিল ওই বাজপড়া নেড়া তালগাছটাও। চারপাশের দিগন্তে মিশে থাকা অচেনা গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সেদিনও মনে হয়েছিল—তাহলে চারদিকে মানুষভরা পৃথিবীটা এখনও রয়েছে; নির্জনতায় নির্বাসন নয়—সামনে মানুষ আছে।

কিন্তু সেদিন সে আজকের মতো একা চলছিল না এ রাস্তায়। ছ্যাকড়া গরুর গাড়িটা তাকে বয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিল পাশে-পাশে। গাড়িতে ছিলেন তার বাবা আর মা। উৎকৃষ্ট গরমে মায়ের অসুখটা এই ভয়ঙ্কর মাঠের মাঝামাঝি এসে হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়েছিল। বাবা ছইয়ের সামনে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। বাবার ওই স্বভাব। কথা বলতে থাকলে বাবা সবকিছু ভুলে যান। তাই পিছনে তাঁর রুগ্‌ণা স্ত্রীর দিকে খেয়াল ছিল না। তার ফলে ...

অবশ্য খেলায় থাকলেও কি কিছু লাভ হত? মা কি বাঁচতেন? মোটেও না। তাঁর সময় হয়ে এসেছিল, তিনি বুঝতে পারেননি।.. উঁহু, হয়তো বুঝেছিলেন। তা না হলে আগের দিন বিকেলে যখন সব বাঁধাছাঁদা হচ্ছিল, তিনি স্বামীকে কেন জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর? কেন তিনি তার আগেও অনেকবার স্বামীর আপত্তিতে কান দেননি? ও-ঘর থেকে সে শুনেছিল, মা কেঁদে কেটে বলছেন—কোনদিন কোন একটা রাত্তিরও কি আমি তোমার পাশটি ছাড়া শুয়েছি? বল, কখনও পরস্পর দূরে থেকেছি আমরা? এ আমার ইচ্ছে, মরার সময় তোমার কোলে মাথা রেখে যেন মরতে পারি। ওগো দোহাই তোমার, এ ইচ্ছেয় বাদ সেধো না! তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে রেখে তুমি যেও না।

বাবা বিরক্ত হয়েছিল। তাঁর আপত্তির যুক্তি ছিল। রাহুলের ফাইনাল পরীক্ষা তখন সামনে। ওই নতুন জায়গায় গেলে পড়াশুনার গোলমাল হবে—শুধু তা নয়, ওই নতুন পাণ্ডববর্জিত দুর্গম এলাকায় আদতে কোন হাইস্কুল নেই। কাজেই রাহুলের কী হবে? তুমি গেলে, ও থাকবে কোথায়? খাবে কার কাছে? ওর কেরিয়ারটা তুমি মা হয়ে নষ্ট করতে চাও?

মা তবু শোনেননি। আজ ভাবতে অবাক লাগে, মায়ের মাথায় সেদিন কি দারুণ জেদ চেপেছিল স্বামীর সঙ্গে থাকার। বাবা ও রাহুল দুজনেই ভেবেছিল, অনেকদিন অসুখে ভুগে মায়ের মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। গতিক দেখে রাহুল সব মিটিয়ে ফেলল। সে বলেছিল, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। সে দিব্যি রাঁধতে পারবে। ও অভ্যাস তো তার আছেই। গরীব সংসারে রাঁধুনী রাখবারও ক্ষমতা নেই। বাবা সামান্য প্রাইমারি শিক্ষক—কাজেই দুবেলা একগুচ্ছের টিউশানি না করলে চলেই না। হয়তো চলত কোনরকমে। কিন্তু মায়ের অসুখের ওষুধ-বিষুধ, রাহুলের পড়ার খরচ। —এত সব চালাতে একজন প্রাইমারি শিক্ষকের মাইনেতে কুলোয় না। যাই হোক, শেষ অব্দি দেখা গেল জেদটা

মায়ের চেয়ে রাহুলেরই বেশি। মা বাবার সঙ্গে চলুন, সে একাই থাকবে। আর তাই শুনে মা ছলছল চোখে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা পাবে বাবা। যদি মন খারাপ করে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে এসো। ছুটি পেলে উনিও আসবেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে যাত্রা হবে সুরু। হঠাৎ মা বলেছিলেন, বরং ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক না গো! কী বলো তুমি? জায়গাটা ওর চেনা হবে। তাছাড়া ...

বাকি কথাটা বলেননি মা। তাছাড়া আর কী হবে, জানতেও চায়নি বাবা আর ছেলে। আজ মনে হচ্ছে, কথাটা অনুমান করা উচিত ছিল। আজ মায়ের সেই অনুক্ত কথাটা টের পাচ্ছে রাহুল। মা জানতে পেরেছিলেন, হয়তো পথের মাঝেই মরণ এসে হাত ধরে বলবে, চলো। তাই যেমন স্বামীর সঙ্গ ছাড়তে চাননি, তেমনি ছেলেকেও শেষ মুহূর্তে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলেছিলেন।

এই জায়গাটাতেই কি? বাবা দূরের দিকে তাকাতে তাকাতে বলেছিলেন, কি ভয়ঙ্কর তেপান্তর মাঠ রে বাবা! মনে হচ্ছে যেন নির্বাসনে চলেছি জনমানুষহীন কোন দেশে। রাহুল, তুমি কি বলো? মনে হচ্ছে না তোমার?

রাহুল তখন কী ভাবছিল, মনে পড়ে না আজ। বাবার পরের কথাটা আজও কিন্তু ভোলেনি। কারণ, কথাটা ছিল বেশ তাৎপর্যময়। বাবা পরক্ষণে বলেছিলেন, দ্যাখো, যেখানেই যাও—যত রাগ করে তুমি যত দূরেই যাও, মানুষকে ফেলে কোথাও হয়তো যাওয়া যায় না। আর গেলেও মানুষের ওপর রাগটা আর থাকে না। তখন মানুষকেই মনে হয় একমাত্র আশ্রয়। কোন গাছ নয়, পাহাড়ের গুহা নয়—মানুষই মানুষের অন্তিম আশ্রয়। ..... তারপর একটুখানি চুপ করে থেকে বলেছিলেন, মানুষের কাছে সারাজিবন অনেক দুঃখ পেয়েছি, রাহুল। মানুষ নামটা সময়ে-সময়ে আমায় প্রচণ্ড ঘেন্না ধরিয়ে দিয়েছে। মানুষের কাছে প্রবঞ্চনা আর আঘাতের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে যেয়েই তো আজ, দূরে পালিয়ে যাচ্ছি—অথচ রাহুল, দ্যাখো যাচ্ছি কোথায়? না—মানুষেরই কাছে।

বাবা অস্ফুট হেসেছিলেন। ফের বলেছিলেন, অথচ এমন যদি হত যে এই রাস্তাটার শেষে কোন জনপদ নেই, তাহলে? এই কথাটাই ভাবছিলাম, রাহুল। চারদিকটা দ্যাখো—ধু-ধু দিগন্তজোড়া প্রান্তর বললেই চলে। কোথাও জল নেই এ গ্রীষ্মে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ নিজেকে এখানে দেখে ভয়ে বুক টিপ-টিপ করে ওঠে। কিন্তু দূরে ওই ধোঁয়াটে গ্রামগুলোর দিকে তাকালে মনে জোর বাড়ে। বুঝতে পারা যায়, ওখানে আশ্রয় আছে আমার। কারণ মানুষ আছে।.....

আজ দশবছর পরে সেই একই রাস্তায় হাঁটছে রাহুল। সময়টাও গ্রীষ্ম। সেই দিনের মতো আজও এখানে নিজেকে দেখে সন্ত্রাসে বুক কেঁপে ওঠে, পরক্ষণে দূরের জনপদরেখা লক্ষ্য করে মনে জোর যায় বেড়ে।

আজ সে একা। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটা সাইকেল যোগাড় করে নিলেও পারত সে—কিন্তু ফেরাটা অনিশ্চিত বলে কারো কাছে সাইকেল চেয়ে নেয়নি। ধুলোয় ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে কাবুলি চপ্পল, প্যান্টটাও হাঁটু অব্দি রেঙে গেছে। কাঁধে ঝোলা আর হ্যাভারস্যাক। হ্যাভারস্যাকটা বুদ্ধি করেই সে চেয়ে এনেছে এক বন্ধুর কাছে। বন্ধুটি বলেছে, বরং তোকে ওটা প্রেজেন্ট করলুম, রাহুল। বড়দা সেকেন্ড গ্রেটওয়ারে মিলিটারিতে চাকরি করতেন—সেই আমলের জিনিস। খাঁটি বিলিতি। আজকাল এমন জিনিস আর কোথাও পাবি না।

হ্যাভারস্যাকের জল বুঝি শেষ হয়ে এল। রাঢ়বাংলার এই এলাকাটার ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ তার জানা। এই গ্রীষ্মের দিনে এদিকে পা বাড়ালে সঙ্গে জল ছাড়া চলে না, এ আগেরবারই টের পেয়েছিল। শুধু একটা ব্যাপারে এখন তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রোদ! দারুণ ঝাঁঝাল গনগনে রোদ! বাতাস বইছে উদ্দাম হু হু। কিন্তু বাতাসে রোদের তাপ প্রচণ্ড। আর ঘাম হচ্ছে না গায়ে। ফোস্কা পড়ছে খোলা জায়গাগুলোয়। গলার চামড়ায় নুন জমে রয়েছে। মাথায় চাপানো ময়লা লুঙিটা আর উত্তাপ থেকে রক্ষা করতে পারছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ তার হৃদপিণ্ড ধুক-ধুক করে উঠছে—সে পৌঁছতে পারবে তো? পথে যদি হঠাৎ তার মায়ের মতো—

থমকে দাঁড়াল রাহুল। সে জায়গাটা আর কতদূরে, যেখানে বাবা কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুরে

স্ত্রীকে মৃতা আবিষ্কার করেছিলেন। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, রমা রমা! রাহুল, তোর মা হয়তো নেই।

বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তার ধারে কোন গাছ নেই—ছিল না। কিন্তু দূরের ধূসর গ্রাম রেখাটা চেনা যাচ্ছে। ওখানেই একটা ছোট্ট নদী আছে। সেই নদীর ধারেই অবশেষে দাহ হয়েছিল মায়ের। গ্রামের লোকগুলো ছিল অন্ত্যজ শ্রেণীর—চাষাভূষো-বাগদী-কুনাই তারা। খুবই গরিব। তাদের কাছেই জানা গিয়েছিল, পরের গ্রামটাও তাদের মতো ছোটলোক-টোটলোক গরিব মানুষের বসতি। রুক্ষ শুকনো পাথুরে মাটি, ফসল ফলে খুব সামান্যই। আর সম্বল বলতে ওই সরু নদীটা। বর্ষার পর দুটো মাস তারই দানে ওরা বেঁচে থাকে। বাবু ভদ্রলোক-বড়লোকের গ্রাম বলতে ওখান থেকে আর ছ মাইল দূরে সেই ময়নাচক। গরুর গাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যাবে। রাস্তাঘাট তো ভালো নয় মোটে।

তখন বাবা এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। বললেন, রাহুল, বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। বুঝতে পারছ তো অবস্থাটা? এরা যদি এখানে সাহায্য করে, তাহলে নদীর ধারেই তোমার মাকে—

রাহুলের ইচ্ছে করছিল, সে লাফিয়ে বাবার ঠোঁটদুটো চেপে ধরে। তার শুকনো ক্লান্ত বুকটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। কেন আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারছেন না বাবা? মায়ের মৃতদেহটা কি এত ভারি হয়ে উঠেছে? নাকি স্ত্রীর প্রতি তাঁর উত্তাল ভালবাসাই তাঁকে মৃত স্ত্রীর সঙ্গবাসে অস্থির করে ফেলেছে?

তখন তার বয়স সত্যি কম। আজ দশবছরে সে অনেক দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে এ পৃথিবীকে। মানুষ ও তার সমাজের সব সত্যই সে টের পেয়েছে। তাই তার আজ এ পথে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু সেদিন কিছু তলিয়ে বোঝেনি।

তার শুধু মনে হয়েছিল যে বাবার এ আচরণে কিছু উৎকট ধরনের অসঙ্গতি রয়ে গেছে। এ যেন চুপি চুপি কাকেও খুন করে পালিয়ে যাওয়া! বাবা শাস্ত্র-টাস্ত্র আচার-বিচার মানবার মতো মানুষ নন সেটা ঠিকই। বরং, হয়তো বা সারা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই মানুষ সম্পর্কে সংশয়ী শুধু নয়, ঈশ্বরেও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের নাস্তিক্যের বিষয়ে বাবার খুব গর্বও রয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আস্থাও ভারি দৃঢ়। তাঁকে রাহুলের যুক্তিবাদী মানুষ বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও কোন মানুষের পক্ষে ওই আচরণ কি সম্ভব ছিল? অন্য কেউ নয়—নিজের স্ত্রী! স্ত্রীর মৃতদেহ।

সেই ছোট্ট গাঁয়ের গরিব লোকগুলো ভারি সরল আর উৎসাহী। তাদের পরোপকারী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে অবাক হয়েছিল রাহুল। নদীর ধারে তাদের নির্দিষ্ট শ্মশানেই দাহ করা হল মাকে । বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন ময়নাচকে পৌঁছতে। রাত দুপুর হয়েছিল। তখন আরেক সমস্যা। কেই বা ভবানীবাবুর বাড়ি দেখিয়ে দেবে তখন? সারা গ্রাম নিঃঝুম ঘুমন্ত।.......

সেদিন তো ভুলে গিয়েছিল মায়ের মুখে শোনা প্রশ্নটা—ওখান থেকে গঙ্গা কতদূর গো? বাবাও কি ভুলে গিয়েছিলেন?

এই মুহূর্তে মায়ের প্রশ্নটা তীব্র হয়ে বাজছে কানের কাছে। যত হাঁটছে, তার মনে হচ্ছে, গঙ্গা কতদূর? আঃ, গ্রীষ্মের দুরন্ত দহন-জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু মা হয়তো গঙ্গার কথাটা ভাবছিলেন। গঙ্গা! স্নিগ্ধ-সুন্দর কালোজলের অপ্রমেয় শান্তি—সে নদী হয়ে বয়ে চলেছে। তাদের গ্রামের নিচেই বয়ে যাচ্ছে সে। তাকে ফেলে স্বামীর সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল মাকে। কেন? .... তবে এ প্রশ্ন এখন থাক। রহস্যের কিছু জানা হয়তো যাবে না। কিন্তু শুধু ভাবতে হাত দুটো মুঠো হয়ে যাচ্ছে রাহুলের, মা মৃত্যুর মুহূর্তে—চেতনা ফুরিয়ে যেতে যেতে হয়তো চোখের সামনে দেখেছিলেন স্বপ্নের মধ্যে শান্তির প্রতিমা প্রবাহিনী গঙ্গাকেই। আর কাকেও নয়— না স্বামীকে, না ছেলেকে।

গঙ্গা! ...... হঠাৎ আরেকটা দৃশ্য ভেসে এল রাহুলের সামনে। ভেসে এল আরেক গঙ্গা। ময়নাচকের ভবানীবাবুর মেয়ে গঙ্গা।

কী আশ্চর্য! গঙ্গার কথা তো আসবার সময় মনেও ছিল না। সারা পথও মনে পড়েনি তাকে। সে কি এখনও ওখানে আছে, নাকি অন্য কোথাও গেছে? থাকা তো উচিতই—অল্পবয়সে বিধবা হয়েছে যে, মোটামুটি বড়লোকের ঘরের মেয়ে—যাবে আর কোথায়? ওই সব গ্রামে বিধবা বিয়ের সম্ভাবনাও আশা করা বৃথা। সে ঠিকই আছে। আর এই দশটা বছরের পর সে আরও বড় হয়েছে। আরও বুদ্ধিমতী

হয়েছে। সে চঞ্চল ছটফটে স্বভাবটাও নিশ্চয় এখন নেই। রাহুল অনুমান করেছিল, তখন তার বয়স বড়জোর ষোল—তার নিজের বয়সী। এখন তাহলে সে ছাব্বিশ। পূর্ণ যুবতী গঙ্গাকে সে দেখে কি আজ খুবই খুশি হবে সেবারের মতো?

নিজের মনের মুখোমুখি হল রাহুল। সত্যিকার প্রেম-ভালবাসা যা পুরুষ ও মেয়ের জীবনে একটা সময়ে ভারি জরুরী, যা যৌবনের বিশাল অগ্নিকুণ্ডে স্বতক্রিয় হাপরেব মতো বাতাস জোগায়—তা কি গঙ্গা ও রাহুলের মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেদিন? সমবয়সী দুজন কিশোর-কিশোরী ছিল তারা। ঐ সময়টা মোটেও অনুকূল ছিল না প্রেম-ভালবাসার পক্ষে। অথচ কী একটা ঘটে গিয়েছিল। একটা নিষ্ঠুর টান যেন দুজনকে বারবার কাছাকাছি হতে বাধ্য করেছিল। আর টের পাওয়া যাচ্ছে যে সেটা ছিল নিছক প্রকৃতির ষড়যন্ত্র। সেটা ছিল ভীতু বোকা-বোকা আড়ষ্ট যৌনতা মাত্র। সুযোগ যদিও বা ছিল নিরঙ্কুশ, তাকে কেউ চমৎকারভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ঘন্টার পর ঘণ্টা সেই ঘরে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও কেউ এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর টানটা ছিল গঙ্গারই বেশি। সে উত্ত্যক্ত করে মারত রাহুলকে। নখে আঁচড়াত। কামড়াত। রাহুলের মতো ছেলেকেও সে ভয় পাইয়ে দিতে পারত।

কিন্তু একটা পাপবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলত রাহুলকে। হ্যাঁ—মাত্র রাহুলকেই। গঙ্গা যেন কিছুই পরোয়া করে না। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। মা নেই। ছেলেবেলায় মারা গেছে। তার মা মারা যাবার আগেই —গঙ্গার বয়স তখন সাত, রোগশয্যায় শুয়ে মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে চেয়েছিল। কীর্তিচকের উকিল সত্যনারায়ণ বাবুর স্ত্রী ছিল গঙ্গার মায়ের সই—একই গাঁয়ের মেয়ে ছিল তারা। ছেলেবেলাতেই একঘড়া গঙ্গাজল ছুঁয়ে দুই সই দিব্যি করেছিল যে যদি তাদের ছেলেমেয়ে হয়, তাদের বিয়ে দেবে, আর যদি দুজনেরই ছেলে বা মেয়ে হয়—তাদের মধ্যে বন্ধুতা থাকবে। গঙ্গাকে বুঝতে পারলে তার মাকেও নাকি বোঝা যায়। জেদী বেপরোয়া একরোখা মেয়ে ছিল গঙ্গাব মা। আর গঙ্গা ফিক করে হেসে চাপাস্বরে বলেছিল, এই, জানো? আমার বাবা স্ত্রৈণ। রাহুল বলেছিল, স্ত্রৈণ মানে? গঙ্গা অবাক! সে কি গো! তুমি স্ত্রৈণ মানে জানো না? তুমি না উঁচু ক্লাশে পড়ো! হুঃ, আমি তো সেই পাঠশালা বাদে আর যা পড়েছি, তা বাড়িতে মাষ্টারের কাছে—আমি কথাটার মানে জানি, তুমি জানো না?.... রাহুল লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল। আর, আর একদিন কী কথায় গঙ্গা হঠাৎ তাকে বলে ফেলেছিল, এই! তুমি বড্ড স্ত্রৈণ। তখন থেকে বলছি—আমার আজ কিচ্ছু ভাল লাগে না, তবু তুমি সঙ্গ ছাড়ছ না!....রাহুল শুধু লজ্জা নয়—রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে চলে এসেছিল। গঙ্গা হঠাৎ অকারণ এমনি করে বসত তাকে। গঙ্গার যেন কোন দুঃখ নেই। কোন হতাশা নেই। সে নির্বিকার। সে জানত, আব তার বিয়ে হবে না। কোন পুরুষকে সে এ জীবনে পাশে পাবে না। তবু তার কোন ভাবনা নেই।

একমাস মাত্র রাহুল ওখানে ছিল। তারপর তাকে চলে আসতে হয়েছিল। আসবার সময় গঙ্গা তাকে বলেছিল, আবার এসো কিন্তু? আসবে তো? আমার বড্ড খারাপ লাগছে। ছাই, কেন যে তোমাব সঙ্গে মিশেছিলুম! আর শোন, চিঠি-টিঠি লিখো না কিন্তু। আমি বিধবা। ঢি ঢি পড়ে যাবে চাদ্দিকে।

রাহুল বলেছিল, লিখবো না।

হঠাৎ গঙ্গা তার হাত ধরে বলেছিল, তুমি তো কিছু বলছ না?

কী বলব?

আমাকে তোমার কেমন লাগল, শুনি? ভাল, না মন্দ? তেতো না মিষ্টি?

রাহুল একটু হেসে বলেছিল, উঁহু বড্ড ঝাল!

শুনে গঙ্গার সে কী হাসি! .... ও মা গো! আমি ঝাল! কিসের ঝাল শুনি! ধানী লঙ্কার তো! গলা বুক জ্বালা করছে বুঝি!

হাসতে হাসতে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। একটু পরে তার মুখের রঙ বদলে যেতে দেখেছিল রাহুল। গঙ্গা বলেছিল, তুমি বড্ড কম কথা বলো। যাক্ গে, শোন। আমি আবার খুব একলা হয়ে গেলুম।.... আচ্ছা, এসো। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে চলে গিয়েছিল। বাবার নতুন বাসা—একতালা পুরনো ঘরের বারান্দায় উঁকি মেরে রাহুল দেখেছিল, গঙ্গা আগাছার জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে হন হন করে চলে যাচ্ছে। বাবা তখন

বাইরে ছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে মাঠের দিকে বেরিয়েছিলেন। বাবার সময় ছিল না, তাকে বিদায় দেবার। বলে গিয়েছিলেন, ঘরের চাবিটা গঙ্গার কাছে রেখে যাস। রাস্তার মাটিকাটার জরীপ আছে কিছু—কাল সন্ধ্যা অব্দি শেষ করা যায়নি। আমি চললুম। কেমন? অসুবিধে হবে না তো?....

গঙ্গাকে চাবিটা দেবে বলে ডেকেছিল, অথচ গঙ্গা হুট করে চলে গেছে। তাই ফের যেতে হয়েছিল তার কাছে। গঙ্গা নির্বিকার মুখে হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়েছিল। আর একটিও কথা বলে নি। সে স্থির মৌন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

তারপর যতদূর গেছে রাহুল, তার মনে হয়েছে গঙ্গা যেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কষ্টটা তখনই এসেছিল মনে। যেন গঙ্গাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে এল সে। সারা জীবন সে দাঁড়িয়ে রইল অমনি করে।

আর এই দুঃখময় অনুভূতিই কি প্রেম? কিন্তু তখন সে কিশোর। দেহের তীব্রতাটা নিয়েই সে ছিল ভাবিত, মনের তীব্রতা সে স্পষ্ট টের পায়নি। গঙ্গা তার অপরিণত ষোলবছরের শরীরে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল—সে জ্বালা শরীর ঘুরে-ঘুরে একদা একসময় নিভে গেল। মন ছিল আরও দূরে—আগুনের নাগালের বাইরে। মনে একটুও আঁচ লাগেনি।........

হ্যাভারস্যাকের ছিপি খুলে ঢকঢক করে জল খেল রাহুল! চোখ দুটো জ্বালা করছে। একটা গগলস থাকলে এত ভালো হত ! সামনে-পিছনে দু'পাশে শস্যহীন ঢেউখেলানো ধুধু মাঠ আগুনে পুড়ে যেন ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এত ক্লান্তি এত কষ্টের বিনিময়ে শুধু কিছু টাকা পাবার আশা আছে বলে এতক্ষণ উৎসাহী ছিল সে। কিন্তু এখন গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেলে সে দেখল, টাকা পাওয়াটা খুবই তুচ্ছ লাগছে। একটু করে চঞ্চলতা তার মধ্যে জেগে উঠছিল। গঙ্গা আছে, গঙ্গা! আজ গিয়ে তাকে দেখবে যুবতী হয়ে উঠেছে। সম্ভবত আরো সুন্দর আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এখনও কি সে তেমনি আছে আর? তেমনি উদ্দাম বেপরোয়া আর দেহের দিকে অতি-সাহসিকা? সে-বয়সে নিজের নারীদেহের গুরুতর পরিণতি নিয়ে গঙ্গা একটুও উদ্বিগ্ন ছিল না যেন। আজ অবশ্যই তার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আজ নিশ্চয় সে জেনেছে যে, তার দুরন্ত মনের তৃষ্ণার কাছে ওই দেহটাই ভীষণ বৈরী। নিজের রক্তমাংসের অস্তিত্ব আজ তার সামনে দিকরোধকারী বিশাল পাহাড়। দুর্গে নিঃসঙ্গ বন্দিনীর মতো তার আজ কালযাপন!

গঙ্গার জন্যে আশ্চর্য সমবেদনায় অভিভূত হল রাহুল। তাকে দেখবার চেষ্টা করল। শ্যামবর্ণা ছিপছিপে অথচ নিটোল শরীর—দুটি টানা উজ্জ্বল চোখ, ডিমালো মুখ। ওর চেহারা দেখে রাহুলের মনে পড়ে যেত ইতিহাস বইতে দেখা অজন্তা গুহাচিত্রের সেই মা ও মেয়ে ভিখারিনীর কথা। গঙ্গার সঙ্গে মায়ের চেহারার আশ্চর্য মিল! রাহুলের রঙটা বেশ ফরসা। গঙ্গা তার হাতে নিজের হাতটা মিশিয়ে বলত, ছ্যাঃ, আমি কী কালো দেখছ? রাহুল সান্ত্বনা দিয়ে বলত, না—তুমি ঠিক কালো নও তো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ওই রঙটাই তো ভালো! আমি যদি তোমার মতো রঙ পেতুম, খুব ভাল লাগত। গঙ্গা বলত, যাও। তোমার শুধু মনরাখা কথা।.....

সেই গঙ্গা! তাকে কেমন করে ভুলে গিয়েছিল রাহুল? আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড, কথাটা তাহলে মিথ্যা নয়।

কিংবা আসলে সেটাও তুচ্ছ—রাহুলের জীবনের পরবর্তী ঘটনাগুলোই এই বিস্মৃতির জন্যে দায়ী।

কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিতে হল। বাবা আর এলেন না, সেই যে গেলেন। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন—কিছু টাকা-পয়সা পাঠাতেন। রাহুল কোন চিঠির জবাব দিত, কোনটার দিত না। সে টের পাচ্ছিল, বাবা যেন আস্তে আস্তে অন্য মানুষ হয়ে উঠছেন। একটা আবছা দূরত্বের স্পর্শ অনুভব করত রাহুল। দুঃখ বা অভিমান? হয়তো পেত—হয়তো পেত না। ততদিনে তার জীবনেও একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। সেই পরিবর্তন একসময় নাটকীয়ভাবে তাকে অন্য চরিত্রের ভূমিকা দিল। এই ভূমিকার সঙ্গে সে এখন একাকার। তার বাইরে নিজের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পেতে কষ্ট হয় মাঝে মাঝে।

বহরমপুরে আজ তার একটা তীব্রধরনের পরিচিতি আছে। কলেজে পড়ার সময় সেই যে নিজের গ্রাম ছেড়ে তাকে এই শহরে যেতে হয়েছিল। তখন থেকে গ্রামের ভিটেটো পোড়ো হয়ে গেছে। বহরমপুরেই বাস করছিল সে। কুখ্যাত নেপাল দাস—নেপো গুণ্ডার ডান হাত হয়ে উঠেছিল রাহুল। সে এক বিচিত্র উত্তেজনায় ভরা জীবন। আজ রাহুল আর সে-রাহুল নয়—কুখ্যাত 'রাহুল' গুণ্ডা। বার দুই ছোটখাটো জেল খেটেছে সে। তার দুর্দান্ত স্বভাব অরও দুর্দান্ত হয়েছে দিনে দিনে। জেল থেকে বেরিয়ে শুনেছিল, তার নেপালদা খুন হয়ে গেছে পুলিশের গুলিতে। বন্ধুরা কেউ জেলে, কেউ ফেরার। সে অসহায় হয়ে পড়ল। দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও। কেউ তাকে আশ্রয় দিতে চাইবে না। অগত্যা গ্রামে ফিরতে চেয়েছিল। একেবারে নিঃস্ব তখন সে। চা খাবার পয়সাও নেই। টাকা-পয়সা যা কিছু ছিল, তা নেপালদার হাতে। ক্লান্ত শরীরে সে যখন ব্রিজ পেরোচ্ছে, হঠাৎ একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে গেল। একটা জিপ যেতে যেতে থেমেছিল তার পাশে। আই. বি.-র বড়কর্তা রাজেনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। রাজেনবাবু তাকে ডেকেছিলেন—রাহুল না?...

ঘটে গেল এই অদ্ভুত যোগাযোগ। রাহুলকে ময়নাচকের পথে পাড়ি দিতে হল। দায়িত্বটা গুরুতর। এর যে কোন পরিণতি ঘটতে পারে। মৃত্যুর যন্ত্রণা কিংবা জীবনের আনন্দ। মাঝামাঝি কোন পরিণতি কল্পনা করা যায় না এ কাজে। রাজেনবাবু বলেছেন, এ তুমিই পারবে। কারণ, আফটার অল—তুমি শিক্ষিত ছেলে, বুদ্ধিমান। তা ছাড়া সেবার ঘেন্টুর স্মাগলিং র‍্যাকেট ভাঙতে যে সাহায্য তুমি করেছিলে, তা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই—এক্ষুনি তৈরি হও। মাইন্ড দ্যাট, কাজ শেষ হলেই তুমি নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছ। তখন একটা ছোটখাট ব্যবসা করে সৎভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব—আই অ্যাসিওর। ....

রাজেনবাবু জানতেন, রাহুলের বাবা ময়নাচকে আছেন। রাহুলের সব ইতিহাসই তাঁর নখদর্পণে। কলেজে পড়ার সময় গুণ্ডামিতে রাহুল রপ্ত হয়ে গেলে বাবা তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন—অবশ্য সেটা চিঠিতেই। বাবার কাছে তার কীর্তিকলাপের খবর কে নিয়মিত পৌঁছে দিত কে জানে! এটাও রহস্যময় ব্যাপার। আজ বাবার কাছেই সে আশ্রয় নেবে। নিতে হবে তাকে। কারণ, কাজটা কতদিনে শেষ করা যাবে—কিছু ঠিক নেই। বাবা তাকে আশ্রয় না দিলে কিন্তু সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। ময়নাচকে সে থাকবে কোন অছিলায়?....

মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রাহুল। বাবা তার আবেকবিহ্বল অপরাধ-ক্ষমা-চাওয়া লম্বা চিঠিটা পেয়েছেন তো? যদি না পেয়ে থাকেন। এইসব অজ পাড়াগাঁয়ে চিঠি পৌঁছতে এখনও অনেক বেশি সময় লেগে যায়। এই এলাকায় সরকারি উন্নয়নের কাজ খুব দ্রুত হয়নি। অশিক্ষিত চাষাভূষো মানুষের সংখ্যাই বেশি। দশ বছর আগে একটা হাইওয়ে বানানো হচ্ছিল। ময়নাচকের ভবানীবাবু তার পাঁচ মাইলের কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন। ভবানীবাবুর সঙ্গে কী সূত্রে পরিচয় ছিল বাবার। তার একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার ছিল। ভাল মাইনে ও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে। বাবা সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে ময়নাচকে চলে গিয়েছিলেন।

রাহুল একটু হেসে ভাবল, চিঠি না পেলেও—বাবা ইজ বাবা। ছেলেকে কি মুখের ওপর তাড়িয়ে দিতে পারবেন? রাহুল তাঁর পা জড়িয়ে ধরবে। কান্নাকাটি করবে। বলবে যে সে জেল থেকে বেরিয়ে পুরো সৎমানুষ হয়ে গেছে। আর পাপের ছায়াটিও মাড়াবে না। বাবা তাকে এবার ইচ্ছেমতো নিজের পথে চালান। তা ছাড়া বাবারও বয়স হয়েছে—একজন দেখাশোনার লোক দরকার। তার মত জোয়ান ছেলে থাকতে বাবার অসুবিধে কিসের! বরং ভবানীবাবুকে বললে একটা কিছু কাজও জুটে যেতে পারে। আর সেইটাই মস্তো সুবিধে। শক্ত প্ল্যাটফরম পাওয়া যাবে পা রাখবার এবং গোপনে কাজ করবার।

অন্যমনস্কতা কেটে গেল রাহুলের। সামনে সেই ছোট নদীটা। একটুও জল নেই। সেদিনের মতো ধুধু বালির চড়া। ওপারে সামান্য দূরে সেই শ্মশানটা। ঝোপঝাড়গুলো পিঙ্গল রঙ ধরেছে। একটা ঘেরাতর রুক্ষতার ছাপ সবখানে। একটুও রস নেই—যেন প্রাণের চিহ্নও নেই কোথাও। এই নিরস

চেয়েছিলুম। ভাবিনি যে ওঁরা তোমাকেই পাঠিয়ে বসবেন।

রাহুল চাপা গলার বলল, আমার এক বছরের কোন কিছু আপনি জানেন না। আমি আর সে-রাহুল নই বাবা। আমাকে আপনি খুলে বলুন সব। কিছু পারি না-পারি—অন্তত সান্ত্বনা থাকবে যে আপনার কিছুটা কাজে লেগেছিলুম। আর সেজন্যে মরতেও আমি পিছ-পা নই!

হৃষিকেশ ঘুরে সোজা হলেন। স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, ওরা যে তোমাকেই পাঠিয়েছেন—সে খবর আমি গতকাল পেলুম। তারপর থেকে খুব অস্থির হয়েছিলুম। যাক্ গে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে বলছি রাহুল, তুমি এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে। আমি আর বাঁচব না। বাঁচতে ইচ্ছে নেই। শুধু ওই বাচ্চাটার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। রাগও হচ্ছে। ভীষণ একটা হঠকারিতায় সব ঘটে গিয়েছিল। তার জন্যে অবশ্য ওর কোন দায়িত্ব নেই—যত দায়িত্ব আমার। ও হয়তো রাস্তার ছেলে হয়ে যাবে। কী করব!

রাহুল বলল, খুলে বলুন বাবা। আমার সব জানা দরকার। হাইওয়েতে কারা রাহাজানি করছে—তার সঙ্গে আপনার কিসের সম্পর্ক! আপনিই বা কিসের দায়ে পড়ে রাজেনবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলেন। ওদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগই বা কার মারফত? কে সে?

হৃষিকেশের মুখটা থমথম করছিল। অনেক কষ্টে উত্তেজনা দমন করছেন যেন। বললেন, ওসব জেনে কী হবে? তুমি চলে যাও রাহুল। তাছাড়া—ধরো, বদমাইসির এই র‍্যাকেটটা তুমি যে কোন ভাবে ভাঙলে—কিন্তু তাতে আমার তো শান্তি হবে না। এ একটা দারুণ সমস্যা—তুমি বুঝবে না। এ বুড়ো বয়সে একটা সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরসংসারের আশা করেই ভবানীবাবুর মেয়েকে বিয়ে করলুম—

রাহুল বাধা দিয়ে বলল, বিয়ে আপনি নাকি বাধ্য হয়ে করেছিলেন?

হৃষিকেশ একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললেন, ওটা বাইরে-বাইরে আমার লোকদেখানো ছল। বিয়ে আমি করতুম। ও সন্তানসম্ভবা ছিল। তাই কিছুটা দ্বন্দ্বেও পড়ে গিয়েছিলুম। তবে শেষে বিয়ে করতুমই। রণ্টুর মা একটু হইচই করে ফেলল খামোকা। যাক্ গে—যা হবার হল। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখি, আমি ঠকেছি! আমার সংসারের নিচে কোন মাটি নেই। কারণ—যা নিয়ে আমার নতুন সংসারের আশা, সেখানেই সর্বনাশ ওৎ পেতে আছে।

রাহুল উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলল, রাজেনবাবুর কাছে শুনেছি—তিনজন লোক রয়েছে র‍্যাকেটের পিছনে। তাদের একজনের নাকি মাথায় বড় বড় চুল—মেয়ে বলে ভুল হয়েছিল আপনার। এখন বুঝতে পারছি, আপনি ঠিকই চিনেছিলেন বা ববাবর চিনতেন - শুধু খুলে বলতে পারেননি। কারণ সে আপনার—

হৃষিকেশ কঠিন মুখে প্রশ্ন করলেন হঠাৎ, সে আমার কী?

রাহুল জবাব দিল, স্ত্রী।

হৃষিকেশ অস্থিরভাবে বলে উঠলেন, ধরো যদি তাই হয়—তুমি কী করবে? ওকে ধরিয়ে দেবে, তাই তো? তখন রণ্টুর কী হবে? আর আমার এই অবস্থা—আমি কী করব? কখনো ভেব না যে ওদের র‍্যাকেটটা পুরো ভেঙে দিতে পারবে। যদি বা পারো, তারপর তোমার এখানে অক্ষত থাকা সম্ভব ভাবছ? অসম্ভব। তখন কী করবে? রণ্টু কী করবে? আমি যদি বেঁচে থাকি—আমিই কী করব? না খেয়ে পথে পথে ঘুরে মরব দুটিতে! হোটেলের অবস্থা যা—তাতে কোন ভরসা নেই। ওটা এখন রুণ্টুর মায়ের মুখোশমাত্র। তাছাড়া এই বাড়ি বা হোটেল—কোনটাই তো আমার নয়। সব হচ্ছে ওর। বেচবার মালিক আমি তো নই। অনেক সমস্যা আছে বাহুল। ছেলেমানুষি করো না। কেন তুমি আমার আরও সর্বনাশ করতে এসেছ? যেটুকু বাকি ছিল—তা না সারলে বুঝি স্বস্তি পাচ্ছ না। তাই না?

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আচ্ছা বাবা, আর দুজন লোকের নাম আপনি জানেন—তারা কে?

হৃষিকেশ জবাব দিলেন, নাম জেনে কী লাভ? তুমি চলে যাও।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, যদি না যাই?

বেশ, যেও না—যা খুশি করো। .... হৃষিকেশ পাশ ফিরে শুলেন। .... তোমার জীবন তোমার।

যদ্দিন কিছু বলার অধিকার ছিল, বলেছি। আর বলি নে। বলবও না। শুধু একটা কথা—আমি চাইনে যে তুমি নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে রণ্টুর সর্বনাশ করো।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রণ্টুর দায়িত্ব আমি নিলুম।

হৃষিকেশ চকিতে ঘুরলেন। .... তাহলে তুমি রাজেনবাবুর কথামতো কাজ করবে?

হাঁ।

কেন? কী পাবে তুমি? দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ বদমাস আছে—থাকবে। তুমি কি তাদের ত্রাণকর্তা? আর—তুমি নিজে কী, শুনি?

আমি অনেক টাকা পাবো। তাই দিয়ে—

মিথ্যা কথা? .... ফুঁসে উঠলেন হৃষিকেশ। .... টাকার নেশা তোমার নেই—আমি জানি। এ স্রেফ তোমার একটা জিঘাংসা।

জিঘাংসা?

হ্যাঁ—তাই। তুমি ভেবো না যে আমাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ। আমি কিছুতে বিশ্বাস করিনে যে রাজেনবাবুর কথায় তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো ময়নাচকে চলে এসেছ।

রাহুল এক পা বাড়িয়ে বলল, তাহলে কেন এসেছি?

তুমি আমার ছেলে না হলে বলে ফেলতুম। যাও, আমাকে ঘাঁটিও না।

রাহুল কঠিন কণ্ঠে বলল, না—আপনি বলুন।

হৃষিকেশ মুখ ফিরিয়ে নিলেন। শান্তভাবে বললেন, সব জেনেও আমি স্বেচ্ছায় বিষ খেয়েছি। এ আমার চরিত্রের বরাবর দুর্বলতা। নিজেকে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই। আত্মহত্যা করতেও ভয় পাই। আমি সত্যি বড় অসহায় রাহুল, তুমি ক্ষমা করো আমাকে!

একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাহুল চলে এল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। রোমকূপে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে গঙ্গার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেরোল। হাইওয়ে ধরে সোজা অরুণের ইটখোলার দিকে চলতে থাকল। সাতবছর আগে গঙ্গার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বাবা তাহলে আঁচ করেছিলেন। তবু তাঁর দ্বিধা হয়নি এতটুকু?

অরুণ সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। রাহুলকে দেখে বলল, আরে, ব্যাপার কী তোমার? রাত্রে শংকরদার ওখানে ছিলে না? ঘোঁতনা এসেছিল এই মাত্র। তোমার ব্যাগট্যাগ নিতে এসেছিল। দিইনি। বিশ্বাস করিনি, ওর কথা।

রাহুল বলল, ঠিক করেছ অরুণদা।

সে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল। শরীর একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল এতক্ষণে। মাথাটা ঘুরছে। বাবার কথাগুলো সে ভুলে যেতে চেষ্টা করল—কিন্তু অলক্ষ্যে বেঁধা কাঁটার মতো সেটা অনবরত খচখচ করছে। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ওই গঙ্গা। নিজের বয়স ডিঙিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবা যায় না। তার মুখে সাত বছর আগে দেখা সেই গ্রাম্য সারল্যটা অবিকৃত থাকলে একটু সমস্যার সৃষ্টি হত নিশ্চয়। রিভলবারের গুলিটা ঠিক কোথায় লাগা উচিত, সে মনে মনে টিপ করতে থাকল। মৃত্যু! একটি মৃত্যু দিয়ে সেই পাপস্পৃষ্ট ভালবাসার মূল্য শোধ তাকে করতে হবে। না রাজেনবাবু, না—তোমাদের সরকারের সুনাম, প্রশাসনের দক্ষতা বা সামাজিক শৃঙ্খলা, কিংবা আইন ব্যবস্থা সচল রাখবার মাথাব্যথা আমার একটুও নেই। ছিলও না। এ আমার একটা অদ্ভুত প্যাশন—রক্তের দিকে, ধ্বংসের দিকে ছুটে যাওয়ার প্রচণ্ড আবেগ। এটাই আমার জীবন। জীবনের স্বাদ। কিন্তু এমন অদ্ভুত অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি।....

অরুণ বলল, সানুটা আমাকে উত্ত্যক্ত করে মারছে তোমার জন্যে। ওর আসবার কথা এখন। একটা কথা বলে রাখি রাহুল। ও ভাব করতে চায়—করো, আপত্তি নেই। কিন্তু খবর্দার, খুব বেশি মিশবে না ওর সঙ্গে। কখন কিসের সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবে—টেরও পাবে না। অমনি করেই তো আমাকে

জড়িয়েছে ব্যাটা।

রাহুল বলল, কিসে জড়িয়েছে অরুণদা?

অরুণ কাছে এসে বসল। সতর্কভাবে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলছি, শোন। গতবছর বর্ষার সময় একরাত্রে হঠাৎ একজন লোক কিছু চোরা মালপত্র এনে আমার কাছে রাখতে বলল—পরে সময় মতো নিয়ে যাবে। তার নাম বলতে পারছিনে—যাই হোক, সে এমন লোক যে তার কথা এড়ানোর সাধ্য আমার ছিল না। মালগুলো রাখলুম। কিন্তু তারপর আর তার নিয়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। এদিকে পুলিশ নাকি খোঁজাখুজি শুরু করেছে। আমি পড়লুম মহাসমস্যায়। সেই ফাঁকে ব্যাটা সানু একদিন এসে হাজির। ঝানু লোক—হয়তো টের পেয়েছিল কীভাবে। আমি বোকার মতো ওর প্যাঁচে পড়ে গেলুম। বলে ফেললুম সব। ব্যস, সেই হল আমার কাল। ব্যাটা গুম হয়ে গেল! তখন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলুম সেই লোকটার কাছে। বললুম, শীগ্‌গির মাল সরিয়ে ফেলে প্রাণ বাঁচাও দাদা। সানু ঘোরাঘুরি করছে। সানুকে যেসব বলেছি, সেটা গোপন রাখতে হল। বেলাবেলি মাল সে সরিয়ে নিল! কিন্তু তারপর শুরু হল সানুর জুলুম। টাকা দাও—নয়তো পুলিশে ফাঁস করে দেব। ভাই রাহুল, পুলিশ কিছু প্রমাণ আর হয়তো পেত না—কিন্তু কথায় বলে— বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমি নিরীহ মানুষ—কোন সাতে পাঁচে নেই। পুলিশের খাতায় নাম উঠলে ইটের কন্ট্রাক্টগুলো নির্ঘাৎ বাতিল হয়ে যাবে। তাই—

রাহুল বলল, সানু আপনাকে ব্ল্যাকমেইল করে, তা জানি। কিন্তু মণিশঙ্করকে করে কেন জানেন?

অরুণ বিকৃত মুখে বলল, তাহলে আর ঢাকঢাক গুড়গুড় করে লাভ নেই। মণিশঙ্কর একটা হাড়ে-হাড়ে নচ্ছার। ডাকাতের বাড়া শালা। ওই মাঠের মধ্যে থাকার আসল কারণ কি জান?

রাহুল বলল, হাইওয়েতে রাহাজানি?

হ্যাঁ। ওই শালাই তো আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা এনে বিপদে ফেলল! ইটের কন্ট্রাকটারি গেলে আমি কী করব বলতে পারো? এমন চমৎকার সহজ ব্যবসা নষ্ট হলে কী বিপদে পড়ব বুঝতেই পারছ। .... অরুণ চাপা স্বরে বলতে থাকল। ... মণিশঙ্কর ডাকাতের ওস্তাদ। ভদ্রলোক ভালমানুষ সেজে থাকে। সে গোল্লায় যাক্, আমার মাথাব্যথা নেই। কথাটা হচ্ছে, সানুকে কীভাবে সামলাবো!

রাহুল হেসে বলল, কেন? তার সঙ্গে তো শীলার বিয়ে দিচ্ছেন?

অরুণ তেতো মুখে বলল, হ্যাঁ। সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু জেনেশুনে শীলার মতো মেয়েকে ওর হাতে দিতে কি ইচ্ছে করে ভাই? তাই যখনি তোমাকে এখানে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার মত বদলেছে।

আমি কি করতে পারি? ... রাহুল গম্ভীর হয়ে বলল।

অরুণের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, সানু শালাকে সাবড়ে দিতে পারো? একেবারে খতম! যত টাকা চাই তোমার—দেব। সিরিয়াসলি বলছি রাহুল! অনেক তো করেছ-টরেছ। এটুকু কি আর পারবে না? তুমি না পারলে পারবেই বা কে? দাও না শুয়োরটাকে শেষ করে। রাহুল! তোমার হাত ধরে বলছি—আমাকে তুমি বাঁচাও। শীলাকেও বাঁচাও।

আগের দিনে হলে রাহুল লাফিয়ে উঠে বলত— আলবাৎ। কিন্তু সে দেখল, তার ভিতরে যেন কী গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। নিঃসাড় হয়ে পড়েছে ভিতরটা। সে শান্তভাবে শুয়ে রইল। কোন জবাব দিল না। সে অন্য একটা কথা ভাবতে থাকল। তাহলে রাজেনবাবুর মুখে শোনা সেই কালো ত্রিভুজের একটি বাহু মণিশঙ্কর, অন্যটি গঙ্গা। কিন্তু তৃতীয়টি কে? অরুণ কি তাকে সত্যি কথা বলল? যদি না বলে থাকে, তাহলে অরুণই কি তৃতীয় বাহু? গঙ্গাকে খতম করতে তার হাত কাঁপবে না। গঙ্গার মৃত্যু যত শিগ্‌গির ঘটে, তত ভালো—সে একটা পরম নিষ্কৃতি যেন। আর মণিশঙ্করের বেলায় একটু দ্বিধায় পড়তে হয়। সে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে গত রাত্রে। নন্দরা তাকে শেষ করে দিত —ভাগ্যিস মণিশঙ্কর কোনক্রমে দৈবাৎ সেখানে এসে পড়েছিল! খুব জটিল সমস্যা। তৃতীয় বাহুটি অরুণ হলেও একটু ইতস্তত করার আছে। ওর রোগা বউ করুণার জন্যে মায়া হয়। আর শীলা—শীলা যদি কোনদিন টের পায়!....

একটু পরে রাহুল স্পষ্ট জানল, আসল সমস্যা শীলা তার জীবনের ঘুরন্ত চাকার কেন্দ্রে জড়িয়ে

গেছে হঠাৎ। কিছু ঘটলে বা ঘটাতে গেলে শীলার দিকে তাকে তাকাতে হচ্ছে বার বার। শীলা যেন তাকে খুব গভীর থেকে টান দিচ্ছে। ক্লান্তি ঘাম রক্ত ঘৃণা অবিশ্বাস থেকে বাইরে দূরে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তাকে—একটা স্বচ্ছন্দ বিশ্বাসে, একটি সরলতায়।

অরুণ ঝোঁকের বশে তার আহত ডানহাতটা ধরে আছে। রাহুল সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, সানুটানুকে মেরে কী হবে? বরং এক কাজ করলেই পারেন অরুণদা। শীলাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

অরুণ হতাশ চোখে চেয়ে বলল, আর আমি? আমার কী হবে?

কেন? আপনারা সবাই বেথুয়াডহরিতে চলে যান।

এত সব ইটপত্তর কী হবে?

কাকেও বিক্রি করে দিন। আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ... হেসে উঠল রাহুল।

অরুণ গুম হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে রইল। তারপর বলল, সেও ভেবেছি। অনেক বার ভেবেছি। কিন্তু ফের কোথাও গিয়ে নতুন কনট্রাক্ট পাওয়াও তো চাট্টিখানি কথা নয়।

রাহুল কঠিন মুখে বলল, দেখুন অরুণদা—ওটা কোন ব্যাপারই নয়। আপনি আসলে ময়নাচক ছেড়ে যেতে রাজি নন। কারণ এখানে যে কোনভাবে হোক, সম্ভবত যখের ধনের খোঁজ আপনি পেয়ে গেছেন। খুব সহজে অনেক বেশি টাকা পাবার সুযোগ থাকলে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে নেশায়। আপনিও হয়েছেন। আপনার ইটখোলাটা সত্যি বড় রহস্যময় লাগছে এখন।

অরুণ তার দিকে নিষ্পলক তাকাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মনে হচ্ছে তুমিও সানুর দলের লোক। রাহুল, তাহলে শীলাকে সানুর হাতেই তুলে দিচ্ছি। ভেবেছিলুম—

ওকে চুপ করতে দেখে রাহুল সকৌতুকে বলল, কী ভেবেছিলেন?

অরুণ মুখ নামিয়ে বলল, শীলাকে তুমি পছন্দ করেছ। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। আমার তো ছেলেপুলে নেই—হবারও আশা নেই। তোমরাই হবে আমার সবকিছুর মালিক।

রাহুল হাসতে গিয়েও পারল না। শুধু বলল, বাঃ! চমৎকার!

কেন? শীলা কি খুব একটা অযোগ্য মেয়ে, রাহুল? খোঁজ নিলে জানতে পারতে ও সামান্য ঘরের মেয়ে নয়। ঘর-বংশ-গোত্র সবদিক থেকে ওদের মর্যাদা বড় কম না। বামুনহাটির আশু রায়চৌধুরীর মেয়ে শীলা। আশুবাবুকে তুমি দ্যাখোনি। উনিই আমাকে ছেলের মতো মানুষ করেছিলেন। ব্যবসা শিখিয়েছিলেন। বেথুয়াডহরিতে ওঁর ইট আর টালিভাটা ছিল। উনি মারা গেলেন। শীলা আর তার মা তারপর থেকে আমার আশ্রয়ে রইল। শীলার মা হঠাৎ ....

রাহুল বলল, কী হল?

অরুণ বলল, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই। শীলার মা মেয়েকে ফেলে হঠাৎ একদিন চলে গেল। বেথুয়াডহরিতে এক স্কুল টিচারের সঙ্গে পালাল সে। তারপর আর খবর নেই কতদিন। শীলা তখন বাচ্চা মেয়ে। যাই হোক, খবর একদিন এল। শীলার মা আত্মহত্যা করেছে।

রাহুল চমকে উঠল। .... কেন?

স্কুল টিচারটি লোক কেমন ছিল, সবাই তো জানতুম। আসলে সে একটা ফোরটুয়েনটি—মস্তো চিটার। ফলস্ সার্টিফিকেট যোগাড় করে নানা জায়গার স্কুলে গিয়ে চাকরি নিত—জমিয়ে তুলত। তারপর একটা বিয়ে করে বউ নিয়ে উধাও হত। কিছুদিন পরে দেখা যেত—মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে। শীলার মায়ের বেলা ঘটল অন্যরকম। শীলার মা আত্মহত্যা করে বসল। তার একটা চিঠিই হল লোকটার পক্ষে সাংঘাতিক। ডি. এম.-কে চিঠিতে ওর সব কাণ্ডকারখানা লিখে তারপর হয়তো ঝোঁকের বশে আত্মহত্যা করেছিল শীলার মা। অনেকে সন্দেহ করে, জোর করে লোকটাই বিষ খাইয়ে মেরেছিল। যাই হোক—লোকটা ধরা পড়ল। কাগজে খবর উঠল। ঢি ঢি কাণ্ড একেবারে। জেল হল ওর। তারপর আর খবর জানিনে। হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে আবার কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে। শালা বদমাস চিটারে দেশটা একেবারে নরক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

রাহুল একটু হাসল। বলল, হ্যাঁ—আমরা সবাই মিলে নরক গুলজার করছি। তাই না অরুণদা?

কেউ—কেউ বাদ নেই।

অরুণ একটু অপ্রস্তুত হল। বলল, তা যদি বলো—তো বলব, দিনে দিনে অবস্থা যা হচ্ছে—আর কেউ ভালো মানুষ থাকবার উপায় আছে? সবাইকে জড়িয়ে পড়তেই হচ্ছে পাঁকে। তোমার বাবা—মাস্টারমশাই একটা চমৎকার কথা বলেন। একটা মস্তো চাকা আছে—তার আধখানা স্বর্গ, আধখানা নরক। এখন মাটিতে নরকের দিকটা রয়েছে। মাস্টারমশাই বলেন, এই দ্যাখো না অরুণ, আমি—আমার মতো মানুষও হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে নরকে ঘষা খাচ্ছি। হ্যাঃ হ্যাঃ, হ্যাঃ।

অরুণ হাসতে পেরে অপ্রস্তুত ভাবটা সামলে নিল। রাহুল বুঝল, অরুণ তার বাবাকেও জড়িয়ে নিজের বদমাইসির সমর্থন দাঁড় করাচ্ছে আসলে। তবে সে তো মিথ্যা নয়। রাহুল চুপ করে থাকল। শীলার কথা ভাবতে তার অবাক লাগছে। এই শীলার মতো মেয়ের পিছনেও অন্ধকারের উপদ্রব আছে!

অরুণ একটু কেসে বলল, তা—রাহুল, আমার কথার কোনো জবাব পাইনি ভাই।

কী কথার?

শীলার কী হবে?

আমি কেমন করে বলবো?

লুকিও না রাহুল—আমি জানি, শীলাকে তুমি পছন্দ করো। শীলাও তোমাকে —

বাধা দিয়ে রাহুল হেসে বলল, পছন্দ করে—অর্থাৎ ভালবাসে ? ভেট্ !

অরুণ তার দিকে ঝুঁকে চপলভাবে বলল আমি খুব বেঁচে যাই রাহুল, তোমার বউদিই প্রথম আমাকে একটু হিন্ট দিয়েছিল। মেয়েরা মেয়েদের সবকিছু টের পায় কিনা। তুমি আর না করো না। যদি বলো—আজকালের মধ্যেই একটা শুভক্ষণ দেখে সব ঠিক করে ফেলছি। শালা সানু পাঁঠাটা ধড়ফড় করে মরুক না। ঢাক বাজাব আর নাচব হে।

রাহুল কোন জবাব দিল না। অন্ধকার রাজত্বের আইনকানুন বেশ মজার। অন্ধকারের এক শক্তিমান অনুচর সে। তাই সে রাজত্বের সবখানে তার সম্মান—তার গুরুত্ব—তার মর্যাদা—তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কেউ দিতে চায় আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক, কেউ বন্ধুত্ব, কেউ টাকা। রাজেনবাবু, গঙ্গা, মণিশঙ্কর, অরুণ আর তার বউ, সানু চ্যাটারজি—সবাই তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা চলেছে। সে মানুষ মারতে পারে ঠাণ্ডা হাতে নির্বিকার মুখে। এই খবরটা জানাজানি হতেই এত সব হইচই। কলেজ জীবনে তার এক বন্ধু একটা কবিতা আওড়াত। কবিতাটা শুনে-শুনে নিজের অজান্তে মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজি কবিতা

And at last the killer came .....
অবশেষে এল সেই ঘাতক !
কথা ছিল তার হাতে থাকবে
  এক টুকরো ইস্পাত
ঋজু মসৃণ নীল ঠাণ্ডা আর কঠিন
মৃত্যুর অতৃপ্ত জাতক
  তৃষ্ণা যার রক্তে হয় নিবৃত্ত—
অথচ এ কী তার রূপ!
শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক
কম্পিত পদক্ষেপ ও · ধূলিধূসর ক্লান্ত দুটি পায়ে
শূন্য নগ্ন হাত ভিখারীর প্রার্থনায় জড়োসড়ো
রুক্ষ চুলে কামনার দুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃদু কাঁপে
কামনার সুখগুলি শুধু দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে
হায়, অবশেষে এল সেই ঘাতক
  শুধু বলল, নমস্কার।।...

শীলা ঘরে ঢুকে বলল, চা-টা খাবে—না সারা সকাল গল্প করা হবে? মুখ ধুয়েছ তোমরা?

অরুণ উঠল। তাই তো! বাসিমুখে ভ্যানর ভ্যানর করছি যে। শালা, যাচ্ছি ভাই। বেগুনী ভাজিস নি আজ? রাহুল, ওঠ। সানু এখনও এলো না দেখছি। ভেবেছিলুম, শালার সঙ্গে বসে আজ ব্রেকফাস্ট করব।

সে হেসে উঠল। শীলা ঠোঁট কুঁচকে চলে গেল। রাহুল উঠে বসল। বলল, আপনার বোন আমাকে দেখে চমকালো না কিন্তু।

অরুণ চাপা গলায় সকৌতুকে বলল, তুমি চমকে দিতে পারলে কই?

সানু সে বেলা এল না। অরুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইটখোলার কাজের চাপ বেড়ে গেছে। সে তাই নিয়ে ব্যস্ত হল অবশেষে। রাহুল সারা দুপুর চুপচাপ শুয়ে কাটাল। খাবার সময় অরুণ একবার উঁকি মেরে বলে গেছে, আমার সামান্য দেরি হবে খেতে। তুমি একা খেয়ে নাও। করুণাবউদির সেই একই নাকিকান্না শুনতে শুনতে রাহুল কোনমতে খাওয়া শেষ করে চলে এসেছে। তারপর শীলা জলের গ্লাস দিতে এসেছে বাইরের ঘরে। তখন শীলার হাতটা চেপে ধরতে ইচ্ছে করেছিল রাহুলের। ধরেনি। সে আর শীলা পরস্পর শুধু হেসেছে। কোন কথা বলেনি।

রাহুল গত রাতের কথা ভাবছিল। যারা তাকে খুন করতে যাচ্ছিল, তারা কি সত্যি সত্যি নন্দ আর তার লোকজন? বিশ্বাস হচ্ছে না। সামান্য মারামারির জন্যে তাকে ওরা খুন করবে কেন? কথাটা যত ভাবল, তত তার বিশ্বাস দৃঢ় হল যে এ ঘটনার পিছনে অন্য গুরুতর কারণ আছে। তাহলে কি কোনভাবে গঙ্গা-মণিশঙ্কর বা তৃতীয় ব্যক্তিটি জানতে পেরেছে, রাহুল কেন এখানে এসেছে? আশ্চর্য ধুরন্ধর মেয়ে গঙ্গা—তার কথায় বা আচরণে এতটুকু ধরার উপায় নেই কিছু। সাত বছর আগের সেই সরলমনা কিশোরী মেয়েটিকে পাপ ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে কী অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার মধ্যে!...

ঘুমিয়ে পড়েছিল রাহুল। কী সব আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল, শীলা তার পাশে বসে আছে। সে মুহূর্তে একটা আবেগ এসে গেল হঠাৎ। শরীর বা মনে সেই আবেগটা জোর নাড়া দিল বলেই রাহুল সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরল। টেনে বুকের ওপর শুইয়ে দিল। শীলা আস্তে আস্তে বলল, আঃ দরজাটা খোলা আছে।

থাক্। বলে রাহুল তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুটিতে। তারপর রাহুল ওর মুখটা তুলে ধরতেই দেখল, শীলা নীরবে কাঁদছে। সে শীলার কাপড়েই শীলার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, আমি আছি। কেঁদো না। কাঁদবে কেন?

শীলা আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, ছাড়ো। তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি।

ভিতরের দিকে দরজায় অবশ্য পর্দা আছে। শীলা পর্দাটার দিকে এতক্ষণে তাকাল। পরমুহূর্তে সে চকিত উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, কে? বউদি?

রাহুলও উঠে বসেছিল। সে দেখল পর্দার নিচে দুটো পা— খসখসে ফ্যাকাশে পায়ের পাতায় আবছা আলতার ছোপ, সবে সরে যাচ্ছে।

শীলা পর্দা তুলেই পিছিয়ে এল। জিভ কেটে সলজ্জ হাসি মুখে নিয়ে কটাক্ষ করল রাহুলের দিকে।

রাহুল বলল, কে? বউদি তো?

শীলা মাথা দোলাল। চাপা গলায় বলল, না—তোমার ছোটমা! ভেট্, আমার লজ্জা করছে। কী ভাবলেন বলো তো! আর কখনো এ ঘরে আসব না।

সন্ধ্যার আগে রাহুল বেরুল। খুব সতর্কভাবে বেরুল সে। রাতের ঘটনার পর আর তার পক্ষে অসতর্ক থাকা ঠিক নয়। অরুণের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। নয় তো তাকে সঙ্গে যেতে বলত। আসলে

সানু চ্যাটারজি তাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছিল।

হাইওয়েতে পৌঁছে একটা রিকশো করল সে। রিকশোওলার কাছে জানা গেল, সানু থাকে টাউনশিপের শেষ প্রান্তে। তার দাদা নীরেন চ্যাটারজি নামকরা লোক। রাজনীতির পাণ্ডা এ এলাকায়। মস্তো বড়লোক। সানু তার সৎমার ছেলে। কলেজে পাস দিয়েছে রীতিমতো। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে মারামারি খুনোখুনি রপ্ত করেছে হাড়ে। .... রিকশোওলা জানাল। .... তবে লোকটার মন বড় ভালো। গরিবের উপকারে সবসময় তৈরি। ছোটলোক-গরিব গুরবো মানুষের কাছে সানু দেবতাদের মতো।

রিকশোওলা বলল, আপনি নতুন মানুষ বাবু—তাই বলছি। যাচ্ছেন এখন চলুন।

আমার আর কী? ভাড়া পাব। তবে এখন হয়তো ওনাকে বাড়িতে নাও পেতে পারেন। মুক্তকেশী হোটেলটা একবার দেখে এলে পারতেন।

রাহুল বলল, সে পরে দেখব'খন। চলো--দেখেই আসি বাড়িটা।

একটা সুদৃশ্য বাগানবাড়ি বলা চলে। বিরাট বাউন্ডারি। গাছপালা। ফুল-ফলের বাগান। পিছনে পুকুর। সামনের দিকে লন আছে। খেলার জায়গা আছে। রীতিমতো একেলে পরিবেশ। দুপাশে দুটো গেট। গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি—লাল সাদা ফুলে ঝকমক করছে। একটা জিপ বেরিয়ে গেল—তার মধ্যে সানুকে দেখল না রাহুল। গেটে দারোয়ান আছে। সে বলল, চলিয়ে যান—খবর লিন। সানুবাবুর খবর হামি জানে না।

গাড়িবারান্দার সামনে বিশাল ড্রয়িংরুম। পর্দাটা ফাঁক হয়ে আছে। উঁকি মারতেই একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, বড়বাবু তো এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। পরে আসবেন।

রাহুল বলল, আমি ছোটবাবুকে চাই।

লোকটা ভ্রূকুঁচকে ওকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, কোত্থেকে আসছেন?

একটু ইতস্তত করে রাহুল বলল, আমি—হৃষিকেশবাবুর ছেলে।

মানে—মুক্তকেশীর মাস্টারমশাইয়ের ছেলে?

আজ্ঞে।

তাই বলুন। বসুন, বসুন। .... বলে সে কয়েক পা এগিয়ে ঘুরল। ... অবশ্যি সানুবাবু আছেন কি না জানিনে। আপনার ভাগ্য। উনি কখন বাড়ি আসেন, কখন থাকেন বলা ভারি কঠিন। দেখছি।

লোকটা হাসতে হাসতে চলে গেল। রাহুল একটা সেকেলে প্রকাণ্ড চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বনেদীয়ানার ছাপ রয়েছে ঘরে। বড় বড় ছবি, মস্তো ভারি পর্দা, মেহগিনিরঙ আসবাবপত্র—সব মিলিয়ে একটা আভিজাত্যের ভাব। এই বাড়ির ছেলে সানু। শীলা তার বউ হবে!

ফিরে এল লোকটা। ... আপনার বরাত ভালো। ছোটবাবু রয়েছেন। আসছেন এক্ষুনি। আপনি বসুন।

ফের সে চলে গেল। একটু পরেই সানু এল। মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল। বিশাল হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাল্লো।

রাহুল বলল, আপনার নাকি যাবার কথা ছিল সকালে। অরুণদা বলছিল।

সানু ওর দু-কাঁধে হাত রেখে বলল, আপনি নিজে চলে এসেছেন—এতে যে কী আনন্দ হচ্ছে বলার নয়! জানেন, আমি কতবার আপনাকে দেখে এসেছি!

রাহুল হেসে বলল, জানি।

আলগোছে রাহুলের ডানহাতটা তুলে ধরে সানু বলল, এখনও সারেনি? নন্দটার দিন ঘনিয়ে এসেছে, বুঝলেন? শালা সব তাতেই ছুরি বের করতে শিখেছে। অথচ একটা বেড়ালের জোরও শালার নেই। বসুন—উঁহু, ...

সে ভ্রূ কুঁচকে কী ভেবে নিল যেন। তারপর বলল, চলুন—আমার ঘরে গিয়ে বসি। নিরিবিলি না হলে জমবে না। রিয়েলি রাহুলবাবু, সেদিন নিজের ব্যবহারে এত অনুতপ্ত আমি, কী বলব।

রাহুল ওকে অনুসরণ করল। সানুকে মুহূর্তে তার এত আপন মনে হয়েছে।

ঘরটা বাড়ির উত্তর প্রান্তে একতলায়। দরজার বাইরে লম্বাচওড়া ছাদবিহীন বারান্দার মতো লাল সিমেন্টের মসৃণ চত্বর। তার শেষে ধাপ নেমে গেছে পুকুরে। পুকুরটা মোটামুটি বড়ো। মাঝখানে একটা বিরাট স্তম্ভ উঠেছে জল ছাড়িয়ে। তার ওপর ফোয়ারা। ধূসর আর কালচে রঙের ছোপধরা প্রকাণ্ড পদ্মফুলের গড়ন সেটা। কেন্দ্রশীর্ষে সাদা পাথরের উলঙ্গ পরী। বোঝা যায় ফোয়ারাটা কবে মরে গেছে। চারপাশে গাছপালা আর জলের মধ্যে সেটা নির্জন সমাধির মতো স্তব্ধ। রোদ সরে গিয়ে বিস্তৃত ছায়া ঢেকে আছে সেখানে। শিরশির করে জল কাঁপছে। একপাল দেশি-বিদেশি নানান চেহারার হাঁস কী জন্যে ঝিমুচ্ছে সিঁড়ির ওপর। সানু অনর্গল কথা বলছিল। ময়নাচকের কথা। তাদের পূর্বপুরুষদের কথা। ভবানীবাবুর সঙ্গে পুরুষ-পরম্পরা তাদের শত্রুতার কথা। একসময় সে উঠে বলল, চলুন— বরং বাইরে বসা যাক্। প্লিজ রাহুলবাবু, বসার জায়গা আমরা নিজেরাই নিয়ে যাই। এবাড়ির চাকরবাকর সব শালা মন্ত্রীমহারাজ। ডাকলে সাড়া দ্যায় না।।

দুজনে দুটো হাল্কা চেয়ার নিয়ে বেরোল। ঘরে অবশ্য আসবাবপত্র বলতে ওই ধরনের গোটাকয় চেয়ার, গদিছেঁড়া একটা সোফাসেট—আর একটা সেকেলে খাট। কিছু বাকসের গাদা ছেঁড়া চাদরে ঢাকা আছে কোণের দিকে। পা ছড়িয়ে বসে সানু বলল, আমি বাউন্ডুলে পাপীতাপী লোক—থাকি একলষেঁড়ে হয়ে এদিকটায়। ভিতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি বড্ড কম। তবে হাঙ্গামা বাধলে তখন সানুর ডাক পড়ে। তখন বাড়িতে আমার খাতির যদি দ্যাখেন মশাই, চক্ষু ছানাবড়া হবে।

রাহুল বলল, আপনার বাবা-মা কদ্দিন আগে মারা গেছেন?

বাবা? দাঁড়ান বলছি। .... সে চোখ বুজে কী হিসেব করে বলল, বছর বাইশ হবে। বুড়ো তো এখানে থাকত না—এখানে রেসের মাঠ কোথায়? বিলিতি বার আর মেমসায়েব কোথায়?.... সে হেসে উঠল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, মা বছর পাঁচেক আগে গেল। যাই বলুন—সতীলক্ষ্মীরা একটানা পতিশোক কদ্দিন বা সইতে পারে!

রাহুল বলল, বাবা-মার ওপর খুব অভিমান আছে আপনার—তাই না সানুবাবু?

কে জানে কী আছে! .... সানু বিকৃত মুখে বলল। ..... আসলে আমার চয়েসটাই হয়তো আলাদা। বাবা-মা সম্পর্কে আলাদা চয়েস নিয়ে যে ছেলেরা জন্মায়—তারা হযতো কষ্ট পায়। যাক্ গে দুনিয়ায় মনের মতো কোনটাই বা আছে? এই যে অমি—আমি শালাই কি নিজের চয়েস অনুযায়ী হতে পেরেছি বা পারছি? তবে অন্য সব হয়তো গড়েপিটে মনের মতো করা যায়—বাবা মাকে তো যায় না। কী বলেন?

ফের সে হো হো করে হেসে উঠল। রাহুল বলল, বিয়ে করেননি কি সেইজন্যেই?

সানু তার দিকে তাকাল।

রাহুল একটু ইতস্তত করে বলল, একটা গুজব শুনছিলুম। বলব?

সানু শিস দিয়ে দুলতে দুলতে বলল, আলবৎ বলবেন।

অরুণদার বোনকে আপনি বিয়ে করছেন?

সানু কিছুক্ষণ চোখবুজে দুলে চলল। তারপর তাকাল। চোখে কৌতুক জ্বলজ্বল করছে তার। বলল, মেয়েটিকে তো আপনি দেখেছেন। কী মনে হয়েছে?

কী মনে হবে?

অরুণ শালাকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। ওর ইটখোলার মজুরনীগুলোর সঙ্গে খুব দিল-লেনা-দেনা আছে। লম্পটের হদ্দ ব্যাটা। এখন কথা হচ্ছে—তার নিজের বোন নয়। এমনকি স্বজাতও নয়। ও শূদ্রটুদ্র বটে—মেয়েটা বামুন। আমার খালি মনে হয়, বেচারা শালাকে গোপনে নষ্ট-টষ্ট করে বসেনি তো?

রাহুল নিষ্পলক তাকালো ওর দিকে। তারপর বলল, অরুণদা লম্পট তা সত্যি। কিন্তু শীলা শিক্ষিতা মেয়ে। পারসোনালিটি আছে। সেটা ভুলে যাওয়া কি ঠিক হবে?

রাইট, রাইট ! ..... সানু তার লোমশ হাতটা চেয়ারের হাতলে আঘাত করল। .... শীলা খুব সহজ মেয়ে নয়। র‍্যাদার সফিসটিকেটেড মনে হয়। আপনি কী বলেন?

রাহুল পুকুরের দিকে ঘুরে বলল, খুব বেশি মিশিনি। তাই জানিনে।

সানু ঝুঁকে এল তার দিকে। .... বিয়ের কথা আমি কিন্তু তুলিনি—তা জানেন? অরুণই তুলেছে। সেজন্যেই তো আমার সন্দেহ। আপনাকে বলতে বাধা নেই। অরুণকে আমি বলেছি—ঠিক আছে। বিয়ে আমি করছি। কিন্তু তার আগে যে কোন কায়দায় শীলাব একটা হেলথ্ সার্টিফিকেট চাই। ডাক্তার আমি ঠিক করে দেব। অরুণ রাজি হয়েছে। মশাই, আমি আজকালকার মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস করিনে। তার ওপর আজকাল কত সব কনট্রাসেপটিভ বেরিয়েছে।

সানুর একটা উজ্জ্বল সুন্দর চেহারা মনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল—এতক্ষণে হঠাৎ সেটা মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। বিকৃত কিম্ভূত একটা চেহারা পেল সানু চ্যাটারজির। মনটা তেতো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাহুলের ইচ্ছে হল—এক্ষুনি ওর মুখে একদলা থুথু ফেলে চলে আসে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল।

সানু চাপা গলায় সকৌতুকে ফের বলল, ডাক্তাব যদি সার্টিফিকেট দ্যায় যে শী ইজ স্টিল আনটাচড্ বাই অপজিট সেক্স—এখনও তার কুমারীত্ব অটুট আছে, আমি তক্ষুনি টোপর পরব। এটা মশাই, সরকারের আইন করে বিয়ের সর্ত করা উচিত। বলবেন, মেয়েদের বেলা তো ওটা না হয় হল—পুরুষেব বেলা?

রাহুল ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিছু বলছিনে।

সানু জোর হেসে বলল, দেখছেন কাণ্ড ? এখনও চা এল না। বসুন—একমিনিট আসছি।

সে চলে গেলে রাহুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অরুণ ওই ডাক্তারী পরীক্ষার কথাটা বলেনি। চেপে গেছে। শীলা কি জানে? অবশ্যই জানে না। তার অজানতে কোন ছলে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কী জঘন্য ব্যাপার! তবে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে অরুণই এ বিয়েতে উৎসাহী হয়েছিল। আর সানুরও শীলাকে খুব মনে ধরে গেছে। .....

একটু পরে ফিরে এল সে। তার সঙ্গে ট্রে হাতে একটা লোকও এল। কিছু বিস্কুট আর চা মাত্র। সানু কোলের ওপর ট্রে রেখে নিজেই চা বানাল।

চা খেতে খেতে সানু বলল, বাই দা বাই—কাল রাতের ব্যাপার। যে জন্যে আজ সকালে আপনার কাছে যাবো ভাবছিলুম। নদীর ধারে কারা নাকি আপনাকে গলা কাটতে চাচ্ছিল। সত্যি?

রাহুল মাথাটা দোলাল মাত্র। একটু শুকনো হাসিও দেখা দিল ঠোঁটে।

সানু বলল, মণিশঙ্কর বলছিল। সকালে এসেছিল সে। তার সন্দেহ—এ কাজ নাকি নন্দর। নন্দ নাকি সেদিনের রাগ ভুলতে পারছে না। .... যাই হোক. আমি উল্টোকথা বললুম ওকে। বললুম—শংকরদা, এ তোমারই কাজ নয় তো? বেচারা বিদেশি ছেলে—নতুন এসেছে এখানে।...

বাধা দিয়ে রাহুল প্রশ্ন করল, শংকরবাবুর কী স্বার্থ আছে আমাকে খুন করার?

সানু ভ্রূ কুঁচকে মৃদু হেসে এবং অভ্যাসমত দুলতে দুলতে বলল, আছে নিশ্চয়। তার আগে একটা কথা জিগ্যেস করি। স্পষ্ট জবাব দেবেন কিন্তু।

দেব। বলুন।

কাল রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে কিছু কি নজরে পড়েছিল আপনার—হুইচ ইজ কোয়াইট স্ট্রেঞ্জ?

না তো।

কিচ্ছু দ্যাখেননি—যাতে ওকে সন্দেহ করা যায়?

কিসের সন্দেহ?

সানু চাপা গলায় বলল, হি ইজ এ গ্যাংস্টার: এলাকার যত রাহাজান, ডাকাতি আর খুনোখুনি হয়—তার লিডার সে। আমার মুশকিল হচ্ছে যে মণিশঙ্কর আবার দাদার বিশেষ বন্ধু নয়—আরও বেশি কিছু।

রাহুল বলল, শুনেছি—আপনি ওকে ব্লাকমেইল করেন।

সানু বলল, হুঁঃ! করি। আরে মশাই, সে কি লুকিয়ে করি নাকি ?

অরুণদাকেও করেন শুনেছি।

ও তো একটা বকধার্মিক। শুওরের ধাড়ী। শালার ইটখোলাটায় যদি পুলিশ হামলা করে, ঢিঢি পড়ে যাবে। ওদিকে একটা বাঁশবন আছে দেখেছেন? সেখানে রিজেকটেড ইটের পাহাড় জমে রয়েছে। সে-ইট অরুণ বেচে না। অথচ রোডস ডিপার্ট রিজেক্ট করলেও ইটগুলো মশাই প্রথম শ্রেণীর ইট। ক'বছর ধরে পড়ে আছে সেগুলো। ডবল দর বললেও কাকেও বেচতে চায় না। ক্যাশব্যানা ঝোপঝাড় গজিয়েছে ওখানে। সাপ-খোপের আড্ডাও হয়েছে। একদিন আমার খুব সন্দেহ হল। ডিটেলস বলব না —কোন একটা ব্যাপার দেখেছিলুম রাত্রিবেলা—তাতেই সন্দেহ হল। গিয়ে ওকে বললুম, আমার হাজার বিশেক ইট চাই। বাড়ি করব নিজের। দাদার সঙ্গে পোষাচ্ছে না। শুনে অরুণ হন্তদন্ত চিমনিভাটার দিকে এগোল। আলবাৎ দেব। এ ক্লাস ইট টাটকা পুড়িয়ে দেব—স্পেশাল তৈরি। আমি বললুম—উঁহু, ওই বাঁশবনের ঝড়জল খাওয়া ইটের কাছে আর কোনটা লাগে নাকি? চলো—ওখানে গিয়ে দেখি। অরুণের মুখ গেল শুকিয়ে। সে নানা বাহানা ছলছুতো শুরু করল। আমিও নাছোড়বান্দা। শালা ঘুঘু দেখেছ—ফাঁদ দ্যাখোনি। ও সাপখোপের ভয় আমায় দেখিও না। আমি বেদের রাজা। ব্যস্। একজায়গায় নতুন স্ট্যাক আর দোমড়ানো ঝোপঝাড় দেখে হাত লাগালুম। অরুণ পরিত্রাহি চ্যাঁচায়। যেন শালার গলায় ছুরি চালাচ্ছি। উরে ব্বাস! বেরিয়ে পড়ল গুঁড়োদুধের টব! বেবিফুড। .... উরে হালুয়া! অরুণ পায়ে ধরল। কান্নাকাটি—সাধাসাধি!.....

দম নিয়ে সানু বলল, আমি যদি অন্যলোক হতুম রাহুলবাবু, তাহলে সেদিনই আমার মুণ্ডুটা সাবড়ে ফেলা হত। সেটা খুব সহজ কাজ নয়। আমার স্টেনগান আছে—দুদশজন চেলা আছে। অবশ্যি তারা কেউ নন্দর মতো গুণ্ডা-বদমাস নয়। ভদ্রলোকের বাড়ির শিক্ষিত ছেলে সব। হাতে আর্মস পেলে মানুষ বদলে যায় মশাই। না—ডিটেলস বলব না। শুধু জানবেন যে আমি পলিটিকস করি না—বিশ্বাসও নেই ওতে। আমার দলের ছেলেদের অবশ্য সেটা আছে। ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু এটুকু যে ওরা ডাকলে আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই আর আমি ডাকলে ওরা আমার পিছনে এসে জোটে। এইমাত্র।

রাহুল একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার চেলা যাদের বললেন—তারা নিশ্চয় আপনার দাদার পার্টির লোক?

সানু রহস্যময় হাসল। বলল, হ্যাঁ। তবে—ওই যে বললুম, দাদা আমাকে ডাকলে আমি যাব না। নেভার। তখন দাদা চালাকি করে। হ্যাঙ্গামার দরকার হলে ওদের ডাকে—ওরা ডাকে আমাকে। ব্যস, দাদার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। কিন্তু আমি তো জানি—কার খাতিরে যাচ্ছি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ততক্ষণে। আকাশে নক্ষত্র ফুটেছে। বাড়ির এদিকে কোনো আলো নেই। হয়তো আছে—জ্বলেনি তখনও। হাঁসগুলো কখন উঠে গেছে সিঁড়ি থেকে। কোথাও কোন শব্দ নেই। রাহুল বলল, উঠি তাহলে।

সানু বলল, একটু বসুন। সেদিন আপনার সাহস আর শক্তির পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছিলুম খুব। কারণ আমি নিরীহ টাইপের ভীতু বোকাসোকা ছেলেদের একটুও পছন্দ করি না। তাছাড়া আপনার হাতের মার দেখে তক্ষুনি চিনেছিলুম, আপনি ওস্তাদ ছেলে। আপনার প্রেমে পড়ে গেছি মশাই। .... সানু হো হো করে হাসল। ....যাক্‌গে—এখন কথা হচ্ছে, শংকরই সম্ভবত আপনাকে সাবড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন?

রাহুল বলল, তাহলে তিনিই বা কেন শেষমুহূর্তে বাঁচালেন? পৌঁছে দিলেন বাবার ওখানে?

সানু বলল, শালা ঘাগী মাল। জানে মারতে চায়নি আসলে—বেশ বোঝা যাচ্ছে, আপনাকে জোর ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল। সবটা সাজানো ব্যাপার। ওর উদ্দেশ্য ছিল—শিগগির আপনি ময়নাচক থেকে পালিয়ে যাবেন!

কিন্তু কেন?

প্রশ্ন তো আমারও। কেন? সেজন্যেই বলছিলুম, কাল কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেছিলেন নাকি ওখানে?

কিছু দেখিনি তো।

সানু ফিসফিস করে বলল, কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আপনার ছোটমার সঙ্গে লোকটার একটা ইলিসিট কানেকশান আছে। অনেকেই জানে ব্যাপারটা। হয়তো মাস্টারমশাইও জানেন। কিন্তু বেচারা তো শয্যাশায়ী রোগা মানুষ। রাহুলবাধু, আপনার ছোটমার সঙ্গে কি মণিশঙ্করকে তেমন কোন অবস্থায় দেখেছিলেন?

রাহুল বলল, না। আমি তো মোটে দুবার গেছি ওখানে। সেও সকালবেলা।

সানু একটু ভেবে বলল, আমি আপনার হিতৈষী। যাকে আমি পছন্দ করি, তার জন্যে জান দিতে পারি। একটা কথা বলব—রাখবেন?

বলুন।

আপনার ছোটমার ওখানে কখনো যাবেন না। আর যদি পারেন, বাবাকে নিয়ে শিগ্‌গির চলে যান এখান থেকে। বহরমপুরে বাড়ি আছে তো আপনাদের?

নাঃ। আমি বহরমপুরে থাকতুম। বাড়ি তো গ্রামের দিকে। ঘরটা পড়ে গেছে। না বানালে নিজে যাই কী করে? আর সেখানে গিয়ে করবই বা কী? ... রাহুল শুকনো হাসল।

সানু বলল, তাহলে এক কাজ করুন। এখানেই জায়গা দিচ্ছি—দাম লাগবে না। বাড়ির মালমশলা যা লাগবে—সব অরুণশালা দেবে। ওর বাপ দেবে।

দেখি। .... বলে রাহুল উঠল।

সানুও উঠে দাঁড়াল। .... টর্চ আনেননি? উঁহু—আনলেও আপনাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়! চলুন, আপনাকে রেখে আসি। সাইকেল আছে—রডে বসে যেতে পারবেন তো?

রাহুল বলল, থাক্। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি একা যেতে পারব।

পাগল! ... সানু বলল। .... আপনি মণিশঙ্করকে চেনেন না। ওর ভিতরের চেহারা দেখলে ভয় পাবেন রাহুলবাবু। আমি ভিতরে-বাইরে এক—ও শালা উল্টো। বাপ্‌স্ আমাকেই ছমছমানি লাগে! চলুন। রাত্তিরে এখানেই থাকতে-খেতে বলতুম—ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং ব্রাদার—এ বাড়িতে মানুষ নেই। ভূতের রাজত্ব। বউদিটা আছে—তার তো দেমাকে পা পড়ে না। রোস, দেখাচ্ছি মজা! বিয়েটা হয়ে যাক্। তারপর পাইপয়সার বখরা ছাড়ব না। আলাদা বাড়ি তো বানাবই। অরুণশালা আমার বাড়ি করে দেবে। বোন দেবে—যৌতুক দিতে হবে না? সে হাসতে হাসতে পা বাড়াল।

রাহুল বলল, চলুন। কিন্তু আমি নিরস্ত্র নই সানুবাবু।

সানু পিছন ফিরে চাপা গলায় বলল, রিয়েলি? কী মাল? 'রেঞ্জ্', না 'টিপস্'?

অটোমেটিক।

কই দেখি? বলে সে দ্রুত ঘরে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল।

রাহুল রিভলবারটা বের করে ওর হাতে দিল। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখার পর সানু বলল, চীনেটিনে মনে হল! কোথায় পেলেন? আপনি মশাই রাজা তাহলে! দাঁড়ান আমার যন্ত্রপাতি দ্যাখাচ্ছি।

রাহুল অবাক হয়ে গেল। দুটো অটোমেটিক রিভলবার আর একটা স্টেনগানের মালিক সানু চ্যাটারজি। নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখটা ফেটে পড়ছে। একটু অস্বস্তি এল রাহুলের। কেন কে জানে—তার গা ছমছম করে উঠল। সে বলল, বেরিয়ে পড়া যাক্।

সাইকেলে এগোচ্ছিল দুজনে। যেতে যেতে হঠাৎ রাহুল বলল, নন্দব সঙ্গে অরুণের বিবাদ কিসের? আমি অবশ্য অরুণদার কাছে একরকম শুনে: ।

সানু বলল, অরুণ আর লোক পায়নি—রেখেছিল নন্দকে। কী না ক্যাশিয়ার বাবু! নন্দ মোটা টাকা মেরে সরে পড়েছিল। চাইতে গেলেই উল্টে পিট্টি লাগায়। .... হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে সানু বলল, এক কাজ করবেন? চলুন না মুক্তকেশীতে যাই।

রাহুল বলল, না না। কেন?

সানু বলল, উঁহু—চলুন। আপনার ছোটমাকে দেখিয়ে আসি যে আমি এখন আপনার জানের

দোস্ত। এটা আপনার সেফটির জন্যে দরকার। ওবা টের পাক্। তা না হলে এখানে স্বচ্ছন্দে বেড়াবেন কেমন করে? তাছাড়া হয়তো মণিশংকরকেও পেয়ে যেতে পারি ওখানে। তাহলে তো খাসা হবে। দুজনেই দেখুক, সানু চ্যাটারজির সাইকেল থেকে রাহুলবাবু নামছেন! হ্যাঁ?

প্রস্তাবটা সঙ্গত মনে হল রাহুলের। সে কোন কথা বলল না আর। হাইওয়ের দুপাশে সারবদ্ধ দোকানপাট। আলো হল্লা জেল্লা আছে। মাঝে মাঝে বাস লরি রিকশা টেম্পো ভ্যান সাইকেল আনাগোনা করছে। তবে দিনের চেয়ে গতিবিধিটা কম। অল্পস্বল্প ভিড় আছে। বেশ গরম পড়েছে আজ। একটুও হাওয়া দিচ্ছে না। তাই কারো হয়তো ঘরের দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মুক্তকেশীর সামনে রাস্তার দুধারে অনেক ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে যথারীতি। ড্রাইভাররা খেয়ে বিশ্রাম করছে—কেউ খাটিয়ায়, কেউ ঘাসের ওপর গড়াচ্ছে। রাহুল লক্ষ্য করল একদল পাঞ্জাবি ড্রাইভার গোল হয়ে বসে মদ খাচ্ছে আর হইহল্লা করছে।

একেবারে হোটেলের বারান্দায় পা রেখে সাইকেল থামাল সানু। রাহুল নামবার আগেই সে ডাকল, হ্যাল্লো ম্যাডাম! হেয়ার ইজ সানু চ্যাটারজি।

থামের ওদিক থেকে গঙ্গা বেরিয়ে এল। থমকে দাঁড়াল। মুখটা থমথমে। পরমুহূর্তে হাসিতে ভরে উঠল। ... সানুদা! এস। ওকে কোথায় পেলে?

সাইকেলটা সশব্দে উঁচু বারান্দায় ঠেস দিয়ে রেখে সানু বলল, হুঁ—তোমাদের হারানিধি খুঁজে আনলুম। কই, কী খেতে দেবে দাও।

আহা, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার খাওয়া যায় নাকি? ভিতরে এসে বসবে তো? .... গঙ্গা মিষ্টি হেসে হাতের রুমালে ঠোঁটটা একবার মুছে নিল।

সানু উঁকি মেরে বলল, আসামী যে অসংখ্য আজ। মেনু কী?

গঙ্গা বলল, মেনুর খবর তো সবসময় জিজ্ঞেস করো—খেতে বললে তখন পেট ভাব। এস, বসোদিকি আগে।

একটা তক্তাপোষে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। সামনে বাকসো। কিছু খাতাপত্র। বোঝা যায়, গঙ্গার লোক। ঘোঁতন নামে ছোকরাটি রাহুলকে দেখে কী কারণে একবার দাঁত বের করে হেসে গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা মেঝেয় পিঁড়ি আর আসন পেতে। গা ঘিন ঘিন করছিল রাহুলের। সানু বলল, নাঃ, এখানে বসব না। ভিতরে মাস্টারমশাইকে দেখে আসি। এস রাহুল।

সানু তাকে তুমি বলছে, সেজন্যে নয়—রাহুল অবাক হল গঙ্গার কথায়। গঙ্গা গম্ভীর মুখে বলল, সানুদা? ওঁর অবস্থা আজ খারাপের দিকে। এখুনি ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। বলে গেলেন—আজ রাতটা সাবধানে থাকতে। বলা যায় না! কিন্তু আমি ওদিক দেখব—না এখানটা সামলাবো। মাসকাবারের খাইয়ে আছে সব। ....

গঙ্গা একটু থেমে মুখ নামিয়ে বলল, বিকেলে ছেলেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। তাই ওর খোঁজে অরুণের ওখানে গেলুম। দেখা হল না।

রাহুল সানুর হাত ধরে টানল। চলুন, ভেতরে যাই আমরা।

গঙ্গা বলল, তাই যাও তোমরা। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

একা পড়ে আছেন বাবা! রাহুল ক্ষুব্ধভাবে বারান্দা থেকে সরু করিডোরে ঢুকল। সানু তাকে অনুসরণ করল। হৃষিকেশের ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। দরজা ভেজানো আছে। ভিতরের বারান্দার বাঁদিকে গঙ্গার ঘরের দরজা সেটাও ভেজানো আছে।

দরজা খুলে রাহুল ছেলেবেলার গলায় ডাকল, বাবা!

হৃষিকেশের কোন সাড়া নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বুকের ওপর দুটো হাত।

একটু ঝুঁকে পড়ল রাহুল। দেখল হৃষিকেশের একটা চোখের কোনায় জলের ফোঁটা। নাকে জমাট কয়েকফোঁটা রক্ত। ঠোঁটের দুদিকে চাপ চাপ ফেনা। সে দ্বিতীয়বার একটু চিৎকার করল, বাবা!

হৃষিকেশের শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ। গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। রাহুল আস্তে আস্তে হাঁটু দুমড়ে বসল। তারপর বাবার বুকে মাথা রেখে সশব্দে কেঁদে উঠল। সানু বিকৃত মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। হতবাক।

নিস্পন্দ। এবার সে এগোল। হৃষিকেশের হাতের মুঠোয় ও পুরিয়াটা কিসের?

কতক্ষণ পরে গঙ্গা এসে কী বলতে গিয়ে সেও থেমে গেল। স্থির দাঁড়াল।

হৃষিকেশ তাঁর ষাট বছরের ভালমন্দভরা জীবনটা নিয়ে কখন চুপিচুপি পালিয়ে গেছেন চিরকালের মতো। মনে হচ্ছিল আর তাঁর কাছে কেউ কৈফিয়ত নিতে পারবে না এবং খুব সহজে তাঁকে ক্ষমা করা যাবে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল।

আবিষ্কার করতে সামান্য সময় লাগল সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যটাকে। গঙ্গার ঘরে ধবধবে পরিপাটি বিছানায় আরেকটি নিষ্ঠুর মৃত্যুর স্বাক্ষর। বল্টু!

হৃষিকেশ তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? এবং তখন মনে হল, হৃষিকেশ পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পাবেন না। একটা কৈফিয়ত তাঁর পক্ষে জরুরী থেকে যাবে। কোনমতে আব তাঁকে ক্ষমা করা যাবে না।

গঙ্গার ভয়ঙ্কর চিৎকারে ময়নাচকেব রাতের আকাশ আলোড়িত হচ্ছিল। সে চিৎকারকে শোকের কান্না বললে হয়তো ভুল করা হবে। সে একটা শব্দময়ী মারাত্মক জিঘাংসা।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল তারপর।

রাহুল অরুণের বাড়িতে থেকেছে যথারীতি। কিন্তু কোনরকম শাস্ত্রীয় বিধির ধার ধারেনি। অরুণ, তার বউ, কিংবা সানুর অনুযোগেও না। শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপার ছিল। সেটাও এড়িয়ে থাকল সে। একটা ঘোরতর নির্লিপ্ততা তাকে গ্রাস করেছিল। বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল একটা বিশাল শূন্যতা। সে শুধু ভাবছিল, কী হবে! ময়নাচকের দুষ্টচক্র খতম করে তার লাভ কতটুকু ? তারপরও আরেক দুষ্টচক্র গজাবে না তাব কোন গ্যারান্টি আছে? আর এ পৃথিবীতে যুগেযুগে এইসব বিষফোঁড়া গজায়। গজাবে চিরকাল। সে কি ত্রাণকর্তা অবতার? না রাজেনবাবু, পাঁচ হাজার টাকা পাওয়াটাও খুব সুখের কিছু নয়। টাকা নানাভাবে পাওয়া যায়। আজ আমার কাছে টাকাও তার দাম হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ মারার সুখ আর সুখ নয়। আমাকে ক্ষমা করুন রাজেনবাবু। এখানে পা দেওয়ার পর সব সংকল্প অভিসন্ধি বাসনা কামনাগুলো যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছি, সেখানে শুধু চারিদিকে থরে থরে সাজানো উদ্দেশ্যহীনতা। খুব শিগ্‌গির এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাকে। টের পাচ্ছি, আমি আর কারো কাজে লাগব না। এমন কি নিজের কাজেও না। এ অবস্থা অসহ্য। হাঁফিয়ে উঠেছি। আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই। ...

অথচ চলে যাবার কথা ভাবলেই মনে হচ্ছে, কী যেন বাকি থেকে গেল। রন্ধ্রহীন শূন্যতার দেয়াল জোরে সরাতে পারলে সেটা পরিষ্কার দেখা যেত। যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, বাবার আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ময়নাচকে, অথচ ফুরিয়ে গেল না হয়তো। অদ্ভুত এ এক অবস্থা! একটা গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল রাহুলের মনে।

অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এল সে। এক সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠিক করে ফেলল, আজই চলে যাবে। বহরমপুরে যাবে না। অন্য কোথাও। বরং কলকাতা—অথবা আরো দূরে। বোম্বে। হ্যাঁ, বোম্বেতে তার এক পরিচিত ভদ্রলোক থাকেন। একবার কথায়-কথায় তিনি তাকে বোম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কী যেন কারবার আছে জিতেনবাবুর—জিতেন বোস নাম ওঁর। একজন কর্মঠ লোক দরকার ছিল। উত্তেজিতভাবে সে ব্যাগ থেকে নিষ্ফল নোটবুকটা বের করল। কিছু ঠিকানা লেখা আছে তাতে। জিতেনবাবুর ঠিকানাটা কি লিখে রাখেনি? কোথাও খুঁজে পেল না নামটা। বেরঙা পাতাগুলো পুরনো কিছু হরফসমেত ব্যঙ্গ করল তাকে। তবু সে শেষ পাতা অব্দি উল্টে দেখতে গিয়ে একটা ভাঁজকরা ছোট্ট চিঠি খুঁজে পেল। বাবার শেষ চিঠিটা! অন্যগুলোর মতো এটাকেও ছিঁড়ে ফেলেনি দেখে তার অবাক লাগল। কেন রেখে দিয়েছিল? মনে পড়ল না তার। চিঠিটা খুলে পড়ল। .... রাহুল, সম্প্রতি জনৈক পরিচিত ব্যক্তির মারফত তোমার সবিশেষ কীর্তিকলাপ জানিতে পারিলাম। আর তোমার সহিত কোন সম্পর্ক রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতেছে। জানিলাম, আমার রাহুল

নামে কোন সন্তান নাই।...তবে শেষ সুযোগ হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না। এই চিঠি পাইবার পক্ষকালের মধ্যে তুমি যদি ময়নাচকে আমার নিকট চলিয়া এস—তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি।...

আসেনি রাহুল। এলে কী ঘটত ? সে একটু ভেবে দেখল। হয়তো এসে পড়লে বড়জোর গঙ্গার সঙ্গে বাবার বিয়েটা হত না। তার নিজের কী পরিবর্তন ঘটত ? মনে হয় না। কারণ, অন্ধকারের আস্বাদ যে পেয়েছে, সে সারাজীবন অন্ধকার চাইবে এবং ময়নাচকে প্রচুর অন্ধকার। ......

একটু হাসল সে। এখন বাবার প্রসঙ্গ অর্থহীন। অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি ! জিতেন বোসের ঠিকানাটা কেন লিখে নেয়নি? খুব আফসোস হচ্ছে। থাক্ গে, কলকাতা যাওয়া যায়। চেনা জানা লোকের অভাব নেই। কার কাছে যাবে, ঠিক করার জন্যে নোটবইতে চোখ রাখল সে।

সেই সময় শীলা এল। নোট বুকটার দিকে ঝুঁকে বলল, হিসেবের খাতা নাকি ?

রাহুল অস্ফুট হেসে বলল, কতকটা। শীলা, আজ আমি চলে যাচ্ছি।

শীলা তার পাশে বসে পড়ল। আমল দিল না কথাটা। বলল, তোমার হাতটা এখনও সারল না? ব্যান্ডেজ খুলে দেখছ না কেন?

রাহুল নোটবইটা রেখে ডানহাতটা তুলে বলল, ঠিক মনে পড়িয়ে দিয়েছ তো। ভুলেই গিয়েছিলুম হাতের কথা। তাছাড়া, আর হাতের ব্যবহার হচ্ছে না কি না—তাই মনে থাকে না।

শীলা বলল, থামো। আমি খুলে দিচ্ছি। ইস্, কী বাঁধন বেঁধেছ!

সে সযত্নে খুলে ফেলল। ঘা প্রায় শুকিয়ে গেছে। রাহুল ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট শিশি বের করল। বলল, দেখছ কাণ্ড ? 'নেবাসালফের' শিশিটা রয়েছে আস্ত। অ্যাদ্দিন রোজ লাগালে মিরাকল্ ঘটে যেত। শীলা, পাওডার ছড়াও এক্ষুনি! সব ভুলভাল হয়ে গেছে।

শীলা শিশি খুলে পাওডার ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, চলে যাবে না কী বলছিলে?

হুঁ। এক্ষুনি বেরোব।

কোথায়?

সে শুনে কী হবে! আমি আর থাকব না এখানে।

তার মানে?

আর কদ্দিন তোমাদের কষ্ট দেব বলো!

শীলা একটু চুপ করে থেকে শান্তভাবে বলল, আমি কী বলব! তোমার ইচ্ছে।

শীলা!

উঁ?

তোমার বিয়েটা অব্দি থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভালো লাগছে না।

শীলা তাকাল নিষ্পলক। কোন কথা বলল না।

রাহুল ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, কিছু ব্যাপার আছে—তোমাকে না জানিয়ে পারছিনে শীলা। বেশ মজার ব্যাপার—হাস্যকর। সেজন্যেই জানাতে চাই।

শীলা নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রাহুল চাপা স্বরে—কিছু চপলতাও ছিল, বলল, সানুবাবুর একটা অদ্ভুত বাতিক আছে। সে একালের মেয়েদের বিশ্বাস করে না। সোজা কথায়—তার ধারণা, কনট্রাসেপটিভের যখন এত ছড়াছড়ি, কুমারীত্ব ব্যাপারটাও নাকি দুর্লভ হয়ে উঠেছে। অতএব তার ইচ্ছে—অরুণবাবুর বোনের একটা ডাক্তারি সার্টিফিকেট চাই আগে। তারপর বিয়ের কথা। এদিকে অরুণদা ....

শীলা ভ্রূ কুঁচকে বিকৃত মুখে বলে উঠল, ডাক্তারি সার্টিফিকেট ? তার মানে?

রাহুল সকৌতুকে বলল, বুঝতে পারছ না? সে তোমার নিষ্পাপ কুমারীত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে চায়।

শীলার মুখটা লাল হয়ে গেছে। সে সব্যঙ্গ বলল, নিষ্পাপ কুমারীত্ব! কিন্তু ডাক্তারবাবুরা কি মনেরও সার্টিফিকেট দিতে পারেন নাকি ? মনে মনে যদি আমি নিষ্পাপ না থাকি ?

রাহুল সামান্য আকর্ষণ করে ওর গালের কাছে মুখ রেখে বলল, জানি বাবা জানি—তুমি আমার

সঙ্গে মনে মনে পাপ করেছ। কিন্তু মনটনের ধার সানুবাবু ধারে না। সে বউ বলতে যদি বউয়ের বডিটাই বোঝে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সবাই তো মেয়েদের বডিটডি পাবে বলেই বিয়ে করে। আর সবাই চায়, বউর বডিটা প্রথম উপভোগ করবে সে নিজে। এর নাম কিনা পুরুষত্ব।

শীলা সরল না। বলল, ও! তাই বুঝি কিছুদিন থেকে দাদা প্রায়ই বলে—তুই রোগা হয়ে যাচ্ছিস রে। চল্, একদিন বড় ডাক্তার-টাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। হ্যাঁ—কাল রাতেও তো বলছিল দাদা! বউদিও খুব বলল।

তুমি রাজি তো?

উঁ?

ডাক্তারি পরীক্ষায়?

শীলা ঘুরে বসল। ওর চোখদুটো জ্বলতে থাকল। নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। সে রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি এর পরও বলছ আমি কচি খুকির মতো সোজা ডাক্তারের টেবিলে শুয়ে পড়ব?

না বললে নিশ্চয় পড়তে! .... রাহুল হেসে উঠল।

পড়তুম। না জেনে বিষ খাওয়ার ওপর কারো হাত থাকে না। ....শীলাকে অস্থির দেখাল। তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। .... ছোটলোক! ইতর! চামার!

কিন্তু সানুবাবু লোকহিসেবে বেশ ভালো। পয়সাকড়ি আছে। ... রাহুল আরও কি বলতে যাচ্ছিল, শীলা তার বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকল সে। রাহুল বলল, আঃ শীলা, ছাড়ো। কাঁদে না! কে এসে পড়বে এক্ষুনি—সেদিনের মতো। এই শীলা! কথা শোন। বিয়ে তো তোমাকে করতেই হবে—যেখানে হোক। এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তাছাড়া অরুণদার জন্যে তোমার স্যাক্রিফাইস করাটাও তো উচিত। সে তোমাদের কত করেছে-টরেছে। এ একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র। শীলা!

শীলা কান্নাজড়ানো গলায় বলল, তোমার লজ্জা করছে না বলতে ? গলা কাঁপছে না? বেশ—তবে আমাকে তোমার পিস্তলটা দিয়ে যাও। .. বলে সে সোজা হল। .... মানুষ মারা শেখাব বলেছিলে, দরকার নেই। আমি নিজে পারব।

রাহুল টের পেল তার মধ্যে কী একটা শক্তি জেগে উঠেছে আস্তে আস্তে। তার রক্ত চঞ্চল হচ্ছে ক্রমশ। সে শীলার চোখেচোখে তাকিয়ে বলল, সানুর হাতে মার খেয়েছিলুম। কিন্তু পাল্টা মার দিতে আজও পারিনি। উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। .... অথচ একটা কিছু করা দরকার। সত্যি শীলা, হার স্বীকার করে বেঁচে থাকাটা আমার স্বভাবের বাইরে। কিন্তু কী করব? আমার... আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না আর। শীলা, ইচ্ছে করছে যাবার আগে সানুকে হারিয়ে দিয়ে যাই—অন্তত একটা জায়গায়। সে হয়তো মোক্ষম মার হবে ওর পক্ষে। কিন্তু .....

শীলা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। দুচোখে কিসের আগুন ধক ধক করে উঠল। চুলগুলো বিস্রস্ত হল। সে থরথর করে কাঁপছিল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কেন পারবে না? আমি যদি ডাকি তোমাকে ? আমি নিজে তোমাকে ডাকছি। .... ফিস ফিস করে উঠল। ... বউদি নেই। ডাক্তারের ওখানে গেছে। নেত্য রান্নাঘরে। দাদা বেরিয়েছে। কেউ আসবে না।

ভিতরের দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে এল রাহুল। তারপর জানলাগুলো। ঘরটা আবছা আঁধারে ভরে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু চাপা কিছু শ্বাস প্রশ্বাসের ধ্বনিপুঞ্জ। ......

চলে যেত ঠিকই—কিন্তু আর সম্ভব হল না। কারণ সকালের সেই বিস্ফোরণের পর রাহুল আবিষ্কার করল, শূন্যতা আর উদ্দেশ্যহীনতার চাপচাপ অবরোধ কোথাও সরে গিয়ে কিছু অর্থময়তা কিছু উদ্দেশ্য উঁকি দিচ্ছে। গঙ্গা বলেছিল, ... তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে? ..... আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো।

গঙ্গার কথাগুলো বারবার তার মনে ভেসে আসছিল। পায়ের নিচে যে মাটি দরকার—তা কি শীলার ভালবাসা? কৈশোরে একদা গঙ্গার দেহে দেহ মিশিয়ে সে যে সুখের স্বাদ প্রথম পেয়েছিল, তার

মধ্যে আর যাই হোক, ভালবাসা ছিল না। তা ছিল নিষিদ্ধ প্রান্তরে খেলার গোপন আনন্দ—তার মধ্যে অস্থিরতা বেশি, উত্তেজনাই পরম, তার নিচে কোন বুনিয়াদ ছিল না। শুধু জেনেছিল, কামনা নামে একটা ব্যাপার মানুষের রক্তে থাকে। কামনার সুখটা সে একটু একটু চিনেছিল। দুঃখের দিকটা জানা হয়নি। জানা হল অনেক বছর পরে। অথচ সে তো শুধু কামনাই! ভালবাসা নয়। ভালবাসা আলাদা জিনিস। তার অচেনা কিছু। এতদিনে একটা সকাল কামনার সঙ্গে ভালবাসাকে নিয়ে এল। আর ভালবাসার এত অশেষ দুঃখ! দুঃখ দিতে জানে ভালবাসা।

চলে যাওয়াটা আবার ভেবে দেখবার বিষয় হয়ে উঠল রাহুলের কাছে। একটা দুঃখ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে—যেখানে যাক, যতদূরে যাক্ সে। বার বার মনে হবে, মাত্র একবার সত্যিকার ভালবাসার খপ্পরে সে পড়েছিল। তার মধ্যে পবিত্রতা আর সৌন্দর্যের ছিল আভাষ। দেহের মধ্যে দিয়ে দেহাতীত একটা সত্তাকে ছুঁয়েছিল সে। হায়, তাকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়নি—সে যেখানেই যাক, ভাববে। অস্থির হবে। বিকেলে সাইকেলে চেপে সানু হাজির হল সেদিন।.. কী, আর যে পাত্তা নেই! শোক দুঃখ কি চিরকাল বয়ে বেড়ায় মানুষ? বাবাবা কেউ বাঁচে না। চলো ঘুরেটুরে আসা যাক্। এই গরমে চুপচাপ শুয়ে থাক কী করে? অ্যাঁ?

অরুণ ছিল ইটখোলার দিকে। হয়তো দূর থেকে আসতে দেখেছিল সানুকে। এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। .... এস, এস। আজই ভাবছিলুম, তোমার কাছে যাই একবার।

সানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী ব্যাপার?

অরুণ বলল, না—তেমন কিছু না। এমনি। মানে তোমার বউদি বলছিল—ও আসেটাসে না আর। অসুখ-বিসুখ হল নাকি।

সানু বলল, নাঃ। আমার অসুখ-বিসুখ হয় না। ভালো কথা—অরুণদা, এক্ষুনি শ'দুই টাকা দাও তো! শিগ্‌গির! বড্ড দরকার। আর ইয়ে—শীলা কোথায়?

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে ডাকল, শীলা, শীলু! এদিকে একবারটি আসবে?

শীলার কোন সাড়া না পেয়ে সে ভিতরে গেল। সানু চোখ নাচিয়ে রাহুলকে বলল, দেখলে শালা আমাকে কী ভয় পায়! এক্ষুনি টাকা এসে যাবে। শীলাও এসে পড়বে। দুনিয়াটা এমনি জায়গা রাহুল—বুঝলে ভাই? সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

রাহুল শুকনো হাসল মাত্র।

সানু ফিসফিস করে বলল, গত রাত্রে ফের তিনতিনটে ট্রাক উজোড় হয়ে গেছে জানো?

রাহুল কৌতূহলী হয়ে বলল, কী হয়েছে?

সানু ফ্যাঁচ করে হাসল। .... মুক্তকেশী হোটেলটা যে দি সেন্টার অফ দা রিং, পুলিশ কল্পনা করতেও পারে না। যদ্দিন ওটা থাকবে—তদ্দিন এই সব চলবে। লক্ষ্য করেছ, যত ট্রাকড্রাইভারের আড্ডা হল ওখানে! তোমার ছোটমা-টি যা জিনিয়াস, ভাবা যায় না!

রাহুল বলল, কাল রাতে রাহাজানি হয়েছে আবার?

সানু দুহাত ভর করে বুক চিতিয়ে দিল। বলল, হ্যাঁঃ! অমি হাওয়ায় গন্ধ পাই। দেখেশুনে আমারও ইচ্ছে করছে, ওদের দলে ভিড়ে যাই। পারিনে—কী হবে! এত ঢাকঢাকগুড়গুড় লুকোচুরি রক্ত জল করা আমার পোষায় না। আসলে ব্যাপারটা তো চুরি—নাকি? আমি চুরি চামারি ঘেন্না করি হে। চাইলেই যখন টাকা পাই, তখন ছেনালী করে কী হবে? ভিতরে বাইরে একরকম থাকাই আমার পছন্দ। শংকরটার মতো ছেনালি... হঠাৎ সে রাহুলের কানের কাছে মুখ আনল। .... শংকরের দিনকাল যা পড়েছে। তুমি বাপের ছেলে না কী হে? মাগীটাকে শায়েস্তা করতে পারছ না? হাজার হোক, বাবা বিয়ে করেছিলেন শাস্ত্রমতে। রক্ষিতা তো নয়। তোমার একটা কর্তব্য আছে—না নেই!

রাহুল ক্ষুব্ধভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, শীলা এসে ঢুকল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হল রাহুল। শীলা হাসল। .... কেন ডেকেছেন?

সানু বরের মতো লাজুক হাসল। .... আরে আসুন, আসুন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। অনেকদিন আসা হয়নি। বউদি কেমন আছে?

ভাল। ... শীলা নির্বিকার বলল। ... আমিও ভাল আছি। আর কী জানতে চান, বলুন?

সানু একটু অপ্রস্তুত হল। .... অতিথির প্রতি আপ্যায়নটা কি ঠিকমতো হচ্ছে? মনে হচ্ছে, হঠাৎ আপনার কাছে কী অপরাধ করে বসে আছি। বুঝলে রাহুল, এই ভদ্রমহিলা সানু চ্যাটারজিকেও থতমত খাইয়ে দ্যায় দাপটে। বাপ্‌স্, বুক টিপটিপ করছে।

সে কৌতুক দিয়ে শীলাকে পরাহত করার চেষ্টা করছে, রাহুল তা টের পেল। রাহুল শীলাব দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বসো। ভদ্রলোক এসেছেন। একটু গল্পগুজব করা যাক্। কাল রাতে কী হয়েছে বললেন সানুদা?

শীলা লক্ষ্মীমেয়ের মত বসল কোণের দিকে একটা চেয়ারে। সানু তার দিকে তাকালে দেখত, ঠোঁটের কোণে প্রচ্ছন্ন কী বিদ্রূপ উঁকি দিচ্ছে।

সানু বলল, ব্রিজের ওখানে ফের তিনটে ট্রাক ফর্দাফাঁই। এত চুপি চুপি হয়েছে যে একশোগজ দূরের সেন্ট্রিরা টুঁ শব্দটি পায়নি। বোঝ ব্যাপারখানা। এদিকে ....

সেই সময় অরুণ এসে ওকে ডাকল। .... একটু বাইরে চলো সানু, কথা আছে।

দুজনে বাইরে গেল। কিছুক্ষণ ফিসফিস করে কিছু কথা হল। তারপর সানু একা ফিরল। রাহুল টের পেল যে অরুণ ওকে টাকা দিয়ে গেল। সে শীলার দিকে চোখ টিপে হাসল। শীলা ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফেরাল অন্যদিকে।

রাহুল বলল, আমরা চা পাবো তো এখন? শীলা, শুকনো মুখে আড্ডা জমে না।

শীলা উঠতে যাচ্ছিল—সানু বলল, চা-ফা হবে। রাত্রির কাণ্ডটা শোন।

শীলা বলল, আহা, চা খেতে খেতেই শোনা যাবে। আসছি।

সে চলে গেলে সানু অভ্যাসমত পা দোলাতে দোলাতে বলল, এই শীলা মেয়েটি এজন্যেই আমার বেস্ট চয়েস রাহুল। দারুণ গিন্নিপনা আছে। তার ওপর চেহারায় এমন দীপ্তি যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আমি শালা বড় ভাগ্যবান। অবশ্য .... সে ফিস ফিস করে বলল—অবশ্য এমন ভাল জিনিসকে অরুণচন্দ্র তলে-তলে ফাঁসিয়ে রেখেছে কি না কে জানে!

রাহুল ঠাণ্ডা স্বরে বলল, সে তো হেল্‌থ সার্টিফিকেটেই ধরা পড়বে। ভাবনা কিসের?

সানু কিন্তু রীতিমত গম্ভীর। সে বলল, সেই সমস্যা। কিন্তু রাহুল, ইট ইজ সিওর অ্যান্ড সার্টন—শেষ অব্দি ভেবে ঠিক করেছি—ইফ শী ইজ রিয়েলি টাচ্‌ড্ বাই সামবডি, তবু আমি ওকে বিয়ে করব। এ আমার জেদ। আরে ভাই, বললে কী হবে—পৃথিবীতে কোথাও কি খাঁটি জিনিস আছে—নাকি থাকে? ভালমন্দর ভেজাল দিয়ে সবকিছু তৈরি। যদি শীলার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে থাকে, হোক—কিছু যায় আসে না।

রাহুল বলল, তাহলে ডাক্তারি পরীক্ষা নিশ্চয় করাচ্ছেন না।

নাঃ। ওটা একটা কথার কথা বলেছিলুম মাত্র। সানু খিকখিক করে হাসল। অরুণটা একটা ছোটলোক। তাছাড়া ব্যাটার প্রাণের দায়ও বটে। তাই স্বীকার করে নিয়েছি। এমন ইনসালটিং সর্ত কোন ভদ্রলোক মাথা পেতে নিতে পারে? নেভার। অতএব অরুণশালা কী মাল, বুঝে দ্যাখ।

রাহুল বলল, হুঁ। তাহলে শীলাকে বিয়ে করতে আর তো বাধা নেই।

তা নেই। ভাবছি কালপরশুর মধ্যে দিনটিন ফাইনাল করে ফেলব। আসলে হয়েছেটা কী জানো? আমার বউদিটার ব্যবহারেই অবশেষে ঝুলে পড়তে হল। যা আছে কপালে। ওকে মুখের ওপর বলে এসেছি, তোমার চেয়ে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী সদ্বংশের মেয়ে আমি এ সপ্তার মধ্যে বউ না করে ফেলি তো আমি বেজন্মা। শশাঙ্ক চ্যাটারজির ঔরসে আমার জন্মোই হয়নি। মাগীকে দেখিয়ে দেখিয়ে বউ নিয়ে বাড়ি ঢোকা চাই। এক ডজন ব্যান্ড পার্টির অর্ডার দেব। কান্দী থেকে বাজি পোড়াতে মালাকার আনব। দাদার গাড়ি আছে—আমার নেই। তো কী হয়েছে? কাটোয়ার গুরুদাস আঢ্যির ছেলে আমার বুজুম্ ফ্রেন্ড। কলকাতায় থাকে। মস্তো ক্যাডিলাক আছে তার। শালা হাইওয়ে দিয়ে প্রিঁ প্রিঁ করে চলে আসবে। হই-চই ফেলে দেবে সানু চ্যাটারজি!

সানুকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। তার মুখটা লাল—ফেটে পড়ছে যেন। রাহুল বুঝল, পারিবারিক

চাপা ক্রোধটা ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আর কৌতুক অনুভব করছিল না রাহুল। প্রচ্ছন্ন অস্বস্তি ভাবে আড়ষ্ট করছিল ক্রমশ। সে মুখ ফসকে বলে ফেলল, সব বুঝলুম। কিন্তু শীলা—শীলা যদি রাজি না থাকে!

সানু চমকে তাকাল। ... কেন? সে রাজি নয়—এমন কথা তো শুনিনি। আর তার অরাজির কারণ কী আছে? আমি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ তো বটে। খেঁদাপেঁচাও নই—কী বলো তুমি? আমার ক্যাশ টাকা প্রচুর না থাকলেও সম্পত্তি আছে। সংসারী হলে তখন সব ছেড়েটেড়ে টাকা-পয়সার দিকে মন দেব। আশাকরি, সৎপথে থেকেও ভাল কামাতে পারব। পারব না?

ওর কথায় একটা অসহায় কাকুতি ছিল। রাহুল গুম হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শুকনো হেসে বলল, না। এমনি বললুম। শীলার ভাগ্য তো বটেই।

সানু চাপাস্বরে বলল, তুমি একটু সাহায্য করবে রাহুল?

বলুন না। নিশ্চয় করব।

শীলা—ধরো যদি রাজি নাও থাকে, মেয়েদের ব্যাপার তো—বুক ফাটে মুখ ফোটে না—তুমি ওকে বুঝিয়ে বলবে? তোমাকে তো ও মনে হয়—খুব খাতির করে।

আমার বলায় কি কাজ হবে? আমি তো বাইরের লোক। আজ আছি—কাল নেই। তাই হয়তো খাতির করে। খাতির দিয়ে তো বেশি দূর এগোন যায় না।

সানু সবেগে মাথা নাড়ল। .... উঁহু হুঁ। তোমার ভীষণ সেবাশুশ্রূষা করেছে শুনেছি।

তাতে কি হয়েছে? বাইরের লোক এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়েরা একটু আধটু লক্ষ্য রাখে। এটা নিয়ম।

সানু চুপচাপ বসে রইল। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবতে থাকল। ইতিমধ্যে শীলা এসে গেল চা নিয়ে। চা রেখে সে চলে গেলেও সানুর ধ্যানভঙ্গ হল না যেন। রাহুল বলল, চা নিন সানুদা।

সানু হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল। কিন্তু তার অন্যমনস্কতাটা ঘুচল না।

রাহুল বলল, কী ভাবছেন?

উঁ?

অত ভাববার কী আছে। বিয়ে তো হচ্ছেই। অরুণ যখন শীলার গারজেন—অরুণ কথা দিয়েছে, ব্যস—আর কোন কথা নেই।

তা তো নেই। ... বলে সানু ঘুরল। .... রাহুল, তোমাকে একটা কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

বেশ তো। বলুন।

তুমি শীলাকে আমার অসাক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে, ওর কী মত। তারপর ....

আমাকে যদি না বলে?

আরে বাবা, যাহোক একটা কিছু জবাব দেবে তো সে! সেটাই আমার জানা দরকার। অ আ ক খ —যা হোক কিছু তো বলবে।

রাহুল হেসে বলল, যদি মুখ না খোলে একেবারে?

সানু হেসে উঠে উরুতে থাপ্পড় মারল। ... ব্যস। মৌন সম্মতি লক্ষণং। সেটাও একটা খবর।

আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করুন না। আমি বাইরে যাচ্ছি।

সানু স্যাঁচ করে জিভ কেটে বলল, ধ্যাৎ! সে হয় নাকি?

বাকি চা-টুকু গিলে সে উঠে দাঁড়াল। .... চলো, সন্ধেবেলাটা একটু ঘুরে আসা যাক। হ্যাঁ, ভাল কথা। ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার ছোটমা আজ সকালে বলছিল—তোমার বাবার কিছু বাকসোপত্তর আছে। পুরনো আমলের জিনিস সব। তোমাদের ফ্যামিলির নিজস্ব। ওগুলো সে রাখতে চায় না। ইচ্ছে করলে তুমি ফেরত নিতে পারো।

রাহুল মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠল। তাই তো! তার মায়ের কত সব স্মৃতি—দাদুর কত কিছু এবং বাবারও অনেক জিনিস রয়ে গেছে। গ্রাম ছেড়ে আসবার সময় সবই তো ওঁরা নিয়ে এসেছিলেন।

ওইসবের মধ্যে তার নিজের ছেলেবেলারও অনেক কিছু থাকা সম্ভব। হয়তো কোন পোশাক-আসাক— কোন ছবি।

ছবি। মা-বাবার ছবি। স্কুলে বাবাকে বিদায়সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল—তারও ছবি আছে।

রাহুল কোন কথা না বলে উঠল। সানু বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে রাহুল ডাকল শীলাকে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, এবং অস্ত্রটা তো নেবেই। ...

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে হাইওয়েতে এল। তারপর কিছুদূর হেঁটে মুক্তকেশী পৌঁছল। সানু বলল, এক কাজ করো। তুমি ততক্ষণ কাজ গুছিয়ে নাও। আমি একপাক ঘুরে আসি। টাকার দরকার। শঙ্করকে পাকড়াব। জাস্ট এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তারপর রিকশো ডেকে মালপত্র যা নেবার নিয়ে ওখানে পৌঁছে দেব। কেমন?

সানু চলে গেল। রাহুল একটু দাঁড়িয়ে ইতস্তত করার পর হোটেলের বারান্দায় উঠল। ঘোঁতন বলল, মা ভেতরে আছেন। যান না।

সাত বছর আগে গঙ্গাকে দেখেছিল। চঞ্চল হাসিখুশি বেপরোয়া। উদ্দাম বন্যতাই ছিল তার জীবনের ছন্দ। শুচিতা-অশুচিতা পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বাইরে ছিল তার অবস্থিতি। নিঃসঙ্কোচে সে নিজের সবকিছু—দেহ বা মন, বাজি রেখে খেলতে পারত। বুক খুলে খুব সহজে সে তার নতুন স্তনের তিলটা দেখাতে পারত। বলত, চুষে দ্যাখো না—দুধ পাবে না একফোঁটা। পাবেই না। আমি যে কক্ষনো মা হবো না!

সাত বছর পরে এসে আরেক গঙ্গাকে দেখেছিল। ধীর শান্ত গম্ভীর। পুরো জোয়ার এসে গেলে নদীর যে থমথম স্থিরতা—তা ছিল তার মধ্যে প্রকাশিত। তার যৌবন নিজের কাছে গোপন প্রাচুর্যের প্রতীক—কৃপণের ধনের মতো লোহার সুকঠিন আলমারিতে গঙ্গা যেন নিজের দেহকে রাখতে শিখেছে। সে পাপপুণ্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা চিনেই মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে একহাতে পাপ অন্য হাতে পুণ্যকে ছুঁয়ে থেকেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সে মা হয়ে গেছে। তার স্তনে অভাবিত দুধের উৎস খুলে গেছে সংসারী প্রৌঢ় পুরুষের কামনার দাঁতে—আর সে পুরুষকে সে হয়তো একদা পিতৃসম দেখেছিল। তাই সব মিলিয়ে সে ছিল বিদ্রোহিনী গঙ্গা। কিন্তু পূর্ণতা দিয়ে সব বিদ্রোহ সব প্রক্ষোভ সে ঢেকে রাখতে জানত।

আজ এক গঙ্গাকে দেখল রাহুল। চমকে উঠল বিস্ময়ে এবং ঘৃণায়।

ভেবেছিল, দেখবে শান্ত সৌম্য শোকনম্র বিধবাকে—হয়তো স্বামীর নয়, ছেলের শোকে বিধ্বস্ত—ভাটার নদীর মতো শূন্য আর গভীর। ক্ষীণ স্মিত জলধারায় রোদ চিকচিক করছে বিষণ্ণতার মতো। তার দুপাশে জমে থাকবে পুঞ্জীভূত অনুশোচনার ক্লেদ।

কিন্তু এ কী গঙ্গা! তার কোথাও কোন অনুশোচনা—কোন রিক্ততা—কোন হারানোর দুঃখ নেই। ফিকে রঙের ভয়েল শাড়ি জামা, দুহাতে মোটা রুলি, গলায় চেন লকেট, কানে বেলকুঁড়ি, কপালে একচিলতে বেগুনি রঙের টিপ—নাগরী গঙ্গার দুচোখে কামনা বাসনার প্রবল উচ্ছলতা। তার দেহটা প্রগলভ হয়ে উঠেছে। তেইশ বছরের যৌবনকে দারুণ ঝাড়পোঁছ করে, ঝড় ঝাপটার ধুলো বালি মুছে, দেহের আলমারিতে সাজিয়ে নিয়েছে এবং এখন সহজেই সে কপাট খুলে থাকে থাকে সাজানো হরেক জিনিস দেখাতে সংকোচ বোধ করে না যেন।

চোখ জ্বলে উঠেছিল রাহুলের। খোলামেলা মুক্তির বিশাল মাঠে একা হেঁটে চলেছে মুক্তকেশী গঙ্গা। ভবানীবাবু তার মেয়ের নাম মুক্তকেশী রেখেছিলেন। তখন কী জানতেন এ মেয়ে একদা সত্যি সত্যি মুক্তকেশী হবে—ভয়ঙ্করী এবং বিবসনা—অযুত পুরুষের মুণ্ডুমালা যার গলায় শোভা পায়?

গঙ্গা আয়নার ভিতর রাহুলকে দেখেছিল। বলল, এস। তোমাকে ডেকেছিলুম।

রাহুল দাঁড়িয়ে রইল।

গঙ্গা বলল, বসো—দাঁড়িয়ে কেন? একটু দেরি করে এলে দেখা পেতে না। একবার বেরোচ্ছিলুম। যাক গে—আর যাচ্ছিনে কোথাও। তুমি এসে গেছ। আরে, বসো।

বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে দিল সে। রাহুল তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে গঙ্গা বলল, এটা নতুন বিছানা। বসতে পারো।

অর্থাৎ ভেবেছে যে রন্টু যে বিছানায় মরে পড়েছিল, সেটা বলে রাহুল বসতে চাইছে না। রাহুল অবশ্য বসল। তারপর বলল, বাবার কীসব জিনিসপত্র আছে?

গঙ্গা সামান্য দূরে বসে বলল, হ্যাঁ—ওই তিনটে বাকসো। বিছানাপত্তর তো সব ফেলে দেওয়া হয়েছে। অনর্থক এ বাকসোগুলো রেখে কী করব। যার জিনিস, সে এসে নিয়ে যাক।

রাহুল বলল, কী আছে-টাছে ওতে?

গঙ্গা ভ্রু এবং নাকের ডগা কুঁচকে বলল, আমি দেখিনি। ওগুলো খুলতেও অবশ্য দেখিনি কোনদিন। অন্যের জিনিসে আমার কোন আগ্রহ নেই। সে অস্ফুট হাসল।

রাহুল উঠে গিয়ে পুরনো ময়লা ঢাকনা দেওয়া ওপরের বাকসোটা খুলে ফেলল। তালা দেওয়া নেই। তালা নিচের দুটোয় অবশ্য আছে! ডালা খুলতেই কেমন একটা গন্ধের ঝাঁঝ তার নাকে এসে লাগল। কী যেন মনে পড়ে গেল গন্ধটার অনুষঙ্গে—আবছা কী স্মৃতি! কোন সকাল দুপুর অথবা বিকেলের—রোদ-ছায়া-নীলিমায় ঘেরা পৃথিবীর একটা পাড়াগেঁয়ে জীবনের কিছু মুহূর্ত—জানালার বাইরে দেখা ধুধু গঙ্গার বালুচর, ঝাউবন, কাজল জল, তার মা এক গুচ্ছের খাতা-পত্র বই, ছেঁড়াখোঁড়া জামা, কৌটো, টুকিটাকি জিনিস কতরকম। হরিণের শিঙ একটা। একটুকরো চন্দনকাঠ। একটা পুঁতির মালা। ছোট্ট হাতুড়ি। ....

বইগুলি তার ছেলেবেলার স্কুল পাঠ্য। খাতাগুলোও। এটা বুঝি বাবার সেই সিল্কের পাঞ্জাবি! ওটা কি তার চেককাটা লাল শার্টটা! একটা অসমাপ্ত সোয়েটার—নেভীব্লু রঙের, কিছু উলের গুটি। মা বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে ধীরে সুস্থে তুলব। এখন তো মোটে খরা। শীত আসতে ঢের দেরি!...

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে পড়েছিল সে। গঙ্গার কথা ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল। তার নগ্ন ঘাড়ের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটায় সে একটু ঘুরল—গঙ্গা ঘনিষ্ঠভাবে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এবং কাঁধের ওপর দিয়ে জিনিসগুলো দেখবার চেষ্টা করছে। রাহুলের পিঠে—হয়তো মনের ভুল—গঙ্গার সামান্য চাপ—সে অস্বস্তিতে অস্থির হল চকিতে। গঙ্গা বলল, ওগুলো কোথায় নিয়ে যাবে ভাবছ?

রাহুল দেখল, সরতে হলে ডাইনে বা বাঁয়ে ছাড়া আর জায়গা নেই—সে বাকসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে আবছা অন্ধকার। বাইরে সূর্য ডুবে গেছে একটু আগে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, আলো জ্বালবে?

জ্বালছি। গঙ্গা যেন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল কথাটা। .... কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে শুনি? অরুণের ওখানে?

রাহুল বলল, হ্যাঁ আপাতত তাই। তারপর ....

তারপর?

কিচ্ছু ঠিক নেই!—বলে রাহুল বাকসোটা বন্ধ করল। সরে এল একটু।

সে তো নেই, জানি। ঠিক করে নিতেই বা দোষ কী?—গঙ্গা হাসল—ভ্রূ কুঁচকে ডান ভ্রূটা একটু তুলে ফের বলল, এক কাজ করলেই পারো। শীলা বেচারাকে আর মিছেমিছি না তাতিয়ে বিয়ে করে ফেলো না কেন? শুনেছি, বেথুয়াডহরিতে ওর বাবার বাড়িটা এখনও আছে।

রাহুল কোন জবাব দিল না। গঙ্গা বলল, অবশ্যি সানু গোলামাল করে ফেলতে পারে। কিন্তু তোমরা দুজনে যদি চুপচাপ কেটে পড়ো, ও কী করবে? বলো তো—আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রাহুল বলল, কী ব্যবস্থা করবে?

গাড়ির। চাই কি সানুর দাদার জিপটাও মিলে যেতে পারে। সানু ন্যাকের ওপর ঘা খাক্ না।

সানুর দাদা তো বিখ্যাত লোক—তার সঙ্গেও তোমার ভাব আছে? ... রাহুল তার বিদ্রূপটা আর লুকোতে পারল না।

আছে। ... গঙ্গা কিন্তু গম্ভীর। .... থাকা খারাপ ভাবছ কেন? ভবানীবাবু খুব সামান্য লোক ছিলেন না। তাঁর ফ্যামিলির সঙ্গে চাটুয্যেদের যোগাযোগ থাকবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। হোটেলওয়ালি হয়েছি বলেই তো বংশমর্যাদা চলে যায় না। যা ছিল—তা আছে। তুমি ভুলে যেও না—আমার দাদু ছিলেন চাটুয্যেদের মতোই একসময়ের জমিদার। .... বলে গঙ্গা উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালল।

রাহুল বলল, দেখি—সানুদা কখন আসে।

কোথায় যাচ্ছ?

রিকশো ডাকতে হবে। সানুদার অপেক্ষা শুধু।

হাত ধরে টেনে গঙ্গা বলল, বসো—কথা আছে। আসছি।

রাহুল বসল না। বলল, কী কথা?

গঙ্গা কেমন হাসল। ... তোমার বয়স কোনদিন হয়ত বাড়বে না! সেই যা দেখেছিলুম, আজও তাই। বসো না, এখুনি আসছি। চা খেতে ইচ্ছে করছে না?

না। এক্ষুনি খেয়ে এলুম।

আমারও তো ইচ্ছে করতে পারে। মনে পড়ে? সেই যে ওবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সন্ধেবেলা দুজনে চা খেতুম—আমার কোঁচড়ে গরম মুড়ি থাকত। আঃ, কী সব দিন ছিল!

গঙ্গা চলে গেল। রাহুল কেমন অবশ বোধ করল। অবশ্য সানু না আসা অব্দি তার থাকা উচিত। একা বেরোতে গা ছমছম করে আজকাল। মনে হয়, রিভলবারটা মরে গেছে কখন। সে আজ পুরোপুরি নিরস্ত্র। নিরস্ত্র কিংবা কুরুক্ষেত্রে কর্ণের মতো।

বারান্দায় টিমটিমে আলো। বাবার ঘরে তালাবন্ধ রয়েছে। হঠাৎ রাহুলের মনে হল—গঙ্গা কি একা এ ঘরে থাকে? সম্ভবত ঘোঁতন ছোকরাটাও থাকে। তা না হলে তো তার ভয় পাওয়া উচিত এঘরে শুতে। দু দুটো ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে এখানে। এই ঘরে রন্টু মরে পড়ে ছিল। এই খাটটাতে। গা শিউরে উঠল রাহুলের। ভূতপ্রেতের ভয় তার নেই। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে এই শূন্য বাড়িটা হাঁ করে তাকে গিলতে আসছে যেন। সে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে রিভলবারটা বের করল। চারিদিকে তাকাল। মনে হল— সামনে পিছনে ইতস্তত কিছু অদৃশ্য আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাকে লক্ষ্য করছে। কিছুতেই এই ভয়টা তাড়াতে পারল না সে।

পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত অস্ত্রটা পকেটে ভরে ফেলল সে। গঙ্গা এক কেটলি চা আর একটা ঠোঙা হাতে ঘরে ঢুকল হাসিমুখে। ... দিনগুলো কী-ভাবে কাটাচ্ছি, আমিই জানি। এত একা লাগে মানুষের, কখনো ভাবিনি। সারা রাত জেগে থাকি। ভয়ে চমকে উঠি। এত কান্না পায় তখন ... সে আলমারি খুলে কাপপ্লেট বের করতে থাকল।

রাহুল বলল, চা-ফা আমি খাবো না কিন্তু।

গঙ্গা আমল দিল না তার কথায়। বলল, কী করব—এর নামই তো ভাগ্য। একসময় তোমাকে বলতুম—আমার কী মজা, কী মজা! মা হবো না। কারো ঘর করব না। মনে পড়ছে রাহুল?

রাহুল মাথা দোলাল শুধু।

আমার প্রত্যেকটি কথা মনে আছে। ভুলিনি। ওই নিয়েই তো আছি—তাছাড়া আর কী আছে আমার?

রাহুল বলল, অল্প করে দাও—ব্যস!

চায়ের কেটলিটা নিজের কাপে উপুড় করে গঙ্গা বলল, একটুও বদলাওনি তুমি। সেদিনও ঠিক এমনি বলতে।

রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, সেদিনকে টেনে আনছ কেন? ছেড়ে দাও।

গঙ্গা চটুল গলায় বলল, আমি আনছি কি? চলে আসছে। অ্যাদ্দিন মাঝে জগদ্দল পাথর ছিল—তাই লজ্জা দুঃখ ঘেন্না ছিল। এখন তো আর আটকানো যাচ্ছে না রাহুল।

রাহুল বিকৃত মুখে বলল, সত্যি বড় অবাক লাগে তোমাকে। তুমি কী!

গঙ্গা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, তেলেভাজাগুলো গরম আছে। নাও—কই হাঁ করো—খাই—

দিই। মনে আছে? সেবার তোমার মুখে—রাহুলের চোখের দিকে তাকিয়ে সে অস্ফুট হেসে থামল। বলল, ঘাট হয়েছে। পিছনটা চাপা থাক্। কই হাঁ করো।

রাহুল সব্যঙ্গ বলল, ছোটমা তার কর্তব্য করছে না তো?

গঙ্গা পলকে বদলে গেল। .... কে ছোটমা?

তুমি।

না তোমার ছোটমা মরে গেছে। ... গঙ্গা হিসহিস করে উঠল। আর রাহুল, সেই পিছনটা যদি তুমি চাপা দিতে বলো—তাহলে এই পিছনটাই বা আমি চাপা দিতে বলব না কেন? নিশ্চয় বলব। আমি তোমার ছোটমা ছিলুম না—কোনদিনও ছিলুম না! তুমি আমাকে ঘেন্না করতে হয় করো—কিন্তু খেপিয়ো না।

গঙ্গার চোখে জল দেখে অবাক হল রাহুল। সে সংযত স্বরে বলল, আদিম যুগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল। তখন মেয়েরাই ছিল নাকি সমাজের লিডার। তাদের হুকুমেই পুরুষকে ওঠবস করতে হত। লিডার মেয়েটি ইচ্ছেমত পুরুষ বেছে নিয়ে তার সঙ্গে বাস করত। সন্তান জন্মাত। মা—তার মানে সেই লিডার তখন করত কি জানো? সন্তানদের ভিতর শক্তিমানদের বেছে নিত—যৌন সংসর্গ করত। ফ্রি সেক্স কাকে বলে—হয়তো তোমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না গঙ্গা। কিন্তু আমরা যে অনেক দূরে চলে এসেছি।

গঙ্গা কী বুঝল কে জানে—সে শ্বাসক্লিষ্ট স্বরে বলে উঠল, ছোটলোক তুমি। ইতর! অসভ্য!

তার নাসারন্ধ্র কাঁপতে থাকল। সে মুখ ঘুরিয়ে বসল। রাহুল বলল, মিছেমিছি গাল দিচ্ছ গঙ্গা। তুমি—আমার মনে হচ্ছে, সেই আদিম যুগ থেকে কীভাবে চলে এসেছ এখানটায়। তোমাকে এখানে মানায় না।

গঙ্গা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না। চায়ের কাপটা হাতে ধরা রইল। তারপর কঠিন আর ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে বলল, আমি তোমার মা নই। ভুলে যেও না কথাটা।

রাহুল বলল, তা ঠিক। কিন্তু গঙ্গা! তোমার সত্যিকার চেহারা কী, আজও আমি জানতে পারলুম না। তুমি কী? কী তোমার ইচ্ছে? খুলে বলবে?

গঙ্গা ঘুরে তাকাল। .... যদি বলি, তোমাকেই চাই! যদি বলি, তোমার ওপর রাগ করেই একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলুম—তোমাকে কত ঘেন্না করি, তা বলতে চেয়েছিলুম!.

মিথ্যা কথা! ..... রাহুল গর্জে উঠল। ... সব তোমার ছেনালি।

গঙ্গা চায়ের কাপটা মাটিতে ছুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। কাপটা সশব্দে ভেঙে গেল। সে অস্ফুট গর্জে বলল, আমার ছেনালি! ছেনাল বুঝি দ্যাখোনি তুমি। অরুণের বোনটা বুঝি খুব সতীসাধ্বী মেয়ে! বুকে বুক মিশিয়ে ছেনালপনা করতে তো কারো বাধে না!

রাহুল ক্ষিপ্রহস্তে রিভলবারটা বের করল। তাক করল গঙ্গার দিকে। গঙ্গা চুপ করে গেছে। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। আর সেই মুহূর্তে হঠাৎ মণিশঙ্কর এসে ঢুকেছে। সে চমকে উঠে চেঁচাল, সর্বনাশ! রাহুলবাবু, রাহুলবাবু! না—না—না।

রাহুল চাপা গর্জে উঠল, হ্যান্ডস আপ রাস্কেল! আজ দুটোকেই খতম করব।

থতমত খেয়ে মণিশঙ্কর দুহাত তুলে দাঁড়াল।

একটা কিছু ঘটে যেতে পারত। মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিতে কয়েকটা দণ্ডপল দরকার মাত্র—কিন্তু সানুও এসে পড়ল।

এসেই সে হো হো করে হেসে উঠল। ... আরে এ যে যাত্রার আসর একেবারে! এই রাহুল! রাখ তো তোমার ইয়েটা। ওই টয়পিস্তল দিয়ে আসর জমে না।

রাহুল বেরিয়ে গেল।

সানু পিছনে গিয়ে বলল, কী হয়েছিল বল তো খুলে?

রাহুল করিডোরে দাঁড়িয়ে বলল, রিকশো ডাকছি। আপনি বাকসো তিনটে এনে দেবেন সানুদা?

সানু বলল, লে হালুয়া! এসেই ঝগড়াঝাঁটি। ঠিক আছে রিকশো ডাকো।

সারারাত ঘুম আসছিল না রাহুলের। টিবির ওপর খোলামেলা জায়গায় অরুণের বাড়িটা। এ ঘরে জানালাও আছে অনেকগুলো। বাইরে গাছপালার শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছিল বাতাস বইছে উত্তাল। তালগাছের বিশাল শুকনো পাতাগুলো খড়খড় শব্দে নড়ছিল। অস্থিরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল নিসর্গে। অথচ ঘরের ভিতর যেন এতটুকু বাতাস নেই। কোণের টুলে টেবিলফ্যান আছে। সেটা হঠাৎ অকেজো হয়ে পড়েছে। সেটাও রাহুলের মেজাজ খারাপেব কারণ হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই কালো ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুটি অরুণ নয়—সম্ভবত সানুর দাদা নীরেন চ্যাটার্জি। অরুণ নিতান্ত জিম্মাদার—স্টকিস্ট। যাই হোক, এবার অনায়াসে রাহুল একে একে তিনটি বাহুকে খতম করে রাজেনবাবুর কাছে গিয়ে পুরস্কার নিতে পারে। কিন্তু আবার তার মাথায় এল, সে ত্রাণকর্তা নয়। ময়নাচক হাইওয়ে নিরাপদ করার জন্য তাব জন্ম হয়নি। রাহুল অন্যদিক থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। মণিশঙ্কর আর গঙ্গার মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে। গঙ্গা তার পরলোকগত বাবার স্ত্রী। কাজেই মণিশঙ্করকে খুন করলে বাবার পক্ষ থেকে একটা নৈতিক কর্তব্য পালন করা হয়। তাছাড়া মণিশঙ্কব তাকে সন্দেহ করে। সে চায় না যে রাহুল এখানে থাকে। রাহুল আরও থাকবার চেষ্টা করলে এরপর হয়তো সে রাহুলকে সত্যি খতম করতে চাইবে। এদিকে গঙ্গা—গঙ্গারও বেঁচে থাকার অধিকার নেই। বাবাব ওই ভয়ঙ্কর আত্মহননের জন্য দায়ী গঙ্গা। রণ্টু—নিষ্পাপ দুধের বাচ্চা—তাকে বাবা একরকম খুনই করেছেন এবং তার কারণও গঙ্গা। অতএব গঙ্গার চরম শাস্তি পাওনা হয়েছে। বাকি রইল নীরেন চ্যাটার্জি। তার সঙ্গে রাহুলের কোন যোগাযোগ নেই। তাকে খুন করার উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ গঙ্গা বা মণিশঙ্কর না থাকলেও কিছু যায়-আসে না, নীরেন চ্যাটার্জিই যখন মূল খুঁটি —বদমাইসির র‍্যাকেট সমানে টিকে যাবে। ... গা ঘামতে থাকল রাহুলের। ছেড়ে দিল প্রসঙ্গটা। শীলার কথা ভাবল সে। সানুর কথা। সানু বিয়ে করবেই। হয়তো জোর করে বিয়ে করবে শীলাকে। রাহুল কি সত্যিসত্যি শীলাকে ভালোবাসে? তুমি কী শীলাকে ভালবাসো রাহুল? নিজের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।

তারপর কিছুক্ষণ বাইরে নিসর্গে মন রাখল। বাতাসের শব্দ শুনল একমনে। তারপর দেখল শেষ প্রশ্নটা তার মাথার ভিতর সাপের মত ফণা তুলে বসে রয়েছে। ভালোবাসা কি তাই—যা বেঁচে থাকে কিছুক্ষণের সংসর্গে, চিন্তাভাবনার অভ্যাসে, দেহের অভ্যাসে? দূরে গেলে যা মরে যায়! তখন বয়স কম—তবু গঙ্গাকেও ঠিক এমনি লেগেছিল। কত আপন কত কাছের এবং মোহসঞ্চারিণী! তারপর ঠিকই ভুলে গেল। প্রকৃত ভালোবাসা কী—তা হয়তো জানা হয়নি তার। যা সময় ও দূরত্ব—অর্থাৎ দেশ-কালের ধার ধারে না। ..... পরক্ষণে হাসল। —ভেট! তা অবাস্তব অসম্ভব। ক্ষণিকতার মধ্যেই ভালবাসার বেঁচে থাকা। তার আয়ু খুব ক্ষীণ। শীলা আর সে হয়তো যথানিয়মে ফের দূরে সরে যাবে পরস্পর। তারপর আর কোন কষ্টই হবে না কারো।

.... হবে না? তাহলে কেন গঙ্গা তাকে এত উত্তেজিত করল—এখনও করে চলেছে সমানে? আর, গঙ্গাও কেন বারবার তার মতোই আজও স্মৃতির কথা তোলে—ভোলে না কিছু, ভোলেনি? সংস্কারের শক্ত পাঁচিল চুঁইয়ে এপার-ওপার শিশিরের ফোঁটার মতো ভিজে দুঃখ, টলটলে ঘৃণা, স্যাঁতসেঁতে সবুজ শ্যাওলার মতো হাল্কা কামনার রঙ চোখে পড়ছে পরস্পর? একদিন শীলার জন্যেও তাই হবে। যে পুরুষ বা মেয়ের দেহকোষগুলো প্রাণবন্ত শুধু নয়—সজাগ, প্রতি রোমকূপে একটা করে চোখ—চেতনার তীব্রতায় যারা আজীবন জর জর থাকে—প্রকৃতির অদ্ভুত ফসল সেইসব পুরুষ ও মেয়ের জীবনে কামনা যত সুখ আনে, তত আনে দুঃখ। রাহুলও তাদের একজন। হয়তো গঙ্গাও। রাহুল, তুমি ঠিক সেই রকম। গঙ্গা, তুমিও তাই। ... রাহুল সিগ্রেট জ্বালল আবার। মাথার ভিতরটা শুকনো লাগছে। একটা অসহায় আকুতি তার ভিতর ছটফট করে উঠেছে। ভয়ঙ্কর শূন্যতার সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে বারবার। কী করবে সে? রাহুল তুমি কী করবে?.... অবশেষে সে উঠে বসল। তক্তাপোষটা মচমচ করে কাঁপল। বালিশের নীচে থেকে রিভলবারটা বের করল। ময়নাচকে আসার রাত্রে একটা কার্তুজ খরচ হয়েছিল—বাকিগুলো পোরা আছে সেই থেকে। রিভলভিং কেসের সেই শূন্য খাপটা আর পূর্ণ করল না। দুটো কি তিনটে কার্তুজই যথেষ্ট। রাজেনবাবুর জন্য নয়—নিজের

জন্যে আর গঙ্গার জন্যেই এটা জরুরী।

...... দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপি চুপি খালি পায়ে সে বেরুল। খালি গায়ে, পরনে প্যান্টটা মাত্র। অসম্ভব হাল্কা লাগছে শরীর। শুক্লপক্ষ শুরু হয়েছে সবে। চাঁদ অনেক আগে ডুবে গেছে। অন্ধকার আছে। সে হাইওয়েতে উঠল না—মাঠের দিকে নামল। অনেকটা ঘুরে একটা বাগান পেরিয়ে মুক্তকেশীর পিছনের দিকে পৌঁছল। খিড়কির দিকে ছোট্ট ডোবা। ডোবার পাড়ে পাঁচিল। পাঁচিলে লতা-পাতার ঘন বিনুনি। সামান্য শব্দ হল। সে উঠোনে নামল। বারান্দায় উঠল। বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা। ঘরে মৃদু নীলচে আলো টেবিলল্যাম্পের। গঙ্গা—মণিশঙ্কর! পাশাপাশি শুয়ে আছে। রক্ত ছলাৎ করে উঠল। রিভলবার তুলে প্রথমে লক্ষ্য করল গঙ্গাকে। ট্রিগারে চাপ দিল। কোন শব্দ নেই। ফের জোরে চাপ দিল! নিষ্ফল। রিভলভিং কেসটা ঘুরিয়ে দিল আঙুলের চাপে। ফের ট্রিগার টিপল। আওয়াজ হল না। জ্যাম হয়ে গেছে! রাহুল থরথর করে কাঁপতে থাকল। গঙ্গা চোখ খুলেছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ঙ্কর হিংস্র চাহনি। অব্যক্ত আর্তনাদ বেরুল রাহুলের গলায়।.....

চোখ খুলল সে। শীলা তার গায়ে চিমটি কাটছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসল রাহুল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

শীলা হেসে বলল, গোঁ গোঁ করছিলে শুনে ছুটে এলুম। স্বপ্ন দেখছিলে? কী স্বপ্ন?

স্বপ্ন দেখছিল। বাইরে ভোর হয়েছে। ধূসর আলোয় পাখ-পাখালি ডাকছে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা আর নেই। ঘামে সারা শরীর জবজব করছে। ঠোঁট মুছে সে তাকাল শীলার দিকে। তারপর বালিশ তুলে রিভলবারটা বের করল। দেখে নিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর .....

শীলা হাঁ হাঁ করে উঠছিল। রাহুল জানালা দিয়ে অদূরে ইটের পাঁজাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। বিস্ফোরণের আওয়াজে বুক কেঁপে উঠল শীলার। বারুদের কটু গন্ধ ভেসে এল। রাহুল একটু হেসে রিভলবারটা ফের যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলল। বলল, পরীক্ষা করে দেখলুম। অনেকদিন চুপচাপ আছে তো! আর শীলা, মাঝে-মাঝে হঠাৎ ভয় হয়, ওটা অকেজো হয়ে পড়ল বুঝি। ওকে ছাড়া আমি কি বাঁচতে পারি?

অরুণ পর্দা তুলে লাল ঘুমঘুম চোখে বলল, শব্দ হল কিসের?

শীলা বলল, কে পটকা ফাটাল কোথায়। ঘুমোও গে না।

অরুণ চলে গেল। এইটেই ওর ঘুমের সময়। কাজেই এত ভোরে এই নির্জন জায়গায় কে পটকা ফাটাবে—এত হিসেবের অপব্যয় করা তার ইচ্ছে নয়। একটা কৈফিয়তই যথেষ্ট।

শীলা বলল, স্বপ্নটা কী বললে না তো? আর আচমকা গুলি ছুঁড়লেই বা কেন, শুনি?

রাহুল বলল; আচ্ছা শীলা—তুমি তো বেশ জানো আমার স্বভাব-চরিত্র। আমি খুনজখম করে বেড়াই। আমি—

শীলা বাধা দিয়ে বলল, যতক্ষণ চোখে দেখিনি—ততক্ষণ তোমাকে খুনী বলব কেন?

চোখে দেখাটাই তো সব নয়।

নয়। কিন্তু তোমার মধ্যে খুনীর আদল নেই। তোমার স্বভাবে নেই।

কিন্তু এই রিভলবারটা কেন তাহলে?

বারে! আমার একটা সখের ছুরি আছে। তাতে কী প্রমাণ হয়?

শীলা, অত সরলতা ঠিক নয়। চেহারায়-স্বভাবে সবকিছু ধরা পড়ে না মানুষের।

তর্ক থাক! স্বপ্নটা কী বলো শুনি।

তার আগে অন্য একটা কথা শোন, শীলা। যদি বলি, আমি এখানে এসেছিলুম একজন ভাড়াটে খুনী হিসেবে! এসেছিলুম তিনজন মানুষকে খুন করতে। কিছু পুরস্কারের লোভে!

শীলা ঠোঁট উল্টে বলল, আমি বিশ্বাস করিনে।

আমার কথায় একটুও মিথ্যে নেই, শীলা। সত্যি বলছি—বিশ্বাস করো।

ধরো, করলুম। কাদের খুন করতে এসেছো? কে তারা?

মণিশঙ্কর ঘোষ, মুক্তকেশী রায় ওরফে গঙ্গা আর নীরেন চ্যাটার্জি।

যাঃ! কেন?

ওরা হাইওয়ে রাহাজানির তিনটি মূল খুঁটি।

তুমি পুলিশের লোক নাকি ! আই বি এজেন্ট ? .. শীলা খিল খিল করে হাসল।

না। বলেছি তো আমি একজন ভাড়াটে খুনী।

তা খুন করছ না কেন? হাত কাঁপছে?

রাহুল একটু ঝুঁকে পড়ল। .... সেটাই সমস্যা। ধরো যদি সত্যি কাজটা করেই ফেলি—তুমি. শীলা—তুমি কি আমাকে তারপরও ভালোবাসতে পারবে? ঘেন্না করবে না?

শীলা নিষ্পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আস্তে আস্তে বলল, ওকথার কী জবাব দেব? বরং আমার একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। তুমি ছাড়া কাকেও বলা যাবে না। আজ সারারাত জেগে ঠিক করলুম, আমি এখান থেকে চলে যাব। সবাইকে লুকিয়ে চলে যাব। আমি জানি, তুমি কথাটা কাকেও বলবে না। তাছাড়া—তোমাকে বললুম, পাছে কিছু ভুল বোঝো আমাকে।

রাহুল চমকে উঠে বলল, কোথায় যাবে?

আপাতত বেথুয়াডহরি। বাবার বাড়িটা আছে। একটা লোক দেখাশোনা করছে। সেখানেই উঠব। বউদির অসুখ বলে অ্যাদ্দিন ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু আমাকে পালাতেই হবে।

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, অরুণদা একটু বিপদে পড়ে যাবে হয়তো।

শীলা ধরাগলায় বলল, দাদা আমাকে একরকম ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে। লোকটা হয়তো অসৎ, অনেক দোষত্রুটি আছে—কিন্তু ও যা করেছে, কেউ করে না। সেইজন্যেই কষ্ট হয়। কিন্তু আর সম্ভব নয়। আমার জীবনটা কেন এমনি করে তার জন্যে নষ্ট করে ফেলব?

রাহুল চুপ করে রইল।

শীলা ম্লান হেসে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি এসে আমাকে ভীষণ লোভী করে ফেলছ হয়তো। কত অসম্ভব স্বপ্ন দেখছি। কত অদ্ভুত সব আশা!

রাহুল তার একটা হাত ধরল। বলল, আমারও তাই, শীলা। তোমার মতো। স্বচ্ছন্দে সহজভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে। অথচ ....

শীলা মুখ তুলল। .... অথচ কী?

কোন উৎসাহ পাইনে। সব মনে হয় উদ্দেশ্যহীন। কেন এমন হ , কে জানে!

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ থাকার পর শীলা বলল, ইচ্ছে হলে তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পারো। তোমার যদি ভালো লাগে!

রাহুল হাতটা ছেড়ে দিল। বলল, দেখি। তুমি কখন যাবে, ভাবছ?

যে কোন দিন—যে কোন সময়। কাটোয়ায় একটা ট্রেন পাব সেই সন্ধ্যার দিকে। বহরমপুর হয়ে যেতে হবে। দুপুরের ট্রেন ধরা অনিশ্চিত। বাসেই ঘণ্টা চার লেগে যায়।

বরং নবদ্বীপ হয়ে গেলে তো সোজা!

তাও দেখব।

রাহুল শুকনো হাসল। .... অরুণদা আমাকে দুষবে না তো? ভাববে না তো যে আমিই তোমাকে ফুসমন্তর দিয়েছি?

শীলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সে তুমি সামলে নেবে। বসো চা আনি। মুখটুখ ধুয়ে ফেল ততক্ষণ। ভেবে নাও কথাটা। আজ পুরো দিন আর রাত্রিটা অব্দি তোমাকে ভাববার সময় দিলুম। আলটিমেটাম। .... নীরব হেসে চলে গেল সে।

রাহুল বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। এমনি করে পালিয়ে যেতে তার বাধছে। না—স্ক্যান্ডালের জন্যে নয়। বাধাটা অন্য কোথাও। কালো ত্রিভুজটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তার। চেষ্টা করেও ওটা ভুলে থাকা যায় না। প্রশ্নটা কী অদ্ভুত ! এত সাজানো গোছানো ঝকঝকে স্বপ্ন সে এর আগে একবারও

দ্যাখেনি। একটুও টের পায়নি যে আগাগোড়া সবটুকুর পিছনে একটা নিপুণ কারিগরি রয়ে গেছে।

কিন্তু স্বপ্নটা যদি বাস্তব হত, হাল্কা হতে পারত কি? স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারত সে? আবার একটা কালো ত্রিভুজ তার সামনে ভেসে এল। শীলার চলে যাওয়াটা ঢেকে ফেলল। ....

অস্থির রাহুল দু-তিনবার চিঠিটা লিখবার চেষ্টা করল আর ছিঁড়ে ফেলল। রাজেনবাবুকে লিখতে চাচ্ছিল সে। .... আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের সেই মারাত্মক কালো ত্রিভুজের খোঁজ আমার হাতে। কিন্তু আমি পারছিনে। বড্ড ক্লান্ত। একফোঁটা শক্তি নেই আর। আজ স্বপ্ন দেখলুম, রিভলবারটা জ্যাম হয়ে গেছে। এ কাজ আমার নয়। তিনটি নাম দিচ্ছি। এবার নতুন কাকেও পাঠান—যে খুব শক্ত-সমর্থ, বিবেচনাহীন, বেপরোয়া মানুষ। নয়তো আপনাদের আইনের সাহায্য নিন। নামগুলো হচ্ছে ....

শেষ বার ছিঁড়ে ফেলে সে উঠল। হার স্বীকারের সংকোচে আড়ষ্ট হল সে। ভেবে দেখল, অন্য কোথাও হলে কাজটা করতে একটুও পিছপা হত না—হাত কাঁপত না। কিন্তু ময়নাচকে এসে সে আজ ভারি অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। শুধু মনে হচ্ছে, কী লাভ তার? বারবার বাবার কথাটা মনে ভাসছে—তুমি তো ত্রাণকর্তা নও!

অথচ এখান থেকে প্রতিশ্রুত রক্ত না ছুঁয়ে চলে যাওয়া মানে ভীতুর মতো, কাপুরুষের মতো লেজ গুটিয়ে পালানো। কাকে তার এত ভয়? গঙ্গাকে? গঙ্গা... গঙ্গা....গঙ্গা! কালো ত্রিভুজ! মুক্তকেশী গঙ্গা! শব্দগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ভীমরুলের মতো তার মগজকে ঘিরে ধরল।

তখন সে বেরুল। প্রস্তুত হয়েই বেরুল। দেখে নিল, স্বপ্ন না বাস্তব এই বেরিয়ে পড়া—এই ছোট্ট রাস্তাটা, গাছপালা, ঘরবাড়ি, হাইওয়ে, খরদুপুরের নিঃঝুম হয়ে ওঠা ঝিম ধরা ময়নাচক আর মাথার ওপর গনগনে সূর্য, রোদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, ঝাঁঝাল হাওয়া, হিংস্র দহনজ্বালা।

হাইওয়েতে উঠে চমকে দাঁড়াল হঠাৎ। সানুকে মনে পড়ে গেল। একবার যাবে তার কাছে? সব খুলে বলবে? পরক্ষণে মনে হল, সেটা ঠিক হবে না। সানুর ব্ল্যাকমেলিং বন্ধ হয়ে যাবে—তাই সানু এতে একটুও সাহায্য করবে না তাকে। উপরন্তু খাম-খেয়ালি গোঁয়ার সানুর হাতেই তার বিপদ ঘটতে পারে। তাছাড়া সবচেয়ে মারাত্মক কথা—সানুর দাদাও তো তার অন্যতম শিকার! না—এটা ভীষণ ভুল করা হবে।

রোদের তাপে গা জ্বালা করছিল যেন। সামনের ডিসপেন্সারিটার পাশ দিয়ে একটা গলিপথ বেরিয়ে গেছে পুরনো ময়নাচক গ্রামের দিকে। দুধারে ঘন বাঁশবন। সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। সাত বছর পরে রাস্তাঘাট অনেক ভুলভাল হতে পারে। তবে যদ্দূর মনে পড়ছে, বাঁশবনটার শেষে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে। উঁচু পাড়গুলো ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরতি। পাড় ধরে কিছু পশ্চিমে এগোলে কয়েকটা পোড়ো বাড়ি পড়তে পারে সামনে। ভবানীবাবুদের জ্ঞাতিদের বাড়ি। তারা সব কে কোথায় রয়েছে। ধ্বসে গেছে বাড়িগুলো। ডাইনে মন্দির, বাঁয়ে একটু এগোলে গঙ্গার বাড়ির পিছনের ডোবা পুকুরটা। খুব পরিষ্কার দেখা হয়নি—তাহলেও পিছনটা নির্জন। স্বপ্নের মধ্যে ওদিক দিয়েই গিয়েছিল সে। বাস্তবে কী ঘটবে জানা নেই। তবু চেষ্টা করা যেতে পারে। রাতের দিকে হলে অবশ্য এত ভাববার কিছু ছিল না। কিন্তু আর অপেক্ষা করার ধৈর্য তার নেই।

হঠাৎ মনে হল, অমন করে লুকিয়ে যাবার দরকার কী? হাইওয়ে দিয়েই তো বুক ফুলিয়ে গঙ্গার কাছে যাওয়া যায়। সেদিন হঠকারিতার বশে যাই ঘটুক, গঙ্গা তাকে অস্বীকার করবে না—খুশি হবে। কারণ, গঙ্গা তাকে এখনও ভোলেনি। নির্লজ্জা গঙ্গা যেন সাত বছর আগের দিনগুলোকে টেনে এনে বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়—অব্যাহত রাখতে চায়। সুতরাং একটুখানি অভিনয় করতেই হবে। গা ঘিনঘিন করবে। সংস্কারে বাধবে। হৃষিকেশের শরীরের ছায়া পড়েছিল যার উপর, তাকে মা না ভাবুক, ভাবতে না পারুক—তবু সংস্কার বলে একটা কঠিন সত্য আছে। তাকে হটিয়ে দিতে পারবে তো?....

'মুক্তকেশী'র সামনে এসে অবাক হল সে। হোটেল বন্ধ। ব্যাপার কী? অত পুলিশ কেন ওখানে?

উল্টোদিকের দোকানগুলোতে জায়গায় জায়গায় ভিড় জমে রয়েছে। সবাই তাকিয়ে আছে 'মুক্তকেশী'র দিকে। চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে। সে পিছিয়ে এল উল্টোদিকের চায়ের দোকানটায়। সে সময় সানুর কণ্ঠস্বর কানে এল। .... এই যে রাহুল এখানে!

সানু চায়ের দোকানের ভিতর বসে আছে। পাদুটো টেবিলে তুলে বুকে দুটো হাত বেঁধে দুলছে সে। রাহুল কাছে গিয়ে বলল, কী হয়েছে সানুদা?

সানু তার দিকে তাকাল না। চোখ বুজে জবাব দিল, তোমার ছোটমা গঙ্গারাণী খুন হয়েছে।

রাহুলের মনে হল, তার শরীরটা কতক্ষণ—হয়তো অনিশ্চিত অজ্ঞাত দীর্ঘ সময় ধরে একটা অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অবশেষে কোথায় এসে ঠেকল। অনুভূতিহীন নিঃসাড় বোধশূন্য হয়ে সে তাকিয়ে আছে সানুর দিকে। সানু তখনও চোখ খোলেনি। দুলছে আর দুলছে।

সানু নির্লিপ্ত স্বরে ফের বলল, কখন খুন হয়েছে, কেউ টের পায়নি। বিছনায় স্বাভাবিক ভাবে মানুষ যেমন শুয়ে থাকে, শুয়েছিল। ঘোতনা মেঝেয় শোয়, ও থাকে খাটে। ঘোঁতনা উঠে গেছে। চা এনে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। মাথার কাছে চা রেখে চলে গেছে—রোজ যেমন করে। তখনও কিছু সন্দেহ করেনি ব্যাটা। ইদানীং গঙ্গা নটার আগে ঘুম থেকে উঠত না। হোটেলের দিকে আসত দশটায়—আপিস যাওয়ার মতো। তারকবাবুর ওপর হোটেলের ভার পড়েছিল—তোমার বাবার অসুখের পর থেকে। বুড়োটা বিশ্বাসী লোক। খুব একটা দরকার না পড়লে গঙ্গারাণীকে ঘাঁটাত না। ভাবত, শোকটোক পেয়েছে বড্ড—সামলে উঠুক। .....ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটু হেসে সানু বলতে থাকল। ..... দশটা বেজে গেল, উঠল না—তখন ঘোঁতন পায়ে হাত দিয়ে ঠেলেছে। পা ভীষণ ঠাণ্ডা আর হলদে—ছোঁড়াটা পুলিশকে বলছিল, শুনলুম। হঠাৎ তার চোখ চলে যায় বালিশে—মুখটা একপাশে গোঁজা। মাথায় হাত দিয়ে মুখ সোজা করতে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে। গলায় আঙুলের দাগ নীল হয়ে বসেছে। গলা টিপে মেরেছে ওকে।

রাহুল অবশ জিভে কোনমতে উচ্চারণ করল, কে মেরেছে?

আমি নই। .... বলে সানু তার দিকে একবার তাকাল—ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। হাসিটা ম্লান—অপরিচ্ছন্ন। .... গঙ্গারাণী ছিল আমার সোনার হাঁস। যাক্ গে—যে মেরেছে, সে তোমাকেই সম্ভবত ট্র্যাপ করতে চেয়েছিল। কারণ কাল সন্ধ্যায় তুমি একটা কীর্তি করে বসেছিলে। এটা পুলিশ জানে না। আর জেনেও তাদের লাভ নেই। খুনীকে তারা ধরে ফেলেছে। ঘোঁতনার বুদ্ধি আছে। মণিশঙ্কর কাল রাতে—অনেকটা রাত তখন, গঙ্গাকে ঘুম থেকে তুলেছিল। ঘোঁতনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। দুজনকে বিছানায় বসে কথা বলতে দ্যাখে। ঘোঁতন ফের ঘুমিয়ে পড়ে। এখানেই একটা মজার ব্যাপার আছে। যখন সকালে সে বাইরে বেরোয়, দ্যাখে দরজাটা খোলা আছে।....

সানু একটু চুপ করে থেকে বলল, তাহলেও হয়তো মণিশঙ্করের কিছু হত না। ও যা বদমাস, শেষঅব্দি তোমাকেই জড়াত। কিন্তু সে সুযোগ পেল না। কারণ—রিয়েলি, ইট ইজ কমপ্লিটলি আনবিলিভেবল। আমার দাদাকে এ ব্যাপারে উৎসাহী দেখলুম ভীষণ। মাইরি, দাদারই স্ত্রীকে যেন মণিশঙ্কর মার্ডার করেছে। উ রে হালুয়া! দাদাও গঙ্গারাণীর ভাগাড়ে ডুব দিচ্ছিল! দুচোখের দিব্যি, একটুও টের পাইনি। ভাবতুম—নিতান্ত কড়ির কারবার নিয়ে যোগাযোগ। আজ দাদার চেহারা দেখে তাক লেগে গেছে। ঝড়ো কাক যেন। বউদিকে একটু ইসারা দিলে যা লেগে যাবে, ভাবা যায় না!.... সানু খিকখিক করে হাসল।

রাহুলের ভিতর হঠাৎ কোত্থেকে একদমক চাপা দীর্ঘ অবরুদ্ধ কান্নার চাপ এসে গেছে—কিসের এ কান্না—কেন—তা সে জানে না; একে সামলাতে সে দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তার ভিতর দাপাদাপি সমানে চলতে লাগল তবু। তার মনে হল—এক্ষুনি কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে বমি করার মতো উদ্দাম না কাঁদলে সে বুক ফেটে মরে যাবে। এ কি তার পরাজয়ের দুঃখ। নাকি গঙ্গার জন্যে শোক? সে বুঝতে পারল না।

সে উঠে দাঁড়াল। একবার দেখতে ইচ্ছে করছিল হতভাগিনী গঙ্গাকে। সে বলেছিল, পায়ের নিচে তোমার মাটি দরকার। মাটি দেব তোমাকে। আরও পাঁচটা মানুষের মতো ঘরকন্নার সুখ নাও, রাহুল। কেন অমন করে জীবনটা নষ্ট করবে তুমি?...হয়তো তার কথায় সত্যের আবেগ ছিল, কামনাটাও ছিল শুদ্ধ আর যথার্থ, আন্তরিকভাবেই কথা বলেছিল গঙ্গা। যদি রাহুল থেকে যেত তার কাছে—গঙ্গার ভাষায় 'শুধু একজন এবাড়ির মানুষ' হয়ে থাকত—তাহলে গঙ্গাকে সে বাঁচাতে পারত। হয়তো কালো ত্রিভুজ থেকে সরিয়ে আনতে পারত। অন্তত এই নিষ্ঠুর অসহায় মৃত্যুবরণ করতে হোত না তাকে।

কিন্তু কেন তাকে খুন করল মণিশঙ্কর? নীরেন চ্যাটারজির সঙ্গে কি গঙ্গার দেহটা নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল গোপনে? অন্তত সানুর কথায় তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

রাহুল উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে সানু বলল, রাহুল! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল হল। একটা জরুরী কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

রাহুল বলল, বলুন।

উঁহু। এখানে বলার মতো নয়। ... সানু পা নামিয়ে সোজা হল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, আজ সন্ধ্যার পর দুজনে একবার বেরোব। তুমি তৈরি থেকো। ডেকে নেবো অরুণের ওখান থেকে। কোথাও যাবে না কিন্তু। ভীষণ জরুরী ব্যাপার। অলরাইট?

রাহুল অন্যমনস্কভাবে বলল, আচ্ছা।

সে বেরিয়ে পড়ল। পথে আসতে আসতে তার মনে হল, সানুকে অমন অপ্রসন্ন আর নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন? সোনার হাঁসের একটা মারা পড়ল, অন্যটা পুলিশের হাজতে—তাই কি?

অরুণ সাইকেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে আসছিল। রাহুলকে দেখে নামল সে। ... সর্বনাশ! তোমার কোন ঝামেলা হয়নি তো? এইমাত্র শুনলুম সব। ভয় পেয়ে গেলুম—তোমার আবার ....

রাহুল শুকনো হেসে বলল, না। আমার কী হবে? মণিশঙ্করকে ধরেছে।

অরুণ পাশেপাশে হেঁটে আসছিল। বলল, হ্যাঁ—এ আমি জানতুম। নীরেনবাবু ইদানীং গঙ্গার সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিল। কানাঘুঁষো শুনছিলুম অনেক। এই তো গতকাল ওঁকে ঠাট্টা করে বলছিলুম—দাদা, আপনার পলিটিক্যাল কেরিয়ার আছে, সম্মানী মানুষ—দেখবেন যেন. .. নীরেনবাবু বলল, ধ্যাৎ! মণিশঙ্কর রটাচ্ছে নাকি। ওর কি মাথা খারাপ হল অরুণ? যে ডালে বাসা, সেই ডাল কাটতে বসেছে কেন?.... যাক্ গে বাবা। আমি কাল সব ফয়সালা করে ফেলেছি, রাহুল।

রাহুল বলল, কিসের।

অরুণ জবাব দিল, তুমি কতক জানো, কতক জানো না। সেই চোরা মালপত্তর হে। সব দায় খালাস করেছি। আর বাবা কারো সাতে পাঁচে নেই আমি। এবার সানু আসুক না টাকা চাইতে— সোজা বলে দেব যা পারো করো—আর একপয়সাও দেব না। আমি চোর, না চোরের দাদা! তাছাড়া ওর দাদা নীরেনবাবুও বলেছে, আর এক পয়সা যেন না দিই ওকে। নীরেনবাবু জানত না সানু আমার কাছে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করে। আর একটা মজার কথা সানু ওঁকেও দাদা বলে রেহাই দিত না, জানো? ব্ল্যাকমেইল করে আসছিল। নীরেনবাবু আর আমি কাল দুজনে মিলে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ এসেছি। সানুকে ঠাণ্ডা করতে হবে।

রাহুল চমকে বলল, অ্যাঁ?

হাসল অরুণ। .... চমকে উঠছ কেন? খুনটুন নয়—ভেবে দেখলুম, শীলার বিয়ে তো দিতেই হবে। এখন সানুর দাদা নিজে যখন সানুর সঙ্গে বিয়ের কথা তুলল—তখন কথাটা ভাববার মতো। অতবড় বংশ, অমন ফ্যামিলি, অত রবরবা। সানু বদমাস মাতাল বটে, নীরেনবাবু যা বললে, ঠিকই বললে—বউ ঝুলিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। এমন চান্সটা ছাড়া ঠিক হবে না ভাই। তুমি কী বলো?

রাহুল বলল, হ্যাঁ—সে তো ভালই।

অরুণ সোৎসাহে বলল, এ খুব ভালো হল। ওর দাদা নিজে গ্যারান্টার রইল। তাছাড়া—আরেকটা ব্যাপার তুমি জানো না। সানুটা কী পাজি ভাবা যায় না। অ্যাদ্দিন বলছিল, বিয়ে করবে—তবে আজকালকার মেয়ে, —খিকখিক করে হেসে অরুণ বলল, শালা একটা বদ্ধ পাগল। বলে

হেলথসার্টিফিকেট চাই। শীলা শুনলে খেপে যেত। তা—

রাহুল বলল, সেটা আর চায় না সানু?

না। ওর সুমতি হয়েছে। শীলার মতো সচ্চরিত্রা সরল মেয়েকে ভগবান রক্ষা করবেন না—এ হয় নাকি?

অনর্গল কথা বলতে বলতে অরুণ পথ হাঁটছিল। ইটখোলার কাছে এসে বলল, কী কাণ্ড! আমি তোমার সঙ্গে ফিরে আসছি যে! দেখছ? মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে। যাই—একবার তোমার ছোটমার ওখানে। কর্তব্য তো আছে একটা। তুমি গিয়ে ঘুমোও গে—যা গরম পড়েছে! ফ্যানটা সেরে এনেছি দ্যাখ গে। আরাম পাবে।

অরুণ চলে গেল।

রাহুল বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লে শীলা লাল চোখে দরজা খুলে দিয়েই রাহুলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বোঝা গেল, ওখানেই সে ঘুমোচ্ছিল এতক্ষণ। ফ্যানটা জোরে ঘুরছে টুলের ওপর। কাত হয়ে শুল সে। চুলগুলো উড়ে মুখ ঢেকে ওপাশে নেমে যাচ্ছে ঝাঁকেঝাঁকে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঘুরছে এতক্ষণে। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। শরীর টলছে। সে ভিতরের দরজাটা বন্ধ দেখল এদিক থেকে। তখন শীলার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। ডাকল, শীলা!

শীলা সাড়া দিল না দেখে সে তার বুকের উপর ঝুঁকে ফের ডাকল, শীলা কি সত্যি ঘুমুচ্ছ?

উঁ?

খবরটা শুনেছ?

হুঁ।

তোমার কি খুব ঘুম পাচ্ছে?

হুঁ।

কী মুশকিল! দিনদুপুরে এত ঘুম কেন?....রাহুল ওর কাঁধে হাত রাখল। ....শীলা, আমিও ঘুমুবো। রোদে ঘুরে ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

শীলার সাড়া না পেয়ে সে ঘরের ভিতরটা দেখে নিয়ে ফের বলল, একটা মাদুরটাদুর নেই এ ঘরে?

শীলা জড়ানো স্বরে বলল, শোও না এখানে। .... তারপর একটু সরল সে।

রাহুল বলল, শীলা, আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। ওঘরে বউদি আছেন। নেত্য আছে।

শীলা তবু চুপ।

রাহুল একটু হেসে বলল, শীলা, আরও খবর আছে। অরুণদা এইমাত্র বলল, সানুর দাদাও তোমার সঙ্গে সানুর বিয়েতে খুব উৎসাহী হয়েছে। অরুণদা ভারি খুশি। এ বেচারকে যে কথাটা দিয়ে বসেছিল, তা ভুলেই গেছে। কাজেই, এভাবে তোমার পাশে শোওয়া যায় না। আগুন ধরে যাবে শীলা।

শীলা বিরক্তভাবে আগের মতো জড়ানো ভারি গলায় বলল, জানি বাবা জানি। বড্ড বকতে পারো। শোও চুপচাপ।

রাহুল একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার জলতেষ্টা পেয়েছে। জিভ থেকে বুক অব্দি শুকনো লাগছে। একটু জল খাওয়াতে পারো?

শীলা সামান্য ঘুরল। চোখ খুলল না। ঠোঁটে নিশ্চুপ হাসির আভাস ধরা পড়ছিল। সে দুহাত বাড়িয়ে রাহুলের গলাটা জড়াল। তারপর ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিল। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিস ফিস করে বলল, জলতেষ্টা—না, অন্য কিছু?

রাহুলের কিছু ভাল লাগছিল না। শীলার নিশ্বাসের গন্ধ, তার বুকের চাপ—অনিবার্য যৌনতার আক্রমণ—অথচ রক্ত যেন জমাট হয়ে গেছে শরীরে। তার মনে হল, এখন এসব অশোভন—ভারি অসঙ্গত। প্রস্তুতিহীন আকস্মিক উপদ্রব। কিন্তু একটা গভীরতর ভিন্ন প্রকৃতির আবেগ তার বুকের মধ্যে আস্তে আস্তে দুলে উঠেছে। শান্তির আশ্রয়ের জন্যে কোন কঠিন মাটি—যে মাটিতে ছায়া আছে, তার

পক্ষে কাম্য হয়ে উঠেছে। আব সেই প্রবলতম কামনা তার মুখটা শীলার ঠোঁট থেকে শীলার বুকের দিকে নিয়ে গেল। ব্লাউজের বোতামটা হিংস্রহাতে খুলে ফেলে সে তার দুটি কুমারী স্তনের মধ্যে শিশুর মতো মাথা ঘষতে থাকল।

কতক্ষণ পরে শীলা চমকে উঠেছে। দুহাতে রাহুলের মুখটা তুলে ধরে সে দেখল, এই দুর্দান্ত তরুণ খুনী যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিষ্ঠুর আঘাতে রক্তাক্ত—কারণ তার চোখ এবং গালে ওই ভিজে ছোপগুলো অশ্রু বলে মনে হল না শীলার—সেগুলো হয়তো রক্তই।

শীলা শুধু বলতে চাইল—আমি আছি। তার চোখের ভাষায় ধরা পড়ছিল ওই কথাদুটো। টেবিলফ্যানটা উদ্দাম ঘরঘর ঘূর্ণির একটানা শব্দে নিঃঝুম দুপুরবেলাটাকে কী একটা অর্থপূর্ণ সুরে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

দুজনে পরস্পরকে অশেষ প্রত্যাশায় আঁকড়ে ধরে রইল।

সেই দুপুরেই ওরা ঠিক করে ছিল—দুজনেই চলে যাবে ময়নাচক থেকে। সানুর সঙ্গে জরুরি কথাটা সেরে ফিরে আসবে রাহুল। শুয়ে পড়বে সকাল সকাল। রাত গভীর হবে। অরুণ দেরিতে ঘুমোয় বলে শীলা অপেক্ষা করবে। তারপর এ ঘরে চলে আসবে। দুজনে বেরিয়ে পড়বে। পথে যেতে যেতে কোথাও না কোথাও ট্রাকে একটা লিফ্‌ট পেয়ে যাবে। রাহুলের কাছে টাকা নেই—শীলার কিছু আছে। আপাতত ওতেই বেথুয়াডহরি পৌঁছান যায়। পৌঁছতে পারলে একটা ব্যবস্থা হবেই।

সানু এল ঠিক সন্ধ্যায়। মুখটা গম্ভীর। একটু অবাক হয়েছিল রাহুল। কিন্তু পরে ভাবল, হয়তো দু দুটো সোনার ডিমদেওয়া হাঁস হাতছাড়া হয়ে বেচারা মনমরা হয়ে গেছে। সে পায়ে হেঁটে এসেছিল। বলল, এস।

রাহুল তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল। কী কথা বলবে তাকে সানু? হয়তো হাইওয়ের রাহাজানি—কিংবা অরুণের বামাল সামলানো নিয়ে কোন নতুন তথ্য। হয়তো সে তাকে দলে টানবে। রাহুলের মন চঞ্চল। সে হাতড়াচ্ছিল।

অবশ্য সে যখন চলেই যাচ্ছে এখান থেকে, তখন ওইসব কথা শোনার জন্যে সানুর সঙ্গে যাওয়াটা অনর্থক। রাহুল টের পেল—কৌতূহল আর চাঞ্চল্যটার উৎস হয়ত অন্যখানে। শীলার সম্পর্কে কি কিছু বলবে সানু? —হ্যাঁ —সেটাই জেনে রাখা খুব জরুরী মনে হচ্ছে। নিরাপদ ভবিষ্যত নিয়ে ময়নাচক থেকে শীলার সঙ্গে চলে যাওয়া দরকার। তা না হলে আবার হয়তো জড়িয়ে পড়বে বিশৃংখলায়—রক্তে হিংসায় জিঘাংসায়।

রাহুল বেরুল। আকাশে নবমীর চাঁদ। ধুলো মাখানো স্তিমিত জ্যোৎস্না—আলো আছে অথচ সব ছায়াময় মনে হয়। পথে কথা বলছিল না সানু। রাহুল জিগ্যেস করল, কোথায় যাচ্ছি সানুদা?

সানু জবাব দিল, বেশিদূরে নয়। মাঠের দিকে।

ব্যাপারটা কী বলবেন তো?

ইনটারেসটিং। তোমার 'টিপস্‌টা' এনেছ তো?

রাহুল দাঁড়াল। .... কিন্তু ওটা কী হবে?

সানু তার হাত ধরে টানল। .... নিরস্ত্র বেরোতে নেই।

ফের কিছুদূর চুপচাপ হাঁটল দুজনে। হাইওয়েতে উঠে ব্রিজ যেদিকে—তার উল্টোদিকে চলতে থাকল সানু। তারপর বলল, রাহুল; তোমার মালফাল খাওয়া অভ্যেস নেই?

রাহুল বলল, তেমন না। সামান্য।

আজ আমরা মাল খাব।

আমার বমি হয়ে যায়, সানুদা। থাক্‌ গে।

পাগল! জমবেই না তাহলে।.... সানু আবগারী দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। .... দিশি না—বিলিতিই। মদনটা বিলিতিও রাখে লুকিয়ে। সব শালা চোরের রাজত্ব হে। ওয়েট—আমি আসছি।

রাহুল একটু চিন্তিত হল। ঝোঁকের বসে বেশি খেয়ে ফেললে রাতের প্রোগ্রামটা ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া শীলার পক্ষে সহনীয় না হতেও পারে। মেয়েরা নাকি খুনীর সঙ্গে শুতে ভয় পায় না—মাতালকে ভয় পায়। খুনীর চেয়ে মাতালকেই ঘেন্না করে বেশি।

প্রকাশ্যে বোতলটা দোলাতে দোলাতে নিয়ে এল সানু। অন্য হাতে দুটো মাটির ভাঁড়, একটা ঠোঙায় কিছু চাট। বলল, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট—শালা অ্যাদ্দিন বিয়ে করলে তোমার মতো দু-দশটা ছেলের বাবা হতুম। তবু তুমি আমার পেয়ারের ইয়ার। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, তোমাকে নিয়ে একটু ফুর্তি করি। হচ্ছিল না। চলো।....

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রাহুল। খামখেয়ালি সানুর আসলে মনটা কেমন দমে গেছে—তাই মৌজ করতে চায়। এটা স্বাভাবিকও। গঙ্গার বীভৎস লাসটা দেখার পর বেচারা মুষড়ে পড়েছে। রাহুল দেখলে, সেও মুষড়ে পড়ত।

কিছুদূরে হেঁটে বাঁদিকে আগাছার জঙ্গলে ভরা পোড়া জমিতে নামল সানু। রাহুল তাকে অনুসরণ করল। জায়গায়-জায়গায় বেশ ফাঁকা আছে। একটা কাছিমের খোলের মতো ডাঙা জমি। অজস্র ফণিমনসা আর কেয়াঝোপ। ফাঁকা জায়গাগুলোতে কোথাও শুকনো কিছু ঘাস, কোথাও খোলা শক্ত মাটি জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক ঘুরে জায়গা পছন্দ করল সানু। তারপর একখানে বসে বলল, এখানটাই ভালো। অল্পস্বল্প ঘাস আছে—পাছা আরাম পাবে।

আরাম করে সে দাঁত দিয়ে ছিপি খুলল। ভাঁড় দুটো ভরতি করল। তারপর বিনা ভূমিকায় একটা ভাঁড় তুলে, ইসারায় রাহুলকেও নিতে বলে, সে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করল—'চিয়ারস!' গিলে ফেলল মদটুকু। বিকৃত মুখে বলল, র খাওয়াই ভালো। জল মেশালে ব্যথা বাজে। ..... আরে, কী হল?

রাহুল ভাঁড়টা হাতে নিয়ে ভাবছিল। এবার চোখ বুজে গলায় ঢেলে দিতেই হু হু করে জ্বলে উঠল বুক অব্দি। দম আটকে যাবার উপক্রম হল। কাসতে কাসতে চোখে জল এসে গেল তার। তারপর হাসতে লাগল।

ভালো না? ... সানু বলল সিগ্রেট জ্বেলে। তার পায়ের কাছে দুটো চারমিনারের প্যাকেট পড়ে আছে। ... নাও, সিগ্রেট খাও। মৌজ আসবে।

রাহুল নীরবে সিগ্রেট নিল। ঠোঙা থেকে ভিজে ছোলা তুলে মুখে দিয়ে সিগ্রেট জ্বালল সে। বাতাস বইছিল—কখনও দমকে-দমকে কখনও মৃদু। সামান্য দূরে গাছপালা আর আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলো দুলছিল। সাদা কেয়াপাতার বড় ঝাড় রহস্যময় ভঙ্গিতে কাঁপছিল—চকচক করছিল।

সানু বলল, আমি খুব বেশি খাইনে আজকাল। একসময় ভীষণ 'খতুম। পরে ভেবে দেখলুম, রাজ্যের লোক স্ফূর্তি করতে পায় না। গরিবগুরবো ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে চাদ্দিকে—শালা এ কোন দেশে বাস করছি! ওদের জন্য একটা কিছু করা দরকার।

রাহুল সকৌতুকে বলল, কী করলেন শেষ অব্দি?

সানু বোতল থেকে ফের ভাঁড় ভরে নিয়ে বলল, হল কই? নানান ঝামেলা আমার। জানো। বরাবর ইচ্ছে ছিল, গরিবের ভালো করব। ওদের হয়ে লড়ব। দরকার হলে দাদার সঙ্গে যুঝব। ধুস! কী সব গোলমাল হয়ে গেল।

রাহুল বলল, সে কি একা আপনার বলে সম্ভব সানুদা? পার্টি করতে হয় তাহলে।

মদটা গিলে সানু ঘোত ঘোত করে উঠল—মুতে দাও! ছ্যার ছ্যার করে পেচ্ছাপ করে দাও। সব চেনা আছে। সব নীরেন চ্যাটা'র দলে। চ্যাটা! কী পদবীখানা দিলুম দেখছ?

রাহুল আর খেতে পারবে না। ওইটুকুতেই তার মাথাটা চনমন করছে। উত্তেজনা অনুভব করছে সে। ভাবছিল, কীভাবে এড়ানো যায়। কিন্তু সানু সেদিকে তৎপর। তার শূন্য ভাঁড়টা ভরে দিয়ে বলল, হাত চালাও। মৌজ না এলে কিস্যু হবে না। ব্রেন খোলতাই করো আগে। নাও, হাত ওঠাও।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ফের গিলতে হল। ক্ষিপ্রহাতে ছোলা তুলে চিবুতে থাকল সে। এত তেতো বিস্বাদ জিনিস খেয়ে মানুষ কী স্ফূর্তি পায়! কিন্তু ততক্ষণে মদের কাজ অল্প অল্প শুরু হয়ে গেছে। সে ভাবল, আজ কী পরিপূর্ণ আনন্দের দিন তার। শীলার সঙ্গে সে চলে যাবে। শীলা আছে তার। আর এই

তুখোড় আশাবাদী লোভী সানু চ্যাটারজি বুককপাল চাপড়ে হয়তো কাঁদবে। রাহুল খিকখিক করে হেসে উঠল। বলল, সানুদা, মাগীটাকে দেখেছিলে নাকি?

সানু বলল, কোন মাগী?

মুক্তকেশীর খানকিটাকে?

হ্যাঁঃ। তবে কষ্ট হল বড্ড। আমি শালা কত খুনখারাপি করেছি—তবে মেয়েমানুষ মারিনি কখনো। তোমার দিব্যি। দরকারই হয়নি। কোন শালী তো সানু চ্যাটারজির সঙ্গে একহাত লড়তে আসেনি—তাই।

ফের ঢকঢক করে মদ গিলল সে। রাহুল বলল, যদি আসত কেউ?

সানু হাসল। ... এলে? এলে বুক পেতে দিতুম। নে—নে, এ বাঞ্চোৎ হৃদয়খানা তুলে নে এক খাবলায়। মাইরি রাহুল, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মেয়েমানুষ। ওঃ! এ বেস্ট্ প্রোডাকশান অফ্ নেচার। এই রাহুলচন্দ্র, কখনও মেয়েমানুষ চেখে দেখেছিস রে?

রাহুল বলল, হ্যাঁঃ।

কেমন লাগে? .... সানুর কুতকুতে চোখদুটো জ্যোৎস্নায় চকচক করল।

ভালো?

শুধু ভালো? ...... সে ফের মদ ঢালল। গিলে নিয়ে বলল, আঃ! কে যেন বলেছিল রে—ফ্রায়েলটি! দাই নেম ইজ মেয়েমানুষ।

রাহুল ঝোঁকের বশে তার খালি ভাঁড়টা এগিয়ে বলল, দিন।

খা। আজ তুই শালা আমার জানের দোস্ত।

রাহুল বলল, তো দোস্ত ভি কভি কভি দুষমন বন্ যাতা হ্যায়।

সানু ওর দিকে তাকাল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, জরুর।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে সিগ্রেট ধরাল। সশব্দে থুথু ফেলল। রাহুল বলল, শীলার সঙ্গে আপনার বিয়ে কবে হচ্ছে?

সানু জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে মদ খেল। দুলতে থাকল।

রাহুল বলল, সানুদা।

হুঁঃ।

আপনার দাদাও তো এতে রাজি। অরুণদা বলছিল।

সানু কোন জবাব দিল না। ফের মদ গিলল। থুথু ফেলল বিকৃত মুখে।

রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, হঠাৎ কী হল? সানুদা।

হুঁঃ।

বিয়েটা কবে হচ্ছে?

কার বিয়ে?

বারে! আপনার।

সানুর জবাব নেই। সে ঘাড় ঘুরিয়ে যেন চাঁদ দেখল একবার। তারপর ধাবমান ঘোড়ার মতো মুখ উঁচু করে রইল কিছুক্ষণ। যেন দম নিচ্ছিল। ঝাকড়-মাকড় চুলগুলো কপাল থেকে সবিয়ে সে ফের মদ ঢালল। খেল। থুথু ফেলল যথারীতি। তারপর প্যান্টের বেল্টটা সামান্য ঢিলে করে জড়ানো স্বরে বলল, টিপসটা এঁটে বসেছে। খুলে রাখি।

কালো রিভলবারটা বের করে পাশে রাখল সে। পা ছড়িয়ে বসল। দেখাদেখি রাহুলও নিজের অস্ত্রটা বের করে পাশে রাখল। এতক্ষণে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার। অস্বস্তিটা দূর করতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে নিজের হাতে ভাঁড়টা ভরে নিল। দেখল বোতলটা প্রায় তলায় ঠেকে গেছে। মদটুকু গিলে সে সিগ্রেট জ্বেলে বলল, অভ্যেস নেই। বেশ নেশা হয়ে গেছে।

সানু বলল, দাঁড়াতে পারবি তো?

রাহুল অবাক হয়ে বলল, কেন? এক্ষুনি তো ফিরছি না। নেশা ছুটলে তখন।

উঁহু। দ্যাখ্‌দিকি, দাঁড়াতে পারছিস্‌ নাকি?

ধেৎ! কেন?

আবে শালা। যা বলছি, কর।

এই সানুদা, গাল দেবেন না মাইরি। আমার রাগ চড়ে যাবে।

চড়ুক না বে মাগীমুখো বেহদ্দ। ওঠ্‌ দ্যাখ্‌, পায়ে জোর আছে নাকি?

রাহুল হো হো করে হেসে উঠল। ..... খুব জোর আছে। কেন, শুনি?

আবে শালা, লড়াই দিতে পারবি নাকি দ্যাখ। উঠে দাঁড়া।

নির্ঘাৎ মাতালের কাণ্ড। রাহুল উঠে দাঁড়াল। সে টলছিল। বেশ নেশা হয়ে গেছে। সবকিছু টলমল করছে। জ্যোৎস্না যেন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। সবকিছু থেকে যেন সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে সে। সানুকে মনে হল অনেক দূরের মানুষ। সে বলল, এই তো দাঁড়ালুম।

অস্তর নে।

হেঁট হয়ে সকৌতুকে খিকখিক করে হেসে রিভলবারটা নিল সে। তারপর বলল, নিলুম। লড়াইটা হবে কার সঙ্গে?

সানু বলল, সবুর। লেট মি সি মাই পজিশান। .... বলে সে তার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়াল। দুলতে থাকল গরিলার মতো। চোখ দুটো চকচক করে উঠল তার। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়তে থাকল সশব্দে। সে বলল, ইয়েস। ওক্কে। আই অ্যাম ফিট। .... বুকে থাপ্পড় মেরে সে চাপা গর্জাল ফের। ....ইয়েস, মাই নেম ইজ সানু চ্যাটারজি—দা সান অফ দা ডেভিল অফ ময়নাচক। আমি ... আমি কে? যম—যমদূত। আমি সানু চ্যাটারজি। আমার উরুতে পাইপগানের গুলি লেগেছিল। আমার কাঁধে ছুরি মেরেছিল। হজম করেছি। আমি দা সন অফ দা ডেভিল—সানু চ্যাটারজি এই ময়নাচকে যাকে বলেছি, ওঠ, সে উঠেছে। যাকে বলেছি বস্‌—সে .....যাঃ শালা! কী বলছিলুম! হাঁ—সানু চ্যাটারজি বলছিল। কাকে বলছিলুম। বহরমপুরের এক শালা পুঁচকে—খানকিবাচ্চাকে!

রাহুল খেপে গিয়ে বলল, এই শালা সানুদা! চুপ। যা তা বললে ভাল হবে না।

আবে চোওপ শালা! .... বাঁ হাত তুলে সে বলল। ..... প্রিন্স অফ ময়নাচক ইজ স্ট্যান্ডিং বিফোর ইউ। হুঁ-শি-য়ার! তুমি বিল্লিকা বাচ্চা—হুঁ—হুঁশিয়ার থাকবে।

রাহুল বলল, মাতলামি করলে আমি চলে যাব কিন্তু।

সানু বলল, না—তুই যাবি না। আই সে—সানু চ্যাটারজি বলছে তোর যাওয়া হবে না। নেভার—কভি নেহী। তোর বাবা এসেছিল এখেনে—যেতে পারেনি। তুইও পারবিনে।

সানুদা, এই মাতলামি করার জন্যে ডেকে নিয়ে এলে?

মাতলামি? নো—নেভার। ডুয়েল লড়বার জন্যে। ইয়েস—কাম অন।

কী হচ্ছে! আমি চলে যাচ্ছি। .... বলে রাহুল পা বাড়াল। একটু ঘুরল সে।

সানু লাফ দিয়ে সামনে এসে বলল, খবর্দার। তুই লড়বি। তোর হাতের টিপস আছে। আর আমার হাতেও ....উঁ? কী আছে বললুম। এই খানকিবাচ্চা, কী আছে রে? হুঃ—আমার হাতেও এই টিপস আছে। দোনো হ্যায় অটোমেটিক। আও—কাম অন।

রাহুল ঘেমে উঠল। কেন এমন করছে সানু? রাহুলেরও নেশা হয়েছে খুব—কিন্তু সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন রাখছিল। তার দম আটকে আসছিল। তবু সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সানুকে সামলানোর চেষ্টা করল। বলল, আঃ দাদা! প্লিজ—কেলেঙ্কারি করবেন না। রাস্তার এত কাছে, কে কী ভাববে।

চো-ওপ্‌! তুমি খানকির বাচ্চা—তুমি আমার প্রাণের শীলাকে নষ্ট করেছ। তুমি তাকে বুকের ওপর ফেলে চুমো খেয়েছ। ইয়েস—ইউ.....

রাহুল চমকে উঠে বলল, ছিঃ কি বলছেন? চলুন—বাড়ি চলুন সানুদা। আপনার শরীর ঠিক নেই।

শাট আপ্‌। গর্জে উঠল সানু। .... গঙ্গা আমাকে কাল রাত্তিরে বলেছে সব। তোর মরা বাপের মরা ছেনাল মাগ বলেছে। তুই শীলাকে ইয়ে করেছিস।

না—না! .... রাহুল অস্ফুট চিৎকার করল।

আলবৎ করেছিস শীলা আমার বউ—তুই তাকে রেপ করেছিস। গঙ্গা বলেছে।

রাগে উত্তেজনায় রাহুল বলল, আমি যাচ্ছি। মাঠে একলা নাচানাচি করুন।

সে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সানু তার পায়ে লাথি মেরে বলল, যাবি কোথায় হারামীর বাচ্চা! আয়—ডুয়েল লড়। সানু চ্যাটারজি কাপুরুষের মতো তোর জান নিতে চায় না। কাম অন। তিন গোনার সঙ্গে সঙ্গে—

রাহুল পড়ে গিয়েছিল। উঠে গিয়ে সে মুখোমুখি হল সানুর। সানু পিছিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। রিভলবারটা তুলে তাক করে রয়েছে। সেই সময় অদূরে হাইওয়েতে গাড়ির শব্দ হল। শব্দটা হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। মুহূর্তে রাহুলের চোখ খুলে গেল। ময়নাচকে তার আসল শত্রু—ভীষণতম প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এতদিনে গর্ত থেকে বেরিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, এতদিন এটা বুঝতে এত ভুল হয়েছিল তার। এত দেরি লাগল! কিন্তু আর কিছু করার নেই। সে থরথর কেঁপে উঠল। কান্নাভরা ভাঙা গলায় বলল, সানুদা—সানুদা! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি ময়নাচক ছেড়ে। প্লিজ—

সানু বলল, নো। ভয় হচ্ছে? রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে? ওরে শালা মাগীর হদ্দ কাপুরুষ! এই তোর বড়াই বুজরুকি? গিদ্ধড়! লজ্জা করে না? থুঃ—ওয়াক থুঃ!

রাহুল বুঝতে পারল, সানু তাকে তাতাচ্ছে। বুঝতে পেরেও তার রক্তকে সে থামাতে পারল না।

থু থু থু! .... সানু থুথু ছুঁড়ে মারল তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে রাহুল রিভলবার তুলে বলল, কাম অন বাস্টার্ড! কাউন্ট—ওয়ান ... টু ....

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। পর মুহূর্তে রাহুল আচ্ছন্ন চোখে দেখল সামনের দিকে টলে পড়ে গেল সানু। যেন দুবার ঝাঁকুনি খেয়েই তার দেহটা স্থির হয়ে গেল।

মানুষের মনের অতলে যে আত্মরক্ষার সহজাত বোধ আছে—তা পলকে তাকে বলে দিয়েছে যে সে ট্রিগার টেপেনি—অথচ সানুর গুলি লাগল, এবং সে ঘাড় ঘোরাতেই ডাইনে কেয়াঝোপের সামনে অস্পষ্ট একটা মূর্তি দেখতে পেল। অমনি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

এটুকু ঘটতে অবশ্য কয়েকটা সেকেন্ড লেগেছে। রাহুল বুকে হেঁটে চকিতে বাঁপাশের ঝোপে গিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপর দেখল মূর্তিটা হন হন করে চলতে শুরু করেছে। দৌড়ে সে লাফ দিয়ে দু তিনটে ঝোপ ডিঙিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করল। লোকটা মাত্র বিশহাত দূরে দ্রুত হাঁটছে। মণিশঙ্কর? সে তো অসম্ভব। মণিশঙ্কর পুলিশের হাজতে। তবে কে এই আততায়ী? নন্দ? হতেই পারে না। তাছাড়া নন্দর শরীর ছোটখাটো। তাহলে ময়নাচকে সানুর কি কোন শত্রু ছিল—যাকে রাহুল চেনে না?

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে। পিছনে ঘুরে দেখল সে জ্যোৎস্নার মাঠে কাটা গাছের মতো সানু পড়ে আছে নিস্পন্দ। হঠাৎ দুঃখে রাগে জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল সে। মনে হল, সানু নয়—নিজেই পড়ে আছে রাহুল। আর সামনের কেয়াঝোপের কাছে গিয়ে লোকটার দিকে রিভলবার তাক করল সে। ট্রিগার টিপল।

এ কি! আজ ভোরে গুলি ছুঁড়েছিল অরুণের ঘরের জানালা দিয়ে। অথচ এখন কোন শব্দ হল না। ট্রিগারটা নড়ল না একটুও। আঙুলের চাপে গুলির কেসটা সরিয়ে ফের ট্রিগারে চাপ দিল। কোন শব্দই হল না।

ক্রমান্বয়ে ছটি কেসই ঘোরাল। ট্রিগার নড়ল না। দর দর করে ঘামতে থাকল সে। কাল রাতের মতো এও কি তবে স্বপ্ন দেখছে? কাঁপতে কাঁপতে রাহুল দেশলাই জ্বালল। দূরে লোকটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্নার গভীরে।

দেখল ট্রিগার ভাঙা—নিচের দিকে থ্যাঁতলানো। কে তার অজানতে অস্ত্রটা বরবাদ করে রেখেছে। কে সে?

না—সানুও না, এই কাজ যার—সেই তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী—জঘন্য শত্রু। ময়নাচকে সারাক্ষণ সে অদৃশ্য থেকে অনুসরণ করেছে। আর শক্তিকে গোপনে থেকে অবশ করে দিয়েছে। তার সব

হননেচ্ছাকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে ফেলেছে শেষে নিরস্ত্র করে ফেলেছে পুরোপুরি। হ্যাঁ—তার নাম শীলা। আঃ শীলা, তুমি জানো কী করেছ!

রাগে দুঃখে মাথার চুল খামচে ধরল সে। অকেজো রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। সানুর বিভলবারটা এখনও পড়ে রয়েছে তার লাসের কাছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে গেল।

উবুড় হয়ে পড়ে আছে সানু চ্যাটারজির নিস্পন্দ দেহটা। জ্যোৎস্নার রাত্রে নির্জন মাঠে একটা দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা। রাহুল চঞ্চল হয়ে উঠল। তাকে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে। যে লোকটা একে খুন করে পালিয়ে গেল, তাব ফাঁদের মুখে সে এখন রীতিমত বিপন্ন। সানুর শক্তিমান রিভলবাবটা দ্রুত কুড়িয়ে নিল রাহুল। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। নিরুচ্চাব একটি প্রতিজ্ঞার কঠিনতা তাকে গ্রাস করল সঙ্গে সঙ্গে।

রাহুল চলতে চলতে দেখল, নেশা কেটে গেছে। পা টলছে না আর। হাইওয়ে ডিঙিয়ে ওদিকে মাঠে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল ক্রমশ।

অরুণের ইটখোলায় পৌঁছে মাথা ঠাণ্ডা করে নিল সে। অরুণের আদরের কুকুরটা একবার ডেকেই চুপ করে গেল। বাইরের ঘরের দরজা খোলা। অরুণ একা বসে কী লিখছে নিবিষ্টমনে। রাহুলের পায়ের শব্দে ঘুরে বলল, কোথায় গিয়েছিলে? কখন থেকে তোমার অপেক্ষা করছি। শীলার কাছে শুনে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলুম—সানুটা একটা জানোযার। তার পাল্লায় পড়লে তো ...

রাহুল বসে পড়েছিল। বাধা দিয়ে শান্তভাবে বলল, আচ্ছা অরুণদা, সানুর সঙ্গে তার দাদা নীরেন চ্যাটারজির সম্পর্ক কেমন?

অরুণ বলল, কেন? সানু কিছু বলেছিল বুঝি?

রাহুল বলল, আমার কথার জবাব দাও আগে।

অরুণ একটু ভেবে নিয়ে বলল, বাইরে-বাইরে সম্পর্ক ভালই। নীরেনবাবু তার জোরেই তো এখানে রাজত্ব করেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভিতরে ওদের পারিবারিক কী সব ভজকট আছে। সানু প্রায়ই আমাকে বলে যে নীরেনবাবু তাকে বঞ্চিত করতে চায়। বিশেষ করে নীরেনবাবুর বউ নাকি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী।

রাহুল বলল, অরুণদা, সানুকে তোমাদের নীরেনবাবু খুন করেছে।

অরুণ চমকে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, যাঃ!

হ্যাঁ। এইমাত্র সানুকে সে খুন করে পালিয়েছে। ... রাহুল বিকৃত মুখে বলতে থাকল। .... সানু আমাকে নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। আমার চোখের সামনে তাকে তার দাদা গুলি করে পালাল। আমি কিচ্ছু করতে পারলুম না। আমার রিভলবারটা কে অকেজো করে রেখেছে, জানতাম না। অরুণদা, আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব।

অরুণ হন্তদন্ত হয়ে বলল, বল কী! সর্বনাশ! রাহুল নীরেনবাবুর পক্ষে অসম্ভব কাজ কিছু নেই জানি। কিন্তু .... আশ্চর্য, এ যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

রাহুল বলল, সানুর লাসটা এখনও পড়ে আছে মাঠে। একটা কিছু করা দরকার অরুণদা। হয়তো নীরেন চ্যাটারজি আমাকেই এতক্ষণে খুনী সাজিয়ে ফেলেছে। কাবণ, আমার সঙ্গে সানুকে সন্ধ্যায় অনেকেই যেতে দেখেছে।

অরুণ গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিকই বলেছ। একটা কিছু করা দরকার।

তারপর অরুণ উঠে দাঁড়ালো। .... আমার মনে হয়, এক্ষুনি থানায় খবর দেওয়া দরকার। ওদের সব খুলে বলাই ভালো। তুমি তো মূল সাক্ষী। একটু দেরি হলেই সব উল্টে যাবে। চলো, এক্ষুনি দুজনে বেরিয়ে পড়ি।

রাহুল বলল, হয়তো আমাদের আগেই নীরেন চ্যাটারজি থানায় চলে গেছে। আমাকে খুনি বানিয়ে ফেলেছে।

অরুণ বলল, তবু দেখা যাক না। ওঠ।

শীলা পর্দা তুলে ঢুকল। বলল, না—ওকে নিয়ে যেও না দাদা। তুমি একা যাও।

অরুণ অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি শীলা?

শীলা বলল, আমি ওঘর থেকে সব শুনছিলুম। তুমি বরং একা গিয়ে খবর নাও।

অরুণ উদ্বিগ্নমুখে বেরিয়ে গেল।

শীলা রাহুলের সামনে এসে বলল, সানু, তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল মুখ নামিয়ে বসেছিল। বলল, তার আগে বল তো শীলা, কেন তুমি আমার রিভলবারটা ভেঙেছ?

শীলা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, তার জন্যে তুমি কি রাগ করেছ আমার ওপর?

রাহুল মুখ তুলে বলল, তুমি জানো না শীলা, কী করেছ!

শীলা একটু হাসল। ... নিজের শক্তিটাই বড় শক্তি রাহুলদা। এতদিন মনে হত, অস্ত্রশস্ত্র হাতে না থাকলে এযুগে বাঁচা যায় না। এখন বুঝতে পারি, আসল শক্তি অন্য জায়গায় থাকে। মানুষের মনে। যাকগে—ও নিয়ে ভেবো না।

রাহুল হাসল। .... না, ভাবিনি। কারণ আরেকটা রিভলবার আমি পেয়ে গেছি। সানুরটা। এ লাইনের নিয়মই এই, শীলা।

শীলা চমকে উঠল! ... কেন ওর রিভলবার তুমি নিলে? এক্ষুনি ফেলে দিয়ে এসো। তোমার ঘেন্না করল না একটুও? ছিঃ!

রাহুল রিভলবারটা বের করে চুমু খেয়ে বলল, কে জানে! সানুকে আমি ঘেন্না করতুম, না ভালবাসতুম। হয়তো ভালই বাসতুম। তা না হলে মাঠে আজ ডেকে নিয়ে যখন ও আমাকে ডুয়েল লড়তে ডাকল, কেন ওর ডাকে সাড়া দিতে পারছিলুম না? টের পাচ্ছিলুম, ময়নাচকে আমার সেই একমাত্র ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী—তবু আমার হাত উঠছিল না। ওকে এত অসহায় মনে হচ্ছিল। হতভাগ্য সানু চ্যাটারজি!

শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল, সানু তোমাকে ডুয়েল লড়তে ডেকেছিল? কেন?

রাহুল বলল, কারণ আমি নাকি তার বাগদত্তা বউকে নষ্ট করেছি!

শীলা মুখ ঘুরিয়ে বলল, ইতর! ছোটলোক!

কিন্তু তুমি তো আজ বেঁচে গেছ, শীলা! আর তো তোমাকে এখান থেকে কোথাও পালাতে হবে না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

কে জানে! ... শীলা অস্ফুটকণ্ঠে বলল।

শীলার কণ্ঠস্বর শুনে রাহুল চমকাল। বলল, কেন শীলা?

হঠাৎ শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুলের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, দ্যাখ, আমার মনে হচ্ছে—এক্ষুনি তোমার কী বিপদ ঘটে যেতে পারে। তোমার এখানে বসে থাকা ঠিক নয় রাহুলদা। হয়তো এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে তোমাকে ধরতে। চলো, বাইরে কোথাও গিয়ে বসবে। তারপর শিগগির একটা কিছু ঠিক করে ফেলব আমরা। রাহুলদা, আর সময় নেই। ওঠ।

রাহুল বলল, অরুণদা ফিরে আসুক না।

শীলা তার হাত ধরে টানল। .... না। আর একটুও দেরি নয়। চলো।

দুজনে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল শীলা। ইটখোলার ভিতর দিকে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। রাহুল একটু অবাক হয়েছিল শীলার আচরণে। কিন্তু কোন কথা বলল না। জঙ্গলের ভিতরে স্তূপীকৃত ইটের মধ্যে সাবধানে ওরা এগোচ্ছিল। হাওয়া বইছিল উদ্দাম। জ্যোৎস্নায় দূরের মাঠ আর এই জঙ্গলটা রহস্যময় আর ষড়যন্ত্রসংকুল দেখাচ্ছিল। একটা খোলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুজনে গিয়ে বসল। কতক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। দূরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাক চলে যাওয়ার আবছা শব্দ ভেসে আসছে। শনশন করে ঝোপঝাড় আর গাছপালা দুলছে। শীলা আরও কাছে সরে এল। রাহুল অবাক হয়ে দেখল সে নিঃশব্দে কাঁদছে। রাহুল ওকে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, শীলা, কী হল তোমার?

শীলা ভাঙা স্বরে ওর বুকে মুখ গুঁজে বলল, আমার বড্ড ভয় করছে রাহুলদা। মনে হচ্ছে সব স্বপ্ন আমার মিথ্যে হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, কেন মিথ্যে হবে? আমি তো সানুকে খুন করিনি। তুমি দেখে নিও, সে-পাপ আমাকে লাগবে না।

শীলা চোখ মুছে বলল, একটা কথা রাখবে আমার?

বলো।

সানুর পিস্তলটা তুমি এক্ষুনি ফেলে দাও। তারপর ....

তারপর?

চলো, এক্ষুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

পালিয়ে যাবো? কার ভয়ে?

নীরেনবাবু তোমাকে ছাড়বে না রাহুলদা! নিজের মাথা বাঁচাতেই সে তোমার ওপরই সব চাপিয়ে দেবে। এ আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি।

রাহুল একটু ভেবে বলল, হয়তো তাই। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে পালিয়ে গিয়েই বা কেমন করে বাঁচব? পুলিশ আমাকে খুঁজে বের করবেই। তার চেয়ে এটার মুখোমুখি দাঁড়ানো ভালো।

শীলা ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠল, না না। চলো কোথাও পালিয়ে যাই আমরা—অনেক দূরে। যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না।

রাহুল দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, যেতে পারতুম। কিন্তু আমার রক্তে কী আছে যেন শীলা। মনে হচ্ছে সানু মরে গিয়ে ফের আরেকদফা হারের মুখে ঠেলে দিয়েছে আমাকে। তাছাড়া, যেজন্যে এসেছিলুম, তা তো চুকিয়ে ফেলতে পারিনি এখনও। নীরেন চ্যাটারজি এখনও বেঁচে আছে। না শীলা, আমার কাজ শেষ হয়নি। ....

সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। .... শীলা, তুমি অপেক্ষা করো। এখান থেকে চলে আমরা যাবই। কিন্তু তার আগে শেষ কাজটা চুকিয়ে নিতে দাও।

শীলা তার হাত ধরে টানল। চেঁচিয়ে উঠল, না না। রাহুলদা, তুমি যেও না। আমার কথা শোনো—রাহুলদা!

রাহুল হনহন করে চলে গেল। তাকে একটা ভয়ঙ্কর রক্তলিপ্সু বাঘের মতো দেখাল সেই নির্জন জ্যোৎস্না রাতে। গাছপালার আড়ালে সে লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে চরম শিকারের দিকে। শীলা ঘাসের ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। এ এক দুঃস্বপ্নের রাত যেন।

রাহুল যে তার কথা রাখল না, সেই দুঃখ শীলাকে ক্রমশ নিঃসাড় করে ফেলছিল। কতক্ষণ পরে সে উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ফিরে এল ঘরে। করুণা তার পায়ের শব্দে ধুড়মুড় করে উঠে বসল। শীলাকে দেখে সে চাপা গলায় বলল, কী হয়েছে রে শীলু? কোথায় গিয়েছিলি তোরা? তখন থেকে কী সব হচ্ছে, একটুও বুঝতে পারছিনে!

শীলা আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারল না। তার কাছে গিয়ে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

করুণা অবাক।

সানুদের বাড়ির উত্তরে বাগানটার ভিতর ঢুকে পড়েছিল রাহুল। বাগানের পর সেই পুকুর। পুকুরের পাড় ধরে বারান্দা ও চত্বরওলা ঘাটের কাছে পৌঁছল সে। নির্জনতা থমথম করছে চারদিকে। এই চত্বরে বসে একদিন সানুর সঙ্গে গল্প করেছিল সে। চত্বরের শেষে দেয়ালে দরজার মাথায় টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে। কেমন করে বাড়িতে ঢুকবে ভেবে পেল না সে। নীরেন চ্যাটারজিই বা কোথায় আছে এখন—তাও তার জানা নেই। কিন্তু সে আজ মরিয়া। রক্ত চঞ্চল হয়েছে খুনের নেশায়। তার সামনে এতটুকু বাধা সে আর সইতে রাজি নয়। যদি এখন শীলাও তাকে আটকাতে আসে, সে তাকে গুলি

করতে দ্বিধা করবে না। একটা খর ক্রোধের ঝড় তার মাথার ভিতর বইতে শুরু করেছে।

না—এদিক থেকে বাড়ি ঢোকা যাবে না। প্রথমে দরকার কোথায় নীরেন আছে, সেই খবরটা জানা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তা না হলে অনর্থক বিপদে পড়ে যাবে, উদ্দেশ্য মোটেও সিদ্ধ হবে না।

ডাইনে ঘুরে বাড়ির একপ্রান্ত ধরে চলতে থাকল। এদিকটা ফুলবাগিচা। অজস্র দেশিবিদেশি ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় রয়েছে। শিকারী প্রাণীর মতো সাবধানে এগোচ্ছিল সে। সামনের দিকে লনের কাছে যেখানে গাড়িবারান্দা, তার পিছনে একটা প্রকাণ্ড বুগানভিলিয়ার ঝাড় রয়েছে। পা টিপেটিপে তার ভিতর গিয়ে ঢুকল সে। ওখান থেকে সদর ঘরটা পুরো দেখা যায়।

ঘরের দরজা বন্ধ। বারান্দায় মৃদু আলো। হাওয়ায় পর্দা সরে যেতেই রাহুল দেখল ঘরের ভিতর কোন লোক নেই। গাড়িবারান্দায় নীরেন চ্যাটারজির জিপটাও দেখা যাচ্ছে না। সব নিস্পন্দ আর নির্জন। রাহুল ভাবল, বোকামি হচ্ছে। নীরেন কখন দেখা দেবে, সেই আশায় বসে থাকার কোন মানে হয় না। সে একটা চান্স মাত্র। তার চেয়ে সোজা এগিয়ে খোঁজ নেওয়া ভালো। সৎভাইকে শেষ করে এসে নিশ্চিন্ত নীরেন নিশ্চয় বিশ্রাম নিচ্ছে।

রাহুল আস্তে আস্তে বেরোল। বারান্দায় উঠল। একটু ইতস্তত করল। প্রকাণ্ড সেকেলে দরজার কপাট। কড়া নাড়লে শুনতে পাবে কি না কে জানে!

সে জোরে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজাটা। সেদিনের সেই লোকটাই বেরিয়ে এসে বলল, কাকে চাই?

নীরেনবাবুকে।

লোকটা রাহুলের পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিয়ে বলল, আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় থাকেন বলুন তো? বাইরে-টাইরে? কোন গাঁয়ে বাড়ি?

রাহুল সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, নীরেনবাবু আছেন?

লোকটা কেমন গম্ভীর। মাথা নেড়ে বলল, না। একটু আগে বেরিয়েছেন। তাছাড়া রাত দশটায় কারো সঙ্গে উনি দেখা করেন না। সকালে আসবেন। অবশ্যি, কাল সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না জানিনে। একটা বিপদ হয়ে গেছে। সেই নিয়ে উনি ভীষণ ব্যস্ত।

রাহুল নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, বিপদ? কী বিপদ?

লোকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, কেন শোনেননি? খানিক আগে সানুবাবু খুন হয়েছেন! আপনি বরং পরশু-টরশু একবার চেষ্টা করবেন। চাকরি-বাকরির ব্যাপার তো? পরে আসবেন—ওঁর মাথার ঠিক নেই এখন।

দরজা বন্ধ করে দিল সে। রাহুল বুঝতে পারল, জননেতার বাড়ির এই লোকটা তাকে চাকরির প্রত্যাশী ভেবেছে। এলাকার বেকার যুবকেরা এভাবে নীরেনের কাছে যখন তখন এসে ধরনা দেয়, সে জানে।

গেটে দারোয়ান যথারীতি বসে রয়েছে। গেটটা সামান্য খোলা আছে। রাহুল বেরিয়ে গেলেও সে গা করল না। এটাই রেওয়াজ আছে এ বাড়িতে—দারোয়ানও সেটা জানে। তাই কে ঢুকল বা বেরোল এবং কে না ঢুকেও বেরোল তার মতো, দারোয়ানের তাতে কোন মাথাব্যথা নেই।

এত রাতে হাইওয়েতেও নির্জনতা ছমছম করছে। বাজারের দিকেও লোকজন কদাচিৎ চোখে পড়েছে। ব্যর্থতার ক্ষোভে রাহুল কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে হাঁটল। এ কাজে সময়ের দরকার হবে কিছুটা—সে বুঝতে পারছিল। এখন নীরেন চ্যাটারজিকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। হয়তো এতক্ষণে পুলিশের সঙ্গে সেই মাঠে সানুর লাসের কাছে হাজির হয়েছে সে।

হঠাৎ চমকে উঠল রাহুল। কিন্তু সানুকে যে খুন করল, সে সত্যি কি নীরেন চ্যাটারজি? স্পষ্ট তো রাহুল দ্যাখেনি! এ তার নিতান্ত অনুমান। এটা ধারণা আরোপ করা মাত্র। সেই আততায়ী নীরেন না হতেও তো পারে!

না হতেও পারে? তবে কে সে? সানুকে খুন করার উদ্দেশ্য কী তার?

এমন তো হতে পারে যে সানুর আরও কোন ভীষণ শত্রু ছিল, অনেক ব্যাপার ছিল সানুর জীবনে

—যা রাহুল আজও জানে না বা জানা সম্ভব নয়! রাহুল কতদিনই বা এখানে এসেছে! কতটুকু জানে সানুর? হয়তো কেউ তক্কে তক্কে ছিল—আজ সুযোগ পেয়ে সানুকে খুন করে বসল।

রাহুল একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল। যত ভাবল, নীরেন চ্যাটারজির ওপর থেকে তার সন্দেহটা সরে গেল ক্রমশ। একথা তো ঠিকই যে আততায়ীকে সে মোটেই চিনতে পারেনি।

রাগ পড়ে গেল নীরেনের ওপর থেকে। অন্তত সানুর হত্যাকারী হিসেবে নীরেনকে সে আর গণ্য করতে পারছে না। অথচ রাজেনবাবু তাকে ময়নাচকে পাঠিয়েছিলেন যে উদ্দেশ্যে, সেদিক থেকে দেখতে গেলে নীরেনকে তার খতম করতে হয়। আবার গঙ্গার কথা মনে পড়ে গেল রাহুলের। তার বাবার কথা মনে পড়ল।

সময় দরকার। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে তাকে। রাহুল আবার অরুণের বাড়ির দিকে চলল। শীলা তার কাণ্ড দেখে এবার হয়তো হাসবে। ....

অরুণ ততক্ষণে ফিরেছে। বাইরের ঘরে শীলা আর সে বসে আছে। রাহুল অবাক হয়ে দেখল ওরা সত্যি হাসাহাসি করছে। ব্যাপার কী? এই পরিস্থিতে ওরা অমনভাবে হাসতে পারছে! রাহুল ঘরে ঢোকামাত্র অরুণের হাসিটা বেড়ে গেল। শীলাও হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ সানুর সঙ্গে বুঝি খুব নেশাটেশা করা হয়েছিল রাহুলদা?

রাহুল বলল, তার মানে?

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, যাঃ! কোন মানে হয় না।

শীলা বলল, রাহুলদা এরপর খুনখারাপি আর লাস ছাড়া কিছু দেখবে না। তারপর জ্যোৎস্নার রাত—ফাঁকা মাঠ—কল্পনার রাশ ছাড়তে অসুবিধে কিসের?

রাহুল প্রায় গর্জে উঠল—কী? হয়েছে কী অরুণদা?

অরুণ হাত তুলে বলল, রোস রোস হে শ্রীমান! আগে ব্যাপারটা শোন।

রাহুল বলল, তাড়াতাড়ি বলুন—কী হল! থানায় গিয়েছিলেন?

অরুণ বলল, ভেট্! থানায় যাব কী? সানু মলে তো থানায় যাব? ভাগ্যিস—

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, সানু মরেনি?

অরুণ হেসে বলল, ও শালা মরে? ওর মরণ নেই হে? বুলেটপ্রুফ শরীর শালার।

তার মানে?

গোড়া থেকে বলি শোন। ... অরুণ সিগ্রেট ধরিয়ে আরামে টান দিয়ে বলল। ..... হন্তদন্ত ছুটে যাচ্ছি—এমন সময় দেখি রাস্তায় শালা সানু টলতে টলতে আসছে। পরিষ্কার চাঁদের আলো। দেখেই চিনে ফেললুম। দৌড়ে গিয়ে বললুম, সানু, তুমি বেঁচে আছ? সানু বলল, বেঁচে থাকব না মানে? ... জোর মাতলামি শুরু করল ও। সেই ফাঁকে প্রশ্ন করে করে যা জানলুম, তা হচ্ছে এই : সানু তোমার দিকে পিস্তল তুলেছিল। ঘোড়াও টিপেছিল। কিন্তু—আমার যা ধারণা, চরম উত্তেজনায় সানু সেই মুহূর্তেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আমি ভাবছি, ভাগ্যিস গুলিটা তোমাকে লাগেনি। তারপর জ্ঞান হলে সে উঠে দ্যাখে, একা পড়ে আছে। সানু বলল, নির্ঘাৎ আমার রিভলবারটা নিয়ে পালিয়েছে রাহুল।

শীলা রাহুলের দিকে চোখ টিপল।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে আরেকজনকে দেখেছিলুম! সে ওর দিকে তাক করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর দৌড়ে পালিয়ে গেল!

অরুণ বলল, ভুল দেখেছ হে। না—লোক একজন দেখেছ, সেটা ভুল নয়। কিন্তু সে বেচারা নিরীহ ভীতু টাইপের লোক। তার সঙ্গে একটু পরেই দেখা হল। তিনি হচ্ছেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই চারু চক্কোত্তি। বেচারা পায়খানা করতে গিয়েছিলেন ওখানটায়। ওটা ওঁর প্রতিরাতের অভ্যাস। হঠাৎ গিয়ে পড়ে তোমাদের রণংদেহি মূর্তি দেখে উনি থ। যেই সানুর পিস্তল থেকে গুলির আওয়াজ হওয়া, অমনি উনি কাছাখোলা অবস্থায় ভোঁ দৌড়। সবই আকস্মিক যোগাযোগ।

রাহুল বলল, কিন্তু আমি যে ....

ভেট্ ভেট্। সব তুমি নেশার ঘোরে দেখে ইচ্ছেমতো ভেবে নিয়েছ। আমি শুধু ভাবছি—একবার সানুকে আর পরীক্ষা করেও দেখলে না! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও দৌড় লাগালে। এত বোকা আর ভীতু তুমি তো ছিলে না ভাই রাহুল!

অরুণ হাসতে লাগল। শীলা বলল, খবরদার রাহুলদা কক্ষনো আর ওসব ছাইপাঁশ গিলবে না কিন্তু। তোমার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে।

রাহুল গুম হয়ে বসে রইল। অরুণ বলল, মাতালটাকে তো ঠেলেঠুলে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। না—পাঠিয়ে নয়, একেবারে নিজে গিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে এলুম গেটের মধ্যে। সেখানে ভজহরি বাবুর সঙ্গে দেখা। সে তো সানুকে দেখে হাঁ। কারণ ইতিমধ্যে চারু পণ্ডিতমশাই দৌড়ে এসে ওদের খবর দিয়ে গেছেন যে সানুকে মাঠে কে এইমাত্র খুন করে ফেলেছে। চারুবাবুও তোমার মতো ভুল দেখেছিলেন তো! তিনি ভেবেছিলেন, তুমিই বুঝি সানুকে খুন করলে। অবশ্যি তোমাকে উনি চিনতে পারেননি। দিন হলেও চিনতে পারতেন না অবশ্য। যাই হোক খবর শুনে নীরেনবাবুরা দৌড়ে মাঠে গিয়ে হাজির। কিন্তু সানুর লাস তাঁরা পেলেন না। হন্তদন্ত সব ফিরেছেন—নীরেনবাবু, পণ্ডিতমশাই, আর সব পাড়ার লোকজন। আমি সানুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা। সব বললুম। তখন হাসির ধুম পড়ে গেল। পণ্ডিতমশায়ের কাঁপুনি থামল। বাপ্স!—একটু থেমে অরুণ বলল, অবশ্যি সানুর সঙ্গে তুমিই মাঠে ছিলে—তা আমি বলিনি। যাক্ গে, শোন। সানুর সঙ্গে আর মিশো না। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর এক কাজ করো—ক'দিন বেরিও না কোথাও। খাও-দাও ঘুমোও—নয়তো আমার সঙ্গে ইটখোলায় আড্ডা দাও। শীলু, খেতে দে রে। খিদে পেয়েছে।

অরুণ উঠে চলে গেল ভিতরে। শীলা একটু পরে উঠল। রাহুল লক্ষ্য করল, তার মুখটা এবার কেমন গম্ভীর দেখাচ্ছে। সানু বেঁচে আছে বলে?

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল রাহুলের।

জানালাগুলো খোলা থাকায় বাইরের জ্যোৎস্না থেকে সামান্য আলোর আভাস ঘরের ভিতরে। রাহুল দেখল, শীলা তার পাশে বসে তাকে ঠেলছে। রাহুল চাপাগলায় বলল, কী ব্যাপার?

শীলা মুখ নামিয়ে বলল, চলো—বেরোই। রাত শেষ হয়ে এল যে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে রাহুর বলল, কোথায়?

বা রে! কী কথা ছিল আমাদের? আমি তৈরি। দেরি করো না—ওঠ।

সব মনে পড়ে গেল রাহুলের। হ্যাঁ, শীলার সঙ্গে তার ময়নাচক ছেড়ে আজ চলে যাবার কথা আছে। সানু মরেনি—ওর মৃত্যু নেই। ও বেঁচে থাকতে শীলাকে নিয়ে সে সুখে থাকতে পারবে না এখানে। রাহুল সাবধানে উঠে বসল। তারপর বলল, আচ্ছা শীলা, যদি আমরা অরুণদাকে বলেই যাই, তাঁর নিশ্চয় আপত্তি হবে না।

পাগল! ... শীলা ফিসফিস করে উঠল। .... দাদা যে বিপদে পড়ে যাবে সানুর হাতে। দাদা কখনো যেতে দেবে না আমাকে।

কিন্তু অরুণদা যে সত্যি বিপদে পড়ে যাবেন!

তাতে আমার কী?

এ মুহূর্তে শীলাকে কেমন স্বার্থপর মনে হল রাহুলের। সে চলে গেলে অরুণ নির্ঘাৎ সানুর খপ্পরে পড়ে যাবে। সানু হয়তো ভাববে অরুণই এদের সরিয়ে দিয়েছে। রাহুল খুব দ্বিধায় পড়ে গেল।

তাকে চুপ দেখে শীলা বলল, তাহলে তুমি থাকো—আমিই যাই।

রাহুল কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, সে শীলাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। চুমু খেল শান্তভাবে। শীলা বাধা দিল না। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল দুজনে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শীলা বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাকে যেতে দাও।

রাহুল শুধু বলল, কেন যাবে?

দাদাকে তুমি এখনও চেনো না। ওকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। গতিক বুঝলে দাদা সানুর ঘাড়ে আমাকে ঝুলিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করবে না। রাহুল ভাবছিল, সেটা মিথ্যে নয়। অরুণ

খুব দুর্বলচেতা ভীতু লোক। তার পক্ষে সেটা সম্ভব। কিন্তু এমনি করে চোরের মত পালিয়ে যাবে তাই বলে?

শীলা উঠে দাঁড়াল। রাহুল দেখল, সে একেবারে তৈরি। মেঝে থেকে একটা সুটকেস তুলে নিচ্ছে শীলা।

রাহুল এবার উঠল। দেয়ালের হুক থেকে ব্যাগটা তুলে নিল। বালিশের নিচে থেকে সানুর রিভলবারটাও নিল, পকেটে রাখল। বাবার বাকসোগুলো নেওয়া যাবে না। থাক। কী হবে!

সাবধানে শীলা বাইরের দরজাটা খুলল। প্রথমে সেই বেরোল। বাইরের জ্যোৎস্না ভোরের আলোয় ফিকে হয়ে গেছে—ধূসর অন্যরকম আলোয় পৃথিবী এখন স্পষ্টতর। কাককোকিল ডাকতে শুরু করেছে চারপাশে। রাতের উদ্দাম হাওয়াটা থেমে গেছে।

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এল শীলা। ঢিবির নিচে থেকে একটা বিশাল শরীর টলতে টলতে উঠে আসছে সামনে। লাল চোখ—বিশৃংখল শার্টের নীচেটা প্যান্টের উপর থেকে বেরিয়ে পড়েছে খানিক—বোতাম খোলা, খালি পা, উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল, অসম্ভব একটা মানুষ! কয়েকমুহূর্ত তাকে যেন চিনতেই পারছিল না শীলা।

রাহুল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

সানু চ্যাটারজি পাগলের মতো হেসে উঠল—হা হা হা হা।

রাহুল আর এক মুহূর্ত ইতস্তত করল না। পকেট থেকে রিভলবারটা ক্ষিপ্রহাতে বের করল। তারপর ট্রিগারে চাপ দিল। একবার .... দুবার .... তিনবার।

সানু চ্যাটারজি গড়াতে গড়াতে ঢিবির নীচে ইটের পাঁজার ওপর গিয়ে স্থির হল। এতক্ষণে সেই ডুয়েলটা একতরফা সমাপ্ত হল। এবার সত্যি সত্যি মারা পড়ল হতভাগ্য সানু চ্যাটারজি। তার হাতের টিপ রাতেব প্রথম দিকে অব্যর্থ হলে রাহুলই মরে যেত। হয়তো এর নামই ভাগ্য।

রাহুল শীলার হাত ধরে টানল। শীলা পুতুলের মতো পা বাড়াল। প্রচণ্ড নির্ঘোষে অরুণের ঘুম ভাঙলো কি না টের পাবার আগেই ওরা হাঁটতে শুরু করছে। দ্রুত হেঁটে চলল দুজনে। হাইওয়েতে পৌঁছে দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর হাঁটতে থাকল। পিছনে একটা ট্রাক আসছে। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলতেই সেটা থামল। ট্রাকগুলো এমনি করে বাড়তি পয়সা কামাতে অভ্যস্ত। ড্রাইভারটা শুধু প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, আপাতত রেলস্টেশন অব্দি।

ট্রাকটা ভোরের হাইওয়েতে প্রচণ্ড গর্জন করে ছুটে চলল। দিগন্তে তখন লাল সূর্যটা ডিমের কুসুমের মতো আকাশ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।....

স্টেশনে পৌঁছতে সেই সূর্যের রঙ বদলাল। হালকা রোদ্দুর ছড়াল চারদিকে। একটা বেঞ্চে বসে ওরা চা খেতে থাকল। রাহুল একবার চাপা গলায় বলল, শীলা, ভয় করছে না তো আর?

শীলা মাথা দোলাল। একটু হাসলও।

এবার তাহলে সামনে পড়ে আছে একটা অন্যরকম জীবন। তার কথাই শীলা ভাবছিল। আপাতত বেথুয়াডহরিতেই যাবার মতলব—তারপর ....

হঠাৎ রাহুল বলল, শীলা, তোমার সিঁথিটা শূন্য থাকা আর ঠিক নয়। কে কী ভেবে বসবে। বসো, আসছি।

শীলা পরিচ্ছন্ন হেসে বলল, বেশ তো। নিয়ে এসো না সিঁদুর। কিন্তু এখন পাবে কোথায় শুনি?

ওপাশে তো সব দোকান রয়েছে। দেখি, বলে রাহুল উঠে গেল।

ট্রেনের এখনও সামান্য কিছু দেরি আছে। একটু উৎকণ্ঠা অবশ্যই রয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি ট্রেনটা আসে তত মঙ্গল। শীলার মনে শুধু সেই আসন্ন ট্রেনের চাকার শব্দ—দূর থেকে কাছে প্রতিধ্বনিময়। একটা আপ কিংবা ডাউন যে কোন ট্রেনের জন্যে শীলা এখন জীবন বিকিয়ে দিতেও রাজি। সেই ক্রমাগত ট্রেনের সঙ্গীতময় ধ্বনিপুঞ্জ তার কানে স্পষ্টতর হচ্ছে। ....

শীলা চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে পাশে ছোট্ট বাজারটার দিকে তাকাল। সবে দোকানপাট খুলতে

শুরু করেছে। রিকশোর জটলা বাড়ছে। সকালের ট্রেনের যাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে একটি দুটি করে। খুব বড় স্টেশন নয়। কিন্তু এখনও রাহুল ফিরছে না কেন? শীলা একটু এগোল।

রাস্তায় গিয়ে সে খুঁজল রাহুলকে। তারপর চমকে উঠল। ও কী! রাহুল ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? ছোট্ট বাজারের পরে বিশাল একটা মাঠের শুরু। সেই মাঠের দিকে চষা জমির ওপর দ্রুত হেঁটে চলেছে রাহুল!

কয়েকমুহূর্তের জন্যে সারা শরীর অবশ হয়ে পড়েছিল শীলার। জিভ ব্লটিং পেপারের মতো খসখসে হয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিল সে। ঠোঁটে দাঁত কামড়ে নিষ্পলক তাকিয়ে দেখতে লাগল রাহুল চলে যাচ্ছে। ভণ্ড, মিথ্যুক, প্রতারক কোথাকার! সিঁদুর কেনার ছল করে তুমি পালিয়ে গেলে! শুকনো চোখ ফেটে জল এল এবার।

একবার ইচ্ছে হল দৌড়ে গিয়ে ওকে ধরে ফেলে—সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিছু বলে। কিন্তু পরক্ষণেই জানল, ওকে আব ধরা যাবে না। নির্জন প্রসারিত শূন্য মাঠের বুকে এতক্ষণে ওই মানুষটার সত্যিকারের চেহারা ফুটে উঠেছে। ওর নাগাল পেতে শীলার মতো মেয়েকে আরও কতবার জন্মাতে আর মরতে হবে।

সিগনাল পড়ে গেছে ওদিকে। স্টেশনে হল্লা বেড়েছে। শীলা চঞ্চল হল। ময়নাচকে আর ফিরবে না সে। অনেকদিন পরে যেন রাহুল এসে তাকে একটা মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছে। বেথুয়াডহরির সেই অনেক স্মৃতিতে ভরা সংসারটা আজ শূন্য আর নির্জন হলেও মনের ভিতর হাতছানি দিচ্ছিল। একটা দুঃস্বপ্নের মতো ময়নাচকের ভয়ঙ্কর জীবন থেকে সে সদ্য জেগে উঠেছে।

টিকিটের কাউন্টারের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল শীলা। আঃ, কতদিন ছেলেবেলার স্বপ্নেভরা বেথুয়াডহরি তার যাওয়া হয়নি!.......

রাহুল অনেকখানি হেঁটে একবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে স্টেশনটা দেখে নিল। শীলা দুঃখ পাবে। সে জানে। কিন্তু উপায় ছিল না। ময়নাচক থেকে এতখানি পথ সে মনে মনে তোলপাড় হয়েছে। শীলাকে কি সত্যি ভালবাসে? শীলাকে নিয়ে জীবন কাটালে কি সুখী হবে? কিসে তার সুখ—কাকে সে ভালবাসে, তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

স্টেশনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, কোথাও একটা গুরুতর ভুল করা হচ্ছে। তার মন বলছিল, না—না, ওদিকে নয়, ওখানে নয়। তার জীবনের শেষ কথা এই পালিয়ে গিয়ে ঘরবাঁধা নয়। অন্য কিছু।

তাছাড়া, এখন তার সরকারি পরিচয়—শুধুমাত্র খুনী। আজই ভোরে সে ময়নাচকে সানু চ্যাটারজি নামে একটা লোককে তারই রিভলবারে গুলি করে মেরেছে। সানুর দাদা নীরেন চ্যাটারজি প্রখ্যাত লোক—প্রভাবশালী। পুলিশ রাহুলকে রেহাই দেবে না। একসময় তাকে খুঁজে বের করবেই—তারপর কাঠগড়ায় হাজির করে দেবে বিচারকের সামনে। যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি হবে। তখন বেচারি শীলা আরও বেশি কষ্ট পাবে। জেলখাটা বা ফাঁসিযাওয়াদের বউ হওয়া শীলার মতো শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ের পক্ষে ভারি অশোভন। সে তাকে হয়তো সত্যি সত্যি গভীরভাবে ভালবেসেছিল, তার কাঁধে ওই কুশ্রী জীবনটা চাপিয়ে দেবার অধিকার রাহুলের নেই।

রাহুল একটু হাসল। মনে মনে বলল, শীলা, সুখে থাকো। স্বচ্ছন্দে থাকো। আমার জীবনটা আমার থাক, তোমারটা তোমার। দুটোকে নিজের নিজের ছন্দে বয়ে যেতে দাও।

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে শীলাকে খুঁজছিল অতদূর থেকে। দেখতে পেল না। ভেবেছিল, শীলা দৌড়ে আসবে। এলে রাহুল কী করত? .... কী করতে তুমি, রাহুল? নিজেকে প্রশ্ন করে জোরে হেসে উঠল সে। তারপর রিভলবারটা বের করে শূন্যে নাচাতে নাচাতে পা বাড়াল। দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল মাঠের বুকে সোজা হাঁটতে থাকল। সামনের গ্রামে গিয়ে নিজের গ্রামটার পথ জিগ্যেস করে নিতে হবে তাকে। এখন তার সারা শরীরে শুধু গভীর তৃষ্ণা—প্রান্তপ্রবাহিনী গঙ্গার কালো জলে সে-তৃষ্ণা মেটাবে রাহুল।

সে গঙ্গা ও মুক্তকেশী—একদিন সেও ছিল পরম কামনার সুখদুঃখে ভরা।

তারপর? সেই কালো জলে রিভলবারটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

তারপর যাবে সে বহরমপুরে রাজেনবাবুর কাছে। সোজাসুজি বলবে, একটা কবিতা শুনুন স্যার।

অবশেষে এল সেই ঘাতক .....
শান্ত রুগ্ন ভীতু ছন্নছাড়া প্রেমিক
শূন্য নগ্ন হাত ভিখারির প্রার্থনায় জড়োসড়ো
রুক্ষ চুলে কামনার দুঃখগুলি হাওয়ার মতন মৃদু কাঁপে
কামনার সুখগুলি শুধু দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে ......

একদা বর্ষার রাতে

নিষ্প্রাণ মাটিতে তার মায়ের দাহ হয়েছিল!........

সুতীব্র উত্তেজনা হঠাৎ তাকে নাড়া দিল। সে নদীর খাড়া পাড় বেয়ে এক দৌড়ে নেমে গেল বালির ওপর। কোথাও একটু জল নেই। ধুধু শুকনো বালি উড়ছে ঝাঁঝাল হাওয়ায়। জুতো না থাকলে পায়ে ফোস্কা পড়ে যেত। সে ওদিকের ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেল। খয়েরী বা পিঙ্গল সব ঘাস কাঁটাঝোপ এখানে ওখানে রোদে ধুঁকছে। তার মধ্যে পোড়া কাঠের টুকেরা আর মাটির সঙ্গে জমাট হয়ে যাওয়া কালো ছাই দেখে শ্মশানটা চিনতে পারল সে। যেখানটায় মায়ের চিতা সাজানো হয়েছিল, তার পাশে সেই ভেঙেপড়া প্রকাণ্ড শ্যাওড়া গাছটা এখনও রয়েছে। আর কী যেন ছিল! একটু খুঁজতেই মনে পড়ল, হ্যাঁ-একটা শিমুল গাছ। সেটা নেই। শিমুল গাছটার গায়ে দীর্ঘ কয়েকফালি কালো দাগ দেখে বুঝেছিল ওটা বজ্রাহত। তাহলে পরে একদিন শিমুলগাছটা শুকিয়ে মরে গেছে। তখন গাঁয়ের লোকেরা কেটে নিয়ে গেছে তাকে। হেলেপড়া শ্যাওড়াগাছের খসখসে সরু সরু পাতার ঝাঁপি—ছায়ার আয়তন সামান্যই, তবু সেদিনের মতো আজও রাহুল তার নিচে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা দেহ মন জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে পকেট থেকে সিগারেট বের করল সে। ধরাল। হ্যাভারস্যাক খুলে শেষ জলটুকুও খেয়ে নিল।

তাহলে সে এজন্যেই পায়েহাঁটা দুর্গম ওই তেপান্তর মাঠের পথ পাড়ি দিয়েছে! তার মায়ের শ্মশানটা একবার দেখবার ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসেছিল। জানে—কিছু আর পাবার নেই। কোন স্নেহবিহ্বল কণ্ঠস্বর কোন সাড়া আশা করা বৃথা। তবু কী দুর্দমনীয় আকর্ষণ তাকে এই পথে টেনে এনেছে। ময়নাচকে পায়ে না হেঁটে পৌঁছতে হলে হয়তো অনেকটা ঘুরে যেতে হয়—ট্রেনে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে ছোটলাইনে কিছুদূর—তারপর আজকাল সেই হাইওয়েতে বাস চলছে সারাক্ষণ—কোন অসুবিধে ছিল না। দিব্যি চোখবুজে রাজার হালে আসা যেত।

তাহলে যেন মায়ের অতৃপ্ত আত্মা তাকে এখানে ডেকেছিল। রাহুলের চোখ ফেটে জল এল। বাবার প্রতি দুঃখে ঘৃণায় অস্থির হচ্ছিল সে। হয়তো এ দুঃখ ঘৃণা নতুন নয়—দশ বছর আগের সেই মর্মান্তিক দিনটিতে যে বীজ তার মনে পোঁতা হয়েছিল, আজ সেটা বিষাক্ত ফলের গাছ হয়ে মাথা তুলেছে। সে ঠিক করতে পারছে না বাবার সামনে কীভাবে দাঁড়াবে সে! বাবাকে সইতে পারবে কতখানি, তাও স্পষ্ট নয় নিজের কাছে। তাকে তো মুখোশ পরে থাকতেই হবে—কারণ, রাজেন হাজরা তার হাতে একটা মুখোস দিয়েছে, কিন্তু বাবার সামনে এ মুখোশটাও যথেষ্ট নয়। আরো একটা কথা বড্ড জরুরী। বাবাকে টের পেতেও দেবে না সে তাঁর ওপর মায়ের দরুন ক্ষুব্ধ—কোনদিনও বলবে না যে তার তরুণ জীবনের এই পরিণতির জন্যে আসলে দায়ী তার বাবার নির্বিকার মনোভাব। কোনদিন যদি একবারের জন্যেও বাবা তার কাছে যেতেন, আদর করতেন—সে সৎ হয়ে উঠত।

সেই কৈফিয়তই কি আজ সে প্রকারান্তরে বাবার কাছে নিতে যাচ্ছে? সেইজন্যেই কি রাজেনবাবুর প্রস্তাব শুনে সে নেচে উঠেছিল? টাকা তার দরকার, শুধু দরকার নয়—জরুরী। কিন্তু টাকা যেন একটা নিছক উপলক্ষ।

মনে মনে মায়ের আত্মার উদ্দেশে সে বলল, শান্তিতে থাকো। আমাকে ক্ষমা করো। তখন আমি ছোট ছিলাম। কিছু বুঝিনি। আজ বুঝতে পারি। একটা নির্বিকার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের পাল্লায় পড়ে তোমার মনে কোনদিন শান্তি ছিল না। এই লোকটা যতখানি ছিল বাক্যবাগীশ ততখানি আন্তরিকতা তার ছিল না। না—দারিদ্র্য নয়, তার নির্বিকার আচরণই তোমাকে সারা জীবন কষ্ট দিয়েছে। আজ আমার সব মনে পড়েছে, মা। স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে ছেলেবেলার সব ঘটনাগুলো। রাতে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতুম—আর তোমাদের সেই তেতো বিচ্ছিরি বচনগুলো শুনতাম। তোমরা টের পেতে না পরস্পর সন্দেহের বিষে তোমরা জ্বলে পুড়ে মরতে। পরস্পরকে আঘাত করতে কিন্তু আমার সামনে দিব্যি চমৎকার মুখোশ পরে কাটাতে, আমি সব জানি!.....

বাবার সঙ্গে মায়ের বয়সের তফাত ছিল অনেক। পনের ষোল বছর কিংবা তারও বেশি। মায়ের মুখেই শুনেছে সে। আজ সে বুঝতে পারে ওদের মধ্যে এই বয়সের অসামান্য পার্থক্যটাও হয়তো গুরুতর কাজ করেছে। কিন্তু মা তো খুব শান্ত সহজ মনের মানুষ ছিলেন। সামঞ্জস্য করে নিতে জানতেন

নানা ব্যাপারে। শুধু বাবা—বাবা বড় জটিল, সন্দিগ্ধ আর হিংস্র প্রকৃতির মানুষ যেন। পাড়ার মানুষ সরিৎকাকার সঙ্গে মায়ের একটু মেলামেশা ছিল। সে নিয়ে এক রাত্রে .....

হঠাৎ কোথায় গুড় গুড় করে চাপা শব্দ হল। চমকে উঠে রাহুল দেখল, বাতাস কখন থেমে গেছে। বিশাল আদিগন্ত মাঠের ওপর খসখসে ধূসর একটা ছায়া পড়েছে। পশ্চিমের আকাশটা চাপচাপ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে—সে মেঘের রূপ ভয়ঙ্কর। কোথায় কালো কোথাও রক্তিম—দীর্ঘ বিস্তৃত একটা রুদ্র ব্যাপকতা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো ফুঁসছে। কালবোশেখি! কালবোশেখি আসছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে এসে পড়ল সেই ভয়ঙ্কর।

যেন লক্ষ লক্ষ বুনো মোষের পাল গাঁক গাঁক করে দৌড়ে চলল পশ্চিম থেকে পূর্বে। পৃথিবী কাঁপতে লাগল তাদের ক্ষুরের আঘাতে। ধারাল শিঙে উপড়ে যেতে থাকল গাছপালা। টলতে টলতে দৌড়চ্ছিল সে। আঁধির আড়ালে সেই ছোট্ট গ্রামটা লক্ষ্য করা গেল না। রাহুল দৌড়াচ্ছিল। চোখ খুলতে পারছিল না।

তারপর শুরু হল শিলাবৃষ্টি। মেঘের গর্জন বাড়ল। রাহুল দিশেহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বৃক্ষবিরল নির্জন মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল, আর পৌঁছনো যাবে না। দিকচিহ্নহীন উত্তাল একটা ধ্বংসের ব্যাপকতায় সে মরিয়া হয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছিল। তার মনে হচ্ছিল—যেভাবেই হোক তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। ভিজে মাটির একটা গন্ধ উঠছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটছে। বছরের প্রথম বৃষ্টির স্বাদে আনন্দিত কীটপতঙ্গের জগতে একটা বিপুল সাড়া পড়ে গেছে। বজ্রাহত গাছ, ভাঙা পাখির বাসা, মরা খেঁকশিয়াল আর দলপাকানো খড়কুটোর মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সে।

একটা আলো আসছিল দূরে। কাছে এলে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হল। রাহুল জিগ্যেস করল, ময়নাচক আর কতদূর বলতে পারেন?

লোকগুলো আসছিল, সেখান থেকেই। ময়নাচকে হাইওয়ের ধারে আজকাল বাজার বসছে। সে পাড়াগাঁ আর নেই। পয়সাওলা লোকেরা সবাই ওখানে গিয়ে বাড়ি করছে। ইলেকট্রিকের আলোয় সেজেগুজে মনয়াচক আজ একালের সুন্দরী। সামনের গাছগুলো পেরোলেই দেখতে পাবেন আলোর ঝিকিমিকি। ভবানীবাবুর কথা বলছেন? তিনি মারা গেছেন। তবে তার মেয়ে আছে—ভালই আছে। যদি বলেন কেমন ভাল—কিসের ভাল—অত কৈফিয়ত দিতে পারব না মশাই। নিজে গিয়ে দেখুন। বড় রাস্তার ধারে নতুন বাড়ি। জিগ্যেস করবেন, মুক্তকেশী হোটেলটা কোথায়। ভূতে দেখিয়ে দেবে। আজ্ঞে হ্যাঁ—ওটা ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে। সাবরেজেস্টেরী আপিস, ব্লক-আপিস—কত সব রয়েছে কিনা! তাই নানা গাঁয়ের লোক ওখানে এসে দিন রাত্রি পড়ে থাকে। পেটটা তাদের যখন আছে তখন একটা সুব্যবস্থাও করা চাই তার।

যে জবাব দিচ্ছিল, সে বাড়ির জন্যে হয়তো ব্যস্ত। হড়বড় করে বলে যাচ্ছিল কথাগুলো।

..... বহরমপুর থেকে আসছেন? তা এ হাঁটা পথে কেন? মশাই সুপথ দূর ভালো। কার কথা বললেন? হৃষিকেশবাবু? কেউ হয় নাকি? হয় না? আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি আর ভবানীবাবুর মেয়ে একজায়গাতেই থাকেন। থাকবেন না তো যাবেন কোথায়? হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ! আর বলবেন না স্যার—সে এক মজার কাণ্ড!

রাহুল একপা এগিয়ে উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করল, কী, কী কাণ্ড বলুন তো?

লোকটা বলল, হৃষিকেশবাবু এখন নতুন রঙ্গে মজে আছেন। ভবানীবাবুর বিধবা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে যে! হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

মাথা ঘুরে উঠেছিল—কতক্ষণ পরে রাহুল দেখল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। আলোটা নাচতে নাচতে দূরে এগিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। এটা একটা দুঃস্বপ্ন ভেবে সে জেগে ওঠার জন্যে ছটফট করতে থাকল। গঙ্গা, সেই গঙ্গা!

হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে রাহুল মনে মনে হিসেব করছিল। রাজেনবাবু আসবার সময় দশটা মাত্র টাকা দিয়েছেন রাহাখরচ বাবদ। রাত্তিরটা এখানে না কাটিয়ে সোজা ফিরে যাওয়া যায় কি না তাকে খোঁজ নিতে হবে। সে লক্ষ্য করছিল, কিছুক্ষণ পর পর অনেক ট্রাক আনাগোনা করছে। বাস না পেলে একটা ট্রাকেই স্টেশন অব্দি পৌঁছনর ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হবে। রাতের দিকে ট্রেন না থাকলেও ক্ষতি নেই। স্টেশনে রাত কাটাবে। কিন্তু এখানে নয়। কখনো নয়।

রাগে দুঃখে ঘেন্নায় তার মনটা তেতো। ক্ষিদেতেষ্টাও ভুলে গেছে। ময়নাচক তার পায়ের নিচে যেন কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। তাকে পালাতেই হবে এখান থেকে। এখুনি। ফিরে গিয়ে রাজেনবাবুকে বলবে—ও আমার দ্বারা হবে না স্যার। কারণ স্বরূপ বানিয়ে কিছু বলবে সে। তারপর?

রাহুলের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে হল—যে অন্ধকারের মধ্যে এতকাল সে বাস করেছিল, সেই অন্ধকারটা ফের তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। নেপালদা হীরু খোকা মনা—সকল অন্ধকারের সহচর তাকে তার মধ্য থেকে হাতছানি দিচ্ছে। পলকে-পলকে নিজের ভিতর সে অন্ধকারে স্বাদ স্মৃতির ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল। ব্যাগের ভিতর হাত ভরে অটোমেটিক রিভলবারটা আছে কি না দেখে নিল সে। এই যন্ত্রটা তার ব্যাগের ভিতর একটা মোজার প্যাকেটে মোড়কবাঁধা অবস্থায় রাখা ছিল—জেলে যাবার কিছুদিন আগে, যে দিন সন্ধ্যায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সেদিন বিকেলে পানওয়ালা ভুজুদার কাছে জিম্মা দিয়েছিল ভাগ্যিস! বুড়োমানুষ ভুজুদা সেটা খুলেও দ্যাখেনি অবিকল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে গতকাল। ত্রিশটা কার্তুজ ছিল—একটাও খোওয়া যায়নি। কিন্তু কাজে লাগবে কি না কে জানে! পুরনো হয়ে গেছে তো বটেই—তার ওপর সদ্য জলঝড়ে ভিজে যায়নি তো? পরীক্ষা করবার জন্য তার মনটা চনমন করে উঠল। এখন আফসোস লাগে—সেই বিশাল নির্জন মাঠে চমৎকার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্য, একবারও এটার কথা তার মনে ছিল না। সারাপথ তার মনটা জুড়ে ছিলেন মা আর বাবা—তারপর গঙ্গা।

প্যাকেটটা পীচবোর্ডের। হাত ছুঁইয়ে টেরপাচ্ছিল, সেটা বেশ ভিজে উঠেছে। কিন্তু তাহলেও এতক্ষণে তার মনে একটা বিপুল সাহস অভাবিত পরাক্রমে ফুঁসে উঠেছে। জেল থেকে বেরিয়ে ভুজুর কাছে ওটা ফেরত নিয়ে তখন তো তার মনেই হয়নি যে সে শক্তিমান? আসলে, তখন একটা ক্লান্তি তাকে নিরাসক্ত করে তুলেছিল। ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার বোধে সে ভেঙে পড়েছিল। অথচ এই ছঘরা অটোমেটিক পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের অস্ত্রটা যতক্ষণ তার হাতে আছে, ততক্ষণ তার বেঁচে থাকার আর ভাবনা কিসের?

শুধু জানা দরকার, কার্তুজগুলো কাজ দেবে কি না। যদি কাজ দ্যায়, সে ফের শক্তিমান। উৎসাহে চাঙ্গা হল রাহুল। দুধারে ছোটখাটো বাজার। আলো ঝলমল পরিবেশ। খুব ভিড় না হলেও লোকজন খুব কম নেই। একটা চায়ের দোকান লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল সে। খিদে পেয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু তার আগে এক কাপ চায়ের তেষ্টা তাকে অস্থির করছিল।

কজন লোক আড্ডা দিচ্ছে দোকানটায়। ভিতরে দু দেয়ালে ঘেঁষে দুটো কাঠের বেঞ্চ। সামনে হাতখানেক উঁচু প্ল্যাটফরমে চা-ওলার কাজকারবার। বাইরেও বাঁশপাতার দুটো বেঞ্চ পাতা রয়েছে খোলা আকাশের নিচে। আবহাওয়ায় স্নিগ্ধতা আজ। বৃষ্টির ফলে উৎকট গরমটা কমে গেছে। রাহুল বাঁশের বেঞ্চে বাইরেই বসে বলল, চা দিন। বিস্কুট নেই? দিন।

চা-ওলা তাকে দেখছিল। বলল, মশায়ের নিবাস?

রাহুল একটু বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, বহরমপুর।

বহরমপুর!....চা-ওয়ালা ছাঁকনিতে এক চামচ চা দিয়ে বলল, অ। কেমন যেন চেনাচেনা ঠেকছিল, তাই কইতাছিলাম।

রাহুল ভুরু কুঁচকে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। অন্য লোকগুলো সম্ভবতঃ ব্যবসায়ী—ছোটখাট ব্যবসা-ট্যাবসা করে। তারা সেই ধরনের কথাবার্তায় জমে রয়েছে।

চা-ওলা ফিক করে হাসল হঠাৎ। .... মশায়ের মুখের লগে আমাগো ঋষিবাবুর মিল আছে। নাই চন্দ্রদা? দ্যাহ না চাইয়া। আছে না? এক্কেরে ঠিকঠাক।

কালো কুচকুচে লোকটি—সাদা গোঁফ, ছোট ছোট কদমকেশর কাঁচাপাকা চুল, একবার দেখে নিয়ে বলল, তা মাইনষের লগে মাইনষের মিল থাকব না ক্যান?

চা-ওলা বলল, জিগানেই বা দোষ কী? আমাগো ঋষিমাস্টার মশায়ের একগো পোলা আছিল। মাস্টারমশায়ের মুখেই গল্প শুনছি তেনার।

রাহুল চমকে উঠেছিল। লোকটা ভীষণ গায়েপড়া তো! সে বলল, একটু তাড়াতাড়ি দিন। আমার তাড়া আছে।

চা-ওলা অতৃপ্ত মুখে চায়ের কাপ আর দুটো বিস্কুট এগিয়ে দিল। তারপর বলল, ঋষিবাবু কেউ হন না আপনার? তেনার পোলা কিন্তু বহরমপুরেই থাকেন শুনছিলাম।

রাহুল বিরক্তমুখে বলল, আপনাদের ঋষিবাবুকে আমি চিনি নে। তার ছেলে হলে এখানে বসে চা খাচ্ছি কেন?

হ—সে তো ঠিকই। ... চা-ওয়ালার মুখটা নীরস দেখাল। সে কালো লোকটির দিকে ঘুরে বলল, মাস্টারমশাই সেদিন কইছিলেন—হোটেলটা তুলে দেবেন। বুঝলে চন্দ্রদা? পোষায় না। পোষাবে কেমন কইরা? সব নিজের হাতে না রাখলে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলব। বাস্ রে, সাক্ষাৎ মা কালী রয়েছেন ঘরে, তার ওপর কথা চলবে না। .... চা-ওলা হাসতে লাগল।

চন্দ্রদা লোকটি বলল, আরে ছাড়ান দ্যাও, ও খানকি ছেনালডার কথা। অন্য কথা কও, শুনি।

রাহুল ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। বলল, আচ্ছা, এখন এখান থেকে অমলাহাট স্টেশনে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে বলতে পারেন!

চা-ওলা বলল, আর তো বাস নাই অ্যাহন। আবার সেই ভোরবেলা। সন্ধ্যা ছটায় লাস্ট ট্রিপ ছাড়িয়্যা গেছে অনে। তবে ট্রাক পাইলে পাইতে পারেন।

সেই চন্দ্র বলল, এক কাম করেন। সোজা মুক্তকেশী হোটেলে চলিয়্যা যান' গিয়া। ওহানে অনেক ট্রাকড্রাইভার পাইবেন। ট্রাক নামাইয়া খাইয়া লয় তারা।

রাহুল হন হন করে চলে এল রাস্তায়। আশ্চর্য, তার বাবার সঙ্গে তার চেহারার এত মিল আছে, সে ভুলে গিয়েছিল। তার অস্বস্তি হতে থাকল। ময়নাচকে সে খুব সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে যেন। এখানে তার বাবাকে আগের সূত্র ধরে সবাই মাস্টারমশায় বলে সে জানত। শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে না, বাবা কেন সব থাকতে হোটেল খুলে বসলেন! এটাও একটা রহস্য। ভবানীবাবু মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। তাহলে তো তার মেয়ের বেশ পয়সাকড়ি থাকার কথা। বোঝা যায়, কিছু একটা ঘটেছিল—যাতে ভবানীবাবুর মৃত্যুর পর গঙ্গা সম্ভবত খারাপ অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আপাতত কোন কৌতূহল নয়—তাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যে মেয়ের দেহমনে একদা তার দেহমনের একটা ছাপ পড়ে গিয়েছিল—তাকে সে মায়ের আসনে দেখতে পারা তো দূরের কথা, সইতেও পারবে না। তাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

পা বাড়াল সে। সতর্কচোখে দু পাশটা দেখতে দেখতে এগোল। মুক্তকেশী হোটেলটা এড়িয়ে যেতে হবে। গঙ্গা তাকে সাত বছর পর দূর থেকে চিনতে পারবে হয়তো—কিন্তু বাবা? রাহুল টের পেল, একটা গোপন কষ্ট তার অস্বস্তিকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেই কষ্ট—সেই অবরুদ্ধ যন্ত্রণা উত্তরোত্তর তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল।

ডাইনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার ওপাশে মাঠ দেখা যাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠটায় গিয়ে দাঁড়াল সে। এ এলাকায় মাঠগুলো খুব বড়ো—দিগন্তবিস্তৃত। সে পিছু ফিরে দেখে নিল, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। না। জায়গাটা নির্জন। সে হন হন করে চষা ক্ষেত পেরিয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে থামল। এখানে একটা কার্তুজ পরীক্ষা করা যেতে পারে। আওয়াজ বাজার অব্দি পৌঁছবে বলে মনে হয় না। কারণ মাঠে বাতাস বইছে উল্টো দিকে। সে বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে অস্ত্রটা বের করল।....

বিস্ফোরণের আওয়াজটা তার কানে নতুন শোনাল। এ শুধু রিভলবারের গর্জন নয়, তার ভিতর সেই ঘুমন্ত বিশ্রামরত অমানুষিক শক্তিটা হঠাৎ জেগে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করল যেন। রক্ত নেচে উঠল রাহুলের। একটা নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হননের ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসল আগের মতো। গঙ্গাকে খুন

করে পালাবে সে? নাকি দুজনকেই। ক্রূর সেই ইচ্ছা তার আঙুলে নিসপিস করে উঠল। ছা... ...ড়ে পুরে রিভলবারটা সে ব্যাগে খোলা রেখে দিল। তারপর বেশ খানিকটা ঘুরে বাজারের শেষপ্র... এসে রাস্তায় উঠল।

একটা কিছু করা দরকার। অমানুষিক শক্তিটা তাকে অবিশ্রান্ত খোঁচা দিচ্ছে। সে দুপাশে তা... খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল। নানা জিনিসের দোকান রয়েছে। খুব সহজেই হানা দেবার সুযোগ আছে। দোকানে লোকজন বিশেষ নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা জুয়েলারি। রেলিংঘেরা গারদের মতো ওই দোকান দেখলে তার হাসি পায়। চিড়িয়াখানার মতো। দোকানটায় দুজন লোক অবিকল বানরের মতো গম্ভীরমুখে আলমারি গোছাচ্ছে। আর কেউ নেই সেখানে।

পা বাড়াতে গিয়ে থামল সে। কাজটা খুব সহজ হবে। কিন্তু সারাদিনের ওই প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজটা করতে গেলে তাকে অজানা মাঠের দিকে অনেকক্ষণ দৌড়নোর ঝুঁকি নিতে হয়। সারাটি রাত তাকে ফের হাঁটতে হয় বিদেশ-বিভুঁইয়ে। অনেক কষ্টের ব্যাপার। তাছাড়া কী পরিমাণ পাওয়া যাবে—তাও জানা নেই।

সামান্য দূরে ম্লান আলোয় একটা ইটখোলা আর টালি ভাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশে স্তূপীকৃত ইট আর টালি জড়ো করা আছে। দেখতে দেখতে মতলব বদলাল রাহুল। একবার বহরমপুরের ওদিকে এমনি ইটখোলায় হানা দিয়ে অভাবিত টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ইটখোলা মালিকের ঘরটা সচরাচর রাস্তা থেকে দূরে ভিতরের দিকেই থাকে। এটাও সেই রকম মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা সুঁড়িপথ নিচে নেমে গেছে অন্ধকারে। শেষপ্রান্তে টিবির ওপর ঘর—আলো দেখা যাচ্ছে।

রাহুল রাস্তা থেকে নামল। ওদিকে মজুরদের ছাউনি থেকে ঢোলের বাজনার সঙ্গে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা টের পাবার আগেই কাজ হয়ে যাবে। রাস্তার দিকে বাজারে খবর তক্ষুনি পৌঁছবে বলে মনে হয় না। সেবারও ঠিক এরকম হয়েছিল। সকাল অব্দি কেউ জানতেও পারেনি। মজার কথা—সেই লোকটির একটা বন্দুকও ছিল দোনলা। কিন্তু কোন ফল দ্যায়নি সেটা। এর কি আছে? লোকই বা কজন? দুজনের বেশি থাকলে একটু বিপদ আছে। দেখা যাক্। অবস্থা অন্যরকম বুঝলে রাতের মতো আশ্রয় নেবে। একটি ভদ্রচেহারার ছেলেকে নিশ্চয় ওরা আশ্রয় দেবে। তারপর ....

ঘরটার কাছাকাছি যেতেই তার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। একটা কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার জুড়ে দিল। হাতে চোখ আড়াল করে সে থামল। কে ভারি গলায় বলে উঠল—কাকে চাই?

রাহুল একটু হেসে জবাব দিল, ইয়ে—দেখুন। আমি বহরমপুর থেকে আসছি। এখানে নতুন—তাই...

তার বলা শেষ হবার আগেই লোকটা দৌড়ে এল। .... আরে রাহুল না?

কে? .... রাহুল চমকে উঠেছিল। পরক্ষণেই চিনে ফেলল। ..... অরুণদা! তুমি এখানে!

কী কাণ্ড! আমি যে দু-তিন বছর ধরে এখানে মাটি পোড়াচ্ছি হে, জানতে না?

কুমড়োদহ—বাজারসাউ রোডে ইটের কন্ট্রাক্ট ছিল। কাজ শেষ। বাড়তি রিজেকটেড ইটগুলোর কিনারা করতে শেষ অব্দি থেকেই গেলাম। এস, এস! ইস, চেনাই যাচ্ছে না। কদ্দিন তোমায় দেখিনি বলো তো?

অরুণ সাঁতরা তার হাত ধরে টেনে টিবির ওপর নিয়ে গেল। বারান্দায় চেয়ার রয়েছে। সে বলল, বসো। তারপর, আছো কেমন? এখানে কী ব্যাপার? দুষ্টুমি-টুষ্টুমি কমিয়ে—না সমানে চলছে? চলছে? .... হাসতে লাগল সে। ..... ভাল আছ হে! এদুনিয়ায় শালা যার বিষদাঁত নেই, তার কিস্যু নেই। থাক্‌গে, তোমার দেখে মনে বড় জোর পেলাম ভাই। সব বলব'খন। ..... তা হ্যাঁ রাহুল? বাবার খবর জানো তো? নাকি এসেই টের পেলে? হুঁস— সে তো আমার এখানে তোমার আসা দেখেই বুঝেছি—কোন মুখেই বা সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! ভদ্রলোককে খুব নিরীহ সহজ মানুষ বলেই জানতাম। এ বয়সে আর .... যাক্ গে, মরুকগে। আমার ঠিকানা কে দিল?

রাহুল শুকনো হেসে বলল, পেয়ে গেলাম।

অরুণ বলল, খুব খুশি হলাম ভাই—খু-উ-ব। তুমি যে আমার কথা মনে রেখেছ ভাবতেই পারি

নি। ওরে নেত্য, বাবুকে জলটল দে। ওঠ, কাপড়চোপড় বদলে নাও।

রাহুলের শরীর এতক্ষণে বিশ্রামের জন্যে ছটফট করে উঠেছে।

গভীর ঘুমে রাত কেটে গিয়েছিল। এমন সুন্দর ভদ্র বিছানায় অনেক রাত তার শোওয়া হয়নি। এমন চমৎকার খাওয়াও জোটেনি অনেকদিন। খুব ভোরে কোথায় মোরগ ডাকল। পাখপাখালি ডাকতে থাকল। ঘুম ভেঙে সে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল চুপচাপ। গত রাতটা কোথায় নিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ দ্রুত বাঁক ঘুরে কোথায় এনে ফেলেছে। এই অরুণ সাঁতবার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল কিছুটা। ভাবতে পারা যায়নি কোনদিন যে সে তাকে এতখানি খাতির করবে। জামাই আদরে বরণ করে নেবে। হয়তো সময় আর অবস্থার গুণে মানুষের মনমেজাজেরও হেরফের ঘটে। চরিত্র আর আচরণে অনেক রদবদল এসে পড়ে। মনে নাকি বড্ড জোর পেয়েছে অরুণ তাকে দেখে—এবং অনর্গল আরও কী সব বলছিল, ঘুম শুনতে দ্যায়নি কিছু। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্ত অব্দি মনে মনে হাসছিল—তুমি শালা উঁচুদেঁতো কিপটের ধাড়ি অরুণ ইটবাবু, তুমি এখন আমাকে খাতির করছ,—অবশ্যই কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে তলায়-তলায়। তা না হলে আমাকে রাত্রিবেলা এই নির্জন ইটখোলায় দেখে তুমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে ফেলতে। নিশ্চয় কোন মতলব তোমার আছে হে! আমাকে তুমি তোষক-চাদর বালিস যুগিয়ে পুরোদমে ফ্যান চালিয়ে ঘুমোবার সুযোগ দিচ্ছ, আমি জানি—এ তোমার আতিথেয়তা নয়। কারণ রাহুলকে যারা চেনে, তারা এসব কোনটাই দ্যায় না।.....

এটা বাইরের ঘর। এ ঘরে সে একা ঘুমিয়েছে। ভিতরে আরো দুটো ঘর রান্নাঘর উঠোন নিয়ে এটা অরুণ সাঁতরার বাড়িই বটে। পুরোদস্তুর ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। রাধারঘাট ইটখোলাতে অরুণ একা থাকত। দরমাবেড়ার ঘর, টালির ছাউনি—নেহাত অস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সেখানে। রাহুল জানত, বেথুয়াডহরিতে অরুণের পৈতৃক বাড়ি আছে। সে নানা জায়গায় সরকারি রাস্তার ইট যোগানের কন্ট্রাক্ট নেয়। কাজেই বছরে-বছরে বীরভূম-মুর্শিদাবাদের নানা জায়গায় তার ডেরা বদলাতে হয়। কিন্তু ময়নাচকে আজ যেন স্থায়ী ডেরা বেঁধে ফেলেছে। পনের ইঞ্চি ইটের দেয়ালে এই একতালা বাড়িটা তুলেছে। জায়গাটা হয়ত সত্যি বসবাসের পক্ষে ভালো। অন্তত যারা গৃহস্থ কারবারী মানুষ—দুপয়সা রোজগার করে ভালভাবে বাঁচতে চায়, তাদের পক্ষে তো বেশ ভাল। অরুণের ফ্যামিলির সব খবর রাহুলের জানা ছিল না। বউ আছে, সেটা না বললেও জানা হয়ে যায়—আটকায় না। কাল রাত্রে অল্পস্বল্প জানা গেছে। ওর বউয়ের নাকি শরীর খারাপ—বিছানায় পড়ে থাকে সারাক্ষণ। অসুখটা কী, তা জানতে উৎসাহ প্রকাশ করেনি রাহুল। ওটা তার স্বভাব নয়। যে তার খাবার পরিবেশন করছিল, সে অরুণের দূর সম্পর্কের কী রকম বোন। মেয়েটি একটু লাজুক মনে হচ্ছিল। পলক ফেলার জন্যে চোখের পাতা স্বভাবত দ্রুত ওঠে পড়ে, রাহুল লক্ষ্য করছিল—অরুণের এই বোনের চোখের পাতা খুব আস্তে পড়ে এবং ওঠে। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে কি? স্বাস্থ্যটি বেশ ডগমগে। এমন তাজা সুস্বাদু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না কেন অরুণ? নাকি রোগা বউয়ের ভবিষ্যত বিকল্প? ও শালা সব পারে। আদিরসের খিস্তি করতে তো ওর জুড়ি নেই। নেপালদা বলত, অরুণটা একটা ঢ্যামনা—আগের জন্মে বারোয়ারী পাঁঠা ছিল। ......

জানালার বাইরে অনেকটা জায়গা নিয়ে লাল পোড়ামাটি আর ইটের এলোমেলো পাঁজা দেখা যাচ্ছে। ইতিউতি দু-একটা গাছপালা, ঝোপঝাড়, ঢিবির ওপর আদিবাসী মজুরদের সারবন্দি কুঁড়েঘর। তার ওদিকে প্রসারিত মাঠের সঙ্গে আকাশটা মিলে গেছে। সাতবছর আগে এই 'গ্রাম নগরীর' (অরুণ বলছিল কথাটা) কোন চিহ্নই ছিল না। একটা কাঁচা রাস্তা, ময়নাচকের পাশ দিয়ে আমেদপুরের দিকে চলে গিয়েছিল। সেটাই এখন হাইওয়ে। পশ্চিমে নদীর ওপর মস্তো ব্রিজও নাকি হয়ে গেছে। দিনেদিনে মালপরিবহনের কাজ বেড়ে চলেছে। কলকাতা ও অনেক জায়গার বড়-বড় ডিস্ট্রিবিউটার্স, সাপ্লাই এজেন্ট, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির আর সাধারণ ব্যবসায়ীদের এক অখণ্ড স্বার্থের প্রবাহ চলেছে এই নতুন পথে। সার্থের স্বার্থ! ..... রাহুল হাসল। তার মাষ্টার মশাই বাবা ছেলেবেলায় এই শব্দভেদ ও অর্থভেদ

বোঝাতেন পই পই করে। সার্থ ও স্বার্থ! এখন ময়নাচকের আপ কিংবা ডাউনের ব্যাপারটা ঘটে যাচ্ছে প্রায়ই। পুলিশ সামলাতে পারছে না। কারণ নাকি বড়-বড় পলিটিকাল ঘুঘু অমনি ডাকতে শুরু করে।....

রাজেনবাবু বলেছিলেন। এই র‍্যাকেটেব পিছনে ওনাদের সোজাসুজি কোন হাত নেই। কিন্তু র‍্যাকেটে যারা আছে—তারা ব্যক্তিগতভাবে ওনাদেব কারো-না কারো লোক। শুধু ইলেকশনের সময় তাদের দরকার হয় তাই নয়, বেদলেব সাথে সংঘর্ষ বাধলে তারাই ওনাদের পিঠ বাঁচায়। কাজেই তাদের আইনত কোন ব্যবস্থা করা যাবে না। হাইওয়েতে মাল চলাচলের ব্যাপারে যাঁদের স্বার্থ—অর্থাৎ সেই ডির্সট্রিবিউটার্স সাপ্লাই এজেন্ট—ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি—সাধাবণ ব্যবসায়ী, তারা সরকারের মন্ত্রীপর্যায়ে দরবার করেও কোন ফল হয়নি। রাহাজানি একটুও কমছে না। এই চক্রটা আইনত ভাঙার অসুবিধা আছে—তা এবার ওরা টের পেয়ে গেছে। অতএব যেমন বুনোওল, তেমনি বাঘা তেঁতুলের বন্দোবস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। আপাতত পাঁচহাজার টাকা ওবা দেবে যে চাকাটার কেন্দ্রে ঘা মেরে ওটা টুকরো করে ফেলতে পারবে। তার সোজা মানে হচ্ছে খতম। হ্যাঁ নির্ভেজাল খতম। হাতে যা খবর আছে, তাতে বোঝা গেছে কেন্দ্রে আছে মোট তিনজন লোক। তিনজনের একজনও বেঁচে থাকলে ফের নতুন চক্র গড়ে ফেলবে। তাই তিন তিনটি খতম সম্পন্ন করা চাই। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হচ্ছে ওই তিনজনের নামধাম পরিচয় পুলিশের অজ্ঞাত। কাবণ, যে সূত্রটা খবরটা দিয়েছিল সে ওই তিনজনকে অস্পষ্ট দেখেছে, রাতেব অন্ধকারে আবছা চেহারা মাত্র। অনেক রাত্রি ধরে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, আড়ি পেতে থাকা, মাত্র ওইটুকু জানা গেছে—তাবা তিনজন। তিনজনই দলের পাণ্ডা। বাকিরা সব হুকুমের চাকর। ওবা তিনজন দৈবাৎ একজায়গায় সে রাতে মিলেছিল আলোচনা করতে—নয় তো সেটুকুও জানা যেত না। বোঝা যায় কী ভীষণ সাবধানী ওরা।

যাই হোক, এই সামান্য চাবিকাঠিটা দিয়ে দরজা খুলবে কি না রাহুল জানে না। শুধু সম্বল—তার সামান্য অভিজ্ঞতা, কিছু বুদ্ধি আর সাহস। আবছা চেহারাগুলোর একটু নমুনাও সে পেয়েছে রাজেনবাবুর কাছে। একজন ঢ্যাঙা, বিশাল শরীর, অন্যজন মাঝারি গড়নের, রোগা, তৃতীয়জন ....

তৃতীয়জন সম্পর্কে ইনফরমারেব নিজেরই সংশয় আছে। তার উচ্চতা আরও কম। প্রথমে ভেবেছিল—মেয়ে, পরে মনে হয়েছিল কমবয়সী ছেলে—পবে ফের মেয়ে মনে হওয়ায় একটু এগোনোর চেষ্টা কবেছিল। সেই সময় হঠাৎ তার কানের পাশ দিয়ে সাঁ কবে কী চলে যায়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজ শোনে। কতক্ষণ পরে মাথা তুলে চারপাশে তাকায়। দ্যাখে, কেউ নেই। অন্ধকাবে রাস্তাটা চকচক করছে—নক্ষত্রে আলো পড়েছে। সে কতকটা বুকে হেঁটেই পালিয়ে আসে। সে শেষঅব্দি বলেছে যে তৃতীয় জন মেয়ে হতেই পারে না।—কারণ, শাড়িটাড়ি পরা ছিল না। শাড়িপরা মানুষ অন্ধকারে বোঝা যেত। ওব পরনে ছিল ফুলপ্যান্ট অথবা পাজামা। শুধু মাথার দিকটা ....

অবশ্য বাবরীচুল আজকাল অনেকেই রাখে।

তাহলে এই হচ্ছে মোট তথ্য। না—আর একটু আছে। ইনফরমারের নামধাম রাজেনবাবু তাকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বলে জানাতে পারেননি। শুধু বলেছেন, সে ময়নাচকেব লোক। তাকে জানানো হবে যে র‍্যাকেট ভাঙতে একজন যাচ্ছে, দরকার হলে সে যেন তাকে যতটা সম্ভব হবে তার পক্ষে, আড়াল থেকে সাহায্য করে। রাহুলের পরিচয় যথারীতি তাকে দেওয়া হবে। কাজেই আকস্মিকভাবে কোন ব্যাপারে অভাবিত সাহায্য বা সহযোগিতা কোন নেপথ্যচারী লোকের কাছ থেকে পেলে রাহুল যেন মাথার ঠিক রাখে। বি ভেরি—ভেরি কেয়ারফুল টু দিস পয়েন্ট।

কতদিন লাগতে পারে এটা চুকিয়ে ফেলতে? কিছু ঠিক নেই। একঘণ্টা অথবা পুরো একটি বছর। তার থাকা-খাওয়া ইত্যাদির খরচ কিন্তু আপাতত এক পয়সাও দেওয়া হচ্ছে না। রাজেনবাবু বলেছেন, সেইজন্যেই তো অনেকদিন থেকে তোমাব প্রতীক্ষায় ছিলাম। কারণ, এইভাবে অনিশ্চিত অবস্থার দরুন কড়ি যোগানোর অসুবিধে আছে। বুঝতেই পারছ—আমরা সরকারি ভাণ্ডার থেকে কিছু দিতে পারছিনে। কোন স্যাংশান আপাতত নেই এক্ষেত্রে। যা দেবার—দেওয়া উচিত ওইসব কোম্পানির। সে ভাই পাঁচভূতের কারবার। বুঝতেই পারছ! ইনটারেস্ট আছে সব শালার—কিন্তু ভয় তো কম নেই।

ধরো. তুমি ফেল করলে—তখন কী হবে? তোমাকে পোষার জন্য কড়িকে কড়ি গচ্চা তো গেলই—উপরন্তু র‍্যাকেটের শয়তান খেপে গিয়ে আরও ক্ষতি করতে থাকবে। এই ব্যবসায়ীদের আমি সত্যি বুঝতে পারিনে। এবা হাসিমুখে ব্যবসার লোকসান সইবে—কিন্তু তার বাইরে একপয়সা নগদ খসালে বুক চচ্চড় করবে। আমি ওদের বলেছিলাম, আরে মশাই, এও তো ব্যবসার খাতে একটা ইনভেস্টমেন্ট ! ওরা বুঝতে চায় না। যাই হোক, আমি কড়া হয়ে চাইলে যে তোমার খরচ-খরচা দিত না, তা নয়। হয়তো জরুরী কিছু বুঝলে, ভেবো না—আমাকে তাই করে তোমার ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা পরের কথা। তোমাকে সিলেক্ট করার একটা বড় কারণ হচ্ছে—তোমার বাবা আছেন ওখানে। তোমার একটা চমৎকার নিরাপদ শেলটার আছে। তোমার ওপর কারো সন্দেহ হবে না। অতএব লেগে যাও। তেমন অবস্থা বুঝলে আর্থিক সাহায্য তুমি পাবে—আই অ্যাসিওর। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে সম্পূর্ণভাবে তোমার প্রগ্রেসের ওপর। ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসে থাকলে তো কিছু করা যাবে না! আবার অন্যদিকে— তোমার কতটা কী প্রগ্রেস হল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও আমি কোন আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারব না—আমি তোমাকে জানি হে—খুব ভালভাবেই জানি। জানি বলেই তোমার উপর বিশ্বাস আছে।. ..

সব শালা চালিয়াৎ! স্বার্থের চাকর। তিনতিনটে মানুষ মাবব আমি, তুমি শালার হবে প্রমোশন। ব্যবসায়ীদের মুনাফা উঠবে ফেঁপে। আর আমি শালা সেই কুত্তার মতো লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াব এ ড্রেন সে ড্রেন! গোল্লায় যাও খানকির বাচ্চা!

রাগে মেজাজ গরম হয়ে গেল রাহুলের। বাইরে লালচে রোদের আভাষ দেখা দিয়েছে। অরুণ তখনও ঘুমুচ্ছে নাকি ? এক কাপ চা পেলে এখন মেজাজটা ঠাণ্ডা হত। হ্যাঁ, রাগ-টাগ ছাড়তে হবে পুরোপুরি। মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। কাল রাত্রে ভেবেছিল, ময়নাচক তার পায়ের নীচে কাঁটা পুঁতে রেখেছে—পালাতে ইচ্ছে করছিল। একটা লম্বা ঘুমের পর ভিতরে ওলটপালট ঘটে গেছে হয়তো। রাজেনবাবুর মিশন নিয়ে ভাবছে। তার মানে, থাকার সুযোগ হয়ে গেলে সে যেন থেকে যাবে। র‍্যাকেট ভাঙতে ? মানুষ মারতে ? শুধু সেজন্যেই?

নাকি একটা তীক্ষ্ণ চাপা কৌতূহল তার ভিতরে শিসিয়ে উঠেছে যন্ত্রণার চেহারা নিয়ে? একটা গভীরতর কষ্ট আলোড়িত হচ্ছে এতক্ষণে। গঙ্গাকে একবার দেখতে—বাবাকে একবাব মুখোমুখি ঘেন্না জানাতে—আর সাতবছর আগের একটি সুন্দর গোপন স্মৃতির ওপর পেচ্ছাপ কবে দিতে তার বড় সাধ হচ্ছে।

তার আগে এক কাপ চা পেলে ভাল হত !

আপনার চা।

লাফিয়ে উঠে বসল রাহুল। মাথার কাছে টুলে জলের গেলাস আছে। সেটা সরানোর শব্দ, তারপর শোনা গেছে মৃদু কণ্ঠস্বর—আপনার চা।

ভারি অদ্ভুত তো! বলে সে অস্ফুট হাসল। ... শুনুন।

অরুণের বোন দরজা ঠেলে চলে যাচ্ছিল তেমনি নিঃশব্দে, যেমন সে এসেছিল—টেরও পায়নি রাহুল। দাঁড়াল একটু। .... বলুন!

আপনি কি কল্পতরু? ঠিক যখনি চায়ের তেষ্টা পাচ্ছিল, তখনি এসে গেল—তাই বলছি।... রাহুল চায়ে চুমুক দিল। ..... অরুণদা ওঠেনি?

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল—এক মুহূর্তের হাসি ফুটেছিল ঠোঁটের কোণে। মাথা দুলিয়ে সে চলে যাচ্ছিল ফের।

রাহুল বলল, আপনি কিন্তু খুব কম কথা বলেন।

কোন জবাব এল না। কিন্তু সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বেহায়ার মতো রাহুল বলল, আপনার নামটা ভুলে গেছি—অরুণদা কি যেন বলছিল....শী...... শী.....

শীলা। .... বলে চলে গেল অরুণের বোন।

রাহুল খুশি হয়ে দুলতে দুলতে চা খেতে থাকল। শীলা বলে ডাকছিল না অরুণদা? শীলা! ড্যামনার ধাড়ি অরুণদাটা। রাধারঘাটে একটা রক্ষিতা পুষত নাকি। এ শালাদের জুটেও যায় বেশ। হয়তো এমন ছিমছাম গোবেচারা মেয়েটিকে তলে তলে নষ্ট করে ফেলেছে। ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। আর আজকাল তো কতরকম চমৎকার ওষুধপত্তর বেরিয়েছে। বাচ্চাটাচ্চা গজাবার উপায় নেই। মেয়েটাকে অরুণ ব্যবহার করে ভাবতেই রাহুলের মাথাটা ফের গরম হয়ে গেল। কিছুক্ষণ স্থির বসে চা খাবার পর সে অবাক হল নিজের দিকে তাকিয়ে। কাল ওই মাঠের পথে আসতে আসতে এক মুহূর্তের জন্যেও সে তার বর্তমানের মধ্যে বাস করছিল না যেন—সবটাই ছিল তার মোটমুটি নিষ্পাপ সরল সহজ ছেলেবেলা। কাল সারাটি দুপুর ও বিকেল। কালবোশেখির ঝড়টা ফুরিয়ে যাবার পর অব্দি, সে কিশোর রাহুল হয়ে পড়েছিল। এখন সে ভিন্ন মানুষ। এখন ফের তার বর্তমানকে ফিরে পেয়েছে সে। চোখদুটো আবার যা ছিল তাই হয়েছে। কাল কিছু সময়ের জন্যে কি তার মা তাকে ছেলেবেলাটা পাইয়ে দিয়েছিলেন? স্মৃতির বিষাদ তাকে সারাক্ষণ ঘিরে রেখেছিল সব পাপ থেকে। সব কদর্যতা থেকে। সবরকম ভয়ঙ্কর ইচ্ছা থেকে মা তাকে বাঁচাচ্ছিলেন।

শূন্য কাপপ্লেটটা হাতে ধরে সে নিষ্পলক কিছুক্ষণ বসে রইল। জানালার বাইরে নরম রোদে ভরা পৃথিবীটা দেখে তার মনে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা এসে যাচ্ছিল। কি যেন কবার প্রতিশ্রুতি দায়বদ্ধ ছিল সে—দূর বাল্যে তা করা যায়নি। যাবে না হয়তো। তা রাজেনবাবুর মিশনের মতো ভয়ঙ্কর নয়, তা ছিল খুবই সহজ আর সুন্দর। অথচ কেন এমন হল? সে অবচেতন বিহ্বলতায় হাতড়াতে থাকল সে প্রশ্নের জবাব।

খানিক পরে অরুণ এল। .... মুখ টুখ ধুয়েছ? ধোওনি? তুমিও দেখছি আমার মাসতুতো ভাই। বাইরের দরজাও খোলনি দেখছি!

বলে সে দরজাটা খুলে দিল। তারপর বারান্দায় গিয়ে ডাকল। .... এসেছ তো রাত্রে। জায়গাটা দ্যাখোনি। দেখে যাও। এখানটা উঁচু বলে—ফুল ভিউ দেখতে পাবে।

রাহুল বেরোল। সত্যি, ভাবা যায় না—সাত বছরে ময়নাচকে কী হয়েছে! রাস্তার দিকটা এরই মধ্যে ভিড়ে গিজগিজ করছে। বাস লরি রিকশাও চলছে অজস্র। পুরো গ্রামটা গাছপালার আড়ালে রয়েছে। সেই শিবমন্দিরের ত্রিশূল চূড়াটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওখানেই ছিল ভবানীবাবুর বাড়ি।

অরুণ কাছে ঘন হয়ে আঙুল তুলে বলল, তোমার বাবার হোটেলটা চিনতে পারছ? ওই যে লাল বাড়িটার পাশে—হ্যাঁ, হ্যাঁ,.... ... রিকশোর স্ট্যান্ডটা, ওই যে সাইনবোর্ড।

রাহুল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল। একটা একতালা হলুদ রঙের ঘর—তার মাথায় সাইনবোর্ড আছে মনে হচ্ছে। পড়া সম্ভব নয় এতদূর থেকে।

অরুণ বলল, কাল বাবার ওখানে তাহলে সত্যি যাওনি?

রাহুল মাথা দোলাল।

যাওনি—বেশ করেছ। তবে ... একটু ভেবে অরুণ হেসে বলল, তবে বাবা আর ছেলে! বাবার ত্রুটি ধরতে নেই হে। তোমার কর্তব্য তুমি করবে—তাতে দোষ কী? যেও—একবারটি যেও। বরং তোমাকে আমিই নিয়ে যাব সাথে করে। অনেকদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি মাষ্টারমশায়ের।

রাহুল গম্ভীর মুখে বলল, এখনও সবাই মাষ্টারমশাই বলে নাকি?

হুঁ—তাই তো বলে। আমি যদ্দিন এসেছি, তদ্দিন ওইনামেই সবাইকে ডাকতে শুনেছি। শুনে আমিও তাই বলে ডেকেছি। আসলে লোকটা বড্ড ভালো ভাই—তোমার বাবা, বুঝলে রাহুল? উনি মেয়েটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—তুমি হয়তো জানো সেকথা।....

রাহুল বলল, কিস্যু জানিনে। দশ বছর পরস্পর দেখাই নেই। চিঠিপত্র বন্ধ হয়েছে অনেকদিন—মনে পড়ছে না কখন থেকে বন্ধ হয়েছে। আর চিঠিতে ওসব খবর ছিল না।

অরুণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সে কি! জানো না? ঠিক আছে। বলব'খন। ওই মেয়েটা যে কী সাংঘাতিক কল্পনা করা যায় না ভাই। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তো ওর বাবারও বনিবনা ছিল না। বাপ যেই স্ট্রোক হয়ে মরল—অমনি মেয়ে নিজের মূর্তি ধরল। বাপের যা কিছু সম্পত্তি বা টাকাকড়ি ছিল, দুহাতে বিলাস-ব্যসনে ফুঁকে দিলে একবছরেই। আজ কলকাতা, কাল দিল্লী, পরশু বোম্বে। এবেলা কাটোয়া, তো ওবেলা চল পাকুড়ে মেলা বসেছে দেখে আসি। উচ্ছৃঙ্খল ভোগী প্রকৃতির মেয়ে আসলে। এদিকে মাস্টারমশাই ছিলেন কতকটা ওদের ফ্যামিলির গার্জেনের মতো। ভবানীবাবু ওনাকে সেই চোখে দেখতেন। মাস্টারমশাই সরল ভীতু গোবেচারা মানুষ। দুহাতে মেয়েটাকে আর তার সম্পত্তি আগলানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু শেষ অব্দি সামাল দিতে পারলেন না। মেয়েটির গারজেন-টারজেন থাকা তো দূরের কথা—তখন যেন চাকরেরও বেশি হয়ে পড়লেন। বয়সও হয়েছে—বুদ্ধিভ্রম ঘটা স্বাভাবিক তো বটেই। তাছাড়া দুর্বলতাও থাকতে পারে—সেটাও বলতে সংকোচ দেখছিনে। যাই হোক, শেষ অব্দি ঘটল এক কুচ্ছিত কেলেঙ্কারী। মেয়েটা নিজেই রটাল—বোঝ ব্যাপারটা।

রাহুল কৌতূহলী হয়ে শুনছিল। বলল, কী রটাল?

অরুণ চাপা গলায় বলল, পেটে বাচ্চা। আর এ জন্যে নাকি মাস্টারমশাই দায়ী। অতএব তাকেই বিয়ে করতে হবে। বালবিধবার এ রকম-সকম দেখে তো সবাই তাজ্জব। হলে কী হবে? এ তো আর সে পুরনো পাড়াগাঁ নেই—গ্রামনগরী। ছত্রিশ জায়গার ছত্রিশ জাতের নতুন নতুন লোক এসে জুটেছে। সমাজ বলে কিছু নেই টেই। তারপর মাস্টারমশাই বিয়েতে রাজি হলেন।

..... অরুণ ফিক করে হেসে বলল, রাগ করছ না তো রাহুল?

কেন?

ভাবছ না তো ছেলে কাছে বাবার কেলেঙ্কারি শোনাচ্ছি? অবশ্যি, এ তোমার বাবার কেলেঙ্কারি মোটেও নয়, ভাই—এ কেলেঙ্কারি সবটাই ভবানীবাবুর মেয়ের। থাকগে মরুকগে, বিয়ে চুকে গেল রাতারাতি। রেজিস্ট্রি হয়েই চুকল। বাচ্চাও হল সত্যি-সত্যি। বাচ্চাটা আমি দেখিনি। লোকে বলেছে—ওর চেহারা নাকি .... হঠাৎ অরুণ প্রসঙ্গ বদলে বলল, ব্রাশট্রাশ সঙ্গে এনেছ তো? না থাকলে—ওই যে। দাঁতন ভেঙে নাও নিমগাছ থেকে। খেয়েদেয়ে দুভায়ে বেরোব। আমার নিজের কিছু কথা আছে।

রাহুল বিকৃত হেসে বলল, অরুণদা, বাচ্চাটার চেহারা আমার বাবার মতো—তাই না?

যাঃ! লোকের কথায় কান করতে আছে?... হাসতে লাগল অরুণ।

আমার চেহারাও নাকি অবিকল বাবার মতো।

ছেড়ে দাও ও কথা। যাও, ডাল ভঙো।

আচ্চা অরুণদা, বাবা হোটেল খুলতে গেলেন কেন?

সব পরে ডিটেল বলব খন। আগে—

উঁহু—শুনতে ইচ্ছে করছে।

হোটেল তোমার বাবা খোলেননি—ভবানীবাবুর মেয়েই খুলেছে।

রাহুল এগিয়ে গিয়ে ফুলবাগিচার ধারে নিচু নিমগাছটা থেকে এক ঝটকায় একটা ডাল ছাড়িয়ে বলল, নেপালদা মারা গেছে জানো তো?

অরুণ বলল, জানি—শুনেছি।

আমিও একবার জোর বেঁচে গেছি। তার পর থেকে বাঁচার সাধটা ভারি শক্ত হয়ে জমাট বেঁধেছে মনে। ..... রাহুল এগিয়ে এসে বলতে থাকল। .... তাই ভেবে ছিলাম আর বে লাইনে পা দেব না। সবার মত ভদ্রটদ্র হয়ে চলব। আর সেজন্যই ময়নাচকে বাবার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু শালা আমার কপালে তো নেই। কী করি, বাৎলে দিতে পারো?

অরুণ বলল, পারি বইকি। সেজন্যই বলছিলাম না—তোমাকে দেখে মনে জোর পেলাম। আমার ভাই একজন লোক দরকার—যেমন তেমন লোক নয়, দুঁদে লোক। কারণ, এই চোর ডাকাত গুণ্ডার

জায়গায় আমার মতো নিরীহ লোকের দুপয়সা রোজগার করা সত্যি অসম্ভব। পরে বুঝিয়ে বলছি সব। তুমি এখানে থাকবে রাহুল। খুব ভালো হয় ভাই। পুষিয়ে দেব তোমাকে—কিছু ভেবো না, থাকবে?

রাহুল নির্বিকার দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ তো। থাকব।

মুক্তকেশী হোটেলের সামনে রাস্তায় কয়েকটা মালবোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। রাহুল একটা ট্রাকের আড়ালে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের সূর্য ততক্ষণে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। রোদের তাপ বেড়েছে। কিন্তু আগের দিনের কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টির পর আজ আবহাওয়ায় একটুখানি স্নিগ্ধতার ভাব রয়ে গেছে। আজ এখানে হাটবার। ময়নাচকের পুরানো হাটটা এখনও সপ্তায় দুবার চলেছে—নতুন বাজার তাকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। শুধু তার জায়গাবদল ঘটেছে। বড় রাস্তার দুপাশে সে নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। আগে হাটটা বসত গ্রামের ভিতর শিবমন্দিরের পাশে।

ভিড় আর গোলমাল ছাড়িয়ে সারাক্ষণ মাইকে বিচ্ছিরি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাইক একটা নয়—অনেকগুলো। রাজ্যের তুকতাকওয়ালারা বজ্রনির্ঘোষে লোককে সমানে তাতাচ্ছে। তার মধ্যে সন্তর্পণে চলেছে বাস ট্রাক রিকশো সাইকেলের আনাগোনা। একটুতে কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। রাহুল ভাবছিল অরুণ গেছে যাক্— সে এই সুযোগে কেটে পড়বে। কোথাও চায়ের দোকানে গিয়ে বসে থাকবে। এখানে এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া। ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে ঘুরে এলাকার প্রায় সবটাই দেখা হয়ে গেছে। কত নতুন বাসিন্দা এখানে এসেছে! ময়নাচক বা এলাকার কোন গ্রামের লোকের সঙ্গে চালচলনের মিল এদের সামান্য। রীতিমত শহরের পরিবেশ—তেমনি পোশাক-আসাক, স্মার্ট ছেলেমেয়ে, অতিচালাক সবজান্তা ভদ্রলোকেরা। রেডিও, খবরের কাগজ আর ওই সিনেমাঘরটা এনে ফেলে হাইওয়ে তার চূড়ান্ত কাজটা শেষ করেছে। এই কয়েক হাজার বাসিন্দার ভিতর থেকে রাহুলকে নিজের শিকার খুঁজে বের করতে হবে। সে হতাশ বোধ করছিল। আনমনা হয়ে পড়েছিল। আর সেই সময়—'এই যে তোমাদের মুক্তকেশী' বলে অরুণ ট্রাকগুলোর সরু ফাঁক গলিয়ে চলে গেছে। ভেবেছে যথারীতি রাহুলও তার পিছনে যাবে।

রাহুলের পা দুটো আড়ষ্ট। পালিয়ে যাবে? কিন্তু হঠাৎ মনে হল, ইতিমধ্যে অরুণ তার বাবার কাছে হাজির হয়েছে। এখন যদি সে পালিয়ে যায়, বাবার প্রতি তার মনোভাবটা খুব সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়বে। একটু দ্বিধায় পড়ে গেল সে। না— বাবার কথা ভেবে ন গঙ্গার কথা ভেবে!

ওইদিক থেকে অরুণ তাকে ডাকছিল—রাহুল, রাহুল! তারপর আচমকা তার সামনে যে এসে দাঁড়াল, তাকে সে ঠিক সেই মুহূর্তে চিনতে না পারলেও—সে যখন শান্তস্বরে বলল, এস—তখন তাকে চেনা গেল এবং পলকে সব অস্বস্তি আর ঘৃণার অতিসচেতন বিহ্বলতাটা কোথায় হারিয়ে জেগে উঠল একটা স্বাভাবিকতা। তার মধ্যে যেন কোন মালিন্য নেই—কোন প্রচ্ছন্ন এপিসোড লুকানো নেই।

হ্যাঁ, এই গঙ্গা। গঙ্গার এ শক্তি একদা প্রত্যক্ষ করেছিল রাহুল। সবকিছুকে নিমেষে সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলতে তার জুড়ি নেই।

কয়েকটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে ছিল রাহুল। সেই গঙ্গা। চওড়া নকসীপাড় ফিকে লাল রঙের শাড়ি, চাইনিজ কাট ব্লাউজ, কানে সাদাপাথরের কুঁড়ি, গলায় সোনার চেনলকেট, হাতে শাঁখা আর সোনার কাঁকন, এবং সধবার চরম চিহ্ন ডগডগে সিঁদুর সিঁথিতে রক্তরেখা! সেই গঙ্গা। শ্যাম যার গায়ের রঙ—যাকে বলা যায়, বাংলাদেশের কালো মেয়ে।

কিন্তু সেই গঙ্গা তো নয়। মুখের আদলে বালিকার প্রসন্নতা ছিল যার এবং পাপকে যে পাপ বলে বুঝতে পারত না! তার চেহারায় প্রচ্ছন্ন ধ্বসের ছাপ লক্ষ্য করছিল রাহুল। যৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস দেখবার কথা ছিল যে শরীরে, সেখানে কী যেন ক্লান্তির আভাস। তাহলে কী নবীনা গঙ্গা অতিদ্রুত প্রবীণ মাস্টার মহাশয়ের বয়সের অনুগামিনী হতে চেয়েছিল? হয়তো মেয়েরা এটা পারে। চোখ নামাল রাহুল। তার পায়ের দিকে রাখল। গঙ্গার পায়ে আলতা। পা দুটোও চিনতে পারল না সে। মাঠের

কুলঝোপে গিয়ে কাঁটা ফুটেছিল গঙ্গার পায়ে—থুথু দিয়ে সাফ করে সে বলেছিল, এই! কাঁটাটা তুলে দেবে? আজ ওই পায়ে তাকে প্রণাম করতে হবে না তো! পাগল, পাগল! কাঁটা তোলার সময় গালে পা ছুঁইয়ে দিয়েছিল বলে রাহুল রাগে কতক্ষণ কথা বলেনি সেবার।

গঙ্গা যে নিজের টানের শক্তি কতখানি জানে, পরক্ষণে ঘুরে পা বাড়িয়েছে। ..... চিঠি দিয়ে এলে উনি খুশি হতেন! শরীর ভালো না তো! ভুগছেন অনেকদিন। এসো। রাহুল নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল। তার সামনে আজ আর সেই গ্রামকন্যাটি অচেনা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, এ মেয়েটি নিপুণা নগরবাসিনী। এর সঙ্গে নেপালদার 'সতিসাবিত্রী' বউর কোন তফাত নেই সম্ভবত। রাহুল যখন চওড়া বারান্দা ডিঙিয়ে বাঁপাশের সরু করিডোরে উঠল, সে দেখল যে আর তার কোন অস্বস্তি হচ্ছে না। রাগ ঘৃণা বিক্ষোভও মনে হচ্ছে অকারণ।

ডাইনে হোটেলের ঘর, কিচেন ইত্যাদি। বাঁয়ে সরু করিডোরের শেষে একটা উঠোন। উঠোনে অনেক ফুলগাছের ঝোপ। গঙ্গা ফুল ভালবাসত—তার মনে পড়ল। একপাশে টিউবেল আর উঁচু একটা ল্যাট্রিন। ওদিকের বারান্দাটা ছোট। দুটো ঘর। একটা বড়, অন্যটা ছোট। ছোট ঘরটার ভিতর অরুণকে সে মোড়ায় বসে থাকতে দেখল। বিছানার পাশে। বিছানায় উনিই কি বাবা! রাহুলকে দেখে তিনি শুধু মাথাটা সামান্য তুললেন। রাহুল পুতুলের মতো চাদরঢাকা পাদুটোয় হাত রেখে কপালে ঠেকাল। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। হৃষিকেশ বড় বড় দুটি চোখে তাকে দেখছেন—বিবর্ণ নিষ্পলক চোখ। অরুণ বলল, দাঁড়িয়ে কেন! বসো—রাহুল।

গঙ্গা ঘরের মেঝেয় একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল রাহুলের। হৃষিকেশ কিছু না বললেও সে তার বিছানার পাশে সাবধানে বসল।

হৃষিকেশ কাসলেন। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল। তারপর বললেন, অরুণবাবুর কাছে তোমার আসার কথাটা শুনলুম। কদিন থেকে স্বপ্ন দেখছিলুম। সাউন্ড স্লিপ তো আর হয় না। তোমাকে স্বপ্ন দেখছিলুম। এসে ভালই করেছ। ... একটু চুপ থেকে যেন একটা কথা খুঁজে তারপর বললেন হৃষিকেশ—টের পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আর বাঁচবো না।

অরুণ শশব্যস্তে বলল, আরে না না মাষ্টারমশাই! সামান্য অসুখবিসুখ সবারই হয়। তাঁছাড়া এমন কি বয়স হয়েছে যে—

হাত তুলে হৃষিকেশ বললেন, বয়সের কথা তুলে ঠাট্টা করো না অরুণবাবু।

অরুণ অপ্রস্তুত হেসে বলল, না—মানে, আজকাল যত কঠিন অসুখই হোক—তার ওষুধের তো অভাব নেই! প্রশান্তবাবুকে দেখাচ্ছেন, না চৌধুরীকে? ডক্টর চৌধুরী কিন্তু হার্টস্পেশালিস্ট মাষ্টারমশাই, তা জানেন?

হৃষিকেশ সেদিকে কান না করে বললেন, অরুণবাবু একটুখানি উপকার করবে? ও বোধ হয় ওদিকে ব্যস্ত রয়েছে। তুমি একবার ঘোঁতনকে ডেকে দেবে? কিছু মনে করো না—যে ভাগাড়ে পড়ে আছি, কেউ নেই!

না, না। বলে অরুণ উঠে দাঁড়াল। এক্ষুনি ডাকছি। সেই দাঁত উঁচু ছোকরাটা তো?

সে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে রাহুলকে লক্ষ্য করে ফের বলল, ভাই রাহুল—আমি কিন্তু এখন আর আসছি না। তুমি বাবার সঙ্গে কথাটথা বলে সোজা আমার ওখানে চলে যেও। কেমন!

হৃষিকেশ বললেন, রাহুল আপাতত এখানেই থাকছে। তুমি শুধু ঘোঁতনকে ডেকে দাও।

তাঁর কণ্ঠস্বরে চাপা ক্ষুব্ধতাটুকু লুকোন গেল না। অরুণ মুচকি হেসে চলে গেল—রাহুলের দিকে চোখের ঝিলিকও দেখিয়ে গেল। রাহুল গম্ভীর মুখে বসে রইল।

হৃষিকেশ এবার কণ্ঠস্বর খুব চাপা করে বললেন, আমি জানি, সহজে তুমি অবাক হবার ছেলে নও রাহুল—অবাক তুমি হবে না কিন্তু আমার এই অবস্থার জন্যে আমাকে যদি দায়ী করো, খুব ভুল হবে! কেন ভুল হবে জানো? মানুষ সব ব্যাপারে নিজের প্রভুত্ব খাটাতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে নিজের কাছেও হার মেনে অসহায় আর উদ্বিগ্ন দর্শকের মতো বসে থাকতে হয়। আমি বরাবর সেইরকম অবস্থায়, সেইরকম উদ্বিগ্ন দর্শক হয়ে নিজের আচরণগুলো লক্ষ্য করছি, রাহুল। শুধু জেনে

রাখো—এর কোনটাই আমার আয়ত্তে ছিল না!

রাহুল আস্তে জিগ্যেস করল, কী?

তার এই ছোট্ট 'কী' প্রশ্নে কী টের পেয়েই হৃষিকেশ বললেন—এই বিয়ে, কাজকারবার, হোটেল—এগুলো। জেনেশুনে আমি বিষ খাচ্ছিলুম। অ্যার্মবিশান—উচ্চাকাংখা আমাকে সাতবছর আগে দূর থেকে এখানে টেনে এনেছিল। সেটাই আমার নিয়তির ভূমিকা নিল। আর—তোমার মা—ছেলের সামনে মায়ের নিন্দা করা অশোভন, তোমাব মাকে সব সময় একটা দারুণ বোঝা বলে মনে করতুম। সেটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। বোকার মতো রমাকেই ভাবতুম আমার জীবনের যাবতীয় দুঃখকষ্টের কারণ। তাই পথে হঠাৎ সে মারা গেলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল। হ্যাঁ, এবার তবে নতুন করে জীবনটা শুরু করার সুযোগ খুঁজতে হবে। অ্যামবিশান—খুব ছেলেবেলা থেকে ওই শয়তান অ্যামবিশান আমার পিছনে ছায়ার মতো ঘুরঘুর করত। শত দুঃখকষ্টে দুর্যোগেও সে পালায়নি। রমা মারা গেল। আমি এখানে এসে ভবানীবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে একটু করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম —ততো পিছনের জীবনটা কুৎসিত ঠাট্টার মতো লাগছিল। ভুলতে চাচ্ছিলুম তাকে। এমন কি তোমাকেও—হ্যাঁ রাহুল, তোমাকেও অস্বীকার করার ঝোঁক আমাকে গ্রাস করছিল। যেন আমি এক মুক্ত পুরুষ—কোন বন্ধন নেই অতীত নেই—আছে মুক্তি আর বিশাল ভবিষ্যত। তাকে সার্থক করে তুলতেই হবে। দুরন্ত ভোগের প্রবৃত্তি আমাকে অস্থির করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে। সব অতৃপ্ত কামনা বাসনা নেচে উঠল। আমি তখন নিজের বয়সকে ভুলে গেলুম। এখানে যখন আসি, তখন সবে আমার বয়স বাহান্ন পূর্ণ হয়েছে। আগুন নেই, জ্বালা আছে। আর ....

রাহুল বলল, আপনার কাছে তো কৌফয়ত চাইতে আসিনি। ওসব কথা থাক্।

হৃষিকেশ উত্তেজিতভাবে বিছানা থেকে একটু উঠে বললেন, কৈফিয়ত নয় রাহুল। কনফেশান। ঈশ্বর মানিনে বলেই মনের পাপ মনে চেপে রাখতে পারিনে। ছটফট করি। বলার জন্যে মানুষ খুঁজে —পাইনে। আজ তুমি এসেছ, তাই তোমাকে বলছি। না এলে কিছু বলা হত না। তাছাড়া, তোমারও তো অভিমান থাকতে পারে।

রাহুল বলল, ওসব নেই-টেই। আপনি চুপ করুন।

হৃষিকেশ দরজার বাইরেটা দেখে নিয়ে বললেন, ঘোঁতনটা এল না দেখছ? এ কি আমার মানুষের পুরীতে বাস করা? সব রাক্ষস-রাক্ষসীর বাজত্ব। দেহ অশক্ত—তা না হলে....

হঠাৎ রাহুলের হাত ধরে হাঁপাতে হাপাতে বললেন হৃষিকেশ রাহুল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে পালাতে পারিস বাবা? আমার কেমন যেন সন্দেহ—তোর ছোটমা আমাকে স্লোপয়জন করছে। ওর হাত থেকে ওষুধ খেতে আমার ভয় করে। ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ও সব পারে, বুঝলি খোকা? ও একটা সর্বনাশী!

বারান্দায় গঙ্গাকে দেখা গেল সেই মুহূর্তে। হৃষিকেশ আগের মতো শুয়ে পড়লেন।

গঙ্গার হাতে একটা ট্রে। সন্দেশের প্লেট, চায়ের কাপ। ঘরে ঢুকে ট্রেটা নিঃশব্দে খালি মোড়াটায় রাখল। তারপর আঁচলে ঠোঁট মুছে শান্ত হাসল। .... শুনলে তোমার রাগ হতে পারে রাহুল, তোমার কথা যেন আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম! কী? রাগ হচ্ছে না শুনে?

হৃষিকেশ পলকে বদলে অন্যমানুষ হয়ে গেছেন। অদ্ভুত শব্দে হাসলেন। রাহুল হাসল না। দেয়ালের ক্যালেন্ডারটার দিকে তাকিয়ে বলল, নাঃ রাগ কিসের?

গঙ্গা বলল, হাত লাগাও। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাহুল বলল, খেয়ে বেরিয়েছি—অরুণদার ওখানে।

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে একটু তিরস্কারের আভাস। .... হ্যাঁ, তুমি অরুণবাবুর ওখানে উঠেছ, তা জানলুম। কিন্তু আমরা হয়তো অরুণবাবুর চেয়ে আপনার লোক। ও আদিখ্যেতার কী দরকার ছিল—তুমিই জানো।

রাহুল সামান্য ক্ষুব্ধ হল। .... আদিখ্যেতা কিসের? চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল—সে টেনে নিয়ে গেল। ব্যস!

গঙ্গা বলল, কিন্তু ময়নাচকে যখন আসছিলে—আমি পর হতে পারি, তোমার বাবার কাছেই নিশ্চয় আসছিলে?

রাহুল একটু ভেবে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তারপর শুনলে তোমার বাবা ফের বিয়ে করেছেন, অমনি . খিল খিল করে হেসে উঠল গঙ্গা। ... অমনি ভীষণ রাগ হয়ে গেল, তাই না? অথচ তোমাব একটা বিশ্বাস বাখা উচিত ছিল তাঁর ওপব। তাঁর দিকটা ভাবা উচিত ছিল। .... গঙ্গার হাসি মুখটা ক্রমশ গম্ভীব হল বলতে বলতে। .... বয়স হয়েছে, অসুখ-বিসুখ আছে। বিদেশে একা পড়ে রয়েছেন। দেখাশোনাব লোক নেই কাছে। একমাত্র যোগ্য ছেলে—সেও বাইরে। খোঁজ নিতেও তাব সময় হয় না। তখন যদি কেউ সেটা লক্ষ্য করে ওঁকে দেখাশোনার ভার নেয়, আশা করি সে খুব একটা অন্যায় করে না।

হৃষিকেশের কণ্ঠস্বরে কে অশোভন হেসে বলল, হ্যা—ভাগ্যিস ও ছিল বাহুল। ওর সেবাযত্ন না পেলে আমি কবে মরে যেতুম বাবা।

গঙ্গা বলল, তাছাড়া এ বয়সে মানুষ কেমন একা হয়ে পড়ে, আমি জানি। আমাব বাবাকে দেখে-দেখে এটা আমার শেখা হয়েছিল। তারপর বাবা মারা গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে পশুগুলো চারপাশে ওঁৎ পেতে ছিল, বেরিয়ে এলো আমার সামনে।

হৃষিকেশ সায় দিয়ে বললেন, ওঃ! মানুষ কী শয়তান, ভাবা যায় না। একটা বাচ্চা মেয়ে—তার সামান্য মুখের গ্রাস! ভবানীবাবু তো দেনার দায়ে ফতুর হয়েই মারা গেলেন। কন্ট্রাক্টরিতে লোকসানের পর লোকসান হচ্ছিল। আমার অভিজ্ঞতা তেমন ছিল না এ ব্যাপারে। যাই হোক, তখন আমাকেই সামনে দাঁড়াতে হল ওঁর মেয়ের। মামলা-মোকদ্দমা হ্যাঙ্গামা—সে একটা ইতিহাস!

গঙ্গা বলল, সেদিন তোমার বাবা না থাকলে আমি আজ রাস্তায় বাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতুম জানো?

রাহুল বিরক্ত মুখে বলল, তোমরা দুজনে আমাকে কৈফিয়ত দিতে শুরু কবেছ দেখছি! আমি কি কৈফিয়ত চেয়েছি নাকি?

গঙ্গা তীব্রদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে কেন তুমি সোজা এখানে আসোনি?

রাহুল জবাব দিল না।

গঙ্গা বলল, আসোনি—তার মানে এটা তুমি মেনে নিতে পাবোনি। কেন, তা বলবে?

রাহুল সোজা তাকাল ওর দিকে' তাব ঠোঁটে নিজের অজানতে সূক্ষ্ম একটা ব্যঙ্গের রেখা ফুটে উঠল। ... কেন—তা তোমারই জানা উচিত। যদি তোমার অন্তত স্মৃতি বলে কিছু থাকে মনে।

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল।

পলকে গঙ্গার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল। সে রাহুলের দিক থেকে দৃষ্টিটা নামিয়ে আনল পরক্ষণে। চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে তার উত্তেজনা ধরা পড়ছিল।

হৃষিকেশ ব্যস্তভাবে বললেন, রাহুল, খোকা! চলে যাচ্ছিস কেন? বোস। তোকে আমার ভীষণ দরকার—অনেক কথা বলতে বাকি আছে যে। ওগো, তুমি ওকে ধবো—চলে যাচ্ছে যে!

গঙ্গা কোন কথা বলল না। সেও উঠে দাঁড়াল। তারপর পাশের দরজা দিয়ে ওদিককার ঘরে চলে গেল। রাহুল উঠোনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনার উপর রাগ করিনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

হৃষিকেশ যেন অস্ফুট আর্তনাদ করলেন। .... না না। একটা ভীষণ জরুরী কথা আছে তোর সঙ্গে। তুই কাছে আয়। কানে-কানে বলি।

রাহুল বলল, ঠিক আছে—পরে আসব'খন। আমি তো এখানেই থেকে যাচ্ছি। অরুণদার কাছে। চাকরিটা ভালই। দেখব—আপনার ভাল চিকিৎসা-টিকিৎসা করা যায় কি না। আপনি ভাববেন না।

হৃষিকেশ ওঠার চেষ্টা করে চাপা গলায় বললেন, না খোকা—না। কথা শোন, তুই এখানে থাকিসনে বাবা। শীগ্‌গির পালা—নৈলে বিপদে পড়ে যাবি! এ খুব সাংঘাতিক জায়গা। তুই বরং আজই চলে যা রাহুল।

রাহুল চমকে উঠেছিল। কিন্তু সংযতভাবে বলল, বিপদ আমার অনেক দেখা আছে। আপনার ওকথা বলে কোন লাভ হবে না।

জানি, জানি! .... যেন আবার আর্তনাদ করলেন হৃষিকেশ। .... তাই তোর মঙ্গলের জন্যে বলছি, খোকা। এখানে তুই—

গঙ্গা পাশের ঘর থেকে এসে বলল, দেওয়া খাবার না খেয়ে গেলে অকল্যাণ হবে গেরস্থর। সেটা কারো জানা উচিত। যেচে এসে অপমান করা হল—তাও না হয় ভাগ্যের দোষে সইবে। কিন্তু আমারও তো ছেলেপুলে আছে।

রাহুল বাবার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়েছিল। এবার সে পা বাড়াল। সাঁৎ করে বারান্দা থেকে করিডোরে গিয়ে ঢুকল। আর পিছন ফিরল না।

বাইরে এসে মন খারাপ হল। সে কিন্তু সহজ আর স্বাভাবিক থাকতেই চেয়েছিল। ওঁদের অপমান করবার ইচ্ছা একটুও ছিল না। অথচ একটা ছোটখাটো বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। নিজেকে সে সামলাতে পারল না আদতে।

কিন্তু বাবার কথাগুলো যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে। গঙ্গা ওঁকে প্রোপয়জন করেছে বলে ওঁর ধারণা হয়ে গেছে। বাবা গঙ্গাকে বিশ্বাস করেন না বোঝা গেল। অবশ্য সেটা তো স্বাভাবিকই। একটি দুরন্ত-যৌবনা মেয়ের স্বামী হয়ে পুরোপুরি সবদিক স্বচ্ছন্দ রাখা আর এ বয়সে ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বাবা একধরনের হীনমন্যতায় ভুগছেন। হয়তো একসময় রাহুলের মায়ের ক্ষেত্রেও এমনি একটা হীনমন্যতাবোধ ওঁর ছিল। আসলে হৃষিকেশের চরিত্রের যেন এই একটা বিশ্রী খুঁত—নিজের শক্তির প্রতি সংশয়। এইসব লোকের মোটেও বিয়ে করা উচিত নয়। অথচ এরা যেন নারীসঙ্গবর্জিত হলে পৃথিবীটা শূন্য মনে করে।

আর গঙ্গা! তার কৈফিয়তটা বেশ আশ্চর্য। একজন নিঃসঙ্গ বুড়োমানুষ—যে গঙ্গাকে নাকি আপদবিপদ থেকে রক্ষা করেছে, তার নিঃসঙ্গতা দূর করতে ......

ছেনাল খানকি কোথাকার! রাহুলের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। রাগে ভিতরটা গরগর করে উঠল এবং সেই রাগ বাবার দিকেও ধাবিত হল একসময়। হৃষিকেশবাবু, তুমি যদি মনে নিষ্পাপ থাকতে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে যা সঙ্গত আর শোভন হত—সেটাই করতে। তার মানে, তোমার দুর্দান্ত ছেলের পাত্রী হিসাবে ওই জংলী মেয়েটাকে তুমি নির্বাচিত করতে। তা তুমি করনি। সুতরাং তুমিও—হৃষিকেশবাবু, তুমিও একটি ইতর। জঘন্য লম্পট।

সিগ্রেট নেই পকেটে—কেনার জন্যে সে সামনের দোকানটায় গেল। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অবাক হল। রুক্ষ মারমূর্তি চেহারাটা! চোখ-দুটো ভীষণ চকচক করছে। সে সিগ্রেট কিনতে কিনতে চুল আঁচড়ে নিল। পাশে একটি লোক পানের জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার ভিতরে তার প্রতিবিম্বের দিকে প্রশ্ন করল, আপনাকে চেনাচেনা লাগছে যেন। কোথায় থাকেন বলুন তো?

লোকটা তার চেয়ে বেশ উঁচু। গায়ে খয়েরীরঙের স্পোর্টিং গেঞ্জী, নীলচেরঙের টাইট প্যান্ট পরনে। খাড়া নাকের দুপাশে চোখদুটো অস্বাভাবিক ছোট। সূচলো গোঁফটা তিরতির করে কাঁপছে। হয়তো অভ্যাস। রোদপোড়া তামাটে রঙ শরীরটা বেশ বলিষ্ঠ। রাহুল খুঁটিয়ে দেখল ওকে। ওর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশের কম নয়। রাহুল বলল, বহরমপুর।

আমাদের মুক্তকেশীর মাষ্টারমশায় কেউ হন নাকি?

প্রশ্নটা কাল রাতের সেই চা-ওলার মতো। রাহুল বিরক্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

তাই বলুন! লোকটা হাসল। ..... আপনিই তবে মাস্টারমশায়ের ছেলে। আমার নাম মণিশঙ্কর—মণিশঙ্কর ঘোষ। আপনার বাবার মুখে অনেক কথা শুনেছি। কবে আসা হল?

রাহুল হাসবার চেষ্টা করে বলল, কী কথা শুনেছেন?

মণিশঙ্কর আঙুলের ডগায় চূণ নিয়ে জিভে রাখল। .... সে অনেক। আপনার নামটা কী যেন?

রাহুল।

রাহুল! ভারি চমৎকার নাম তো। ..... মণিশঙ্কর জোরে হেসে উঠল। আরও বলল, আপনার বাবা বলতেন বটে, মনে পড়ল। বলতেন, অমন শান্তশিষ্ট ছেলে ছিল—হঠাৎ শহরে পড়তে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে দেখে কিন্তু নষ্ট হওয়া ছেলে লাগে না। আসলে সেকেলে লোকেরা একালের ছেলেদের রকম-সকম বুঝতে পারেন না কিনা' তাই ছেলেদের সব কিছুতেই ওঁদের সন্দেহ।

লোকটার কথায় অন্তরঙ্গতার সুর আছে। এ সেই জাতের লোক—যাদের মুখে তেতো কথা শুনতেও মিষ্টি লাগে। তবে বাবার জনপ্রিয়তা টের পাওয়া যাচ্ছে ক্রমশ। রাহুলও হেসে ফেলল সশব্দে। বলল, এখানে কোথায় থাকেন আপনি?

বলার পরক্ষণেই রাহুল আবিষ্কার করল, মণিশঙ্করের একটা মোটর সাইকেল আছে। সেটা তার কাছেই দাঁড় করানো। মণিশঙ্কর সেটার সীট সাফ করার ভঙ্গিতে থাপ্পড় মেরে জবাব দিল—কাছেই থাকি। আসবেন সময়মতো। আপনি আমাদের নিজের লোক মশাই। হৃষিবাবু এ ময়নাচকের সবারই আপন মানুষ। হ্যাঁ—আমি থাকি মাইলটাক পশ্চিমে—ব্রিজ পেরিয়ে একেবারে খাঁখাঁ মাঠে।

রাহুল এগিয়ে এসে বলল, মাঠে কী করেন?

একটু আধটু চাষবাস আর ফলের বাগান-টাগানও আছে। মেকানাইজড্ এগ্রিক্যালচার করছি। অবশ্যই আসবেন কিন্তু। ভারি সুন্দর জায়গা—নদীর ধারে কী আর করব বলুন? ব্যবসা করে পিতৃপুরুষ কিছু কানাকড়ি আর জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। যা যুগ পড়েছে, ব্যবসাও খুব সুবিধেজনক নয়—আমি ওটা পারিও না আসলে। এদিকে জমিজমাতেও আজকাল ঝঞ্ঝাট অনেক। যাই হোক, এ একটা নেশা বলতে পারেন। এবারে মার্চে সদরের এগ্রিক্যালচার এগজিবিশানে কয়েকটা প্রাইজ পেয়েছি। এখন কৃষিই আমার লক্ষ্মী! আসবেন কিন্তু। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন—হাইওয়ে থেকে জাস্ট এক ফার্লং মাত্র। শঙ্করবাবুর খামারবাড়ি বললে ভূতে দেখিয়ে দেবে।

মোটর সাইকেলে চেপে মণিশঙ্কর চলে গেল। রাহুল একটু আশ্বস্ত হল। আসলে পরিচয় হওয়া খুবই দরকার তার। হয়ে যাবে সহজেই—যা মনে হচ্ছে। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকল। তারপর কিছুদূর এগোতেই একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল।

সামান্য দূরে একটা ভিড় দেখা যাচ্ছিল। কাছাকাছি যেতেই চেঁচামেচি শোনা গেল। মনে হচ্ছে দুটি বিবদমান পক্ষকে লোকেরা সামলানোর চেষ্টা করছে। রাহুল কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারল। মিষ্টির দোকানের সামনে একটা কিছু অনাছিষ্টি কাণ্ড হচ্ছে নির্ঘাৎ। সামনে একটা মারমুখী যুবক ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে আসছে—ট্যারা চোখ, মস্তান মার্কা চেহারা। তাকে আটকানোর চেষ্টা করছে কয়েকজন। উঁকি মেরেই অন্য পক্ষকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল রাহুল। অরুণদা! সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আরও হতবাক হল। অরুণদার ঠোঁট কেটে গেছে। রক্তের ছিটে লেগে রয়েছে। লাল চোখে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হাঁফাচ্ছে। সেই ছোকরাটা কদর্য ভাষায় গাল দিতে দিতে বারবার তেড়ে আসছে। রাহুল সামনে গিয়ে, কি হয়েছে অরুণদা, বলার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ লাফিয়ে উঠল। .... এসেছিস্ ভাই? দ্যাখ, দ্যাখ—শালা আমাকে মেরেছে! ওই খানকির বাচ্চার এত স্পর্ধা যে আমার গায়ে হাত তোলে!

অরুণ হাউহাউ করে প্রায় কেঁদে উঠল। রাহুল দু পা বাড়িয়ে মারমুখী যুবকটির সামনে দাঁড়াল। ... কী হয়েছে? ওঁকে মেরেছ কেন?

যুবকটি দাঁত ছরকুটে জবাব দিল, মেরেছি—আরও মারব শালা ঢ্যামনাটাকে। তুমি কে হে নাক গলাতে আসছ? কেটে পড়ো দিকি।

পাশ থেকে তার বয়সী একজন বলে উঠল, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। এ যে নতুন মাল দেখছি।

ভিড়টা চুপ। বিনাপয়সায় মজা দেখার সুযোগটা সবাই উপভোগ করতে চায় যেন। রাহুল কঠোরস্বরে বলল, কেন মেরেছ?

ট্যারা যুবকটি ভেংচি কেটে বলল, কেন মেরেছ? ময়নাচকের নন্দর এটা অভ্যেস। মানুষ পেলেই মারে।

ভিড়টা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল চারপাশে। রাহুলের কান গরম হয়ে গেল। হয়তো বেশি কিছু

করে ফেলার উৎসাহ পাচ্ছিল না সে—এই কুৎসিত হাসির কোরাস তাকে পলকে খেপিয়ে দিল। সে আচমকা যুবকটি অর্থাৎ সেই নন্দর জামার কলার ধরে চিবুকে একটা নমুনাস্বরূপ 'তিননম্বরী' চালাল। নন্দ আটকাতে হাত তুলেছিল—হাতটা নিজের দাঁতে গিয়ে লাগামাত্র ঠোঁট কেটে রক্ত দেখা দিল। রাহুল এবার তার 'দুনম্বরী' ঝাড়ল নাকের পাশে। পরক্ষণে সে নিজেকে আক্রান্ত দেখল চারপাশ থেকে। নন্দব সঙ্গীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এলোমেলো চড় কিল ঘুষি লাথি চলেছে।

রাহুলের এ অভিজ্ঞতা নতুন নয় মোটেই। এতে সে অভ্যস্ত। চারপাঁচটি বদমাসকে একা কাবু করা তার ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রতিপক্ষ কয়েকটা ঘুষি ও লাথি খাবার পর রাহুল দেখল একজন ইট তুলেছে হাতে। ইটটা তার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টির দোকানের কাচে গিয়ে লাগল। ঝনঝন শব্দ হল। রাহুল লাফ দিয়ে ছোকরাটার ওপর পড়ল। সে পেটে ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল। পরক্ষণে অরুণের চিৎকার শুনল সে। .... ড্যাগার, ড্যাগার! রাহুল! ওরে বাবা!

নন্দর হাতে চকচকে ছুরিটা দেখতে পেল সে। আরেক লাফে ওর ছুরিধবাহাতের কব্জিটা ধরে ফেলল তক্ষুনি। কিন্তু হাতের একপাশটা কেটে গেল অনেকখানি। রক্ত বেরিয়ে এল। দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে লাগল। রাহুলকে অবিশ্রান্ত এই সুযোগে ঘুষি মারছিল নন্দর সঙ্গীবা। রাহুল ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছিল। ছুরিধরা হাতটা সে তবু ছাড়ল না। সে টের পেল ছুরিটা ক্রমশ কেটে বসছে তার হাতে। একসময় তার হাত শিথিল হয়ে এল। অরুণ সমানে চেঁচামেঁচি করছে। ভিড়টা সামান্য তফাতে সরে গিয়ে মজা দেখছে। রাহুল টলে পড়ে যাবার মুহূর্তে কার ভারি গলায় হুকুম শুনল, নন্দ ছেড়ে দে ওকে। এই শালার ব্যাটা শালা!

নন্দ তা… হাত ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল রাহুল। আচ্ছন্ন চোখে তাকাল। একটি লম্বাচওড়া বিশাল লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে চাপা কৌতুকে। অরুণ তাকে হাতমুখ নেড়ে কী বোঝানোর চেষ্টা করছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপর রাহুল উঠে দাঁড়াল। অক্ষত বাঁহাতে অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে—আচমকা সেই লোকটিকেই ঘুষি মেরে বসল।

লোকটা ভারি সেয়ানা। খপ করে তার মুঠোটা ধরে সশব্দে হেসে উঠল। তারপর অন্যহাতে রাহুলের জামার কলারও ধরে ফেলল। রাহুল নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। সে ক্লান্ত, আহত—সর্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট। আর এই লোকটার শরীরে যেন অসুরের শক্তি।

লোকটা শক্ত হাতে রাহুলের জামার কলার ধরে তার মুখটা সোজা রাখল এবং পর পর দুটো ঘুষি চালাল দুদিকের চোয়ালে। রাহুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল তার, সে দেখল অরুণের ঘরে শুয়ে আছে। আলো জ্বলছে। সামনে অরুণকে দেখতে পেল। অরুণ বলল, উঁহু—নড়ো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

রাহুল টের পেল তার ডানহাতটা ভারি—সারা শরীর অবশ। কিন্তু কোন যন্ত্রণা হচ্ছে না। একটু পরে সে বুঝল যে চোয়াল নাড়ানো যাচ্ছে না। ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে দুদিকে। তার কথা বলার ইচ্ছে করছিল। ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু কথা বলা সম্ভব হল না।

অরুণ কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, আমিই শালা যত নষ্টের গোড়া! মিছেমিছি তোমার কপালে এত কষ্ট এনে দিলুম! উঃ! কেন যে এ শয়তানের রাজ্যে এসে জুটেছিলুম! এখানে কি মানুষ আছে কেউ? সব জানোয়ারের রাজত্ব ভাই রাহুল। আর দেখলে তো সব স্বচক্ষে! ওই নন্দ—নন্দ আমার এখানেই কাজ করত। বুঝলে? বিশ্বাস করে পার্টির কাছে টাকাপয়সা আদায়ের ভার ও ব্যাটার ওপর দিয়েছিলুম। তিন-তিনহাজার টাকা মেরে কেটে পড়ল ব্যাটা। তখন ওর মুরুব্বী সানু চাটুয্যেকে গিয়ে ধরলুম—এই তোমার চ্যালার কাণ্ড। একটা ফয়সালা করে দাও। সানু মিটমাট করে দিলে। আসলে ভদ্রবংশের ছেলে তো সানু চাটুয্যে—এখনও বিবেকবুদ্ধি কিছু আছে। তা নন্দ রাজি হল। রাজি না হলে উপায় আছে আর? এলাকায় সানুর নামে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। এখন—রাজি তো হল নন্দ। বারোটা কিস্তিতে টাকাটা শোধ করে দেবে। প্রথম দুটো কিস্তি বেশ ভদ্রভাবেই দিল। থার্ড কিস্তির বেলা শালা

খানকির বাচ্চা টালবাহানা শুরু করল। দিনের পর দিন ঘোরাচ্ছে। কাঁহাতক আর পারা যায়? আজ শালাকে ধরে ফেললুম ওখানে—তারপর দুটো কথা কথান্তর হতে হতে শুওরটা আচমকা আমাকে মেরে বসল! .... যাক্ গে, ভেবো না। ও টাকা আমার দরকার নেই। এখন তোমার জন্যে আমি মাষ্টারমশাইকে মুখ দেখাব কেমন করে ভাবতে পারছিনে ভাই। নিশ্চয় সব কথা কানে যাবে ওনার।

শীলা এসে বলল, দাদা, গরম দুধ।

রাহুল দেখল শীলা একটা প্লেটের ওপর দুধের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণে হাসল রাহুল। হাসিটা হয়তো স্পষ্ট ফুটল না—ঠোঁটের কোণে সামান্য স্পন্দন তুলল মাত্র। কিন্তু শীলাও কি হাসল? ঠিক হাসল না—একটা হাসি চাপল যেন। কেন? রাহুলের হাসির বিনিময় মাত্র— নাকি তাকে দেখে তার কীর্তি জেনে শীলার হাসি পেয়েছে?

অরুণ বলল দুধ এনেছিস? চামচ না হলে খাবে কেমন করে? যা—নিয়ে আয়।

শীলা দুধ টুলে রেখে ভিতরে গেলে অরুণ বলল, ভাই রাহুল, আমি একবার বেরোচ্ছি। এখন জাস্ট সাতটা বাজে—আমি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব। ডাক্তারবাবুর কাছ হয়ে ফিরে আসব—ভেবো না। শীলা রইল। একবার সানু চাটুয্যের কাছে ঘুরে আসি। ডেকে পাঠিয়েছে। বিশ্বাস নেই—না গেলে ভাববে পাল্টা মতলব আঁটছি।

শীলা আসার পর অরুণ বেরিয়ে গেল। রাহুল চোখের ভাষায় শীলাকে বলতে চেষ্টা করল, বসুন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ করে শীলা নিঃসঙ্কোচে কাছে এল। তারপর বলল, নিজে খেতে পারবেন—নাকি খাইয়ে দিতে হবে?

রাহুল ফের তেমনি হাসল—মাথাটা তোলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

শীলা তার পাশের চেয়ারে বসে চামচেয় দুধ তুলে বলল, এই, হাঁ করুন—আপনারও আর কাজ ছিল না! দাদার পাল্লায় পড়ে গেলেন। লোকটা কেমন গণ্ডগুলে মানুষ—জানা ছিল না—তাই না?

রাহুলের কিছু খাবার ইচ্ছে মোটেও ছিল না। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে শীলার সাদা হাত—সাদা চিরোল আঙুলে ধরা দুধভরা রুপোলি চামচটা তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদরের জিনিস মনে হচ্ছিল। শীলার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। শীলার দুচোখে দুটো চামচ চকচক করছে—অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো স্নেহভালবাসা! রাহুল তার জীবনের অন্ধকার হাতঁড়ে বিপন্নভাবে খুঁজতে চেষ্টা করছিল—কী যেন এমনি উজ্জ্বল বস্তুখণ্ড তারও সঞ্চিত ছিল, বড় পরিচিত ছিল—এমনি মুখ, স্নেহভালবাসায় নরম হয়ে ওঠা চিরোল আঙুল! কতকাল আগে তা হারিয়ে গেছে। তার কথা বলতে ইচ্ছা করল। যে কোন কথা। ক্ষোভ দুঃখ অভিমানের কথা—অথবা কিছু রাগের কথা। চুপ করে থাকা তার অসম্ভব মনে হচ্ছে। ভীষণভাবে সাড়া দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছু করার নেই, এবং পরিণামে এই অক্ষমতার বিপুল চাপেই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

শীলা চমকে উঠল।..... আরে! আপনি কী ছেলেমানুষ! কাঁদছেন কেন? মারামারিতে হেরে গেলে কেউ কাঁদে নাকি? উঁহু—চুপচাপ দুধটা খেয়ে ফেলুন তো। গায়ে বল না হলে আবার ফাইট করবেন কিসের জোরে? জানেন—মার দিতে যারা পারে, তাদেরও মাঝে মাঝে মার খেতে হয়?

চাপা হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল। রাহুল চোখ বুজল। হ্যাঁ—তাকে সেরে উঠতে হবে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে অনেকটা শক্তি তার দরকার। আপাতত নন্দ নয়—সানু চাটুয্যের চোয়াল না ভাঙা অব্দি তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

চোখবুজে নিঃশব্দে দুধ খাচ্ছিল সে। হঠাৎ শীলার কণ্ঠস্বরে চোখ খুলল। শীলা উঠে দাঁড়িয়েছে। ... কে কে ওখানে? বলে সে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাইরের দিকে জানালাটা খোলা ছিল। রাহুল দেখল—চমকে উঠল। গঙ্গা!

শীলা দরজা খুলে বলল, মাসিমা! আরে—আসুন, আসুন।

গঙ্গা ঘরের ভিতর এক পা বাড়িয়ে রাহুলকে একবার দেখে নিয়ে শুধু বলল, আচ্ছা চলি শীলা।

শীলা বলল, এসেই চলে যাচ্ছেন মাসীমা? বসবেন না? বউদি বকবেন—জানতে পারলে।

পরে আসব'খন। ... বলে দ্রুত ঘুরে চলে গেল গঙ্গা।

শীলা দরজাটা বন্ধ করে বলল, ঢঙ দেখে বাঁচিনে! ছেলের খবর নিতে এসেছিলেন দয়াময়ী জননী! রাহুলবাবু, আপনার ছোটমাকে চিনতে পারলেন তো?

রাহুল প্রচণ্ড চেঁচিয়ে শীলাকে থামিয়ে দিতে পারলে আকস্মিক ভয়ঙ্কর আলোড়নটা প্রশমিত হত; কিন্তু পারল না। তার চোখদুটো নিষ্পলক হয়ে উঠল। শীলা দৌড়ে কাছে এসে বলল, কী হয়েছে আপনার? রাহুলবাবু। শুনছেন? অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? সত্যি বড্ড ভয় করছে আমার। রাহুলবাবু!

রাহুল তেমনি রক্তরাঙা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল। একটা ভয়ঙ্করকে যথাশক্তি ভিতরের অন্ধকারে ঠেলে দিতে তার সবটুকু রক্ত যেন ঘাম হয়ে বেরুচ্ছে।

ময়নাচকের এই অভিজ্ঞতাটা তার নতুন। রাহুল কোনদিন কারো হাতে মার খায়নি। সে জেনেছিল যে অপরকে মার দিতেই তার জন্ম। কিন্তু এতদিনে টের পাচ্ছিল একটা গোলকের সুমেরু ছাড়া কুমেরু আছে। আসলে সে বহরমপুর এলাকায় একা ছিল না। সারাক্ষণ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেপাল আর তার দলবল ছিল তৈরি। সে ছিল দলের একটা অংশমাত্র। এখানে আজ সে একা। কেউ তার মাথা বাঁচানোর জন্যে নেই এখানে। কাজেই আজ তার শক্তির পুরোটা যাচাই হয়ে যাচ্ছে। আজ তার যা কিছু শক্তি—তার উৎস সে নিজে। এই অভিজ্ঞতার অবশ্যই দরকার ছিল। কতখানি জোর তার দরকার এবার জানা গেল। এখন তাকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে বাড়তি অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হবে। সুতীব্র সাহস, ক্ষিপ্রতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চাতুর্য—অনেক কিছু জিনিস তার দরকার, পরোক্ষে যা বুদ্ধি থেকে মেলে। তা না হলে সে এখানে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। আর সৎ নিরীহ ভালোমানুষ হয়ে-ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব নয়—হয়তো সহজও নয় আর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে, হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে তার জীবনের সবকিছু। এখন আর চেষ্টা করেও ভালো মানুষটি হয়ে ওঠা যাবে না।

তিনটে দিন তার বিছানায় কেটে গেল। কীভাবে কাটল, সে স্পষ্ট টের পায়নি। একটা গুরুতর আচ্ছন্নতা কুয়াসার মতো তার অস্তিত্বের চারপাশ ঘিরে ছিল সারাক্ষণ। তার মধ্যে শুধু শীলাই ছিল কিছুটা স্পষ্ট—বাকি সব অস্পষ্ট। গঙ্গা আরেকবার নাকি এসেছিল, সে জানে না। তখন তার প্রচণ্ড জ্বর। মাথার কাছে বসে থেকে চলে গেছে। শীলা বলেছে। আর এসেছিল সেই সানু চাটুয্যে। বলে গেছে, পরে আসবে। সানু আরও বলে গেছে, মাষ্টারমশায়ের ছেলে জানলে সে ওর গায়ে হাতই দিত না। নিষ্পত্তি করে ফেলত ব্যাপারটার। যাক্‌গে, যা হবার হয়েছে। পরে এসে ভাব করে ফেলবে। তাছাড়া সানু খুব অবাক হয়েছে যে রাহুলের মারপিটে এমন ওস্তাদী হাত আছে। সেই জন্যেই তার ভাব করার ইচ্ছেটা এত তীব্র। ময়নাচকে নন্দরা সবাই আসলে তার মতে নেড়ি কুত্তা—তার মধ্যে এ একটা ডালকুত্তা সন্দেহ নেই। হুঁ, সানু খুব খুশি হয়েছে।

চতুর্থ দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, শরীরটা হাল্কা লাগল তার। সে স্বচ্ছন্দে উঠে বসতে পারল। দুর্বলতা সামান্য আছে, কিন্তু সেটুকু আমল দিল না সে। প্রথমে মুখের ব্যান্ডেজটা একটানে খুলে ফেলল। দেখল দুটো চোয়ালেই কালচে ছোপ পড়েছে। তখনও একটু ফোলাভাব বোঝা যাচ্ছে সেখানে। চোয়াল নাড়া দিতে গেলে বিশেষ ব্যথা আর নেই। গতরাত্রে কথা বলতে পারছিল—কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল। এখন সেই কষ্টটা নেই। নেই—তা স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্যেই ডাকল, অরুণদা, ও অরুণদা!

নাঃ, সে এবার অনেকটা ফিট হয়ে উঠেছে। শুধু ডানহাতের ব্যান্ডেজ এখনও কিছুদিন খোলা যাবে না। ঘা সারতে সময় লাগবে। বুড়ো আঙুল নড়ানো যাচ্ছে না। তালুও টনটন করছে। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ফের অরুণকে ডেকে বাঁহাতের সাহায্যে বাইরের দরজাটা খুলে দিল। বাইরে প্রচুর রোদ নিয়ে অনেক আশা আর সম্ভাবনায় ভরা পৃথিবীটা অপেক্ষা করছে তার জন্যে। পরিচ্ছন্ন আকাশে খেলা করছে প্রসন্ন একটা মুক্তি। অন্তত রাহুলের তাই মনে হল—আকাশ এবং রোদে ঝকমকে পৃথিবী জুড়ে মুক্তির গভীর আস্বাদ রয়েছে ছড়ানো। সেখানে পা বাড়ালেই তার দুর্বিনীত স্বাধীনতা বোধ বাঘের মতো

সগর্জনে সাড়া দেবে। আর এই ভয়-না-মানা হার-না-মানা ক্ষুধিত স্বাধীনতার বোধই তো তাকে কোনদিন আর দশটা ছেলের মতো সুবোধ করে তুলতে দ্যায়নি।

অরুণের সাড়া সে পেল না। এল শীলা। ভিতরের দরজা খুলে প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে উঠল।..... এই স্মা! কী হবে!

রাহুল বলল, কিছুই হবে না। মুখ ধোবার জল দিতে পারেন? ঠাণ্ডা জল কিন্তু। শীলা চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! ব্যান্ডেজ খুলে গরম জলে মুখ ধুতে বলেছেন যে ডাক্তার। একটা পাওডারও দিয়ে গেছেন।

উঁহু। আর ডাক্তার-ফাক্তার নয়। ..... রাহুল একটু হাসল। ..... আমিই নিজেই এখন ধন্বন্তরী।

শীলা বলল, সেই তো! এখন মুখে কথা ফুটেছে—আর কে কার ভরসা করে!

রাহুল পলকে ক্ষুব্ধ হল। দেখুন ভরসা আমি কারো ওপর করতে চাইনি। পথে ফেলে দিতেই পারতেন আপনারা।

শীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ছি, ছি! আমি কী তাই ভেবে কিছু বললুম নাকি! আপনি ভারি মেজাজী লোক রাহুলদা। অত হিসেব করে কথা বলতে আমি শিখিনি।

সে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল—রাহুল ডাকল, শীলা শুনুন।

বলুন।

আপনিও কম মেজাজী নন, দেখছি।

ওর কথার সুরে শীলা ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, জল ঠাণ্ডাই এনে দিচ্ছি—কিন্তু খারাপ কিছু হলে আমার দায়িত্ব নেই।

কিসের দায়িত্ব? আমার জন্যে দায়ী আমি নিজে। .... রাহুল বলল। .... আচ্ছা, অরুণদা ওঠেনি এখনও?

শীলা জবাব দিল, আজ দাদার ঘুম সকালেই ভেঙেছে। মানে ভাঙানো হয়েছে। সানু এসেছিল—সেই বদমাস লোকটা—তার সঙ্গে বেরিয়েছে দাদা। কী জানি কী ব্যাপার।

রাহুল একটু অস্বস্তি বোধ করল। বলল, লোকটার সঙ্গে আপনার দাদার বুঝি ভীষণ ভাবটাব আছে?

শীলা ভ্রূ কুঁচকে এবং ঠোঁট উল্টে বলল, কে জানে! দাদার ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই। দাঁড়ান জল এনে দিচ্ছি।

রাহুল দেখল সানু চাটুয্যের নামে তার অবচেতনা থেকে এই অস্বস্তিটা যেন অনুভূত হচ্ছে। সে তাকে মেরেছিল বলে? কিছুক্ষণ এটা নিয়ে ভাবল সে। আচ্ছন্নতাব মধ্যে ওই লোকটার কণ্ঠস্বর সে শুনেছে মনে পড়ছে। কেন এসেছিল তাকে দেখতে? এসব ক্ষেত্রে তো তারা দুজনে পরস্পর শত্রু—কারণ আঘাত ও আক্রমণ ঘটেছে দুপক্ষের মধ্যে। হতে পারে এটা সামান্য বিবাদ মাত্র, কিন্তু নিতান্ত দৈবাৎ উত্তেজনার মুখে ঘটে গেছে—তারা দুজনে পরস্পর অপরিচিত বটে; কিন্তু সানু চাটুয্যের এই খোঁজখবর নেওয়া আর উদারতা দেখানো কেমন অস্বস্তিকর লাগছে। শুধু কি মাষ্টারমশায়ের ছেলে বলে তাকে খাতির দেখাতে চায় সে? সেজন্যেই কি বলতে চায় যে সে অনুতপ্ত হয়েছে? অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করল রাহুলের। সানু সম্পর্কে সে মোটামুটি যা জেনেছে—তাতে বোঝা যায়, লোকটি নেপালদার জাতেরই একজন। কিন্তু সে নেপালের চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ নাকি। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে সানু বা সনৎ চ্যাটার্জি। তার দাদা এলাকার রাজনীতির পাণ্ডা। তাছাড়া সানু রাহুলের মত কলেজ ছাড়া। বিদ্যেবুদ্ধি বড় কম নেই। এদিকে অরুণের মত মিথ্যুক অসচ্চরিত্র লোভী লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। ব্যাপারটা বড় রহস্যময়। শীলা কি কিছু জানে?

শীলা জলের বালতি এনে বলল, নিন। মুখটুখ ধুয়ে আজ ভিতরে আসবেন কিন্তু। বউদি আপনাকে ডেকেছে।

রাহুল জল নিয়ে বাইরে গেল। বারান্দায় বালতিটা রাখল। নিমডালের দাঁতান করা সম্ভব হবে কি না ভাবল কিছুক্ষণ। মুখের ভিতরটা পচে গেছে যেন। কদিন ধরে দাঁত মাজা হয়নি একেবারে।

শীলা যেন টের পেয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে বলল, গুঁড়ো মাজন এনে দিচ্ছি। ডাল ভাঙতে যাবেন না যেন। একদিনে বেশি-বেশি স্ফূর্তি দেখাতে গেলে আর ফাইট করবেন কেমন করে?

রাহুল হেসে বলল, সত্যি বলেছেন। কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে চাঙ্গা করতে পারলে আপনি খুব খুশি। অর্থাৎ লাস্ট ফাইটটা দেখবার লোভ বড্ড প্রবল। তাই না?

শীলা জবাব দিল, কেন হবে না বলুন? বিনা পয়সায় জলজ্যান্ত মজা দেখতে কে না চায়। অ্যাদ্দিন পর্দার ছবিতে ওসব দেখেছি—এবার বাস্তবে দেখব। হাততালি দেব।

রাহুল বলল, ঠাট্টা হচ্ছে? মনে হচ্ছে না যে আমি কাকেও মারতে পারি!

শীলা হেসে বলল, বা রে! মনে কত কী হচ্ছে। কিন্তু সানু চাটুয্যের সামনে শুনেছি নাকি খুব জবর পালোয়ানও ভিরমি খায়।

রাহুল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, দেখা যাবে। দেখবেন আপনি। আপনাদের সানু না কানু—

শীলা সকৌতুকে বলল, আপনি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ রাহুলবাবু। এখনও বাচ্চাদের স্বভাব আপনার যায়নি। ছাড়ুন তো ওসব—মুখ ধুয়ে ভিতরে আসুন। বউদি ডাকছেন।

রাহুল জেদের স্বরে বলল, সানুর সম্পর্কে অন্যের কী ধারণা জানিনে—আপনার ধারণা দেখছি খুব উঁচু। অনেক ভক্তি-টক্তিও থাকতে পারে লোকটার ওপর। কিন্তু আমি রাহুল। আমাকে আপনি চেনেন না।

শীল হঠাৎ কণ্ঠস্বর একটু চাপা করল। ....ভক্তি-টক্তি হবে না। ধারণা উঁচু হবে না আবার? জানেন, সে আমার কে?

চমকে উঠল রাহুল। ঘুরে বলল, আপনার! কে হয় সে আপনার?

শীলা চোখ নামিয়ে বলল, হয় নয়—হতে চলেছে। সে আমার গলায় নাকি মালা দেবে। দাদা খুশি হয়ে নিজে থেকেই কথাটা তুলেছেন। চাটুয্যে মশায়ের কোন আপত্তি নেই।

রাহুল দু পা এগিয়ে বলল, এ কী বলছেন! অরুণদা জেনেশুনে—

বাধা দিয়ে শীলা বলল, জেনেশুনে নয়, প্রাণের দায়ে। নৌকোর চারিদিকে যে হাজারটা ফুটো—জল ঢুকে কখন ডুবে যায় সেই ভয়ে একটা করে ফুটো বন্ধ করার মতলব। কিছু ফুটো বন্ধ করবেন শ্রীমান চাটুয্যে—কিছু আপনি। দাদা আমার কী রকম লোক—তা জানেন না বুঝি?

শীলা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। রাহুল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। শীলা, এই শীলার সঙ্গে হারামজাদা সানুটার বিয়ে হবে? আজ সব আগে একটা পবিত্র কর্তব্য আছে রাহুলের। সেটা হচ্ছে, যে কোন মূল্যে এই বিয়েটা ভাঙা। অমন চমৎকার মেয়েটার সর্বনাশ করতে অরুণদার বাধবে না? আশ্চর্য তো। সে মনে মনে বলল, রাজেনবাবু, আপনার কাজ পরে হবে। আপাতত একবার সানু চ্যাটার্জির সঙ্গে চরম বোঝাপড়া করাটাই জরুরী। কিন্তু অরুণের চারদিকে ফুটো কিসের?

একটু পরে ভেতরে যেতে হল রাহুলকে। অরুণের বউয়ের সঙ্গে তার প্রথম মুখোমুখি আলাপ। প্রথম দর্শনেই তার মনে হল, মেয়েটি ভালো। ভালো মানে বোকা আর সাদাসিধে। ওর গায়ের রঙ বেশ ফরসা, চেহারায় লালিত্যেরও অভাব নেই—কিন্তু অনেক দিন ধরে নানান অসুখে ভুগে চেহারাটি হয়েছে যেমন পাটকাঠি, তেমনি ফ্যাকাসে। এসব মেয়েরা সচরাচর তিরিক্ষি মেজাজের হলেও দোষ দেওয়া যায় না। অরুণ বলেছিল ওর আসল অসুখ হচ্ছে মনে—মেজাজই ওর অসুখের কারণ। তাই রাহুল ভেবেছিল, দুটো কড়া কথা বলতেই ডেকেছে অরুণের বউ। কারণ উড়ে এসে জুড়ে বসে হাঙ্গামা বাধিয়েছে রাহুল। হয়তো অরুণের প্রতিপক্ষকে রাহুলই আপোষ ফয়সালার বাইরে ফেলে দিয়েছে এবং তার ফলে অরুণের নন্দঘটিত সমস্যা আরও বেড়ে গেছে।

কিন্তু মিষ্টি হেসে অরুণের বউ করুণা কথা বলতে শুরু করলে রাহুল আশ্বস্ত হয়েছে। শুধু আশ্বস্ত নয়, মনে হয়েছে—এ যেন কতকালের চেনাজানা আপনজন। রাহুল তার নিজের সম্পর্কে অরুণের মনোভাব পুরোটাই জানে। সে জানে যে অরুণের খাতির করার পিছনে কিছু স্বার্থ আছে—তা না হলে পারতপক্ষে রাহুলের মতো ছেলেকে সে এড়িয়ে থাকত। আর—শুধু অরুণ কেন, যারাই রাহুলের সবিশেষ পরিচয় জানে তারা প্রত্যেকেই তো তাকে মনে মনে গভীরভাবে ঘৃণা করে। করুণাও তাকে

সবিশেষ জানে বইকি—অরুণ তার সম্পর্কে সবই বলেছে। অথচ করুণা যেন তাকে ঘৃণা করল না! করুণা বলল, একালের ছেলে সব—চাকরি-বাকরি নেই, কাজকর্ম পায় না। একটু আধটু দুষ্টুমি করবে না তো কী করবে শুনি? বেশ করবে। বিষদাঁত না থাকলে এ যুগে চলে না মোটে। এই দ্যাখো না তোমাদের দাদাটির কাণ্ড। যদি শক্তসমর্থ মানুষ হত, চাদ্দিক থেকে কেউ ওকে লাঞ্ছনা করবার অবকাশ পেত ? আমি তোমার প্রশংসা করেছি, রাহুল। শীলাকে জিজ্ঞেস করো। বলেছি, পুরুষ ব্যাটাছেলে—কখনও দুঘা দেবে, কখনও দুঘা খাবে—তাতে লজ্জা কিসের?

পরক্ষণে সে একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, সানু চাটুয্যেকে তুমি মেরেছ শুনে আমার তো ভাই নাচতে ইচ্ছে করছিল। ওই খড়ের অসুরকে সবাই এখানে নাকি ভয় পায়।

রাহুল হেসে বলল, নাঃ, মারতে আমি পারিনি বউদি। সেই আমাকে মেরেছে।

করুণা বলল, আহা, হাত তো তুলেছিলে মারতে—আমি সব শুনেছি ভাই। ওই হাত ওঠানোই হচ্ছে আসল কথা। সানুর গায়ে হাত ওঠানোর মানুষ যে এ তল্লাটে নেই। তাই শীলাকে বলছিলাম, ওকে আমি সামনে বসিয়ে খাওয়াবো, দুটো কথা বলে শান্তি পাব রে শীলা! ওকে একবার ডেকে আনবি? আমার তো চলাফেরা বারণ। তাছাড়া বড্ড মাথা ঘোরে।

শীলা দুষ্টু হেসে বলল, চাটুয্যেমশায়কে রাহুলবাবু চিনতেন না বলেই হয়তো মারতে হাত তুলেছিলেন!

রাহুল হো-হো করে হাসতে গিয়ে, দেখল, চোয়ালে ব্যথা। সে বিকৃতমুখে বলল, যা বলেছেন!

করুণা ধমক দিল। .... তুই থাম্ শীলা। রাহুল ঠাকুরপোকে তুই চিনিসনে। বেথুয়াডহরিতে থাকতে তোর দাদার মুখে ওর যা সব গল্প শুনেছি, ভয়ে তো বুক ঢিপঢিপ করছে। আসলে ভুলেই গিয়েছিলুম ওর কথা। গত রাত্তিরে তোর দাদা বলল, সানুর সঙ্গে একটা মিটমাট করে দিতে হবে রাহুলের—সানু নিজেই উদ্যোগী। বারবার আসছে সেজন্যে। বুঝলি শীলা? তখনই আমার মনে পড়ে গেল। আরে তাইতো! রাহুলের কথা তো আমি শুনেছিলুম! এ তবে সেই রাহুল!

করুণা হেসে উঠল। হাসতে সম্ভবত কষ্ট হয় ওর। পরক্ষণে বলল, হাঁফিয়ে উঠি ভাই বেশিক্ষণ কথা বললে। তুমি এখানে থাকো ভাই, কোথাও তোমাকে যেতে দেব না। নিজের বাড়ির মতো থাকো। নিজের মা নেই, বাবা থেকেও নেই, তো কী হয়েছে? আমি তো আছি। যদ্দিন বাঁচব তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আপাতত সেরে-টেরে ওঠ, তারপর .....

তাকে থামতে দেখে শীলা বলল, তারপর কী হবে বউদি? লড়িয়ে দেবে কারো সঙ্গে?

করুণা ধমক দিয়ে বলল, লজ্জা করে না তোর হতভাগা মেয়ে? কী হবে? তোর নিজের কথা একবার ভেবে দেখেছিস? একবারটি ভেবেছিস তোর দাদার কথা? তাহলে বুঝতিস, আমরা এখানে কী অসহায় অবস্থায় বেঁচে আছি। তোমাকে সব বলব রাহুল, সব জানতে পারবে। দিনের পর দিন ওই বদমাস সানু তোমার দাদার কাছে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সময় নেই অসময় নেই—এসে হাত বাড়াচ্ছে। না পেলে শাসাচ্ছে, ইটখোলাশুদ্ধ উড়িয়ে দেবে নাকি। অগত্যা, তোমার দাদা ডাকাতটার মুখ বন্ধ করতে .....

বাধা দিয়ে রাহুল বলল, বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে—তাই না?

করুণা চমকে উঠে বলল, তুমি জানো? ভাই রাহুল, কথাটা শুনে আমি ওকে যা-না-তাই গালমন্দ করেছিলুম। কিন্তু শেষ অব্দি ভেবে দেখলুম, আর কিই বা উপায় আছে!

শীলা ফোঁস করে উঠল, হ্যাঁ—তা তো নেই। মায়ের পেটের বোন তো নয়—উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক হতচ্ছাড়ী। অতএব তাকে বলি দিয়েই দেবতাকে তুষ্ট করা যাক্।

করুণা হাত তুলে বিষণ্ণস্বরে বলল, না—তা নয় রে শীলু, কথাটা তা নয়। বিয়ে তো তোর দিতেই হবে—কারো না কারো ঘর করতেই হবে। রাবণরাজারও তো ঘরকরার মেয়ে ছিল ভাই রাহুল, ছিল না? তাই শেষটা আমিও মত দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আমার মুখের সায়—তোমার দিব্যি ভাই, মনের সায় আমার ছিল না। আর এখন—তুমি আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছ, এখন বুকে জোর বেড়েছে। তাই কথাটা আবার ভাবছি। সানুর মত রাক্ষসের গ্রাসে এমন সুন্দর কচি মেয়েটাকে ফেলে দিতে কার

বা মন চায়, বলো? রাহুল, তুমি আমাদের বাঁচাও ভাই!

শীলা উঠে কোথায় চলে গেল। রাহুল মাথাটা একবার দোলাল মাত্র। তার মনটা এবার তেতো। তাহলে এই হচ্ছে আসল ব্যাপার! এই শুওরের বাচ্চা দুনিয়ায় এই হচ্ছে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রকৃত ভিত্তি। স্বার্থ না থাকলে কোন শালা বা শালী আপন ভাবতে একটুও রাজি নয়। সবাই চায় একজন শক্তসমর্থ মারাত্মক ধরনের দেহরক্ষী—কারণ এখন সব পথই অন্ধকার এবং শত্রুসঙ্কুল। আমি শক্তিমান—তার একটি অর্থই আজ খুঁজে মেলে—সেটি হচ্ছে, আমি খুন করতে পারি। খুনীই এখন শক্তিমান। ওস্তাদ লড়ুয়ের দিকেই সবার একাগ্র সপ্রশংস দৃষ্টি। আমি সানুর গায়ে হাত ওঠানোর ক্ষমতা রাখি, এতেই আমি হিরো হয়ে গেছি। বাঃ! করুণার কথা শুনতে পেল সে। .... ভাই রাহুল, নিরীহ মানুষ আমরা। কারো সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু তবু রেহাই আছে? চারদিকে ওঁৎ পেতে বেড়াচ্ছে বদমাসের দল। তুমি আমাদের বাঁচাও।

রাহুল উঠে দাঁড়াল। .... বউদি! মহাভারতে একটা শ্লোক আছে, জানেন নিশ্চয়। .... দুষ্কৃতিকে বিনাশ করতে আর সাধুদের পরিত্রাণে ভগবান নাকি যুগেযুগে অবতার হয়ে গজান। আমি অবশ্যি অবতার মোটেও নই। আমি সামান্য পাপী তাপী গুণ্ডা-বদমাস মানুষ। দুষ্কৃতি করাটাই আমার ধর্ম। তবে কথা দিচ্ছি, দেখব কী করতে পারি। না বউদি, হয়তো শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নয়—যদিও উনি আমার যথেষ্ট সেবাশুশ্রূষা করেছেন—আমি সানু চ্যাটারজিকে দেখব শুধু নিজের কারণে। জীবনে কখনও মার খাইনি কারো হাতে। আমার রাগ বলুন—সেটাই আসল কথা।.....

বাইরের ঘরে চলে এল সে। দেখল, শীলা চুপচাপ বসে আছে তার বিছানায়। কিন্তু ও কী করছে সে? কোত্থেকে খুঁজে বের করল ও জিনিসটা?

রাহুল প্রায় চেঁচিয়ে ঝুঁকে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আরে, আরে! করছেন কী? এটা কেন বের করলেন? রেখে দিন, রেখে দিন—অটোমেটিক। গুলি পোরা আছে।

শীলা তার বিছানার তলা থেকে রিভলবারটা বের করে নাড়াচাড়া করছিল। সাবধানে সেটা তুলে দেয়াল তাক করে বলল, কোথায় পান আপনারা? আমাকে একটা দিতে পারেন?

রাহুল বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে গুলি বেরিয়ে যেতে পারে—দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সে জোর করল না। পাশে বসে শান্ত গলায় বলল, দরকার হলে ওটাই পাবেন। এখন লক্ষ্মীমেয়ের মতো রেখে দিন তো। উঁহু হু—ট্রিগারে আঙুল দেবেন না। অটোমেটিক। শীলা, প্লিজ, লক্ষ্মীটি!

শীলা নিঃশব্দে হাসছিল। বলল, সে-রাতে আপনার ঘরে উঁকি মেরেছিলুম, জানেন? আমার ঘুম আসছিল না। আসবে কেমন করে! পাশের ঘরে একা একজন জ্বর ঘোরে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে—হয়তো জলতেষ্টা পেয়েছে। কেউ দেবার নেই। চুপিচুপি উঠে এলুম। ওই দরজাটা তো বন্ধ থাকে না। একটু ফাঁক করে দেখি আপনার মাথাটা, বালিশ থেকে পড়ে গেছে। বালিশও পড়ে গেছে নিচে। তখন বিছানাটা ঠিক করতে গিয়ে কেমন শক্ত কিছু হাতে ঠেকল। এই জিনিসটা আবিষ্কার করলুম। খুব ভয় পেয়েছিলুম—কিন্তু হঠাৎ মনটা খুশি হয়ে উঠল। বুকে যেন জোর পেলুম। ইচ্ছে করছিল, এটা লুকিয়ে ফেলি। বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে—তখন এর চেয়ে বড় বন্ধু কোথায় পাব! কিন্তু পারলুম না। আপনার দিকে তাকিয়ে সেটা পারা গেল না।

শীলা, আপনি কাঁদছেন।

ভেট্। কানাটান্না আমার আসে না। .... তারপর কী হয়েছে শুনুন।

শুনব, ওটা আপনি—তুমি রাখো আগে। আঃ শীলা, এই!

রাহুল অসতর্ক বিহ্বলতায় একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিল শীলার। অন্তত বাঁ-হাতটা শীলার পিঠ ঘুরে ওর হাতে ধরা রিভলবারটার কাছে পৌঁছতে গিয়েই এই বিপত্তিকর ঘনিষ্ঠতা! দুটো মুখ অনিবার্যভাবে খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। শীলার শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ ঝাপটা মারছিল রাহুলের মুখে। শীলা সরল না। বলল, কতবার এটা চুরি করতে চেয়েছি। সুযোগ পাইনি। মনে হয়েছে আপনি ধরে ফেলবেন! আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না হয়তো। তারপর আমি মনে মনে—ও রাহুলবাবু রাগ করবেন না

তো? যদি বলি—মনে মনে আপনার মরণ চাইছিলুম। শীলা চাপা হেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাহুল দেখল তার নিজের শরীরজুড়ে জেগে উঠেছে একটা অনন্যসাধারণ তৃপ্তি। নারীশরীরের স্বাদ তাকে প্রথম একদা গঙ্গাই দিয়েছিল—তারপর বহু সুযোগ জীবনে এসেছে, সুযোগগুলোর যথাযোগ্য ব্যবহার সে করেনি, ভাল লাগত না। একটা হিংস্র শক্তির হাতে পুতুল হয়ে উঠেছিল সে—মানুষের টাটকা রক্ত তাকে জীবনের আস্বাদ দিত। পৃথিবী আব মানুষকে ঘৃণা কবাটাই তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঘৃণা দিয়ে ত্যাগ করাই যায়—ভোগ করা অসম্ভব। এখন সে দেখল, ব্যাপক ঘৃণার প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে আল্লোর শিখার মতো একটা কিছু উঠে আসছে—তাকে অবশ করে ফেলছে। দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সেই আলোয় সব ঘৃণা সরে যাচ্ছে পলকে পলকে। আর সে জড়িয়ে ধরল শীলাকে। চুমু খেয়ে বসল হঠকারিতায়। শীলা কিন্তু চমকাল না। নড়ে উঠল না। স্থির অবিকৃত ঠোঁটে নিল চুমুগুলো। তারপর বিভলবারটা রাহুলের হাতে দিয়ে বলল, যার হাতে যা মানায়। ভেট ! আমি কি মানুষ মারতে পারি!

রাহুল বলল, তোমাকে মানুষ মারা আমি শেখাব।

বিকেলে মণিশঙ্কর এল মোটর সাইকেলে। রাহুল চুপচাপ শুয়ে ছিল। মোটর সাইকেলের আওযাজ শুনে উৎকর্ণ হয়েছিল সে। অরুণ ইটখোলার দেখাশোনায় ব্যস্ত। দরজায় ধাক্কা আর অরুণের নাম ধরে ডাকাডাকি শুনেও মণিশঙ্করের কথা ভাবেনি রাহুল। আসলে, তাকে ভুলে গিয়েছিল সে। শীলা এসে দরজা খুলতে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিল অকারণে। তারপর মণিশঙ্করের আবির্ভাব।

এসেই বিছানার পাশে বসে হন্তদন্ত বলল, কী মুশকিল! এত সব কাণ্ড হয়েছে, একটুও জানতুম না ভাই। আজ সকালে অরুণের কাছে শুনলুম। অরুণ বলেনি যে আমি এবেলা আসব?

রাহুল মাথা দোলাল।

ভুলে গেছে তাহলে। ....মণিশঙ্কর কৌটো থেকে পান বের করে মুখে দিল। .... ওর বড্ড ভুলো মন। অবশ্য, কাজের চাপও তো কম নয় বেচারার। কুমড়োদহের রাস্তায় ইটের নতুন অর্ডার পেয়েছে বলছিল। বেশ আছে ও। ওই টিঙটিঙে শরীরে যা খাটে ভাবা যায় না! যাক্ গে রাহুলবাবু। কাণ্ডটার জন্যে সত্যি বড় দুঃখিত ভাই। ময়নাচকের আসল লোকেরা কিন্তু মোটেও বদমাস নয়। এই টাউনশিপ হবার পর কোত্থেকে সব নানা ধরনের লোক হাজির হয়ে জায়গাটা নবক করে তুলেছে। আমি—মণিশঙ্কর হেসে বলল,—অন বিহাফ অফ দি গুডপিপল অফ ময়নাচক, অ্যাপলজি চাচ্ছি রাহুলবাবু। শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মশায়ের ছেলে আপনি, আপনাকে আঘাত কবা তো দূবের কথা—কটুকথা কেউ বলবে, ভাবতে আমার অবাক লাগছে!

রাহুল চুপ করে বসে থাকল।

এখন কেমন আছেন? চলফেরা করতে অসুবিধে হয় না তো? একটা বাপার আমি বুঝিনে মশাই—অরুণ কেন এটা পুলিশে জানাল না। এমনি করেই তো জানোয়ারগুলো আস্কারা পাচ্ছে। এই দেখুন না, হাইওয়েতে প্রায়ই রাহাজানি হচ্ছিল রাতের বেলা। এমন কি একদিন দিন-দুপুরেই ব্রিজেব কাছে তিনটে লরি আটকে কারা মাল নামিয়ে নিল। ড্রাইভারদের দুজনকে স্ট্যাব করে নদীতে ফেলে দিল—অন্যজন এখনও হাসপাতালে। পুলিশ এল যথারীতি—কিন্তু কোন ফয়সালা হল না।

রাহুল বলল, কারা এসব করছে জানেন নিশ্চয়?

মণিশঙ্কর তেতোমুখে বলল, কারা করছে সেটা তো সবাই দেখছে চোখের সামনে। তাদের পুলিশ ধরছেও। কিন্তু মজার কথা—কী ফুসমন্তরে তাদের ছেড়ে দিতে পুলিশ পথ পায় না! আসলে, সবারই ধারণা—তলায় খুব বড় আদমি আছে মশায়। বুঝলেন? জব্বর আদমি আছে পিছনে। আমি অবশ্য কোন সাতে পাঁচে নেই। কিন্তু ভয় হয়। হবে না কেন? ওই মাঠের মধ্যে থাকি। ফসলটসল ওঠে। বাইরে কোথাও ট্রাকে পাঠাতে ভরসা পাইনে। পাঠালে দরটর ভাল পেতুম। অথচ সব ফসল লোকাল ফড়েদের কাছে লোকসানে ঝেড়ে দিচ্ছি। কে রিস্ক্ নিতে যাবে মশাই!

রাহুল শীলাকে ডেকে চায়ের কথা বলবে ভাবছিল, সেই সময় শীলা চায়ের ট্রে হাতে হাজির। নমস্কার করে বলল, কেমন আছেন শঙ্করদা?

মণিশঙ্কর বলল, আরে শীলা যে! কেমন আছেন? কই, আর গেলেন না যে আমাদের ওখানে? আমার স্ত্রী সবসময় আপনার কথা বলে। তেপান্তর মাঠে একা থাকি সবাই.... বাইরের কেউ গেলে কত খুশি হই জানেন? বাই দা বাই, শীলা, আপনার পরীক্ষার কী হল? এবারই তো? ডেট পিছিয়ে গেছে শুনলুম—খবর নিতে হবে।

শীলা সলজ্জ হেসে বলল, পরীক্ষা দিয়ে কী হবে? প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার কোন মানে হয না। আমি সব ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া প্রাইমারি মাস্টারিটাই যখন ছেড়ে দিলুম—তখন উপায় ছিল না।

মণিশঙ্কর বলল, সর্বনাশ! তবে যে ও বলছিল—আপনি ছুটিতে আছেন! কাজটা ভাল করেননি শীলা। আপনার বউদিও মাঝে-মাঝে খুনসুটি করে। বলে—দুঁদে জোতদারের বউ হয়ে পাঠশালায় রোজ ছেলেঠ্যাঙাতে যাই—মর্যাদা থাকে না। কিন্তু আমি বরাবর স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। গ্রামের মেয়ে— বাপের বাড়িতে না হয় ভালো সুযোগ পাওনি, আরে বাবা, আমার ঘরে এসে তো অসুবিধে নেই? জানেন রাহুলবাবু, ... হাসতে হাসতে মণিশঙ্কর বলল, রোজ দুবেলা আমার কাজ হচ্ছে ওই বাহনে স্ত্রীকে বহন করা। অর্থাৎ চার মাইল দূরে স্কুলে পৌঁছে দিই এবং ফেবত নিয়ে আসি! হাঃ হাঃ হাঃ!

রাহুল শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি প্রাইমারি স্কুলের দিদিমণি ছিলে? বলনি তো? আশ্চর্য, অরুণদাও বলেনি!

শীলা বলল, বলবার মতো নয় বলেই কেউ বলেনি।

মণিশঙ্কর বলল, আরে—শীলা আর আমার গিন্নি এক খোঁয়াড়েই দ'বছব কাটাল যে! সে থেকেই তো পরস্পর চেনাজানা। তা নাহলে ইটখোলার অরুণ সাঁতরার সঙ্গে আমার কী!

সে হেসে হাসতে লাগল। রাহুল বলল, রেজিগনেশন দিয়েছ কদ্দিন শীলা?

শীলা জবাব দিল, তিনমাস আগে একটা ছুটির দরখাস্ত করেছিলুম—তারপর চুপচাপ আছি। দাদাবউদিও বলছিল—আর গিয়ে কাজ নেই। চাকরি কবা তো পরীক্ষাপাসের জন্যে। পাস করে তো ডানা গজাবে না! কী বলেন শঙ্করদা?

মণিশঙ্কর বলল, উঁহু—গজাবে। দেখুন—সেযুগে বাস করছি, হঠাৎ দুম করে পুরুষ ব্যাটাছেলে পটল তুলল—মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। বলবেন—আমার জোতজমা আছে-টাছে। কিন্তু ও তো অনিশ্চিত সম্পত্তি। কাল সরকার কেড়ে নিলেই হল—নয়তো কোন পলিটিক্যাল পার্টি এসে ঝাণ্ডা পুঁতে দখল নিল। এ আমার জেনেশুনে বিষপান মশাই—বুঝলেন রাহুলবাবু? ফসল-ফলানোর একটা নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া মানুষের ভিড় থেকে এইভাবে দূরে থাকা যায়—গাছপালা উদ্ভিদজগতে একটা শান্তিও আছে। যাক্ গে রাহুলবাবু, চলুন না একবার আমার ওখানে। ভাল লাগবে। রাত্তিরটা থেকে যেতেও পারেন—কোন অসুবিধে নেই। যাবেন? ব্যাকসীটে বসিয়ে নিয়ে যাব—কোন কষ্ট হবে না। চলুন না!

রাহুল শীলার দিকে তাকাল। শীলার চোখে সম্মতি ছিল। রাহুল বলল, শরীব এখনও একটু দুর্বল—তা হোক। যেতে ইচ্ছে করছে। চলুন—বেরোচ্ছি।

মণিশঙ্কর উঠল। শীলাকে বলল, তাহলে কথাটা শোভনাকে জানাতে হয়। কী মুশকিল, আপনার জয়েন করার দিন গুনছে ওদিকে।

শীলা হাসল মাত্র।

একটু পরে বেরুল রাহুল। শীলার সামনে রিভলবারটা প্যান্টের পকেটে ভরল—কিন্তু কী ভেবে কার্তুজগুলো বের করে অন্য পকেটে রাখল। শীলার চোখে উদ্বেগের ছাপ লক্ষ্য করে সে চাপা গলায় বলল, নাঃ—আপাতত মানুষ মারবার দরকার হবে না। এমনি রাখলুম কাছে। আর একটা কথা—যদি দ্যাখো রাত্তিরটা ওখানে রয়ে গেছি, তোমরা হইচই করো না।

বাজার পেরিয়ে একমাইল ফাঁকা মাঠের পর ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকে নামল ওরা। একফালি ইটের পথ নদীর পাড় বেয়ে চলেছে উঁচু বাঁধের ওপর। বনজঙ্গল আছে কিছুকিছু। বিকেলে লালচে আলোয় পরিবেশ বেশ মনোরম দেখাচ্ছিল। এখানে কোথাও কোন রুক্ষতা নেই। নদীর বুকে বাঁধ

রয়েছে। তার ফলে একদিকটা অতল নীলাভ জলে ভরা। সেখান থেকে পাম্পিং মেশিনের আওয়াজ আসছে। অন্যদিকে ঘন গাছপালার ভিতর একতলা বাংলোধরনের ছোট্ট একটা বাড়ি। সুদৃশ্য ফুলবাগিচা—কলাঝোপ, ইউকালিপটাস আর দেবদারু গাছের সারি। বেশ রুচি আছে লোকটার। শুধু ভাবতে অবাক লাগে যে এও জীবনকে অনিশ্চিত আর নিরাপত্তাবিহীন ভেবে উদ্বিগ্ন নিরন্তর। তাই বউকে সামান্য প্রাইমারি টিচারের চাকরি করতে আপত্তি করে না। বরং খুশি থাকে। নাকি টাকা নামে সর্বনাশা শক্তির একটা টানের কারচুপি সবই? সবাই টাকা চায়—যে কোনভাবে, যে কোন জায়গা থেকে, যে কোন মূল্যে! রাগে রাহুলের মেজাজ ফের খারাপ হয়ে গেল। টাকার লোভ সবাইকে যেন হিজড়ে করে ফেলেছে ক্রমশ।

মণিশঙ্করের বলার অপেক্ষা ছিল মাত্র—রাহুল থাকতে চেয়েছিল রাত্রে। কারণ, একটা উদ্দেশ্য ছিল তার। ব্রিজের কাছেই রাহাজানি হয়। এদিকে সন্ধ্যার দিকে জনা চার সশস্ত্র পুলিশ নাকি সেখানে হাজির থাকে—তারা ভোরঅব্দি পাহারা দ্যায়। তা সত্ত্বেও রাহাজানি আটকানো যায় না। কেন যায় না? তাহলে কি ড্রাইভারদেরও কোন কারচুপি থাকে? মুক্তকেশী হোটেলে ট্রাক ড্রাইভারদের সে দেখেছিল। গাড়ি থামিয়ে ওখানেই কেউ কেউ স্নান আহার বা বিশ্রাম সেরে নেয়। কাজেই স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাদের আলাপ-পরিচয় থাকা সম্ভব। ওদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হলে বাবার কাছে থাকাটাই তার সবচেয়ে ভাল সুযোগ ছিল। কিন্তু কোনভাবেই সেটা সম্ভব নয়। কাজেই মণিশঙ্কর আর তার বাড়িটা তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে—রাহুল একথা ভেবেছিল। ব্রিজের কাছেই বাড়ি—মণিশঙ্কর খেয়ালি মানুষ, রাত জেগে সে নিজের ফসল পাহারা দ্যায়। শুধু তাই নয়, তার একটা ছোটখাটো লাইব্রেরিও আছে—সেখানে সে তার অশিক্ষিত পটুত্বের জোরে উদ্ভিদবিদ্যার চর্চাও করে। তার পক্ষে ওইসব রাহাজানি অনেক কিছু জানা থাকা সম্ভব মনে হয়েছিল রাহুলের। প্রাণের দায়ে খামখেয়ালি সরল লোকেরাও অনেক সময় মারাত্মক কথা মুখ টিপে হজম করতে বাধ্য হয়।

মণিশঙ্করের স্ত্রী শোভনা গাব্দাগোব্দা মুটকি মেয়ে। খুব জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করে। হাসি পাচ্ছিল রাহুলের। শোভনা তার পড়ার জগৎ ছাড়া আপাতত কিছু আমল দেয় না যেন। সে রাহুল সম্পর্কে কোন কৌতূহলই প্রকাশ করল না। রাতের খাওয়া চুকে গেলে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর তার মুখে রোমের ইতিহাস তারস্বরে বেরোতে থাকল।

মণিশঙ্করকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল স্ত্রীর আচরণে। রাহুল সেটুকু দূর করার জন্যে সরলভাবে বলল, সত্যি একেই বলে সাধনা। বউদির কিছু হবে। জানেন শঙ্করদা? আমি মুখ খুলে পড়তুম না বলে বাবা কী মার না লাগাতেন! মুখ খুলে পড়তে পারিনি বলেই হয়তো আমার কিছু হল না জীবনে। মারামারি করেই কাটালুম খালি।

মণিশঙ্কর অন্যমনস্কভাবে বলল, বড্ড গরম লাগছে না? বরং চলুন নদীর ধারে-ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। খুব ভাল লাগবে। হাঁটতে কষ্ট হবে না তো?

রাহুল সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল। .... মোটেও না। আমি পুরো ফিট এখন।

দুজনে বেরিয়ে এল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার আছে। খোলামেলায় বাতাস বইছে উত্তাল। সামনের দিকে নদীর পাড় অব্দি ছড়ানো জঙ্গলে গাছপালার শোঁ শোঁ শনশন শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে বেশ উঁচুতে ময়নাচকের আলোগুলো জ্বলছে। আকাশটা সেখানে সামান্য হলুদ। বাঁধে দাঁড়িয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল রাহুল। ব্রিজের বিশাল ফ্রেম অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মণিশঙ্করের হাতে টর্চ। মাঝেমাঝে সে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছিল। সে বলল, এখানে সবই ভালো—কিন্তু পোকামাকড়ের উপদ্রব আছে কিছুটা।

রাহুল বলল, সাপ?

মণিশঙ্কর জবাব দিল, হুঁ। নদীটা বিহারের পাহাড় এলাকা হয়ে এসেছে। তার ফলে রাজ্যের পাহাড়ী সাপ বর্ষায় ভেসে এসে আশ্রয় নেয়। গতবার এখানে একটা প্রকাণ্ড অজগর মেরেছিলুম।

বলেন কী?

আর বলবেন না। প্রথম প্রথম অনেকবার জোর বেঁচে গেছি সাপের হাতে। তারপর জঙ্গলগুলো সাফ হয়ে গেলে উপদ্রব একেবারে কমে গেছে। আসলে কী জানেন? মানুষকে সবাই বড্ড ভয় করে। .... মণিশঙ্করের বক্তৃতা শুরু হল যথারীতি।.. রাহুলবাবু, সত্যি বলছি—মানুষকে ভয় করা উচিতও। মাঝে মাঝে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়—এ কী জাত মশাই এই প্রাণিজগতে গজিয়ে উঠেছিল। অদ্ভুত, ব্রিলিয়ান্ট, সাংঘাতিক! কেন জানেন? এরা আইন বানাতে জানে। রাষ্ট্র গড়তে জানে, রাষ্ট্রের নামে মানুষ আইন চালায়। আর এই রাষ্ট্রই হল প্রবঞ্চনার মোক্ষম উপায়। পণ্ডিতেরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে অনেক বলেছেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে আমি বুঝেছি—রাষ্ট্র হল বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ক্ষমতাবান বদমাসের একটা মজার খাঁচাকল। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নির্বোধ নিরীহ ছাপোষা টাইপের। তার ফলে তারা খাঁচাকলেই আটক থেকে কোন রকমে একটা সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকে। কষ্ট কি টের পায় না? পায়। মাঝে মাঝে তাদের সেই কষ্ট পাওয়ার সুযোগ নেয় বুদ্ধিমান ক্ষমতাবানেরা—বিদ্রোহ ঘটায় চলতি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। সেটা ভেঙে ফেলে। কিন্তু তার জায়গায় ফের গড়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র, নতুন একটা খাঁচাকল। নতুন তার আইনকানুন। সুতরাং ফের কষ্ট আর সামঞ্জস্য করে বেঁচে থাকা। ....রাহুলবাবু, রাষ্ট্রই মানুষের—আই মিন ব্যক্তি-মানুষের কাঁধে এক জগদ্দল বোঝা। এ বোঝার দাসত্ব সারাজীবন তাকে সইতে হয়। একটু সচেতন হলেই তো আমি বুঝতে পারি, আমার যন্ত্রণাটা কোথায়? আমার প্রকৃত শত্রু কে? ইয়েস—রাষ্ট্র। অতএব মনে মনে আমার যত ঘৃণা তার ওপর। আর তাকে ঘৃণা করি বলেই মানুষও আমার ঘৃণার পাত্র—সরি, ঘৃণা বলব না—করুণার পাত্র। আমি ভেবেই পাইনে কী করে মানুষ এই বিশ শতকের দুদশক পেরোতে চলেছে—তবু রাষ্ট্রের কারচুপি ধরতে পারল না! ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের মৌলিক বিরোধটা আজও কোন সার্থক রূপ পেল না মানুষের ইতিহাসে। কেউ রাষ্ট্রের দিকে থুথু ছুঁড়ল না!

মণিশঙ্কর সশব্দে থুথু ফেলল। হয়তো তার মুখে বিকৃতি ফুটছে। অন্ধকারে—হয়তো তার শরীরের শিরা ও পেশীগুলো ফুলে শক্ত হয়ে উঠেছে—রাহুল অনুমান করল। সে কোন মন্তব্য করল না। শুধু অবাক হল।

মণিশঙ্কর ফের মুখ খুলল। রাষ্ট্র চালানোর যে যন্ত্র, তার নাম সরকার। তার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব টের পাইয়ে দ্যায় যা কিছু—তা সবই আমার ঘৃণার বস্তু। পুলিশ আর মিলিটারি দিয়ে আমাকে গায়ের জোরে তার প্রতি অনুগত রাখে। ইচ্ছে করে, দিই একের পর এক ...

রাহুলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী?

মণিশঙ্কর কেমন হাসল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। পিশাচেরা কি এমনি হেসে ওঠে? রাহুল পিশাচের গল্প শুনেছে—পিশাচের অস্তিত্বে তার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তার মাথায় পিশাচ শব্দটাই এসে গেল। সে মণিশঙ্করের হাসি শুনে চমকে উঠল। অস্বস্তি টের পেল। বাঁধের নীচে ডানদিকে নদী। নদীর বুকে এখানেই উঁচু বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। ওপাশটা শুকনো—বালির চড়া, অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোয় ঝকমক করছে নিচে। মণিশঙ্কর বলল, ওখানে গিয়ে বসবেন?

কেন কে জানে, গা ছমছম করল রাহুলের। সেই মুহূর্তে মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল। আড়ষ্টভাবে সে অনুসরণ করল তাকে। টর্চের আলোয় সাবধানে পাড় বেয়ে নিচে নামল ওরা। বাঁধের ওপর দাঁড়াল। বাঁধের কিনারা ছুঁয়ে জল চকচক করছে। মণিশঙ্কর বলল, বসুন।

বসল দুজনে। মণিশঙ্কর বলল, কথাগুলো নিঃসঙ্কোচে আপনাকে বলে ফেললুম। বলতে পারলুম। কারণ, বয়স আমার চেয়ে যত কম হোক আপনার আমি আপনাকে পছন্দ করি রাহুলবাবু!

রাহুল বলল, কেন? আমার মধ্যে পছন্দ করার মতো কী পেলেন?

অনেক। প্রথমত আপনিও আমার মতে বিশ্বাসী।

কেমন করে বুঝলেন তা?

আমি আপনাকে সবিশেষ জানি। আইন আপনার চক্ষুশূল—রাষ্ট্র আপনার শত্রু।

রাহুল হেসে উঠল। বলল, ধেৎ! কী যে বলেন!

মণিশঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, আপনি জন্মবিদ্রোহী রাহুলবাবু। হলফ করে বলুন তো এ যাবৎ যা কিছু করেছেন—তা কি টাকা রোজগারের জন্যে করেছেন, নাকি গায়ের ঝাল ঝাড়তে?

রাহুল একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, কে জানে!

আপনার বাবা গতকাল সব বলেছেন আপনার ইতিহাস। উনি দুঃখ করছিলেন—ওর ওই শক্তি, ওই বিদ্রোহের জ্বালাটা যদি রাজনীতির পথে আত্মপ্রকাশ করত, উনি খুব খুশি হতেন। যাই হোক—আমি অবশ্য রাজনীতি পছন্দ করিনে। কারণ রাজনীতি মানেই রাষ্ট্রের খাঁচাকল ব্যবস্থা আর ক্ষমতাবানদের শাসন শোষণ—ভোগ-দখল প্রবৃত্তি চরিতার্থতার উপায় কায়েম রাখা। কাজেই সে পথে না গিয়ে ভাল করেছেন। কিন্তু রাহুলবাবু.... হঠাৎ মণিশঙ্কর কণ্ঠস্বর চাপা করল। ফিসফিস করে বলল, ময়নাচক এসেছেন—সে কি সত্যিসত্যি বাবার কাছে থাকতে? লুকোবেন না। আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি ছাপোষা মানুষের মতো নিরীহভাবে বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে বাবার কাছে চলে এসেছিলেন! ওটা আপনার চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। এখানে আসবার উদ্দেশ্য কী আপনার?

রাহুলের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কে এই মণিশঙ্কর! সে বাঁহাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকাতে গিয়ে দেখল, ঢুকছে না। উঠে না দাঁড়ালে সেটা সম্ভব নয়। অতল জলের একেবারে কিনারায় সে বসে আছে। তার মাথা ঘুরছিল। দুর্বলতাটা ফের জেগে উঠছিল। সে সামলানোর চেষ্টা করে বলল, আপনার প্রশ্নটা খুব অদ্ভুত। এর কী জবাব দেব, খুঁজে পাচ্ছিনে।

মণিশঙ্কর খুকখুক করে হাসল।...... অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে—তাই না?

রাহুল একটু রাগের ঝাঁঝে জবাব দিল, না।

মণিশঙ্কর তার রাগটা আমল দিল না। বলল, অরুণের একজন শক্ত-সমর্থ বডিগার্ড দরকার হয়ে পড়েছে। সানু চ্যাটার্জি তাকে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে সমানে। তাই অরুণ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অরুণ আপনাকে এখানে এনেছে।

রাহুল বলল, ব্ল্যাকমেইল? সে কী! কেন?

মণিশঙ্করের মুখের পানের গন্ধ ঝাপটা মারল রাহুলের নাকে। সব জেনেও লুকোচ্ছেন রাহুলবাবু।

রাহুল বিরক্তভাবে বলল,—কিচ্ছু জানিনে আমি। অরুণদা একটা ব্যাপার বলবে বলেছিল—এখনও বলেনি। আপনি ভুল করছেন শঙ্করবাবু, তাছাড়া এতে আপনার উৎসাহেরও কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে কিন্তু।

মণিশঙ্কর বলল, সত্যি বলছেন, অরুণ আপনাকে আনেনি?

বিশ্বাস করা না করা আপনার খুশি। চলুন, উঠব।

রাগ করবেন না প্লিজ। মণিশঙ্কর তার কাঁধে হাত রাখল। ...বসুন। ঘরে গরমের চেয়ে খোলামেলায় কিছুক্ষণ গল্পগুজবে আপত্তি কী?

এ ঠিক গল্পগুজব নয়, শঙ্করবাবু! আপনি কেন এসবে ইনটারেস্টেড, শুনি?

মণিশঙ্কর অন্ধকার জলে সশব্দে থুথু ফেলল। তারপর বলল, আমার ইনটারেস্ট খোলাখুলি বলছি। সানু চ্যাটারজি আমার শত্রু—ঘোর শত্রু বলতে পারেন। সে আমাকেও ব্ল্যাকমেইল করে। অরুণ আমার বন্ধু মানুষ—তারও শত্রু সানু। এদিকে আপনি হচ্ছেন অরুণের লোক—সানু আপনাকে মেরেছে, অতএব সানু ইজ আওয়ার কমন এনিমি। তাকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। তার ফাঁদে ভুলেও পা দেবেন না। শুনলুম, সে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চায়। সাবধান, সানু সাংঘাতিক লোক!

রাহুল মুখ তুলে বলল, তারপর?

কথাটা জানিয়ে রাখলুম—এইমাত্র। আপনি সতর্ক থাকবেন সবসময়। নন্দর সাধ্য হবে না আপনার ক্ষতি করতে—কিন্তু সানু আপনাকে ছাড়বে না। ওর গায়ে হাত তুলেছিলেন—ও কখনো সইবে না। তাই ..... বলতে বলতে হঠাৎ মণিশঙ্কর ঘুরে নদীর শুকনো দিকটায় টর্চের আলো ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল। চাপা স্বরে বলল, জাস্ট ইনটুইশান! মনে হল, কাদের পায়ের শব্দ পেলুম যেন।

রাহুল উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। টর্চের আলো ঘুরছিল বালির চড়ায়—নদীর ভিতর অন্ধকার চিরে যাচ্ছিল বারবার। কাকেও দেখা গেল না। রাহুল বলল, কেউ না। চলুন ফেরা যাক্।

দুজনে উঠে পাড়ের বাঁধে এল। তারপর রাহুল বলল, শংকরবাবু প্লিজ—কিছু মনে করবেন না। আমি বরং ফিরে যাই অরুণদার ওখানে।

মণিশঙ্কর শশব্যস্তে বলল, না—না, সে কী! এই শরীরে এতদূর যাবেন কী করে? তাছাড়া অন্ধকার রাস্তা। নাঃ ভারি ছেলেমানুষ আপনি মশাই! রাগ হয়েছে আমার কথায়—তাই না? দেখ কাণ্ড। আমি খামখেয়ালি লোক—কী বলতে কী বলি। দূর, দূর! ফরগেট ইট। চলুন আসল কথাটা তো বলাই হয়নি!

রাহুল গোঁ ধরে বলল, না। আমার ভালো লাগছে না এখানে। আমি যাই। পরে আসব'খন।

সে হন হন করে হাঁটতে থাকল। মণিশঙ্কর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। যা ভাবে ভাবুক, রাহুল বিরক্ত। প্রথমে ওই লোকটার কথাবার্তায় কেমন রহস্যের আভাস পাচ্ছিল, এখন তার মনে হচ্ছে—আসলে সব তাতে নাকগলানো অভ্যাস আছে ওর। সম্পূর্ণ হার্মলেস মানুষ মণিশঙ্কর। সব তাতে কৌতূহলী। গায়েপড়া ভাব আছে। অদ্ভুত সব কথা ভাবে—অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা মগজে নিয়ে ঘোরে। তা না হলে কেন এই বনে প্রান্তরে নির্জনে পড়ে রয়েছে সে? রীতিমতো বাতিকগ্রস্ত লোকটা। ওর বউ বেচারা ভাগ্যিস বোকাসোকা মেয়ে—উদ্দেশ্যহীন পড়াশোনা ডিগ্রি পরীক্ষাপাসের নেশায় পড়ে রয়েছে বলেই রক্ষে। তা নাহলে কবে বিদ্রোহ করে বসত স্বামীর ওপর।

ব্রিজ লক্ষ্য করে সে হাঁটছিল। আশ্চর্য, মণিশঙ্কর তাকে টর্চটা দিলেও তো পারত! দিল না। হয়তো এত হাঁ হয়ে গেছে যে কথাটা মাথায় এল না! কিন্তু ওর কথা যদি সত্যি হয়, সানু কেন ব্ল্যাকমেইল করছে অরুণকে? শীলা বলছিল, অরুণের অনেকগুলো ফুটো আছে। কিসের? আর সানু কেন মণিশঙ্করকেও ব্ল্যাকমেইল করে? মণিশঙ্কর বা অরুণ যদি খুলে না বলে সব, সানুর সঙ্গে ভাব হয়ে গেলে কৌশলে জানা যেতেও পারে। একটা কথা মাথায় আসছে এ মুহূর্তে—মণিশঙ্করও যেন রাহুলকে পেতে চায়—দেহরক্ষীর মতো। সেও সম্ভবত রাহুলের সাহায্য চায়।

বডিগার্ড! সবাই নিজের নিজের বদমাইসির কারণে একটা করে রক্ষাকবচ চাইছে। রাহুলকে বেছে নিয়েছে সেজন্যে। কী শালা কপাল! নেপালদাও বলত—রাহুল থাকতে আমার গায়ে গুলি-চাকু বিঁধবে না। এই জন্যেই কি হৃষিকেশ মাষ্টারমশাই তার জন্ম দিয়েছিলেন পৃথিবীতে?

ব্রিজটা তখনও সামান্য দূরে—বাঁধের দুপাশে টানা জঙ্গল এখানটায়, আচমকা একঝলক টর্চের আলো পড়ল সামনে থেকে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল রাহুলের। অভ্যাসবশে সে পকেটে বাঁহাত ভরে জিগ্যেস করল—কে? কে?

প্রথমে ভেবেছিল—ব্রিজের সেই পুলিশেরা, পরে চমক খেল। বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথচ আলো এগিয়ে আসছে। সে পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করার আগেই এবং আলো নিভে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনজন লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুপাশের অন্ধকার থেকে।

তার মুখে কাপড় গুঁজে দিলে রাহুল চিৎকার করার সুযোগ পেল না। তাকে জোর করে শুইয়ে দিল তারা। একজন ফিসফিস করে বলল, এখানে না—নদীতে নিয়ে চল।

আরেকজন বলল, ধুস্! এখানেই চালিয়ে দে।

চোখ দুটো খোলা ছিল রাহুলের। সে অনুমান করল. একজনের হাতে ছোরা রয়েছে। তার গলা পোঁচিয়ে কাটা হবে—তাতে কোন ভুল নেই। এ মুহূর্তে শুধু শীলার মুখটাই ভেসে উঠছিল মনে। আর কিছু নয়—কেউ নয়। সে চোখ বুজল। অনেক মৃত্যু সে অনেককে দিয়েছে- -এবার নিজের পালা পড়েছে। নিস্পন্দ থেকে সইতে হবে। সে জানত—এটাই নিয়ম। অমোঘ আইন। তবে খুব শিগগির বিনা প্রস্তুতিতে এসে গেল—তাই একটু কষ্ট। এরা কে—তা জানবার ইচ্ছে মনে নেই, হয়তো আর প্রয়োজনও নেই। কেন তার মৃত্যু হচ্ছে—তার কৈফিয়তও অপ্রাসঙ্গিক। শুধু মনে হচ্ছে, এত তাড়াতাড়ি! এত হঠকারিতায়। চোখ বুজে সে মুহূর্তকাল আগে দেখা নক্ষত্রের প্রতিবিম্বে চেতনাকে রাখল। সেখানে শীলাকে দেখল সে। শেষ সময় এইটুকুই যেন সান্ত্বনা। শীলা নামে পৃথিবীতে একজন ছিল—তার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল একদিন। তা না হলে কত আগে সে কতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল—শেষ অব্দি জীবন এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শীলার ঠোঁটে তখনও চুমু দেওয়া বাকি বলে।

হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। কার অমানুষিক কণ্ঠস্বর শুনল সে। এক ঝলক তীব্র আলো ফুটল ভয়ঙ্কর অন্ধকারে। একটা ঝড় শুরু হল যেন। গাছপালার শব্দ গেল বেড়ে। চোখ খুলতে ইচ্ছে ছিল না—সাধ্যও ছিল না, দুচোখের পাতা অবশ হয়ে গেছে। তারপর মনে হল সে তলিয়ে যাচ্ছে অনন্ত শূন্যে। ......

চোখ খুলে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল রাহুল। তারপর বলল, তুমি গঙ্গা না?

গঙ্গা তার পাশে বসে আছে। সে ভ্রূ কুঁচকে বলল, গঙ্গা কে? ছোটমা বলতে পারছ না?

রাহুল ধুড়মুড় করে উঠে বসল। সকাল হয়েছে। ঘুম ঠিক সময়ে ভেঙেছে। কিন্তু এখানে কেন সে? ঘরটা চিনতে পারল না সে। অরুণের ঘরেই সে ঘুমাচ্ছে ভেবেছিল—সেখানে গঙ্গা এসেছে মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার অচেনা ঘরটা তাকে চমকে দিল। পরক্ষণে রাত্রে মণিশঙ্করের ওখানে বাঁধের ওপর জঙ্গলের ব্যাপারটা তার মনে পড়ে গেল। তাহলে সে ফের বেঁচে গেছে! কে বাঁচাল তাকে? এখানে আনলই বা কে? সে গঙ্গার দিকে সপ্রশ্ন তাকাল। তখন দেখল, গঙ্গার দুপায়ের ফাঁকে একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে মুখটা গঙ্গার বুকের নিচে গুঁজে একটু কাত হয়ে ফ্যালফ্যাল করে দেখছে তাকে। অবিকল তার বাবার মতো চেহাবা। রোগা গড়ন—বড় বড় চোখ, একটু পিঙ্গল—গঙ্গার চোখ দুটো শুধু পেয়েছে।

গঙ্গা শান্তভাবে তাকিয়ে বলল, অবাক হচ্ছ তাই না? মণিশঙ্করবাবু কাল রাত্রে তোমাকে এখানে রেখে গেছেন। সব শুনলুম। নন্দদের ঘাঁটিয়েছ—ওরা যা বজ্জাত সবাই জানে। ভাগ্যিস, মণিশঙ্করবাবু গিয়ে পড়েছিলেন! তা এসেছ—বেশ করেছ। কিন্তু অরুণের পাল্লায় পড়তে গেলে কেন? আর যেও না ওখানে—এখানে থাকো। তোমার বাবার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ছিল এখানে—আমাকে বিয়ে করে একটু কমলেও যা আছে, তাই যথেষ্ট তোমার পক্ষে।

রাহুল কিছু বলল না। ভ্রূ কুঁচকে ব্যান্ডেজবাঁধা ডানহাতটা দেখতে থাকল। দেখতে দেখতে তার রিভলবারটার কথা মনে পড়ে গেল। সে প্যান্টের পকেটের দিকে হাত বাড়াল।

গঙ্গা বলল, তোমার যন্ত্রটা? আছে—রেখেছি। তোমার বালিশের নিচেই আছে। ইস! তুমি যে এত সাংঘাতিক ছেলে হয়েছ, ভাবতেও পারিনি! ওটা ভেঙে ফেল। ওটা যতক্ষণ থাকবে, তোমার রেহাই নেই।

রাহুল বালিশ তুলে দেখে নিয়ে বলল, এটা তোমার ঘর?

হুঁ—আবার কার? তোমার বাবা পাশের ঘরে আছেন। চা-টা খেয়ে নাও, তারপর দেখা করবে।

রাহুল বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, শঙ্করদা আমাকে এখানে আনলেন কেন?

গঙ্গা জবাব দিল, আমি তার কি জানি। সে নিজের ওখানে রাখলেও পারত—রাখেনি। অরুণবাবুর ওখানেও নিয়ে যায়নি। এখানে আনল। কী ভেবে আনল—সেই বলতে পারে। তখন রাত তো বেশি হয়নি। হোটেল খোলা ছিল। আমি কী করব—অগত্যা ডাক্তারের কাছে খবর দিলুম। তিনি এসে কী ওষুধ খাইয়ে দিলেন। তারপর ....

বাবা জানেন?

না—বলা হয়নি। বলছি। ..... গঙ্গা বাচ্চাটাকে *ঠেলে* দিল। .... যাও, এখন খেলো গিয়ে। পরে দাদার সঙ্গে ভাব করবে, কেমন? দাদা এখন এখানেই রইল—তোমাকে নিয়ে বেড়াবে। লক্ষ্মীসোনা!

ছেলেটি শান্তভাবে চলে গেল। গঙ্গা ফের বলল, চোখজ্বালা করছে। এমনিতে তো রাতে ঘুমোতে পাইনে। হোটেল—তারপর তোমার বাবার পাশে বসে থাকা। .... সে ম্লান হাসল। .... কাল রাতটা বেশ গেল। ওঘরে বাবা বিড়বিড় করছে—এঘরে ছেলে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখছিলে তুমি।

রাহুল জবাব দিল না। কিছু মনে নেই। মাথার ভিতরটা খালি লাগছে। অথচ গঙ্গা, তার কণ্ঠস্বর, তার বসে থাকা, তার চাহনি সবকিছু দিয়ে তাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করছে যেন। ডাইনি গঙ্গা! এত ভালো সে! এত মমতাময়ী। সহজ আর স্বচ্ছন্দ সে!

গঙ্গা উঠল। .... মুখটুখ ধুয়ে নাও। চা খেতে হবে না—গরম দুধ দিচ্ছি।

রাহুল বিছানা থেকে পা বাড়িয়ে বলল, আমি অরুণদার ওখানে যাচ্ছি।

গঙ্গার মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল। সে স্থির তাকাল রাহুলের দিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। তারপর সে বলল, কী আছে অরুণদার ওখানে যে নিজের লোকদেরও পর মনে হয়?

রাহুল অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, এখানেই বা কী আছে যে সবাইকে নিজের লোক মনে হবে?

গঙ্গা কোন জবাব দিল না দেখে সে ফের বলল, নিজের লোকের কথা যদি বলো—আমার কোথাও কেউ নেই। আমি সবসময় নিজেকে একা ভাবতে অভ্যস্ত। এতেই আমি স্বস্তি পাই—ভালো লাগে। কারো বা কাদের সঙ্গে জড়িয়েপড়া আমার স্বভাবের বাইরে।

গঙ্গা বলল, স্বার্থপর—দায়দায়িত্বের জ্ঞান যাদের নেই—ওটা তাদের মুখের কথা রাহুল।

রাহুল একটু হাসল। .... আমি সত্যি স্বার্থপর। আমার দায়িত্বজ্ঞানের বড্ড অভাব আছে। কিন্তু কী করব বলো? যাকে বলে ফ্যামিলিলাইফ—তা আমার কপালে সইবেও না, আর পছন্দও নয়। নিজেকে একা ভাবতে আমার স্বর্গসুখ হয়। আচ্ছা চলি!

গঙ্গা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখমুখে উত্তেজনার ছাপ পড়েছে। সে চাপাস্বরে ঈষৎ বিদ্রূপেব ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, একা ভাবতে নয়—তোমার স্বর্গসুখ যে কিসে তা আমি জানি রাহুল। অরুণের বাড়ি তোমার প্রাণশুদ্ধ কিনে নিয়েছে—সে খবরও জানি! কিন্তু রাহুল, তুমি বোধ হয় ভুল করছ।

রাহুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী বলতে চাও তুমি?

গঙ্গা হেসে উঠল। হাসিটা স্বচ্ছন্দ নয়। ঠোঁটের কিছু ভাঁজ আর উজ্জ্বল চাহনি তাকে একটা সর্বনাশা চেহারা দিল, সে বলল, বলতে চাই যে অরুণের বোনের সঙ্গে সানুর বিয়ের কথা কবে ঠিক হয়ে গেছে। আর সানুকেও তুমি ইতিমধ্যে ভালো চিনেছ। তার মতো বুদ্ধিমান এ এলাকায় আর একটিও নেই। সে একটা কিছু আঁচ করে ফেলেছে। .... গঙ্গার হাসিটা নিভে গেল ক্রমশ। মুখে একটা কঠোর গাম্ভীর্য ছমছম করে উঠল। সে কয়েক মুহূর্ত থেমে ফের বলল, তুমি খুব বিপদের মধ্যে পড়ে গেছ রাহুল—বুঝতে পারছ না! কেন তুমি অরুণের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে গেলে? কী দরকার ছিল? বাবার কাছে থাকতে না চাইলে তো কেন বহরমপুর ফিরে গেলে না তক্ষুনি?

রাহুল প্রথমে রাগে অস্থির হয়েছিল—শেষের দিকে রাগটা পড়ে গিয়ে একটা বিস্ময় কৌতূহল ক্ষোভ মেশানো আলোড়ন এসে গেল তার মধ্যে। সে বলল, কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। আসার পর থেকে যেন কোন অন্ধকার রাজত্বে ঢুকে পড়েছি! আবছায়ার মতো কারা কী সব করছে, স্পষ্ট বোঝা যায় না। কী জায়গা রে বাবা!

গঙ্গা এগিয়ে এল কাছে। .....রাহুল, লক্ষ্মীটি, যা বলছি শোন। তোমার বাবার যা অবস্থা, কদিন আছেন বলা যায় না। এদিকে আমি মেয়ে—কেউ পাশে রইল না, ওই দুধের বাচ্চা নিয়ে কীভাবে এখানে বেঁচে থাকব—কিছু বিশ্বাস নেই। হোটেলের কথা বলছ! তুমি আর পারছিনে রাহুল, বিশ্বাস করো—তখন তো খুব সাহস করে হোটেলের ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলুম, এখন এটা আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একা মেয়েদের পক্ষে এ কি চালানো সম্ভব! তোমার বাবা অসুস্থ হয়ে আর কিছু দেখাশোনা করতে পারছেন না। শেষ অব্দি উঠিয়েই দিতে হবে হয়তো। এ আমার সাজে না রাহুল—আমি খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিলুম। সব মান-সম্মান খুইয়ে এ পথে নামলুম। কিন্তু আর পারছিনে!

রাহুল শান্তভাবে বলল, জানিনে—তুমি যা বলছ, তা সত্যি কি না। কারণ আমি অন্য কথা শুনেছি।

গঙ্গা কথা কেড়ে বলল, জানি, জানি—তুমি কী শুনেছ। আমি নষ্টা মেয়ে। আমি বেশ্যা হয়ে গেছি, ... এইসব তো!

রাহুল বলল, তুমি কী হয়েছ না হয়েছ, তাতে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

গঙ্গার চোখ ছলছল করে উঠল হঠাৎ। সে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কোন দোষ নেই—সব আমার ভাগ্য। তোমার দুঃখটা কোথায়—

রাহুল বলল, আমার কোন দুঃখটুঃখ নেই। আমি চলি।

গঙ্গা ওর কাঁধে হাত রেখে একটু ঠেলে দিল। .... তুমি একটুখানি বসো রাহুল। তোমার সব কথা জানা দরকার। সব শুনে তুমি আমাকে যে শাস্তি দিতে হয়, দিও।

রাহুল একটু ইতস্তত করে বসল। চুপ করে থাকল। গঙ্গাও বসল—সামান্য একটু তফাতে। বিনা ভূমিকায় খুব চাপা কণ্ঠস্বরে সে বলতে থাকল।

.... বাবা রাস্তার কাজে দারুণ লোকসান করেছিলেন। লোকসান হয়তো হত না—লাভই হত প্রচুর। কিন্তু লোকেরা চক্রান্ত করে দরখাস্ত করে বসল ওপরে যে ঠিকঠিক মালমশলা দেওয়া হয়নি, অথচ রোডস এঞ্জিনিয়ার আর সব অফিসার মিলে টাকা খেয়ে বিলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এ রাস্তা আর কালভার্টগুলো নাকি এক বর্ষাও টিকে থাকবে না। ওপরে মন্ত্রীঅব্দি বাবার বিরুদ্ধে আনাগোনা শুরু হল। এনকোয়ারি যা হবার হল। তারপর বাবার বিল তো চুলোয় গেল, কন্ট্রাকটের লাইসেন্সও বাতিল করল ওরা। জনমতের চাপ। ফের সব তুলে-টুলে নতুন করে বানাতে হবে। বাবার পক্ষে তা আর সম্ভব ছিল না। বাবা জোর আঘাত পেলেন। শয্যাশায়ী হলেন। আর উঠলেন না। এদিকে শত্রু যা চাল চেলেছিল, তা কাজে লাগতেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। নিজে কনট্রাক্ট নিল। আশ্চর্য রাহুল, এ যুগে কী যে হচ্ছে, ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সে করল কী জানো? বাবার তৈরি সেই রাস্তায় জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু পীচ ঢেলে আর কালভার্টের সামান্য মেরামত করে সেই পুরো কাজের টাকা পেয়ে গেল। তখন কেউ আর চেয়েও দেখল না যে ভবানীবাবুর খোওয়ার-পীচগুলো কোথায় গেল। দিনদুপুরে এইরকম বিরাট জোচ্চুরি হয়ে গেল লোকের চোখের সামনে। কেউ আর তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করল না পর্যন্ত। কেন করবে? করাই কার বা সাহস হবে! সানু চাটুয্যের দাদাকে লোকে ভক্তি করে বলেই তো ভোট দ্যায় ইলেকশনে। নিরু চাটুয্যের বেনামী কন্ট্রাকটারি—তাও সবাই জানে। সইটইগুলো সানু দ্যায়—আসল কাজ করে নিরুবাবু। সানু বাউন্ডুলে লোক। সংসারের ধার ধারে না। গুণ্ডামি মারামারি করা তার নেশা। তাকে তার দাদা কাজে লাগায় নানা দরকারে। তার ভয়েই সবাই দরখাস্তে সই দিয়েছিল—বুঝতে পারছ নিশ্চয়।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তারপর?

গঙ্গা আঁচলে ঠোঁট মুছে বলল, তারপর তো বাবা মারা গেলেন। মাষ্টারমশাই—তোমার বাবার প্রতি লোকের অবশ্য ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল খুব। সেটা ওঁর অমায়িক ব্যবহারের দরুন। সবার সাথে হেসে কথা বলতেন, সৎ উপদেশ দিতেন। লোকে সৎ উপদেশ বা ভাল কথা মানুক বা না মানুক, শুনতে খুব ভালবাসে কিনা। তা—বাবার মৃত্যুর পর উনি হলেন আমার গারজেন। এদিকে সুযোগ পেয়ে আত্মীয় শরিকেরাও সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা বাধাল। তোমার বাবা খুব তদ্বির তদারক করলেন। কিন্তু কাজে লাগল না। সে বৈষয়িক বুদ্ধি তো ওঁর নেই। শেষে সব খুইয়ে মাত্র ভিটেবাড়িটা রইল। সেইসময় উনি একটু অসুখে পড়লেন। খাটনি হয়েছিল তো খুব। তাই জ্বর—বুকে ব্যথা। পাশের ঘরে প্রতিরাত্রে শুয়ে থাকি। উনি ডাকলে ঘুম ভেঙে যায়। কাছে যাই। একদিন ....

গঙ্গা হঠাৎ থেমে নিজের পা দুটো দেখতে থাকল। রাহুল বলল, থাক্।

গঙ্গা মাথা দোলাল। .... না লজ্জা আমার সাজে না। অন্তত তোমার কাছে লজ্জা করলে সারাজীবন যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। আসলে সবই তো আমাদের সংস্কার রাহুল, তাই না? বেশি লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি তোমার মতো—কিন্তু জীবনের চারপাশে যা ঘটেছে যা দেখেছি তা থেকেই আমার অনেক শেখা হয়ে গেছে। আর তুমি তো জানো—খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী কী বোঝবার আগেই বিধবা হয়েছিলুম। তাই ভিতরে ভিতরে খুব পেকে উঠেছিলুম। যখন বুঝতে পেরেছিলুম যে আর আমার বিয়ে হবে না—তখনই একটা বিদ্রোহ করার ঝোঁক মাথায় এসে গিয়েছিল। দিনে দিনে তত লোভী হয়ে পড়েছিলুম। সেই লোভ আমাকে সাহস যোগাচ্ছিল অনেক। সে সবই তুমি জানতে পেরেছিলে। পারনি রাহুল?

রাহুল বলল, সেকথা থাক্।

গঙ্গা জেদের সাথে বলল, ওকথা এড়িয়ে যাবার নয়। কেন যাবো? কেন আমি অপরাধী হয়ে থাকব তোমার কাছে? আমি তো কোন দোষ করিনি।

শেষ কথাটা বলতে তার গলার স্বর কান্নার চাপে ভেঙে পড়ল। সে আঁচলে চোখ ঢাকল। একটু নত হল! রাহুল তেতো মুখে বলল, কান্নাটান্না আমার ভালো লাগে না।

গঙ্গা সামলে নিয়ে ভাঙা কণ্ঠস্বরে বলল, কাঁদতে দাও আমাকে। বিশ্বাস করো, কতদিন আমি কাঁদিনি। সেই বাবার মরার সময় একবার কেঁদেছিলুম। আর একবার—বলছি সেকথা। কিন্তু আমি যে প্রাণভয়ে কাঁদতে চাই রাহুল। ভিতরে কত কান্না চেপে আছি—কেউ তো জানে না। অথচ কাঁদতে ভয় হয়—লোকে হাসবে। টিটকারী করবে।

রাহুল বলল, তোমার আবার কান্না কিসের? বেশ তো আছ।

গঙ্গা শান্ত হবার চেষ্টা করে বলল, অসুখের সময় তোমার বাবা বুকে হাত বুলিয়ে দিতে বলতেন। এত শ্রদ্ধাভক্তি করতুম, আপনজন ভাবতুম ওঁকে। বাবার অভাব আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু একরাত্রে বুকে হাত বুলোতে গিয়ে হঠাৎ উনি আমাকে ....

গঙ্গা ফুঁপিয়ে উঠে দুহাতে মুখ ঢাকল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর রাহুল বলল, বুঝেছি। কিন্তু ওঁর কাছে শুনলে হয়তো অন্য রকম শুনব।

গঙ্গা সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, না। আমি যা বলছি, সব সত্যি। আমাকে উনি যেন বশ করে ফেলেছিলেন। খারাপ লাগত। কষ্ট হত। কিন্তু ওঁকে চটাতে সাহসও পেতুম না। আর আস্তে আস্তে আমি ওঁর কাছে অবশ হয়ে পড়ছিলুম। মনে হচ্ছিল, রাগ করে উনি চলে গেলে আমি খুব অসহায় হয়ে পড়ব। শুধু ভাবতুম, উনি না থাকলে আমার কী হবে! শিউরে উঠতুম। রাহুল, আমাকে পাপের পথে টানবার লোক তখন চারপাশে অনেক ছিল—এখনও আছে। কিন্তু পুণ্যের পথে টানবার মতো উনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। যদি বলো, কী সেই পুণ্য—আমি বলব, ঘর-সংসার। আমি বিধবা—আমার ঘরসংসার আর হবে না, এটা যে মনে মনে কোনদিন মেনে নিতে পারিনি। আগেই বলেছি না? লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল।

রাহুল বলল, এর কোনটাতেই আমি দোষ দিইনে তোমাকে। আমার প্রশ্ন অন্যখানে। বাবাকে তুমি ঠকিয়েছ—সাংঘাতিকভাবে ঠকিয়েছ।

কেন শুনি?

সাত বছর অগের সেই দিনগুলো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

ছিল মনে! কিন্তু সেই দুর্দিনে তুমিও তো কোন খবর রাখনি, রাহুল। তোমার বাবা না হয় রাগ করে খোঁজ নিতেন না। তুমি কেন নাওনি?

নিলে কী করতে? বাবার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছেলের কাছে আশ্রয় নিতে? .... রাহুল অস্ফুট হাসল।

অসভ্য! গঙ্গা ক্ষুব্ধভাবে বলল। .... তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে গেছ রাহুল?

নিষ্ঠুরতা কোথায়? যা সত্যি, তা খোলাখুলি বলা ভালো। অনেক সত্যি কথা গোপন রাখি বলেই তো আমরা কষ্ট পাই। ঠকতে হয়। তাছাড়া আমার প্রশ্ন হচ্ছে—বুঝলাম, বাবা তোমাকে দেখে বা হাতের কাছে পেয়ে হ্যাংলা কুকুরের মতো লোভী হয়েছিলেন—কিন্তু তুমি? তুমি তো খুলে বললেই পারতে যে অনেকদিন আগে তাঁর ছেলের সঙ্গে তোমার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল! তাহলে বাবা নিশ্চয় লজ্জা পেতেন।

গঙ্গা নির্বিকার মুখে বলল, পেতেন এবং আমাকে ফেলে পালিয়ে যেতেন।

বেশ তো, যেতেন।

আর চাদ্দিক থেকে কুকুর আর শকুন এসে ভাগাড়ে পড়ত। কেমন?

রাহুল জবাব দিল না। চুপ করে থাকল। সে কথা খুঁজছিল। গঙ্গা বলল, এর কোন জবাব তোমার নেই। তাই সহজভাবে সবকিছু মেনে নাও রাহুল।

রাহুল সব্যঙ্গ হেসে বলল, তার মানে—তবু তোমাকে ছোটমা বলতে হবে? মায়ের আসনে বসাতে হবে? শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে?

গঙ্গা ধরা গলায় বলল, তা বলছিনে। নাই বা করলে শ্রদ্ধা-ভক্তি!

রাহুল চঞ্চলতার সুরে হাল্কাভাবে বলল, দ্যাখো গঙ্গা—মা একজনই থাকে। লোক দ্যাখানো ভব্যতায় কাকেও হয়তো মা-টা আমরা বলে থাকি, মায়ের পুজোটুজোও দিই—কিন্তু মা একজনই

আসলে—যার পেটে আমি জন্মেছিলুম। নারী মাতৃসমা বলে একটা কথা চালু আছে। ওটা অর্থহীন। বিশেষ করে বয়স নামে যখন একটা ব্যাপার আছে। কোন যুবকের মা কোন যুবতী হতে পারে না। সেটা ইললজিক্যাল, ইররাশানাল—সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের কাছে একটুও সত্যি ব্যাপার নয়। আমি তা ভাবতে পারিনে। ওটা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা। দুর্বল লোকদের পক্ষে যা সত্য, তা সকলের কাছে নাও সত্য হতে পারে।

গঙ্গা একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ। মা ভেবো না—যা খুশি ভেবো। আমিও তোমাকে অন্যকিছু ভাবব। ধরে নাও—এ বাড়ির তুমি একজন মানুষ মাত্র। কিন্তু তুমি এখানে থাকো রাহুল।

রাহুল হেসে উঠল। ..... তোমাকেও কেউ ব্ল্যাকমেইল করছে না তো? বুঝেছি অরুণদা বা মণিশঙ্করের মতো তোমারও একজন বডিগার্ড দরকার। তাই না?

গঙ্গা উঠে দাঁড়াল। .... না। আমার বডিগার্ড দরকার নেই—আমি অনেক ঠেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখেছি। তুমি এমনি থাকো। তোমারও তো পায়ের নিচে মাটি দরকার। কেন তুমি ভবঘুরে হয়ে বেড়াবে! এখানে তোমার অধিকার আছে। সেটা তুমি দাবি করে নাও। তারপর আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতো ঘরসংসার করো। ব্যস, তাহলেই আমি খুশি।

রাহুল পা নাচাতে-নাচাতে বলল, এমন হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ থাকতে আমি শালা টোটো করে ঘুরে মরছিলুম! যাকগে—চা-টা তো দাও। দেখা যাক্। ....

গঙ্গা বেরিয়ে গেল। বাইরে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে ঘোঁতনকে ডাকছে।

আবার বাবার মুখোমুখি রাহুল। ঘরে আর কেউ নেই। গঙ্গা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের দিকে চলে গেছে। বলে গেছে, অরুণের বাড়ি থেকে তোমার ব্যাগপত্তর আনতে ঘোঁতনকে পাঠাচ্ছি। তুমি কখনো ওদিকে পা বাড়াবে না আর। রাহুল মুখ টিপে হেসে সায় দিয়েছে।

এবার বাবার মধ্যে কিছুটা নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করে অবাক হল রাহুল। হৃষিকেশ নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, বসো।

রাহুল মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। বলল, এখন কেমন আছেন?

হৃষিকেশ সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, এসে অব্দি অনেক কীর্তি করে বেড়াচ্ছ শুনছি। সব কানে আসছে।

রাহুল বলে উঠল, কিসের কীর্তি! এখানের লোকগুলো আমাকে যেন সইতে পারছে না। তাই সামান্য ধস্তাধস্তি হচ্ছে। আবার কী!

হৃষিকেশ পাশ ফিরে বললেন, এরপর জানশুদ্ধ মেরে দেবে—তখন আর পস্তানোর সুযোগ পাবে না। আমার আর কতক্ষণ! ওবেলা দেখবে, নেই। শুধু দুঃখ হয়—তোমার অমন তাজা জীবনটা তুমি নষ্ট করে দেবে! শিগগির তোমার চলে যাওয়া উচিত। এ কাজ তোমার নয়।

রাহুল দারুণ চমকে উঠে বলল, কী কাজ!

হৃষিকেশ কোন জবাব দিলেন না।

রাহুল উত্তেজিতভাবে একটু ঝুঁকে পড়ল বাবার দিকে .... কী কাজ আমার নয় বলছেন! বাবা!

উঁ!

আপনি কী ভেবেছেন, শুনি?

ভাবনার ব্যাপার নয়, রাহুল। আমি সব জানি—তুমি কেন হঠাৎ এখানে হাজির হয়েছ। তোমার মুরুব্বীরা একটু ভুল করেছেন। তোমার মতো চপলমতি ছেলের পক্ষে এসব কাজ একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ওঁরা কেন ভাবলেন যে হৃষিকেশ জেনেশুনে নিজের ছেলেকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে? কোন বাপ তা পারে না।

রাহুল গুম হয়ে বলল, তাহলে রাজেনবাবুদের ইনফরমার আপনিই?

হৃষিকেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি কারও ইনফরমার নই। নিতান্ত দায়ে পড়ে ওঁদের সাহায্য

দোপহরিবাবু জানালায় বৃষ্টি এবং গঙ্গা দেখতে দেখতে পাঁউরুটি চিবুচ্ছিলেন। দু'দিকের কষদাঁত নেই। শুকনো খাদ্য চিবুতে সময় লাগে। কাতুরি এক গেলাস ভাপানো চা ঢেকে রেখে গেছে। পাঁউরুটি চুবিয়ে নরম করে খেতে গেলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই চিবিয়ে একটু কষ্ট করেই খাবেন। সময় একটু লাগবে, কিন্তু চায়ের নিজস্ব গাম্ভীর্যটুকু পাওয়া যায়। আর দোপহরিবাবু তো জানেনই, কাতুরির বাবা কাশীদাস চা কতক্ষণ ধরে ফুটিয়েছে। সেই ভোর পাঁচটা তেতাল্লিশের কাটোয়া লোকালের জন্য তৈরি।

বৃষ্টির দিনেও কি কারবার! ছাতি গুটিয়ে একধারে রেখে প্রভাতমণি এলেন। হাঁটু অব্দি গুটনো ধুতি, রবারের পামসু, সাদা বেলুন-বেলুন পায়ের রোমে প্রচুর চোরকাঁটা। স্কুলবাড়ির পাশের পোড়ো জমি হয়ে এলে দোপহরিবাবুর ঘর নাকের ডগায়। দরজার বাইরে ছাতির পাশে জুতো রেখেই ঢুকলেন। তক্তপোশে বসে পড়লেন একেবারে।

দোপহরিবাবু বিশেষ না ঘুরে আড়চোখে দেখে নিয়ে বললেন, কী বলছিলেন যেন?

প্রভাতমণি হাসলেন। রোজ শোবার আগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, কালকের দিনটা যেন অশান্তিতে না যায়। ভগবানের অবস্থা হয়েছে সেই পাগলের মতো। গল্পটা জনেন তো?

না। আপনি বলুন। পাঁউরুটির শেষ টুকরো মুখে পুরে দোপহরিবাবু বললেন।

পাগল পাগলামি করছে। প্রভাতমণি গল্পটা বলতে লাগলেন। এটা ভাঙছে, ওটা ছুঁড়ছে। নাচছে। গাইছে। মানে, যা করে থাকে পাগলরা। তো একজন অতি বুদ্ধিমান যেই বলেছে, দেখিস রে, যেন ঢিল না ছোঁড়ে, অমনি পাগল নেচে উঠে বলল, দিলে তো মনে পড়িয়ে! আর ব্যস!

ভগবান ঢিল ছুঁড়ছেন বুঝি? কথার কথা হিসেবে বললেন দোপহরিবাবু।

প্রভাতমণি গম্ভীর হলেন। আপনি খবর পাননি? আজও—বৃষ্টির দিনেও একটা পড়েছে।

দোপহরিবাবু পাঁউরুটির ডেলাটা কোঁত করে গিললেন। নলী বেয়ে নড়তে-নড়তে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে সেটা নেমে গেল। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল ব্যাপারটা। আসলে দোপহরিবাবুর বয়স যা-ই হোক, কোন-কোন জায়গার চামড়া যথেষ্ট ঢিলে হয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, বৃষ্টির দিন বলে কিছুই তো থেমে থাকে না। ওই দেখুন, কেমন বয়ে চলেছে গঙ্গামাইজিও।

জানালা দিয়ে বৃষ্টি-ধূসর গঙ্গাকে দেখে নিয়ে প্রভাতমণি মনে-মনে একটু বিরক্ত হলেন দোপহরিবাবুর ওপর। লোকটা সব কিছুতে বড় নির্বিকার কিংবা সহজভাবে নেয়। একটুও উত্তেজিত হয় না। কোন ব্যাপারেই রাগ করে না।

কিসের সঙ্গে কি! রসিকতা বলে ধরে নিয়েই প্রভাতমণি আবার হাসবার চেষ্টা করলেন। দুটো কক্ষণো এক নয়। জন্মিলে মরিতে হবে এটা কোন নতুন কথা কি? জন্মেছি, অতএব মরব। কিন্তু কেউ আমাকে রাতারাতি ঘাসে শুইয়ে রেখে যাবে, শ্বাসনালী ফাঁক, মুখে মাছি—

দেশলাই-কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন দোপহরিবাবু। কাঁটালিয়াঘাটে অনেক পাপ জমে আছে। এতদিনে বেরুচ্ছে। বেরুতে দিন।

প্রভাতমণি সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন। অবশ্য এ অ্যাঙ্গেলটা থেকে আমি এখনও দেখছি না। কারণ সঙ্গে-সঙ্গে রবির কথা মনে পড়ছে। অত্যন্ত সৎ ছেলে ছিল। আমার ছাত্র বলেই এ সার্টিফিকেট দিতে পারি। আমি তো জানি, রবি কোন ব্যাপারে ছিল না।

নিজের দেশলাই জ্বেলে প্রভাতমণির সিগারেটা ধরালেন দোপহরিবাবু। ধোঁয়ার সঙ্গে বললেন, সত্যি বলতে কি, আমরা কারুর কিছুই জানি না। নিজেরও কি জানি?

হুঁ—আপনি আরেকটা অ্যাঙ্গেল বের করেছেন বটে। প্রভাতমণি নার্ভাস হাসলেন। ভাবতে গেলে ভয় করে কিন্তু। না জেনেও মানুষ পাপ করে ফেলতে পারে বৈকি।

কাতুরি এলো মাথা থেকে পিঠ অব্দি ভাঁজ করা একটা শাড়ি ঢাকা দিয়ে। হাতে আরেক গেলাস চা। জিভ কেটে দোপহরিবাবুর গেলাসটার দিকে তাকাল। বাবা বলল, আগের চা-টা না খেয়ে থাকলে খেতে বারণ করিস। নতুন করে করে দিয়েছি।

দোপহরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন না, কেন। ওর হাত থেকে গেলাস নিয়ে চা-টা নিজের অসমাপ্ত গেলাসে ঢেলে নিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন মাস্টারমশাইয়ের জন্য চা নিয়ে আয়। কাপ-প্লেটে।

কাতুরি দৌড়ে বেরিয়ে গেলে অবাক প্রভাতমণি বললেন, বারণ করেছে, তবু—

হাত তুলে দোপহরিবাবু বললেন, ও আপনি বুঝবেন না।

বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বুঝব।

কাশীদাস আমাকে খুব ভক্তি করে।

প্রভাতমণি পা থেকে এতক্ষণে ঘাসের কুটো বা চোরকাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হলেন। বললেন, সবটাতে আপনার হেঁয়ালি! .....

এবার গঙ্গার লক্ষণ দেখে ভাল লাগছে না। আদিনাথ ডাক্তারের ডিসপেন্সারি থেকে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হেমন্তরঞ্জন বললেন। যে বছর কাঁটালিয়াঘাট ডুবেছিল, সে-বছরও ওই হিজলগাছের নিচে ফাটল ধরেছিল। কাল বিকেলে দেখলাম ফাটল ধরেছে। ফ্লাড-সেন্টারে খবর দিতে বললাম নচুকে। নচু দেখে এসে বলল, ও কিছু না।

কাত্যায়নী কোলের নাতিকে দোলাতে দোলাতে বললেন, নচু কোথায় আর?

জানি। শ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন হেমন্তরঞ্জন।

কম্পাউন্ডার বিশ্ববন্ধু বার-বার প্রত্যেকের মুখের দিকে আর গঙ্গার দিকে তাকাচ্ছিল। কাত্যায়নী প্রেসক্রিপশান আর মিক্সচারের শিশি দিয়ে বলল, দু'টাকা। তারপর হেমন্তরঞ্জনকে বলল, নচু এখনও তেমনি পড়ে আছে শুনলাম।

আদিনাথ চাপা ধমকের সুরে বললেন, কে কোথায় পড়ে আছে, তাতে আমাদের কি? দেখ, ওই মেয়েটা কি বলছে।

ঘোমটায় মাথা ও চাদরে গা ঢাকা দিয়ে মেয়েটি উবু হয়ে বসে আছে—দেয়ালে পিঠ। বিশ্ববন্ধু বলল, মোজাম্মেলের বউ। তারপর কাছে গিয়ে বলল, কৈ গো, প্রেসক্রিপশান দাও। জ্বর ছেড়েছে?

মোজাম্মেলের বউ ঘোমটার ভেতর বলল, হুঁ।

এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি কেন এলে? মোজাম এলো না?

ঘরে থাকলে আসত। চৌকিদার এসেছিল। থানায় ডেকে নিয়ে গেছে ভোরে।

আদিনাথ আবার ধমক দিলেন। বড্ড কথা বল তুমি বিশ্বরঞ্জন!

বৃষ্টিটা ভোরবেলা থেকে সমানে ঝির-ঝির করে ঝরে চলেছে। রাস্তার পিচের সভ্যতা ধুয়ে-ধুয়ে যা বেরিয়ে পড়েছে, তা কনট্রাক্টরের অর্ধসত্য। ওধারে কয়েকটা প্রকাণ্ড গাছ ছাড়া-ছাড়া দাঁড়িয়ে কাতরভাবে ভিজছে। আকন্দের ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার রূপ আকাশ অব্দি একটা প্রচণ্ডতা হয়ে উঠেছে। ভয় করে দেখতে, ভালও লাগে। হেমন্তরঞ্জন পাশের নগেন্দ্রকে আস্তে বললেন, মোজাম এর মধ্যে থাকতেই পারে না। সে তো নচুর সাগরেদ।

নগেন্দ্র মুচকি হাসলেন। কাঁটালিয়াঘাটে আজকাল কে কার সাগরেদ বোঝা কঠিন।

কিন্তু দেখছ? ঘড়ি দেখলেন হেমন্তরঞ্জন। আটটা বাজতে চলল। এখনও পুলিশ আসেনি।

শুনতে পেয়ে আদিনাথ একটু কাশলেন। হেম! ওই নোটিশটা বোধ করি তোমার চোখে এখনও

পড়েনি।

হেমন্তরঞ্জন তাকিয়ে ভীষণ চমকে গেলেন। সাদা কাগজে লাল ডট-পেনে বড় বড় হরফে লেখা, অনুগ্রহপূর্বক এখানে রাজনৈতিক আলোচনা করিবেন না।

নচিকেতা রাজনীতি করত কি ? হয়তো একটু-আধটু করত। কিংবা আজকাল করা-না-কবা ব্যাপাব বলে কিছু নেই। সবাই এবং সবকিছুই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। হেমন্তরঞ্জন গুম হয়ে বসে রইলেন। নগেন্দ্রর বোধ হয় একটা আপত্তি ছিল ওই নোটিশ সম্পর্কে। ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু বললেন না।

হেমন্তরঞ্জন ওষুধ নিয়ে ছাতির আড়ালে বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগলেন। কাশীদাসের চায়ের দোকানে আজ লোকজন একেবারে কম। সবচেয়ে লক্ষ্য করার মতো দৃশ্য, দোকানেব এবং দোপহরিবাবুর ঘরের মাঝখানের ফাঁকে একটা গাধা দাঁড়িয়ে আছে। নানকুর গাধাটাই হবে। সে ছাড়া কাঁটালিয়াঘাটে আর কেউ সম্ভবত গাধা পোষে না। তবে গাধা পুরনো কাঁটালিয়াঘাটকে মনে পড়িয়ে দেয়। প্রভাতমণি দরজায় উঁকি দিয়ে বৃষ্টির অবস্থা দেখছিলেন, বাড়ি ফিরবেন বলে। আজ অবশ্য রবিবার। স্কুলের ছুটি। তাঁকে দেখেই হেমন্তরঞ্জন ঢুকে পড়লেন।

আশাকরি দোপহরিবাবুর ঘরের দেয়ালে নোটিশ টাঙানো নেই? নার্ভাস স্বরে বললেন হেমন্তরঞ্জন। কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

প্রভাতমণি বললেন, কিসের নোটিশ হেম?

রাজনৈতিক আলোচনা চলবে না। হেমন্তরঞ্জন চেয়ারে বসলেন। আদিনাথ ডাক্তার দেয়ালে নোটিশ লটকেছে।

দোপহরিবাবু বললেন, ডাক্তারবাবু ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করেন না দেখছি।

প্রভাতমণি বললেন, আদিনাথ ডাক্তারের প্রচুর পাপ জমেছে। দেখবে, কবে তাকেও যেতে হবে।

হেমন্তরঞ্জন অন্যমনস্কভাবে বললেন, অ্যাঁ—কোথায়?

যমালয়ে। খিক-খিক করে হাসলেন প্রভাতমণি। কি দোপহরিবাবু, আপনার কি মনে হয়?

দোপহরিবাবু ভাবছিলেন সেই সব দিনের কথা, যখন কাঁটালিয়াঘাটে কোন ঝুট-ঝামেলা ছিল না। মাত্র গোটাকতক দরমা-বাতার ঘর। নামেমাত্র বাজার। লাগোয়া ঘর-বিশেক লোকের একটা গ্রাম। তখন এখানকার শ্মশানটাই ছিল বিখ্যাত। সেই কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুরের পর কাঁটালিয়াঘাটের শ্মশান। এখন রাস্তাঘাট পাকা। বিদ্যুৎ এসেছে। শ্মশান পিছনে পড়ে গেছে। তখন লোকে 'কাঁটলেঘাটের মড়া' বলে গাল দিত প্রতিপক্ষকে। গালটা ভুলেই গেছে লোকেরা। এখন রীতিমত কাঁটালিয়াঘাট স্টেশন এবং বাজার এবং সামান্য দূরে ইরিগেশান অ্যান্ড ফ্ল্যাড কনট্রোল সেন্টারের একতলা হলুদ বাড়ি। আরও একটু গেলে ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন। পাড়াগাঁ আর শহরের কিছু জিনিস খিচুড়ি পাকিয়ে একটা অদ্ভুত চেহারা দাঁড়িয়েছে।

সে-যুগে এমন বৃষ্টির দিনে লকড়ির কারবারি দোপহরিবাবুর মনে বড্ড সুখ নিসপিস করত। লকড়ির দর যেত বেড়ে। শ্মশানের ঘাটোয়ারিবাবুর আটচালা থেকে পাঁজার পর পাঁজা লকড়ির অর্ডার। তবে সেজন্য নয়, বৃষ্টির দিনে গঙ্গার রূপটাই ছিল আলাদা। বড় শান্ত আর কোমল। তখন ফরাক্কা ফিডার ক্যানেলের জলে বারোমাস কুলে-কুলে ভরে থাকত না গঙ্গা। তাই তার বর্ষার চেহারায় গ্রামের গেরস্থ মেয়ের লাবণ্য ফুটে উঠত। এখন যেন মেমসাহেব।

আর তখনও দীপহরি সিং ছত্রী, যিনি আদতে গঙ্গা পারাপারের খেয়া নৌকার জিম্মদার ছিলেন এবং বছরকাল আড়াইশো টাকা গুনে দিয়ে কালেক্টরি থেকে ঘাটের ইজারা নিতেন তিনি দোপহরিবাবু হয়ে ওঠেননি। ঘাটে লোকসান খেয়ে নৌকোগুলো ভকতজিকে বেচে লকড়ির ব্যবসা খুলেছিলেন। দুপুর-রাতেও জেগে থাকতে হত তাঁকে। মড়া এলেই তাঁর লকড়ি যায়। তাই থেকে ক্রমশ দীপহরি সিং হয়ে গেলেন দোপহরিবাবু। তিরিশ বছর পরে তাঁকে আর পূর্ণিয়া এলাকার ছত্রীরাজপুত বলে চেনা যায় না। খাঁটি বাঙালিবাবু। বাংলা লেখাপড়াও যত্ন করে শিখেছিলেন। পরে লকড়ির কারবার ছেড়ে দিয়ে কয়লা-কেরোসিনের ডিপো করেছিলেন বছর পাঁচেক। তাও ছেড়েছেন বছরখানেক আগে। তারপর এই একটা বছর চুপচাপ বসে আছেন।

কিন্তু কারবারি লোক এমন চুপচাপ বসে কাটালে গুজব রটে। কাঁটালিয়াঘাটে তাঁকে নিয়ে অনেক রকম গুজব রটে আসছে। কখনও শোনা যায় পেট্রোল-পাম্প করবেন। কখনও রটে, কাপড়ের দোকান করবেন। গত মাসেও জোর গুজব রটেছিল, বোন-মিল ফ্যাক্টরি করবেন। হাড়-কুড়োনি মেঝেনদের সঙ্গে যোগাযোগও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ব্যাপারটা থেমে আছে।

নচুর ব্যাপারটা—প্রভাতমণি দোপহরিবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, আমার কিন্তু গোলমেলে লাগছে। অমন অনেস্ট ছেলে ক'টাই বা আছে এখানে। হেম, তোমার মত কী?

হেমন্তরঞ্জন আঙুল মটকাতে থাকলেন। দোপহরিবাবু বললেন, হেমবাবু, আপনার ভাগ্নীর বিয়ে কোথায় দিলেন?

হেমন্তরঞ্জন বললেন, এখনও কিছু ঠিক হয়নি।

দোপহরিবাবু গোঁফে হাত বুলিয়ে বললেন, একবার যেন শুনেছিলাম নচুর সঙ্গে —

ভগবান রক্ষা করেছেন। হেমন্তরঞ্জন বললেন দ্রুত। কথা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। শুধু একটা ব্যাপারে ঠেকে ভেঙে গেল।

কিসে ঠেকেছিল শোনার জন্যে প্রভাতমণির কৌতূহল ছিল। কিন্তু দোপহরিবাবু অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। একটু হেসে বললেন, কাঁটালিয়াঘাট নামেই এখন আতঙ্ক। বাইরের লোকজন আসা কি রকম কমে গেল দিনে দিনে, লক্ষ্য করেছেন?

হেমন্তরঞ্জন, প্রভাতমণি দুজনেই লক্ষ্য করেছেন। লং-রুটের বাস দু'মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না। দিন-দুপুরেও বাইরের লোক এসে সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে কাটায়। কাজ সেরে ঝট-পট চলে যেতে পারলে বাঁচে। সন্ধ্যায় তো একেবারে খাঁ খাঁ অবস্থা।

প্রভাতমণি আলোচনার দারুণ একটা বিষয় পেয়ে গেলেন। সূর্য ডোবার পর কী অবস্থা! একে তো বর্ষা-বাদলার মাস। তার ওপর টেররিজ্‌ম!

টেররিজ্‌ম ঠিক নয়। হেমন্তরঞ্জন একটু আপত্তি করলেন। দলাদলি ভেতরে থাকতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে তো কিছু নেই। বরং সেটাই অস্বাভাবিক লাগে। কোন সংঘর্ষ নেই। বোমাবাজি নেই। পোস্টার-আঁটা নিরামিষ রাজনীতি কাঁটালিয়াঘাটে। তার চেয়ে বড় কথা, যে ক'জন মার্ডার হল, তারা অন্তত প্রকাশ্যে কেউই রাজনীতি করত না। করত কি? করলেও খুব সামান্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গায় হাওয়াটা অন্য রকম।

সেই কথাই হচ্ছিল দোপহরিবাবুর সঙ্গে। প্রভাতমণি বললেন, তবে এটাকে তুমি কী বলবে?

ঠিক বুঝতে পারছি না। হেমন্তরঞ্জন উদ্বিগ্নভাবে বললেন, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। সেইজন্যেই ভাবছি, আমরা প্রকাশ্যে যদিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হয়তো আড়ালে একটাই কারণ কাজ করছে।

সেটাই রাজনীতি।

হ্যাঁ—সেটাই রাজনীতি।

তার মানে রাজনীতির একটা আলাদা চেহারা আছে—

যাতে তুমি, আমি, সবাই নিজেদের অজান্তে জড়িত আছি।

প্রভাতমণি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে এবং সত্যকে আবিষ্কারের গর্বে বললেন, টেররিজ্‌ম শব্দে তুমি আপত্তি করলে। আমি তোমাকে বোঝাতে চাইছিলাম, রাজনীতির সেই আড়ালের চেহারাটাই হল টেরিজমের উৎস। এবার বল তুমি কী বলতে চাইছ। তোমার লজিকটা শুনি।

স্কুলমাস্টার এবং তাত্ত্বিক প্রভাতমণি তক্তপোশে দোপহরিবাবুর বিছানায় পা দুটো তুলে জাঁকিয়ে বসলেন।......

কাত্যায়নীর ঘরের পিছন দিকের জানালা বন্ধ থাকে। বেশি দিনের কথা নয়, মাসখানেক আগেও খোলা থাকত। ওখানে চোখ রেখে তিনি হেমন্তরঞ্জনের সংসারের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ওই সংসারে তাঁর একমাত্র দ্রষ্টব্য ছিল সুগন্ধা—হেমন্তরঞ্জনের ভাগ্নী। সুগন্ধা আসার পর থেকে তার মামার পুরনো বাড়িটার ভোল ফিরেছে বলে কাত্যায়নীর ধারণা। আগে হেমন্তরঞ্জন সপ্তায় দু'দিন দাড়ি

কামাতেন। ভাগ্নী আসার পর রোজই। তাছাড়া ওঁর স্ত্রী কমললতার চেহারাতেও চাকচিক্য ফুটেছিল। কাত্যায়নী খুঁজতেন এতদিনে কাঁটালিয়াঘাটের কে এবং কারা-কারা ও-বাড়ির পরিধি হটানোর দায়িত্ব নিয়েছে।

সুগন্ধার একদিন হঠাৎ চোখে পড়ায় তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। শেষে কাত্যায়নীর ছেলে নীলমাধব জানালাটায় একটুকরো কাঠে পেরেক বসিয়ে সিল করে দেয়। এতে মায়ের অপমান হয় জেনেও। আসলে হেমন্তরঞ্জনকে নীলমাধব যেন ভয় করতে শুরু করেছিল।

কাঁটালিয়াঘাটে আজকাল কিছু বোঝা যায় না। কাত্যায়নী ফাঁপরে পড়ে দিন কাটান। আর ছেলেও বউয়ের হাত-ধরা হয়ে আছে। নিজের সংসারে পর হয়ে আছেন কাত্যায়নী। হাত-তোলা খেতে দেয়, পরতে দেয়। এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা কাত্যায়নীর। আজ হঠাৎ দেখলেন সিল-করা কাঠেব পেরেক আলগা হয়ে আছে। কেউ খুলেছিল, যখন আদিনাথের ডাক্তারখানায় নাতির জ্বর দেখাতে গিয়েছিলেন। দশটা বাজে। নীলমাধব কাটোয়ায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে চাকরিতে যায়। আজ ছুটির দিনে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেছে ভাত খেয়ে। বলে গেছে, ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যাবে বন্ধুদের সঙ্গে কোন্ গ্রামে। কাত্যায়নী ডাকলেন, বউমা!

ব্রততী সঙ্গে সঙ্গে এল। চাপা স্বরে বলল, সুগি কাঁদছিল। অ্যাদ্দিন বিশ্বাস করতাম না। স্বচক্ষে দেখলাম।

কাত্যায়নী মধুর হাসলেন। এবার হল তো আমার কথা। আমি বলেছিলাম—

শুনুন আগে, ব্রততী বাধা দিয়ে বলল! গোলাম দারোগাবাবু এসেছিল। কি সব জিজ্ঞেস করে গেল।

কাত্যায়নীর দম আটকে গেল। চোখ ঠেলে বেরুল। এবারে আস্কার হবে। আমি বলছি। দেখে নিও তুমি।

ব্রততী শাশুড়ির দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বলল, সুগি কি হেমা মালিনী যে ওব রূপে পাগল হয়ে আপনাদের কাঁটালিয়াঘাটের মড়াগুলোও জ্যান্ত হয়ে উঠেছে? কী যে বলেন তাব মাথামুণ্ডু নেই।

আমি বলছি তোমাকে। ওই মেয়েটাকে নিয়েই কুরুক্ষেত্তর বেধেছে আসলে।

কাত্যায়নীর পাতলা ঠোঁটে পাগলাটে হাসি। যথেষ্ট জোর দিয়ে বললেন কথাটা। কিন্তু ব্রততী হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল। তখন কাত্যায়নী লোল হাতে কাঠের টুকরোটা ওপড়াতে গেলেন। উত্তেজনায় মুখ লাল। লুকিয়ে সুগিকে দেখবেন। .....

সাড়ে দশটা বাজে। বৃষ্টি এইমাত্র বন্ধ হয়েছে। গঙ্গার শিয়রে চাপ-চাপ সাদা-কালো মেঘ অগ্নিকোণ থেকে আবার কাঁটালিয়াঘাটকে তাক করছে। খেয়াঘাটের পাশে শিমুল গাছটার বাজ-পড়া শুকনো ডালে একটা শকুন বসে আছে। ঘাটের বাঁদিকে পাড়ের খাঁজে কাল রাতে কখন একটা মরা মোষ বা গরু এসে আটকেছিল। দুর্গন্ধে ঘাট অস্থির। ভোরে খেয়ানৌকোর মাঝিরা সেটা স্রোতে ঠেলে দেওয়ায় রক্ষা। কিন্তু পশুটার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল।

দোপহরিবাবু ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছিলেন। ঘাটের মাথায় তেতলা গদি থেকে ভকতজি ডাকলেন, রাম রাম সিংজী।

রাম রাম।

শুনা হ্যায় তো?

জরুর। একটু হাসলেন দোপহরি সিং। পেড় ভি শুনা। গঙ্গা মাইজি ভি।

আও ভেইয়া, চায়-উ পিও।

নেহি ভকতজি।

কাহে! ভকতজি হাসলেন। কুছ গড়বড়া তো নেহি? আরে, আও, আও।

দোপহরিবাবু হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। মাফ কিও ভেইয়া। বলে বড় বড় পা ফেলে

হনহন করে চলতে শুরু করলেন স্টেশনের রাস্তায়।

কারবারি মানুষ। চুপচাপ বসে থাকলে শ্মশানবৈরাগ্য চেপে বসে। তাই খালি চক্কর মেরে বেড়ান। পাল ছাড়া গরুর মতো অবস্থা। রাস্তার দু'ধারে লাগানো অর্জুন, শিরীষ, আকাশিয়া বিশ বছরে বেশ ঝাঁকালো হয়েছে। উর্বর গাঙ্গেয় মাটি এককে বহু করার জন্য সব সময় উদ্‌গ্রীব। শস্য হোক কী আগাছা। তবে দোপহরিবাবু যখন প্রথম আসেন, তখন মানুষের এত দাপট ছিল না। চারিদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। বাঘের ডাকও শুনতেন রাত-বিরেতে। এখন শেয়ালও দেখা যায় না। কী নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে মানুষ দিনকে দিন!

দোপহরিবাবু যে! স্টেশন-মাস্টার নিশাপতিবাবু প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কামরূপ এক্সপ্রেস পাস করাচ্ছিলেন। এখনও দূরের বাঁকে চড়বড় করে খৈ ফোটার শব্দ এবং একটা চৌকো কালো জিনিস ছোট হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কামরূপ লেট মনে হচ্ছে?

বিশেষ না। আধঘণ্টাটাক। নিশাপতি চাপা স্বরে বললেন। আবার একটা পড়েছে খবর পেলাম?

হ্যাঁ। নচু—নচিকেতা নামে একটা ছেলে।

পাঁচটা হল। তাই না?

হবে। শুনিনি। দোপহরিবাবু একটু হাসলেন। কাঁটালিয়াঘাটে অনেক পাপ জমেছিল। মা গঙ্গা ধুয়ে ফেলছেন এতদিনে।

নিশাপতি বাচ্চার মতো খিকখিক করে হাসলেন। বর্ষার ফ্লো দিয়ে। তবে এক বর্ষার ফ্লোয়ে সব ধোয়া যাবে না। অবশ্য আমি আউটসাইডার। যা শুনি, তাই বলছি।

দোপহরিবাবু আনমনে বললেন, কী শোনেন?

একটা মেয়েকে নিয়ে নাকি কামড়া-কামড়ি চলেছে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে। নিশাপতি সরস গলায় বললেন। আপনি তো ভেতরে থাকেন, আপনি বলতে পারবেন কি ব্যাপার।

আমি তেমন কিছু শুনিনি।

নিশাপতি দাবি করলেন, তাহলে যে বললেন পাপ জমেছিল? পাপটা কিসের?

সঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়—

সহকারী স্টেশন-মাস্টার দরজায় উঁকি মেরে বললেন, দাদা, হাজরা সায়েব কথা বলছেন আপ জংশন থেকে।

স্টেশন-মাস্টার লাল-নীল নিশান হাতে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দোপহরিবাবু প্ল্যাটফর্মে এগিয়ে ছাউনির তলায় খালি বেঞ্চটাতে বসলেন। তলায় একটা কুকুর কুঁকড়ে শুয়ে আছে। তার পাশে একটা বেওয়ারিশ কমবয়সী ছেলে। চিটচিটে ময়লা মাখা ছেঁড়া প্যান্ট-জামা। অন্য বেঞ্চে একটা গ্রাম্য লোক মাথায় ব্যাগ রেখে চিত হয়ে চোখ বুজে বিড়ি টানছে। উল্টোদিকে এক গম্ভীর প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ছাউনির তলায় আজ সরে এসেছে হাঘরেদের ঘরকন্না। কয়েকটা ল্যাংটা ছেলে, কয়েকটা রাগী-চেহারার স্ত্রীলোক এবং শান্ত পুরুষ লোক। এই সময় ছাতি বগলে রেললাইন ধরে গেরুয়া পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা নিকটবর্তী আশ্রমের এক সন্ন্যাসী এলেন। তাঁর চেহারায় শিক্ষিত লোকের ব্যক্তিত্ব। ঘড়ি দেখে বেঞ্চের খালি জায়গায় বসে নিবিষ্ট চিত্তে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লেন দোপহরিবাবু। সাড়ে এগারোটার আপ ট্রেনটা দেখার ইচ্ছে ছিল। বেশ লাগে বৃষ্টির দিনে ট্রেন এসে পৌঁছুনো দেখতে। কত লোক নামে এবং ওঠে। ইঞ্জিনের শব্দ, লোকজনের কোলাহল, তারপর গার্ডের হুইস্‌ল, ইঞ্জিনের চিৎকার এবং হুশ করে হঠাৎ আওয়াজ। তারপরও কতক্ষণ খই ফোটার মত চটপট একটা শব্দ। শেষে নিঝুম নীরবতা। কারবারি মানুষের নিষ্কর্মা হয়ে দিন কাটে না বলেই এই সব জিনিস অনুভব করেন।

রেললাইনের ধারে-ধারে হাঁটতে হাঁটতে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল পোস্টের কাছে ডাইনে ঘুরলেন। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নেমে দোপহরিবাবু দেখলেন, নয়ানজুলিতে বর্ষার গভীর জল। জলের ধারে হাঁটতে হাঁটতে ইজারা দেওয়া জলার পাড় হয়ে মাঠ পেরিয়ে কাঁটালিয়াঘাটের শেষ প্রান্তে পৌঁছুলেন।

কোথায় যাচ্ছিলেন, কেনই বা যাচ্ছিলেন, নিজেও জানেন না। আসলে কিছু ভাল লাগে না। বিধুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জল ছপছপ করছে। এতক্ষণে মেঘের ফাঁকে সূর্যের মুখ। কিন্তু এক মিনিট পরই কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল। শিরশিরে একটা হাওয়া এলো গঙ্গার দিক থেকে। হাওয়াটারও স্বাদ নিলেন নিবিড়ভাবে।

দোপহরিবাবু যে!

দোপহরিবাবু দেখলেন আদিনাথ ডাক্তার সামনের বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দোপহরিবাবু নমস্কার করলেন। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

বন্ধ দরজার কড়া খটখটিয়ে ডাক্তার বললেন, যা আমার কাজ। এদিকে কোথায়?

বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ক্ষীণ স্বরে বললেন দোপহরিবাবু। উদ্দেশ্য ছিল একটু —

হাসলেন আদিনাথ। উদ্দেশ্য সফল হয়নি তো? বডি সওয়া দশটায় তুলে নিয়ে গেছে শুনলাম।

বডি ! বডি দেখার উদ্দেশ্য ছিল না। দোপহরিবাবুর উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যহীনতা, তা বুঝিয়ে বলতে পারলেন না।

একটা ছোট্ট মেয়ে এতক্ষণে দরজা খুলে দিল। আদিনাথ তাকে তেড়ে গেলেন। কখন থেকে কড়া নাড়ছি। খুলে রাখতে পারো না? কল দিয়ে এসে সব নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ। বলে দোপহরিবাবুর দিকে ঘুরলেন। ওই তো মশাই দাঁড়িয়ে আছেন রক্তমাখা ঘাসের ওপর।

দোপহরিবাবু পায়ের কাছে সাপ থাকার মতো দৃষ্টি নামিয়ে দু'পা সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু রক্ত দেখতে পেলেন না। ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। এখানে মাথার ওপর একটা বিশাল কদমগাছ। মাথা তুলে দেখলেন কদম ফুলের গোটা ধরে আছে অজস্র আবেব মতো। কাল রাতে এখানে নচুর শ্বাসনালী কাটা হয়েছিল ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে। চাপ চাপ সবুজ ঘাসও ঘটনাটাকে মিথ্যে করে দিতে চাইছে। নির্দোষ ওই কোমলতার দিকে তাকিয়ে দোপহরিবাবু চাপা শ্বাস ছাড়লেন। ..... .

নগেন্দ্র কাত্যায়নীকে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতে দেখে দাঁড়ালেন রাস্তায়। গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন। কাতুদি বসে আছ এখনও? নাইতে যাবে না? আগে তো ঘাটেই দেখা হতো রোজ। নাকি সময় বদলেছ?

কাত্যায়নী হাসলেন। ঠিক ধরেছ নগু! আজকাল ভোরবেলা যাই। নিমুর মা, পুষ্প ওরা সব যায়। নইলে ভরা গঙ্গা। এদিকে ঘাটটার অবস্থাও সাংঘাতিক হয়েছে।

নগেন্দ্র এসে উঁচু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসলেন থামে পিঠ দি ' । নচুকে তো সদরে নিয়ে গেল। কাটাকুটি করবে খামোকা।

মুসলমানপাড়ার মোজামকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল শুনেছ কিছু?

আরে ধুর ধুর! সে অন্য কেস। নগেন্দ্র বাঁকা মুখ করে বললেন। নিয়েও গেল, আবার ছেড়েও দিল। নচুর ব্যাপারে এখনও কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

কাত্যায়নী এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু ঝুঁকলেন লাল সিমেন্টের রোয়াক থেকে। কোলে রুগ্‌ণ নাতি বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। বড্ড ঘুমোয় বাচ্চাটা। হেমের ভাগ্নীকে ধরুক। ধরলেই সব বেরুবে। ও সাংঘাতিক মেয়ে।

সে কী! খুব অবাক হয়ে গেলেন নগেন্দ্র। কি বলছ কাতুদি!

কাত্যায়নী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, তুমি হিসেব করে দেখ। কাত্যায়নী আঙুলের গাঁট গুনতে থাকলেন। এক বছর ওর আসা। তারপরই এই খুনোখুনি শুরু। প্রথমে রবি। রবির পরে বাণীব্রত। তারপরে গেল ভোলা। ভোলার পরে মোনা। তারপর নচু। আমার কাছে শোন। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে সুগির ভাব ছিল। প্রত্যেকে হেমের বাড়ি আসা-যাওয়া করেছে, সুগি যদ্দিন মামার কাছে এসেছে।

নগেন্দ্র হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার ঘরের পেছনের জানলা থেকে সব দেখা যায়। ও মাসে

সুগির চোখে পড়ল। তারপর হেমের বউ ঝগড়া বাধাল। শেষে ভালমানুষি করে নীলু কাঠ এঁটে জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

কিন্তু সুগি মেয়েছেলে হয়ে—

ধুস! কিছু বুঝতেই পারলে না নগু! কাত্যায়নী বিরক্ত হলেন। সুগি কেন করবে? সে লড়িয়ে দিয়েছে। তাতিয়ে দিয়েছে একজনের ওপর আরেকজনকে। এই করে পাঁচ-পাঁচটা ছোঁড়া কাটা পড়েছে।

নগেন্দ্র হাসলেন খিখি করে। যাঃ! তাহলে নচুকে কে কাটল?

নিশ্চয়ই নতুন কেউ জুটেছে। মেয়েটাকে ধরুক গোলাম দারোগা। বেরিয়ে পড়বে রুলের গুঁতো খেলে। কাত্যায়নী ফিসফিসিয়ে বললেন। আমি তোমাকে কাল-পরশুর মধ্যে বলব কে নতুন জুটেছে।

হেমন্তরঞ্জন তাঁর সদর দরজা খুলে বেরুলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নী সিধে হয়ে ঘুমন্ত নাতিকে দোলাতে দোলাতে সুর ধরলেন, আমার মনাটা রে! আমার ছোনাটা রে! আমার টুকুনমণিটা রে!

নগেন্দ্র বলললেন, হেম, এসো চান করে আসি।

হেমন্তরঞ্জন গম্ভীর মুখে বললেন, তখন দেখলে না আদিদার ওখানে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম? রাত্তির থেকে জ্বরমতো হয়েছে।

নগেন্দ্র আড়ামোড়া দিয়ে উঠলেন। পা বাড়াতে গিয়ে মনে হল শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। বুকের ভেতরটা খালি লাগছে এবং খালি হাতুড়ির শব্দ। রুণুর কথা ভেবেই।

রুণু তাঁর বড় ছেলে। দু-দুবার স্কুল-ফাইনালে ফেল করার পর চালের ব্যবসা করতে পুঁজি দিয়েছিলেন। আশেপাশের গ্রামের মেয়ে রিক্রুট করে পোঁটলা ভর্তি চাল চালান দিত রুণু। রেলগাড়ির কামরার ভাগ পাওয়া কঠিন। কোনক্রমে একটা কামরা পেয়ে গিয়েছিল এক গুরুকে ধরে। এ লাইনে সব ডাউন ট্রেনের কামরা বিলি হয়—ফার্স্ট ক্লাস বাদে। অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী এ লাইনে। তাই বোঝাপড়া না করে নিয়ে এ ব্যবসা চালানো যায় না। রুণুর এত ঝক্কি পোষাল না। বারকতক চাল সিজ হওয়ার পর পিছিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে উদাস হয়ে টো টো ঘুরছিল। ইদানিং বদুবাবুদের রাজনৈতিক দলের পোস্টার সাঁটতে বেরুনো ছেলেগুলোর সঙ্গে তাকে দেখা যাচ্ছে।

রুণুর সঙ্গে সুগির কি ভেতরে-ভেতরে ভাব হয়েছে?

ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে নাইকুণ্ডুলে হাত বোলাতে বোলাতে চিন্তিত উদ্বিগ্ন নগেন্দ্র গঙ্গা দেখতে থাকলেন। পরশু ইটভাটার ওখানে সুগিকে রুণুর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলতে দেখেছিলেন। সুগি তার মামার গাইগরুটা বাঁধতে গিয়েছিল। রুণু কোথায় গিয়েছিল জানেন না নগেন্দ্র। তবে একটা খটকা লেগেছিল দেখা মাত্র।

অবশ্য হেসে-হেসে কথা বললেই যে প্রেম থাকে এবং সেই প্রেমের খাতিরে হাতে ছুরি তুলে নিতে হয়, এর কোন মানে নেই। আর রুণু সেদিনকার ছেলে। এখনও চোখ বুজে তাকে ন্যাংটো দেখতে পান নগেন্দ্র। পিঠে করে গঙ্গায় স্নান করতে আসতেন। রুণু তাঁর কান চুষে খিকখিক করে হাসত। একদিন তো হিসি করে পিঠ ভাসিয়ে দিল। সেই রুণু নচুর শ্বাসনলী ফাঁক করে দিয়েছে এবং হেমন্তরঞ্জনের ধেড়ে ভাগ্নীটার কথায়!

নগেন্দ্রর ইচ্ছে হল নিজেকে মেরে ফ্ল্যাট করে দেন। কেন এ-কথা ভেবে হঠাৎ অমন ভয় পেয়ে গেলেন, তাতে এখন নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে। থু থু করে থুথু ফেললেন নগেন্দ্র। সাবধানে জলে নেমে বললেন, আজকাল কাঁটালিয়াঘাটে এমন হয়েছে, নিজের ছায়াকে দেখেই ভয় পাচ্ছে মানুষ।

কোমর জলে দাঁড়িয়ে দোপহরিবাবু সূর্যপ্রণাম শেষ করার পর পাশে নগেন্দ্রকে দেখতে পেলেন। বললেন, কী বললেন?

নগেন্দ্র হাসলেন। গণ্ডুষপরিমাণ জল হাতে তুলে বললেন, এই সব খুনোখুনির কথা।

দোপহরিবাবু গামছা কাচায় মন দিলেন। তারপর ভুস করে একটা ডুব দিলেন দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে। মুখের জল হাত দিয়ে মুছে বললেন, পাপ।

পাপীরা কি মরছে? ভেবে দেখুন। সব ইয়ং ব্লাড। রবি, বাণীব্রত, ভোলা, মোনা, তারপর এই নচু। হয়তো নচুতেই শেষ নয়।

আপনি ঠিক বলেছেন নগুবাবু।

তাহলে? নগেন্দ্র অকারণে গাঢ় সোনালী জলের ময়লা সরানোর মতো করে দু'হাতে জল সরিয়ে বললেন। ইয়ং ব্লাড সব। ওরা কী পাপ করেছে আমাকে বলতে পারেন? পাপ তো আমাদের। ধেড়ে বুড়োদের। আমাদের কিচ্ছু হচ্ছে না কিন্তু। আমরাই আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছি।

দোপহরিবাবু পর পর দুটো ডুব দিলেন। আবার মুখের জল ঝেড়ে বললেন, ঠিক, ঠিক।

নগেন্দ্র ঘাটে কাপড়-কাচা ঘোমটা-টানা বউটির কান বাঁচিয়ে বললেন, হেমের ভাগ্নীকে তো চেনেন?

চিনি। কেন?

হেমের তো আপনার সঙ্গে খুব ওঠা-বসা। আমার নাম করবেন না, হেমকে বলুন, শিগগির ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে হোক বা যে করেই হোক কাঁটালিয়াঘাট থেকে সরাক।

দোপহরিবাবু মাথা মুছতে মুছতে বললেন, আপনার কথা বুঝলাম না ঠিক।

নগেন্দ্র আরও চাপা স্বরে বললেন, আমি বলেছি বলবেন না। খামোকা ঝামেলা হবে। হেম ভাগ্নীর দৌলতে সুখের মুখ দেখেছে। মাঝখানে এতগুলো তাজা প্রাণ চলে গেল। হেম জানে না কিছু? জেনেও ওর ন্যাকামি। নগেন্দ্র ঘোমটা-ঢাকা বউটির দিকে সতর্ক নজর রেখে ঢোক গিলে উত্তেজিতভাবে বললেন, পাপের কথা বলছিলেন। আপনার তো কাঁটালিয়াঘাটে চুল পেকে গেল। শ্মশানঘাট ছাড়া আর কোথাও একটা ডেডবডি দেখেছেন, বলুন? হেমের ভাগ্নী এলো। আর তারপর থেকে ধড়াদ্ধড় বডি পড়তে লাগল গাছের ফল পড়ার মতো। আমার ক্লিয়ার-কাট কথাবার্তা মশাই। এ জন্যে আমার বদনামও আছে।

দোপহরিবাবু চুপচাপ উঠে গেলেন ঘাটের মাথায়। ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসে পা-দুটো ধুয়ে রবার পামসু পরলেন। নিম্নাঙ্গ ভিজে, চলার সময় অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল। ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়বেন।...

আড়াইটে বাজছিল থানার দেওয়ালঘড়িতে। অফিসার-ইন-চার্জ গোলাম হোসেন বাইরে থেকে এইমাত্র এসেছেন। উঁচু চওড়া বারান্দায় টেবিল-চেয়ার পেতে অফিস করা অভ্যেস। বয়সে তাজা ছটফটে তরুণ। চিতাবাঘের বাচ্চা।

আদাব স্যার! হেমন্তরঞ্জন কপালে হাত ঠেকিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন।

গোলাম সহাস্যে বললেন, আদাব, আদাব। আসুন হেমবাবু, বসুন।

আপনি গিয়েছিলেন। আমি তখন বাজারের ওখানে ছিলাম। শুনলাম আড়াইটে নাগাদ আসতে বলেছেন। হেমন্তরঞ্জন মুখোমুখি বসে বললেন। একটু হাসলেনও। কাঁটালিয়াঘাটে প্রবাদ আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। পুলিশে ছুঁলে আঠারো দুগুণে ছত্তিরিশ।

গোলাম হো হো করে হাসলেন। এই রকম? জানা ছিল না তো! না, না। এটা ট্রাডিশনাল প্রোভার্ব। আপনার আমলের তৈরি নয়।

হেমন্তরঞ্জন ওঁকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন। আসলে এর তাৎপর্য হল, কাঁটালিয়াঘাটে কোন ক্রাইম কখনও দেখা যায়নি। মানে কোন বিগ ক্রাইম। লোকেরা বরাবর শান্তিপ্রিয়। দেখুন না, অন্যত্র রাজনীতি নিয়ে কত হাঙ্গামা হচ্ছে শুনতে পাই। এখানে আজ অব্দি কিচ্ছু হয়নি। এখানকার রাজনীতিও বড় নির্দোষ। পোস্টার সাঁটা, ঘাটের চত্বরে সভা—ব্যস!

গোলাম ঝুঁকে এলেন টেবিলে। আস্তে বললেন, নচিকেতাবাব কাল রাত দশটা বা ওই সময় নাগাদ আপনার বাড়িতে ছিলেন?

হেমন্তরঞ্জন চমকালেন না। হতে পারে। আমি তো ঘাটে ভকতজির গদিতে তাস খেলতে যাই সন্ধেবেলা। ফিরতে কোন কোন দিন রাত এগারোটা-বারোটাও হয়ে যায়। কাল—

হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী এবং আপনার ভাগ্নীও তাই বললেন।

হেমন্তরঞ্জন চোখে-চোখে তাকিয়ে বললেন, নচুর সঙ্গে আমার ভাগ্নীর বিয়ের কথা চলছিল। হঠাৎ

ভেঙে যায়। তা সত্ত্বেও নচু আমাদের বাড়িতে আসত। ওর বাবা প্রমথনাথ ছিল আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

বিয়ে ভেঙে গেলেও নচিকেতাবাবু আপনার বাড়ি যেতেন?

হেমন্তরঞ্জন একটু চুপ করে থাকার পর গলা ঝেড়ে বললেন, আমি—মানে আমার ফ্যামিলি বহু ব্যাপারে উদার। তবে সেজন্যে নয়, নচু বেহায়ার মতো—কতকটা গায়ের জোরেই যেত। আমরা নিছক ভদ্রতা বলুন ভদ্রতায়, ভয়ে বলুন ভয়ে, ওকে সহ্য করতাম। নইলে—আপনি ঠিকই বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে-উল্টোটাই হয়।

আপনার ভাগ্নীর সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না প্লিজ, জাস্ট আ রুটিন ইনভেস্টিগেশান—

হেমন্তরঞ্জন ভীষণ গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। না! তেমন কিছু ছিল না।

আর ইউ সিওর?

ডেফিনিট্‌লি।

বিয়ের সম্পর্ক হঠাৎ ভেঙে গেল কেন?

হেমন্তরঞ্জন সোজা হয়ে বসলেন। বলতে আপত্তি কী। আপনাদের ইসলামধর্মে আছে কি না জানি না, আমাদের হিন্দুধর্মে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর যোটকবিচার হয়। ঠিকুজি-কোষ্ঠী মেলাতে হয়। পাত্রীর গণ হল দেব, পাত্রের গণ রাক্ষস। এই বিপরীত যোটকে বিয়ে সুখের হয় না।

কিন্তু নচিকেতাবাবু ইনসিস্ট্‌ করেছিলেন?

তা করেছিল।

আপনি রাজি হননি?

আমি—আসলে সংস্কারের বশীভূত না হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বাধে। তবে আমার স্ত্রী বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাছাড়া অকালমৃত্যু যোগের আভাস ছিল কোষ্ঠীতে।

গোলাম হাসলেন। ফলে গেল!

অক্ষরে অক্ষরে। হেমন্তরঞ্জন একটু কাতর হয়ে বললেন। সত্যি বিয়েটা হলে কি হত ভেবে আমার সকাল থেকে কষ্ট হচ্ছে।

হওয়া উচিত। সত্যি তো! গোলাম গাছপালার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা দেখতে দেখতে বললেন। তারপর ঘুরে বসলেন। কাল রাতে নচিকেতাবাবু আপনার স্ত্রীকে অপমান করেছিলেন?

হ্যাঁ। ফিরে গিয়ে শুনেছিলাম। কিন্তু আপনি কি ভাবছিলেন ভাই রাগের বশে—

না, না। নিছক প্রশ্ন।

হেমন্তরঞ্জন উত্তেজিত হয়ে বললেন, রবি, বাণীব্রত, ভোলা, মোনা এদের সঙ্গে আমার ভাগ্নীর বিয়ের কথা হয়নি। এদের কে খতম করল—আমি?

প্লিজ হেমবাবু! গোলাম সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। নিন, সিগারেট খান।

হেমন্তরঞ্জনের হাত কাঁপছিল উত্তেজনায়। সিগারেট নিলেন। গোলাম লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন। নিজেও ধরালেন। ফের বললেন, চা খাবেন হেমবাবু?

খেতে পারি।

গোলাম ডাকলেন, ননী। একজন কনস্টেবল এসে সেলাম দিল।

দেখ তো মধু চায়ের জল চড়াল নাকি। ঝটপট দু'কাপ চা দিয়ে যেতে বল।

ননী কনস্টেবল বারান্দা থেকে নেমে গেল। গেটের পাশে পিচরাস্তার ধারে চায়ের দোকান হয়েছে ইদানিং। থানার লোকেরা খায়। বাইরের যারা থানায় আসে, তারাও খায়।

গোলাম আবার গঙ্গার দিকে তাকালেন। পাল তোলা নৌকো যাচ্ছে একটা। বিকেলের রঙ লেগেছে রোদে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। তবে অগ্নিকোণে সন্দেহজনক কালো মেঘ। গোলাম ঘুরে বললেন, কৃষ্ণপক্ষ যাচ্ছে। কাল রাতে চাঁদ ওঠে এগারোটা নাগাদ। আকাশের অবস্থা এই রকম ছিল। আমি রকুনপুর থেকে ফিরছিলাম। ঢোকার মুখে কদমগাছটার ওদিকে মনে হল কেউ দাঁড়িয়ে আছে। জিপের আলো গাছটার উল্টো দিকে। কিন্তু চাঁদের আবছা আলোয় লোকটাকে দেখতে পেলাম। ব্রেক কষে টর্চের

আলোয় খুঁজলাম। আর দেখতে পেলাম না। গোলাম একটু হাসলেন। আমি ভাবলাম আপনাকেই দেখেছি। একই ফিজিক্যাল ফিচার।

হেমন্তরঞ্জন শক্ত মুখে বললেন, আমি না। অন্য কেউ।

তাই। গোলাম সিগারেটেব ধোঁয়ার মধ্যে উচ্চারণ করলেন।

তখন কদমতলায় কিছু ছিল না?

নাঃ। আমি চলে আসার পরই ব্যাপারটা ঘটে থাকবে।

আমার গড়নের কেউ বলছেন? হেমন্তরঞ্জন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন ও. সি. সাহেবের দিকে।

ও. সি. সাহেব বললেন, এক্স্যাক্টলি। ভাল বা মন্দ যা-ই বলুন, আসলে আমার অভ্যাস মানুষ অবজার্ভেশন। এই ছ'মাসে কাঁটালিয়াঘাটের প্রত্যেকটি মানুষের ফিজিক্যাল ফিচার আমার মুখস্থ। অন্ধকারে দেখলেও বলে দিতে পারি—অন্তত নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কারেক্ট হবে। আমার কলিগদের জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওঁদের কতবার অবাক করে দিয়েছি।

আপনি কি সায়েন্স স্টুডেন্ট ছিলেন?

না, আর্টস। এম. এ-তে হিস্ট্রি ছিল।

চা এলো। চায়ে চুমুক দিয়ে হেমন্তরঞ্জন বললেন, তাহলে আপনি ভালই জানেন কাঁটালিয়াঘাটে আমার গড়নের মানুষ ক'জন আছে?

অন্তত জনাতিনেক তো বটেই।

হেমন্তরঞ্জন হাসলেন। কে-কে শুনি?

আমাব টপসিক্রেট আপাতত। গোলাম উচ্চহাস্য করলেন। বলছি না।

তাদের জেরা করবেন?

কিছু ঠিক করিনি।....

হেমন্তরঞ্জন উঠলেন, তখন সাড়ে তিনটে বাজে। অগ্নিকোণের কালো মেঘ বিশাল হয়ে উঠেছে। রাস্তায় এখনই লোকজন কম। বৃষ্টির ভয়ে লম্বা পা চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। শিবমন্দিরের কাছে এলে কেউ তাঁকে ডাকল। ঘুরে দেখলেন দোপহরিবাবু।

এখানে কী করছেন? হেমন্তরঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন। থানা থেকে ছাড়া পেয়ে মন খুব প্রসন্ন। আসুন, অসুন। বৃষ্টি আসছে। বলে লম্বা মানুষ লম্বা লম্বা পা ফেললেন।

দোপহরিবাবু অনেক চেষ্টায় এসে সঙ্গ ধবলেন। জায়গাটা কেনা আছে। মাঝে মাঝে দেখতে আসি, পাছে বে-দখল হয়ে যায়।

ও! আপনার বোন-মিলের ব্যাপার। হেমন্তরঞ্জন বললেন উ· 'হ দিয়ে। করে ফেলুন আর দেরি না করে। কারবারি মানুষ কেমন করে চুপচাপ বসে আছেন দেখে অবাক লাগে।

দোপহরিবাবু শ্বাস ছাড়লেন জোরে। দেখি।

বাধাটা কিসের?

আপনারা সকালে আলোচনা করছিলেন—আপনি আর প্রভাতবাবু। দোপহরিবাবু আস্তে বললেন শ্বাস-প্রশ্বাস মিশিয়ে। বলছিলেন আরেকরকম চেহারা আছে রাজনীতির।

হেমন্তরঞ্জন অবাক হলেন। গঙ্গার ওপারটা ধূসর হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। প্রবল বৃষ্টি আসছে। বললেন, আসুন আমার বাড়িতে। একটু দাঁড়িয়ে যাবেন। বৃষ্টি এসে পড়ল বলে।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখে দোপহরিবাবু বললেন, চলুন, যাই।

সুগন্ধা দরজা খুলে দিল। দোপহরিবাবুকে দেখে একটু হাসল। কাকাজিকে অনেক দিন বাদে দেখছি।

দোপহরিবাবু শুধু বললেন, ভাল তো?

হেমন্তরঞ্জন তাড়া দিলেন ভাগ্নীকে। ঘর খুলে দে শিগগির। আর চা-ফা কর। শোন, পারিস তো একটু তেলেভাজা কর। আমাদের দোপহরিবাবু তেলেভাজাব ভক্ত।

উঁচু বারান্দাওলা বাড়ি। বসার ঘরে তক্তপোশ, টেবিল-চেয়ার, একটা কাঁঠাল কাঠের আলমারি। আলমারিতে কিছু বই, পুতুল আর একগাদা নানা সাইজের ওষুধের শিশি। দেওয়ালে কয়েকটা

ক্যালেন্ডার, বাঁধানো ফটোগ্রাফ, রবীন্দ্রনাথ আর নেহরুর ছবি। তক্তপোশে সতরঞ্জিতে বসলেন দোপহরিবাবু। হেমন্তরঞ্জন একটা চেয়ার টেনে দরজার কাছে বসলেন। বললেন, এবার বলুন কি বলছিলেন। হ্যাঁ—রাজনীতির কথা।

বলে আর ফায়দা কী? দোপহরিবাবু হাসলেন। এবাব সবাই ডাক্তারবাবুর মতো নোটিশ লটকে রাখুক ঘরে। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কববেন না।

না, না! কারবারে বাধার কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ—একটা বছর হাত গুটিয়ে বসে আছি। একবার ভাবি চলে যাই অন্য কোথাও, আবার ভাবি কোথায় যাব? বয়স হয়েছে। যে ক'টা দিন বাঁচি, এখানেই থাকি।

বাধাটা—মনে করিয়ে দিলেন হেমন্তরঞ্জন।

সেই তো বলছিলাম, রাজনীতির অন্য চেহারার কথা। আপনারা টেররিজ্‌ম নিয়ে আলোচনা করছিলেন। দোপহরিবাবু পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন। তারপর পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে বললেন, আপনি আর প্রভাত মাস্টাববাবু একমত হয়ে বলছিলেন, আড়ালে রাজনীতির যে চেহারা, সেটাই টেররিজ্‌ম। আমি সামান্য কারবারি মানুষ। কারবার ছেড়ে দিয়ে বসে আছি একবছর। অন্য কারবারিরা ছাড়েনি। ছাড়বে না। রফা করে চলবে। আমি পারি না। আমার মুনাফাখোরি স্বভাব। কিন্তু মুনাফা তো সহজে হয় না। অনেক বুদ্ধি খাটাতে হয়। অনেক রক্ত জল করতে হয়।

দোপহরিবাবু থামলে হেমন্তরঞ্জন মাথার পিছনকার চুল টানাটানি করে বললেন, হুঁ, বলে যান।

মুনাফার ভাগ দিতে আমার কষ্ট হয়। আমি পারি না। গলার ভেতর দোপহরিবাবু বললেন। বলবেন তাহলে অত টাকা কি করবেন—একা মানুষ?

হুঁউ। তা বলব বৈকি।

আমি টাকা নিয়ে কারবার করব। কারবার ছাড়া জীবনে কিছু বুঝি না। বুঝলাম না। দোপহরিবাবু মুখ উঁচু করে বললেন। এক টাকার কারবারে এক টাকা মুনাফা হলে দু'টাকা পুঁজি হবে। দু'টাকা চার টাকা হবে। চার হবে আট। কারবার বাড়বে। আমি এই বুঝি।

হেমন্তরঞ্জন একটু দ্বিধার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তবে সমাজের প্রতি আপনার কিছু কর্তব্য আছে।

আছে। দোপহরিবাবু বললেন। কিন্তু পেটে চাক্কুর ডগা ঠেকিয়ে মুনাফার ভাগ দাবি করবে— -

সে তো গুণ্ডা মস্তানের ব্যাপার। কাঁটালিয়াঘাটে আমার বিশ্বাস তেমন কিছু ঘটে না। ঘটতে শুনিনি। আপনিও বলেননি।

বলিনি। জানতে চাইছেন বলে বললাম।

হেমন্তরঞ্জন একটু হাসলেন। কে জানে! তবে এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে কি?

আজকাল রাজনীতর অন্য চেহারা তো এটাই। আপনারা যা নিয়ে আলোচনা কবছিলেন।

আমরা ঠিক এই অ্যাঙ্গেলে ব্যাপারটা দেখছিলাম না—জানেন?

বৃষ্টিটা এতক্ষণে এলো। বাইরের বারান্দার মাঝ অব্দি ভেজাতে লাগল। শনশন করে বাতাস বইতে লাগল। হেমন্তরঞ্জন দরজা ভেজিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে যাচ্ছিলেন। দোপহরিবাবু বললেন, থাক। আলো চোখে বড্ড লাগবে। ক'টা বাজে?

সওয়া চারটের বেশি নয়। হেমন্ত দরজাটা ফের খুলে দিলেন। বাইরেটা দেখে নিয়ে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার আগে ছাড়ছে না। দেখুন আবার ফ্লাড-টাড না হয়। তারপর ভেতরে এসে চেয়ারে বসলেন।

দোপহরিবাবু বললেন, ফ্লাড এলে আপনার বাড়ি ডোবার চান্স নেই। যথেষ্ট উঁচু।

হেমন্তরঞ্জন বললেন, হুঁ—কি যেন বলছিলেন? পেটে চাকু ঠেকিয়ে মুনাফার ভাগ দাবি! খুক খুক করে হাসলেন একটু। এদিক থেকে আমরা বেশ আছি—সেফসাইডে। কিন্তু তারা কারা?

দোপহরি তাকালেন। একটু পরে বললেন, পাঁচটা খতম হয়েছে। আবার দেখা যাক কে যায়।

হেমন্তরঞ্জন ভীষণ চমকে উঠলেন। বললেন, কি আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! ভাবা যায় না।

বলে আপন মনে হাসতে লাগলেন। হাসির মধ্যে ফের বললেন, দোপহরিবাবু! আমাকে যা বললেন —বললেন। যেন আর কারুর কাছে বলবেন না। ভাববে, আপনিই—না, না। জাস্ট কথার কথা বলছি। যা হয়েছে, প্রত্যেকের প্রত্যেককে সন্দেহ। গোলামবাবু দারোগা বলছিলেন, কাল অনেক রাতে কদমতলায় আমার গড়নের কাকে দেখেছিলেন জিপ থেকে। সেখানে নচুর বডি পাওয়া গেল ভোরবেলা। বুঝুন কাণ্ড !

দোপহরিবাবু দরজার ফাঁক দিয়ে গঙ্গা ও বৃষ্টি দেখছিলেন। কিছু বললেন না।

হেমন্তরঞ্জন চাপা স্বরে বললেন, কাল রাতে নচু শাসাতে এসেছিল—সুগিকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে।

দোপহরিবাবু পকেট থেকে সিগারেট বের করে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন হেমন্তরঞ্জনের দিকে। বললেন, নচু কাল সকালে আমার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিল। বলে কি, হাজার দুই ছাড়ুন। তারপর ফ্যাক্টরি করুন। নইলে মোজামকে বলব জমিতে লাঙল চষতে।

আপনি কি বললেন?

বললাম দু'দিন সময় দাও। ভেবে দেখি। দোপহরিবাবু নিজের সিগারেট ধরিয়ে জোরে কয়েকটা টান দিলেন। ধোঁয়ার ভেতর বললেন, রবি, বাণীব্রত, ভোলা, মোনা সবাই একই লাইনে ছিল। সবাইকে বলেছিলাম দু'দিন সময় দাও, ভেবে দেখি।

ফ্যাঁচ শব্দে অদ্ভুত হাসলেন হেমন্তরঞ্জন। কে এসব করছে বলুন তো? কী মনে হয় আপনার?

আমি কোন ভাড়াটে খুনী আমদানি করিনি। এটুকু সিওর জানবেন।

না, না! আপনার কি ধারণা?

আমি আঁধারে। ধোঁয়ার রিং বানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন দোপহরিবাবু। আমি খুঁজছি তাকে। কারণ কি, আমার ইচ্ছা, তাকেই দু'হাজার টাকা বখশিস দেব।

হেমন্তরঞ্জন বাচ্চার মতো অগাধ ও নিরুপদ্রব আনন্দে হাসতে লাগলেন। ....

ঘণ্টা দুই পরে দুজনে বেরুলেন। হেমন্তরঞ্জন ঘাটের গদিতে ভকতজির তাসের আড্ডায় চললেন। দোপহরিবাবু নিজের বাসায়। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। রাস্তা গঙ্গার সমান্তরাল এবং দূরে-দূরে একটা করে ল্যাম্পপোস্টে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। রাস্তা এখনই জনহীন নিঝুম। সূর্যাস্তের পর কাঁটালিয়াঘাটে আজকাল গা ছমছম করে মানুষের। তবু কিছু সাহসী আছেন, যাঁরা বেরোন। কিন্তু তাঁরা কেউ সদর রাস্তার বাইরে পা বাড়ান না। আলো ছেড়ে আঁধারে যান না।

দোপহরিবাবু ঘর খুলে বাতি জ্বেলে দিলেন। কাতুরি এলো খোঁজ নিতে কিছু দরকার আছে নাকি। সে উনুন ধরিয়ে দেয়। ঘর সাফ করে দেয়। থালা-বাসন -হাঁড়ি-কুড়িও ধুয়ে দেয়। বাড়তি খাবার নিয়ে যায় দু'বেলা। মাইনে নয়, সপ্তায় দুটো-পাঁচটা টাকা হাতে ধরিয়ে দেন দোপহরিবাবু। পুজোয় পরবে ফ্রক, জুতো এই সব।

কিছু করার নেই জেনে কাতুরি চলে যাচ্ছিল। যেতে গিয়ে ঘুরল। দোপহরিবাবু বললেন, কী রে?

রুণু—

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তেই কথার ওপর কথা বসিয়ে দিলেন দোপহরিবাবু, কে রুণু?

কাতুরি হাসল। ওই যে গো নণ্ডবাবুর ছেলে রুণু না ফুলু।

কি রুণু না ফুলু? গলার ভেতর গর্জন করলেন দীপহরি সিং ছত্রী। মুখে বোবা ধরে গেল অমনি!

অমন করছেন কেন দোপহরিবাবু? বাব্বাঃ। চোখ-মুখ দেখে—

কিছু না। বল।

রুণু আপনার জন্যে আমাদের দোকানে কতক্ষণ বসে থেকে গেল। বিষ্টি পড়ছিল। আপনার ঘরে তালা।

কিছু বলছিল?

কাতুরি ফ্রকের বাহুর নকশা চিবুতে চিবুতে বলল, নাঃ। শুধু বলছিল—কি যেন বলছিল? ওপরে চোখ তুলে স্মরণ করে কাতুরি বলল ফের, বলছিল—হ্যাঁ, কাতুরি, দোপহরিবাবুকে বলিস রুণুবাবু এসেছিল। পুরুষালি স্বর নকল করে কথাটা বলেই কাতুরি বেরিয়ে গেল।

দোপহরিবাবু দেয়ালেব দিকে তাকিয়ে রইলেন কতক্ষণ। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। নাক আর কান দিয়ে গরম বাতাস বেরিয়ে গেল।

কে তাঁর পিছনে একজন করে লেলিয়ে দিচ্ছে? কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। ঠিক এইভাবেই সে লেলিয়ে দিয়েছিল রবিকে। রবি এসে বলেছিল, দোপহরিবাবু, আপনি একলা মানুষ। কি করবেন অত টাকা? আমরা বেকার বসে আছি। দিন আমাদের কিছু টাকা। না, না—কাঁটালিয়াঘাটে থাকতে হলে দিতে হবে। ইনকাম-ট্যাক্স তো দেন না। মনে করুন এটা তাই।

তারপর এলো বাণীব্রত। আরও চোখা চোখা কথা তার। এমনি করে এলো ভোলা, তারপর মোনা, শেষে নচু। নচু বলে গেল মোজামকে দিয়ে ফ্যাক্টরির জন্যে কেনা জমিতে সর্ষে বোনাবে। গঙ্গার ধারের মাটিতে সর্ষের ফলন ভালই হয়।

এবার আসছে রুণু। তারপর আরও আসবে। একের পর এক। রক্তবীজের বংশ কাঁটালিয়াঘাটে।

হতাশভাবে বসে রইলেন দোপহরিবাবু। মাথার কাঁচা-পাকা চুল আঁকড়ে ধরলেন। কেউ নিজের বুদ্ধিতে আসছে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কেউ লেলিয়েই দিচ্ছে। বলছে, দোপহরিবাবুর অনেক টাকা। গিয়ে দাবি কর। চেপে ধরলেই পাবে। দবকার হলে ভয় দেখাবে।

সে কে ? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো হাতড়াতে থাকলেন দোপহরিবাবু। .....

রাত দশটা বাজে। নগেন্দ্র ছেলের জন্যে অস্থির হয়ে বাড়ি-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কাশীদাস বলেছেন, বিকেলে বৃষ্টির সময় তার দোকানে ছিল। বাকিতে তিন কাপ চা খেয়েছে এবং বিস্কুটও। তারপর কখন উঠে গেছে দেখিনি। হয়তো বৃষ্টি ছেড়ে গেলে গেছে। দোপহরিবাবু ঘরের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেছেন, এসেছিল শুনেছি। দেখিনি।

তারপর রুণুকে কেউ আর দেখেনি। হেমন্তরঞ্জনের বাড়ি গেলে দরজা খুলে মুখের ওপর হেমবাবুর বউ ঝাঁঝলো স্বরে বলেছে, রুণু আমাদের বাড়ি আসে না। নগেন্দ্রর ইচ্ছে ছিল সুগন্ধাকে কিছু জিগ্যেস করবেন। করা হল না। পাশের বাড়ির নীলমাধবকে ডাকলেন। নীলমাধব ছিপে রুইমাছ ধরে এনেছে কোন্ গ্রামের পুকুর থেকে। তখনও সেই মাছ ভাজা হচ্ছে। সে বলল, আমি তো ছিলাম না সারাদিন। একটু আগে নটা তেতাল্লিশের ট্রেনে ফিরেছি।

কাত্যায়নী এলেন। নীলু এলো, তখন ঘরে ঢুকলাম। বাইরের বারান্দাতেই বসে ছিলাম। নীলু নিরাপদে ফিরুক বলে ভগবানের কাছে মাথা কুটছিলেন, তাও বললেন কাত্যায়নী। শেষে ফিসফিসিয়ে বললেন, রুণু ওবাড়ি ঢুকলে বা বেরুলে দেখতে পেতাম। তবে একটু আগে সুগি বেরিয়ে কোথায় গেল, এখনও ফেরেনি বোধ করি।

নগেন্দ্র ভাঙা গলায় বললেন, তাহলে আর বেঁচে নেই রুণু।

বালাই ষাট ! রুণু কি সেই ছেলে? কাত্যায়নী পরামর্শ দিলেন, থানায় গিয়ে খবর দাও। যা চলছে কাঁটালিয়াঘাটে, খবর দিয়ে রাখা ভাল।

অগত্যা নগেন্দ্র থানায় গেলেন।

গোলাম দারোগা বারান্দার টেবিলের সামনে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছিলেন। 'স্যার'! শুনে চোখ খুলে নগেন্দ্রকে দেখতে পেলেন। বলুন নগেনবাবু।

নগেন্দ্র চেয়ারের পিছন আঁকড়ে ধরে ধরা গলায় অতি কষ্টে বললেন, আমার বড় ছেলে রুণু স্যার—

গোলাম ঝুঁকে এলেন টেবিলে। মার্ডারড ?

জানি না। সে এখনও বাড়ি ফেরেনি। কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না তাকে। নগেন্দ্র নাক ও চোখ মুছতে থাকলেন রুমাল বের করে। তাকে পই-পই করে বলা আছে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরতে। রোজ নটার

মধ্যেই ফেরে—

আপনি কেন ভাবছেন আপনার ছেলে খুন হয়েছে?

বুঝতেই পারছেন স্যার! পাঁচ-পাঁচটা ছেলে ওইভাবে—

না—আমি জানতে চাইছি, আপনার ছেলের খুন হওয়ার কি কোন বিশেষ কারণ আছে? কেন আপনি মনে করছেন সে খুন হয়েছে?

নগেন্দ্রর মাথায় কিছু এলো না।

আপনার ছেলে কী করে?

এখন বেকার বসে আছে, স্যার!

সাব-ইন্সপেক্টর রতনবাবু ঘরেব ভেতর থেকে বললেন, আগে চালের কারবার করত না?

নগেন্দ্র দরজার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে চকচকে একজোড়া চোখ দেখতে পেলেন শুধু। সে অনেক আগে।

বাড়ি যান। কোন আড্ডায় আছে। এসে যাবে'খন।

নগেন্দ্র গোলামের দিকে ঘুরে কাকুতি-মিনতি করে বললেন, একটু যদি দযা করে স্যার—

গোলাম বললেন, বলুন কী করতে পারি? আপনার ছেলেকে খুঁজতে সেপাই পাঠাব? কোথায় পাঠাব? যেখানে-যেখানে আগের বডিগুলো পাওয়া গেছে, সেখানে-সেখানে? নাকি নতুন কোন জায়গায়? বলুন কোথায়?

বিব্রত নগেন্দ্র বললেন, অন্তত একটা ডায়রি, স্যার।

গোলাম হাসলেন। বাড়ি গিয়ে দেখুন এতক্ষণ এসে গেছে। খামোকা ডায়রি লিখিয়ে লাভ নেই। মোটে তো সাড়ে দশটা বাজে। যান, বাড়ি চলে যান।

নগেন্দ্র কথা খুঁজে না পেয়ে আস্তে আস্তে ঘুরলেন। বারান্দা থেকে নেমে খুব আশা হল, বাড়ি ফিরে রুণুকে দেখতে পাবেন। বকাঝকা করবেন একচোট।

রাস্তায় আবার হঠাৎ ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি এসে গেল। দৌড়তে শুরু করল নগেন্দ্র। বয়স হয়েছে। একটু দৌড়ে হাঁফাতে শুরু করলেন। তখন ভিজতে ভিজতে আস্তে হাঁটতে থাকলেন। রোয়াকের মাথায় একটু কার্নিশ। সেখানে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন নগেন্দ্রর স্ত্রীর আর ছোট মেয়ে লুলি। নগেন্দ্র একটু দূর থেকে চিৎকার করে বললেন, ফিরেছে?

নগেন্দ্রর স্ত্রী কি বললেন বৃষ্টির শব্দে শোনা গেল না।

কাছে গিয়েই বুঝলেন রুণু ফেরেনি। নগেন্দ্রর স্ত্রী বললেন, লুকুকে চাঁদুদের বাড়ি পাঠিয়েছি। আনুর সঙ্গে চাঁদুর নাকি দেখা হয়েছিল। আনু বলেছে, রুণুকে চাঁদু স্টেশনে দেখেছে। সঙ্গে দুটো ছেলে ছিল।

নগেন্দ্র বাড়ি ঢুকলে রুণুর ছোট লুকু এলো ভিজতে ভিজতে। বলল, আনু মিথ্যুক। চাঁদু বলল দাদাকে স্টেশনে দেখেনি। আনুকে আসলে বলেছে, টুপু আর কাকে-কাকে দেখেছে স্টেশনে। আনু শুনেছে দাদার নাম।

প্রথমে নগেন্দ্রর স্ত্রী কেঁদে উঠলেন। তারপর নগেন্দ্র ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, তাহলে আর নেই।

খেলার ঝোঁকে সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। ভকতজি আর হরিহর, হেমন্তরঞ্জন আর রামলাল পার্টনার। শেষ ডবল-দেওয়া ফাইভ ডায়মন্ডের খেলা জিতে হেমন্তরঞ্জন বললেন, উঠি। আর নয়। গিন্নি বকবে।

ভকতজি অনিদ্রায় ভোগেন। সারারাত চালিয়ে গেলেও খুশি। বললেন, কাল দেখা যায়গা। সবুর! তারপর রাতের গঙ্গার শব্দ শুনতে তাকিয়ায় হেলান দিলেন।

হেমন্তরঞ্জন টর্চ হাতে বেরিয়ে আকাশ দেখে নিলেন। গঙ্গার মাথায় একচিল্‌তে চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে। আকাশ বাকি অংশে মেঘলা। সামনে রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে বাতি জ্বলছে। বাতি ঘিরে থকথকে পোকা। বৃষ্টিটা সদ্য ছেড়েছে। জল ঝিক-ঝিক করছে এখানে-ওখানে। হরিহর, মা গঙ্গায় হিসি

কেরো না এ বয়সে। হেমন্তরঞ্জন ঠাট্টা করলেন। অনেক পাপ তো করেছ। আর পাপ বাড়িও না।

হরিহর প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে হেসে বলল, সবই জল দাদা! চলি।

সে রেলের কর্মী। স্টেশন বোড ধরে চলে গেল। রামলাল খন্দের গদির মালিক। রাস্তার ধারেই তাঁর আড়ত এবং একতলা বাড়ি। পা বাড়িয়ে বললেন, চলি হেমবাবু! রাম রাম!

হেমন্তরঞ্জন বললেন, রাম রাম। ফির কাল মিলেঙ্গে।

জরুর। রামলাল বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘুরে বাংলায় ফেব বললেন, সঙ্গেতে লোক দেব হেমবাবু?

কেন? হেমন্তবঞ্জন হাসলেন। আমার গলা কেউ কাটবে না।

হোঁশিয়ারিসে যাইয়ে ....

হেমন্তরঞ্জন গুনগুন করে গান গাইবার চেষ্টা করে হাঁটছিলেন। এক হাতে ফোল্ডিং ছাতা, অন্য হাতে টর্চ। দোপহরিবাবুর ঘরের সামনে এসে ভাবলেন সাড়া দিয়ে যাবেন নাকি। ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে আর ডাকলেন না দূব থেকে একদঙ্গল কুকুরেব ডাক ভেসে এলো। ময়রাবুড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কুকুর সেদিকে তাকিয়ে বাবকতক চেঁচাল। তারপর ধুকুর-ধুকুব করে দৌড়ে চলল। তার ছায়া ঘরবাড়ির গায়ে কিছুক্ষণ ধবে তিড়িংবিড়িং করে নাচতে নাচতে দূরের আঁধারে মিশে গেল।

হেমন্তরঞ্জন খুব আস্তে হাঁটছিলেন। তাসের ছবিগুলো তখনও মনের ভেতর ভেসে উঠছে, উপুড় হচ্ছে। এই তাঁর অভ্যাস। শুয়ে পড়ার পরও কতক্ষণ ধরে বাহান্নখানা তাস মাথার ভেতর শাফ্‌ল হয়। খেলা চলতে থাকে। ডামি পার্টনারের হাতের তাসগুলো চিত হয়ে পড়ে থাকে চোখের সামনে। রাত্রির নির্জনতায় আসলে তাঁর মাথাটা ভাল খোলে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ খেয়াল হল, তাসে মানুষের মুখ দেখছেন। গোলামের ওপর গোলাম তুরুপ, তার ওপর গোলাম তুরুপ, তার ওপর গোলাম তুরুপ—ক্রমান্বয়ে এক অদ্ভুত তুরুপ পরম্পরা দেখে চমকে উঠলেন। রবির ওপর বাণীব্রত, তার ওপর ভোলা, ভোলার ওপর মোনা। মোনার ওপর টেক্কার মতো নচু তুরুপ। নচুর ওপর আরেকটা রঙের টেক্কা তুরুপ। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন হেমন্তরঞ্জন। রবিকে বাণীব্রত যদি খুন করে, বাণীব্রতকে যদি ভোলা খুন করে, ভোলাকে যদি মোনা এবং মোনাকে নচু ?

এবং নচুকে যদি দোপহরিবাবু?

অবাক লাগল নিজের সিদ্ধান্তের ওপর। দু'হাজার টাকা দাবি করেছিল বলেই দোপহরিবাবু মানুষ খুন করে ফেলবেন, তার চাইতে বড় কথা হল, খুন করার সাহস আর গায়ের জোর তাঁর আছে কি না! লোকটার গায়ের চামড়া জায়গায়-জায়গায় হাড়ে সাঁটা। খুব দ্বিধায় পড়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন হেমন্তরঞ্জন। সিগারেট ধরানোর সময় গঙ্গার দিক থেকে জোরালো হাওয়া এলো। অনেক চেষ্টার পর ধরালেন। আবার হিসেব করতে থাকলেন। দোপহরিবাবুকে তাহলে কত টাকা দিতে হয়েছে? রবিকে মারার জন্য বাণীব্রতকে, বাণীব্রতর জন্য ভোলাকে, ভোলার জন্য মোনাকে, মোনার জন্য নচুকে টাকা দিতে হয়েছে। তাহলে তো অনেক টাকার ব্যাপার। নাঃ, দোপহরিবাবু কিপ্‌টে লোক। টাকা-পয়সা ওঁর গায়ের রক্ত। আপ্যায়নের খরচাব ভয়ে নিজে থেকে কারুর সঙ্গে মেশেন না। বৎসরাধিক কাল তাঁর টাকা বাচ্চা বিয়োতে পারছে না, এটা খুনোখুনির পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই অন্য দিক থেকে ভাবা যাক। হেমন্তরঞ্জন ভাববার জন্য গোড়া-বাঁধানো অশ্বত্থ গাছটার কাছে গেলেন। সিমেন্ট ভিজে আছে দেখে বসলেন না। আজ সন্ধ্যায় ঘাটে গিয়েই ভকতজির কাছে শুনেছিলেন, তাঁর ভাগ্নীর নামে গুজব রটেছে। আমল দেননি। এখন ঠাণ্ডা মাথায় মনে হচ্ছে, রবির সঙ্গে তাঁর ভাগ্নী সুগির কি কোন গোপন সম্পর্ক ছিল? রবি যাতায়াত করত বাড়ির ছেলের মতো। মাঝে মাঝে টাকা ধারও দিত। ধরা যাক, নচুর মতোই রবি সুগিকে শাসিয়েছিল। সুগি বাণীব্রতকে তার পিছনে লেলিয়ে দিল। তারপর বাণীব্রত যখন কোন অন্যায় প্রস্তাব করল তখন সুগি ভোলাকে লেলিয়ে দিল। এই ভাবে! শিউরে উঠলেন তিনি।

হ্যাঁ, একটা লজিকের লেজ নজর হচ্ছে। ওই লজিক অনুসারে নচু অব্দি পৌঁছানো যাচ্ছে। গত

রাতে নচু কদমগাছটার তলায় খুন হয়েছে। তাস খেলে ফেরার পথে বাড়ির একটু আগে খুব চমকে গিয়ে দেখেছিলেন যেন সুগি বেরিয়ে যাচ্ছে। ডাকব-ডাকব করতে সময় লাগল। অত রাতে ভাগ্নীর নাম ধরে ডাকলে কে কি ভাববে। তাই তাকে অনুসরণ করে কদমতলা অব্দি গেলেন। তারপর আর দেখতে পেলেন না। সেই সময় জিপের আলো এসে পড়তেই ঝোপের আড়াল দিয়ে ফিরে এলেন। ফিরে দেখেন সুগি বাড়িতেই আছে। বলেছিল তুমি ভুল দেখেছ। মামীমা ঘুমিয়ে। আমি দরজা ভেজিয়ে কোথায় যাব এত রাতে? এখন মনে হচ্ছে, তিনি ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু সুগি নচুর ওপর লেলিয়ে দিয়েছে কাকে, এখনও বুঝতে পারছেন না হেমন্তরঞ্জন।

এটা জানা দরকার। জানতেই হবে। এ এক সর্বনেশে তুরুপের খেলা। হেমন্তরঞ্জন হাঁটতে থাকলেন আবার। প্রভাতমণির সঙ্গে আজ সকালে একবারে ভুল জায়গায় গিয়ে পড়েছিলেন। তাসের হিসেব করতে গিয়েই একটা নতুন অ্যাঙ্গেল পাওয়া গেল এতক্ষণে। সুগির সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হবে।

দরজায় কড়া নাড়তে আজ শিগগির খুলে গেল। লতিকারানী জেগে ছিলেন তাহলে। অবাক লাগল হেমন্তরঞ্জনের। রোজ রাতে সুগন্ধাই দরজা খুলে দেয় মামাকে। যেন মামার জন্যে ঘুমোয় না। গত রাতেও তো সে তাঁকে অবাক করে দিয়েছিল দরজা খুলে। হেমন্তরঞ্জন দ্রুত বললেন, সুগি কই?

লতিকারানী জবাব দিলেন না। হেমন্তরঞ্জন পা ধুয়ে উঠোনের কোণে গেলেন না আজ। খাবার ঢাকা দেওয়া আছে রান্নাঘরে। সেখানে আলো জ্বলছে বলেই দেখতে পেলেন। একটু অধৈর্য হয়ে ফের বললেন, সুগি কই? কাল রাতের মতো আবার কোথায় বেরুল সে? আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে হতচ্ছাড়ী বাঁদরী মেয়েটা।

লতিকারানী শ্বাস ছাড়ার মধ্যে বললেন, চেঁচিও না রাতদুপুরে।

হেমন্তরঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর খাটো করলেন। শরীর খারাপ নাকি সুগির?

সুগি নেই।

নেই মানে? হেমন্তরঞ্জন এক পা এগিয়ে গেলেন স্ত্রীর দিকে।

লতিকারানী শক্ত গলায় বললেন, সুগি পালিয়ে গেছে।

তুমি কোথায় ছিলে? হেমন্তরঞ্জন হাত বাড়িয়ে থাম ধরলেন।

ঘুমুচ্ছিলাম। একটু পরে ফের বললেন, জানতাম, যাবে।

হেমন্তরঞ্জন পাশের ঘরের বন্ধ কপাটের দিকে তাকালেন। তারপর অবিশ্বাসী হাতে ধাক্কা দিতে কপাট দুটো আস্তে খুলে গেল। সুইচ টিপে বাতি জ্বাললেন। বিছানা খালি। দড়ির আলনাও খালি। দেয়ালের নিচের তাকে সুগন্ধার সুটকেশটাও নেই।

পিছন থেকে লতিকা বললেন, চোখের মাথা খেয়ে বিছানায় রাখা চিঠিটাও দেখতে পাচ্ছ না? তাসের ফোঁটা তো অন্ধকারেও বেশ দেখতে পাও!

অসভ্যের মতো কথা বোলো না। হেমন্তরঞ্জন চিঠিটা আলোর সামনে তুলে পড়তে থাকলেন। পড়া হলে সুগন্ধার বিছানায় বসে পড়লেন। মুখটা কিছুক্ষণ নিচু করে রাখলেন।

লতিকারানী বললেন, কি লিখে গেছে? আমি পড়তে পারিনি।

হেমন্তরঞ্জন ভাঙা গলায় বললেন, সর্বনাশী! শেষে নগুর ওই হারামজাদা ছেলে সঙ্গে! এত ভাল-ভাল সব ছেলে থাকতে ..

দোপহরিবাবু ঘুমোননি। কান পেতে শুয়েছিলেন চুপচাপ। বালিশের তলায় একটা ছুরি রাখা ছিল। ছুরিটা কি ভেবে গত গঙ্গাপুজোর মেলায় কিনেছিলেন।

কিন্তু নগুর ছেলে এলো না। ভেবেছিলেন আসবে। এলেই—

এবং তিনি ওদের মতো বোকা নন। বর্ষার ভরা গঙ্গায় তার লাসটা স্রোতে ঠেলে দিয়ে আসবেন। ঘাসে শুইয়ে রাখবেন না। ঘরের রক্ত পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলার জন্যে খুব ভোরে বাইরের দরজায় তালা আটকে দিয়ে আসবেন। প্রভাতমণি এসে ফিরে যাবেন। কাতুরিও তালা দেখে ফিরে যাবে। এই

সব পরিকল্পনা ছিল। নিখুঁত পরিকল্পনা। তিনি হিসেবি মানুষ। হিসেব করেই এ পথে পা বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রুণু হারামিটা এলো না। রাত সওয়া দশটায় নগেন্দ্র এসে খোঁজ করছিলেন, তখন আসলে দোপহরিবাবু রুণুরই অপেক্ষা করছিলেন। বাইরে দাঁড়িয়ে। তখন তিনি সংকল্পবদ্ধ। একেবারে তৈরি।

বারোটা বাজল। একটা বাজল। দুটো বাজল। তখন কাত হয়ে শুলেন। তারপর ভাবতে লাগলেন, সত্যি যদি রুণু আসত এবং ধরা যাক, সত্যি সত্যি তিনি তাকে জবাই করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসতেনও—কিন্তু তাতেই কি ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেত ?

চমকে উঠলেন। আবার যে একজন এসে টাকা দাবি করত না তার গ্যারান্টি কোথায়?

দোপহরিবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন। ক্রমাগত একের পর একজনকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ। তাকেই তো আগে খুঁজে বের করা দরকার। কে সে?

তাঁর কান্না পেল। মনে মনে মাথা কুটতে থাকলেন। ভগবান, আমাকে চিনিয়ে দাও সেই পাপীকে। মা গঙ্গা, সেই পাপীর রক্তে তোর পা ধুইয়ে দিতে দে মা!

শেষ রাতে বৃষ্টি এলো ঝমঝমিয়ে। তখন মন অনেকটা শান্ত হল। অনেক খেলা খেলে বাড়ি ফেরা ছোট্ট ছেলের মতো ক্লান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন দোপহরিবাবু। স্বপ্নে দেখলেন, গঙ্গার বুক জুড়ে অসংখ্য মড়া ভেসে যাচ্ছে। ভকতজি তাঁকে ঠাণ্ডা করে বললেন, বহুত হাড্ডি মিলেগা সিংজি ভেইয়া! বোন-মিল ফ্যাক্টরি বানাও। রুপেয়া কামাও। রাগে ভকতজির গলা কাটতে গেলেন দীপহরি সিং ছত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ হতে লাগল।

কাতুরি জোর কড়া নাড়ছিল। খুললে পাঁউরুটি আর চায়ের ট্রেনিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, বেলা কত হয়েছে দেখুন! দু'বার ফিরে গেছি। ভেবেছিলাম এই শেষবার। পা ধরে যায় না আমার?

দোপহরিবাবু বসলেন বিছানায়। শরীরে একফোঁটা জোর নেই। মাথাটা ভারি লাগছে।

কাতুরি হাসল। মুখে জল দেবেন না কি ?

দিচ্ছি। তুই যা।

কাতুরি ফিক করে হাসল। কি হয়েছে জানেন? হেমবাবুর ভাগ্নীকে নিয়ে নগুবাবুর ছেলে রুণু পালিয়ে গেছে। নীলুদার মা জনে-জনে ডেকে বলছিল। তাই নিয়ে হেমবাবু আর নীলুদার ফাটাফাটি লেগেছিল। সবাই গিয়ে মিটিয়ে দিল।

দোপহরিবাবু তাকালেন নিষ্পলক চোখে। মাথার ভারি জিনিসটা বুক দিয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যেতে হাল্কা লাগল। কাতুরি ফ্রকের গলার নক্‌শাকাটা কাপড় চিবুতে চিবুতে আবার ফিক করে হেসে জোরে বেরিয়ে গেল। মেঘে-মেঘে বেলা বাড়ার মতো মেয়েটার যৌবন কানায়-কানায় পূর্ণ। কাশীদাস আর কতদিন ফ্রক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে? নাদান মূর্‌খ! বিরক্ত দোপহরিবাবু ঘুরে জানালা দিয়ে গঙ্গা দেখতে থাকলেন। একটা পালতোলা নৌকো ভেসে চলেছে। ওপারের আকাশে মেঘের রঙ পাটকিলে হয়ে আছে। সূর্য শিমুলগাছের কাঁধ বরাবর উঠে এসেছে, তার আভাস চলন্ত মেঘেই পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গার জলে লাল্‌চে আভা। তাকালেই মনে হয় রক্ত। একেই হয়তো রক্তগঙ্গা বলে। রক্তগঙ্গার ওপর যতক্ষণ না বৃষ্টির জল পড়ে সব ধুয়ে দিল, ততক্ষণ দোপহরিবাবু চুপচাপ বসে থাকলেন।

তারপর দোপহরিবাবু চিন্ত্মসে শুকনো ঠোঁটের ফাঁকে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল। কাল দুপুরে স্নানের ঘাটে নগেন্দ্র যে আভাস দিয়েছিলেন, তাই তাহলে সত্যি হল। আসলে সত্য জিনিসটাই এই রকম। ফালতু জিনিসের ভেতর পড়ে থাকে। চেনা যায় না। ......

—